বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

৭ম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ ১৩৪০—আষাঢ় ১৩৪১

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্

পরিচালক

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র এম্-এ, ডি-লিট্

কলিকাতা

২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

বার্ষিক মূল্য—৬৲

P 30226

বিষয়-সূচী

(মাঘ ১৩৪০—আষাঢ় ১৩৪১)

ন্ত্রী চিত্রবীর ও আধুনিক বাঙলার শিল্পকথা —শ্রীঅসিতকুমার হালদার ২০৪
(কবিতা) —শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ... ৭১৬
ন (উপন্যাস) —শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৯১, ৪২৬, ৬৮৩, ৭২০
কবিতা) —শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ... ৩১৬
বৃষ্টি হ'ল এই ক্ষণ (কবিতা) —শ্রীসুরেশ বিশ্বাস ... ৭৯৬
মানুষ (কবিতা) —আশু চট্টোপাধ্যায় ... ৩২৫
কার জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণ সমিতি —ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখার্জী ... ৪৯২
র কুৎসা কবিতা —মহম্মদ গোলাম মাওলা ... ৫৪২
গীতাঞ্জলী —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৬৫
মা —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১
ন দিয়েছিনু (কবিতা) —শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ... ৭২৮
[redacted]্য (কবিতা) —শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৭৩৪
[redacted] (কবিতা) —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪২৩
[redacted]ক নয় —শ্রীরবীন্দ্রলাল রায় ... ৫৯
ইন ও আর্ট —শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ... ৬৪৭
ষ্ট বা গৌরীশঙ্কর অভিযান —ডাঃ পিনাকীলাল রায় ... ২২০
উদ্যান প্রান্তে (কবিতা) —শ্রীদক্ষিণারঞ্জন কর চৌধুরী ২৯০
ও আনন্দ —অধ্যাপক কাজি মোতাহার হোসেন ... ৩৮৫
াব ও রূপ) —শ্রীনবেন্দু বসু ... ৩৩৮

কবিতার বই বুঝি মোর পেলে (কবিতা) —শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫২
কর্ম্ম-ভিক্ষু (গল্প) —শ্রীরমেশচন্দ্র রায় ... ৪৯৮
কল্পনা (কবিতা) —শ্রীমমতা মিত্র ... ২৯০
কবিকুঞ্জ (১) চাতুরী —শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ... ৭০০
(২) চিত্র লেখা —শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৯৯
(৩) পদ্মাপারের মাঝির গান —শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায় ... ৭০১
কাঙাল (কবিতা) —কুমারী অমিতা রায় ... ৩৭৩
কাবুলিওয়ালা —শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ ... ৪৭৯
কাব্য-কথা —অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ৫৭০
কামনা রতি ও শরণাগতি (কবিতা) —শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৩৪৬
কাল-বৈশাখী (কবিতা) —শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ... ৪৭০
গজল (কবিতা) —এস, আনোয়ারা বেগম ২০২
গীতিকবি অতুলপ্রসাদ —শ্রীসুরেশচন্দ্র পুরকায়স্থ ৭১০
চণ্ডীদাসের পঞ্চপঞ্চাশৎ প্রকাশিত পদ —শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত ... ৬৬৭
চিত্রে ভাব-সৌন্দর্য্য —শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ... ৭৩২
জন্মগত (গল্প) —শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় ... ১৯৭
জাগৃহি (কবিতা) —শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ২০২
তর্পণ (কবিতা) —শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ ... ৩৪৭
তিন অঙ্ক —শ্রীসুকুমার দে সরকার ... ১১৩
তিরিশে (কবিতা) —শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য ... ২১৯
তুমি এস মোর মাঝে (কবিতা) —আবদুল গফফার চৌধুরী ১০৮
তোমার অস্তিত্ব মাঝে (কবিতা) —শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ... ৭২৮
দাতা —শ্রীমতী মায়া গুপ্তা ... ২৪৭

দারা ও সুজার শেষজীবন —অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু ... ৪৭১, ৫৯৬
দিৎসা (কবিতা) —শ্রীরসময় দাশ ... ২৪৭
দুই দিক —শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য ... ৭২৩
দুর্গোৎসব-প্রতিমায় ত্রিশক্তি —শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩১২
দেশের কথা —শ্রীসুশীলকুমার বসু ১২২, ২৬০, ৩৭৭, ৫৫০, ৬৯৩, ৮০১
দোকানী (চিত্র) —শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস ... ৫০৬
ধরণীর ধূলি —শ্রীসুশীলকুমার দেব ... ৫৮
ধূলির শিশু (কবিতা) —শ্রীমতী রাজকুমারী অর্চ্চনা ঘোষ ... ৮৩৪
ধ্বনি (কবিতা) —শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ... ৪৯১
নব জাগরণ —শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৭৩০
নন্দলাল বসু —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ২৮১
নবযুগের সাধনা —কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় ... ৭৬৬
নব্য জড়বিজ্ঞান —অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় ... ৭৩৫
নাটকের ক্ষেত্র —অধ্যাপক শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ ... ২৫
নানা কথা ... ১৩১, ২৭০, ৪১৬, ৫৫৯, ৭০২, ৮৪৩
নারীর মন (গল্প) —শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত ... ৪৭৫
নারী হরণ —শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দেব ... ৪০৩
নূতন (কবিতা) —সুফী মোতাহার হোসেন ... ৬৭
পথিক —এম, এ, ওয়াহিদ ... ২৪৬
পরম পবিহাস (কবিতা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ৩২৬
পিশাচী —শ্রীআশীষ গুপ্ত ... ৩৪২
পুস্তক পরিচয় ... ১১৯, ৪১২, ৫২৯, ৮৪০
প্রজ্ঞাশ্রী —শ্রীসুশীলকুমার দেব ... ৮১১
প্রতিক্রিয়া —শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৫৫
প্রতিভার উন্মেষ —কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় ... ৮৬
প্রাচ্যের পরিচয় —অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ১৯
প্রেম ও প্রতিমা (কবিতা)—শ্রীরমেশচন্দ্র দাস ... ১২৯

ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যার্থনা সমিতি সভাপতির অভিভাষণ — হুমায়ুন কবির
বসন্ত (কবিতা) —শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী
বর্ষা রাত্রি (কবিতা) —শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপা
বাতাবীর চারা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাবেক (কবিতা) —শ্রীকর্ম্মযোগী রায়
(The) Bird of Fire —Sri Aurobindo ...
বাংলা সাহিত্যে এক শত ভালো বই —শ্রীরমেশচন্দ্র দাস
বাংলা ভাষার বানান ও মুদ্রণ —শ্রীসুধীর মিত্র
বাঁশীদারের বেহালা —শ্রীবিনায়ক সান্যাল
বিকাশ (কবিতা) —শ্রীসৌরিন্দ্রমোহন দে
বিচার (গল্প) —শ্রীমতী হেমবালা বসু
বিতর্কিকা
আমাদের জাতীয় পোষাক —শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক ...
আমাদের স্কুলে সংস্কৃতের অবশ্য শিক্ষণীয়তা —শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেন গু
আপনি, তুমি ও তুই —শ্রীসুকুমার ঘোষ ...
তুই, তুমি, আপনি —শ্রীসুরতচ[illegible]
ঐ —শ্রীরবীন্দ্রনা[illegible]
ঐ —শ্রীসুধীরকু[illegible]
ঐ —শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ...
"তুই, তুমি ও আপনি" সম্পর্কে —শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ ...
নয় মাত্রার ছন্দ —শ্রীবিভাস নাগ ...
নামের পদবী —শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায় ...
ঐ —শ্রীনীহার রুদ্র ...
ঐ —শ্রীস্বরূপ গুপ্ত ...
ঐ —শ্রীবিনয়কুমার মিত্র
ঐ —শ্রীবিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ

...বী	—শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৩০
ঐ	—শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ...	৮৩০
...ষায় দ্বিরুক্তি প্রয়োগ	—শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল ...	৩৬৫
...—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা, না বাংলা ?	—শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৮২৫
...লীর জাতীয় পোষাক	—শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৬
ঐ	—শ্রীফকির আহম্মদ ...	২৫৬
ঐ	—শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ...	২৫৯
ঐ	—শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৬৯
ঐ	—শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	৩৭১
ঐ	—শ্রীমোহাম্মদ আবদুল হামিদ	৫৩৯
ঐ	—শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ সেন ...	৫৪০
ঐ	—শ্রীসুশীলকুমার দেব ...	৬৮০
ঐ	—শ্রীনীহার রুদ্র ...	৮৩২
...লীর শিরস্ত্রাণ	—শ্রীঅমিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়	৮৩১
...লী মেয়েদের শালীনতা বোধ	—শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক ...	৬৭৬
ঐ	—শ্রীমতী লতিকা সেন ...	৮২৫
...য়েদের শালীনতা বোধ	—শ্রীসলিলকুমার হাজরা ...	৮২৬
...য়েদের শিক্ষা	—শ্রীমতী সরলা দেবী ...	৬৭৯
...-বাণী	—কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	২১৩
...ম)	—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩, ১৪৪, ৪৩১
...হে	—শ্রীকালিপদ সিংহ ...	৩৫৭
...ঙ্গ-বহ্নি	—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...	৭০৮
...নজামিন ফ্রাঙ্কলিন	—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০২
...র্থ (কবিতা)	—"জোনাকী" ...	২৪
...্য ক্ষত্রিয়	—শ্রীভুবনেশচন্দ্র বসু ...	৬৪০
...দেব (কবিতা)	—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	৭১৯
...মিকম্প	—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র	২৮৫
...ম্পে উত্তর বিহার	—শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার সেনগুপ্ত	৩৮৭,৫১১

মহামানব রবীন্দ্রনাথের প্রতি (কবিতা)	—শ্রীসুখরঞ্জন রায় ...	৫০৪
মহাসাগরের গান	—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেন ...	৭৯২
মাঝি (কবিতা)	—শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা ...	৬৯০
মানবের শত্রু নারী	—শ্রীসুবোধ বসু	৯৯,২২৫,৩১৭
মালতী দি	—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় ...	৩০৮
মিষ্টিক	—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ ...	৪৯৫
মুক্ত-ছন্দ	—শ্রীঅনিলবরণ রায় ...	৭২৯
মুক্ত-ধারা	—শ্রীঅবনীনাথ রায় ...	৫৭৪
মুক্তি (কবিতা)	—শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়	৫৩
মুক্তির ডাক	—কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	৬৬৯
মৃত্যু (কবিতা)	—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	১৫২
যজ্ঞ-ভঙ্গ (কবিতা)	—শ্রীমতী নীলিমা দাস	১৭
যৎকিঞ্চিৎ	—ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	৬২৩
যাত্রী	—শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	২৪৮
যৌবন (কবিতা)	—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২১৯
যৌবন ও অপরাধ	—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৫৪
রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন (কবিতা)	—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ...	৫৮১
রবীন্দ্রনাথের সুর	—শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা ...	৬৩৪
রবীন্দ্রাষ্টক	—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ...	৬২২
রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয়	—শ্রীগদাধর সিংহ রায় ...	৬৫১
রাত জেগে পড়ি রবি ঠাকুরের গীতবিতান (কবিতা)	—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য ...	২০৩
রূপদীনা বসুমতী (কবিতা)	—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	১৫২
রূপবতী আজো কাঁদে (কবিতা)	—শ্রীমনোজ বসু ...	১৮৫
রেখা	—এম, এ, ওয়াহিদ ...	৪১১
লতা ভাসে সকল আঁখি নীরে (কবিতা)	—শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ ...	৪৮১
লিসেল (গল্প)	—ডক্টর কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়	[illegible]

শিল্প ও জীবন —শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ... ৪৫৩
শীতের রাতে (কবিতা)—শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় ... ২৯৬
শ্যাম ও কুল (গল্প) —শ্রীসত্যেন্দ্র দাস ... ৪৮২
শ্রেভালিয়ে দ্যুদ্রেনেক —শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৩, ২৯৭
শ্রীকান্তের অভয়া (কবিতা) —শ্রীসন্তোষকুমার বসু ... ২৪৭
শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষের কৃতিত্ব —শ্রীশান্তি পাল ২৩২, ৩৫৮, ৮২০
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য — শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় ... ৫৭৭
সত্য মিথ্যা (কবিতা) —শ্রীবিভু কীর্ত্তি ... ৪০৮
সন্দেহ (কবিতা) —শ্রীধীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ১৮৪
সব প্রেম প্রেম নয় —শ্রীমতী ইলা দেবী ... ৩২৮
সমর্পণ —আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী ... ১০৮
সমাজে নারীর স্থান ও বর্ত্তমান নারী প্রগতি —শ্রীসুকুমার মিত্র ... ৭১
সাগর দোলায় ঢেউ (উপন্যাস) —শ্রীনবগোপাল দাস ৪৩৯, ৫৮২, ৭৪৪
সাত তাল (কবিতা) —অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ... ১২
সাঁতার —শ্রীশান্তি পাল ... ১০৯
সাহিত্য সভার কি কাজ—শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ... ১৪
সাহিত্য-সম্মিলনের রূপ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১৩৯
সিনেমার দেবগণ —শ্রীভোম্বল দাস ... ২৪১
সুপ্তি ও জাগরণ (কবিতা) —শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ২৫২
সুর ও স্বরলিপি —শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত ... ২৫৩
সূর্পণখা — শ্রীসুনির্ম্মল বসু ... ৬০৬
স্ত্রী-রত্নং —শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু ... ৭৬০
স্পর্শমণি (কবিতা) —শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ... ৪৫৭
"স্বপনে হেরিনু করাল ঝঞ্ঝা গ্রাসিছে সোনার চরে" —শ্রীরামেন্দু দত্ত ... ৪৯৭
স্বপ্নময়ী (কবিতা) —শ্রীরসময় দাশ ... ৭৮
স্বর্ণাঙ্কুর —শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় ৭৭৭
স্বপ্নাদেশ —শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা
স্বর্গীয় অনু ঘোষ ও তাঁহার আবিষ্কার —শ্রীরমেশ বসু
স্বরলিপি :—
আজি আমারই কথা ওগো বিমনা সাঁঝে —শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত ...
আমার আঁধার ভালো —শ্রীমতী সাহানা দেবী ...
আরো কিছুক্ষণ না হয় বসিয়ো পাশে —শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ...
ঘুচাও, ঘুচাও তব ঘন আবরণ —শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু ...
জাগিয়ে গোপাল লাল পষ্টীবন বোলে —শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পায়ো জী মৈনে রাম রতন ধন পায়ো —শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...
যদি দক্ষিণা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে —শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত ...

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণ পৃষ্ঠ)

কালো ছেলে —শ্রীতরুবালা গুপ্তা ... ৮
কালের যাত্রা —শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬
কৌতূহল (রঙিন) —শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫
কুটিরপুঞ্জ—মজঃফরপুর (রঙিন) —শ্রীযতীশচন্দ্র সিংহ ...
তথাগত —শ্রীমতী শান্তি ঘোষাল ... ৫০
দীর্ঘ পথের যাত্রী (রঙিন) —শ্রীচিন্তামণি কর ...
পাকশালা (রঙিন) —শ্রীঅজিতকৃষ্ণ গুপ্ত ... ৪
প্রতীক্ষা (রঙিন) —শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ৭
বসন্তের আগমনী —শ্রীমজ্ঞেশ্বর সাহা ...
মেঘলা দিনে (রঙিন) —শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২
সন্ধ্যা-বন্দনা —শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর ... ৭
সারে হিল্‌স্ (Surrey Hills) (রঙিন) —Capt. F. C. W. Fosbery

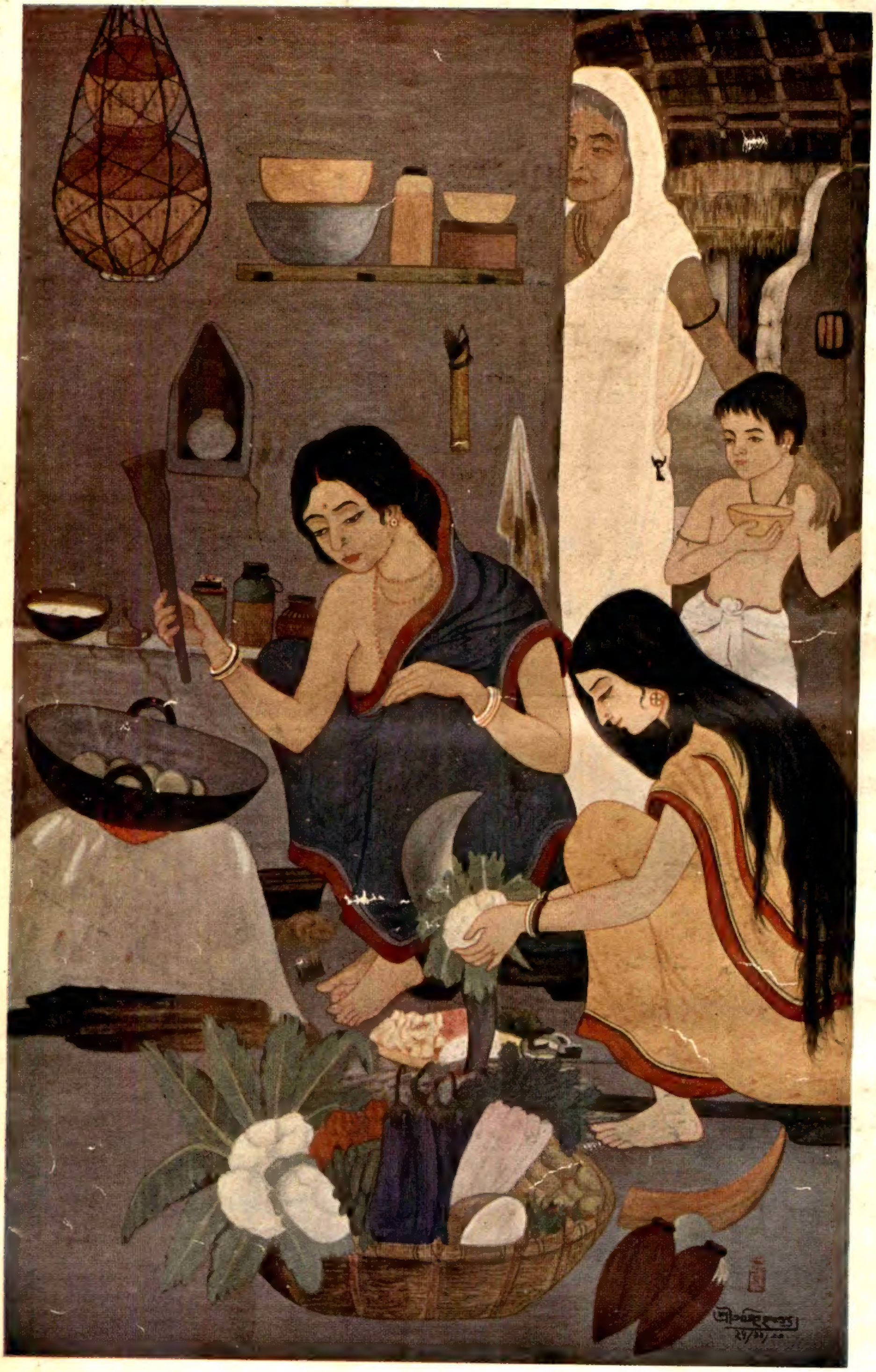

পাকশালা

শিল্পী—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

বিচিত্রা

সপ্তম বর্ষ, ২য় খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৪১ | ৪র্থ সংখ্যা

একাকী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এলো সন্ধ্যা তিমির বিস্তারি' ;
দেবদারু সারি সারি
দোলে ক্ষণে ক্ষণে
ফাল্গুনের ক্ষুব্ধ সমীরণে।
স্তব্ধতার বক্ষোমাঝে পল্লবমর্ম্মর
জাগায় অস্ফুট মন্ত্রস্বর।
মনে হয় অনাদি সৃষ্টির পরপারে
আপনি কে আপনারে
শুধাইছে ভাষাহীন প্রশ্ন নিরন্তর ;
অসংখ্য নক্ষত্র নিরুত্তর।
অসীমের অদৃশ্য গুহায় কোন্‌খানে
নিরুদ্দেশ পানে
লক্ষ্যহীন কালস্রোত চলে ;
আমি মগ্ন হয়ে আছি সুগভীর নৈঃশব্দ্যের তলে ॥

ভাবি মনে মনে,
এতদিন সঙ্গ যারা দিয়েছিল আমার জীবনে
নিল তারা কতটুকু স্থান ?
আমার গভীরতম প্রাণ ;

আমার সুদূরতম আশা আকাঙ্ক্ষার
গোপন ধ্যানের অধিকার ;

ব্যর্থ ও সার্থক কামনায়
আলোয় ছায়ায়
রচিলাম যে স্বপ্ন ভুবন ;

যে আমার লীলা-নিকেতন
একপ্রান্ত ব্যাপ্ত যার অসমাপ্ত অরূপ সাধনে,
অন্যপ্রান্ত কর্ম্মের বাঁধনে ;

যে অভাবনীয়,
অলক্ষিত উৎস হ'তে যে অমিয়
জীবনের ভোজে
চেতনারে ভরেছে সহজে ;

যে ভালোবাসার ব্যথা রহি রহি
আনিয়া দিয়েছে বহি
শ্রুত বা অশ্রুত সুর উৎকণ্ঠিত চিতে
গীতে বা অগীতে ;

কতটুকু তাহাদের জানা আছে
এলো যারা কাছে ;

ব্যক্ত অব্যক্তের সৃষ্টি এ মোর সংসারে
আসে যায় একধারে,
বিরহ দিগন্তে পায় লয়,
নিয়ে যায় লেশমাত্র পরিচয়।

আপনার মাঝে এই বহুব্যাপী অজানারে ঢাকি'
স্তব্ধ আমি রয়েছি একাকী ॥

যেন ছায়া-ঘন বট
জুড়ে আছে জনশূন্য নদীতট,
কোণে কোণে, প্রশাখার কোলে কোলে,
পাখী কভু বাসা বাঁধে, বাসা ফেলে কভু যায় চোলে।
সম্মুখে স্রোতের ধারা আসে আর যায়
জোয়ার ভাঁটায়;
অসংখ্য শাখার জালে, নিবিড় পল্লবপুঞ্জ মাঝে
রাত্রিদিন অকারণে অন্তহীন প্রতীক্ষা বিরাজে॥

২ এপ্রেল ১৯৩৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৬

পরদিনের কথা।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। সকাল থেকে মাঝে মাঝে লঘু মেঘের হাল্কা বর্ষণ হয়ে গেছে,—অপরাহ্নের দিকে আকাশ নির্ম্মল, বায়ুতে মৃদু শৈত্যের স্পর্শ। আমিনা গফুরের অনুমতি নিয়ে সন্ধ্যাকে তার কারাকক্ষ থেকে বার ক'রে বাড়ির পিছন দিকে একটা ঝোপের আড়ালে এনে বসেছে। তিরোবিয়ায় এসে পর্য্যন্ত সন্ধ্যার এই প্রথম মুক্ত বায়ু সেবন করবার জন্ম বাইরে এসে বসা। গফুর বারম্বার আমিনাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছে যে সন্ধ্যা যেন কোনো গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে না পড়ে,—আর একান্তই যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে ত' তার দূরসম্পর্কীয়া ননদ ব'লে যেন পরিচয় দেয়—দুদিনের জন্ম তিরোবিয়ায় বেড়াতে এসেছে।

সন্ধ্যাকে লক্ষ্য ক'রে গফুর বলেছিল, "আমি তোমাকে ভাল মেয়ে ব'লেই জানি হামিদা, কিন্তু তবু তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে, হঠাৎ যদি কোনো লোকজনের সামনে পড় ত' চেঁচামেচি ক'রে ছেলেমানুষী কোরো না। তা'তে কোনো ফল হবে না, লাভের মধ্যে আমি তোমাকে মহবুবের হাতে একেবারে ছেড়ে দোবো—তারপর সে তোমাকে বনের মধ্যেই নিয়ে যাক্ বা আর কোথাও লুকিয়েই রাখুক। চেঁচামেচি ক'রলে ফল হবে না কেন বলছি জানো? আমাদের এ গাঁয়ে যে কয়েকজন লোক বাস করে সব এক বাড়ির মতো,—সকলেরই এক পেশা, এক পরামর্শ। কেউ কারোর শত্রুতা করবে, সে উপায় নেই।"

অন্যদিকে দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা মৃদুস্বরে উত্তর দিয়েছিল, "আমি ত' বাইরে যেতে চাচ্ছিনে।"

"চাচ্ছনা, কিন্তু যাচ্চ ত? সেই জন্যে হুঁসিয়ার ক'রে দিলাম।"

উত্তরে আমিনা ব'লেছিল, "তুমি মিছে ভয় করছ ভাইজান, হামিদা ভারি ভাল মেয়ে।"

গফুর হেসে উত্তর দিয়েছিল, "আমিই কি হামিদাকে দুষ্টু বলছি। বাঘের মুখ থেকে হঠাৎ ছাড়ান পেলে হরিণ ভড়বড়িয়ে পালিয়েই থাকে,—তাই ব'লে কি তাকে দুষ্টু বলবি আমিনা। আচ্ছা তোরা যা, একটু ফাঁকে গিয়ে বোস,—আমি এখানে আছি, কোনো ভয় নেই।"

দূরে তালবনের পাশে ঘন নীলবর্ণের গিরিশ্রেণী দেখা যাচ্ছিল,—সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সহসা সন্ধ্যার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে এল। তারপর ধীরে ধীরে টপ্ টপ্ ক'রে দু-চার ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে মাটিতে পড়ল।

ব্যস্ত হয়ে আমিনা বললে, "তুমি কাঁদচো হামিদা? কাঁদচো কেন তুমি?"

তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে সন্ধ্যা বললে, "কেন তুমি আমাকে অমন ক'রে কাল বাঁচালে আমিনা? কাল যদি আমাকে না বাঁচাতে তা হ'লে আজ ত' এতক্ষণে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম।"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে আমিনা বললে, "নিশ্চিন্তই যে হ'তে তা কি ক'রে বলছ হামিদা? তোমাদের হিন্দুদের শাস্তরে বলে আত্মহত্যা মহাপাপ। পাপীরা মারা গেলে কোথায় যায় তা জানো ত?"

"জানি, নরকে। কিন্তু সে কি এর চেয়েও খারাপ?"

"কিন্তু এখানেই যে চিরকাল তুমি থাকবে- তা কেমন ক'রে জানলে?"

সন্ধ্যা আমিনার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সজোরে তার দু-হাত চেপে ধরলে,—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "এখান থেকে আমি উদ্ধার হব আমিনা? বল, বল, সত্যি ক'রে বল,—হবো?"

"খোদাতালার মর্জ্জি হ'লে হ'তে পারো।"

এবার দুই হাত দিয়ে সন্ধ্যা আমিনার দেহ জড়িয়ে ধরলে,—বললে, "কে আমাকে উদ্ধার করবে ভাই? তুমি?"

সন্ধ্যার আকুলতা দেখে আমিনার চক্ষু সজল হ'য়ে উঠল, মুখে কিন্তু মৃদু হাসিও দেখা দিলে,—বললে, "আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমি তোমাকে কি ক'রে উদ্ধার করবো হামিদা?"

প্রবল ভাবে মাথা নাড়া দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "না আমিনা, তুমি সামান্য মেয়েমানুষ নও—একমাত্র তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পার। তোমার দাদারা ত' দস্যু,—জানোয়ারের মতো;—তাদের কাছ থেকে কখনো দয়া প্রত্যাশা করতে পারি নে।"

কপট কোপ প্রকাশ ক'রে আমিনা বললে, "বেশ মেয়ে ত' তুমি?—আমার দাদাদের দস্যু জানোয়ার ব'লে গালি দেবে আর আমার কাছ থেকে দয়া প্রত্যাশা করবে?" তারপর সহসা কণ্ঠস্বর কোমল ক'রে নিয়ে বললে, "মহবুবের কথা তুমি যাই বলতে চাও বল, কিন্তু গফুর ত' একেবারে নির্দ্দয় নয় হামিদা?"

তা যে নয়, সে কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। নিমেষের মধ্যে গত মাস খানেকের ঘটনাবলী মনে মনে ভেবে নিয়ে সন্ধ্যা দেখলে গফুর তার প্রতি মাঝে মাঝে সদয় ব্যবহারও করেছে। মহবুবের উৎপীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করবার অভিপ্রায়ে মহবুবের সঙ্গে সে বচসা করেছে, অনশন-জনিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে বলপ্রয়োগ না ক'রে সুমিষ্ট বচনেই তাকে আহার করাতে চেষ্টা করেছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত আমিনার নির্ব্বন্ধে সে যে আহার করতে বাধ্য হয়েছিল তার মূলে যে তারই পোষকতা বর্ত্তমান ছিল সে কথা জানতেও সন্ধ্যার বাকি নেই। মাঝে মাঝে গফুর প্রয়োজনের অনুরোধে বজ্রনাদ করেছে বটে, কিন্তু তাই ব'লে বজ্রপাত করেনি।

অনুতপ্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "আমাকে মাপ করো আমিনা, গফুরের বিষয়ে আমার ও কথা বলা অন্যায় হয়েচে।" তারপর হঠাৎ মনের মধ্যে একটা কথা উদয় হ'তে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা আমিনা, কখনো যদি তেমন দরকার হয়ত গফুরকে আমার কি ব'লে ডাকা উচিত?"

একটু ভেবে আমিনা বললে, "গফুর ব'লেই ডাকতে পারো; আর, বয়সের জন্যে কিম্বা অন্য কোনো কারণে বুড়ো মানুষকে যদি একটু খাতির করতে ইচ্ছে হয় তা হ'লে গফুর মিঞা ব'লে ডেকো।"

"গফুর মিঞা? মিঞা মানে কি?"

"তোমাদের যেমন বাবু, আমাদের তেমনি মিঞা।"

"মিঞা কথাটা সন্ধ্যার একেবারে অপরিচিত না হ'লেও তার যথার্থ প্রয়োগ সে জানত না। আমিনার মুখ থেকে শোনবার পর বার পাঁচ-সাত মনে মনে আবৃত্তি ক'রে রাখলে।

আমিনা বললে, "হামিদা, আমার একটি অনুরোধ রাখবে ভাই?"

"কি বল?"

"তোমার নাম আমাকে বলবে?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, বললে, "কি হবে ভাই আমার নাম জেনে? সে মানুষও আমি এখন নই, সে নামেও আর দরকার নেই। এখন আমার হামিদা নামই ভাল।"

"কিন্তু হামিদা ত আর তোমার আসল নাম নয়—জোর ক'রে দেওয়া নাম। তোমার আসল নাম তুমি আর কাউকে না বলতে চাও—শুধু আমাকে বল। আমি শপথ ক'রে বলছি, কাউকে আমি তোমার সে নাম বলব না। কাল থেকে যতবারই তোমাকে হামিদা ব'লে ডাকছি মনে ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছি নে।"

"তৃপ্তি পাচ্ছনা? কেন, আমি ত' হামিদা ব'লে ডাকলে সাড়া দিচ্ছি?"

স্মিতমুখে আমিনা বললে, "তা দেবে না কেন এই ধর, আমার নাম ত' আমিনা, কিন্তু আমার আসল না[illegible] জানতে না পেরে তুমি যদি আমাকে যশোদা ব'লে ডাক্-

তা হ'লে আমিও হয়ত সাড়া দিতুম, কিন্তু তাই ব'লে আমাকে যশোদা ব'লে ডেকে তুমি কি পুরোপুরি তৃপ্তি পেতে? তা'ছাড়া হামিদা, তোমার আসল নাম বলতে ভয়ের ত' কোনো কারণ নেই। আমরা ত' আর তোমার নাম টের পেলে পুলিশে গিয়ে লিখিয়ে দিয়ে আসছিনে। বরং সে ভয় আমাদেরই আছে যে তুমি কোনোদিন ছাড়া পেলে আমাদের নাম পুলিশে লিখিয়ে দিতেও পারো। অথচ আমরা ত' তোমার কাছে আমাদের আসল নাম লুকোচ্ছি নে।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ পুনরায় আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। ম্লান হাসি হেসে সে বল্‌লে, "ভয়-টয় কিছু নয় আমিনা, তোমাকে এখনি বল্‌লাম ত' ভাই, মনে হয়, যখন আগেকার জীবনে আর আমার অধিকার নেই, তখন আগেকার নামেও নেই।' তোমাদের এই জেলখানায় আমাকে সে নামে তুমি নাই ডাক্‌লে ভাই!" কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যার দুই চক্ষু থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে পুনরায় কয়েক ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ল।

সন্ধ্যার পিঠের উপর সযত্নে একটি হাত রেখে আমিনা বল্‌লে, "কষ্ট যদি হয়, থাক্‌ ব'লে কাজ নেই।"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে সন্ধ্যা বল্‌লে, "বলছি। আমার নাম সন্ধ্যা।"

আমিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; সহাস্য মুখে বল্‌লে, "সন্ধ্যা? চমৎকার নাম ত'! ও মা, যেমন স্বভাব, তেম্‌নি নাম!"

আমিনাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা নয় ভাই, যেমন অদৃষ্ট তেম্‌নি নাম।"

এ কথাও সত্য। আমিনার দুই চক্ষু সজল হয়ে এল, কণ্ঠ এল রুদ্ধ হয়ে। সেও দুই হাতে সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধ'রে নীরবে ব'সে রইল। দূরে গিরিমালা এবং তালবন ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় ধূসর হ'য়ে আসছিল; একদল গো-মহিষ মন্থর গ্রাম থেকে এ অঞ্চলে চরতে এসেছিল, গলায় বাঁধা ঘণ্টায় সন্ধ্যার আগমনী বাজিয়ে তারা ফিরে চলেছিল গ্রামাভিমুখে, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলেছিল দুটি ভীল বালক যদি সুরের বাঁশি বাজিয়ে। বহুক্ষণ কেটে গেল,—বেদনা-সমবেদনার যুক্ত ক্রিয়ায় সম্মিলিত দুইটি নারী ভাষা হারিয়ে পরস্পর বাহুবদ্ধ হ'য়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

মৌন ভঙ্গ করলে সন্ধ্যা। আমিনার বাহুবন্ধন থেকে সহসা নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তার মুখের উপর অবিচল দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "আমিনা, একটা কথার সত্যি উত্তর দেবে?"

"দেবো,—কি কথা বল?"

"তুমি আমাকে ভালবেসেছ,—না?"

সন্ধ্যার কথা শুনে আমিনা যেন ধপ্‌ ক'রে আকাশ থেকে পড়ল;—সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লে, "শোন কথা! দেখা ত মোটে কাল থেকে, এর মধ্যে আবার ভাল বাস্‌লাম কখন্‌?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল,—অধীর কণ্ঠে বল্‌লে, "বাস নি? সত্যি বলছ, বাস নি?"

"রোসো, একটু ভেবে দেখি।" ব'লে ক্ষণকাল মনে মনে কি যেন তলিয়ে দেখে আমিনা বল্‌লে, "তোমার দুরবস্থা দেখে মনের মধ্যে একটু দয়া হয়েচে বটে,—কিন্তু ভালবাসা?—কই, না!"

সন্ধ্যার চোখ মুখ কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। সবলে মাথা নেড়ে সে বল্‌লে, "দয়া নয়, দয়া নয়! সে যদি হ'য়ে থাকে ত' তোমাদের ঐ গফুর মিঞার হয়েচে!" তারপর সহসা আমিনার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার বক্ষের মধ্যে মুখ ঘসতে ঘসতে বল্‌লে, "আমাকে শুধু দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবে না আমিনা, কখনই পারবে না; ভালবেসে হয় ত পারবে!"

আমিনা দুহাতে সন্ধ্যার মুখ তুলে ধ'রে বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হ'লে না হয় ভালবাসাই যাবে। এখন চল, তোমাকে ঘরে পুরে তালা দিই,—মহবুব কখন্‌ এসে পড়ে কিছু বলা যায় না ত!" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "বেসেছি সন্ধ্যা! খোদা-কসম তোমাকে ভাল বেসেছি!"

রাত্রে যখন মহবুব কাজ থেকে ফিরল তখন নটা বেজে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে সে এসে দেখলে আমিনা তার

জন্ম আহার্য্য সাজিয়ে ব'সে রয়েছে। টপ্ ক'রে খাবারের সামনে ব'সে প'ড়ে বল্লে, "এ-সব খাবার তুই রেঁধেছিস না-কি রে আমিনা?"

আমিনা বল্লে, "আমি দু'দিনের জন্যে এসে তোমাদের ব্যবস্থায় গোল বাধাব কেন? রহিমের মা খাবার দিয়ে গেছে—আমি শুধু বেড়ে দিয়েছি।"

আর বাক্যব্যয় না ক'রে মহবুব আহারে নিবিষ্ট হ'ল। প্রথমে সে ক্ষুধার্ত্ত পশুর মতো এক রাশ খাদ্য উদরসাৎ করলে, তারপর জঠরাগ্নি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লে আমিনার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন হালচাল আমিনা?"

"কিসের হালচাল?"

মহবুবের কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে উঠ্‌ল,—"কিসের আবার? হামিদার।"

সহজভাবে আমিনা বল্লে, "হামিদার আবার হালচাল কি?—যেমন আমরা রেখেছি তেমনই আছে। খাওয়া-দাওয়া করেছে—।"

"সে কথা জিজ্ঞেস করছিনে,—পোষ-টোষ মান্‌লে কি-না তাই জিজ্ঞেস করছি।"

আমিনার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিলে,—বল্লে, "তোমার বয়স হ'ল কিন্তু বুদ্ধি হলো না মহবুব ভাই, কি যে বলো তার ঠিক নেই।"

মহবুব গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—"চুপ কর্, চুপ কর্। ভারি ফাজিল হয়েছিস্! ছেলেবেলায় শ্বশুরের কাছে ছাই পাঁস কি দুখানা বই প'ড়েছিলি, তাই তোর বুদ্ধির শেষ নেই—আর আমরা সব মুখ্‌খু!"

আমিনা পূর্ব্বের মতই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, "মুখ্‌খু ত নও, কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো কথা বলনা কেন? আচ্ছা, একটা জঙ্গলের জানোয়ারকে পোষ মানাতে কত দিন লেগে যায়, আর একটা মেয়েমানুষ একদিনে পোষ মান্‌বে?"

মহবুব তর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল, "তা ব'লে পাঁচ দিনের বেশী আমি সবুর মানবো না তা ব'লে রাখ্‌ছি। তার মধ্যে তোর চিড়িয়া পোষ মান্‌লে ত ভাল, নইলে তার আমি সুরুয়া ক'রে তবে ছাড়বো।"

আমিনা হাসিমুখে বল্লে, "একবার ত' সুরুয়া করতে গিয়েছিলে,—পেরেছিলে কি? ওই ত' তোমাকে কাবাব ক'রে ছেড়েছিল। আমি যদি হঠাৎ না আস্‌তাম, এতদিন পুলিশের হাতে পড়তে।" তারপর সহসা মুখ গম্ভীর ক'রে গাঢ় স্বরে বল্লে, 'না, না, ভাইজান, ছেলেমানুষি কোরোনা। তুমি হামিদাকে চেনোনা—ও একেবারে কেউটে সাপের জাত—সব ভাল মেয়েই তাই—ওকে ভয় দেখিয়ে তুমি বশে আন্‌তে পারবে না। তুমি ওকে যদি সাদি করতে চাও,—বেশ ত ওকে খুসি করো, রাজি করো, আমার কোন ওজোর নেই। কিন্তু জুলুম ক'রে তুমি ওকে পাবে না।"

মনে মনে আমিনার মুণ্ডপাত ক'রে মহবুব ব্যক্তি আহারটা শেষ করলে। তারপর অজনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্লে, "গফুরকে দেখ্‌ছিনে যে? গফুর কোথায় গেল?"

"তার তবিয়ৎ ভাল নেই, ঘরের ভিতর শুয়েচে।"

"হামিদার ঘরের চাবি কার কাছে?"

"আমার কাছে।"

বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়ে মহবুব বল্লে, "কই, দে আমাকে।"

আমিনা ঈষৎ দৃঢ় স্বরে বল্লে, "চাবি নিয়ে এখন তুমি কি করবে?"

মহবুব উষ্ণ হয়ে উঠ্‌ল; বল্লে, "সে কৈফিয়ৎও তোকে দিতে হবে না-কি?"

"কৈফিয়ৎ আবার কি? এম্‌নি জিজ্ঞেস করছি।"

"হামিদাকে রাজি করব।"

সজোরে মাথা নেড়ে আমিনা বল্লে, "কখ্‌খনো না। তুমি হামিদাকে রাজি করবে, আর আমি সমস্ত রাত সেখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবো, তা কিছুতে পারব না। দেখ, ভাইজান, সমস্ত দিন খেটেখুটে এলে এখন সারা রাত আজনে শুয়ে ঘুমোও গে। শরীরটাকে বজায় রাখ্‌তে হবে ত? কাল সমস্ত রাত হামিদাকে নিয়ে কেটেছে, আমার নিজের শরীরও ভাল নেই—আমি আজ সমস্ত রাত ঘুমোতে চাই।"

"তুই ঘুমোগে, মরগে, যা ইচ্ছে হয় করগে। কিন্তু পাহারা দিবি কেন শুনি?"

সহাস্যমুখে আমিনা বল্‌লে, "শোন কথা। বাঘ যাবে হরিণকে রাজি করতে আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবো?—পাহারা দোবো না?"

মহবুব তার ডান পা'টা সজোরে মাটিতে ঠুকে একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল। বললে, "খালি-পেটে বাড়ী ফিরেচি ব'লে তোর ভারি সাহস হয়েচে দেখ্‌চি! চল্‌লুম খেয়ে আস্‌তে। আগে তোকে খুন করে তারপর তালা ভেঙে হামিদাকে খুন করব!"

আমিনা আবার হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "বেশ ত' আমিও চললাম হামিদার ঘরের দরজার সামনে শুতে। তুমি এসে দেখ্‌বে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমি ঘুমিয়ে আছি। দেখি, কত বড় মুরোদ তোমার, কেমন তুমি আমাদের খুন কর! কেন, মহবুব ভাই, খালি পেটে বোনের উপর তোমার ছোরা চলে না না-কি?" ব'লে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

আমিনার মুখের সম্মুখে ডান হাতের বদ্ধ-মুষ্টি একবার কম্পিত ক'রে বিড়-বিড় ক'রে কি বলতে বলতে মহবুব প্রস্থান করলে, আর পর হাত মুখ ধুয়ে একটা বড় লাঠি কাঁধে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

আমিনাও তাড়াতাড়ি আহার সমাপন ক'রে সন্ধ্যার ঘরের সামনে একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। একবার ভাবলে সন্ধ্যাকে ডেকে একটু তার সাড়া নেয়, কিন্তু ঘর একেবারে নিঃশব্দ, নিশ্চয়ই সে ঘুমিয়ে পড়েচে মনে ভেবে আর তাকে বিরক্ত করলে না।

সন্ধ্যা কিন্তু তখনো ঘুমোয় নি; স্তব্ধ হয়ে ঘরের মেঝের ব'সে একটি গবাক্ষের দিকে চেয়ে ছিল। তার অন্ধকার কক্ষের সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে বহির্জগতের সামান্য একটি অংশ দেখা যাচ্ছিল—একখণ্ড আকাশ, এবং তার মধ্যে জ্যোৎস্নাকিরণে মৃদু হিল্লোলিত কয়েক গাছি তরুশির। গবাক্ষটি উচ্চে অবস্থিত, সুতরাং পাশে ব'সে বাহিরের দৃশ্য অবলোকন করবার সুবিধা ছিল না, ঘরের মঝের ব'সে যতটুকু দেখা যায় নির্নিমেষ নেত্রে সন্ধ্যা তাই দখ্‌ছিল। তার মনের ভিতরকার অবস্থাও আজ কতকটা সই ধরণের। সেখানেও আজ অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটি আলোকের রেখা নিবিড় অন্ধকার রাশির মধ্যে আশা জাগিয়ে তুলেছে। যেখানে ছিল শুধু অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্য্যাতিত মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা—যা' থেকে উদ্ধারের মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না—সেখানে আমিনা এনেছে মুক্তির কল্পনা! স্পষ্ট ক'রে সে কিছু বলেনি, কোন অঙ্গীকার করেনি, তবু মনে হয় সে তাকে উদ্ধার করবে, কেন না সে তাকে ভালবেসেছে!

জীবন-ধারার একটা অতি আকস্মিক প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনে হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, পূর্ব্ব জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনায় আজ আবার তারা ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌ল। আবার নূতন ক'রে নূতন ভাবে মনে পড়ল বাপ-মাকে, মনে পড়ল ভাই-বোনকে, মনে পড়ল শ্বশুর-শাশুড়ীকে। তারপর যাকে মনে পড়ল তার কথা মনে করতে তার অঙ্গ বিকল হয়ে এল, চক্ষে বইল অশ্রুর ধারা। তার বিরহ-পীড়িত চিত্ত বল্‌তে লাগ্‌ল—ওগো, তুমি অত অল্প সময়ের মধ্যে এত যাকে ভালবেসেছিলে তাকে হারিয়ে কি ক'রে দিনাতিপাত করছ? ঘুরে বেড়াচ্ছ কি 'সন্ধ্যা সন্ধ্যা' ক'রে বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, নদীর তীরে-তীরে? রাত্রি কাটছে কি জেগে জেগে তার কথা স্মরণ ক'রে? দিন কাটছে কি সে অভাগিনীর ব্যাকুল প্রতীক্ষায়, আকুল অন্বেষণে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে নিবিড়তরভাবে সেটা চিন্তা করবার অভিপ্রায়ে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল। চিন্তাবিলাসে সে তখন আত্মহারা! মনে হ'ল সে যেন মুক্তিলাভ ক'রে কলিকাতায় উপস্থিত হয়েচে, সমস্ত দিন কাটল বাইরে বাইরে আকুল প্রতীক্ষায়, রাত্রে প্রিয়লালের সহিত দেখা! ঘরে প্রবেশ করতেই দুটি উন্মত্ত-ব্যাকুল বাহুর মধ্যে সহসা বন্দী! উঃ অত উগ্র উল্লাসের প্রকোপ সহ্য হবে কি? দু'হাত দিয়ে সন্ধ্যা তার দ্রুত-স্পন্দিত বুকটা সজোরে টিপে ধরলে।

তারপর সহসা কোন্ একমুহূর্ত্তে অতর্কিতে নিদ্রা এসে জাগ্রৎ স্বপ্নকে টেনে নিয়ে গেল স্বপ্নেরই বাস্তব জগতে।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিপ্রদাস

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২০

দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা হঠাৎ চলে গেলেন কেন? আমার এসে পড়াটাই কি কারণ নাকি?

বিপ্রদাস বলিল, না। ওঁর বাবা টেলিগ্রাম করেছেন মাসির বাড়ীতে গিয়ে থাকতে যতদিন না বোম্বায়ে ফিরে যাওয়া ঘটে।

—কিন্তু হঠাৎ মাসি বেরুলো কোথা থেকে? বন্দনা আমার সঙ্গে ত প্রায় কথাই কইলেন না, সর্ব্বক্ষণ আড়ালে আড়ালে রইলেন, তারপর সকাল না হতে হতেই দেখচি সরে পড়লেন। একটা নমস্কার করে গেলেন সত্যি কিন্তু সে-ও মুখ ফিরিয়ে। আমার বিরুদ্ধে হলো কি তাঁর?

প্রশ্নের জবাবটা বিপ্রদাস এড়াইয়া গেল এবং মাসির ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাইয়া কহিল, আমার অসুখে ভয় পেয়ে এই মাসির বাড়ী থেকেই অন্নদি ওকে ডেকে এনেছিলেন আমার শুশ্রূষা করতে। যথেষ্ট করেচে। ওর কাছে তোদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

দ্বিজদাস কহিল, উচিত নয় বলিনে, কিন্তু আপনাকে সেবা করতে পাওয়াটাও ত একটা ভাগ্য। সে মূল্যটা যদি উনিও অনুভব করতে পেরে থাকেন ও কৃতজ্ঞতা ওঁর কাছেও আমাদের পাওনা আছে।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, তুই ভারি নরাধম।

দ্বিজদাস বলিল, নরাধম কিন্তু নির্বোধ নই। আমার কথা যাক্। কিন্তু এই সেবা করার কথাটা মায়ের কানে গেলে উনি চিরকাল আমাদের মাকেই কিনে রাখবেন। সেই কি সোজা সম্পদ?

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিল, কহিল, মাকে এতকাল পরে তুই চিনতে পেরেচিস বল্?

দ্বিজদাস বলিল, যদি পেরেও থাকি সে আপনিই জানুন। আমি মায়ের কুপুত্র, আমি কুলাঙ্গার তাঁর কাছে এই পরিচয়ই আমার থাক্। একে আর নড়িয়ে কাজ নেই দাদা।

—কিন্তু কেন? মা তোকে বিশ্বাস করতে পারেন, তোকে ভালো বলে ভাবতে পারেন একি তুই সত্যিই চাসনে? এ-অভিমানে লাভ কি বল্‌তো?

—লাভ কি জানিনে কিন্তু লোভ বিশেষ নেই। আমি আপনার পেয়েছি স্নেহ, পেয়েছি বৌদিদির ভালোবাসা, এই আমার সাতরাজার ধন, সাতজন্ম দু'হাতে বিলিয়েও শেষ করতে পারবোনা। কিন্তু

বলিয়া ফেলিয়াই তাহার চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। হৃদয়ের এই সকল আবেগ-উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে সে চিরদিন পরাঙ্মুখ,—চিরদিন নিঃস্পৃহতার আববণে ঢাকা দিয়া বেড়ানোই তাহার প্রকৃতি,—মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া বলিল, কিন্তু এ সব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেটা প্রয়োজন সে হচ্চে এই যে আমার চোখে বন্দনার চলে যাওয়ার ভাবটা দেখালো যেন রাগের মতো। এর মানেটা বলে দিন।

— মানেটা বোধ হয় এই যে তুই যখন এসে পড়েচিস তখন ওর আর দরকার নেই। এখন থেকে সেবা শুশ্রূষার ভার তোর উপর। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিতে লাগিল।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি ঠাট্টা করচেন বটে, কিন্তু আমি বলচি, এই সব ইংরিজি-নবিশ মেয়েগুলো এই দম্ভতেই একদিন মরবে। আপনাকে রোগে সেবা করবার দিন যেননা কখনো আসে, কিন্তু এলে প্রমাণ হতে দেরি হবেনা যে দাদার সেবায় দ্বিজুকে হারানো দশটা বন্দনার সাধ্যে কুলোবে না। এ কথা তাকে জানিয়ে দেবেন।

স্নেহ-হাস্যে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আচ্ছা জানাবো কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে। তবে, সে পরীক্ষার প্রয়োজন দাদার কাছে নেই,—আছে শুধু একজনের কাছে সে মা। বোঝা-পড়া তোদের একটা হওয়া দরকার,—বুঝ্‌লি রে দ্বিজু?

দ্বিজদাস বলিল, না দাদা বুঝলাম না। কিন্তু মা যখন, তখন বেঁচে থাকলে বোঝা-পড়া একদিন হবেই, কিন্তু এখুনি প্রয়োজনটা কিসের এলো এইটেই ভেবে পাচ্চিনে। এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, আমার কপালে সবই হলো উল্টো। বাবা জন্ম দিলেন কিন্তু দিয়ে গেলেন না কাণা-কড়ির সম্পত্তি—সে দিলেন আপনি। মা গর্ভে ধারণ করলেন কিন্তু পালন করলেন অন্নদা দিদি, আর সমস্ত ভার বয়ে মানুষ করে তুললেন বৌদিদি,—দুজনেই পরের ঘর থেকে এসে। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ এবং স্বর্গাদপি গরীয়সী—এই দুটো শ্লোক আউড়ে মনকে আর কত চাঙ্গা রাখবো দাদা, আপনিই বলুন?

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের মামলা নিয়ে আর ওকালতি করবোনা সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে যে-ধারণা তোর আছে সে ভুল। অর্দ্ধেক বিষয়ের সত্যিই তুই মালিক।

দ্বিজদাস বলিল, হ'তে পারে সত্যি, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে ঘরে দোর দিয়ে তাঁর উইল খানা কি আপনি পুড়িয়ে ফেলেন নি?

—কে বললে তোকে?

—এতকাল যিনি আমাকে সকল দিক দিয়ে রক্ষে করে এসেছেন এ তাঁর মুখেই শোনা।

—তা হ'তে পারে, কিন্তু তোর বৌদিদি ত সে উইল পড়ে দেখেন নি। এমন ত হতে পারে বাবা তোকেই সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন বলে রাগ করে আমি তা পুড়িয়েছি। অসম্ভব ত নয়।

শুনিয়া কৌতুকের হাসিতে দ্বিজদাস প্রথমটা খুব হাসিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আপনি যে কখনো মিথ্যে বলেন না? দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যেটা নোট করে গিয়েছিলেন বেদব্যাস, আর কলিতে আপনারটা নোট করে রাখবে দ্বিজদাস। দুই-ই হবে সমান। যাহোক এটা বোঝা গেল বিপাকে পড়লে সবই সম্ভব হয়। আর পাপ বাড়াবেন না, বলুন এখন থেকে কি আমাকে করতে হবে।

—আমাদের কারবার বিষয়-আশয় সমস্ত দেখতে হবে।

—কিন্তু কেন? কিসের জন্যে এত ভার আমি বইতে যাবো আমাকে বুঝিয়ে দিন। আপনি একা পারচেন না নাকি? অসম্ভব। আমি নিষ্কর্ম্মা অপদার্থ হয়ে যাচ্চি? না যাচ্চিনে। তবু মা জিজ্ঞেসা করলে তাঁকে জানিয়ে দেবেন পদার্থের আমার দরকার নেই অপদার্থ হয়ে আমি দিন কাটিয়ে দেবো তাঁকে ভাবতে হবে না। আপনি থাকতে টাকা কড়ি বিষয়-সম্পত্তির বোঝা আমি বইব না। শেষে কি আপনার মতো ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠবো নাকি? লোকে বলবে ওর শিরের মধ্যে দিয়ে রক্ত বয় না, বয় শুধু টাকার স্রোত। কিন্তু বলিতে বলিতেই লক্ষ্য করিল বিপ্রদাস অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছে তাহার কথায় কান নাই। এমন সচরাচর হয় না,—এ স্বভাব বিপ্রদাসের নয়, একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, দাদা, সত্যিই কি চান আমি বিষয়-কর্ম্ম দেখি, যা আমার চিরদিনের স্বপ্ন সেই স্বদেশ সেবায় জলাঞ্জলি দিই?

বিপ্রদাস তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, জলাঞ্জলি দিবি এমন কথাও তোকে কোন দিনই বলিনে দ্বিজু। যা তোর স্বপ্ন সে তোর থাক,—চিরদিন থাক,—তবু বলি সংসারের ভার তুই নে।

—কিন্তু কেন বলুন? কারণ না জানলে আমি কিছুতেই এ কথা মানবো না।

বিপ্রদাস এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, এর কারণ ত খুবই স্পষ্ট দ্বিজু। আজ আমি আছি কিন্তু এমন ত ঘটতে পারে আর আমি নেই।

দ্বিজদাস জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, না ঘটতে পারে না। আপনি নেই,—কোথাও নেই এ আমি ভাবতে পারি নে।

তাহার বিশ্বাসের প্রবলতা বিপ্রদাসকে আঘাত করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, সংসারে সবই ঘটে, রে, এমন কি অসম্ভবও। এই কথাটা ভাবতে যারা ভয় পায় তারা নিজেদের ঠকায়। আবার এমনও হতে পারে আমি ক্লান্ত, আমার ছুটির দরকার,—তবু দিবিনে তুই?

—না দাদা, পারবো না দিতে। তার চেয়ে ঢের সহজ আপনার আদেশ পালন করা। বলুন, কবে থেকে আমাকে কি করতে হবে।

—আজ থেকে এ সংসারের সব ভার নিতে হবে।

—আজ থেকেই? এতই তাড়াতাড়ি? বেশ তাই হবে। আপনার অবাধ্য হবো না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল কিন্তু শুনিতে পাইল দাদার কথা—তোকে বলতে হবে না রে, আমি জানি আমার অবাধ্য তুই নয়।

দ্বিজদাসের কাজ সুরু হইয়া গেল। সে অলস, অকর্ম্মণ্য উদাসীন এই ছিল সকলের চিরদিনে অভিযোগ কিন্তু দাদার আদেশে মায়ের ব্রত প্রতিষ্ঠার সুবৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার সং প্রকার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল যখন একাকী তাহার পরে তখন এ দুর্নাম অপ্রমাণ করিতে তাহার অধি সময় লাগিল না। এই অনভ্যস্ত গুরুভার সে যে এত স্বচ্ছন্দে বহন করিবে এতখানি আশা বিপ্রদ করে নাই কিন্তু তাহার নিরলস, সুশৃঙ্খল কর্ম্মপটুতায় সে যেন একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। যাহা কিনি পাঠাইবার তাহা গাড়ী বোঝাই করিয়া দ্বিজদাস বাড়ী পাঠাইল, যাহা লইবার তাহা সঙ্গে রাখি

আত্মীয় কুটুম্বগণকে একত্র করিয়া যথাযোগ্য সমাদরে রওনা করিয়া দিল, এখানকার সকল কার্য্য সমাধা করিয়া আজ গৃহে ফিরিবার দিন সে দাদার শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে বসিয়া বন্দনা। সেই যাবার দিন হইতে আর সে আসে নাই, তাহার কথা কাজের ভিড়ে দ্বিজদাস ভুলিয়া ছিল—আজ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে সে আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ না করিয়া শুধু একটা মামুলি নমস্কারে শিষ্টাচার সারিয়া লইয়া বলিল, দাদা আজ রাত্রির গাড়ীতে আমি বাড়ী যাচ্চি, সঙ্গে যাচ্চেন অক্ষয় বাবু তাঁর স্ত্রী ও কন্যা মৈত্রেয়ী। আপনার কলেজের ছাত্ররা বোধ করি কাল পরশু যাবে,—তাদের ভাড়া দিয়ে গেলুম। অন্নদিকে কি আপনিই সঙ্গে নিয়ে যাবেন? কিন্তু দিন তিন চারের বেশি বিলম্ব করবেন না যেন।

—আমাকে কি যেতেই হবে?

—হাঁ। না যান তো একজোড়া খড়ম কিনে দিন নিয়ে গিয়ে ভরতের মতো সিংহাসনে বসাবো।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ফাজিলের অগ্রগণ্য হয়েছিস্ তুই। কিন্তু আশ্চর্য্য করলি অক্ষয়বাবুর কথায়। তিনি যাবেন কি কোরে? তাঁর তো ছুটি নেই—কাজ কামাই হবে যে?

দ্বিজদাস বলিল, তা হবে; কিন্তু লোকসান নেই—ওদিকে তার চেয়েও ঢের বড় কাজ হবে বড় ঘরে মেয়ে দিতে পারাটা। টাকা-ওয়ালা জামাই ভবিষ্যতের অনেক ভরসা,—কলেজের বাঁধা মাইনের অনেক বেশি।

বিপ্রদাস রাগিয়া বলিল, তোর কথাগুলো যেমন রূঢ় তেমনি কর্কশ। মানুষের সম্মান রেখে কথা কইতে জানিসনে?

দ্বিজদাস বলিল, জানি কিনা বৌদিদিকে জিজ্ঞেসা করে দেখবেন। সৌজন্যের বাজে অপব্যয় করিনে শুধু এই আমার দোষ।

শুনিয়া বিপ্রদাস না হাসিয়া পারিল না, বলিল তোর একটি সাক্ষী শুধু বৌদিদি। যেমন মাতালের সাক্ষী শুঁড়ী।

দ্বিজদাস কহিল, তা হোক, কিন্তু আপনার কথাটাও ঠিক মধু-মাখা হচ্চে না দাদা। কারণ আমিও মাতাল নই, তিনিও মদের যোগান দেন না। দেন অমৃত, দেন গোপনে বহুলোকের অন্ন যা অনেক বড় লোকে পারে না।

বিপ্রদাস কহিল, তাদের পেরেও কাজ নেই। আদর দিয়ে দেওরকে জন্তু করে তোলা ছাড়া বড় লোকদের অন্য কাজ আছে।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়া হাসিতে লাগিল, দ্বিজদাস সেটা লক্ষ্য করিয়া বলিল, এ নিয়ে আর তর্ক করবো না দাদা। বউদিদি আপনার নেই,—বাঙালীর সংসারে তাঁর স্নেহ যে কি সে আপনি কোনদিন জানেন না। অন্ধকে আলো বোঝানোর চেষ্টায় ফল নেই। একটু হাসিয়া বলিল, বন্দনা আড়ালে হাসচেন, কিন্তু মাসির বাড়ীর বদলে দিন কতক আমাদের বাড়ীতে কাটিয়ে এলে হয়ত আমার কথাটা বুঝতেন। কিন্তু থাকগে এসব আলোচনা। আপনি কবে বাড়ী যাচ্ছেন বলুন?

—আমি বড় ক্লান্ত দ্বিজু, মাকে বুঝিয়ে বলতে পারবিনে?

বিপ্রদাসের এমন নির্জ্জীব নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর সে কখনো শোনে নাই, চমকিয়া চাহিয়া দেখিল ক্ষীণ হাসিটুকু তখনো ওষ্ঠপ্রান্তে লাগিয়া আছে—কিন্তু এ যেন তাহার দাদা নয় আর কেহ—বিস্ময় ও ব্যথায় অভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, অসুখ কি এখনো সারে নি দাদা?

—না, সেরে গেছে।

—তবু মায়ের কাজে বাড়ী যেতে পারলেন না এ কথা মাকে বোঝাবো কি করে? ভয় পেয়ে তিনি চলে আসবেন, তাঁর সমস্ত আয়োজন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, তুই আমাকে কবে যেতে বলিস্?

দ্বিজদাস বলিল, আজ, কাল, পরশু—যবে হোক্। আমাকে অনুমতি দিন আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, বেশ তাই হবে। আমি নিজেই যেতে পারবো, তোকে ফিরে আসতে হবে না।

দ্বিজদাস চলিয়া গেলে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি হলো মুখুয্যে মশাই, বাড়ী যেতে আপত্তি করলেন কিসের জন্যে?

বিপ্রদাস কহিল, কারণটা ত নিজের কানেই শুনলে?

—শুনলুম, কিন্তু ও-জবাব পরের জন্যে, আমার জন্যে নয়। বলুন কিসের জন্যে বাড়ী যেতে চান্‌না। আপনাকে বলতেই হবে।

—আমি ক্লান্ত।

—না।

—না কেন? ক্লান্তিতে সকলেরই দাবী আছে নেই কি শুধু আমার?

—আপনারও আছে, কিন্তু সে দাবী সত্যিকার হলে সকলের আগে বুঝতে পারতুম আমি। আর সকলের চোখকেই ঠকাতে পারবেন, পারবেন না ঠকাতে শুধু আমার চোখকে। যাবার সময় মেজদিকে চিঠি লিখে যাবো আপনার রোগ ধরবার কখনো দরকার হলে যেন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান।

—মেজদি নিজে পারবেন না রোগ ধরতে, তুমি দেবে ধ'রে।—এ কথা শুন্‌লে কিন্তু তিনি খুসী হবেন না।

বন্দনা বলিল, খুসি হবেন না সত্যি কিন্তু কৃতজ্ঞ হবেন। আমার মেজদি হ'লেন সে-যুগের মানুষ, স্বামী তাঁকে খুঁজে-বেছে নিতে হয়নি, ভগবান দিয়েছিলেন আশীর্ব্বাদের মতো অঞ্জলি পূর্ণ করে। তখন থেকে সুস্থ সবল মানুষটিকে নিয়েই তাঁর কারবার। কিন্তু সে মানুষেরও যে হঠাৎ একদিন মন ভাঙতে পারে এ খবর তিনি জানবেন কি করে?

বিপ্রদাস কথা না কহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল।

বন্দনা বলিল, আপনি হাসলেন যে বড়ো?

বিপ্রদাস বলিল, হাসি আপনি আসে বন্দনা। স্বামী খুঁজে-বেছে নেবার অভিযানে আজ পর্য্যন্ত যাদের তুমি দেখতে পেয়েছো তাদের বাইরে যে কেউ আছে এ তোমরা ভাবতে পারো না। সংসারে সাধারণ নিয়মটাই শুধু মানো, স্বীকার করতে চাও না তার ব্যতিক্রমটাকে। অথচ এই ব্যতিক্রমটার জোরেই টিকে আছে ধর্ম্ম, টিকে আছে পুণ্য, আছে কাব্য-সাহিত্য, আছে অবিচলিত শ্রদ্ধা বিশ্বাস। এ না থাকলে পৃথিবীটা যেতো একেবারে মরুভূমি হয়ে। এই সত্যটাই আজও জানো না।

বন্দনা বিদ্রূপের সুরে বলিল, এই ব্যতিক্রমটা বুঝি আপনি নিজে মুখুয্যে মশাই? কিন্তু সেদিন যে বললেন আমাকেও আপনি ভালোবাসেন?

—সে আজও বলি। কিন্তু ভালোবাসার একটিমাত্র পথই তোমাদের চোখে পড়ে আর সব থাকে বন্ধ, তাই সেদিনের কথাগুলো আমার তুমি বুঝতে পারোনি। একবার দেখে এসোগে দ্বিজু আর তার বৌদিদিকে। দৃষ্টি অন্ধ না হ'লে দেখতে পাবে কি করে শ্রদ্ধা গিয়ে মিশেছে ভালোবাসার সঙ্গে। রহস্য-কৌতুকে, আদরে-আহ্লাদে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় সে শুধু তার বৌদিদি নয়, সে তার বন্ধু সে তার মা। সেই সম্বন্ধ ত তোমার আমারও,—ঠিক তেমনি কোরেই কেন আমাকে তুমি নিতে পারলে না বন্দনা।

তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল গভীর স্নেহের সঙ্গে মিশিয়া তিরস্কারের সুর, বন্দনাকে তাহা কঠিন আঘাত করিল। কিছুক্ষণ নীরবে অধোমুখে থাকিয়া সহসা চোখ তুলিয়া বলিল, আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম মুখুয্যে মশাই। আমার মেজদিদিকে যদি আপনি সত্যই ভালোবাসতেন দুঃখ আমার ছিল না কিন্তু তা আপনি বাসেন না। আপনি পালন করেন শুধু ধর্ম্ম, মেনে চলেন শুধু কর্ত্তব্য। কঠিন আপনার প্রকৃতি,—কাউকে ভালোবাসতে জানে না। যত ঢেকেই রাখুন এ সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আজ আমার ভুলও ভাঙলো। শূন্যের মধ্যে হাত বাড়িয়ে মানুষ খুঁজতে আর না যাই, আজ আমাকে এই আশীর্ব্বাদ আপনি করুন।

বিপ্রদাস সহাস্যে হাত বাড়াইয়া বলিল,—করলুম তোমাকে সেই আশীর্ব্বাদ। আজ থেকে মানুষ খোঁজা যেন তোমার শেষ হয়, যে তোমার চিরদিনের তাকে যেন তিনিই তোমাকে দান করেন।

কথাটাকে অপমানকর পরিহাস মনে করিয়া বন্দনা রাগিয়া বলিল, আপনি ভুল করচেন মুখুয্যে মশাই, মানুষ খুঁজে বেড়ানোই আমার পেষা নয়। তারা আলাদা। কিন্তু হঠাৎ আজ কেন এসেচি এখনো সেই কথাটা আপনাকে বলা হয়নি। এদিক দিয়ে সত্যিই আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙে গেছে। এখানে আপনাদের সংস্রবে এসে ভেবেছিলুম এই সব আচার বিচার বুঝি আমি সত্যিই ভালোবাসি, খাওয়া-ছোঁয়ার নিয়ম মেনে চলা ফুল তোলা চন্দন ঘষা পূজোর সাজ-গোছ করা—আরও কত কি খুঁটি-নাটি,—মনে করতুম এ সব বুঝি সত্যিই ভালো—সত্যিই মানুষকে বুঝি পবিত্র ক'রে তোলে, কিন্তু এবার মাসিমার বাড়ীতে গিয়ে এ মূঢ়তা ঘুচেছে। দিন কয়েক কি পাগলামিই না ক'রেছিলুম মুখুয্যে মশাই! যেন সত্যিই ঐ সব বিশ্বাস করি, যেন আমাদের শিক্ষায়, সংস্কারে সত্যিই কোথাও এর থেকে প্রভেদ নেই! এই বলিয়া সে জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিয়াছিল কথাটা হয়ত বিপ্রদাসকে ভারি আঘাত করিবে কিন্তু দেখিতে পাইল একেবারেই না। তাহার ছদ্ম হাসিতে সে প্রসন্ন হাসি যোগ করিয়া বলিল, আমি জানতুম বন্দনা। তোমার কি মনে নেই আমি সতর্ক ক'রে একদিন তোমাকে বলেছিলুম এ সব তোমার জন্যে নয় বন্দনা, এসব করতে তুমি যেয়োনা। সেই মূঢ়তা ঘুচেছে জেনে আমি খুসিই হলুম। মনে করেছিলে শুনে বুঝি বড় কষ্ট পাবো কিন্তু তা নয়। যার যা স্বাভাবিক নয় তা না করলে আমি দুঃখ বোধ করিনে বন্দনা। তোমার ত মনে আছে আমি কিসের ধ্যান করি তুমি জানতে চাইলে আমি চুপ করেছিলুম। বলতে বাধা ছিল বলে নয়, অকারণ বলে। কিন্তু এ সব কথাবার্ত্তা এখন থাক। তোমার বোম্বায়ে ফিরে যাবার কি কোন দিনস্থির হলো ?

অভিমানে বন্দনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বিপ্রদাসের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলিল, না।

—সেদিন তোমার মাসির ভাই-পো অশোকের কথা বলেছিলে। বলেছিলে ছেলেটিকে তোমার ভালই লেগেছে। এ কয় দিনে তার সম্বন্ধে আর কিছু কি জানতে পারলে ?

—না।

—তোমাদের বিয়েই যদি হয় আমি আশীর্ব্বাদ করবো, কিন্তু মাসির তাড়ায় যেন কিছু করে বোসোনা। তাঁর তাগাদাকে একটু সামলে চোলো।

বন্দনার চোখে জল আসিয়া পড়িল কিন্তু মুখ নীচু করিয়া সামলাইয়া ফেলিল, বলিল, আচ্ছা।

বিপ্রদাস বলিল, আমি পরশু বাড়ী যাব। দু তিন দিনের বেশি থাকতে পারবো না। ফিরে আসার পরেও যদি কলিকাতায় থাকো একবার এসো।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়াই ছিল মাথা নাড়িয়া কি একটা জবাব দিল তাহার স্পষ্ট অর্থ বুঝা গেল না।

বিপ্রদাস কহিল, শুনলে ত আমার ছুটি মঞ্জুর হলো, এখন থেকে সব ভার দ্বিজুর। সংসারের ঘানিতে বাবা আমাকে ছেলেবেলাতেই জুড়ে দিয়েছিলেন কখনো অবকাশ পাইনি কোথাও যাবার। আজ মনে হচ্চে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচবো।

এবার বন্দনা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি নিশ্বাস ফেলার এতই দরকার হ'য়েছে মুখুয্যে মশাই ? সত্যিই কি আজ আপনি এত শ্রান্ত ?

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গেল, বলিল, ভালো কথা বন্দনা আমার অসুখে তোমার সেবার উল্লেখ করে বলছিলুম তোমার কাছে তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এর অর্দ্ধেক তারা কেউ পারতো না। সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেও তোমাকে বলতে বলেছে, যদি সে সময় কখনো আসে দাদার সেবায় তার সমকক্ষ হওয়া দশটা বন্দনারও সাধ্যে কুলোবে না।

বন্দনা বলিল, তাঁকেও বলবেন সর্ত্ত আমি স্বীকার করে নিলুম। কিন্তু পরীক্ষার দিন যদি কখনো আসে তখন যেন তাঁর দেখা মেলে।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিল, দেখা মিলবে বন্দনা, সে পিছোবার লোক নয়। তাকে তুমি জানো না।

—জানি মুখুয্যে মশাই। ভালো করেই জানি আপনার কাজে তাঁর প্রতিযোগিতা করা সত্যিই বন্দনার শক্তিতে কুলোবে না।

ভ্রাতৃগর্ব্বে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, জানো বন্দনা দ্বিজু আমার সাধু লোক।

—আপনার চেয়েও নাকি?

—হাঁ আমার চেয়েও। এই বলিয়া বিপ্রদাস এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু সে বলছিল তুমি নাকি তার উপর রাগ করে আছো। কথা কওনি কেন?

—কথা কইবার দরকার হয়নি মুখুয্যে মশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তবেই ত দেখচি তুমি সত্যিই রাগ করে আছো। কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলি বন্দনা, দ্বিজুর ব্যবহারটা রুক্ষ, কথাগুলোও সর্ব্বদা বড় মোলায়েম হয়না কিন্তু তার এই কর্কশ আচরণটা ঘুচিয়ে যদি কখনো তার দেখা পাও দেখবে এমন মধুর লোক আর নেই। কথাটা আমার বিশ্বাস কোরো এমন নির্ভর করবার মানুষও তুমি সহজে খুঁজে পাবে না।

বন্দনা আর একদিকে চাহিয়া রহিল উত্তর দিল না। হঠাৎ এক সময়ে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে মুখুয্যে মশাই—আমি যাই। যদি থাকতে পারি আপনি ফিরে এলে দেখা করবো। যদি না পারি এই আমার শেষ নমস্কার রইলো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল। একটা কথা বলারও সে বিপ্রদাসকে অবকাশ দিল না।

বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ির মুখে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল দ্বিজদাস দাঁড়াইয়া হাত যোড় করিয়া।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ আবার কি?

—একটা মিনতি আছে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে আমাদের দেশের বাড়ীতে একবার যেতে হবে।

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে? এর হেতু?

দ্বিজদাস কহিল, বলবো বলেই দাঁড়িয়ে আছি। একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন আজ আবার সেই দয়া আপনাকে করতে হবে।

বন্দনা একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিল, তারপরে বলিল কিন্তু আমাকে যাবার নিমন্ত্রণ করচে কে? মা, দাদা, না আপনি নিজে?

—আমি নিজেই করচি।

—কিন্তু আপনি ত ও-বাড়ীতে তৃতীয় পক্ষ, ডাকবার আপনার অধিকার কি?

দ্বিজদাস বলিল, আর কোন অধিকার না থাক আমার বাঁচার অধিকার আছে। সেই অধিকারে এই আবেদন উপস্থিত করলুম। বলুন মঞ্জুর করলেন? একান্ত প্রয়োজন না হলে কোন প্রার্থনাই আমি কারো কাছে করিনে।

বন্দনা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যদিকে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, আচ্ছা তাই যাবো কিন্তু আমার মান-অপমানের ভার রইলো আপনার উপর।

দ্বিজদাস সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে কহিল, আমার সাধ্য সামান্য, তবু নিলুম সেই ভার।

বন্দনা বলিল, বিপদের সময়ে এ কথা ভুলবেননা যেন।

—না ভুলবোনা।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

সাগর দোলায় ঢেউ

শ্রীনবগোপাল দাস আই-সি-এস্

*

* *

দূরে ডাঙার অস্তায়মান রেখাটুকু পর্য্যন্ত যখন সমুদ্রের কল্লোলের সাথে মিশে গেল তখন মোহিত ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ষ্টীমারের রেলিংটা ছেড়ে ডেকের ভিতরে তার চেয়ারটির খোঁজে গেল।

সমুদ্রের সাথে পরিচয় তার এই প্রথম—দেশের মাটির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার প্রয়োজনও এর আগে হয়নি। এই যে যাত্রা সুরু হ'লো এর শেষ কবে হবে?……বারবার মোহিতের মনে শুধু এই কথাটিই জাগছিল।

ডেক্ তখন যাত্রীদের ভীড়ে ভরে গেছে। সেকেণ্ড ক্লাশের ডেক—খুব বড়োও নয়। মোহিত কিছুতেই তার কাবিন নম্বরের অনুযায়ী চেয়ারটি খুঁজে পাচ্ছিল না।

তাকে অমন ক'রে তাকাতে দেখে একটি ছেলে ইংরেজীতে বলে উঠলো, আপনি কি আপনার চেয়ারটি খুঁজছেন?

মোহিত একটু লজ্জায়, একটু কৃতজ্ঞভাবে বল্লে, হ্যাঁ, আমার নম্বর হচ্ছে ৪৭৬ ··এদিকে কোথাও হ'বে হয়ত···

ছেলেটি হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে রোদ্‌ উপভোগ করছিল। একটুখানি উঠে বসে পিছনকার চেয়ারের উপরের কার্ডটার দিকে তাকিয়ে বল্লে, আমারই অন্যায় হয়ে গেছে—আপনার চেয়ারটি যে আমিই অধিকার ক'রে বসে আছি! ···মুখে তার একটু অপ্রস্তুতভাব।

মোহিত তাকে উঠ্‌তে দেখে একটুখানি লজ্জিত বোধ করলে। আহা, বেচারী দিব্যি আরামে শুয়ে সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্যরশ্মির খেলা দেখছিল; তাকে বেদখল করতে তার যেন বেশ খানিকটা দ্বিধা বোধ হচ্ছিল।

ছেলেটি কিন্তু খুবই সপ্রতিভ। সে এক মুহূর্ত্তে মোহিতের মনের দ্বন্দ্ব বুঝে নিয়ে বল্লে, আপনি বসুন, আমি আপনার পায়ের কাছে এই পা'দানটার উপর বস্‌ব—আপনার আপত্তি হবে না ত?

আপত্তি?—সমস্যার এমন একটা সহজ অথচ সুষ্ঠু সমাধান হয়ে গেল বলে মোহিত ছেলেটির কাছে ভয়ানক-ভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করছিল। সে হেসে জবাব দিলে, মোটেই নয়—আপনার সাথে গল্প করতে পারলে সময়টা কাটবে ভাল!

—তাহ'লে পরিচয় সুরু হোক্, কি বলেন?

মোহিত স্মিতমুখে ঘাড় নাড়লে।

—আমার নাম হচ্ছে যোশী···বম্বের লোক তা বোধ হয় নাম থেকেই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন। দেশে এসেছিলাম গরমের ছুটিটাতে বেড়াতে, আবার ফিরে চলেছি।

মোহিত একটু সম্ভ্রমভরা চোখে যোশীর দিকে তাকালে। সে যে দেশের মণিমুক্তা সংগ্রহ করতে যাচ্ছে যোশীর কাছে তা' একেবারে পুরাতন!···গল্প শুন্‌বার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল।

বল্লে, আমার নাম মোহিত সেন। আমি অবশ্যি এই প্রথম যাচ্ছি বিলেতে—দেশটা সম্বন্ধে ধারণা আমার কিছুই নেই, দু'তিনটে ভ্রমণকাহিনী পড়ে আমার কল্পনাটাও যেন অনেকখানি গুলিয়ে গেছে! ... আপনার সাথে আলাপ হ'য়ে বেশ ভালোই হ'লো—অনেক কিছু শোনা যাবে!

যোশী হেসে বল্লে, কিন্তু আমার কথাগুলো আপনার কল্পনাকে হয়ত একটুও সাহায্য করবে না, অথচ বাস্তব যা' তার ছবিও হয়ত আমি ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারব না। ···কাজেই এসব নিয়ে গল্প না করাই ভালো!

মোহিত বুঝ্‌লে যোশী তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। তার এই ভদ্র প্রত্যাখ্যান মোহিতের কাছে যেন বড্ড গর্ব্বোদ্ধত বলে ঠেক্‌ল। সে মর্ম্মাহত হয়ে চুপ করে রইল।

যোশী তার নীরবতা লক্ষ্য ক'রে তাকে প্রশ্ন করলে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন—লণ্ডন না কেম্ব্রিজ ?

মোহিত সংক্ষেপে জবাব দিলে, কেম্ব্রিজ—

যোশী উৎসাহসূচকস্বরে বল্‌লে, আপনি ভয়ানক ভাগ্যবান্‌ যা'হোক—কেম্ব্রিজে সিট পেয়েছেন!—আমি ত দু'বছর চেষ্টা করেও সেখানে সীট পেলুম না!—আমার না আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণাঙ্কিত ছাপ, না আছে আভিজাত্যের গৌরব—

মোহিত বল্‌লে, আমি আমার প্রোফেসারদের অনুগ্রহেই সীট পেয়েছি বল্‌তে হবে!—আপনি কি লণ্ডনেই পড়ছেন?

—হ্যাঁ, বছর দুই হ'লো, আস্‌ছে জুনেই পরীক্ষাও দিতে হবে—সেই কথা মনে হ'লেই গায়ে জ্বর আসে!

মোহিত কিছু বল্‌লে না।

যোশী বস্‌তে লাগলে, লণ্ডনে বসে কি আর পড়াশুনা চলে? সেখানে চিত্তবিক্ষেপকারী জিনিষের অভাব ত' নেই—সীনেমা, থিয়েটার আর week-end পার্টি ত লেগেই আছে, তার ওপর বন্ধুদের আব্‌দার শুন্‌তে শুন্‌তেই সময় আর উৎসাহ চলে যায়!—আপনি কেম্ব্রিজে গিয়ে ভালোই করেছেন, তবু কটা মাস একটু মন দিয়ে পড়াশুনা কর্‌তে পার্‌বেন।

মোহিত যোশীর কথার তাৎপর্য্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌ছিল না। সে বিস্মিতভাবে বল্‌লে, কিন্তু লণ্ডনে থেকে ত কত ছেলে পড়াশুনা কর্‌ছে, নয় কি?

একটুখানি মুচকি হেসে তাচ্ছিল্যের সুরে যোশী জবাব দিলে, যারা কর্‌ছে তারা একেবারে গ্রন্থকীট—জীবনে পড়া ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না!—লাইফ্‌ ব'লে যে-মস্ত বড় জগৎ পড়াশুনার গণ্ডীর বাইরেও পড়ে রয়েছে তার খবর কি তারা রাখে? —আপনার কাছে আজ এসব কথা ভয়ানকভাবে বেসুরো ঠেক্‌ছে, কিন্তু আপনিও মাস ছয়েক পরে আমার সাথে একমত হবেন, অবশ্য যদি গ্রন্থ-কীটদের দলে না ভিড়ে যান!

মোহিত দু'একজন বন্ধুর কাছে এই বিশাল "জগৎ"টার কথা একটু-আধটু শুনেছিল, মনে মনে খানিকটা কল্পনাও করে নিয়েছিল সে, আর খুব দৃঢ়ভাবে মনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে এই "জগৎ"এর ঘূর্ণিপাকে সে পড়বে না, পড়লেও হাবুডুবু খাবে না। ···কাজেই যোশীর কথায় সে একটুখানি সন্দিগ্ধ-হাসি হাস্‌লে মাত্র।

চায়ের ঘণ্টা পড়ল। সমুদ্রের দোলানি তখনও বিশেষ আরম্ভ হয়নি', যাত্রীরা বেশ সুস্থভাবেই চায়ের টেবিলে এসে বস্‌লে।

ডেকের উপরই চায়ের টেবিলগুলো সাজানো হয়েছিল; আর যাত্রার সুরু বলেই বোধ হয় অর্কেষ্ট্রা বাজছিল যেন···

যোশী আর মোহিত ঠিক্ রেলিঙএর ধারে একটি টেবিল অধিকার করে বস্‌লে। যোশী তখনও বেশ বিজ্ঞতামাখা-সুরে একটু মুরুব্বিয়ানার ভাবে মোহিতের সাথে গল্প করছিল, আর মোহিত তার প্রথম কৌতূহল, অজ্ঞতা এবং অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে সেসব শুন্‌ছিল।

সমুদ্রের জলের উচ্ছ্বাস এসে জাহাজের গায়ে লাগছিল আর জাহাজটি মাঝে মাঝে একটু দুলে উঠছিল। এই নতুন অনুভূতিটুকু মোহিতের কাছে কিন্তু খুবই প্রীতিকর বলে মনে হচ্ছিল—শীকরকণার শীতল স্পর্শ তাকে তার মায়ের স্নেহস্পর্শের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

মায়ের কথা মনের কোণে ভেসে উঠতেই তার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখ মুছলে। যোশী একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে, কী হল?

নিজের ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় একটু লজ্জিত হয়ে মোহিত জবাব দিলে, কিছু নয়। ···হঠাৎ কী জানি কেন চোখ দিয়ে জল এসে পড়ল!

যোশী সহানুভূতিভরা স্বরে বল্‌লে, বাড়ীর কথা মনে হচ্ছে বুঝি?

ছুরী দিয়ে টোষ্টের উপর মাখন মাখাতে মাখাতে মোহিত জবাব দিলে, হ্যাঁ।

—তুমি বুঝি এর আগে বেশীদিন বাড়ীছাড়া হওনি'?

—না, বাড়ীতেই থেকে আমি পড়তুম কি না!

যোশী তাব অন্যমনস্ক ভাবটা দূর করে দেবার প্রয়াস করে বল্‌লে, অর্কেষ্ট্রায় কী বাজাচ্ছে জানো ?

—না...আমি ত এর আগে ইংরেজী গান বিশেষ শুনিনি'...

—ওরা Blue Danube বাজাচ্ছে।...শোন, কী সুন্দর ওব সঙ্গীত ঝঙ্কার...সুবেব মূর্চ্ছনার মধ্যে যেন ড্যানিয়ুব্‌এর নীল জলের স্বচ্ছ প্রবাহ ভেসে আস্‌ছে।

মোহিত মন দিয়ে সঙ্গীতেব মাধুর্য্য উপভোগ কর্‌বার চেষ্টা করলে। ভায়োলিনের মধুর তালে তালে ড্যানিয়ুব্‌এর চঞ্চল অথচ নির্ম্মল স্রোতের কল্লোল যেন শোনা যাচ্ছিল। যদিও তার অনভ্যস্ত কানে সঙ্গীতের সব পদগুলো ঠিক ফুটে উঠ্‌ছিল না তবু তার মাদকতা তার মনকে আবিষ্ট ক'রে তুলছিল। আব তার মনে আস্‌ছিল বাংলা একটা গানের সুর—যেন কেউ "গ্রামছাড়া ঐ পথিক..." বাজাচ্ছে...

চায়ের পেয়ালা শেষ করতে করতে যোশী বল্‌লে, তুমি আমার উপর বাগ কর নাই ত মোহিত ?

মোহিত বিস্ময়পূর্ণচোখে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, না—রাগ কর্‌ব কেন ?

যোশী বল্‌লে, একটু আগেই তুমি বিলেতেব গল্প শুন্‌তে চেয়েছিলে, আমি তার কিছুই বলিনি' ব'লে।

মোহিত যোশীর কথার আন্তরিকতায় আর্দ্র হয়ে বল্‌লে, কী ছেলেমানুষ তুমি, যোশী...এর জন্য আমি রাগ করতে যাব কেন ? তুমি ঠিকই বলেছ হয়ত, আমাব কল্পনাকে বাস্তবেব নগ্নতা দিয়ে এত শীগ্‌গীরই ভেঙে দিতে চাওনি'...সে ত' তোমার সহানুভূতির পরিচায়ক, বন্ধু...

যোশী হেসে বল্‌লে, ঠিক সহানুভূতির ভাব থেকে যে আমি তোমাকে বল্‌তে চাইনি' তা' নয়।...চোখের সামনে ওদেশের কতগুলো জিনিষ দেখে আমার শ্রদ্ধা অনেকখানি কমে গিয়েছে বলেই আমি সে সব আঙুল দিয়ে তোমাকে দেখাতে চাইনি'। কল্পনার চোখে যদি তুমি দেখ তাহ'লে যা' সাধারণ তা'ও সুন্দব এবং মধুর বলে ঠেক্‌বে...শুধু শুধু এই কল্পনার অনুভূতিকে নষ্ট ক'রে ত লাভ নেই !

মোহিত একটু হেসে বল্‌লে, একেই ত সাধুভাষায় বলে, সহানুভূতি...

যোশী আনমনাভাবে বল্‌লে, হবে ..

তখনও সন্ধ্যা হয়নি'। সমুদ্রের দোলানি একটু একটু আরম্ভ হয়েছে...দুটি ছোট্ট ছেলে রেলিংএর কাছে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি-সূচক মুখভঙ্গী কর্‌ছিল, আর একটি মহিলা, হয়ত বা তাদের মা হবেন, কাছে রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মুখের ভাব থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে অনতিকাল-বিলম্বে তিনিও আক্রান্ত হয়ে পড়্‌বেন।

যোশী এই দৃশ্য থেকে চোখ এড়িয়ে নিয়ে মোহিতকে বল্‌লে, এখানকার বাতাসটা বড্ড বন্ধ হয়ে গেছে যেন। চলো ফর্ষ্ট‌ক্লাশের ডেকে একটু বেড়িয়ে আসি।

মোহিত একটু সঙ্কুচিতভাবে বল্‌লে, আমাদের কোনরকম প্রশ্ন কর্‌বে না ত ?

হেসে যোশী বল্‌লে, পাগল নাকি !...আমরা ত' আর সেখানে আস্তানা গাড়্‌তে যাচ্ছি না—সেখানে যাচ্ছি শুধু দু'একজন বন্ধুবান্ধবের খোঁজ করতে।

—তোমার জানাশুনো কেউ আছে নাকি ?

—ঠিক জানিনে, তবে শ দুই যাত্রীর মধ্যে কি দু'একজন মিল্‌বে না ?...না হয় যেচে ভাব ক'রে নেব...

মোহিত একটু শ্রদ্ধাভরে যোশীর দিকে তাকালে। তার সাহসিকতা, তার খোলাখুলি উক্তির কাছে তার মনেব নতি জানালে।

এদিক ওদিক ঘুরে মোহিত আর যোশী ফার্ষ্টক্লাশের প্রশস্ত ডেকের উপর গিয়ে হাজির। ডেকের উপর সবাই হয় শুয়ে আছে, নয় পায়চারী করছে। স্বাস্থ্যকামীর দল একটি সন্ধ্যাও কামাই কর্‌তে রাজী নয়, তাবা খাকী শার্টস্‌ এবং মোজা পরে বীরবিক্রমে ডেকের উপর পরিক্রমণ করছে ; কাহারও মুখে পাইপ, কাহারও হাতে বেতের rattan.

যোশী একটু হেসে বল্‌লে, এই যে সব বীরপুরুষদের দেখ্‌ছ এরাই জাহাজেব সজীবতা বজায় রাখে ! এদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখ্‌লে মনে হয় নেপোলিয়নও বোধ হয় এদের কাছে হাঁটু গেড়ে নিজের অক্ষমতা এবং দৈন্য জানাতেন !

মোহিত একটু হাস্‌লে।

যোশী বললে, ঐ যে বিসমার্কের মত শাদা গোঁফওয়ালা বুড়োটাকে দেখছ ও বোধ হয় একটা কর্ণেল গোছের কিছু হবে। আমি শপথ করে বলতে পারি বুড়ো অন্ততঃ একশ'টিবার জাহাজের এমাথা থেকে ওমাথা পর্য্যন্ত পায়চারী করতে না পারলে শান্তি পাবে না……তার এই পাবচারণের সমাপ্তি হবে দু'পেগ হুইস্কী এবং সোডায়!

মদের নাম উল্লেখ হ'তেই মোহিত ভয়ানক বিতৃষ্ণায় বলে উঠলে, এরা কি সবাই মদের পিপে?

যোশী হেসে বললে, এই সব ভবঘুরে সৈনিকদলই হচ্ছে এ বিষয়ে সব চেয়ে বড় ওস্তাদ্! কিন্তু এদের বাদ দিলেও তুমি এমন একটি লোক বার করতে পারবে না যিনি এই স্বচ্ছ তরল পদার্থ টির মধুতে মোহিত নন্!

মোহিত একটু তীব্রস্বরে বললে, অথচ এরাই আবার সভ্যতার শ্রেষ্ঠতার দাবী করে।

যোশী মোহিতের এই রাগে একটু আমোদ বোধ করে বললে, এতে সভ্যতার আদর্শের কী ক্ষতি হল মোহিত?… তুমি যেটাকে এত বিতৃষ্ণার চোখে দেখছ সেটা যে এদের কাছে নিতান্ত সাধারণ একটা পানীয়! এদের মাপকাঠি দিয়ে এদের বিচার ক'রো!

তবু প্রতিবাদের সুরে মোহিত বললে, কিন্তু সত্যের একটা মাপকাঠি আছে ত! মদ খাওয়াটাকে আমি মোটেই কোন নীতিসম্মত বলে মানতে পারি না!

যোশী এর জবাব অনায়াসেই দিতে পারত, কিন্তু মোহিতের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে একটা রূঢ় আঘাত দেবার ইচ্ছা তার ছিল না।

মোহিত পাদচারিণী একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, আর ওদের মেয়েদের এই পোষাকটা আমার মোটেই বরদাস্ত হয় না…এর মধ্যে না আছে শ্রী, না আছে হ্রী; এ যেন একটা বিরাট্ নগ্নতাকে জোর ক'রে গর্ব্বভরে লোকের চোখের সামনে তুলে দেওয়া হচ্ছে!

এবার যোশী প্রতিবাদ করলে, বললে, তোমার এই অতিশয়োক্তি আমি মোটেই মানতে রাজী নই, মোহিত। তোমার নতুন চোখে অনভ্যস্ত জিনিষটা হয়ত একটু দৃষ্টি-কটু দেখাতে পারে, কিন্তু তাই বলে এদের পোষাককে শ্রী বা হ্রীহীন বলতে আমি রাজী নই। এদের সাধারণ মেয়েরা বেশভূষার মধ্যে সৌন্দর্য্যের যা কাল্‌চার জানে আমাদের গরীব সংস্কারভরা দেশে অনেক বড় বড় লোকেরাও তা' জানে না!

মোহিত একটুও না হঠে বললে, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের শাড়ীর মত সুন্দর ও কোমল আর কিছু আছে কি যোশী?

যোশী বললে, এরকম তুলনামূলক সমালোচনা বড্ড অন্যায়, মোহিত। আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে শাড়ীটি মেয়েদের অঙ্গে যেমন মানায় এদের জীবনযাত্রার মধ্যে এদের স্কার্ট, ফ্রক বা গাউনও তেমনি মানায়…

মোহিত এর কোন জবাব দিতে না পেরে চুপ করে রইলো।

রেলিংএর উপর ঝুঁকে দুজনে সমুদ্রের উপর সূর্য্যাস্তের শোভা দেখছিল। যেন লাল একটা অগ্নিগোলক ধীরে ধীরে সমুদ্রের শীতল জলের স্পর্শ পাবার লোভে তার মধ্যে মিশে গেল, আর তার চারিদিকে মেঘের কোলে পথটা আবীর-রাঙা হয়ে রইল।

মুগ্ধনেত্রে মোহিত এই অপূর্ব্ব দৃশ্যটি দেখছিল, হঠাৎ কানের কাছে একটি সম্বোধনের স্বরে সে স্বপ্নোত্থিতের মত ফিরে তাকালে।

—হ্যালো, যোশী…

দেখলে, সুন্দরী একটি মেয়ে চাঁপা রঙএর একটি ফ্রক্ পরে যোশীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে…মুখে তার মৃদু হাসি।

যোশী আচম্কা এই সম্ভাষণে একটুখানি বিস্মিত হয়ে পেছন ফিরে তাকালে। তারপর পরিচিত সুরে হাসিমুখে বললে, হ্যালো, মিস্ রজার্স…তুমিও কি অবশেষে এই জাহাজেই চলেছ?

হেসে মিস্ রজার্স জবাব দিলে, তাইত' দেখছি… এখন জাহাজ না ডুবলেই বাঁচি!

যোশী উচ্চহাসির কল্লোলে ফোর্-ডেক্‌টা মুখরিত করে বললে, তাহ'লে এমি জনসনের মত উড়ে পালালে না কেন?

তেম্‌নি হাসিমুখে মিস্‌ রজার্স জবাব দিলে, পাখাও ত' ভেঙে যেতে পারত!

যোশী তখন মোহিতকে এগিয়ে দিয়ে মিস্‌ রজার্স'এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে। বল্‌লে, এটি আমার কয়েক ঘণ্টার বন্ধু, মিস্‌ রজার্স, কাজেই লম্বা সার্টিফিকেট দিতে ভরসা হচ্ছে না…তবে ইনি এখনও বিদেশের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা, একটা তীব্রতার ভাব কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি।

মোহিত যোশীর এই গায়েপড়া গোছের বক্তৃতায় একটু বিরক্তি বোধ কর্‌ছিল! সে কোন কথা না বলে চুপ করে রইলো।

মিস্‌ রজার্স অভিবাদনসূচক একটা ভঙ্গী ক'রে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লে, আপনি বুঝি এই প্রথম দেশছাড়া?

মোহিত সংক্ষেপে জবাব দিলে, হ্যাঁ।…কী-জানি-কেন মিস্‌ রজার্স আর যোশীর উচ্চহাসি আর কৌতুক তার চোখে কেমন যেন ঠেক্‌ছিল।

মেয়েটি নাছোড়বান্দা। আবার প্রশ্ন কর্‌লে, আপনার নিশ্চয়ই ভয়ানক মন খারাপ লাগ্‌ছে, নয় কি?

মোহিত অনন্যোপায় হয়ে উত্তর দিলে, একটু-আধটু লাগ্‌ছে বৈকি।

সহানুভূতির সুরে মিস্‌ রজার্স বল্‌লে, দুদিন ওরকম লাগ্‌বে, তারপর সেরে যাবে!…তা' ছাড়া সমুদ্রের হাওয়ার গুণ যাবে কোথায়?

মোহিত এর কোন জবাব দিলে না।

যোশী চুপ করে এদের কথোপকথন শুনছিল। সে প্রতিবাদের সুরে বল্‌লে, আমার সরল বন্ধুটির কাছে সমুদ্রের হাওয়ার গুণব্যাখ্যান কর্‌তে হবে না এখন! তোমরা মেয়েরা হচ্ছ শয়তানের প্রতীক, কাউকে দেখ্‌লেই তোমাদের স্বভাবগত বৃত্তিগুলো জেগে ওঠে, তাকে তোমাদের ফিলসফির মধ্যে টেনে আন্‌তে না পার্‌লে তোমাদের তৃপ্তি হয় না।

মিস্‌ রজার্স বল্‌লে, এ তোমার বড্ড অন্যায়, যোশী। আমাদের ফিলসফি খুবই সহজ এবং ঋজু। তোমরা পুরুষেরাই সব জিনিষের একটা বঙ্কিম ব্যাখ্যা করে সাধারণতঃ প্রমাণ করতে চাও যে তোমরা যা করো তার পেছনে থাকে একটা মহানুভবতা, একটা গভীর অনুবেদনা। কিন্তু ওরকম কৃত্রিমতার মুখোস পরে তা নিয়ে গার্ব্ব প্রকাশ করতে আমাদের সুরুচিতে বাধে।

মোহিত একমনে এদের আলোচনা শুনছিল। মিস রজার্স'এর হাস্যচপল লীলাভঙ্গী তার কাছে প্রীতিকর না ঠেকলেও তার কথাগুলো শুনে তার মন বেশ একটু আকৃষ্ট হয়ে উঠছিল। কিন্তু এসব মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা তার জুরিসডিক্‌শনের বাইরে, কাজেই নীরব শ্রোতা হয়েই সে আনন্দ পাচ্ছিল বেশী।

যোশী মিস্‌ রজার্স'এর শ্লেষসূচক সুরে একটু অস্বস্তি করছি বোধ করে বললে, কিন্তু তোমার এরকম একতরফা বিচার কি উচিত হচ্ছে মিস্‌ রজার্স?

মিস্‌ রজার্স একটু হেসে জবাব দিলে, একতরফা বিচার না যোশী একটুখানি ওকালতী করছি মাত্র। তোমাদের কৃত্রিমতারও ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় সময় সময় এবং ব্যতিক্রম আছে বলেই তোমরা যে নকল সেটা জোর-গলায় বলতে পারি।

যোশী চুপ করে রইলো।

মিস্‌ রজার্স এবার মোহিতের মৌনতা ভাঙ্‌বার উদ্দেশ্যে তাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলে, আপনি নিশ্চয়ই এসব তর্ক শুনে মনে মনে হাসছেন, না?

মোহিত এর কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে লজ্জাবিনম্রসুরে বললে, আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম তাই এসব মনস্তত্ত্বের সমস্যা সমাধান করবার মত আস্পর্দ্ধা আমার মনের কোণে স্থানই পায় না।

মুখে সুন্দর একটি হাসি ফুটিয়ে মিস্‌ রজার্স বললে, আপনি দেখছি ভয়ানক সীরিয়স লোক! আমরাই বা কী আর জানি? শুধু তর্কের খাতিরে, গল্প করবার অজুহাতে আর সময় কাটাবার অছিলায় এসব দার্শনিক আলোচনা পেড়ে বসি, নয় কী যোশী?

যোশী সায় দিয়ে বললে, সত্যি। তারপর মোহিতের দিকে তাকিয়ে বললে, ওদেশে গিয়ে তুমি দেখবে, মোহিত, কলেজের কমনরুমটা হচ্ছে এ সব গম্ভীর দার্শনিক আলো-

75.225

চনার একটা প্রকাণ্ড আড্ডা। ছেলে মেয়েরা যে কী গভীর উৎসাহ নিয়ে নব্য জার্ম্মাণীর সমস্যা বা রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করতে থাকে তা দেখে তুমি সত্যি অবাক হয়ে যাবে—তোমার মনে হবে যেন সমস্ত জার্ম্মাণী বা রুশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কমনরুমের ঐ গবেষণাটুকুর ফলাফলের ওপর।

মিস রজার্স তার হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকালে, তারপর বললে, আমায় এখন নড়তে হচ্ছে··· সময়মত পোষাক পরে যদি তৈরী না হয়ে নেই তা হলে অভিভাবিকাটীর কান্নার সুরে আমি পাগল হয়ে যাব!

যোশী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, তুমি আবার অভিভাবিকার সাথে এসেছ নাকি? অবাক করলে যা হোক!···

একটুখানি রাঙা হয়ে বললে, আমার স্বাধীন ইচ্ছামত কাজ করবার অবসর এখনও পাইনি, তাই এসব অত্যাচার সহ্য করতেই হয়। আমার বাবাটি তোমাদের দেশের উপর কী হাড়ে হাড়ে চটা তা তো জান না। ভাবেন তোমরা সবাই বুঝি জংলী দেশের মানুষ তাই আমাকে একা ছেড়ে দিয়ে তিনি মনের স্বস্তি হারিয়ে বসেন।

মোহিত মিস রজার্সএর এই কথাটিতে ভয়ানক ভাবে রুষ্ট হয়ে বললে, আপনি তাহলে আমাদের মত জংলীদের সাথে কথাবার্ত্তা করে আপনার অপমানের বোঝা না বাড়ালেই পারেন।

মিস রজার্স একটু আহতস্বরে বললে, আপনাদের মহত্ত্ব আর উদারতার মর্য্যাদা যদি আমি না বুঝতাম তা হলে কী যেচে আপনাদের সাথে আলাপ করবার জন্য এত উন্মুখ হতাম মিঃ সেন?

ব'লে আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে ক্ষুদ্র একটি অভিবাদন করে সে দ্রুতগতিতে চলে গেল।

যোশী তার গতিশীল মূর্ত্তিটির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, তুমি মিস রজার্সকে ভয়ানক চটিয়ে দিলে, মোহিত।

তাচ্ছল্যভরাকণ্ঠে মোহিত জবাব দিলে, বেশ করেছি। ওরকম দেমাকভরা কথা আমার মোটেই সহ্য হয় না।

তারপর যোশীর উপর যেন প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যেই একটু তীব্রস্বরে বললে, তুমি ওদেশের আদবকায়দা ভাল ভাবে জান, যোশী, ওদের মিষ্টি হাসি, লীলায়িত ভঙ্গী আর মিহিসুর তোমার কাছে উর্ব্বশীতিলোত্তমাসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার চোখে ওদের হাসির পেছনে লুকানো অহমিকার নগ্নতাটাই বাজে বেশী।

যোশী একটু হেসে মোহিতের পিঠ চাপড়ে বললে, তুমি আজ যে মন্তব্য প্রকাশ করলে, মোহিত, এর জন্যে দুদিন পরে নিজেই অনুতাপ বোধ করবে, কাজেই এসম্বন্ধে বেশী আর কিছু বলব না। তবে এটুকু বলতেই হবে যে তুমি মিস রজার্সকে মোটেই চেননি। যেদিন চিনতে পারবে সেদিন দেখবে ওর মিষ্টি হাসি লীলায়িত ভঙ্গী আর মিহিসুরের পেছনে শুধু অহমিকাই লুকিয়ে নেই, তার পেছনে একটা সরল উদার মনও উকিঝুঁকি মারছে।

মোহিত এর কোন জবাব দিলে না, শুধু একটুখানি অবিশ্বাসের হাসি হাসলে।

তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। যোশী আর মোহিত ডিনারের জন্য তৈরী হবার উদ্দেশ্যে তাদের নিজেদের ক্যাবিন অভিমুখে যাত্রা করলে।

সারাটি দিন মোহিত তার ঘরের ভেতর যায়নি। যোশীর সাথে পরিচয় হবার পর থেকে তার সময়টা যে কখন কী ভাবে কেটে গেছে সে নিজেই বুঝতে পারেনি। জাহাজের দোলানীর সাথে নিজের দেহটার ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে সে অপ্রশস্ত corridor দিয়ে যখন নিজের কামরায় ঢুকল তখন সেখানকার বদ্ধ হাওয়ায় তার মেজাজের তীব্রতা আরও বেড়ে উঠল।

ঘরে ঢুকে সুইচটা জ্বালতেই দেখলে তার সহযাত্রী একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক নীচের ব্যার্থ এ শুয়ে আছে।

আলোটা চোখে পড়ায় সে একটু পাশ ফিরে তাকিয়ে বললে, গুড ইভনিং··

মোহিত বললে, গুড ইভনিং—আপনি কী ভয়ানক কাতর বোধ করছেন?

ছেলেটী—তার নাম চিদম্বরম্—একটুখানি মলিন হেসে

বললে, আর বলবেন না, যাত্রার সুরুতেই যা আরম্ভ হল তাতে আর ভরসা হচ্ছে না।

মোহিত তার শিয়রের কাছে বসে একটু আর্দ্রস্বরে বললে; এ কালই সেরে যাবে আপনার। যা কিছু দুর্ভোগ আগে শেষ হয়ে গেলেই ত ভালো!...তারপর দিব্যি চাঙ্গা হয়ে বসে সমুদ্রের হাওয়া খেতে পাবেন।

কাতরভাবে চিদম্বরম্ বললে, দুর্ভোগের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত উপভোগের ক্ষমতাটুকু বেঁচে থাকলেই নিয়তিকে ধন্যবাদ দেব···

মোহিত একটু হেসে তার চুল কটা ঠিক করে নিলে তারপর চিদম্বরম্‌কে আর একবার গোটাকয়েক সান্ত্বনাসূচক কথা ব'লে সুইচ্‌টা টিপে বার হয়ে গেল।

* *

*

ভোরবেলা মোহিতের যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখনও বেশ ক'রে ফর্সা হয়নি। পোর্টহোল্‌টা খোলা ছিল, আর তার ভিতর দিয়ে সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছ্বাস চঞ্চল কিশোরীর মত ঢুক্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল, কিন্তু তার ছোট ছুটি হাতে কিছুতেই নাগাল পাচ্ছিল না। মোহিত বিছানার উপর উঠে বসে পোর্ট্‌হোল্‌টার মধ্য দিয়ে সমুদ্রের জলটা একবার দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে।

চোখ তার তখনও ঘুমে ভারাক্রান্ত। খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার চোখ যখন আবার ঘুমের আবেশে মুদে এলো তখন সে বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুম যখন আবার ভাঙ্‌ল তখন অনেকখানি বেলা হয়ে গেছে। সূর্য্যোদয় দেখ্‌বার তার ইচ্ছা ছিল বেজায়, সেটা নিজের কুঁড়েমির জন্য এম্‌নিভাবে মাটি হয়ে গেল! সে কোন ক্রমেই নিজেকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ছিল না। ধড়মড়িয়ে উঠে সিঁড়ি বেয়ে সে মেজেতে নাম্‌লে।

চিদম্বরম্ তখন অঘোরে ঘুমুচ্চে—তার মুখে শ্রান্তির রেখা। মোহিত কোন-রকমে ড্রেসিংগাউনটা গায়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেল।

পিছনের ডেকে তখন লোকের ভীড় কমে গেছে। সূর্য্যের নীলিমা কখন আকাশে মিশে গেছে, তার কিরণের প্রখরতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।···ছোট ছোট groupএ যাত্রীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প কর্‌ছিল।

যোশী ছায়ার নীচে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। মোহিতকে উঠে আস্‌তে দেখে বল্‌লে, এতক্ষণে বুঝি তোমার সূর্য্যোদয় দেখ্‌বার সময় হ'লো!

মোহিত লজ্জিতভাবে বল্‌লে, আমি উঠেছিলাম অনেক আগেই, আবার হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলার ঘুমটা এত মিষ্টি লাগে!

যোশী বল্‌লে, একটা জিনিষ miss করলে কিন্তু!

—কী?

—মিস্ রজার্স তার আধঘুমন্ত চোখ আর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলো চুল নিয়ে সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে এখানে এসেছিল, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে!

মোহিত একটা বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী কর্‌লে।

যোশী সেটা উপেক্ষা করে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, শুধু তাই নয়, তোমার খোঁজ কর্‌ছিল!

মোহিত বিশ্বাস না করে বল্‌লে, কেন?

—কেন আমি কী ক'রে বলব? মেয়েদের অন্তর-রহস্য বোঝ্‌বার মত ক্ষমতা ত' আমার নেই!···কালকে এমন খোঁচা দিলে তুমি, অথচ আজ ভোর বেলা প্রথম প্রশ্নটি আমাকে "তোমার সেই বন্ধুটি কোথায়?"

মোহিত এবার একটু হেসে বল্‌লে, তোমার মন বড্ড খারাপ যোশী, সাধারণ ভদ্রতাসূচক একটা প্রশ্নের মধ্যে তুমি গভীর অর্থ খুঁজবার চেষ্টা কর্‌ছ!

কাঁধটা বিচিত্রভঙ্গীতে নাড়িয়ে যোশী জবাব দিলে, গভীর অর্থ খুঁজ্‌বার চেষ্টা কর্‌তুম না যদি তার পরই দ্বিতীয় প্রশ্নটি না হত, 'উনি কি আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছেন?"

মোহিত একটু কুপিত হয়ে বল্‌লে, তাঁকে বলো তিনি এমন কিছু রাশভারি লোক নন্ যে তাঁকে নিয়ে সারাদিন আমার মাথাব্যথা হবে!

যোশী মোহিতের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত ও রুষ্ট হয়ে বল্‌লে, ও রকম বর্ব্বরের মত ব্যবহার কর্‌লে তুমি নিশ্চয়ই পরে অনুতপ্ত হবে মোহিত!

এবার একটু শান্ত হয়ে মোহিত জবাব দিলে, কিন্তু আমাকে নিয়ে এরকম মাথা ব্যথা কেন তাঁর ?

—কেন তা' যদি জান্‌তে পারতুম তা হ'লে এম্‌নি অলস-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতুম ? তা হ'লে এতক্ষণে যবনিকা ভেদ করে নেপথ্যের দৃশ্যটিকে সম্মুখে টেনে নিয়ে আসতুম !

যোশীর রূপকভরা কথা শুনে মোহিত আর হাসি চেপে রাখ্‌তে পার্‌লে না। বললে, বিলেত প্রবাসের ফলে বুঝি তোমার কল্পনা-শক্তি এমন অদ্ভুতভাবে বেড়ে উঠেছে ?

তার কল্পনাশক্তি বেড়েছে কি কমেছে সেটা সে যেন নিজেই বুঝ্‌তে পারছে না, এম্‌নি একটা ভঙ্গীতে মাথাটি আন্দোলন করে যোশী জবাব দিলে, এ ত কল্পনাশক্তির খেয়াল নয়, মোহিত, এ যে ভয়ানক সত্যি কথা!··· হেসো না মোহিত, আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে যে মিস্ রজার্স তোমাকে একটুখানি পছন্দ করতে আরম্ভ করেছেন! অবশ্য, এর মধ্যে বিস্মিত হবার কিছুই নেই !

মোহিত যোশীর মুখের গম্ভীরতা হাসির এক ঝলকে উড়িয়ে দিয়ে বললে, তোমার এই গবেষণার জন্য তোমাকে নোবেল প্রাইজ্ আমি দিতুম যোশী, কিন্তু আপাততঃ খিদেয় নাড়ী চুঁইয়ে যাচ্ছে, কাজেই আমি প্রস্তাব করছি এখন বাস্তব জগতে ফিরে এসে ব্রেক্‌ফাষ্ট্ খাবার বন্দোবস্ত করা যাক্।

ব্রেক্‌ফাষ্ট্ সেরে মোহিত আর যোশী যখন আবার ডেকের উপর এসে বসলে তখন হাট বসে গেছে। সমুদ্র অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে—দোলানিটা নাড়ীভুঁড়িকে কোন রকম পীড়া না দিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে আরম্ভ করেছে।

চিদম্বরম্ উঠে-বসেছিল। মোহিত আসতেই সে হাত নেড়ে তাকে ডাক্‌লে। মোহিত যোশীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চিদম্বরম্-এর কাছে এগিয়ে গেল।

চিদম্বরম্ তাকে পাশের ডেকচেয়ারটায় বসতে বলে তার কানের কাছে মুখটা নিয়ে এসে খুব চুপি চুপি বললে, আপনার সাহায্য একটু দরকার মিঃ সেন, একটু আগে একজন স্প্যানিয়ার্ড পাদ্রি ভয়ানকভাবে তর্ক আরম্ভ করেছিলেন খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য নিয়ে; এই মাত্র নীচে তাঁর ক্যাবিনে চলে গেছেন কী একটা বই আনতে···আমি ত' ওঁর সাথে এঁটে উঠতে পারছি না···আপনি বসুন এখানে, এলেন ব'লে !

মোহিত ত' এই চায় ! সে ভয়ানক উৎসাহের সুরে বললে, ওর ধর্মান্ধতা যদি খানিকটা ঘোচাতে পারি তা হ'লে আমি ভয়ানক আনন্দ করব, মিঃ চিদম্বরম্।

ততক্ষণে তাঁর আভূমি বেশভূষা লুটাতে লুটাতে ফাদার মাদারিয়াগা একখানা বই হাতে ক'রে হাজির। যেন মস্ত বড় একটা জেহাদ্‌এ নামছেন এম্‌নি সুরে হাতের বইখানা চিদম্বরম্‌এর চোখের সাম্‌নে ধরে বললেন, এই দেখুন····

চিদম্বরম্ নিতান্ত অসহায় শিশুর মত মোহিতের দিকে তাকালে। মোহিত বললে, আমি দেখ্‌তে পারি কি ?

চশমার ফাঁক দিয়ে মোহিতের দিকে একটিবার তাকিয়ে অবজ্ঞার সুরে ফাদার জবাব দিলেন, সমস্ত পৃথিবীর সাম্‌নে আমি এই সত্য প্রচার করতে পারি জোর গলায়···

মোহিত একটু হেসে বললে, আমি সেই পৃথিবীরই এক কোণে আছি বলে আমার ধারণা !

বইটা হচ্ছে এক পাদ্রীর লেখা, তার প্রথম সংস্করণ হবে অন্ততঃ বছর কুড়ি আগে। বইখানার কাট্‌তি এমন যে তারপর প্রত্যেক এক বছর দু'বছর অন্তর নতুন মুদ্রণ হয়েছে, এবং সংশোধন বা পরিবর্ত্তন না করাতেও তার পাঠকপাঠিকার সংখ্যা কমেনি।

মোহিত ফাদারের নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করলে, দেখ্‌লাম···এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে কী ?

জোর গলায় ফাদার মাদারিয়াগা বললেন, প্রমাণ হচ্ছে এই যে তোমাদের দেশে যে এম্‌নি ধারা বাল্যবিবাহ আর আর শিশুমৃত্যু চলছে তার মূলে হচ্ছে তোমাদের ধর্ম্মনীতির অন্ধতা। তোমরা একটা স্থবির নীতিহীন—শুধু নীতিহীন কেন, দুর্নীতি প্রশ্রয়ক—dogmaয় ডুবে আছে বলেই আজ তোমাদের এমন দুর্দ্দশা !

ব্যঙ্গভরা সুরে মোহিত প্রশ্ন করলে, তা হ'লে আপনি কি বলতে চান যে আমাদের এই দুর্নীতিপ্রশ্রয়ক ধর্ম্মটা ছেড়ে দিয়ে আপনাদের সুনীতি এবং সুরুচিসম্পন্ন

P30256

ধর্ম্মটা মেনে নিলেই আমাদের সব দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হবে?

জোর গলায় ফাদার বল্লেন, নিশ্চয়ই হবে।…তবে এর মধ্যেও একটা "কিন্তু" আছে…শুধু খৃষ্টধর্ম্ম বল্লে ভুল করা হবে, হ'তে হবে রোম্যান ক্যাথলিক, যার প্রাচীনতা এবং সত্যতায় আজ পর্য্যন্ত কেউ সন্দেহ করেনি' এবং যার প্রতীক হয়ে রয়েছেন আমাদের পোপ্…তোমাদের দেশে খৃষ্টধর্ম্মের আলোক যে ভালোভাবে পৌছায় নি' তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে রোম্যান্ ক্যাথলিক্ প্রীচাররা উপযুক্ত সাহায্য বা সুবিধা পান্‌নি' সেখানে। নইলে আজ পোপের সিংহাসন অধিষ্ঠিত হ'ত দিল্লীতে!

মোহিত ইতিহাসের ছাত্র, সে একটুখানি ব্যঙ্গভরে বল্লে, Inquisitionটা হিন্দুস্থানে খাটাতে না পেরে বুঝি মনে আফ্‌শোষ হচ্ছে?

ছেলেটির তরলতায় রুষ্ট হয়ে ফাদার বল্লেন, যাদের বিশ্বাসের অভাব তাদের কাছে সত্য প্রচার করাটা বাতুলতা মাত্র!

মোহিত তেম্‌নি সুরে জবাব দিলে, আপনি বুঝি শুধু বিশ্বাসীদের নিয়েই একটা চার্চ্চ গড়ে তুল্‌তে চান, ফাদার?… সে মন্দ হবেনা কিন্তু!

ফাদার মাদারিয়াগা এবার চিদম্বরম্‌এর তাকিয়ে বল্লেন, আমার আলোচনা হচ্ছিল তোমার সাথে, এর সাথে নয়…

পাছে আবার তাকে তর্কের গোলকধাঁধায় পড়ে বিব্রত হ'তে হয় এই ভয়ে চিদম্বরম্ তাড়াতাড়ি বল্লে, হ্যাঁ, কিন্তু এ আমার বহুদিনের পুরাণো বন্ধু এবং এর চিন্তাধারা আর মতিগতি সব আমারই মত।…আমার শরীরটা তত ভালো নেই বলে এ আমাদের কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়েছে।

গম্ভীরভাবে "অবিশ্বাসীদের সাথে আলোচনা যে করে সে মূর্খ" এই মন্তব্য প্রকাশ করে ফাদার মাদারিয়াগা সেখান থেকে উঠে গেলেন।

চিদম্বরম্ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নেত্রে মোহিতের দিকে তাকিয়ে বল্লে, আপনি আজ আমাকে এই ধর্ম্মপাগলের হাত থেকে মুক্ত করে যা' উপকার কর্‌লেন তা' আমি ভুল্‌বনা, মিঃ সেন…

মোহিত হেসে জবাব দিলে, আনন্দটা হ'ল আমার, মিঃ চিদম্বরম্, এবং তার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনি… কাজেই ধন্যবাদ যদি কারও প্রাপ্য থাকে তাহ'লে সে আপনারই।

ব'লে সে উঠে দাঁড়ালে।

যোশী তখন সেকেণ্ডক্লাশ ডেক্ থেকে চলে গেছে। কোথায় গেল?…বুঝি বা সে মিস্ রজার্স'এর সাথে গল্প কর্‌তে গিয়েছে। কী জানি কেন তার মনে হচ্ছিল যোশীর হাসিখুসীভাব আর কৌতুকমেশানো কথাবার্ত্তার পেছনে আর একটি মানুষ লুকিয়ে আছে—সেটা হচ্ছে প্রেমিকের মানুষ। মিশ্ রজার্স'কে যোশীর ভালো লাগে এ বিষয়ে তার কোনই সংশয়ই ছিল না।

ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের বিশাল প্রসারতার মাঝে এসে দেখে সেখানে ফাদার মাদারিয়াগা জাতীয় কোন উৎসাহী কারও ধর্ম্মপিপাসা উদ্রেক করবার চেষ্টা করছেন না। শিথিল অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সবাই ঈজিচেয়ারে শুয়ে আছে—জাহাজের চাকার ঘর্ষণ আর জলের উচ্ছ্বাস এই দুটো মিলে একঘেয়ে একটা সুরের সৃষ্টি করছে।

মোহিতের উৎসুক চোখ দুটী যোশীকে খুঁজছিল। খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে এমন সময় একটি মেয়ের মৃদু হাসির ছটা তার মুখের উপর এসে পড়ায় সে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠ্‌ল।

ঘাড়টা একটুখানি ফিরিয়ে দেখ্‌লে মিস্ রজার্স একটা ছবিওয়ালা ম্যাগাজিনের ফাঁক দিয়ে অভিবাদন সূচক হাসি হাসছে। তার পাশে একটী বর্ষীয়সী ক্ষীণকায়া মহিলা বসে গম্ভীর ভাবে পশমের কী-একটা বুন্‌ছে।

মুহূর্ত্তের জন্য মোহিতের মুখচোখ রাঙা হয়ে গেল। তারপর সে কোন প্রকার শিষ্টাচার না করেই জোরে জোরে পা ফেলে সম্মুখে এগিয়ে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে দেখে যোশী ফার্ষ্টক্লাশ স্পোর্টশ ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখ্‌ছে। ক্রীড়াশীলা ছেলেমেয়ের হাসি আর কলরব মিশে একটা অদ্ভুত স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিল।

মোহিতকে দেখে ঘোশী বল্‌লে, ফাদারের সাথে ধর্ম্মালাপ শেষ হলো ?

মোহিত হেসে বল্‌লে, আর ব'লো না ভাই, এম্‌নি ছাঁচেঢালা ধর্ম্ম, তা নিয়ে আবার বাগাড়ম্বর কর্‌তে আসে !... আমার মন ত এদের উপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠ্‌ছে ধীরে ধীরে !

ঘোশী বল্‌লে, ফাদারকে দিয়ে তুমি সমস্ত ইউরোপকে বিচার করতে যেয়ো না, মোহিত !...আমাদের দেশের পুরুতদের দিয়ে যদি আমাদের ধর্ম্মকে কেউ বিচার কর্‌তে চায় তা'হলে সেটাকে তুমি মান্‌বে ?

মোহিত এবার ঘোশীর উক্তির সত্যতা স্বীকার কর্‌লে। বল্‌লে, আমি ইউরোপকে বিচার কর্‌ছিনা ঘোশী...আমি শুধু ভাব্‌ছি যে এদের মত শিক্ষিত লোকও দেখ্‌তে পায় না যে যে-ধর্ম্ম সজীব মনের অন্তরের সাথে না মেলে তার দাম অকিঞ্চিৎকর, তা' কুশ্রী...

ঘোশী কথার ধারাটা উল্‌টে নিয়ে বললে, মিস্ রজার্সকে দেখ্‌লে ?

অপ্রসন্নস্বরে মোহিত বল্‌লে, দেখ্‌লুম। আমাকে দেখে তাঁর ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে ছোট্ট একটা হাসি হাস্‌লেন। ওজন করা হাসির ফাঁক দিয়ে তাঁর ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো ঝলক্ দিয়ে উঠ্‌ল, আমার মনে জাগ্‌ল সেই টুথ্‌পেষ্টএর বিজ্ঞাপনের ছবিটা !

মোহিতের পিঠে একটা চাপড় মেরে ঘোশী বল্‌লে, তুমি কিন্তু ভয়ানক দুষ্ট হয়ে উঠ্‌ছ, মোহিত...ভদ্র মেয়েদের সম্বন্ধে এরকম যা' তা' মন্তব্য প্রকাশ করা কিন্তু তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না।

একটুও না দমে মোহিত বল্‌লে, ম্যাগাজিনের পাতার ফাঁক দিয়ে বুড়ি অভিভাবিকার চোখ এড়িয়ে ওরকম ফিক্ ক'রে একটি হাসি যদি আমায় বিজ্ঞাপনের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় তাহ'লে সে কি আমার মনের দোষ ?

ঘোশী এবার মোহিতকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, যথেষ্ট হয়েছে ...তোমার মনের যা ছবি আমি দেখ্‌ছি তাতে অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাক্...সত্যি বল্‌ছি, মোহিত, মেয়েটা বড় ভালো —ওকে আমি ছয় সাত মাস ধরে দেখ্‌ছি ত।

—কোথায় ? লণ্ডনে ?

—হ্যাঁ লণ্ডনে। ওর পুরো নাম হচ্ছে শীলা রজার্স... ভারী মিষ্টি নামটা, না ?

—হবে...

—তুমি ভয়ানক cynical ; জানো আমি নামটা দেখেই ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছিলুম আর কি !

—পড়্‌লে না কেন ?

হেসে ঘোশী জবাব দিলে, ভালো ভাবে পড়্‌তে হ'লে দুদিকেরই টান থাকা চাই যে—প্রেম হচ্ছে চুম্বকের মত আকর্ষণ বিকর্ষণের সাথী...

মোহিত ঘোশীর প্রেমের সংজ্ঞায় না হেসে থাক্‌তে পার্‌লে না। বল্‌লে, তোমার কথাটা ভয়ানক মূল্যবান, ভাই...মনের খাতায় শাদা কালীতে আমি নোট্ করে রাখ্‌ছি।

তার উপহাসটা গায়ে না মেখে ঘোশী বল্‌লে, কিংস্ কলেজে ও পড়ে। আমার পাশেই বসেছিল। একটা কাগজে আমাদের সব নাম লিখ্‌তে হয়—ও লিখ্‌লে, তার পরই আমার হাতে দিলে। আমি দেখ্‌লুম লেখা আছে, শীলা রজার্স। আমার নাম দস্তখত শেষ করেই মরিয়া হয়ে প্রশ্ন কর্‌লুম, তুমি কি হিন্দুস্থানে জন্মেছিলে ?...অবাক্ হয়ে সে জবাব দিলে, না...। তারপর আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু সে দেশটা দেখ্‌বার ইচ্ছে আমার খুবই আছে !...আমি ভাব্‌লুম এটা বুঝি একটা ইঙ্গিত, ভয়ানক উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লুম। তখন ত' প্রোফেসার এসে পড়্‌লেন, তাই আলাপ্ আর বেশী এগোল না।...ক্লাশ শেষ হবার পর শীলার পেছনে পেছনে ছুট্‌লুম, চায়ে নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত কর্‌লুম, কিন্তু কী ভয়ানক reserve মেয়েটার ! হাসি খুসী ঠাট্টাতে সে অনেক ফ্লার্টকেও হারিয়ে দিতে পারে, তবু শীলতার সীমারেখার বাইরে ওকে কিছুতেই আনা যায় না।

মোহিত ঘোশীর গল্পে একটুখানি interested বোধ কর্‌ছিল, প্রশ্ন কর্‌লে, লণ্ডনে কি শীলতার সীমারেখার বাইরে অনেকেই আস্‌তে রাজী তা হ'লে ?

—সেটা নির্ভর করে শীলতার সংজ্ঞার উপরে। আমাদের দেশের অভিধানে যাকে শীলতা বলে তা নিয়ে ত ওদের বিচার করা চলে না। ওরা যাকে শীলতা বলে

তার দাম কম নয়, মোহিত।...তার বাইরেও অনেকে আসে, কিন্তু সে হচ্ছে এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মেয়েরা।...কলেজ যারা আসে তারা ভদ্র, শিক্ষিত—তারা ভয়ানক ভাবে elusive, ছেলেদের সাথে সেক্স নিয়ে কত তুমুল আলোচনা করে চলেছে, কিন্তু তাদের মনের মধ্যে কোন আলোড়ন বা চঞ্চলতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না তা' বাইরে থেকে বুঝ্‌বার জোটি পর্য্যন্ত নেই।

—তুমি শীলাকে, মিস্ রজার্সকে, এই দলের মধ্যে ফেল্‌তে চাও।

—হ্যাঁ, এবং এর খুবই উঁচু স্তরে। মিস্ রজার্স‌এর সাথে আমার কত গল্পগুজব হয়েছে, কিন্তু আমাকে তার প্রথম নামটি ধরে ডাক্‌বার সুযোগ একটিবারও দেয়নি। একদিন আমি এই নিয়ে বলেছিলুম, এত বড় গালভরা "মিস্ রজার্স" বলার চেয়ে শুধু "শীলা" বললে লোকের কষ্টের লাঘব হবে। তাতে উত্তর পেয়েছিলুম, জগৎ শুদ্ধ লোকের কষ্টের লাঘব করতে হ'লে যে আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাব! অথচ আমার নামের আগে "মিঃ" টা পছন্দ করে না বলে "যোশী" এই ডাকটুকু আদায় করে নিয়েছে।

মোহিত হেসে বল্‌লে, একতরফা বিচার ত হ'তে পারে না, যোশী...বাকীটাও আসবে শীগ্‌গীরই!

দুঃখসূচক একটা অস্ফুট শব্দ করে যোশী বল্‌লে, এ ত' আর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নয় যে যতই টান মারবে ততই অফুরাণ হয়ে বেরিয়ে আসবে।

উপমাটিতে ভয়ানক খুসী হয়ে মোহিত বল্‌লে, নামটা দিয়েছ ভালোই...তা' তুমি বুঝি অর্জ্জুনের সাথে ডুয়েল লড়্‌তে চাও?

—অর্জ্জুন থাক্‌লে ত লড়্‌ব!...এ পর্য্যন্ত কাউকে ও মন দিয়েছে বলে ত আমার বোধ হয় না!...তোমার দিকে একটু ঝুক্‌ছে বলে মনে হচ্ছে, তুমি এবার হাত গুটিয়ে নাও, আমি তোমায় দু'চারটে মন্তর শিখিয়ে দিচ্ছি।

যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে এম্‌নি সুরে মোহিত বল্‌লে, দরকার নেই যোশী, তোমার সাথে ডুয়েল লড়্‌তে হ'লে আমার এই মাছ ভাত খেকো শরীরটা চুরমার হয়ে যাবে একটি আঘাতেই!...তার চেয়ে বসে বসে সমুদ্রের শোভা দেখা অনেক ভালো।

যোশী বল্‌লে, কিন্তু তুমি ভুল বুঝছ, মোহিত! তোমাকে যদি মিস্ রজার্স বরণ করে নেয় তাহলে আমি একটুও ঈর্ষ্যান্বিত হব না, আমার বরং আনন্দ হবে এই দেখে যে আমারই একজন বন্ধু এই গর্ব্বিতা মেয়েটীকে মাটিতে লুটিয়েছে।

কথা হচ্ছিল দুজনের ইংরেজীতে। মিস্ রজার্সকে নিয়ে আলোচনা করতে দুজনে যখন মশগুল তখন হঠাৎ কানের কাছে মেয়েলি সুর একটি এসে বাজ্‌ল, সুপ্রভাত মিঃ সেন...

মোহিত চম্‌কে পেছন ফিরে দাঁড়ালে। যোশীও একটু লজ্জিত ভাবে তাকালে। ছিঃ ছিঃ মিস্ রজার্স বুঝিবা তাদের কথাগুলো শুনেছেন এবং মনে মনে না জানি কী ভীষণ ভাবে হেসেছেন!

মিস্ রজার্সএর সম্ভাষণের মধ্যে কিন্তু তার কোনই পরিচয় পাওয়া গেল না। হাসি মুখে মোহিতের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, আপনি আজ অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়েছিলেন বুঝি?

কথাটা খুবই সাধারণ—শুধু একটা কথোপকথনের অবতারণা করবারই চেষ্টা। তবু মোহিত একটু ঝাঁঝের সহিত জবাব দিলে, ছোট্ট ছেলের মত ভোর বেলায় উঠেই আকাশের লালিমা দেখ্‌বার জন্য পাগল হওয়াটা আমি সুধীজনোচিত মনে করি না মিস্ রজার্স!...মিস্ রজার্স ত' অবাক্। তবু আবার হেসে প্রশ্ন করলে, আপনার কালকের রাগটা বুঝি এখনও পড়েনি?

মোহিত কোন জবাব দিলে না। যোশী মোহিতের হয়ে বল্‌লে, রোদ যেরকম বাড়্‌ছে তাতে আমার বন্ধুটির রাগ কম্‌বার ত কোনই সম্ভাবনা দেখ্‌ছিনা, মিস্ রজার্স...

মিস্ রজার্স একটু অনুতপ্ত সুরে বললে, আসলে কিন্তু অন্যায়টা হয়েছিল আমারই যোশী। বাবা যে ভাষা ব্যবহার করেন সেটা আমার মুখে আনাই উচিত হয় নি। আমাকে কী এর জন্য ক্ষমা করতে পারবেন না মিঃ সেন।

মোহিত মিস রজার্সএর কথায় একটু বিব্রত হয়ে বললে, আমি ঠিক রাগ করি নি মিস্ রজার্স, আমার তরুণ মনের সবুজের উপর একটুখানি কালোছায়া এসে পড়েছিল মাত্র।

যা হোক, আমার মনের সব গ্লানি এখন কেটে গেছে।

মিস রজার্স ভয়ানক ভাবে খুসী হয়ে মোহিতের হাতটি ধরে বললে, তাহলে আমরা এখন বন্ধু কেমন?

মোহিত মিস রজার্স এর করস্পর্শে সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ল। স্বাধীন দেশের আদবকায়দা আবহাওয়ার সাথে সে তখনও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, তাই লীলা রজার্স এর আবেগ ভরা আহ্বানের সে কোন উপযুক্ত উত্তর দিতে পারলে না, একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

মিস রজার্স চকিতের মধ্যে মোহিতের মনের বিতৃষ্ণাটুকু বুঝে নিয়েছিল। সে নিজের এই প্রগলভতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললে, অবিশ্যি আপনি যদি এখনও রাগ করে থাকেন তাহলে আমার বলবার কিছুই নেই।

মোহিত শশব্যস্তে বলে উঠ্‌ল, না, না, আমি রাগ করিনি এখন, তবে…

যোশী এতক্ষণ চুপ করে এদের কলহ লীলা দেখছিল। সে মোহিতের কথাটুকু পূর্ণ করে বললে, তবে বন্ধুত্ব মানে যদি এরকম প্রগলভতা হয় তাহলে মোহিতের আপত্তি আছে।

মোহিত ভয়ানক ভাবে অপ্রস্তুত হয়ে মুখচোরার মত বললে, না; না, আমি তা বল্‌তে যাচ্ছিলুম না। আমি বলছিলুম এই যে "আমরা বন্ধু হব" এ রকম গৌরচন্দ্রিকা করবার ত কোনো দরকার নাই! আমাদের মধ্যে বন্ধুতা যদি সত্যই গ'ড়ে উঠবার হয় তা হ'লে তা উঠ্‌বেই, তার জন্যে কোনো রকম আয়োজন করবার দরকার হবে না।

মিস্‌ রজার্স বল্‌লে, তা' মানি। কিন্তু তার আগে কৃত্রিম ব্যবধানগুলো দূর করে দেওয়া উচিত নয় কি?…ভুল বোঝার সম্ভাবনা ত' আছে, শুধু আছে কেন, হয়েছেও—তাই সে সব হওয়ার সুযোগ আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া দরকার নয় কী?

মোহিত এর উত্তরে কী বল্‌বে খুঁজে পাচ্ছিল না। যোশী তার হয়ে জবাব দিলে, সব খোলাখুলি ত' এখন হয়ে গেছে, লাইন্‌ ক্লিয়ার, সিগ্‌নেল্‌ ডাউন…এখন বন্ধুত্বের রকেট্‌ চালিয়ে দাও…দেখ কোথায় গিয়ে ঠেকে!

মিস্‌ রজার্স একটু তর্জ্জন করে বল্‌লে, তুমি ভয়ানক উদ্ধত ছেলে, যোশী…আরেকটু হলেই আমি তোমার সাথে আড়ি করতুম, কিন্তু তাহ'লে মিঃ সেন দুঃখিত হবেন বলে আজও সেটা মুলতুবী রাখ্‌লুম।

যোশী একটুখানি কুর্ণিশ করার ভঙ্গীতে বল্‌লে, ধন্যবাদ, মাদামোয়াসেল্‌…

সেদিন বিকালবেলা চা খাবার পর মোহিত চুপ করে বসে Sherlock Holmes-এর গল্প পড়্‌ছিল আর মনে মনে হাস্‌ছিল। যোশী গিয়েছিল জাহাজের কাপ্তেনের সাথে ভাব করতে আর জাহাজখানা আরব সাগরের কোন্‌ জল-রেখা বিদীর্ণ করে অগ্রসর হচ্ছে এই অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করতে। চিদম্বরম্‌ অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, আর ফাদার মাদারিয়াগা বোধ হয় শীকারের উদ্দেশে ঘুরছিলেন এদিক ওদিক কোথাও।

খানিকক্ষণ পরে শ্রান্তিবোধ করায় মোহিত বইটা মুড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর কী করা যায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মনে হ'ল একবার মিস্‌ রজার্স-এর সাথে খানিকটা গল্প করে আসা যায়। সকালবেলার আলোচনার পর তার মনের মেঘ অনেকখানি কেটে গিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে এই তরলভাষী হাস্যবিলাসনিপুণা মেয়েটির প্রতি তার বিতৃষ্ণা কমে আস্‌ছিল।

ফার্ষ্ট ক্লাস ডেকে এসে দেখে মিস্‌ রজার্স-এর প্রিয় স্থানটিতে কেউ নেই—দুটো চেয়ারই খালি। একটুখানি হতাশ হয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু কী মনে ক'রে পাশেই স্মোকিং-রুমে সে ঢুকল। দেখ্‌লে এক কোণে একটি টেবিল অধিকার করে মিস্‌ রজার্স একমনে কী লিখ্‌ছে।

লেখার সময় বিরক্ত করা উচিত নয় এই ভেবে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় আহ্বান শুনতে পেলে, মিঃ সেন…

বিস্ময়ের সহিত মোহিত অনুভব করলে যে, মিস রজার্স-এর এই ডাকে তার মনের মধ্যে পুলকের একটা ঢেউ খেলে গেল। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল।

মিস্ রজার্স হেসে জিজ্ঞেস্ করলে, বন্ধুর খোঁজে এসেছিলেন বুঝি ?

ফস্ করে মিথ্যা কথাটা মোহিতের মুখ দিয়ে বাহির হল না।—সে একটু ইতস্ততঃ করে বললে, না, এই আপনারই খোঁজে এসেছিলুম···

মিস্ রজার্স-এর মুখ আভায় দীপ্ত হয়ে উঠ্ল। বললে ঠাট্টা করছেন না ত ?

—না, সত্যি...

—তাহ'লে বসুন···

মোহিত পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলে। মিস্ রজার্স তার সাম্নের কাগজপত্রগুলো গুছাতে গুছাতে মোহিতের সেদিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললে, এগুলো আমার অবসর সময়ের ছেলেখেলা, মিঃ সেন। যখন কিছু কর্‌বার থাকে না আর শরীর আলস্যে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন এই কাগজগুলোর উপর আঁচড় কাটি...আমার বন্ধুরা অবশ্য এর মস্ত একটা গালভরা নাম দেন, বলেন এ নাকি আমার ডায়েরী···

মোহিত মিস্ রজার্স-এর কথার ভঙ্গী আর ছন্দ বেশ উপভোগ করছিল। মেয়েটির ব্রীড়ার অভাব থাকতে পারে, কিন্তু তার ব্রীড়াহীনতার মধ্যে একটা লীলায়িত স্বাচ্ছন্দ্য আছে যাকে উপেক্ষা করা চলে না।

বললে, ডায়েরী লেখা ত খুবই ভালো জিনিষ, মিস্ রজার্স···

একটু তাচ্ছিল্যের সুরে মিস্ রজার্স বললে, ছাই ভালো।···আমার ডায়েরী ত' আর আসল ডায়েরী নয়, এ হচ্ছে এলোমেলো কতকগুলো কথা বা ভাবের সমষ্টি...

মোহিত হেসে বললে, ঐখানেই ত ডায়েরীর যথার্থ মর্য্যাদা। যদি কাঠখোট্টা কতকগুলো ঘটনার সমাবেশ হ'লেই ডায়েরী হ'ত তাহ'লে জগতে বড় বড় চিন্তাশীলদের ডায়েরী আজ বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবে যেত।

ডায়েরীর কথাটা উল্‌টিয়ে নিয়ে মিস্ রজার্স প্রশ্ন করলে, আচ্ছা মিঃ সেন, আপনাকে যদি গুটিকয়েক প্রশ্ন করি তাহ'লে রাগ করবেন কি ?

—না, রাগ করব কেন ?

—তাহ'লে প্রথম প্রশ্ন করছি এই, আপনি আমাদের দেশের উপর ভয়ানকভাবে চটা, নয় কি ?

—চটা ঠিক বললে ভুল করা হবে, তবে আপনাদের সভ্যতার অনেকগুলো আচরণই আমার কাছে ভয়ানকভাবে মেকী ঠেকে। তাই যখন দেখি সে সব মেকী জিনিষ নিয়ে লোকে গর্ব্ব করছে তখন আমার প্রতিবাদের স্পৃহা জেগে ওঠে।

খুব শান্ত অথচ গভীরভাবে মিস্ রজার্স প্রশ্ন করলে, এ আপনার অন্যায় নয় কি ?

—অন্যায় কিসে ?

—আপনি আমাদের দেশের কীই বা দেখেছেন বা শুনেছেন। যা' কিছু আপনার অভিজ্ঞতা তা' পুঁথিপড়া, হয়ত বা একটা বিশিষ্ট মতবাদের পোষক এক শ্রেণীর পুঁথি তা'।···আপনি আগে থেকেই এ রকম সংস্কারান্ধ মন নিয়ে একটা দেশে যাচ্ছেন, এ কি আপনার শিক্ষা বা জ্ঞানের সহায়তা করবে ?

মোহিত জবাব দিলে, আমি সঙ্কীর্ণতা নিয়ে যাচ্ছি না, মিস্ রজার্স···আমার মধ্যে অন্ধভক্তির ছায়া নেই এইটুকুই আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।

হেসে মিস্ রজার্স বললে, তা' যদি হয়ে থাকে তাহ'লে আমার ঝগড়া কর্‌বার কিছু নেই—কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনি আপনার গলদ কোথায় ঠিক বুঝ্‌তে পারছেন না।··· আপনি যাকে অন্ধভক্তির অভাব বলছেন তাকে আমি বল্ অতি স্থূলত রকমের একটা গোঁড়ামি।···আমায় মা' করবেন, মিঃ সেন, কিন্তু মিস্ মেয়ো যদি তাঁর বই সম্বন্ধে বলে যে তিনি যা' বলেছেন তা' শুধু 'অন্ধভক্তির ছায়া তাঁর উপ পড়ে নি' এর পরিচায়ক, তাহ'লে আপনার রক্ত কি গর হয়ে উঠ্‌বে না ?

মোহিত এবার বলে উঠ্ল, আপনি কার সঙ্গে ক তুলনা করছেন, মিস্ রজার্স ? মিস্ মেয়োর সেই পঙ্কি আবর্জ্জনাময় গালিগালাজের কি তুলনা হয় কখনও ?

—মেনে নিলুম না হয় আপনার কথা। কিন্তু বাই থেকে আপনার এই অনভিজ্ঞ মন থেকে উৎসারিত ব শুনে যদি সাধারণ লোকে—আমাদের দেশের লোকে

আপনাকে সঙ্কীর্ণমনা ভাবে তাহ'লে তাদের কি অন্যায় হবে ?

অন্য সময় হ'লে হয়ত মোহিত এর তীক্ষ্ণ একটা জবাব দিত, কিন্তু আজ তার মুখ দিয়ে সেরকম কোন কথা বেরুল না। সে একটুখানি চিন্তিতস্বরে বল্‌লে, এটা অবশ্যি আমি ভেবে দেখি নি', মিস্ রজার্স···

হেসে মিস্ রজার্স বল্‌লে, আচ্ছা, আমার প্রথম প্রশ্নটির সমাধান ত একরকম হ'ল। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি করছি···আপনাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

মুহূর্ত্তের জন্য মোহিতের চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌ল, তারপর শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বল্‌লে, মাপ কর্‌বেন, ওটা হচ্ছে আমাদের গভীর অনুবেদনার বস্তু, তা নিয়ে আমি এখানে মতামত প্রকাশ করতে চাইনে' !

মলিন হাসি হেসে মিস্ রজার্স বল্‌লে, আমার গায়ের রং আর নাড়ীর রক্ত বোধ হয় আপনার স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দিচ্ছে !···কিন্তু আপনাকে বল্‌ছি, যতই অপ্রিয় হোক্ না কেন, আমি একটুও অসন্তুষ্ট হব না !···আর একটি কথা ভুলে যাবেন না, আমি স্বাধীন দেশেরই মেয়ে, স্বাতন্ত্র্য এবং সাম্যের মর্য্যাদা কী তা' আমার কাছে অজ্ঞাত নেই।

মোহিত আগেরই মত শান্তভাবে বল্‌লে, আজ থাক, আর একদিন বলব।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।···অস্তায়মান সূর্য্যের লাল রশ্মি স্মোকিং-রুমের জান্‌লা দিয়ে শীলা রজার্স-এর মুখের উপর এসে পড়েছিল, আর তার মুখ চোখ এক অপূর্ব্ব আলোকে প্রতিভাত হয়ে উঠ্‌ছিল। মোহিত একটুখানি মুগ্ধভাবে তার দিকে ক্ষণেকের জন্য তাকিয়ে ছিল, তার পর হঠাৎ যেন-ভয়ানক-একটা অন্যায় করেছে এম্‌নি একটা ভঙ্গীতে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিলে।

শীলা রজার্স স্তব্ধভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সূর্য্যের লালিমা দেখে বোধ হচ্ছিল যেন তার মনের কুঞ্জেও আবীর লেগেছে···ছোট্ট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়াল।

মোহিতও সাথে সাথে উঠে পড়্‌ল। শীলা একটুখানি হেসে বল্‌লে, আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট কর্‌লাম, আশা করি কিছু মনে কর্‌বেন না।

মোহিত একটুখানি মৃদুহাসি হাস্‌লে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবগোপাল দাস

শিল্প ও জীবন †

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শিল্পকলা জীবনের অভিব্যক্তি, পুষ্পিত বিকাশ। জীবন থেকে জীবনের শিরোমণি হয়ে ফুটে উঠেছে শিল্প। জীবন শিল্পকে জন্ম দিয়েছে, এই একদিকে—কিন্তু অন্যদিকে শিল্পও আবার জীবনকে জন্ম দিতেছে, জীবনের বিকাশে সহায়তা করে চলেছে, জীবনের মধ্যে পরিবর্ত্তনের পুনর্গঠনের সম্ভাবনা এনেছে। *

তবে অনেকে হয়ত কথাটা স্বীকার করতে চাইবেন না। তাঁরা বলবেন শিল্প ও জীবনকে যতদূর সম্ভব আলাদা করে, পরস্পরের অস্পৃশ্য করে রাখাই যুক্তিযুক্ত। উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল বড় জোর যেন সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ—অর্থাৎ একান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই উভয়ের পক্ষে মঙ্গল—পরস্পরের সামীপ্যের প্রভাবের ফলে প্রকৃতি হারায় তার সাম্য, হয়ে পড়ে চঞ্চল পঙ্কিল,—আর পুরুষেও এসে দেখা দেয় অজ্ঞান্ সম্মোহ। অন্য কথায় চারুশিল্প সুন্দর (beautiful) না হয়ে, হয়ে পড়ে লাভের ব্যবহারের জিনিষ (useful)—অহেতুক আনন্দের বস্তু না হয়ে, হয়ে পড়ে উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়মাত্র, সে উদ্দেশ্য যতই সাধু হোক না কেন; শিল্পী রসিক না হয়ে, হয়ে পড়েন প্রচারক। শিল্পকে জীবনের সাথে জুড়ে দিয়ে, জীবনের সেবক, তল্পীদার করে তোলবার প্রচেষ্টাকেই La Trahison des clercs (বাণী-সেবকদের বিশ্বাসঘাতকতা) নাম দিয়ে Julien Benda এই কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী সাহিত্যমহলে বিষম সোরগোল তুলেছিলেন। আর আজকালকার রুশের সমস্ত সোভিয়েট সাহিত্যের শিল্পকলার বিরুদ্ধে এই অভিযোগই আনা হয়েছে। তা ছাড়া, জীবনের সাথে শিল্পকে জড়িয়ে মিশিয়ে ফেললে যে কেবল শিল্পের মুণ্ডপাত হয় তা নয়, জীবনও তাতে হয়ে পড়তে পারে খঞ্জ পঙ্গু, দুর্ব্বল অক্ষম। এই আশঙ্কার জন্যই যাঁরা সাহিত্যিক স্বপ্ন দিয়ে জগৎকে সংস্কার করবার বা গড়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁদের কাজে অনেকে সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিতে পারে না। † তবে একথাও বলা হয় কবি-রাজ্য কবিদের স্বপ্ন, মানসিক বিলাসই বেশীর ভাগ—বাস্তবে সত্যসত্যই তার সাথে সাক্ষাতের আশঙ্কা বা ভরসা খুব কম।

জীবন ও শিল্প হ'ল দুটি বিভিন্ন স্তরের বা ক্ষেত্রের জিনিষ। পারতপক্ষে স্বীকার করা যেতে পারে তারা যেন দুটি সমান্তরাল রেখা, পাশে পাশে চলেছে বরাবর, কিন্তু কোথাও পরস্পরকে স্পর্শ করে না, এতটুকুও মিলে যায় না—এক বোধহয় পরিশেষে অনন্তের মধ্যে গিয়ে ছাড়া। শিল্পের উৎপত্তি জীবন থেকে নয়, জীবনের প্রেরণাও সাহিত্যের মধ্যে নয়। উভয়ের জন্ম আলাদা, লক্ষ্য আলাদা, ধর্ম্মকর্ম্ম আলাদা।

শিল্প ও জীবনে এই দ্বৈধ বৈপরীত্য যদি থেকেই থাকে, তবে তার কারণ ও-দুটিকে তাদের সত্যকার স্বরূপে না দেখে, দেখা হয়েছে ওদের একটা সঙ্কীর্ণতর বাহ্যতর রূপে জীবনকে মূলতঃ প্রধানতঃ ধরা হয় প্রাকৃত (অর্থাৎ পাশব বৃত্তির অদম্য লীলাখেলা হিসাবে, যাকে ব্যর্থভাবে অসহা ভাবে নিয়ন্ত্রিত বশীভূত করে-রাখবার চেষ্টা হয়েছে কতকগুলি

* ফরাসীরা বলে থাকেন বালজাকের সমাজ—বিশেষতঃ তাঁর Femme de Trente ans (ত্রিশ বছরের মেয়ে) ফরাসী দেশে বাস্তবিক দেখা দিয়েছে বালজাকের পরে। ঐ ফরাসীদেশেই আর একজন বা এক সম্প্রদায় শিল্পীর সম্বন্ধে কথা আছে যাঁরা মেয়েদের আঙুল এক বিশেষ গড়ন দিয়ে আঁকতেন—পরবর্ত্তী পুরুষে দেখা গেল সত্যসত্যই অনেক মেয়ের আঙুল ঐ রকম গড়ন পেয়েছে।

† বিগত মাঘ মাসে ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

† জাপানে রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে কিছু বাধা পেয়েছিলেন।

রীতিনীতি, মনগড়া বিধিব্যবস্থার সহায়ে। আর শিল্পকেও মোটের উপর বিবেচনা করা হয় কেবল চিত্তবিনোদনের সামগ্রী, জীবনের রূঢ়তা তিক্ততা হতে ক্ষণকালের মুক্তি, আরাম—কল্পনার, খোসখেয়ালের, স্বপ্নবিলাসের লাস্য—একেবারেই অহেতুক আনন্দের উচ্ছ্বাস, একান্ত অপ্রয়োজনের অব্যবহার্য্যের অতিরিক্ততা। কিন্তু জীবনকে ও শিল্পকে এভাবে কোথাও কোথাও বা সচরাচর দেখা হলেও তা সত্য দেখা কি পূর্ণ দেখা নয়; উভয়ের মধ্যে যে কেবল অন্যোন্যাভাবেরই সম্বন্ধ থাকতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা কিছু নাই।

শিল্প ও জীবন যদি পরস্পরকে স্পর্শ না করেই বরাবর চলতে থাকে—তাদের মিলবার মিশবার সম্ভাবনা এক যদি থাকে কেবল অনন্তের মধ্যে, তবে ত সমস্যাটি সমাধানের ইঙ্গিত স্পষ্ট রয়েছে ঐখানেই—শিল্পকে অনন্তের চেতনায় উন্নীত করে ধরতে হবে, জীবনকেও গড়তে হবে ঐ অনন্তেরই অনুপ্রেরণায়।

শিল্প সম্বন্ধে কথাটি হয়ত একান্ত অভিনব বা অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ শিল্পের স্বরূপই বলা হয়ে থাকে একটা কিছু আনন্ত্যের অভিব্যক্তি—অন্ততঃ অধিকাংশ শিল্পীশ্রেষ্ঠেরাই একথা বলে থাকেন। জীবনের সাথে শিল্পের বিরোধও ঠিক এই দিক দিয়ে—কারণ, জীবনের কারবার হল ক্ষুদ্রকে খণ্ডকে সসীমকে নিয়ে আর ক্ষুদ্র খণ্ড সসীমভাবে। সব কবিরাই চেয়েছেন জীবনের এই গণ্ডী ভেঙ্গে, এই বাস্তবতা ছিঁড়ে একটা কিছু গভীরতর বৃহত্তর বস্তুকে আবিষ্কার করতে, প্রকট করতে। তথাকথিত অতি আধুনিকেরাও ক্ষুদ্রকে বাস্তবকে তুচ্ছকে নিয়ে যতই মত্ত থাকুন না, তাঁদেরও সৃষ্টি শিল্পরসে অমৃতায়িত হয়ে উঠেছে তখনই—তাঁরাও অনেকে একথা স্বীকার করেন—যখন তার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে একটা কিছু আনন্ত্যের দ্যোতনা, একান্ত ইন্দ্রিয়-পরিচ্ছিন্ন নয় এমন কোন চেতনার বা শক্তির বা সত্তার ইঙ্গিত। আর জীবনকেও কেবল লোকায়ত-জীবন করে রাখাই সর্ব্বত্র একমাত্র কর্ত্তব্য ও সম্ভাব্য বলে বিবেচিত হয় নাই। জীবনকেও সেই আনন্ত্যের সুরে ও ছাঁদে গড়ে তোলবার চেষ্টাই হল আধ্যাত্ম-সাধনার নিগূঢ় মর্ম্ম। নীতির সদাচারের সাময়িক সঙ্কীর্ণ শৃঙ্খলা নয়, কিন্তু পরম মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বিধৃত দিব্য ছন্দই অধ্যাত্মের লক্ষ্য।

কবি হিসাবে যিনি মহান শ্রেষ্ঠ, জীবনের ক্ষেত্রে তাঁকে দেখি অতি সাধারণ, এমন কি সাধারণেরও নীচে হয়ত। অবশ্য জীবনে তুচ্ছ হলেও, শিল্পীর শিল্পমহত্ত্ব তাতে কিছু খর্ব্ব হয় না—শিল্পীর জীবনকে ভুলে দেখা উচিত কেবল তাঁর শিল্পকে। কথাটি ঠিক—কিন্তু এতে শিল্পীর অন্তরাত্মার একটি রহস্যকে, শিল্পসৃষ্টির একটি পূর্ণতর অভিব্যক্তির সম্ভাবনাকে আমরা অবহেলা করি।

শিল্পী তাঁর শিল্পের মধ্যে যে সত্যের সুন্দরের সন্ধান পেয়ে থাকেন অর্থাৎ যে চেতনার বলে তিনি রূপদ্রষ্টা ও রূপস্রষ্টা, তাকে শুধু ক্ষণিকের নয় কিন্তু সর্ব্বদার, স্বপ্নের কল্পনার ভাবের নয় কিন্তু জাগ্রতের, চঞ্চল নয় কিন্তু স্থির, ব্যতিক্রম নয় কিন্তু স্বাভাবিক করে তোলাই হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। জীবনকে গঠিত শাসিত করবার জন্য, সার্থক করবার জন্য যে সকল রীতিনীতি বিধিব্যবস্থা সাধারণতঃ আশ্রয় করে চলা হয় দেখি, শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রায়ই তা যথেষ্ট উদার গভীর বা সমুচ্চ বলে বোধ হয় না—বরং মনে হয় জীবনের বৃহত্তর নিবিড়তম অভিব্যক্তির পক্ষে অন্তরায়। সেই জন্যই অনেক শিল্পী, যাঁদের চেতনা একটা লোকোত্তর সত্যের সুন্দরের প্রভাবে পরিপ্লুত, একটা বৃহৎ মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্যে লীলায়িত, তাঁরা জীবনের পরিচিত শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলেন, তাঁদের প্রাণ সাধারণ সর্ব্বজনসম্মত ছাঁচের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। বহু কবি শিল্পীরাই জীবনের স্বাভাবিক কাঠামকে ভেঙ্গেছেন বা ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছেন—তাঁদের সৌন্দর্য্যরচনার মধ্যেও তাঁদের এই প্রয়াসের ও আকৃতির দোল ফুটে উঠেছে; কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে নূতন চেতনার অনুরূপ নূতন ছাঁচ গড়বার প্রতিষ্ঠা করবার কৌশল বা সাধনা তাঁরা আয়ত্ত করেন নাই। আবার অবশ্য এমন শিল্পীও আছেন যাঁরা শিল্পের দিক হতে লোকোত্তর দ্রষ্টা স্রষ্টা হয়েও অন্তর্দিকে—বাস্তবে কর্ম্মায়তনে—সাধারণ নৈমিত্তিকতার গড্ডালিকা প্রবাহে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন, তার বিধিব্যবস্থা সব মেনে নিয়ে চলেছেন—যেমন, শেকসপীয়র স্বয়ং।

অন্তরে লোকোত্তর শিল্পদৃষ্টি, বাহিরে স্থূল প্রাকৃত-দৃষ্টি—শিল্পীর এই দুটি দিক কোনরকমে না মিশে একেবারে পৃথক হয়ে থাকতে পারে। শিল্পী যখন সৃষ্টি করেন তখন একটা একান্ত অন্তর্মুখী সমাধির অবস্থায় তাঁর অন্য সত্তাটি সম্পূর্ণ ভুলে হারিয়ে ফেলতে পারেন; আবার সহজ জীবনে যখন ফিরে আসেন তখন তাঁর কবিসত্তাকে তাকের উপর তুলে রাখতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় এরকম সম্ভব হয় না—ঐ দুটি দিকের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হতে থাকে, এবং ওদের মধ্যে যদি একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয়, তবে সংঘর্ষ ঘটে। তার ফলে জীবনে যে কেবল ব্যর্থতা আসে তা নয়, শিল্পশক্তিও অনেক সময় ক্ষুণ্ণ খর্ব্ব হয়ে পড়ে।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যে এই রকম একটা কিছু ঘটেছিল বলে কেউ কেউ নির্দ্দেশ করে থাকেন। অবশ্য ব্রাউনিং যে অপরাধের উল্লেখ করেছেন—একমুঠি সোনার জন্যে আমাদের দিশারী আমাদেকে ছেড়ে গেলেন—সেটি স্থূল কথা; পদ অর্থ মান সম্ভ্রম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভনে যদি কবির পদস্খলন হয়ে থাকে, তবে সেটি একটি সূক্ষ্মতর অধঃপতনের প্রতীক। কবি তাঁর কবিচেতনায় পেয়েছেন যে উপলব্ধি, যে সত্যের সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ স্পর্শ, শিল্প-হিসাবেও তার সম্যক প্রকাশের রূপায়নের জন্য অনেক সময়ে দেখা যায় কেবল বাঙমানসের সাড়া ও সাহচর্য্যই যথেষ্ট নয়—প্রয়োজন হয় প্রাণের শারীরচেতনার পর্য্যন্ত অনুমতি ও সহযোগ, আর প্রাণ এবং শরীর নিয়েই ত জীবন। অন্য কথায়, সমগ্র জীবনটি যখন কোন না কোন রকমে মূল শিল্পীচেতনায় অনুপ্রাণিত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখনই শিল্পটির সম্যক স্ফুরণ সম্ভব। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিদৃষ্টি যখন তাঁর জীবনধারায় উন্মুক্ত পথ না পেয়ে কঠিন প্রতিবন্ধকে ব্যাহত প্রতিহত হয়ে পড়ল—তাঁর মনের প্রাণের দেহের সঙ্কীর্ণতা সংস্কার অসাড়তা যখন তাঁর ঊর্দ্ধতর চেতনাকে প্রত্যাখ্যান করে চলল তখনই তাঁর কাব্য-অনুপ্রেরণার উৎসও বিশুষ্ক হয়ে এল। কেবল ওয়ার্ডসওয়ার্থ কেন, আমার মনে হয় অনেক শিল্পীই, যাঁদের সম্বন্ধে বলা হয় তাঁরা could not speak out—তাঁদের মুখ ফুটল না—এই এক কারণে ব্যর্থকাম হয়েছেন।

জগৎকে জীবনকে একটা উত্তর চেতনার মধ্যে রূপান্তরিত করে দেখা সকল শিল্পীরই সহজাত অবশ্যম্ভাবী বৃত্তি বলে মনে হয়। এই আদর্শপরায়ণতাই শিল্পীকে কখন দৃশ্যমান স্থূলের রূঢ়তা ক্ষণিকতা ছাড়িয়ে unheard melodies, Elysian fields, magic casements প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিয়েছে—কখন বা এই জগৎটিকে ভেঙ্গে চুরে প্রাণের মত করে গড়বার প্রেরণা দিয়েছে কিংবা এ সকল চেষ্টা নিরর্থক ভেবে একে শুধু কষ্ট করে সহ্য করে যেতে বলেছে—in this harsh world draw thy breath in pain—অথবা এরই মধ্যে ডুবে গিয়ে এরই থেকে একটা কিছু তীব্র অসাধারণ আনন্দ আবিষ্কার করতে উদ্যুক্ত করেছে। এই আদর্শ-পরায়ণতাই যে শিল্পীর কেবল বিষয়বস্তুর ব্যাপার, শিল্পীর শিল্পরচনার তারতম্য ওদিক দিয়ে হয় না—এমন কথা বলা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ এই আদর্শপরায়ণতাই শিল্পীকে দিয়েছে তাঁর ছন্দের দোল, তাঁর রূপায়নে প্রাণাবেগ। এই আদর্শপরায়ণতারই অন্য নাম কবি-দৃষ্টি।

শিল্পীকে যতখানি মনে করা হয় অথবা শিল্পী নিজেই যতখানি মনে করেন যে জীবনলীলায় তিনি রয়েছেন কেবল সাক্ষীগোপালের মত, তাঁর একান্তবাসে সমাহিত, বাস্তবিক পক্ষে ততখানি তিনি তা নন। হাতে হাতিয়ারে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে আর পাঁচ জনার মত নেমে না যেতে পারেন, কিন্তু যে-সকল শক্তি বা বৃত্তি জীবনকে কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করে, তাদের সাথে তাঁর রয়েছে একটা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ, এবং এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, এই নিভৃত সহজ সংযোগ রয়েছে বলেই তিনি হতে পেরেছেন কবি—দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। শুধু শিল্পী হিসাবে অর্থাৎ জীবনের ভাব নিয়ে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা না হয়ে, জীবনের বস্তু নিয়েও দ্রষ্টা ও স্রষ্টা হয়ে ওঠা আর একটি ধাপের অপেক্ষা মাত্র।

জীবনের সাথে শিল্পের যে কতখানি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তার কিছু পরিচয় পাই ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনায় যখনই দেখি জীবনে নূতন জোয়ার দেখা দিয়েছে, প্রাণে ফুটে উঠেছে নূতন সামর্থ্য, কর্ম্মায়তন যখন সমৃদ্ধ, তখন কি দেখা দেয় নাই যাকে বলা হয় শিল্পের স্বর্ণ যুগ

প্রাচীন গ্রীসে পেরিক্লিস্‌র যুগ, রোমে অগস্তের যুগ—রেণাসেন্সের ইতালীতে দশম লেও'র যুগ, ইংলণ্ডে এলিজাবাথের যুগ, ফরাসীদেশে চতুর্দ্দশ লুই'র যুগ—ভারতে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের যুগ প্রভৃতি কি একই সত্যের প্রমাণ নয়? আর আমাদের এই অভিশপ্ত (?) বর্ত্তমান যুগেও শিল্পজগতে দেখছি যে বিপুল বহু প্রয়াস, নূতনের অভিনবের বিচিত্রের আবিষ্কার-অভিযান, তারও মূলে নাই কি জীবনেরই ক্রমবর্দ্ধমান আবেগ আকাঙ্ক্ষা আশাভরসা?

জীবনপ্রবাহে তরঙ্গমালার উতলে কেবল নয় পরন্ত নিতলেও যে শিল্পীর আবির্ভাব কোথাও কখন হয় না, তা নয়—তবে সেটা ব্যতিক্রম মাত্র। বেওশিয়া'র (Boeotia) মত দেশে পিন্দার, আর মধ্যযুগের একেবারে মধ্যভাগে দান্তে—দেখায় যেন নিবিড় আঁধারের কোলে বিজলী-চমক; কিন্তু এ হ'ল ব্যক্তিগত প্রতিভার কথা—দুই একটি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় শিল্পীজ্যোতিষ্ক, ধূমকেতুর মত, এভাবে অপ্রত্যাশিত দেশে ও কালে প্রকট হতে পারে, কিন্তু তাঁরা যেন মানবচেতনার ক্রমবিকাশের যে প্রধান কক্ষা তার কিছু বাইরে—(কতকটা হয়ত intervention বা আকস্মিক অবতরণের মত, ঐ বিকাশেরই কাজ এগিয়ে দেবার জন্য)।

জীবনের সাধক হলে যে শিল্পসাধনায় এসে পড়বে খাদ মিশ্রণ অধঃপতন, এমন আশঙ্কা অমূলক। বরঞ্চ তাতেই শিল্প হয়ে উঠতে পারে মহত্তর—শিল্প-হিসাবেও সত্যতর সুন্দরতর। যখন গীতাকারের মুখে শুনি

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্

—কিংবা উপনিষদ ঋষির

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি—

তখন তা'তে কেবল অধ্যাত্ম-গৌরব নয়, কবিত্বেরও পাই রসোৎকর্ষ।

জীবন-সাধক অর্থই ত এই তিনি তাঁর সমস্তখানি, তাঁর দেহপ্রাণমন দিয়ে এক পরম সত্যকে সৌন্দর্য্যকে ব্যক্ত করতে প্রয়াসী—সত্যের সৌন্দর্য্যের নিবিড়তম রহস্যকে তিনিই পূর্ণতরভাবে অধিগত করেছেন। সুতরাং তিনি যদি বিশেষ শিল্পসৃষ্টিতে ব্রতী হন, তাঁর উপলব্ধি বা চেতনা যদি বাঙ্ময়, ধ্বনিময়, বর্ণরেখাময় হয়ে উঠতে চায়, তবে তাঁরই হাতে শিল্প লাভ করে না কি তার পরাকাষ্ঠা?

আধুনিকতার, অতি-আধুনিকতার প্রধান দুর্ব্বলতাই এইখানে যে মানুষের একটা সঙ্কীর্ণ অংশ, বাহ্যবৃত্তি দিয়ে শিল্পসৃষ্টি করতে সে চেয়েছে—প্রধানতঃ তার মগজ, তার স্নায়ব অনুসন্ধিৎসা দিয়ে। সকল শিল্পই অবশ্য মানস সৃষ্টি—কিন্তু শিল্পীশ্রেষ্ঠদের মধ্যে দেখি তাঁদের মানস (সৃষ্টিকালে অন্ততঃ) তাঁদের জীবনের সমগ্রতাকে আপনার মধ্যে যেন তুলে নিয়েছে। আধুনিকের মানসসৃষ্টি কেবলই, একান্তই মানস—মানুষের আর সব অংশকে নিজের বাহিরে রেখে, দূরে থেকে শুধু দেখেছে পরীক্ষা করেছে। তাই আধুনিকতার মধ্যে দুর্লভ সামর্থ্য, সজীবতা, সত্যের একটা মৌলিক মহিমা।

ভবিষ্যতের শিল্পীকে প্রথমে ফিরে যেতে হবে চেতনার সমগ্রতার মধ্যে, সমস্ত আধার দিয়ে উপলব্ধ সত্যের সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হবে শিল্প। প্রাচীন শিল্পীতে এই সমগ্রতা ছিল ভাবগত, অন্তরাত্মার একটি একাগ্রতার ফল। কিন্তু এই সমগ্রতা যদি হয় বস্তুগত অর্থাৎ মানুষ হিসাবে আধারে জীবনে শিল্পীর সত্য যদি মূর্ত্ত হয়ে উঠে, তবে তাতে শিল্পও পাবে এক অভিনব মাহাত্ম্য। কেবল কাগজে কলমে নয়, সেই সাথে ক্রিয়া কর্ম্মেও শিল্পী তাঁর শিল্পপ্রেরণাকে মূর্ত্ত করে চলতে পারেন—ভবিষ্যৎযুগের শিল্পীর পথই হবে তাই। শিল্প হিসাবে শিল্পীর পথ এক, জীবন-সাধক হিসাবে পথ তাঁর আলাদা—এ ব্যবস্থার মূল্য তখন আর থাকবে না। কারণ, শিল্পীর শিল্প হবে তাঁর জীবনসাধনার অভিব্যক্তি—যে সত্যকে সুন্দরকে জীবন চায় শরীরী করতে তারই এক একটা প্রতিরূপ গড়ে তুলতে বিভিন্ন শিল্পের বিভিন্ন কাঠামো। তা ছাড়া, এখনও—চিরকালই কি শিল্পী তাঁর জীবনের সাধনাকে, অর্থাৎ জীবনের গভীরতম উপলব্ধিকে, আকুতিকেই রূপ দিয়ে চলছেন না?

তবে ভবিষ্যতের শিল্পী এই জীবন সাধনা সজ্ঞানে ত করবেনই, তাঁর লক্ষ্যও হবে চরম পরম সাধ্য একটা কিছু—পূর্ব্বে আমরা যে বলেছি, আনন্ত্যের মহিমা। এখনকার শিল্পীর মধ্যে রয়েছে যে দ্বৈধ বা আত্মবিরোধ, তার

পরিবর্ত্তে শিল্পী আপনাতে পাবেন অখণ্ড ঐক্য, তাঁর প্রকৃতি দ্বিচারিণী না হয়ে, হয়ে দাঁড়াবে অচ্ছিদ্রা একনিষ্ঠা অনন্যভাজা।

তাতে শিল্পকে হয়ত পুরাতনের অনেক রস ও রূপ বর্জ্জন করে, অতিক্রম করে চলে যেতে হবে—কিন্তু বিবর্ত্তনের ক্রমোন্নতির নিয়মই এই। ভবিষ্যতের শিল্পী অতীতের প্রাকৃত বৃত্তি নিয়ে যদি না'ই আর লিখতে পারেন—

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus...
Da mihi basia mille deinde centum,
Deinde—* (Catullus)

* "এস প্রিয়ে, আমরা বেঁচে থাকি শুধু তুমি আমাকে ভালবাসবে, আমি তোমাকে ভালবাসব বলে। দাও আমাকে সহস্র চুম্বন, দাও আরও শত, আরও…

কিংবা,
I fear thy kisses, gentle maiden,
Thou needest not fear mine— (Shelley)

তাতে তাঁর শিল্পশক্তি কিছু খর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে না। তাঁর চেতনা যদি পেয়ে থাকে জীবনের উর্দ্ধতর, বৃহত্তর, গভীরতর গতি ও বৃত্তি, তাঁর শিল্পেও ধরা দিবে লোকোত্তর চলন ও বলন।

কবির আদি অর্থ ছিল ঋষি। এই দুয়ের মধ্যে ভেদ ক্রমেই বেড়ে চলে এসেছে। কিন্তু এখন কবিকে আবার ফিরে আর্ষ চেতনায় উঠতে হবে নব যুগের নব সৃষ্টির জন্য। জীবনের সাধনায় যে ঋষি—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মভূত—শিল্পের রচনায় তিনিই হবেন পরম কবি।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

স্পর্শমণি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নীল আকাশের নিটোল গায়ে তারার কুসুম যেথায় রাজে,
নীল সাগরের অতল জলে মুক্তা ধবল দ্বীপের মাঝে,
তুষার-গলা অভ্রভেদী পাহাড়তলীর ঝরণা পরে,
কুজ্ঝটিকার তিমির ভেদি সোণার কিরণ যেথায় ঝরে,
বেড়াও সেথায় বন্ধু আমার নিত্য নূতন কাব্য গেঁথে;
তোমার পায়ের পরাগ পেয়ে বিশ্বভুবন উঠ্‌ছে মেতে।

অচীন্ পাখীর রজতপাখায় ঝিলিক্ লাগাও কল্পলোকে,
সুরমা লাগাও স্বপন ছুঁয়ে ঘুমিয়ে-থাকা পরীর চোখে;
বৈতরণীর তপ্তনীরে স্নেহের খেয়া ভাসিয়ে দিয়ে,
পার ক'র যে শেষবেলাতে পারের কড়ি নাইক নিয়ে।
যাত্রীগণের হতাশ মনে নবীন আশার জাগাও সুর,
পিছন পানে কাঁদ্‌ছে যারা তাদের নিরাশ করছো দূর।

গ্রহদলের নৃত্য তালে তোমার বাঁশীর মোহন ধ্বনি,
বাজ্‌ছে যে গো রাত্রিদিবস মুগ্ধ রহে করাল-ফণি।
উষার ভালে দিচ্ছ সিঁদুর, রাতের গলায় চন্দ্রহার,
রবির রথের তুরগ চালাও ঘুচিয়ে ধরার অন্ধকার।
ঝড়ের সাথে মাত্‌ছো তুমি সরিৎপতির বাহ্‌নাতে
তোমার রূপের পাই যে আভাস তড়িৎবধূর আর্‌নাতে।

সরিৎবুকে জ্বালাও আগুন, ফলের ভিতর রাখ্‌ছো বারি,
পুষ্পদলে পাই যে তোমার হৃদ্‌জুড়ানো সুধার ঝারি,
তরুর সনে লতার বাঁধন দিচ্ছ মিলন রাখীর ডোরে,
আমার প্রেমের প্রকাশ কর তোমার প্রেমের পরশ করে,
ছাপিয়ে আমার পরাণখানি পড়ুক তোমার শান্তিজল,
সকল জ্বালা জুড়াও সখা পাই যেন গো পরম বল।

বিচার

শ্রীমতী হেমবালা বসু

১

ফুলজান বিবি বিধবা হইয়া যখন বারো বছরের ছেলে মাণিককে লইয়া বাপের বাড়ী আসিল, রহিম তখন বুঝিতে পারে নাই যে সেজন্যে তাহাকে অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে; তার গৃহ শূন্য, বাড়ীতে আর কেহ ছিল না; সেই শূন্য গৃহ পূর্ণ করিয়া মেয়েটি যখন ছেলে নিয়া রহিল, এই শোকের ভিতরেও রহিম একটু স্বস্তি অনুভব করিল; তবু ও সে একবার বলিল, 'আর কি সেখানে যাবি না জান? স্বামীর ঘর ছেড়ে দেওয়া উচিত হ'বে কি মা? সেখানকার ক্ষেত খামার, কুঁড়ে খানার মালেক তো এই মাণিক!'

ফুলজানি উত্তর দিল, 'না বাবা, আর সেখানে যাব না: সে সব ক্ষেত খামার কবে সরিকরা দখল করেছে, তার জন্যে দাঙ্গা করতে ইচ্ছে করে না আর; তোমার সেবা আর মাণিককে মানুষ করা এখন এই তো আমার কাজ বাবা! নসীবে থাকলে মাণিক অমন কত জমি করতে পারবে, তার জন্যে ভাবি না। খোদা ওকে জীইয়ে রাখুন!'

রহিমের অবস্থা মন্দ ছিল না, মেয়ে ও নাতিটির মুখ চাহিয়া সে দ্বিগুণ উৎসাহে চাষ করিতে লাগিল। ফুলিও ফসল ঝাড়া তোলা, রান্না-বাড়া প্রভৃতি সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকিয়া স্বামী শোক ভুলিতে সচেষ্ট হইল; সে পড়শীদের বাড়ী যায় না, কারো সঙ্গে কথা বলিতেও চায় না। পাড়ার মহম্মদ মইজুদ্দিন প্রভৃতি যুবকেরা ফুলির এই নীরবতা পছন্দ করিল না, তার শোক নিবারণের জন্যেও তাহারা বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িল; পথে, ঘাটে দাঁড়াইয়া তারা ফুলির সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল, ফুলি যে তা'দের একজনকে নিকা করিলে মনের সুখে থাকিতে পারে, ইহাও জানাইতে কসুর করিল না; ফলে ফুলজানির ঘাটে পথে যাওয়া বা পিতার অনুপস্থিতির সময় বাড়ীতে একলা থাকা মুস্কিল হইয়া উঠিল; যেদিন সে সারা রাত ঘরের পেছনে শিসের শব্দ ও গান শুনিতে পাইল, তার পর দিনই পিতাকে বলিল, 'এখানে থাকা আমার হ'বে না বাজান, যে জন্যে মীরপুর ছেড়ে এসেছি, এখানেও তাই—চল, আমরা আর কোথাও যাই!'

বৃদ্ধ রহিম সবই বুঝিত, কিন্তু একলা প্রাণী এতগুলি কুলোকের সঙ্গে বিবাদ করিতে সাহস পাইত না; নিরুপায়ের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে মেয়ের কথার জবাব দিল, 'বাড়ী ঘর ছেড়ে কোথায় যাব মা? দেখি, জমিদারকে ব'লে কোনো সুরাহা হয় কি না; ঈশেনবাবু থাকলে তো কথাই ছিল না, আমার ওই লাঠি তাঁর অনেক কাজে লেগেছে। রতনবাবু যে আমায় চেনেন না, এই হয়েছে মুস্কিল!'

'না বাপজান, তুমি এসব কথা জমিদারকে বলতে যেও না—ছি, ভাবতেও আমার সরম লাগে! তার চেয়ে চল, এ গাঁ ছেড়ে হিন্দু পাড়ার সামনে কোথাও থাকি গে; তারা তো আমোদের ছোঁবেও না, সেই বেশ হ'বে।'

'বিপদে আপদে সেখানে কে আমাদের দেখবে মা?' কাতর প্রশ্নের উত্তরে কন্যা বলিল, 'খোদা দেখবেন, আর কেউ দেখবার নেই! বাবা, তুমি সেই ব্যবস্থাই কর।'

বৃদ্ধ পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বাজিতপুরে জমিদারের কাছারী বাড়ীতে উপস্থিত হইল; সে এখানে অনেকবার আসিয়াছে, ঈশানবাবুর মৃত্যুর পরে আর এদিক মাড়ায় নাই; তখন এই বাবুরা সব পাঠের জন্যে বিদেশে থাকিতেন, রহিম ইঁহাদের পরিচিতও নহে। যাঁর জন্যে সে জীবন দিতেও পারিত, যিনি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, আজ তিনি কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে রহিম শুষ্ক মুখে নবীন জমিদারকে সেলাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল; রতন রায় কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'কে তুমি?'

'আমি রহিম শেখ, হুজুর, আপনার তাঁবেদার।'

'তুমি কি চাও ?'

'বাবু আমি আর কাদেরপুরে বাস করতে পারছি না, জান হায়রাণ হয়ে উঠেছে। আপনি যদি মেহেরবাণী ক'রে বাজিতপুরে পুকুরের ধারের ঐ জায়গাটা আমায় বাস করতে দেন, তবে আমি সেখানকার জায়গা জমি বিক্রী ক'রে এইখানেই চলে আসি।'

বিস্মিত রতন রায় দেওয়ানের পানে চাহিলেন; তিনি বলিলেন, 'লোকটা বয়েসকালে বাবুর লাঠিয়াল ছিল, অনেক উপকার করেছে; কিন্তু ও যে মোছলমান বাবু!'

রতন রায় বলিলেন, 'তুমি ওখানে থাকতে পার, কিন্তু পুকুরের জল তো ব্যবহার করতে পারবে না, গাঁয়ের হিন্দুরা তা'তে আপত্তি করবেন।'

'বাবুজি, ঐ পুকুরের জলে আমাদের দরকার নেই। আমরা মোটে তিন জন লোক। আমি, আমার মেয়ে আর ছোট একটি ছেলে; খালের জলেই আমাদের যথেষ্ট হ'বে; দরকার হয় তো পেছনের ডোবাটা কাটিয়ে একটু গভীর ক'রে নেব, কাজ চলে যাবে। অনেক ক্ষতি স্বীকার ক'রেও এখানে আসতে চাচ্ছি, একটু শান্তির জন্যে বাবু; যে রকম ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, একটা খুন জখম বা করতে হয়! জোয়ানকালে অনেক জান নিয়েছি, এখন আর কারো মাথায় লাঠি তুলতে হাত ওঠে না হুজুর!'

'আচ্ছা তাই এস; গাঁয়ের এক পাশে থাকবে, এতে আর কার কি ক্ষতি হবে। ওকি, এখনি উঠছো কেন রহিম, বসো; অনেক দূর থেকে এসেছ, একটু জল খেয়ে যাও।'

'না বাবু, মাপ করবেন, এ বাড়ীতে আমি অনেক খেয়েছি। এখন আর দেরী করতে পারব না, মেয়েটাকে একলা ফেলে এসেছি; সেলাম বাবুজী!' তাঁহাকে আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া রহিম আবার বলিল, 'আজ আমাদের বড় শান্তি দিলেন বাবু, খোদা আপনার ভালো করবেন!' রতনরায় হাসিয়া বলিলেন, 'খোদা আমার ভালো করেন নি রহিম, যাক তুমি যাও!'

রহিমের সহিত দেওয়ানও কাছারীর বাহিরে আসিলেন ও একটু দূরে গিয়া তাহাকে বলিলেন, 'কেন তুই বাবুর সঙ্গে অত কথা কইতে গেলি? বাবুর ছেলেটি এবারে পাশ দিয়েই মারা গেল। শোন্ রহিম, বাবু খুবই ভালো মানুষ, যে যা চায় দিয়ে দেন, কিছু তলিয়ে দেখেন না; কিন্তু তোর তো বুঝতে হয়; তুই এখানে এলে গাঁয়ের সবাই বিরক্ত হয়ে বাবুকে যা তা বলবে, তার চেয়ে যেখানে আছিস থাক্; আমি পাইক পাঠিয়ে তোদের পাড়ার সবাইকে শাসিয়ে দেব, বুঝলি?'

'না দেওয়ানজী, তা'তে কিছু হ'বে না; পাইকের কথায় বুঝ মানবে, ওরা সে পাত্তর নয়। আপনি দেখবেন আমার জন্যে কারু কিছু অসুবিধে হ'বে না। চাঁড়াল পাড়ার ঐ জঙ্গলটা সাফ ক'রে নিয়ে গাছের আড়ালে ঘর বাঁধব, পরের জমিতে জন খেটে খাব, তবু আর সেখানে থাকব না!'

'মর্ ব্যাটা! যখন ভালো বুঝ নিলি না, তোর বরাতে অনেক দুঃখু আছে!' বলিয়া দেওয়ানজী অপ্রসন্ন মুখে কাছারীতে ফিরিয়া চলিলেন।

২

এক মাস হইল রহিম বাজিতপুরে আসিয়াছে, নূতন বাড়ী প্রস্তুত ও পরিষ্কার করিয়া এইবারে তাহারা একটু স্থির হইতে পারিয়াছে। ফুলজানি রহিমকে বলিয়া বাড়ীতে একটা কুয়া কাটাইয়াছে, জলের জন্যে সে খালের ধারেও যায় না। সামনেই চাঁড়াল পাড়া, সর্দ্দাররা সবিস্ময়ে একবার এই নূতন বাড়ীটির দিকে চাহিয়া দেখিল, তার পরেই যথা সম্ভব দূরে সরিয়া গেল; তাদের বাড়ীর মেয়েরা বলিতে লাগিল, 'ও মা, ওরা মোছলমান! আমরা ভেবেছিলুম হিন্দু বুঝি; মাগো, জমিদারবাবুর বা কাণ্ড, বাজিতপুরেও মোছলমান বসালে, হিন্দুর পাড়া আর রইল না কো! ওগো জগা, দেখিস ঐ ছোঁড়াটাকে ছুঁয়ে এসে ঘর দোর যেন এক ক'রে দিসনে; ওর কাছ থেকে তোরা একটু তফাতে হয়ে থাকিস।'

ফুলজানি এখানে আসিয়া যেন শান্তি পাইল, রহিমের তো মেয়ের সুখেই সুখ; সে কর্ম্মঠ লোক, কয়েকটা জমি বন্দোবস্ত করিয়া ভাগে চাষ করিতে লাগিল। বেলা শে[illegible] শ্রান্ত রহিম যখন ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ফুলির সঙ্গে [illegible] করিত, তাহার হাসি মুখ ও নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া তার [illegible]

ভালো লাগিত যে পূর্ব্বপুরুষের ভিটে ছাড়ার কষ্টও সে ভুলিয়া যাইত।

কেবল মাণিক এখানে কোন সুবিধাই পাইল না; পাড়ার ছেলেরা তার পানে এমন ভাবে চাহিয়া থাকে, যেন তাহারা একটা নূতন জানোয়ার দেখিতেছে। কাহারও কাছে গেলেই সে শোনে, 'ওরে সরে আয়, তোকে ছুঁয়ে দেবে!' সাথীর অভাবে তাহার খেলাধুলা বন্ধ হইয়া গেল; নির্জ্জন বাড়ীটিতে গরু চরাইয়া ও পাখীর গান শুনিয়া দিন আর কাটে না। আম্মাজানকে বলিলে সে তাহাকে বই পড়িতে বলে, তাহাও মন চায় না। ক্রমে সে মরিয়া হইয়া উঠিল; কেন, সে কি মানুষ নয় যে কাহাকেও ছুঁইতে পারিবে না? পাঠশালার নফর গোপাল তো তা'কে ছোঁয়, তা'দের জাতি যায় না, তবে কেষ্ট কানাইদের জাতি যাইবে কেন? না, সে এখন হইতে সকলকেই ছুঁইয়া দিবে, ওসব কথা শুনিয়া একপাশে সরিয়া থাকিবে না! সেদিন তাহার গরু মাধব সর্দ্দারের বাড়ী ছুটিয়া গিয়াছিল; সে আনিতে গেলে বাড়ীর মেয়েরা বলিল, 'তুই ওইখেনে দাঁড়া, আমরা গরু বার ক'রে দিচ্ছি; নিকোনো উঠোন মাড়াস নি কো!' মাণিক মুখ লাল করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল; স্ত্রীলোকটি গরুটাকে তাড়া দিতে দিতে বলিল, 'মুখে আগুন, মোছলমানের গরুও কি তেমনি? এবাগে তাড়ালে ওবাগে যায়, কিছুতেই বাড়ী থেকে বেরুতে [illegible]য় না!'

আল্লা, অনবরত মাণিক এসব কি শুনিতেছে, এত অপমান, এই ঘৃণা সে কেমন করিয়া সহিবে!

তারপরেই পাড়ায় রক্ষাকালীর পূজা হইল। মাণিক [illegible]কুর পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখিল, মাথায় ফলের ঝুড়ি, চা'লের [illegible]লা লইয়া ছেলে মেয়ে বুড়ো মেলা লোক বাজনা বাজাইয়া [illegible]থায় যাইতেছে; তাহারা নিকটে আসিয়া কহিল, 'ওরে [illegible]কে, সরে যা; আমরা মায়ের পূজো দিতে যাচ্ছি, পথ [illegible]!' মাণিক গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; একটি স্ত্রীলোক [illegible]ল, 'ওরে শুনচিস, সরে দাঁড়া!' মাণিক মুখ তুলিয়া [illegible]ল, 'কেন সরে দাঁড়াব? তোমরাও মানুষ, আমিও মানুষ; [illegible]য় ছুঁলে তোমাদের কক্ষনো জাত যাবে না!' জগা বলিল, [illegible] যে মোছলমান রে, তোকে ছুঁলে জাত না যাক, মায়ের পূজো দেওয়া যাবে না; সেদিন গুরুমশায় তোকে বলেন নি, এই মাণকে, তুই একটু ওধারে গিয়ে বোস বাবা, কাউকে যেন ছুঁয়ে দিস নি; তবে?' স্ত্রীলোকটি বলিল, 'মাণিক, লক্ষ্মিটি, একটু সরে দাঁড়াও তো! আমরা সব নেয়ে ধুয়ে পূজো দিতে যাচ্ছি, পাড়ায় মায়ের অনুগ্রহ হ'তে লেগেচে, তুমি যেন ছুঁয়ে সব পণ্ড ক'রে দিও না।'

মাণিকের কি মনে হইল, সে জগাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'আজ তোদের সব্বাইকে ছুঁয়ে দেব রে, আমি ছুঁলে যদি মায়ের পূজো না হয় তো হবে না!' জগাও তাহাকে ধরিয়া পথ হইতে সরাইয়া লইয়া বলিল, 'তোমরা সব চলে যাও, আমি এটাকে আটকে রাখছি; এর পরে নেয়ে তখন যাব।' তাহারা মোছলমানের 'নিকুচি' করিতে করিতে চলিয়া গেল। জগা মাণিককে ঘা কতক মারিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার প্রতিফল দিল, পরে তাহারা কয়েক জনে মিলিয়া এই অপরাধের বিচারের জন্যে মাণিককে জমিদার বাড়ীতে লইয়া চলিল; 'মাতব্বর' ও পূজা দিতে না গিয়া তাহাদের সঙ্গ লইল, এই মোছলমান ছোঁড়াটা যাহাতে বেশী সাজা পায়, তাহাতো করিতে হইবে।

দ্বিপ্রহরে রহিম সেখ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিল। আজ আর মাণিক তাহার ভাত লইয়া মাঠে যায় নাই, কি হইল? সে আসিবামাত্র ফুলজানি কাঁদিয়া বলিল, 'বাপজান, এখানে এসে আর এক মুস্কিলে পড়া গেছে, কেউ আমাদের ছুঁতে চায় না! ছেলেটা কা'কে ছুঁয়ে দিয়েছে ব'লে তাকে মারতে মারতে ওরা সব কাছারীতে নিয়ে গেছে।'

রহিম ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল; কাছারী বাড়ীর সামনে জগারা মাণিককে লইয়া একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, রতন বাবু তখনও আসেন নাই। রহিম সেখ আসিয়া দেখিল, কেহ মাণিকের কাণ মলিয়া দিতেছে, কেহ বা বলিতেছে, 'আর কখনো আমাদের ছুঁয়ে দিবি, তা'হলে তোদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেব, জানিস? তোর জন্যেই আজ আমার পূজো দেখা হলোনা!'

রহিম জগার নিকটে গিয়া বলিল, 'বাপজান, একে ছেড়ে দাও; বাচ্চা লোক, বুঝতে পারে নি, কসুর করে ফেলেছে; আর কখনো করবে না।'

জগা বলিল, 'বুড়া, এ কসুরের মাফ নেই। আমাদের পূজোর জিনিস ছুঁয়ে দিয়েছে, এর শাস্তি ওকে পেতেই হবে।'

ধীরে ধীরে রহিম সেইখানে বসিয়া পড়িল, তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। রতন রায় কাছারী যাইবার মুখে সেই গাছতলায় আসিয়া বলিলেন, 'এখানে তোরা কি করছিস রে, একি, এমন কোরে একে ধরে রেখেছিস যে?'

জগা যোড় হাত করিয়া বলিল, 'বাবু, এই মাণকেটা রহিম সেখের নাতি; সেই আপনি যাঁকে আমাদের ডোবার ধারে বসিয়েছেন; এর জ্বালায় আমরা অস্থির হয়ে উঠেছি হুজুর! পুজো পার্ব্বণ সব বন্ধ হ'বার যোগাড় হয়েছে; ছেলেটা কারু কথা শোনে না, সবাইকেই ছুঁয়ে দেয়, বুঝুন কি বিপদ!'

রতন রায় বলিলেন, 'তোমায় যদি কেউ সব সময় ছুঁওনা ছুঁওনা বলে, তবে তোমার কেমন বোধ হয় জগা?'

জগা ম্লান হাসিয়া বলিল, 'সে তো বলেনই হুজুর আপনারা! তা আমরা কখনো আপনাদের ছুঁতে যাইও না, যেমন চাঁড়ালের ঘরে জন্মেছি, তেমনি আলগোছ হয়েই থাকি; কিন্তু এই মোছলমান বেটার আস্পর্দ্ধা কত, আমাদের পুজোর জিনিস নষ্ট ক'রে দিতে চায়!'

রতন রায় বলিলেন, 'আহা ওযে বালক! সব সময় ছুঁওনা ছুঁওনা ব'লে ওকে বোধ হচ্ছে পাগল ক'রে তুলেছিলে তোমরা, ছোকরা তাই ক্ষেপে গেছে; তাই নয় কি, মাণিক?'

মাণিক মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর দিল না। রতন রায় জগাকে কহিলেন, 'একে ছেড়ে দাও জগা, এবারের মত মাপ করলুম; রহিম, নাতিকে একটু শাসন করে দিও, আর যেন আমার এরকম নালিশ শুনতে না হয়!'

কৃতজ্ঞতায় রহিমের বুক ভরিয়া গেল; মাণিক ছাড়া পাইয়া নিকটে গেলে সে তাহাকে বলিল, 'বাবুকে সেলাম কর্ বেটা, ওঁর দয়ায় বেঁচে গেলি; আমার তো ভাবনায় কলিজা শুকিয়ে উঠেছিল, এমন গোস্তাকী আর করিস্ নে!'

জগা বলিয়া বলিয়া উঠিল, 'একি কর্লেন হুজুর? নিদেন দু'চার ঘা বেতের হুকুম দিন! মোছলমানকে অত আস্কারা দেবেন না বাবু, তা'হলে হিন্দুয়ানী রাখতে পারবেন না; একেই তো বাঙ্গালা দেশ মোছোলমানে ভরে উঠেছে!'

'ঠিক বলেছ, বাঙলা দেশ মোছলমানে ভরে উঠেছে! কিন্তু বিচারের নামে অবিচার তো করতে পারব না। এইটুকু ছেলে, এর দোষ একবার মাপ করাই উচিত; যাও ছোকরা, দাদুর সঙ্গে বাড়ী যাও, আর কখনো এমন কাজ করো না' বলিয়া রতন রায় চলিয়া গেলেন; রহিম ও মাণিক তাঁহাকে যে আভূমি নত হইয়া সেলাম করিল, তিনি তাহা চাহিয়াও দেখিলেন না।

রহিম ব্যথিত স্বরে জগাকে বলিল, 'মোছলমান কি মানুষ নয় বাপজান? মানুষকে এত ঘেন্না করা কি মানুষের কাজ?'

জগা হাসিয়া বলিল, 'তোরা আবার মানুষ না কি রে? ঠ্যাঙানীর চোটে চাঁড়ালরা তোদের সায়েস্তা করে রেখেছে; নইলে চুরি, বদমাইসী, বাটপাড়ি—হেন কাজ নেই যা তোরা করতে না পারিস্! সেই জন্তেই তোদের আমরা অত ঘেন্না করি, শুধু মোছোলমান বলেই নয়!'

আর কথা না বাড়াইয়া রহিম মাণিকের হাত ধরিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল; তাহারা ঘরের দাওয়ায় উঠিতেই ফুলজান ছুটিয়া আসিল, পিতার সঙ্গে পুত্রকেও দেখিয়া তাহার বিষণ্ণ মুখ প্রফুল্ল হইল; এক বদনা জল বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া আনিল। রহিম হাত মুখ ধুইয়া আসিলে হুকাটা তাহার হাতে দিয়া ফুলি কাছে বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল; সে একটু সুস্থ হইলে এক সানকী চিঁড়া গুড় আনিয়া ফুলজান বলিল, 'বাপজান, এই নাস্তাটুকুন খেয়ে ফেল, এতটা বেলা তোমার পেটে আজ কিছুই পড়ে নি। মাণকেকে খেতে দিও না বলছি, ওর জন্তেই তোমায় এত হায়রান হ'তে হলো। আমি যাই, চট্ করে রান্না সেরে ফেলি গে।'

'এখনো রান্না চড়াস নি মা?' বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ফুলজান হাসিয়া বলিল, 'চড়িয়েছিলুম বাজান, মাণকেকে সর্দ্দাররা মারতে মারতে নিয়ে গেল দেখে নাবিয়ে ফেলে রেখেছি; আজ যে আবার খানা পিনা করবো, সে কি বুঝেছি? চাঁড়ালদের কথা শুনে বাবু কি বললেন বাপজান

বল না শুনে যাই; ওরা যে ক'রে ধরে নিয়ে গেল, মাণকে যে আজ ছাড়ান পাবে, তা ভাবতেও পারিনি।'

'বাবু বড় ভালো মাজান। ঈশেন বাবুর ছেলে তো, ভালো হ'বেন না? সর্দ্দারদের কোন কথাই তিনি কাণে তোলেন নি, মাণককে তক্ষুনি একেবারে বেকসুর খালাস দিয়ে দিলেন।' পিতার কথা শুনিয়া ফুলজানের চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া গেল, সে উদ্দেশে রতন রায়কে সেলাম করিয়া কহিল, 'যিনি গরীবের ভালো করেন, খোদাতালা তাঁর ভালো করবেনই বাপজান। এই সুবিচারের জন্যে খোদার দোয়া নিশ্চয় তিনি পাবেন।'

৩

ফুলজানের মত দেশের সকলেই রতন রায়ের সুবিচারের সুখ্যাতি করিত। স্ত্রীলোকেরাও তাঁহার কাছে আসিয়া অভাব অভিযোগ জানাইতে দ্বিধা করিত না; তিনি তখনই তাহার প্রতিকার করিতেন দেখিয়া প্রজারা নারীর উপরে অত্যাচার করিতে সাহস পাইত না। রতন রায়ের সুশাসনে বাজিতপুরের লোকেরা শান্তিতে বাস করিত, কিন্তু তাঁহার নিজের জীবন ছিল শান্তিহীন; একমাত্র সন্তান মণি রায়ের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাঁহার মাতা ও পত্নীর মনোমালিন্যের ফলে বাড়ীতেও বড় অশান্তি হইত।

বাজিতপুরের চৌধুরী বাড়ী দেখিলে রাজবাড়ী বলিয়া মনে হয়; বড় দীঘির পাড়ে পুষ্পোদ্যান পরিবেষ্টিত সেই সুন্দর অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে পাইক ও বরকন্দাজরা পাহারা দিতেছে, তাঁহাদের ঠাকুর বাড়ী ও অতিথিশালাতে বহু লোক প্রতিপালিত হইতেছে; ইহা ছাড়া দুঃস্থ প্রজা ও ব্রাহ্মণগণের সাহায্যের নানা রূপ সুব্যবস্থা আছে।

জমীদারীর কাজের জন্য রতন রায় কাছারীতেই প্রায় থাকিতেন, বাড়ীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিতেন মধ্যম রজত রায়; তাঁহার পত্নী কল্যাণী ও সংসারের সমস্ত ভার লইয়া দিদি ও শ্বশ্রূ-মাতাকে শান্তি দিতে চাহিত, কিন্তু তাঁহারা যে কোথা হইতে গোলোযোগের সূত্র বাহির করিতেন, কেহই বুঝিতে পারিত না।

সে দিন কিন্তু সেরূপ কিছুই হইল না; চৌধুরাণী আহারান্তে নিজের ঘরে গিয়াছেন, বড় বধূ সুজাতাও তাহার দ্বিতলের সুপ্রশস্ত শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া কল্যাণী হাসি মুখে বিশ্রাম করিতে গেল; খাটের উপরে রজত রায় লম্বশাটপটাবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'তোমাদের খেতে এত দেরী হয় কেন, বেলা যে তিনটে বাজে। চট ক'রে কয়েকটা পান সেজে দাও তো, আমায় এখুনি ভিন গাঁয়ে যেতে হবে; পানও সেজে রাখ নি যে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

খাটের নীচে হইতে পানের বাটা বাহির করিয়া কল্যাণী পান সাজিতে বসিল, রজত রায় তাহার দীর্ঘ চুলের গোছা হাতে তুলিয়া নিয়া আস্তে আস্তে টানিতে লাগিলেন; কল্যাণী হাসিয়া বলিল, 'উঃ, আমার লাগে না বুঝি। নাও, তোমায় আজ অনেক গুলো পান সেজে দিলুম, যত খুসী খাও।'

রজত রায় হাত পাতিয়া বলিলেন, 'দাও, পানে আমার অরুচি নেই; তা হঠাৎ যে এতটা উদার হয়ে গেলে, এর কি কারণ?'

'আজ আর বাড়ীতে কিছু হয় নি। মণি মারা গিয়ে অবধি তোমাদের বাড়ীটি যা হয়েছে—হয় কান্না, নয় তো ঝগড়া, একটা কিছু অশান্তি লেগেই রয়েছে; আজকের দিনটা শান্তিতে গেলো দেখে মনটাও বেশ ভালো লাগছে; তাই কি আর করি, তোমাকেই দুটো পান বেশী ক'রে দিয়ে দিলুম!'

'তবে ও পান দুটো এখন রেখে দাও, রাত্তিরে দিও; এখনও অর্দ্ধেক দিন পড়ে রয়েছে যে, এর ভেতরে কত কিছুই হতে পারে।'

'না না, আজ আর কিছু হবে না,' কল্যাণী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'দিদির সঙ্গে যার তো আর দেখা হবে না, ঝগড়া হবে কি ক'রে?'

'তোমার সঙ্গে তো দেখা হবে, তা' হলেই হলো।'

'ইস, আমার সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হতে পারে, আমি যার কথার জবাবও দিই না।'

'কিন্তু আমার কথার তো—বলিয়াই রজত রায় থামিলেন।

তিনি দেখিতে পাইলেন, সুজাতা তাঁহার ঘরের দিকে আসিতেছে। দ্বারের নিকটে আসিয়া সুজাতা ডাকিল, 'কল্যাণী, একটা কথা শুনে যা।'

মাথায় আঁচলখানা তুলিয়া দিয়া কল্যাণী বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কথা দিদি?'

'ভাই, আমি বিনোদ ঠাকুরপোর বাড়ী চললুম; সইয়ের ছেলেটি শুনলুম এই একটু আগে মারা গেছে! কি যে করছে সই, দেখি গে যাই; বিকেলের কাজ তুই দেখে শুনে করিস, কোন গোল হয় না যেন।'

'দিদি, তুমি যদি মাকে না বলে যাও, তবেই গোল হবে, তিনি শুনতে পারলে রেগে যাবেন; তাঁকে বলেই কেন যাও না?'

'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার যে ভাব, বললে কি আর যেতে পারবো? যাই কল্যাণী আমার বাড়ী ফিরতে একটু রাত হতেও পারে।' বলিয়া সুজাতা নীচে নামিয়া গেল।

ঘরে আসিয়া কল্যাণী স্বামীকে অনুযোগ করিল, 'দিদি তো চলে গেল, তুমি একটি বার মানাও করলে না—তারপরে?

রজত উঠিয়া বলিলেন, 'তারপর আর কি, আমিও চললুম, রবি রইল, আজকের গোল সেই মেটাবে।'

'ঠাকুরপো বুঝি ওসব পারে? সে তো এই সবে কলকাতা থেকে এসেছে।'

'তবে তুমিই আমার হয়ে আজকের গোলটা মিটিয়ে দিও।' বলিয়া রজত রায় প্রস্থান করিলেন।

কাছারীর পাশেই পথ; গ্রীষ্মকাল, রোদে চারিদিক যেন জ্বলিয়া যাইতেছে। কর্ম্মে ব্যস্ত রতন রায় মুখ তুলিতেই দেখিলেন, সুজাতা সেই রৌদ্রতপ্ত পথ দিয়া ঝি'র সঙ্গে কোথায় যাইতেছে; রতন রায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, সে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইলে তিনি কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

বিনোদ রায় রতন রায়ের খুল্লতাত ভ্রাতা; বিষয় সংক্রান্ত বিবাদের ফলে ইঁহারা দূরে দূরে বাড়ী করিয়া বেশ তফাত হইয়াই ছিলেন, কিন্তু বধূরা সেরূপ থাকিতে চাহিল না। সুজাতা ও লীলা এক গ্রামের মেয়ে, ছেলে বেলায় সই পাতাইয়াছিল। বাজিতপুরের দুই জমিদারের সহিত এই সখী দুইটির পরিণয় হওয়াতে আবার গোল বাধিল। তাহাদের সখিত্বের সঙ্গে ইঁহাদের বিরক্তিও যে বাড়িতেছে, বুঝিয়াও তাহারা নিবৃত্ত হইল না। লীলাকে দেখিয়া চৌধুরাণী মুখ ফিরাইলেও সে আবার আসে—সুজাতারও যখন তখন তাহার কাছে যাওয়া চাই। চৌধুরাণী সহজে বধূর সহিত বিবাদ করেন নাই—অশেষ প্রকারে জমিদার বাড়ীর নিয়ম কানুন এই ছোট লোকের মেয়েটাকে শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সুজাতা এসব কথা একেবারেই শোনে না। জ্ঞাতি যে কত বড় শত্রু, বিশেষ বিনোদ রায়রা, যে তাঁহাদের অনিষ্ট ভিন্ন আর কিছুই করে না—বহু উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিলেও সে তাহা বোঝে না; চৌধুরী বাড়ীর বধূদের যে পায়ে-হাঁটিয়া কোথাও যাইতে নাই—বিবাহের পরে তাহারা যেমন চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া মহা সমারোহে প্রাসাদে প্রবেশ করে, মৃত্যুর পরেও তেমনি সমারোহে চারি বেহারার স্কন্ধে চাপিয়া প্রাসাদের বাহিরে যায়, এই সনাতন নিয়ম সুজাতা মানিতে চাহে না। বিনোদ রায়ের জমিদারী ইঁহাদের চেয়ে তো কম নয়, সুজাতা সেখানে গেলে ইনি কেন রাগ করেন, লীলা আসিলে তাহার শাশুড়ী কিছুই তো বলেন না, এইসব প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তোলে।

বিনোদ রায়ের প্রাসাদের নিকটে গিয়া সুজাতা থমকিয়া দাঁড়াইল; সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটা আজ একেবারে নিঝুম, এইমাত্র সেথান হইতে যে চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছে, বাড়ীটাও যেন সেই রাজা রায়ের শোকে ম্লান গম্ভীর হইয়া রহিয়াছে! অন্দরে প্রবেশ করিয়া সুজাতা পরিচারিকাকে কহিল, 'ঝি, তুই বাড়ী চলে যা; আমার যেতে অনেক দেরী হ'বে, ততক্ষণ বসে থেকে তুই কি করবি?'

লীলার ঘরের সম্মুখে কয়েক জন স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, সুজাতাকে দেখিয়া তাহারা সরিয়া গেল। সেই সুবৃহৎ কক্ষে, শ্বেত পাথরের মেজের উপরে শোকার্ত্তা অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা লীলা শ্বেত কমলের মত পড়িয়াছিল, ত্বরিত পদে সুজাতা নিকটে গিয়া ডাকিল 'সই!'

লীলা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'এসেছিস সই, বোস্!'

বলিয়া সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ভাই, মন যে জ্বলে পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে, কি করি বল্!'

সুজাতা কি বলিবে, পুত্রশোকের যাতনা সে ভাল রূপেই জানে; ইহার সান্ত্বনা সে খুঁজিয়া পাইল না। একটি দৃশ্য তখন তাহার মনেও ফুটিয়া উঠিল, মণি রায় যখন পরলোকের পথে যাত্রা করিয়াছিল—তাহার কত আরাধনার ধন্ সে! লীলার তবু একটু চেতনা আছে, সুজাতার সেদিন তাহাও ছিল না!

অসহ্য যাতনায় লীলা কখনও শরাহতা হরিণীর মত মেজেয় লুটাইয়া পড়িতেছে, কখনও বা উঠিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে, 'মণি আর রাজু এইবারে সত্যিকারের ভাই হয়ে স্বর্গে গিয়ে রইল দিদি, সেখানে তো হিংসে দ্বেষ নেই—এতটুকু জমির জন্যে ভাই সেখানে ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ করে না!'

লীলার হাতখানি ধরিয়া সুজাতা নীরবে চোখের জল ফেলিতে লাগিল; কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া লীলা আবার করুণ স্বরে কহিল, 'রাজু ভাত খেতে চেয়েছিল সই, বললে, আমায় দু'টি ভাত দাও না মা, খেতে পেলেই আমি ভাল হ'ব। ডাক্তাররা তাও দিতে দিলে না। আহা সই, সে যখন বাঁচবেই না—যা খেতে চাইলে দিলেই হতো; রাজুকে আমার না খাইয়ে মেরে ফেললে, ওরা কি নিষ্ঠুর ভাই! একে রোগের যাতনা, তার ওপরে খিদের জ্বালা, বাছা আমার কত কষ্ট পেয়েই চলে গেল! সে কি আর ভাত খেতে পাবে না দিদি? আমি যদি জানতে পারি, সে আমার ভালো আছে, ভাত খেয়ে প্রাণটা তার ঠাণ্ডা হয়েছে, তা হ'লেও বুকটা জুড়োয়!'

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুজাতা একভাবে বসিয়া এই সদ্য পুত্রশোকাতুরার শোকের কাহিনী শুনিতেছে, আর কিছুই তাহার মনে নাই। লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে নিঝুম হইয়া পড়িয়াছিল, সহসা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'ওই শোন্, সে বলছে, মাগো, আমায় তুমি দু'টি ভাত খেতেও দিলে না! শুনতে পাচ্ছিস সই? রাজু, এখানেই রয়েছে—আর কোথাও যায়নি; আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না!'

পরিচারিকা দ্বারের নিকট হইতে ডাকিল, 'বাড়ী চল গো বউমা, রাত হয়ে গেছে যে!' শুনিয়া সুজাতার হুঁস হইল; সখীর অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি সযত্নে মুছাইয়া দিয়া সে কাতর কণ্ঠে কহিল, 'সই, এইবারে যাই, রাত হয়ে গেছে!'

'যাবি?' বলিয়া মুহ্যমানা লীলা ফিরিয়া চাহিল; সুজাতা শুষ্ক মুখে বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, এখন যেতে হবে! নইলে রক্ষে থাকবে না আমার—জানিস তো সব।'

সজল নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া লীলা তখন কি ভাবিতেছিল, তাহার কথা শুনিতেও পাইল না। ভাবিতে ভাবিতে লীলা সহসা উঠিয়া বসিল, সুজাতার হাত দুইটি ধরিয়া সে মিনতি করিয়া কহিল, 'আজ তোকে একটা কথা বলব, শুনবি সই?'

'কি কথা ভাই?' সুজাতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল।

'সই, ছেলে বেলায় পুতুল হারিয়ে আমি যখন কাঁদতুম, তুই কেমন সেই পুতুলটি এনে দিয়ে আমায় শান্ত করতিস! আজ কি আর তা পারবি না? রাজু এইখানেই কোথা লুকিয়ে রয়েছে—যা তো ভাই, তাকেও খুঁজে নিয়ে আয়!'

লীলার কথা শুনিয়া সুজাতা কাঁদিয়া ফেলিল, তার সেই হাস্যময়ী সখী আজ শোকে আত্মহারা! কি করুণ, মিনতি ভরা তার সজল চোখ দুইটীর দৃষ্টি, কত আশায় সে তাহার পানে চাহিয়া আছে—বেদনায় অমন মুখখানিও একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে! সম দুঃখিনীর মত সেই অতি মলিন মুখের পানে চাহিয়া সুজাতা সনিঃশ্বাসে বলিল, 'তা যদি পারতুম! রাজু তো তোর পুতুল নয় দিদি, যে খুঁজে এনে দেব, সে যে ভগবানের জিনিস; বড় দুঃখে একদিন তা'কে পেয়েছিলি, বড় দুঃখেই আজকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছিস! যাঁর জিনিস তিনিই নিয়েছেন বলে, মনকে বুঝিয়ে শান্ত কর্ সই!'

ঘড়িতে ন'টা বাজিয়া গেল; সুজাতার ইচ্ছা হইতেছিল, আজ লীলার কাছেই থাকে; কাল সকালে ইহাকে একটু জল খাওয়াইয়া তবে বাড়ী যায়; কিন্তু বাড়ীতে বলিয়া আসে নাই, এখানে সারা রাত থাকিলে যদি আবার গোল হয় ভাবিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে উঠিয়া পড়িল।

৪

চৌধুরাণী নীচে বসিয়া রবি রায়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন, বাড়ী আসিয়াই সুজাতা তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া গেল; সুজাতাকে বাহির হইতে আসিতে দেখিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল, কিন্তু তাহাকে কিছু না বলিয়া ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত রাত্তিরে কোথায় গেছলি ঝি?'

'বউমাকে নিয়ে এলাম মা।' ঝির কথা শুনিয়া চৌধুরাণী বলিয়া উঠিলেন, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি; কোত্থেকে নিয়ে এলি, শুনি?'

ঝি ভয়ে ভয়ে বলিল, 'সইমার ছেলেটি আজ মারা গেছে কিনা, তাই বউমা—'

'ও, সেখানে যাওয়া হয়েছিল! তা ওকে চান ক'রে যেতে বল, মড়া ছুঁয়ে ঘর দোর যেন একাকার করে না!

সুজাতা উপরে যাইতেছিল, সিঁড়ি হইতে বলিল 'সে সব তো আমি ছুঁই নি; তা ঝি, ওপরে একঘড়া জল দিয়ে যা, কাপড়খানা ছেড়ে ফেলি।'

চৌধুরাণী স্থির করিয়াছিলেন, সুজাতার সহিত কথা কহিবেন না; গোল হয় যখন, কাজ কি! তাই পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'কথার ছিরি দেখলি রবি? পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে এসে, এখন—ঝি, ওপরে এক ঘড়া জল দিয়ে যা! নীচে থেকে নেয়ে গেলে কি হয়, জিজ্ঞেস কর্ তো ওকে!'

রবি হাসিয়া বলিল, 'আমায় আবার কেন মা, তোমার বউ, তুমিই জিজ্ঞেস কর!'

চৌধুরাণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'বউ কা'কে বলচিস রবি, উনি যে এখন গিন্নি হয়ে উঠেছেন। যেখানে খুশী যান, যা খুশী তাই করেন, মুখের পানে তাকিয়ে কথা কয় কার সাধ্যি। আমিতো দাসী বাঁদীর মত একটি পাশে পড়ে আছি আর এই সব আদিখ্যেতা দেখছি!'

অন্য দিন হইলে সুজাতা সহিয়া যাইত, এসব কথা সে কত শুনিয়াছে; আজ তার মনটা বড়ই খারাপ ছিল, তাই ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'মাকে চুপ করতে বল তো ঠাকুরপো, রোজ রোজ আর এসব কথা শুনতে পারা যায় না; তুমি তো বেশ বসে বসে মজা দেখছ! কিসের জন্যে এত কথা শুনতে যাব আমি? কিছু চুরিও করি নি, কারু বাড়া ভাতে ছাইও দিই নি, কেন উনি দিন রাত আমায় অমন কোরে বলবেন?'

রবি রায় সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, 'মা, চুপ কর তো তুমি; এ সব বলে কি সুখ পাও? কলকাতা থেকে এসে আমি একটি দিনও সোয়াস্তিতে থাকতে পেলাম না, অমন কর তো কালই কলকাতা চলে যাব।'

সুজাতার পানে জলন্ত নয়নে চাহিয়া চৌধুরাণী বলিলেন, 'তুই থাম তো রবি, উনি চোপা করবেন আর আমি চুপ ক'রে থাকব, সেটি হতে পারবে না। এ কথা তো কেউ বলে নি যে তুমি কারু কিছু চুরি করেছ কি বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছ; কিন্তু তার চেয়েও বেশী করেছ মা তুমি। এ বাড়ীতে পা দিয়েই তো আমার হাতের নোয়া খসিয়েছ, তাও সয়েছিলুম; অমন সোণার চাঁদ মণি, যাই ষোল বছরে পড়লো, তুমি শনির দৃষ্টি দিয়ে তাকেও ছাই করেছ। জ্ঞাতি শত্তুরের বাড়ী যেতে তোমায় হ'শো বার মানা করেছি আমি, তুমি তাও শোন নাই; তাদের ওপরে দরদ তোমার কত একেবারে। অমন ঘরজ্বালানী পরভালানী বউ দিয়ে কিছু দরকার নেই আমার।'

'আমারো দরকার নেই মা এখানে থাকবার,—যে সুখে রয়েছি! মা পেটে ঠাঁই দিয়েছে যদি তবে বাড়ীতেও ঠাঁই দিতে পারবে; আমি কালই এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি!'

'তাই যাও!' চৌধুরাণী স্বর সপ্তমে তুলিয়া বলিলেন, 'মাগো, নির্ব্বিষ সাপের কুলোপানা চক্কর দেখ! বাপের বাড়ীর যা দশা, সবাই তা জানে; সাত জন্মে যারা একটি বার ডেকে জিজ্ঞেস করে না, যাবেন তো সেই মা ভায়ের বাঁদীগিরি করতে, তাও কেমন তেজ ক'রে জানানো হচ্ছে!'

দুঃখে, অপমানে সুজাতার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল; আঁচলে তাহা মুছিয়া সে কম্পিত কণ্ঠে কহিল, 'যাবই তো, এখানে যে অপমান, যত অন্যায় সহ্য করেছি আজ তার শোধ দিয়ে যাব। এমন কথা শুনিয়ে দিয়ে যাব যা মনে থাকবে—অকারণ আর কাউকে অপমান করতে কেউ সাহস করবে না!'

রবি রায় বলিয়া উঠিল, 'সে হচ্ছে না বউদি! রাগ হয়ে থাকে, তোমার যা খুসী আমাকে বল, আমি সহ্য করব; কিন্তু মাকে আমার কেউ কিচ্ছু বলতে পারবে না!'

চৌধুরাণী বলিলেন, 'কেন রবি মানা করছিস? মনে মনে তো দিবে রাত্রি আমার মুণ্ডুপাত করছেই, মুখেও করুক না! শোন বউমা, এর পরে তোমাতে আমাতে আর এক জায়গায় থাকা চলে না; এক জনকে যেতেই হবে, সে তুমিই যাও কি আমিই যাই! যে মুখে তুমি আমার অপমান করতে চেয়েছ, যদি মানুষের পেটে জন্মে থাক, তবে তাতে আর আমার অন্ন তুলে দিও না; এখানে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া চলবে না!'

রবি রায় ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'চুপ কর না মা, রাগলে তোমার একেবারেই জ্ঞান থাকে না; কি যে বল তার ঠিক নেই!'

চৌধুরাণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, 'না রে, এ শুধু রাগ নয়, কত দুঃখে যে এসব কথা মুখ দিয়ে বেরোয়, তা তুই বুঝবি নি! কর্ত্তা ঘটা ক'রে বেটার বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে এলেন; আমার কত সাধের রতন—হীরে মতির গয়না দিয়ে গা সাজিয়ে কত আনন্দে আমি তার বউ বরণ করে ঘরে তুলেছি; সে আজ এই মূর্ত্তি ধরেছে! আচ্ছা রতন আসুক, সে পরের বিচার ক'রে বেড়ায়, ঘরের বিচার করতে পারে না? একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যাক আজ; তুই তো কলকাতায় যাবি, আমাকেও নিয়ে চল, কাশীতে রেখে আসবি। এত হেনস্তা সয়ে থাকতে পারব না আমি!'

সুজাতা আর সেখানে দাঁড়াইল না; উপরে গিয়া দেখিল ঝি জল আনিয়া রাখিয়াছে, কোনও রূপে কাপড় কাচিয়া ঘরে গিয়াই, বিছানায় পড়িয়া সে অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল আজ সব শেষ! শাশুড়ীর বড় সাধ, রতন রায়ের আবার বিবাহ দিয়া মনের মত বউ আনেন। সুজাতা চলিয়া গেলে নিশ্চয়ই তিনি বিবাহ করিবেন, কেনই বা করিবেন না? সুজাতাও চিরদিনের মত মার কাছে থাকিতে যাইবে; মা তাহা বিশ্বাস করিবেন না, ভাবিবেন রাগ করিয়া আসিয়াছে, রাগ পড়িলেই আবার স্বামীর কাছে যাইবে; কিন্তু সে যখন আর যাইবে না, তখন—

রবি রায় বাহিব হইতে বলিল' 'বউদি, ঘরে যাব?'

'এস ভাই!' বলিয়া সুজাতা চোখ মুখ মুছিয়া ফেলিল; তাহার রোদনারক্ত মুখের পানে চাহিয়া রবি রায় বলিল, 'বৌদি, তুমিও কাঁদছ! ওদিকে মা তো কাশী যাবেন ব'লে বায়না ধরেছেন; কোথাও যাবার বেলা মাকে ব'লে গেলেই তো পার, তাঁকে একটু মেনে চললে দোষ নেই তো কিছু!'

'তুমিও তাই বলছ? তোমরা এমনি একচোখোই বটে!' সুজাতা উঠিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না; কালই তো চলে যাব, আজকের রাতটা আমায় চুপ চাপ পড়ে থাকতে দাও!'

'তুমি আবার কোথা যাবে, বৌদি?'

'সে খবরে তোমার কি দরকার ভাই? তুমি আর আমার কথায় থাকতে এস না!'

'ছি বৌদি, সবাই অবুঝ হ'লে চলে কি? মার মনে কষ্ট দেওয়া আমাদের কারুই উচিত নয়; তিনি যা বলেন, তা মেনে নিলে আর কোনো গোল থাকে না।'

'সে আমি পারলুম না তো ভাই! তা সব গোল চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; আদেশ উপদেশ অনেক শুনেছি, আর শুনতে পারি না! আচ্ছা, সইয়ের ছেলেটি মারা গেছে ব'লে তা'কে দেখতে গেছি, এই ত? তুমিও তা'তে দোষ ধরলে ঠাকুরপো, তোমাদের এই বিচার!'

সুজাতা আবার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল দেখিয়া রবি রায় বুঝিল, তাহার দ্বারা মিটমাট হওয়া অসম্ভব; 'যাই তবে বৌদি!' বলিয়া সে বাহিরে গেল ও দাদাকে ডাকিয়া আনিতে কাছারীতে লোক পাঠাইয়া দিল।

রতন রায় সেই লোকের সহিত বাড়ী আসিলেন; রবি রায়কে বারান্দায় পায়চারি করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমায় ডেকেছিস নাকি রবি?'

'হ্যাঁ দাদা, মা আর বৌদির যে কি কাণ্ড! দেখতে যদি, অবাক হয়ে যেতে। আমার কথা তো কেউ শোনেন না, তাই তোমাকে ডাকতে হলো' বলিয়া রবি রায় ঘরের ভিতরে গেল।

৫

'মা ঘুমুচ্ছেন নাকি, ঝি?'

চৌধুরাণী চোখ বুজিয়া শুইয়াছিলেন, পরিচারিকা তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল; পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা বলিলেন, 'না বাবা, ঘুমুই নি; ঘুম তো আসচে না, অমনি শুয়ে পড়ে আছি। ঝি, রতনকে বসতে দে।'

ঝি একখানা চৌকী আনিয়া নিকটে রাখিল, রতন রায় বসিয়া বলিলেন, 'আজ আবার কি হয়েছে মা?'

'কি হ'বে বাবা—ঝি, তুই এখান থেকে যা তো; হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে কথা গিলছে, বেরো বলছি! কিছু হয় নি রতন, বউ মা এই একটু আগে সইয়ের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এল; কোথাও যাবার বেলা আমাকে বলেও না, যা খুসী তাই করে; তাই বলেছি ব'লে আমায় কত শাসালে—বলে, বাপের বাড়ী চলে যাব, এখানে আর থাকব না। তা, ও কেন যাবা যাবে, আমায় তুই কাশী পাঠিয়ে দে, আমি চলে যাই; অত অসৈরণ সইতেও পারব না, এ বউ নিয়ে-ঘর করা আমার পোষাবে না!' বলিয়া চৌধুরাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রতন রায় বলিলেন, 'মা ওঠো, জল টল খেয়ে সুস্থ হও; সামান্য ব্যাপার নিয়ে কাঁদতে আছে কি? ছি, তুমি বড় অবুঝ হয়েছ!'

চৌধুরাণী চোখের জল মুছিয়া কহিলেন, 'না রতন এ সামান্য ব্যাপার নয়; রোজ রোজ অশান্তির চেয়ে তফাত হয়ে থাক'ই ভালো; তুই আমায় কথা দে, কালই কাশী পাঠিয়ে দিবি; তবেই জল গ্রহণ করবো, নইলে আর নয়!'

'মা কাশী যাবে বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করতে, সে তো খুব ভালো কথা; কাছারীর কাজ একটু কমলেই আমি তোমায় কাশী নিয়ে যাব। সত্যি, একটা বাড়ীতে বন্ধ হয়ে থাকলে মানুষের মন শান্তি পেতে পারে না, মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসা ভালো। মহালের নায়েবরা নিকেশ দিয়ে যাক, তার পরে তোমাতে আমাতে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু মা আমরা তোমার সন্তান, আমাদের দোষ ঘাট তোমায় কতই সইতে হয়েছে; আজ কেন এমন অসহ্য হয়ে উঠলো যে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে চাইছ? শুনেছি, বউকে সবাই মেয়ের মত মনে করে; তা করাই যে উচিত, ওদের তো এখানে আপনার লোক কেউ নেই। বউকে যদি আপনার ক'রে নিতে না পার, তবে সে চিরকাল পর হয়েই থাকবে—আমাদের ভালো দেখলে দুঃখ করবে, মন্দ হ'লে খুসী হবে; পর নিয়ে ঘর করবার মত বিপদ আর নেই! মা, ওকে কি তুমি আপন ক'রে নিতে পারবে না? ওর জন্যে সংসার ছেড়ে চলে যাবে—তবুও না!'

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া চৌধুরাণী বলিলেন, 'বাবা, সে আর হয় না। ও বউ যে অপয়া, এসেই আমার হাতের নো খসিয়েছে! সীঁথের সিঁদুরটুকু মুছে ফেলে এই বেশ হয়েছি, যার চেয়ে হীন বেশ মেয়েদের আর নেই! তোর অমন সোণা ছেলে মণি, একটা পাশ দিয়েছিল, সেও ওর নজর লেগে ছাই হয়ে গেল! তারপর থেকে ওকে আমার একটুও ভাল লাগে না, বউমাও আমায় দেখলেই জ্বলে যায়; এমন কোরে এক জায়গায় থাকা চলে কখনো? আমায় কাশীধামে নিয়ে চল রতন, আমি সেখানেই বেশ থাকবো।'

'তাই চল। যা হবে না, তার চেষ্টা না ক'রে চল মা, আমরা কাশীবাস করি গে। তোমার সেবা আমার প্রধান কাজ; প্রজাদের উপকার কি জমিদারী রক্ষে করা, এসব তার পরে। তবে যা বললে, সে জন্যে বউকে দোষী করা যায় না। শাস্ত্রে বলে, যার যখন মৃত্যু হ'বার সে হবেই, কেউ খণ্ডাতে পারবে না। বাবা ওকে কত ভালবাসতেন, তিনিই দেখে শুনে বাড়ীর বড় বৌ এনেছিলেন; তিনি মারা গেলেন, ওরও আদর য[illegible] ফুরুলো। মণি থাকলে পরে ওকেই মা ব'লে ডাকতো। পুত্র শোক যে কি, তা'তো মা তুমি জান—সে শোক [illegible] পেয়েছে, তা'কে সান্ত্বনা না দিয়ে নির্য্যাতন করা কি মানুষে[র] কাজ?'

চৌধুরাণী নিরুত্তর; রতন রায় আবার বলিলেন, 'বল [illegible] শুনে যাই—মণির মৃত্যুর জন্য বউকে দোষী করা যায় কি[না] সে তুমিই বিচার ক'রে দেখ। তবে বউ যে তোমাকে মা[নে] না, সে কথা অবশ্য বলবে; তারও কারণ, সে তোমাকে শ্র[দ্ধা]

করতে পারে না। তুমি যদি ন্যায় বিচার করতে মা, সবাই তোমায় মান্য করতো; শ্রদ্ধা ভক্তি মনের জিনিষ, সে কখনো বলে কয়ে হয় না, ও জিনিষটি না পেলে সংসারে থাকাও চলে না; দিনরাত কলহ করা কি ছোট মুখে বড় কথা শোনার চেয়ে সংসার ত্যাগ করা ঢের ভালো; তাই হবে—আমায় সাতটি দিন সময় দাও মা, রতনকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাই। মণি মারা গেছে আমারই কর্ম্মদোষে—আমার কোষ্ঠীতে পঞ্চমে পাপগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি থাকাতে এমন সন্তানহানি যোগ হয়েছে, যে সন্তান হবে না, হ'লেও বাঁচবে না। আমারও ইচ্ছে, তীর্থস্থানে গিয়ে জপতপ ক'রে ও-পাপ খণ্ডাই।'

চৌধুরাণী আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে না না, তোকে আমি কাশীবাসী হ'তে দেব না—ওমা সেকি হয়! শোন্ রতন, আমি বলছি, আজ হ'তে সুজাতা আমার মেয়ে, আমি তার মা—বাড়ীতে আর কোনো গোল হবে না; তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে তোর কাজ কর্ম্ম কর্, কাশীর কথা আর মুখেও আনিস্ নে!'

আনন্দে রতন রায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্রফুল্ল নয়নে মার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, 'আমায় আজ কত সুখী করলে তুমি মা! আমাদের অবহেলায় মনে কত কষ্ট পেয়েছ, কত অশান্তি ভোগ করছ, তবুও আমাদের এতটুকু অমঙ্গল হ'তে দিতে চাও না! এমন কি আর কেউ করতে পারে? জগতে এসেই মা, তোমায় পেয়েছি; রোগে সেবা করে, শোকে সান্ত্বনা দিয়ে, আপদ বিপদে তুমি আমায় কত সাহায্য করেছ; আজ তোমায় ছেড়ে দিয়ে কি নিয়ে মা থাকবো? সে আমায় কি সুখ দেবে, তোমায় যে অবহেলা করে?'

চৌধুরাণী তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, 'ষাট ষাট, এমন কোরে বলতে নেই; তুই যে রতন, আমার অমূল্য রতন—আমি প্রাতর্ব্বাক্যে তোকে কত আশীর্ব্বাদ করি!'

'তবে এই আশীর্ব্বাদ ক'রো, যেন তোমাকে না হারাই! ভগবান আমায় সন্তানহারা করেছেন, তিনি সবই করতে পারেন; কিন্তু মানুষ কখনো মা, আমায় মা-হারা করতে পারবে না! তুমি যেখানে, আমিও সেইখানে থাকবো। চল মা, আমরা কাশীধামে যাই; শুনেছি, শোকার্ত্ত মন সেখানে গেলে শান্তি পায়; বিশ্বনাথের চরণ দর্শন ক'রে শান্তি নিয়ে আসিগে চল!'

মাতা পুত্রে এমন নিবিষ্ট মনে কথা কহিতেছিলেন, রবি রায় কখন যে ঘরে আসিয়াছে, জানিতে পারেন নাই; তাহাকে দেখিয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া কল্যাণীও অবাক হইয়া দেখিতেছিল, বৃদ্ধা মাতার কোলের কাছে বসিয়া আছে প্রৌঢ় পুত্র; মাতা কাশী যাইবে শুনিয়া সেও সঙ্গে যাইতে চাহিতেছে—শিশু যেমন কিছুতেই মা ছাড়িয়া থাকিতে চায় না, সেও তেমনি একান্তভাবে মাতাকে ধরিয়া আছে, শিশুর মতই সরল তাহার মুখের ভাব। কল্যাণী ভাবিয়াছিল আড়াল হইতেই ইঁহাদের কথা শুনিয়াই চলিয়া যাইবে, কিন্তু ইহা দেখিয়া যেন আর নড়িতেও পারিতেছিল না; রবি রায় তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলে পরে সে লজ্জিতা হইয়া সরিয়া গেল।

সুজাতা তখনও তেমনি পড়িয়াছিল; কল্যাণী ছুটিয়া ঘরে গিয়া ডাকিল, 'ঘুমুচ্ছ নাকি, দিদি?'

সুজাতা একটু নড়িয়া উঠিল, উত্তর দিল না দেখিয়া কল্যাণী রাগিয়া গেল; সে তীক্ষ্মস্বরে কহিল, 'দিদি, বড়ঠাকুর মাকে নিয়ে কাশী যাবেন, এখানে আর থাকবেন না; তখন কত বললুম, মাকে বলে যাও, তা তুমি শুনলে না! এখন রাগ রঙ্গ রাখ তো, বড় ঠাকুরকে বলে কয়ে গোল মিটিয়ে ফেল: ওই যে তিনি আসছেন; দিদি ওঠ, এসময়ে মান অভিমান ক'রে সব নষ্ট করো না!'

রতন রায়ের পদ শব্দ শুনিয়া কল্যাণী বাহির হইয়া গেল; তিনি ঘরে আসিয়া দেখিলেন সুজাতা শুইয়া আছে। 'অসময়ে শুয়ে আছ কেন?' বলিয়া খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। সুজাতা তখন উঠিয়া বসিল; তাহার অশ্রুমাখা মুখের পানে চাহিয়া রতন রায় বলিলেন, 'তুমিও কাঁদছ! এই কান্না আর কলহ, কি করলে বন্ধ হয়, তা আমায় বলতে পার, সুজাতা?'

একটা কথা সুজাতার খুবই মনে আসিতেছিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না, কল্যাণীর কথা শুনিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে নীরবে কাঁদিতে দেখিয়া রতন রায়

একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'কান্না এখন থামাও, স্থির হয়ে আমার কথার জবাব দাও তো! তুমি নাকি বাপের বাড়ী গিয়ে থাকবে ঠিক করেছ? তার কি দরকার, আমরা সাত দিন পরেই চলে যাব, তখন তুমি এখানেই বেশ স্বাধীন ভাবে থাকতে পারবে।'

স্বামীর অভিমানভরা কথাগুলি সুজাতার মর্ম্ম বিদ্ধ করিল, সে মুখ তুলিয়া কাতর নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার নীরব ভাষা রতন রায় বুঝিতে চাহিলেন না, তিনি কঠিন স্বরে কহিলেন, 'কি বলতে চাও, স্পষ্ট ক'রে বল, চুপ ক'রে থেকো না। আমায় বুঝিয়ে দাও, যাকে না ব'লে আমি কিছু করি না, তুমি কি ক'রে সে সাহস কর? অন্যায় ক'রে মাপ চেয়ে নিতেও জান না; পুত্র শোক সইতে পেরেছ, কিন্তু মা কিছু বললে তা অসহ্য হয়ে ওঠে। তুমি কেন ভুলে যাও, মার সেবা করা তোমারই কাজ, তুমি বড় বউ; সেতো করই না, খেয়ালের জন্যে মাকে কষ্ট দিয়ে বাপের বাড়ী যেতে চাও! এসব কি সুজাতা? বিয়ের পরে যে মেয়েদের বাপের বাড়ীতে থাকতে হয়, তাদের কথা ভাব দেখি, তা'হলে ওকথা আর মনেও আনতে পারবে না! এমনি কোরে আমাদেব বাড়ী-ছাড়া করবে, না রয়ে সয়ে সবাইকে নিয়ে থাকতে পারবে—আমি এই কথাটাই শুনতে চাই।'

সুজাতা নতমুখে ভাবিতেছিল, কি বলিবে—রতন রায়কে সে চিনিত; এই অর্দ্ধ উদাসীন লোকটি যদি সত্যই সংসার ছাড়িয়া যায়, তবে মা বাপ, এমন কি সইও তার মুখ আর দেখিবে না! রতন রায় উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার চিন্তায় আর বাধা দিলেন না।

বহুক্ষণ পরে শিশির সিক্ত শুভ্র শতদলের মত অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া সুজাতা বলিল, 'ওগো, কেন আমায় ওসব কথা বলে ব্যথা দিচ্ছ? তুমি তো আমায় জান; আমি যে কত কষ্ট পেয়েছি, কত অপমান সয়ে তবে এখান থেকে যেতে চেয়েছি তাকি তুমিও বুঝবে না? বেশ, আজ থেকে আমার সব যাক—মনের সুখ সাধ, ন্যায় অন্যায়, বিচার বিবেচনা সব দূরে সরে যাক, শুধু তুমি থাকো। তোমার সুখই আমার একমাত্র কামনা হোক—তারি জন্যে আমি সব করবো; তোমার মাকে মা, ভাইদের ভাই বলেও মনে করবো, কিন্তু তোমায় ছাড়তে পারবো না।'

'তবে যাও।' বিছানায় বসিয়া পড়িয়া রতন রায় ক্লান্ত স্বরে কহিলেন, 'মার এখনো খাওয়া হয় নি সুজাতা, তাঁকে জল খেতে দাও গে; তিনি আজ মনে বড় কষ্ট পেয়েছেন, মিষ্ট ব্যবহারে তাঁকে শান্ত ক'রে এসে আমাদের খাবার দিতে বল; আমি একটু জিরিয়ে নি।'

ধীরে ধীরে সুজাতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীমতী হেমবালা বসু

কালবৈশাখী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

ওগো কাল ওগো ভয়ঙ্কর
তোমার বৈশাখী নৃত্যে পৃথ্বীব্যোম্ কাঁপে থর থর
হুহুঙ্কারে গর্জ্জি' উঠে প্রভঞ্জন প্রলয়ের বেশে
উন্মাদ প্রলয়লীলা ভীমরোলে অট্টহাসি হেসে
বজ্রনাদে কাঁপায় অম্বর ;
হে কাল বৈশাখী মূর্ত্তি রুদ্ররূপী ভীষণ সুন্দর।
কৃষ্ণমেঘ রুক্ষ জটাজাল,
অনল বিদ্যুৎশিখা শিবনেত্রে চমকে ভয়াল।
শঙ্কাকুল বিশ্বভূমি আর্ত্তরবে করে হাহাকার,
পবন শ্বসিছে ফিরি উচ্চারিয়া সংহার, সংহার,—
শান্ত হও ওগো মহাকাল,
বৈশাখের ঝঞ্চাবাতে একি খেলা খেল চিরকাল!
সশঙ্কিত অচল মৈনাক
মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত গর্জ্জে তব হে ইন্দ্র বৈশাখ
দধিচীর অস্থিপুঞ্জ কভু কিগো হবেনা শীতল
বর্ষে বর্ষে উদ্গারিবে ধরাতলে প্রলয় অনল
ঝঞ্চাবাহু করিয়া বিস্তার ;
কাঁদিছে নিখিল চিত্ত ব্যর্থতার তুলি হাহাকার।

বহে উষ্ণ প্রলয়ের বায়ু,
প্রচণ্ড নিঃশ্বাস তব হরিবারে জীর্ণতার আয়ু ;
উন্মত্ত সমুদ্র হ'তে উর্ম্মিমালা ধরাবক্ষে ধায়
বিশ্ব করে টলমল সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়,
ভয়ত্রস্ত কাঁপে চরাচর,
থামাও বিপ্লব মূর্ত্তি ক্ষান্ত হও ওগো ভয়ঙ্কর।
বাজে তব প্রলয় বিষাণ
দিগন্ত ভরিয়া ক্রুদ্ধ প্রতিধ্বনি ধরে তার তান ;
ফেনিল তরঙ্গ তুলি নদনদী উঠিছে ফুলিয়া
ভীষণ আক্রোশে চাহে ধরিত্রীরে ফেলিতে গ্রাসিয়া,
শান্ত হও মরণ ঈশ্বর,
হে কাল বৈশাখী মূর্ত্তি রুদ্ররূপী ভীষণ সুন্দর!
কাঁপে দ্রুত বক্ষের স্পন্দন
মর্ম্মভেদী হাহাকারে বনানীর উঠিছে ক্রন্দন
সৃজনের বক্ষ 'পরে হে নিষ্ঠুর নির্ম্মম দেবতা
অভয় প্রার্থনা শুনি বুকে তব বাজেনা কি ব্যথা?
কঠোর কি রবে চিরকাল,
হে ভৈরব! হে পাষাণ! রুদ্ররূপী ওগো মহাকাল!

দারা ও সুজার শেষ জীবন

অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু এম-এ

সামুগড় যুদ্ধ অবসানে ভাগ্যহীন বিজিত সাহাজাদা দারা পিতা সাহজাহানের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও আগ্রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া নিজের পবিবারবর্গ ও অনুচরগণের সহিত নানা ঘটনার মধ্য দিয়া দিল্লী পৌছিলেন (৫ জুন, ১৬৫৮ খৃঃ)। সরকারি সম্পত্তি হস্তগত করিয়া এখন তিনি নূতন সৈন্যসংগ্রহে মন দিলেন। ওদিকে, আগ্রা দুর্গ আওরংজীবের করতলগত হইল। এই সংবাদে ভীত হইয়া দারা দিল্লী হইতে লাহোর রওনা হইলেন। পাঞ্জাবের সমস্ত অধিবাসী দারাব অনুগত ছিল। সাহজাদা এই দেশ বহুকাল শাসন করিয়াছিলেন। উপস্থিত তাঁহারই এক কর্ম্মচারীর হস্তে এই দেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। দশ হাজার সিপাহী লইয়া দারা লাহোর পৌছিলেন (৩ জুলাই)। পুনরায় যুদ্ধের জন্য সমস্ত আয়োজন শেষ করিতে তাঁহার দেড় মাস সময় লাগিল। স্থানীয় সরকারী খাজনাখানা তাঁহার করায়ত্ত হইল। ক্রমে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ হইল, খেয়াঘাটগুলির উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইল।

ওদিকে, সুচতুর বিজয়ী আওরংজীব তাঁহার অনেক সেনাপতি খাঁ-ই-দৌরানকে এলাহাবাদ দখল করিবার জন্য এবং অপর এক সেনাপতি বাহাদুব খাঁকে তাঁহার পলাতক জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া নিজে দিল্লী রওনা হইলেন (৬ জুলাই)। প্রায় সাতমাস দিল্লী বাস করিয়া তিনি সেই স্থানে এক নূতন শাসন ব্যবস্থার অনুষ্ঠান করিলেন, এবং পরে, "আলমগীর গাজী" নাম লইয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (২১ জুলাই)। দারার অনুসরণে প্রবৃত্ত বাহাদুব খাঁর সৈন্যের সাহায্যার্থ পঞ্জাবের নূতন শাসন কর্ত্তা খলিল উল্লা খাঁকে পাঠান হইল।

সম্রাটসৈন্য দারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুচ করিতে লাগিল। বিপক্ষের আগমনে দারার সৈন্যাধক্ষেরা সতলেজ নদী পরিত্যাগ করিয়া বিয়াস নদী তীরে উপস্থিত হইল। আর দারা নিজে পরিবারবর্গের সহিত লাহোর হইতে মুলতান যাত্রা করিলেন। এইরূপ স্থানান্তরে পলায়ন হেতু দারা নিজে ত হতাশ হইয়া পড়িলেনই, উপরন্তু তাঁহার সৈন্যেরাও একেবারে নিরাশ হইল।

আওরংজীব কিন্তু একেবারেই নাছোড়বান্দা—জ্যেষ্ঠের পলায়নে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাকে বন্দী করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প। এবার তিনি নিজে অনুসরণকারী সৈন্যে যোগদান করিলেন (১৩ সেপ্টেম্বর)।

দারা এইবার মুলতান হইতে সক্কর পলায়ন করিলেন (১৩ অক্টোবর)। কিন্তু আওরংজীব আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তাঁহার মধ্যম সহোদর সুজা এক সৈন্য লইয়া আওরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এলাহাবাদের নিকট উপস্থিত। কাজেই, তাঁহাকে শীঘ্র দিল্লী ফিরিতে হইল (৩০শে সেপ্টেম্বর)। পনের হাজার সৈন্য লইয়া কেবল সফশিকন খাঁ ও শেখ মীব দারার পিছু লইল।

সক্কর পৌছিয়া সম্রাট সৈন্য খবর পাইল, পাখী আবার আবার উড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সম্পত্তি, বড় বড় কামান ও নিজের গোলান্দাজ সিপাহীদের সক্কর দুর্গে রাখিয়া দারা সেওয়ানের দিকে পলায়নপর হইয়াছেন। তখন দারার সহিত মাত্র তিন হাজার অনুচর অবশিষ্ট। এই দুর্দ্দিনে একে একে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এমন কি তাঁহার অতি বিশ্বস্ত অনুচর পর্য্যন্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে ইতস্ততঃ করে নাই। ক্রমে সম্রাট সৈন্য সক্কর পৌছিল ও দারার গতিরোধ করিবার জন্য সিন্ধু নদীর দুই তীর অধিকার করিল। কিন্তু উহাদের অল্পসংখ্যক নৌকা দারাব গতিরোধ করিতে পারিল না। নির্ব্বিঘ্নে নদী-উত্তীর্ণ হইয়া দারা টাট্টা পৌছিলেন (১৩ নভেম্বর)।

সম্রাট সৈন্যও তখন টাট্টা পৌঁছিল। দারা এইবার দক্ষিণে কচ্ উপসাগর দিয়া গুর্জ্জর পলায়ন করিলেন। দারাকে আর অনুসরণ করা নিরর্থক হইবে মনে করিয়া সম্রাট তাঁহার সৈন্যদের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হুকুম দিলেন।

(২)

টাট্টা হইতে পলায়ন কালে "রাণ" বা জলাভূমি পার হইবার সময় পানীয় জলের অভাবে দারা অশেষ কষ্ট পাইলেন। কচ্ দ্বীপের রাজধানী পৌঁছিলে সেখানকার রাজা ও কাথিয়াওয়াড় প্রদেশের সর্দ্দার "নওয়ানগরের জাম" সাহাজাদাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণ করিলেন। এই প্রকারে প্রায় তিন হাজার অনুচরের সহিত তিনি আহমদাবাদ যাত্রা করিলেন। এই প্রদেশের নূতন শাসনকর্ত্তা সাহনওয়াজ খাঁ তাঁহার সহিত যোগদান করিল ও রাজকোষ সাহাজাদার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিল (জানুয়ারী, ১৬৫৯)। দারার সৈন্য সংখ্যা এখন বাইশ হাজার হইয়া দাঁড়াইল। দারা সুরত হইতে কামান আনয়ন করিলেন। আওরংজীবকে আক্রমণ করিবার জন্য সুজা এলাহাবাদ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছেন জানিতে পারিয়া দারা আগ্রা অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। পথে, তিনি আজমীর সর্দ্দার যশোবন্ত সিংএর নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পাইলেন। ইনি রাঠোর বা অন্যান্য রাজপুত জাতিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

ওদিকে, আওরংজীব খাজওয়া যুদ্ধে সুজাকে পরাজয় করিয়া (৫ই জানুয়ারী) মিরজা রাজার সাহায্যে যশোবন্তকে এককালে আক্রমণের ভয় ও পদোন্নতির আশা দিয়া নিজের দলে আনিলেন। যুদ্ধ করা ব্যতিরেকে দারার তখন আর অন্য কোন উপায় রহিল না। আওরংজীব তাঁহার সমীপে পৌঁছিয়াছেন। দারা বুদ্ধি করিয়া নিজের কৌশল পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি খোলা মাঠে যুদ্ধ না করিয়া আজমীর হইতে চার মাইল দক্ষিণে দেওরায় গিরি পথটি দখল করিবেন ঠিক করিলেন, কারণ, এই সংকীর্ণ গিরিপথ হইতে মাত্র মুষ্টিমেয় সৈন্য বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্যের অগ্রগমনে বাধা দিতে পারে। এই গিরিবর্ত্মের দুই পার্শ্বে দুই গিরিশ্রেণী, আর, পশ্চাতে সমৃদ্ধিশালী আজমীর সহর। এই সহর হইতে অনায়াসে সৈন্যের রসদ পাওয়ার সম্ভাবনা। দারা এক গিরিশ্রেণী হইতে অপর গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত এক নীচু প্রাচীর, সম্মুখে পরিখা এবং স্থানে স্থানে উপদুর্গ তৈয়ারী করিলেন।

আওরংজীব দক্ষিণ দিক হইতে দারার বিপক্ষে অগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন রাত্রি পর্য্যন্ত গোলা বর্ষণ চলিল (১২ই মার্চ্চ, ১৬৫৯)। দারার গোলন্দাজ ও বন্দুকধারী সৈন্য উচ্চ স্থান হইতে আওরংজীবের সৈন্যের উপর মৃত্যু বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু আওরংজীবের সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না। অগত্যা আওরংজীব এক সভা আহ্বান করিলেন। ইহাতে সাব্যস্ত হইল, বহুসৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের বাম অংশ আক্রমণ করা হইবে ও সেই সঙ্গে বিপক্ষের দক্ষিণ অংশকেও যুদ্ধে নিযুক্ত করিতে হইবে। শত্রুকে সম্মুখ হইতে আক্রমণ করায় সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না। পর্ব্বত আরোহণে দক্ষ জম্বুগিরির রাজা যদি তাঁহার সৈন্য লইয়া পশ্চাৎ হইতে গিরিশ্রেণী আরোহণ করিয়া বিপক্ষ সৈন্যকে অকস্মাৎ আক্রমণ করেন তাহা হইলে উদ্দেশ্য সফল হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই; সম্রাটবাহিনী বিপক্ষ সৈন্যের বাম অংশ আক্রমণ করিল (১৪ই মার্চ্চ)। প্রবল কামান বর্ষণ চলিল। দারার সৈন্যের অপর অংশ নিজেদের স্থান ছাড়িয়া শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত বামের সহকর্ম্মীদিগের সাহায্যের জন্য যাইতে পারিল না। তুমুল যুদ্ধ চলিল। দারার সৈন্যেরা খুবই দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত সম্রাট সৈন্য বিপক্ষকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা দারার সৈন্যকে মাঠ হইতে বিতাড়িত করিয়া শত্রুপক্ষের পরিখা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি অধিকার করিল।

ইতিমধ্যে জম্বুগিরির সৈন্যেরা বিশেষ পরিশ্রম সহকারে গিরিশ্রেণীর উপর আরোহণ করিল। সে সময়ে বিপক্ষ সৈন্য সম্মুখে তুমুল সংগ্রামে নিযুক্ত ছিল। জম্বু সৈন্য পর্ব্বতের শিখরদেশে নিজেদের জয়পতাকা প্রোথিত করিয়া

চীৎকার আরম্ভ করিল। পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইয়া দারার সৈন্যের বাম অংশ সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িল। তথাপি তাহারা সাহসের সহিত যুদ্ধ করা বন্ধ করিল না। শত্রু পক্ষের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে আওরংজীবের সেনাপতি শেখ মীর নিজের হস্তী অগ্রসর করিলেন। কিন্তু, বিপক্ষের গুলিতে তিনি নিহত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহাদের আশা ভরসা লোপ পাইলেও, দারার সৈন্যেরা তাহাদের সেনাপতি সাহনওয়াজ খাঁর পরিচালনায় একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু অকস্মাৎ এক গোলার আঘাতে সাহনওয়াজের মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার সৈন্যেরা রণে ভঙ্গ দিল।

ওদিকে, গিরিশ্রেণীর দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় দারার অবশিষ্ট সৈন্য আর দাঁড়াইতে পারিল না। তখন, দারা তাঁহার পুত্র সিপির সুকো ও বারটি অনুচর লইয়া গুর্জ্জর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। আজমীর শহরের আশপাশে লুটপাট চলিল। যশোবন্তের আহ্বানে সহস্র সহস্র রাজপুত সৈন্য একত্র হইয়া, শকুনির মত শিকারের আশায় চারিদিকে ঘুরাফেরা করিতেছিল। এখন সুবিধা পাইয়া তাহারা পরাজিত সৈন্যের দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন কবিতে লাগিল।

দেওরায়ে যুদ্ধের সময় দারার পরিবারবর্গ ও সঞ্চিত ধনরত্ন তাঁহার এক বিশ্বস্ত খোজার অধীনে একদল সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণে আজমীরে অবস্থিত অনাসাগর হ্রদের তটে অবস্থান করিতেছিল। দারার পরাজয় সংবাদে তাহারা সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া (১৪ই মার্চ্চ) পরদিন বৈকালে মায়েরটা নামক এক স্থানে দারাব সঙ্গ লইল। ইতিপূর্ব্বে, আওরংজীব পলাতকদিগের অনুসরণ করিবার জন্য জয়সিং ও বাহাদুব খাঁর অধীনে সৈন্য প্রেরণ কবিয়াছিলেন। সুতরাং দারা কোন স্থানে বিশ্রামেব অবকাশ পাইলেন না। বিলম্ব হইলেই বিপদের সম্ভাবনা। তাঁহাকে পলায়নের বেগ বর্দ্ধিত করিতে হইল। মায়েরটা পরিত্যাগ করিবার সময়ে তাঁহার সহিত দুই হাজার পদাতিক ছিল। অত্যধিক গ্রীষ্ম ও ধূলার মধ্যে, প্রতিদিন কিঞ্চিদধিক ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করায় দারাকে অশেষ কষ্টভোগ করিতে হইল। শিবির বা ভারবাহী পশুর অভাবে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁহার অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক অশ্ব ও উষ্ট্র পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

দারা দেখিলেন যে, আওরংজীবের পত্র চারিদিকেই পৌঁছিয়াছে, এবং স্থানীয় সম্রাটকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে প্রস্তুত। আহমদাবাদ হইতে দারার দূত ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, তিনি এই সহরে প্রবেশলাভ করিবার চেষ্টা করিলে ব্যর্থ হইবেন। সাহজাদা নিরাশ হইয়া পড়িলেন। আশ্রয়লাভের আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল। দারার অনুচরেরা হতবুদ্ধি ও ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং তাঁহার পুরমহিলাদের মর্ম্মভেদী চীৎকারে সকলের নয়নে অশ্রু দেখা দিল। এই সময়ে ডাক্তার বার্ণিয়ে দারার পীড়িতা স্ত্রীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। সাহাজাদার অনুচরেরা কিরূপ দুর্গতি ও কষ্টভোগ করিয়াছিল তাহারই এক শোচনীয় বর্ণনা বার্ণিয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের অবস্থা ভিখারীর কাঁথার মত হইয়াছিল। সাহজাদার নিকট তখন একটি অশ্ব, একটি গোযান, মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঁচটি ও আরও গুটিকয়েক উট ছিল।" সাহজাদা সেই ভীষণ রাণ্ পুনরায় উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুপ্রদেশের দক্ষিণে পৌঁছিলেন।

আওরংজীবের দূরদর্শিতা হেতু সিন্ধুদেশের দক্ষিণেও দারার গন্তব্য পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। আওরংজীবের আদেশক্রমে খলিলউল্লা খাঁ লাহোর হইতে ভাকরে রওনা হইয়াছিলেন। সম্রাটের অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারী এবং জয়সিংএর সৈন্য উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে দারার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সুতরাং, পলায়নেব জন্য মাত্র একটি পথ উন্মুক্ত ছিল। সেক্ষেত্রে, কান্দাহাবের পথে পারস্য দেশে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্য দারা উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে রওনা হইয়া সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইলেন ও সিউই স্থানে প্রবেশে করিলেন।

ইতিমধ্যে, পানীয় জলের অভাব, রসদের অল্পতা, এবং অশ্ব বা ভারবাহী পশুদের ক্লান্তি উপেক্ষা করিয়া, প্রতিদিন ষোল হইতে কুড়ি মাইল পথ গমনোপযোগী বেগে জয়সিং আজমীর হইতে দারার বিরুদ্ধে ধাবিত হইতেছিলেন। এই রাজপুত সর্দ্দার দারা ও তাঁহার অনুচরদের পদচিহ্ন

লক্ষ্য করিয়া ছোট ও বড় "র‍্যাণ্" এবং কচ দ্বীপ উত্তীর্ণ হইলেন। পথে খাদ্যাভাবে তাঁহাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি ভীষণ দৃঢ়তার সহিত লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। তিনি সিন্ধুনদী তীরে উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাইলেন, যে দারা ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি পশ্চাদপদ হইলেন।

দারার পরিবারবর্গের কেহই পারস্য যাইতে সম্মত ছিলেন না। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী নাদিরা বানু সান্নাতিক পীড়িতা। জনশূন্য বোলান গিরিবর্ত্ম এবং অনুর্ব্বর কান্দাহার প্রদেশের মধ্য দিয়া গমনজনিত কষ্টে তাঁহার মৃত্যু হইবার খুবই সম্ভাবনা, সুতরাং দারা তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তিনি পারস্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন না। তাঁহাকে নিরাপদ আশ্রয় এবং লোকবল দিয়া সাহায্য করিতে পারে এমন কোন এক নিকটবর্ত্তী সর্দ্দারের তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে, বোলান গিরিপথের নয় মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত দাদর প্রদেশের জমীদার মালিক জিউন হয়তো তাঁহাকে উপকার করিতে পারেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, সম্রাট সাহজাহানের আজ্ঞায় এই সর্দ্দারকে শাস্তি দিবার জন্য হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পিতার প্রিয়পুত্র দারা সম্রাটের নিকট অপরাধীর প্রাণভিক্ষা করিয়াছিলেন। সর্দ্দারের জীবন সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। এই বিপদসময়ে সেই সর্দ্দার তাঁহার প্রত্যুপকার করিবেন এই আশায় সাহজাদা দাদর পৌঁছিলেন। জিউন দারাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা ও তাঁহার সেবা যত্ন করিল।

দাদর যাইবার সময় পথের কষ্ট এবং ঔষধ বা বিশ্রামের অভাবে নাদিরা বানু ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। সাহজাদা তাঁহার জীবনসঙ্গিনীকে হারাইয়া দুঃখে পাগল হইলেন। তাঁহার নিকট পৃথিবী তমসাবৃত মনে হইল; তিনি একেবারে দিশাহারা হইলেন। তাঁহার বিচারশক্তি ও বুদ্ধি তিরোহিত হইল।" স্বীয় দীক্ষাগুরু ফকীর মিঞা মীরের কবরস্থানে সমাধি দিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর গুলমহম্মদ ও অবশিষ্ট ৭০টি পদাতিক সিপাহীর সাহচর্য্যে দারা তাঁহার পত্নীর মৃতদেহ লাহোরে প্রেরণ করিলেন। অনুচরদিগের উপর আদেশ হইল যে, যদি তাহাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহারা স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে, এবং যাহাদের ফিরিবার ইচ্ছা নাই তাহারা সাহজাদার সহিত পারস্যে যাইতে পারে। দারার নিকট এখন একটিও বিশ্বাসী অনুচর রহিল না। তিনি নিরুপায় হইলেন। আশ্রয়দাতা কখন বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না এই মনে করিয়া তিনি জীউনএর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

কিন্তু জীউনের অর্থলোলুপতা তাহার অপরাপর কোমল হৃদয়বৃত্তি নষ্ট করিল। সত্যানুরাগ যে পরম ধর্ম্ম, জীবন-রক্ষাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া যে প্রত্যেক মানবেরই অতি অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা সে ভুলিল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করিল। দারা, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এবং কন্যা দুইটিকে বন্দী করিয়া সে বাহাদুর খাঁর নিকট প্রেরণ করিল (৯ই জুন, ১৬৫৯)। (ক্রমশঃ)

শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু

নারীর মন *

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত এম-এ

এখন সে প্যারির একজন নামজাদা অভিনেত্রী, কিন্তু যে-সময়কার কথা আমরা বলছি তখন সে সাধারণ মেয়েদেরই একজন। তা'র প্রেমে পড়েছিল এক তরুণ কবি। কবির প্রেম তরুণীর অন্তরকে ভরে দিয়েছিল অপরূপ মাধুর্য্যে। তা'রা থাকতো ড্যান্যুব নদীর তীরে এক ক্ষুদ্র সহরে। দারিদ্র্যের দুঃখ তা'দের অন্তরকে একেবারেই স্পর্শ ক'রতে পারত না। কবি কাব্য রচনা করত আত্মভোলা হ'য়ে। কবির সাফল্যে তা'র তরুণী প্রিয়ার আনন্দ ধরত না—প্রণয়ীর গলায় সে জয়মাল্য পরিয়ে দিত। এম্‌নি ক'রে দিন তাদের কেটে যাচ্ছিল। জীবনে কখনো ছাড়াছাড়ি হ'তে পারে এ ধারণা ছিল তখন তাদের স্বপ্নের অতীত। এমন সময় হাঙ্গেরীতে যুদ্ধ বাঁধল। বিপুল আয়োজন ক'রে অষ্ট্রীয়ানরা হাঙ্গেরী অধিকার ক'রতে এল। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কবি ম্যাগিয়ার সৈন্যদলে ভর্ত্তি হ'ল। ক'মাস ধরে ভীষণ যুদ্ধ চলল। অবশেষে রুষ ও অষ্ট্রীয়ার মিলিত সৈন্যের কাছে ম্যাগিয়ার সৈন্য পরাজয় স্বীকার করলে।...

শত্রুসৈন্য শহর অধিকার করেছে। তরুণী খবর পেলে, যুদ্ধে তা'র প্রণয়ীর মৃত্যু হ'য়েছে। তরুণী কাঁদলে, কেঁদে কেঁদে চোখ তা'র লাল হ'য়ে উঠল, তারপর—চিরদিন যা' হয়—বিবাহ করলে আর একজনকে।

* * * *

ফ্রাউ ভন্ কুবিনী—এখন সে এই নামেই পরিচিত—বিবাহের কিছুদিন পরেই স্থির করে ফেললে, স্বামীর সঙ্গে থাকা তা'র পক্ষে সম্ভবপর নয়। লোকটি কেমন সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। তা'র পূর্ব্ব প্রণয়ী প্রায়ই বলত, অভিনেত্রী হ'লে সে সহজেই সুনাম অর্জ্জন করতে পারবে—এখন সেই কথাটাই তা'র মনের মধ্যে কেবলই জাগতে লাগল। রঙ্গমঞ্চে যাওয়াই শেষে সে স্থির করলে। স্বামীর কাছ থেকে পৃথক হ'য়ে দিনকতক সে রইল শুধু পড়াশুনা নিয়ে। শহরের এক রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষের সঙ্গে তা'র একটু আধটু পরিচয় ছিল—কাজ যোগাড় হ'য়ে গেল সহজেই। প্রথম দু'চারটে ছোটখাটো ভূমিকায় একটু খ্যাতি অর্জ্জন করার পর সে নামতে লাগল নায়িকার ভূমিকায়। মাস কয়েকের মধ্যেই তা'র নাম লোকের মুখে মুখে। তা'র সঙ্গে দেখা করার জন্যে কত লোকেই না উৎসুক! শহরের ধনীরা অভিনয়ের পর রোজই তা'র সাজঘরের সামনে ভীড় করে ফুলের তোড়া হাতে ক'রে। অভিনেত্রী কারো পানে চেয়ে দেখে না।... ..

হঠাৎ একদিন অভিনেত্রীর একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সৈন্যবিভাগের কর্ত্তা—সহরের শাসনভার এখন যাঁর হাতে—তিনি এসেছিলেন কুবিনীর অভিনয় দেখতে। লোকটি আধবয়সী—চেহারায় অভিজাত্যের ছাপ আছে আর ব্যবহারও অত্যন্ত মোলায়েম। অভিনয়ের পর তিনি কুবিনীর সঙ্গে দেখা করলেন। রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তাও সঙ্গে ছিলেন। কুবিনী তাঁর ফুলের তোড়াটি আগ্রহের সঙ্গেই নিলে। নেবার সময় তার ঠোঁটের কোনে গর্ব্বের একটু হাসি ফুটে উঠল। অত বড় লোকটা যে ভাবে তা'কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলে তা'তে মনে একটু গর্ব্ব না হওয়াটাই আশ্চর্য্য!......দু'চারদিন পরেই লোকে শুনলে, কুবিনী রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে—সে আছে সৈন্যাধ্যক্ষের গৃহে তাঁ'র প্রণয়িনী হ'য়ে। সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর প্রণয়িনীকে সুখী করতে কিছুরই অভাব রাখেন নি। বিলাসে সমারোহের মধ্যে কুবিনীর দিন কাটতে লাগল।......

তারপর একদিন এক কল্পনাতীত ব্যাপার ঘটে গেল

* গী দ মোপাসাঁ হইতে

যাকে সবাই মৃত বলেই জান্‌ত সে ফিরে এল বেঁচে। সেদিন কুবিনী সৈন্যাধ্যক্ষের গাড়ী ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছিল—নরম গদীতে হেলান দিয়ে বসে অন্যমনস্ক-ভাবে দু'পাশের জনতাকে সে লক্ষ্য করছিল, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে গেল পথচারী এক সাধারণ অশ্রীহান্ সৈনিকের উপর। কুবিনী নিজের অজ্ঞাতেই চেঁচিয়ে উঠল অব্যক্ত বিস্ময়ে!…তা'র সে চীৎকার কারো কানে পৌঁছল না—কেউই লক্ষ্য করলে না এই স্থিরচিত্ত উচ্ছ্বাসবৰ্জ্জিত নারীর আকস্মিক চাঞ্চল্য! পথের যে দৈনিকটি তা'কে হঠাৎ এমনি ক'রে বদলে দিলে তারো পানে দৃষ্টি দিলে না কেউ!

* * * * * *

পরের দিনই কবির ডাক পড়ল। কবি তো ভেবেই পেলে না, কী এমন্ কারণ থাকতে পারে যা'র জন্যে তা'কে প্রয়োজন হ'তে পারে সৈন্যাধ্যক্ষের। বেশ একটু কৌতূহল নিয়ে সে সৈন্যাধ্যক্ষের আবাসে উপস্থিত হ'ল।

কবি জানত না সৈন্যাধ্যক্ষের প্রণয়িনী কে—সে শুধু শুনেছিল তাদেরই দেশের এক মেয়ে সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে—শুনে অবধি তা'র প্রতি তা'র মন বিতৃষ্ণায় ভরে ছিল। তা'র কেবলই মনে হচ্ছিল, তা'র সঙ্গে দেখা না হ'লেই ভাল।

সে যে আসবে একথা যেন আগে থাকতেই কর্ত্রীর জানা ছিল। তা'কে সে এক ভৃত্যের সঙ্গে ভিতরে পাঠিয়ে দিলে। বারান্দায় এক কোণে টেবিলের উপর চাকরদের ব্যবহারের একপ্রস্থ পোষাক পড়েছিল, ভৃত্য সেইদিকে তা'র দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললে, তা'রই জন্য ঐগুলো আনা, কর্ত্রীর খাসকামরার চাকর সে। কবির চোখদুটো ক্রোধে আরক্ত হ'য়ে উঠল—কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। অদৃষ্টের পরিহাস মনে ক'রে নিজেকে সংযত ক'রে নিলে।…সে ভাবতে লাগল, কোনদিন কি এই নারীর প্রতি কোন অবিচার করেছে—যার জন্য তা'কে এইভাবে অপমানিত করার আয়োজন! কোনো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'বার আগেই সংবাদ এল, কর্ত্রী তাকে আহ্বান করেছেন।

সংবাদ-বাহক তা'কে এক সুসজ্জিত কক্ষে পৌঁছে দিয়ে অন্যত্র চলে গেল। কবি দাঁড়িয়ে রইল কর্ত্রীর প্রতীক্ষায়। খানিক পরেই পর্দাটা সরে গেল—কর্ত্রী কবির সাম্‌নে এসে উপস্থিত। তা'কে বেশ স্থির বলেই মনে হ'ল, কিন্তু তা'র মুখখানা অত্যন্ত বিবর্ণ। মূল্যবান্ পরিচ্ছদে তা'র দেহ আবৃত। কবি তা'কে দেখেই চিনতে পারলে। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকলে, "ইর্ম্মা!"…

সে ডাক পিয়াসী তরুণীর বুকে বাজল তীরের মত। স্থির থাকতে পারলে না সে, প্রণয়ীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু এ শুধু ক্ষণেকের জন্যে। কবি তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে।

তরুণী বললে, "এর জন্য আমায় তুমি দোষ দিতে পার না! সবাই জানত, দেশের জন্য তুমি প্রাণ দিয়েছ।…আমি তোমার জন্যে কত কেঁদেছি……

কবি শ্লেষের সুরে বললে, "সত্যই তোমার অসীম দয়া। কিন্তু আমার কাছে তুমি কৈফিয়ৎ দিচ্ছ কেন? আমি তোমার দাস। তুমি আদেশ করবে—আমি তা' পালন ক'রব বিনা দ্বিধায়।……এই না-আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ!"

তরুণীর চোখদুটো জলে ভরে এল। সে মুখ ফিরিয়ে নিলে অশ্রু গোপন করতে।

কবি লক্ষ্য ক'রে বললে, "তোমাকে আঘাত করার জন্যে আমি ওকথা বলিনি। তবে আমার মনে হয়, আমাদের আর দেখা না হ'লেই ছিল ভাল।…কেন তুমি আমায় এইভাবে এখানে আটকে রাখতে চাও! তুমি যে-পথে চলেছ আমি তা'তে বাধা জন্মাতে চাই নে—আমায় আমার পথে চলতে দাও। আমার সুখ তুমি কেড়ে নিয়েছ—এখন চাও আমায় লাঞ্ছিত ক'রতে?"

তরুণী কান্নার সুরে বললে, "তুমি আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবলে কি ক'রে? তোমার দুর্ভাগ্যের কথা শোনার পর থেকে তোমায় সুখী ক'রতে কত চেষ্টাই না আমি করেছি!"

কথা শেষ না হ'তেই কবি ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল,

"তাই বুঝি তোমার বর্ত্তমান প্রণয়ীকে অনুরোধ করেছ আমায়—তোমার পূর্ব্ব প্রণয়ীকে তোমারই অধীনে একটা চাকরি দিতে।"

"তুমি আমায় এমন কথা বলছ……আমি যে……" তরুণীর কণ্ঠস্বর কান্নায় ধরে এল।

কবি তিক্ত কণ্ঠে বললে, "তুমি বোধ করি আমায় শাস্তি দিতে চাও তোমায় একান্ত ভাবে ভালবাসার জন্যে।…এতে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি না—নারীর স্বভাবই যে ঐ। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার এ লাঞ্ছনা তোমার এক নতুন অভিজ্ঞতার—এক নতুন আনন্দের কারণ হবে।"

তার কথা শেষ হ'বার আগেই তরুণী সেখান থেকে সরে গেল। পাশের ঘর থেকে তার কান্নার চাপা আওয়াজ কবি শুনতে পেলে, কিন্তু সে তা ভ্রূক্ষেপ করলে না। তরুণীর প্রতি তার ঘৃণা বেড়ে গেল যখন সে লক্ষ্য করলে চারিদিকের ঐশ্বর্য্য ও বিলাস।…

কিন্তু কেন এ ক্রোধ—কেন এ জ্বালা। সে তো তার দাসত্ব গ্রহণ করেছে, আর দাস যে তার তো স্বাধীন মত থাকতে পারে না—শুধু আদেশ পালন করাই যে তার কাজ।… ..

সৈন্যাধ্যক্ষের দুটী বন্ধু একটু পরেই চায়ের নিমন্ত্রণে আসবেন। কবিকে সে সময় হাজির থাকতে হবে তাঁদের কাছে।

* * * *

কবি ব্যস্ত ছিল পাকশালার কাজে পাচককে সাহায্য করতে। পাশের ঘরের হাসি তামাসা বেশ স্পষ্ট ভাবেই শোনা যাচ্ছিল। খানিক পরে পাচক দরজাটা খুলতেই কবির সারা দেহ উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ক্রাউন্‌ড কুবিনী—তার ডান হাতখানা সৈন্যধ্যক্ষের মুঠোর ভিতরে।…

কুবিনীর দৃষ্টি কবির মুখের উপর ন্যস্ত— সে-দৃষ্টিতে জয় বা ঘৃণার চিহ্নমাত্র নেই—আছে গভীর মমতা ও সহানুভূতি!

সে কি তবে কোনো দিন অজ্ঞাতে তার কোন অনিষ্ট করেছে!—কবি কেমন ধাঁধাঁয় পড়ে গেল!…

ঘৃণা, প্রেম, বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা, তার মনের মধ্যে এক তুমুল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করলে।…পাত্রে সুরা ঢালতে গিয়ে তার হাতটা কাঁপতে লাগল।

সৈন্যাধ্যক্ষ তাকে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করছিলেন।… "তুমি যার কথা বলছিলে সেই নাকি?"

প্রণয়িনী ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, "হ্যাঁ।"

সৈন্যাধ্যক্ষ একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "সামান্য ভৃত্য হ'বার জন্যে এর জন্ম হয়েছে বলে মনে হয় না।"

মৃদুস্বরে কুবিনী উত্তর করলে, "সৈনিক হবার জন্যেও না।"

কথাগুলো কবির অন্তরকে জোরে একটা ধাক্কা দিলে।… কিন্তু এটা সে বেশ বুঝতে পারলে কুবিনী তারই পক্ষ সমর্থন করছে সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে তার প্রকৃত পরিচয় পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে—পাছে কবির আত্মসম্মানে আঘাত লাগে তা'র জন্যে তাকে রীতিমত সন্ত্রস্ত বলে মনে হল।

কিন্তু কবির মন তখনো সন্দেহের আঁধার পথে ফিরতে লাগল।…নারী চায় বৈচিত্র্য—উত্তেজনা! একদিন যাকে ভালবেসেছিল—স্বেচ্ছায় হৃদয় দিয়েছিল, আজ তা'কে দয়ার ভিখারীরূপে পাওয়ায় বৈচিত্র্য, উত্তেজনা—দুইই আছে। নূতন প্রণয়ীর সামনে তাকে লাঞ্ছিত ক'রে যদি তার আনন্দ লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকত তা'হলে তাও হয়ত করতে সে কুণ্ঠিত হ'ত না।…

কবি হঠাৎ চোখ তুললে। চোখ তার কুবিনীর চোখের সাথে এক হ'য়ে গেল। কুবিনীর দৃষ্টি বেদনায় ভরা…কবি চোখ নামিয়ে নিলে…তার চিন্তাগুলো কেমন জোট পাকিয়ে গেল।

* * * * *

সেদিন থেকে কবি সৈন্যাধ্যক্ষের বাড়ীতে আছে। এবং আর তাকে কর্ত্রীর কোনো কাজই করতে হয় না। কর্ত্রী সঙ্গে দেখাও তা'র হয় না কোনো দিন—সেও খবর নেবার চেষ্টা করে না।

এই ভাবে কেটে গেল দু'মাস। হঠাৎ একদিন সৈন্যাধ্যক্ষ তাকে ডেকে পাঠালেন।

দর্শনার্থীরা যে ঘরে বসে ছিল কবি সেখানে উপস্থিত হ'ল। খানিক পরেই বাইরের কি একটা কাজ সে

সৈন্যাধ্যক্ষ ফিরলেন। তাঁকে দেখে সকলে উঠে দাঁড়াল। কবির দিকে দৃষ্টি পড়তেই সৈন্যাধ্যক্ষ তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি এখন যেখানে খুশী যেতে পারো—মুক্তিক্রয়ের অনুমতি পরিষদ্ তোমায় দিয়েছে।"

বিস্মিত কবি বললে, "সে কি!...কিন্তু আমি..."

"মুক্তিমূল্যও পরিষদ্ পেয়েছে—তুমি এখন মুক্ত।"

"এ যে আমি ভাবতে পারছি না। আপনি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা..."

"কৃতজ্ঞতা আমায় জানাবার কোনো দরকার নেই। তোমায় মুক্ত করেছেন ফ্রাউ ভন্ কুবিনী।"

কবির হৃদয়ের স্পন্দন যেন থেমে গেল। চেষ্টা করেও সে একটি কথা মুখ দিয়ে বা'র করতে পারলে না। নত হয়ে সৈন্যাধ্যক্ষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সে প্রস্থান করলে।...

কুবিনীর কক্ষের দিকে সে দ্রুতপদে চলল। তার প্রতি সে যে অবিচার করেছে—মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তাকে যে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছে তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করতে। তীব্র অনুশোচনায় তখন তার অন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে। কুবিনীর কক্ষদ্বারে উপস্থিত হ'তেই একটি পরিচারিকা জানিয়ে দিলে, কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে না তার।

রুদ্ধকণ্ঠে কবি প্রশ্ন করলে, "কেন?"

"এখানে নেই তিনি—চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন?...কোথায়?" কবির কণ্ঠস্বর আর্ত্তনাদের মত শোনাল।

"প্যারিতে...ঘণ্টা দুই আগে।"

কবি নিশ্চল—অব্যক্ত বেদনায় মুখ তার পাণ্ডুর।

পরিচারিকা ব্যস্তভাবে বললে, "অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে? শরীরটা ভাল নেই বুঝি? এসো, এখানে বসে একটু জিরিয়ে নাও—কোনো জরুরী কাজ নেই তো?"

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

কাবুলিওয়ালা *

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ

মানুষে মানুষে ভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গ'ড়ে তুলেছে মানুষের নিজ হাতের গড়া তা'র আপন সভ্যতা। এই সভ্যতা একদল মানুষকে সর্বদা মানুষের চক্ষে ধ'রেছে উজ্জ্বল ক'রে, সব কিছুতে তা'কে দিয়েছে প্রাধান্য, অপর আর একদলকে ক'রে রেখেছে অখ্যাত—সব কিছুতে তা'কে ক'রেছে গৌণ। সাহিত্যেও দেখি এই অখ্যাত দলের লোকদের করা হ'য়েছে অস্বীকার; তা'দের অবজ্ঞাত জীবনের রসের চিত্রের একটা মস্ত বড় দৈন্য, একটা মস্ত বড় শূন্যতা র'য়ে গেছে সাহিত্যের যুগ-যুগ-সঞ্চিত ভাণ্ডারে। যুগে যুগে সাহিত্য যা গ'ড়ে উঠেছে তা কেবল ঐ সভ্য সমাজের নরনারীর জীবন নিয়ে। তাই জগতের সাহিত্যের আজ শতকরা নিরানব্বই ভাগই হ'চ্ছে যা'কে বলা যেতে পারে বুর্জো literature বা নাগরিক সাহিত্য। অধুনা রুষ দেশে অবশ্য এই অখ্যাত অবজ্ঞাত লোকদের নিয়ে সাহিত্য গড়ে তুলবার খুবই প্রয়াস দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু তা'কে ঠিক সাহিত্য বলা যায় না, কেননা তা'দের জীবনের রসের চিত্রটি সেখানে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা হ'চ্ছে না, হ'চ্ছে শুধু তা'দের প্রতি বুর্জোয়াদের যুগ-যুগান্তরের অবিচার, অত্যাচারের নির্মম নিষ্ঠুর কাহিনী।

সভ্যতার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে যতই কেন না মানুষে মানুষে বৈষম্য দেখানো হ'য়ে থাক্, তবু—মানবহৃদয়ের এমন এক-একটি স্থান আছে যেখানে সব মানুষই এক, যেখানে সব মানবই হ'চ্ছে আদিম মানব। সেখানে "সেও যে আমিও সে", সেখানে শান্তস্বভাব মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন ভদ্র বাঙ্গালী ও পর্ব্বতবাসী বলিষ্ঠকায় স্বাধীনজীবনযাপী হিংস্র কাবুলিওয়ালায় কোনই প্রভেদ নেই। প্রেমের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বাৎসল্যের ক্ষেত্রে, মানবহৃদয়ের এই শাশ্বত বৃত্তি সব চাইতে বেশী হ'য়ে ওঠে পরিস্ফুট, সেখানে মানুষে মানুষে কোনই তারতম্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। মানবের এই মানবতাটুকু, তার প্রেমের এই চিরন্তন রহস্যটুকু অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্যে ফুটে উঠেছে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিতে। সমস্ত গল্পটি শরতের শুভ্রগম্ভীর সুনির্ম্মল প্রকৃতির ন্যায় একটি অপরূপ পবিত্রতায় মণ্ডিত। সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় একটা মুক্তির আস্বাদন, একটা বৃহতের স্পন্দন। সরলহৃদয়া বালিকা মিনি ও পর্ব্বতবাসী কাবুলিওয়ালার মধ্যে প্রীতির যে নিগূঢ় বন্ধন অতি দ্রুত গড়ে উঠেছে তা'র মধ্যে আছে শরৎ আকাশের একটা ব্যাপ্তি একটা শান্তোজ্জ্বল স্নিগ্ধ ছবি। এ তো নরনারীর যৌবনের প্রেম নয়, এ যে মানবের সুপ্ত পিতৃহৃদয় হ'তে উত্থিত। এ প্রেমের প্রকৃত সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এর মধ্যে চঞ্চলতা নেই, আছে গভীরতা, আছে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তির ছায়া। এ যে একটি সরলহৃদয়া বালিকার সঙ্গে একটি মানবের স্নেহের বিচিত্র কাহিনী যার প্রকৃত কৃত্রিম সভ্যতার হিমস্পর্শে তা'র বালকসুলভ সহজ সরলতাটুকু,—তা'র সহজ গতিটুকু বিকিয়ে দেবার অবকাশ পায় নি। জটিল মনস্তত্ত্বের কঠিন বিশ্লেষণ এতে নেই, অতৃপ্ত কামনার আবেগ এতে নেই, সুখের উন্মাদনা নেই, দুঃখেরও হাহাকার ধ্বনি নেই; আছে শুধু দুটি অন্তরের বিচিত্র সুন্দর সহজ প্রেমকাহিনী যা'র মধ্যে তীব্রতা নেই আছে গভীরতা। যে দুটি চরিত্র নিয়ে এই সহজ সরল সুন্দর প্রেম আখ্যান গড়ে উঠেছে তা'রা নিজেরাই তা'দের প্রেম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ নয়, তা'র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চেতন নয়। "শিশু আননের সরল হাসির মতো" তা যেমন আপনি সহজে ফুটে উঠেছে তেমনি সহজে আবার তা মিনির বয়সের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা'র হৃদয় হ'তে ঝরে প'ড়েছে। তাই বলছিলাম গল্পটির মধ্যে আছে একটা ব্যাপ্তির, একটা মুক্তির সুর। বালিকা মিনি ও কাবুলিওয়ালার রহস্যমধুর সংক্ষি-

* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠচক্রে "কাবুলিওয়ালার" আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

বিক্ষিপ্ত কৌতুকালাপ গল্পের এই দিকটি আরও সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুলবার সহায়তা ক'রেছে। গল্পের আরম্ভ ও শেষ দুই হয়েছে শরতের দুটি সুনির্ম্মল সুপ্রভাতে। গল্পের এই আরম্ভ ও শেষের মধ্যেই যেন নিহিত র'য়েছে গল্পের সমস্ত অর্থটি। শরতের আকাশে বাতাসে আছে একটা স্তব্ধতা, একটা নির্ম্মলতা, একটা বিস্তৃতি, একটা মুক্তি। গল্পের যবনিকা শরৎপ্রকৃতির যে সুনির্ম্মল প্রভাতে প্রথম উত্তোলন করা হ'য়েছে প্রকৃতিদেবীর সেই শুভ্রতা সেই পবিত্রতা অতি সুন্দর সুনিপুণভাবে পরবর্ত্তী সমস্ত গল্পটিতে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে মিনি কাবুলিওয়ালার জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়ে। গল্পের শেষ যেখানে হ'য়েছে সেখানেও গল্পটির মধ্যে আছে একটা বিস্তৃতি। কাবুলিওয়ালার নীরব বেদনার সেখানে অভ্রভেদী হাহাকারধ্বনি নেই। তার বেদনা তার হৃদয় হতে উত্থিত একটি নিঃশব্দ সকরুণ সঙ্গীতের গুঞ্জরণধ্বনির মতো দশদিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার বেদনা যেন একটা মস্ত প্রসার লাভ করেছে যা শরৎপ্রকৃতিরই অনুরূপ। মনে করে দেখুন গল্পের সেইখানটি যেখানে মিনির দর্শনপ্রার্থী কাবুলিওয়ালা তার দর্শনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে না জেনে ক্ষণেকের তরে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুধু মাত্র 'বাবু সেলাম' বলে দ্বারের বাইরে চলে গেল। তারপর পুনরায় ঘরে ফিরে মিনির জন্য সংগৃহীত কিস্‌মিস্ বাদামের নৈবেদ্য ধীরে ধীরে মিনির পিতার টেবিলের উপর রেখে তাকে বলা তার কথাগুলি ও পরে মিনির পিতা দাম দিতে উদ্যত হলে মিনতিসহকারে তা' নিতে অস্বীকৃত হওয়া কি সুন্দর ভাবেই না তার ব্যথাতুর মনের ব্যথাটুকু ব্যক্ত করে দিয়েছে। তারপর তার ঢিলে জামার ভিতর হতে তার নিজ কন্যার হাতের ভুষিমাখানো স্মরণচিহ্নটুকু বের করে মিনির পিতাকে বলা তার কথাগুলি, 'বাবু, তোমার যেমন একটি লড়্‌কি আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়্‌কি আছে।'—কি সুগভীর করুণ সুরেই না সমস্ত চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছে! বেশী কথা সে বলতে জানে না, তার বেদনা যে কত গভীর তাও সে ব্যক্ত করতে পারে না, অথচ সমস্ত জড়িয়ে—তার স্তব্ধতা, তার সংক্ষিপ্ত কথা, তার নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে যাওয়া ও পরে আপনি ফিরে আসা—তার মনের একটি স্তব্ধ গভীর ব্যাকুলতার আভাস দেয়। শরতের প্রকৃতির মতই সে শান্ত, স্তব্ধ, গভীর। তার বেদনা যেন তার এই স্তব্ধতার ভিতর দিয়ে একটি বিস্তৃতি লাভ করেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে তা যেন শরতের রৌদ্রের সঙ্গে মিশে সমস্ত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। বসন্তের চঞ্চল হাওয়ার মতো তা যেন দ্রুত এসে আমাদের আঘাত করে না। ধীরে নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে তা একটি পরশ বিছিয়ে দেয়। এমনি ধরণের একটি বেদনার আভাস সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে কবিগুরুর 'হৈমন্তী' গল্পটিতে। 'হৈমন্তী' নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তার প্রকৃতিটী, তার বেদনার স্বরূপটি। পোষ্টমাষ্টার গল্পটিতেও এমনি ধরণের একটি অব্যক্ত মর্ম্মবেদনার আভাস পাওয়া যায় রতনের মধ্যে।

নানা দিক দিয়ে ছোট বড়র সমন্বয় ঘটেছে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিতে। প্রথমতঃ যে দুটি চরিত্র নিয়ে প্রধানতঃ গল্পটি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে বয়সের কত বড়ই না পার্থক্য! তাদের নিজ নিজ সমাজের দিক দিয়েও ব্যবধান তাদের বড় কম নয়। তারপর কাবুলিওয়ালার প্রকৃতির মধ্যেও দেখতে পাই ছোট বড় দুটি element। এক দিকে যেমন মিনির প্রতি তার সুগভীর স্নেহ তার ভিতরকার স্নেহকোমল সুন্দর মানুষটির পরিচয় দেয়, অন্য দিকে তেমনি আবার তার পাওনাদারের প্রতি তার অসহিষ্ণু আচরণ তার ভিতরকার হিংস্র ক্ষুদ্র মানুষটিরই পরিচায়ক। এ ছাড়া গল্পের আরম্ভ ও শেষের মধ্যে আছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিপরীত দুটি সুর, একটি হাসির অপরটি অশ্রুর। আখ্যানটির প্রথমদিকের ঘটনাবলী সর্ব্বত্রই একটি প্রসন্ন হাসির আলোকে উদ্ভাসিত। শেষ দিকটি তার শেষ হয়েছে গিয়ে বেদনার একটি অশ্রুমাখানো সকরুণ দৃশ্যে। 'কাবুলিওয়ালার' মিনির ও মিনির পিতার প্রশস্ত প্রকৃতির সম্মুখে মিনির মাতার সংশয়াকুল সঙ্কুচিত, শঙ্কিত প্রকৃতি গল্পের এই দিকটারই একটু ইঙ্গিত করে।

যে জিনিষটী গল্পটিতে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার তা হচ্ছে এই যে গল্পের প্রতিটি চরিত্র অতি সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। অথচ কোথাও তাদের প্রকৃতি

নিয়ে খুব বেশীক্ষণ ব্যাখ্যান করবার কবি সুযোগ পান নি। এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সামান্য দু চারটি ঘটনার আবর্ত্তে তিনি এমনি নিখুঁত ভাবে প্রতিটি চরিত্র এঁকেছেন যে তারা প্রত্যেকে তাদের স্ব স্ব মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে, প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। কোনও চরিত্রের বিকাশের জন্যই কবিকে যেন কোথাও এতটুকু কষ্ট করতে হয় নি। তারা যেন ফুলের মতো আপনি হয়ে উঠেছে প্রস্ফুটিত। চরিত্রগুলির মধ্যে আবার মিনির চরিত্র পেয়েছে সবচেয়ে বেশী পূর্ণতা। শিশু চরিত্রের এমন সহজ সুন্দর বিকাশ বাংলাসাহিত্যে খুব কমই আছে। একমাত্র বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র অপু-দুর্গা ছাড়া বাংলা দেশে যে অজস্র কথা সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার মধ্যে এমন একটি সুন্দর বিকাশের ছবি পাওয়া যাবে না বললে অতিশয়োক্তি হবে না। মিনির সেই তার পিতার ঘরে প্রথম ঢুকে বালিকাসুলভ চপলতার সহিত অনর্গল কথা বলে যাওয়া, পরক্ষণে আগ্ডুম বাগ্ডুম খেলা ও জানালার ধারে ছুটে গিয়ে কাবুলিওয়ালাকে দেখে উচ্চৈঃস্বরে 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' বলে চীৎকার করা এবং পরে ঝুলি ঘাড়ে মস্তদেহ কাবুলিওয়ালাকে তাদের বাড়ী অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখে ভয়ব্যাকুল চিত্তে উর্দ্ধশ্বাসে তার পিতার ঘর থেকে পলায়ন—এ সকলের ভিতর দিয়ে কি সুন্দর ভাবেই না তার শিশু প্রকৃতিটি ফুটে উঠেছে। তার শিশুপ্রকৃতি সবচেয়ে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে তার পিতার ও কাবুলিওয়ালার সঙ্গে তার বলা তার কথার ভিতর দিয়ে। ভাবে ও প্রকাশভঙ্গীতে শিশু-প্রকৃতির কি সুন্দর অনুরূপই না তরে বলা তার কথাগুলো হয়েছে!

পূর্ণেন্দু গুহ

"লতা ভাসে সকল আঁখিনীরে"

শ্রীবিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ

গোলাপ লতা দিনের পরে দিন
হৃদয় রসের নিবিড় করা ক্ষীরে
ফুটিয়ে তোলে সলাজ নতমুখী
পাপ্ড়ি ঢাকা রাঙা গোলাপটিরে॥

হঠাৎ কবে পাপ্ড়ির মুখ খোলে
দিশে দিশে বারতা যায় ছুটে।
গন্ধে আকুল ভ্রমর এসে বলে
মধু, পরাগ, নেবো আজই লুটে॥

গোলাপ কলি কয় না কোন কথা
বাতাস এসে আদরে দেয় দোলা।
গোলাপ লতা বুকে হাসে কলি
আপন সুখে সদাই আপন ভোলা॥

কেউ ত তারে বলে না ক' কভু
বারেক দেখ চেয়ে লতার পানে।
গোলাপ কলি ফুটেছে যার বুকে
বাঁধা আছে নাড়ীর টানে টানে॥

হাসি মুখে গোলাপ লতা শুধু
দান করে দেয় রাঙা গোলাপটিরে।
গোলাপ-ভ্রমর সুখে মাতোয়ারা
লতা ভাসে সকল আঁখিনীরে॥

শ্যাম ও কুল

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

আমাদের টুনুর কথাই বলিতেছিলাম।

ওর প্রায় সাত বছর আগে পৃথিবীতে আসিয়া আমি যে-অভিজ্ঞতাটুকু ওর আগেই সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছি, টুনু তাহার কোনোই মূল্য দিতে রাজি নয়। ওর মতে সেটা নাকি নিতান্তই দৈবদুর্ব্বিপাকের কথা এবং সেটা না-হইয়াও পারিত। যদি-ই বা কোনোক্রমে এই দৈবদুর্ব্বিপাকটা ফস্‌কাইয়া যাইত, তাহা হইলে নাকি আমার বদলে আজ টুনুই প্রেমে পড়িয়া হাবুডুবু খাইত, আর আমাকে টুনুর মতো গৌরব-ভরা মাথা লইয়া আঁক কষিতে কষিতে হয়রাণ হইতে হইত।

আমাদের টুনুর একটা আলাদা ফিলোসফি আছে!

টুনুর বয়স সবে এই চৌদ্দ ছাড়াইয়াছে, কিন্তু কথা কয় আমাদের পাড়ার লোচন-ঠাকুদ্দার মতো! ভাবিয়াছি, আগামী বারের কাউন্সিল নির্ব্বাচনে টুনুকে একজন ক্যান্‌ডিডেট্ দাঁড় করাইয়া দিব। তবে, অঙ্কে ওর মাথা খেলে না,—ও-ই যা' একটু ভরসা।

অদ্ভুত মেয়ে! রাগ করিয়া চোখ রাঙাইবারও উপায় নাই, তাহা হইলেই হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া বলিবে, অ খোকাদা' থামো—থামো। একেবারে মানায় না তোমায়—

রাগ করিলে তাহা মানাইল কিনা, সেকথা ভাবিতে গেলে রাগ করিবার কথা কাহার মনে থাকে মশাই?

এমন আকাট-মূর্খ মেয়ের ভবিষ্যৎ যে কি, তাহা আমি নখদর্পণে দেখিতেছি। মাথার বেণীটা ধরিয়া একটু টানিয়া দিলে কাঁদিয়া ফেলিবে, অথচ আছাড় পড়িয়া একটা হাত ভাজিয়া আসিয়া সেদিন হাসি যেন আর কিছুতেই থামে না মেয়ের। গলার সঙ্গে দড়ি দিয়া হাতটা ঝুলাইয়া নাচিতে নাচিতে পাড়ায় এই নতুন দৃশ্যটি দেখাইতে বাহির হইয়া গেলো।

আমি হলপ্ করিয়া বলিতে পারি, এ-মেয়ের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার।

সহরতলিতে পাশাপাশি বাড়ি। প্রায় তিনপুরুষের আলাপ; নৈকট্যের বন্ধনটাই একদিন স্বাভাবিক আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছে। সেই সূত্রে আমি টুনুর খোকাদা' এবং টুনুদের বাড়ির সকলেই আমার একটা-না-একটা-কিছু। আমার মাকে টুনু বলে জ্যেঠাইমা, আর টুনুর মাকে আমি বলি মাসিমা; এর ভিতরে লজিক্ খুঁজিতে যাওয়া বৃথা।

এমনি চলিয়া আসিয়াছে তিন-পুরুষ ধরিয়া।

কিন্তু টুনু বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে। আমার সঙ্গে একটু বেশি ঝগ্‌ড়া করে বটে, তাহা হইলেও ও আছে বলিয়াই আমার ফুটফর্‌মায়েস্ খাটিবার লোকের অভাব হয় না। বাড়িতে একটা ছোট মেয়ে না থাকিলে যে কত অসুবিধা হয়, সেবার টুনুর জ্বরের সময় তাহা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছিলাম।

সে যাহাই হোক, আজিকার এই সকাল বেলাটা ওর সঙ্গে বক্ বক্ করিয়া কাটাইবার আগ্রহ আমার মোটেই নাই। তাই বই-খাতা লইয়া ঘরে ঢুকিতেই বলিলাম, তেরোর থিওরেম্‌টা মুখস্থ হয়েছে?

টুনু অসঙ্কোচে মাথা নাড়িয়া বলিল, হয় নাই।

গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম, আগে মুখস্থ ক'রে এসো, তার পরে আর-সব পড়া হবে।

টুনু ঝঙ্কার দিয়া বলে, তার চেয়ে পরিষ্কার বল্লেই পারো, এখন তোমার কাছে এলে ডিস্‌টার্ব্ করা হবে তোমায়। লিখ্‌বে হয়তো ছাইয়ের প্রেম-পত্তর, তা-ও আবার বাবুর নিরালা হওয়া চাই।

বলি, প্রেমে পড়িস্‌নি তো কোনদিন, কী বুঝ্‌বি তুই?—

ইঃ, ভা—রি তো আমার প্রেমে-পড়া! মিলা আমার বন্ধু বলেই না জীবনে একটা মেয়ের সঙ্গে মেশ্‌বার সুযোগ পেলে। আমার কাছে তোমার ঋণী থাকা উচিত।

গালে সাবান ঘষিতে ঘষিতে বলি, বলিস্ তো ঋণটা এখুনি শোধ ক'রে দিতে পারি। জীবনে একটা ছেলের সঙ্গে মেশ্‌বার দরকার হয়ে পড়েছে তোর, তা বন্ধু আমারো দু'একজন আছে—

বা—রে, ভালো হ'বে না কিন্তু খোকাদা', খালি খালি ফাজ্‌লেমি করা হচ্ছে, দাড়ি কামাবে তো কামাও না বাপু—

দাড়ি কামাবার সময় চীৎকার ক'রে বাড়ী মাথায় ক'রে তুললে, দাড়ি কামানো তো হয়-ই না, বরং গাল কেটে যাওয়ার ভয়ও থাকে ভারি—

চাহিয়া দেখি, ততক্ষণে টুনু চলিয়া গেছে।

মিলা খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, কি জানি আমি ঠিক বুঝি না। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি, আপনার আর আমার একই যুগে জন্মানো উচিত হয়নি।

এ-কথায় আপনারা ওর মনোভাবের কোনো আভাস পাইলেন কি? বোকা বলিবার সাধ্য তো রহিলই না, অধিকন্তু চালিয়াৎ বলাও নিরাপদ নয়। মুখে ওই ক্ষীণ হাসিটুকু না থাকিলে নবপরিচিতের দস্তুরমতো ভয় পাইয়া যাইবার কথা। একটুখানি ফ্লার্ট করিবার প্রবৃত্তিও যদি মেয়েটার মধ্যে থাকিত। সব সময়েই এমন করিয়া কথা বলিবে, যাহার মানে খুঁজিয়া তোমার মাথার টনক নড়িয়া গেলেও ওর মনের কাছ ঘেঁসিতে পারিবে না।

আগেই বলিয়াছি, টুনুর ধারণা—আমি নিশ্চয়ই প্রেমে পড়িয়াছি, তা-ও কিনা ওরই বন্ধু উর্ম্মিলার সঙ্গে। হাঃ, প্রেমে পড়িবার মতো মেয়েই বটে। বাঙ্‌লা-দেশে যেন মেয়ের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কিন্তু যাহাই করি বা না-করি, ওই এক ফোঁটা মেয়ে টুনু—সে-ও তাহা লইয়া ঠাট্টা করিবে নাকি?

সে-ঠাট্টাও সহ্য করিতে রাজি ছিলাম, যদি সত্যি বা ও-রকম একটা কিছু ঘটিয়া যাইত। আরে মশাই, প্রেমে-পড়া কি চারটিখানি কথা?—না, ভদ্রলোকের কাজ? তিন বছর ধরিয়া কস্‌রৎ করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া গেলাম। বাঙ্‌লা দেশের কুমারী মেয়েগুলো যেন হঠাৎ ডুমুরের ফুল হইয়া উঠিয়াছে।

যাহাও হাতের পাঁচ একটা মেয়ে ছিল উর্ম্মিলা, তার সম্বন্ধেও এখন আর কোনো উচ্চ আশা পোষণ করিতে ভরসা হয় না। এমন অদ্ভুত মেয়ে জীবনে দু'টি দেখি নাই। মেয়েটা বোকা, কি চালবাজ—সেকথাই আজ তিন বছরে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলাম, বুঝ্‌লে মিলা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমার যে-যুগে জন্মানো উচিত ছিল, সে-যুগ এখনো অনাগত।

এই তো গত-কালের কথা—

বন্যা-রিলিফ্-ফণ্ডের জন্যে মেয়েরা 'ওভারটুন্ হল্'-এ চ্যারিটি পার্‌ফরমেন্‌স্ করিবে। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, যন্ত্র-কস্‌রৎ—সবই আছে।

টুনু আসিয়া বলিল, তোমাকে বাঁশী বাজাতে হবে, তা জানো তো?

বলিলাম, না। জানিও না, পার্‌বোও না।

পার্‌বে না কি রকম? বল্লেই হলো আর কি, তোমার নামে প্রোগ্রাম ছাপা হ'য়েছে, তা জানো?—টুনু হাত নাড়িয়া মুরুব্বিয়ানার সুরে বলে।

গম্ভীর-কণ্ঠে বলি, ছাপা হওয়ার পরে জান্‌লে, ওতে আর কোনো ফল হয় না।

খুব খানিকটা মেজাজ দেখাইয়া টুনু চলিয়া গেল। আমি বুঝিলাম, চলিয়া গেলো বটে, কিন্তু আমাকে রেহাই দিয়া নয়; বরং ওর চাইতে যার কথায় বেশি কাজ হইবে বলিয়া ওর ধারণা—তাহাকেই ডাকিয়া আনিতে। কাজেই আমার পক্ষে একটু সন্ত্রস্ত হইবার কথা।

মিলা আসিল।

কোনো ভূমিকা না করিয়াই শুধাইল, যাবেন না তো আপনি? বেশ ভালোই হোলো, আমিও আপনার দলে।

কথাটা ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ওর কোনো কথাই আমি চট্ করিয়া বুঝিতে পারি না। বলিলাম, আমার দলে কি রকম? তোমার তো ওতে মেন্ পার্ট রয়েছে।

বসিবার জন্য ঘরে চেয়ারের অভাব না থাকিলেও, মিলা আমার সমুখের টেবিলটার এক কোণে উঠিয়া বসিল এবং নির্ব্বিবাদে পা দোলাইতে লাগিল।

যে-কথাটা তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এইমাত্র বলিলাম, তাহার কোনো উত্তর পাইব মনে করিয়া কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম এবং শেষ পর্য্যন্ত যখন বুঝিলাম যে উত্তর পাওয়ার আশা করিয়া আমিই ভুল করিয়াছি, তখন নিশ্চিন্ত মনে আবার 'শেষের কবিতা'য় মনোযোগ দিলাম। যে-মেয়েটা মুখের উপর বসিয়া থাকিবে, অথচ একটাও কথা কহিবে না—এমন কি কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও জবাব দিব না, তাহাকে লইয়া কী করিব? তার চেয়ে কিটির ছাপার হরফের মুখরতাও ঢের ভাল লাগে।

একটু পরেই মেয়েদের লইয়া যাইবার জন্য বাস্ আসিয়া পড়িল।

টুনু ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, আর দেরি নয়, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—খোকাদা', তোমার বাঁশী আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—তুমি বেশী দেরি কোরো না, ঠিক সময়েই যেয়ো কিন্তু, বরং একটা ট্যাক্‌সি ক'রেই না হয়—ওমা, মিলাদি যে এখনো কাপড়-চোপড় বদ্‌লাওনি—

মিলা এতক্ষণ টেবিলের উপর লাল কালির দোয়াতটি উল্‌টাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে দু'টি হাত বেশ করিয়া রঙাইতেছিল; টুনুর তাড়াতেও তার কাজে বিশেষ কোনো অমনোযোগ দেখা গেল না। কেবল মুখ তুলিয়া একবার বলিল, আমি যাবো না, গাড়ী আমার জন্যে যেন দেরি না করে।

এবার টুনুর রাগ দেখে কে! তাহার মুখে কথার খৈ ফুটিতে সুরু করিয়াছে,—এসব তামাসা করার কী দরকার ছিল? আগে থাকতে বল্‌লেই হোতো—যত সব ইয়ে—মুখ দেখানো যাবে না—ফাঙ্‌শন্‌টা মাটি হ'য়ে গ্যালো—এত কষ্ট ক'রে কেন আর তা'লে কাপড়-চোপড় বদ্‌লে এলাম—কতকগুলো স্নো আর পাউডার অনর্থক বাজে খরচ হোলো—ইত্যাদি।

বাইরে বাস্-চালকের ঘন ঘন হর্ণ, আর ঘরের ভেতরে বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রাভিনয়,—কোন্ দিকের তাল সাম্‌লাই ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া অগত্যা টেবিলের উপরকার খানিকটা লাল কালি মিলার গালে ও মুখে বেশ করিয়া মাখাইয়া দিয়া বলিলাম, খুব হ'য়েচে, এবার লক্ষ্মী মেয়েটির মতো তাড়াতাড়ি ক'রে গাড়িতে ওঠো গে, আমি এখুনি যাচ্ছি।

মিলা হাস্যস্ফুরিত গণ্ডে শাড়ির আঁচল ঘষিতে ঘষিতে বলে, ভাগ্যিস্ এত তাড়াতাড়িই রাজি হলেন, আর দু'মিনিট দেরি কর্‌লেই হয়তো আমাকে চ'লে যেতে হোতো। না গিয়ে সত্যি তো আর পার্‌তুম না। আপনি ভারি বোকা—

মিলা ও টুনু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গ্যালো।

মনে মনে বলিলাম, বোকা না হইয়া কী আর করি বলো। যেহেতু তিন বছর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির মতো তোমার দুর্ব্বোধ্য মস্তিষ্কটি পাঠ করিয়াও কোনো কূলকিনারা করিতে পারিলাম না, তখন কেহ বুদ্ধির অভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত বা স্পষ্ট কথা বলিলে রাগ করি কেমন করিয়া?

একটা খয়েরী খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে চড়াইয়া ওভারটুন্ হল্-এর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাগে তখন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে। সবাই যেন আমাকে ছেলেমানুষ পাইয়াছে! আমি বোকা! আমি কিছু বুঝি না—আমার সব তাতেই ঠাট্টা!—আচ্ছা, বেশ।

সদর দরজা ছাড়িয়া অনেকখানি চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার হন্ হন্ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বরাবর মা'র কাছে গিয়া হাজির হইলাম। কোনো ভূমিকা না করিয়াই বলিয়া, চলিলাম, বুঝ্‌লে মা, আজ্‌কে ফাগুনের তেরোই, এমাসে আর মাত্র দু'টো তারিখ আছে—উনিশে আর চব্বিশে; উনিশে যদি একান্তই না হয়, চব্বিশে তারিখে আমার বিয়ে হওয়া চাই-ই। যেখান থেকেই হোক্, এর ভেতরে ক'নে যোগাড় কর্‌তেই হ'বে, ব'লে দিলুম।

তা না হ'লে কিন্তু আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যাবো—

মা হাতের কাজ ফেলিয়া অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া থাকিবারই কথা বটে। যে-ছেলের বুনো বাঁশের মতো ঘাড়টিকে কোনোদিন তিনি সাধ্যসাধনা করিয়াও বিবাহের নামে নোয়াইতে পারেন নাই, আজ হঠাৎ তাহা আপনা হইতেই নুইয়া পড়িল,—ইহা মা'র কাছে কম আশ্চর্য্যের কথা নয়।

যাহা হোক্, মা খুব খুশীই হইলেন। বলিলেন, সে কি একটা খুব বেশি কথা হ'লো রে খোকা? আমি আজ তোর মুখের কথা পেলে, কালই তোকে বিয়ে করিয়ে একটি টুক্‌টুকে বউ ঘরে আন্‌তে পারি —তা জানিস্? এতদিন তোর অমত ছিল বলেই তো আমার সে-সাধ পূর্ণ হয় নি—

বাধা দিয়াই বলিলাম, সাধ-টাধ আমি বুঝিনে, এই ফাগুনে আমাকে বিয়ে করাতে হবে, ব্যস্।

মা হাসিয়া বলিলেন, শোন একবার আমার পাগ্‌লা ছেলের কথা! বিয়ে যেন এতদিন আমিই ইচ্ছে ক'রে ওকে দিই নি। হ্যাঁরে খোকা, আমাদের টুনুকে বিয়ে কর্‌বি? ওর মা একদিন কথায় কথায় আমার কাণে কথাটা তুলেছিল।

আমিও এবার না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথাটা হাসিবারই বটে। টুনুকে বউ কল্পনা করিলে, আর যাই হোক্—হাসিটা কিছুতেই থামাইয়া রাখা যায় না। বলিলাম, তবেই হয়েছে, টুনটুনি পুষ্‌তে গিয়ে এখন ঘরের ভেতর পাখীর বাসা করি আর কি! যাক্, আমি এখন চল্লুম—

পথ চলিতে চলিতে মা'র কথাটাই আমার বার বার মনে হইতে লাগিল। কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু উড়িয়া গেল বলিয়া তো মনে হইতেছে না। কথাটা এরকম ভাবে ভাবিয়া দেখি নাই বলিয়াই হয়তো, ভাবিতে মন্দ লাগিতেছে না।

ওভারটুন্ হল্-এ গিয়া যত মনোযোগ দিয়া বাঁশী না বাজাইলাম, তার চেয়ে বেশী মনোযোগ দিয়া টুনুর সঙ্গীত ও অভিনয় শুনিলাম। নাঃ, মোটের উপর আমাদের টুনু মেয়ে এমন কিছু মন্দ নয়। না হয় অঙ্কে ওর মাথা একটু কমই খেলে, তা বলিয়া বেচারি কী আর করিবে? সকলের মাথা সব দিকে সমান খেলে না।

বাড়ী ফিরিবার সময় মিলাকে শুনাইয়াই টুনুকে বলিলাম, ইস্কুলের গাড়ীতে তোকে আর বাড়ী ফির্‌তে হবে না, আমার সঙ্গেই চল্, ট্রামে যাওয়া যাবে'খন—

কিন্তু টুনুটা এমনি বোকা, ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, মিলাদিও চলো না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।

বাড়ী ফিরিয়া আহারাদির পর মাকে বলিলাম, জানলে না, টুনুটা একেবারে বোকা, আর অঙ্ক জিনিষটা ওর মাথায় কোনোমতেই ঢোকে না। এজন্যেই তো ওকে আমার ভালো লাগে না—

মা তো হাসিয়াই খুন! বলেন, তোর মাথা খারাপ হয়েছে খোকা। টুনু আঁক ক'যে তোকে স্বর্গে তুলে দেবে নাকি? —আর বোকা? আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি, তোর চেয়ে টুনু ঢের চালাক। টুনুর মতো লক্ষ্মী মেয়ে আজকাল খুব বেশী বড়ো দেখা যায় না। আঃ, ওর মা যে তাহ'লে কী খুশীই হবে—

আচ্ছা, রাখো রাখো তোমার খুশী এখন চাপা দিয়ে। কাল সকালে টুনুকে একবার ডেকে দিয়ো তো, আমি শুতে চল্লুম—রাত ঢের হয়েচে। বলিয়াই প্রস্থান।

কিন্তু রাত ঢের হইলে কি হইবে?—ঘুম সেদিন মোটেই ভালো হইল না। মিলার কথা যতবার মনে হইয়াছে, ততবারই ওই দুর্ম্মুখ মেয়েটাকে জব্দ করিবার নানা রকম ফন্দি আঁটিতে গিয়া আমার চোখের ঘুম ও মনের সোয়াস্তিকে দেশ-ছাড়া করিয়াছি। মা আর টুনু ছাড়া সমস্ত মেয়ে জাতটার উপর আমার সে কী রাগ! এক কড়া বুদ্ধির পুঁজিও না লইয়া কেমন করিয়া পুরুষানুক্রমে তাহারা বুদ্ধিমান পুরুষ জাতটাকে ভাঁড়াইয়া খাইয়া আসিয়াছে এবং ঘোল খাওয়াইয়াছে, সেকথা ভাবিতে বসিলে শোপেন্‌হাওয়ার প্রমুখ জগতের দুঃখবাদীদের উপর ভক্তি চটিয়া যায়।···কিন্তু আমাদের টুনু! আমি হলপ্ করিয়া বলিতে পারি, সে যদি

বৈদিক যুগে জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে আজ এ-যুগে খনা-লীলাবতী-গার্গী-প্রমুখ দেবীগণের সঙ্গে তাহারো একই আসন নির্দিষ্ট হইত। কিন্তু বৈদিক-যুগে জন্মগ্রহণ না করিয়া টুনু খুব ভালো কাজই করিয়াছে; আমি তাহা হইলে আজ টুনুকে কোথায় পাইতাম?

যাক্, এখন 'শুভস্য শীঘ্রম্' করিয়া কাল সকালে ভালোয় ভালোয় টুনুকে কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচি। বিশ্বাস তো নাই কিছু, যে-রকম মেয়ে, হয়তো একটা কাণ্ডই করিয়া বসিবে। হয়তো বা হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িয়া বলিবে, খোকাদা'র সঙ্গে কিনা—হি-হি-হি—

কথাটা কেমন করিয়া পাড়িলে এফেক্‌টটা সুবিধাজনক এবং অনুকূল হইবে, তাহারই একটা প্ল্যান্ করিতে লাগিয়া গেলাম।

সকাল বেলা দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া টুনু হাঁক্ দিল, আমায় নাকি ডেকেছো খোকাদা'? জ্যেঠাইমা বলে পাঠালেন।

সুমুখের চেয়ারটা দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, বোস্, কথা আছে। যা যা জিজ্ঞেস্ কোর্‌বো, ঠিক ঠিক উত্তর দিবি—

বুকটা একটু দুরুদুরু করিয়া উঠিল নাকি?—বেশি রকম ঘাম সুরু হইল যে! না, ওসব কিছু নয়। কোনো কিছুতে ঘাবড়াইয়া যাইবার ছেলে আমি নই, সে-কথা দেশ-ভরা লোক জানে! যাক্—

টুনু হাসিয়া বলিল, তেরোর থিওরেম্ কিন্তু আমার এখনো মুখস্থ হয় নি, সে-কথা আগে থাক্‌তেই বলে' রাখ্‌লুম।

সে-কথায় কাণ না দিয়া বলি, তোর এবার থার্ড ক্লাশ্ নয়?—ম্যাট্রিক দিতে আরো তিন বছর দেরী আছে তো?

টুনু বলিল, হ্যাঁ, যদি ফি বছর পাশ করতে পারি।

মিলা বুঝি এবার ম্যাট্রিক দেবে—না?

হ্যাঁ। কী সব বাজে কথা জিগ্যেস্ কর্‌তে ডেকে আন্‌লে তুমি। তার চেয়ে একটা তাসের বাজি দেখিয়ে দাও না খোকাদা'—

থাম্ থাম্, সবতাতেই অস্থিরপনা। তারপর, ইংরেজিতে দু'চারটে কথা বল্‌তে পারিস্ তো? এই ধর্, আমি যদি জিগ্যেস্ করি—'হাউ মেনি বয়েজ্ ইন্ ইয়র্ ক্লাশ?—তা'হলে' কী জবাব দিবি?

টুনু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, বল্‌বো যে আমাদের ক্লাশে একটিও 'বয়' নেই—কিন্তু তোমার কী হ'য়েছে আজ সকালবেলা, বল দেখি খোকাদা'?

টুনুর কাছে অপ্রতিভ হওয়ার কোনোই কারণ নাই। তাই জিব্ না কাটিয়াই বলিলাম, ওহো 'বয়েজ' বলে ফেলেছি বুঝি, তা যাক্—ও-কথার আর জবাব দিতে হবে না। তুই বাইকে চড়্‌তে জানিস্?

টুনুর হাসি এবার আর কিছুতেই থামে না। তবু কোনো মতে বলে, তোমার বউকে—হি-হি-হি—বাইকে চড়্‌তে শিখিও—হি-হি-হি—নয়তো ঘোড়ায়। উঃ, বাব্বা, হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল্ ধ'রে গ্যালো।

যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাই। মেয়েটার যদি একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি থাকিত! সব তা'তেই ঠাট্টা! জিয়োমেট্রির থিওরেম্ যেন! কিন্তু কথাটা যে আমাকে বলিতেই হইবে এবং তার মানেটাও ওর মগজ অবধি নির্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে!···মিলার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে না পারি তো—

মনে মনে একটা দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম এবং দেহে-মনে অনেকটা বল পাইলাম। খুব রাগ দেখাইয়া ঝাঁঝালো গলায় বলিলাম, ফের যদি ও-রকম অসভ্যের মতো হি-হি ক'রে হাসো, তাহ'লে কাণ মলে' লাল ক'রে দোব বলে দিচ্ছি। এতখানি ঢ্যাঙা মেয়ে হয়েচেন, একটুখানি সিরিয়াস্ হ'তে শিখ্‌লেন না—

ডাগর দু'টি কালো চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া টুনু এবার হঠাৎ মুখখানি শাঙন আকাশের মতো অন্ধকার করিয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত্তে চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, এবং পরবর্ত্তী ট্রেনে কখন্ আসিয়া পড়ে—এ-ভয়ে আমি রীতিমতো ভড়্‌কাইয়া গেলাম। মাত্রাটা একটু বেশি হইয়া গেল নাকি?

একখানি হাত ধরিয়া সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, বোকা আর কি! আমি সত্যি কি আর রাগ কর্‌লাম?

তারপর চেয়ারটা একটু কাছে টানিয়া নিয়া,—আমি বল্‌ছিলুম কি, মা ভয়ানক পীড়াপীড়ি সুরু করেচেন, এই ফাগুন মাসেই—

টুনু খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল, ও, সেই বেল্‌ঘরিয়ায়—

আরে না—না। মা বল্‌ছিলেন, এই ফাগুন মাসেই বিয়েটা যাতে—

এবার টুনুর পক্ষে চেয়ারের মতো নিরাপদ জায়গায় বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত তালি সহযোগে চীৎকার করিয়া উঠিল, হুর্‌-র্‌-রে, খোকাদা'র বিয়ে! বেশ বেশ, শীগ্‌গির করে—

হ্যাঁ, মাসিমারও নাকি অমত নেই, মাকে তিনি বলেচেন—

টুনু গর্‌ গর্‌ করিয়া বলিয়া চলিল, অমত আমারো নেই, কারই বা থাকে? পেট পুরে নেমন্তন্ন খাবো'খন, আর নতুন বউএর সঙ্গে—

কিন্তু তোর সঙ্গেই যে বিয়ের কথা হচ্ছিল—

'ধ্যাৎ' কিম্বা ওই ধরণের একটা কিছু মন্তব্য করিয়া পলাইয়া যাইতে পারে আশঙ্কা করিয়া, আগে হইতেই চাণক্য শ্লোক অনুসারে টুনুর একখানি হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। কাজেই চেষ্টা সত্ত্বেও পলাইবার সুবিধা হইল না। কিন্তু চপলতা ওর এক মুহূর্ত্তেই ঘুচিয়া গ্যালো। ঠাট্টা করিতেছি মনে করিয়া হয়তো প্রথমে ওর চোখে একটুখানি অবিশ্বাসের ছায়া পড়িয়াছিল, আমার চোখের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হইতেই তাহা মিলাইয়া গ্যালো এবং অমন দুরন্ত মেয়ের মস্তকটিও কচি পুঁয়ের ডগাটির মতো নুইয়া পড়িল।

ওর হাত ছাড়িয়া দিয়া পিঠের ওপর একখানা হাত রাখিয়া বলিলাম, মা তাহলে সত্যি খুব খুশী হবেন, টুনু, মাসিমাও। শুধু তুমি যদি—

টুনুকে তুমি বলিতে গিয়া হঠাৎ এমন অদ্ভুত শোনাইল যে, নিজেই একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। হাসিও পাইয়াছিল। কাজেই, টুনুর সম্মতি পাইলে আমিও যে খুসী হইব, সে কথাটা আর বলা হইল না। টুনু কিন্তু একবার আমার মুখের দিকে ক্ষণিকের জন্য চাহিয়া, আরক্ত মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গ্যালো।

আর বাধা দিলাম না। একটুখানি নার্‌ভাস্‌ হইয়া পড়িয়াছিলাম হয়তো। কিন্তু সে কথা থাক্‌, কাজ যে উদ্ধার হইয়াছে—তা' আর বুঝিতে বাকী ছিল না আমার। বহু উপন্যাস গল্পে এরকম লক্ষণ আশাজনক হইয়াছে দেখিয়াছি। সেই কথায় বলে, মৌনং—ইত্যাদি।

অবাক কাণ্ড আর কি!

অদ্য তিন দিন ধরিয়া টুনুর টিকিটিরও দর্শন মিলিল না। অমন মুখরা আর দুরন্ত মেয়ের পক্ষে যে একেবারে দম্‌ আটকাইয়া মরিবার কথা। কেমন করিয়া এমন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইল, তাহাই ভাবি। ভাবিতে ভালোই লাগে। হাসিও পায় এই বলিয়া যে, টুনুও শেষ কালে আমাকে লজ্জা করিতে শিখিল!

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্‌!

টুনুকে লইয়া সংসার পাতাইবার খস্‌ড়া তৈয়ার করিতে থাকি।—

সব উপরের তলার ঘরখানা থাকিবে আমাদের। তাতে টুনু আর আমি, আমি আর টুনু। দক্ষিণের বারান্দার দুই কিনারে গুটিকয়েক ফুলগাছের টব্‌ থাকিবে—বেশির ভাগই বেলফুল। বর্ষা আসিতেই যেন ফুল ধরিতে সুরু হয়। তা ছাড়া কয়েকটা জাপানী বামন গাছ'ও থাকিতে পারে চীনা মাটির টবে। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই থাকিবে না। কেবল চারদিকের দেয়ালে রুবেন্‌স্‌, কন্‌স্টেব্‌ল্‌, ক্যাণ্ডিয়ার, গেন্‌স্‌ব্যরো প্রভৃতি ওস্তাদ শিল্পিদের চিত্র-প্রতিলিপি কয়েকখানা থাকিলে মন্দ হয় না।

ছোট্ট নিরিবিলি সংসার। কোনো কোলাহল ঝঞ্ঝা নাই। সেখানে সারাদিন ধরিয়া টুনুকে আমি জিয়োমেট্রি শিখাইব—কারণ টুনু ভালো অঙ্ক না জানিলে আমার খুঁৎ খুঁৎ করিবে। আমার টুনু কোনো বিষয়েই মিল

চাইতে কম থাকিবে না। মাত্র তিনটি বছর তো—তা টুনুও তখন ম্যাট্রিক পাশ করিবে। তারপর কলেজে—

খুট্ করিয়া দরজা খুলিবার শব্দে মনটা আপনিই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু চাহিয়া দেখি, সেই পাজি মেয়েটা—নাম করিতেও গা জলিয়া যায়—মিলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মিটিমিটি হাসিতেছে। গাল দু'টিতে তেমনি দুটি ছোট্ট টোল পড়িয়াছে; ইচ্ছা করে সে দিনের মত দুই হাতে লাল কালি চুবাইয়া ওর গালে মাখাইয়া দিই।

দুরন্ত আক্রোশে ফুলিতেছিলাম, তাই কিছু না বলিয়া মনোযোগ সহকারে টেবিলের উপরকার একটা পুরাণো চিঠি দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু মেয়েটা এমনি বেহায়া যে, আমার কাছে আসিয়া অনায়াসে দুই হাতে আমার মুখটা তুলিয়া তাহার দিকে ফিরাইয়া দিল এবং নিঃসঙ্কোচে দু'টি ডাগর চোখের ধারালো দৃষ্টি ষ্টিমারের সার্চ্চ লাইটের মতো আমার চোখের উপর ফেলিয়া সমস্ত অন্তরটার আনাচ কানাচ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

এমন বিপদেও মানুষে পড়ে। আমি হলপ্ করিয়া বলিতেছি—মিলার উপর রাগ আমার তখনো পুরা মাত্রায়। কিন্তু কি করিব, হাতের কাছে লাল কালির দোয়াতটা পর্য্যন্ত ছিল না।

দস্তুরমতো মেজাজ দেখাইয়া বলিলাম, এ সব কী হচ্ছে মিলা?—সব সময়ে ইয়ে ভাল লাগে না বলে দিচ্ছি।

মিলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসি তো নয়, যেন জলতরঙ্গ বাজনা!—কিছুতেই আর থামিতে চায় না। ওর ধারণা, কোনো কিছুতেই আমার যেন রাগ হইতে পারে না।

কিন্তু রাগটা দেখাই কেমন করিয়া? অতো বড়ো ধিঙ্গি মেয়ের গায়ে শেষটায় হাত তুলিতে হইবে নাকি?

হাত কিন্তু তুলিতে হইল না, আমারই হাত দুইটা মিলা ই হাতে তুলিয়া লইয়া যাহা করিতে লাগিল, তাহা আর কহতব্য' নয়! আপনারা কেহ সুমুখে থাকিলে আমার হাত ইটার হাল দেখিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিতে ারিতেন না।

আমার কিন্তু তখন চোখে জলও ছিল না, মুখে হাসিও ছিল না। আমার আসল গোলমালটা লাগিয়াছিল, অন্তরের মধ্যে। সেখানে টুনু আর মিলাতে মিলিয়া প্রচণ্ড সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেছে।

কিছুক্ষণ পরে মিলা যখন মুখখানা শাওন-আকাশের মতো অন্ধকার করিয়া শুধাইল, টুনুকে আমি বিবাহ করিব বলিয়া সম্প্রতি যে একটা গুজব রটিয়াছে এবং টুনুও যাহা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে, তাহার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে—আমি তখন হঠাৎ অনুভব করিয়া ফেলিলাম যে, অন্তরলোকের সেই দ্বন্দ্বটাও যেন আপনা হইতেই মিলাইয়া গ্যালো!

টুনু যে কেবল অনুকম্পাই পাইবার উপযুক্ত সেকথা কে না বলিবে?

সুতরাং মিলার কথায় দস্তুরমতো সপ্রতিভভাবে জবাব দিয়া ফেলিলাম,—রাঃ—যোঃ! টুনুকে বিয়ে?—

বাকিটা একটা উচ্চ হাসিতে প্রমাণ করিয়া দিলাম যে, তার চেয়ে জীবনে আর বড়ো ট্রাজিডি কী হইতে পাবে?

মিলা হাসিমুখে চলিয়া গ্যালো। ওর চলার ছন্দ দেখিয়াই বুঝি, ওর মনে খুশীর জোয়ার আসিয়াছে, দেহেও। এই মাত্র যেন ও সমস্ত পৃথিবীটা জয় করিয়া লইয়া গ্যালো!

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বলি-বলি করিয়াও ওকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। কে জানে, ভুল বুঝিলাম কিনা? মেয়েটার সবই অদ্ভুত—ওর কোনো কিছুতেই হঠাৎ কোনো মতামত প্রকাশ করিতে ভরসা হয় না।

কথাটা তো ঠিকই।

টুনুকে কে না ভালো মেয়ে বলিবে? চমৎকার মেয়ে—এক কথায় সুপারফাইন্! তামাসা করিল কিন্তু মন্দ নয়। ভাবিলেও পেটের ভিতরে হাসির ফোয়ারা ঘোলাইয়া ওঠে। কবে আমি একটু ঠাট্টা করিয়া কি বলিয়াছিলাম, তাহাকে মস্ত একটা সিরিয়স্ ব্যাপার ধরিয়া লইয়া কী কাণ্ডটাই না করিয়া বসিল!—এতদিনে সে একবারো আমাকে তাহার মুখটা দেখাইতে পর্য্যন্ত পারিল না? টিপিক্যাল্ বাঙালি-

মেয়ে! গল্প উপন্যাসে ইহাদের লইয়া অতি সহজে রোমান্স্ সৃষ্টি করা চলে।

যাক্, ঢের হইয়াছে। এবার কিন্তু ঘরের কোণ হইতে টুনুকে টানিয়া বাহিরে না আনিলেই নয়। টুনু না হইলে একটুও জমে না। দিনরাত আমার সঙ্গে ঝগ্ড়া করিবে কে? আমি রাগ করিলে, হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার সাহস তো কেবল টুনুরই আছে!

টুনুকে আবিষ্কার করিতে কিন্তু যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। বাড়িতে আমার সাড়া পাইয়াই সে এমন ভাবে এ-ঘর ও-ঘর ছুটাছুটি করিতে লাগিল যে, শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা।

তবু টুনুকে বাহির করিলাম। কিন্তু আসল বিপদ একটুও কাটে না। টুনু এমন করিয়া মুখ নীচু করিয়া থাকে যে, নববর্ষার নিবিড় মেঘস্তূপের মতো এক-মাথা কালোচুলের আড়াল হইতে ওর মুখখানা আবিষ্কার করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

অগত্যা আগের মতো সহজ সুরে বলি, পড়াশুনা একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েচো তো?—

কি জানি, টুনুকে 'তুমি' বলিতে আজ আর তেমন লজ্জা করিল না, কিম্বা সেদিনের মতো পেটের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ঘোলাইয়া উঠিল না। বরং কোনোদিন যে 'তুমি' ছাড়া অন্য কিছু সম্বোধন করিয়াছি—সেকথা ভাবিতেও মনটা কি রকম খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। বুঝিলাম, এ অসোয়াস্তির কিছুটা টুনু আমার মগজে ঢুকাইয়া দিয়াছে এ-কয়দিনের একটা মিথ্যা-অর্থপূর্ণ অন্তর্দ্ধানে এবং আমি নিজেই কিছুটা অর্জ্জন করিয়াছি নিজের অসুস্থ-মনের বিলাসিতায়—বিলাসিতায়ও নয়, নিতান্ত ছেলেমানুষীতে। এই টুনুকেই কতদিন পড়া বলিয়া দিতে গিয়া কাণ মলিয়া দিয়াছি, অথচ আজ ওই তুচ্ছ (শব্দটি তুচ্ছার্থে ব্যবহার করি নাই!) চুলের গুচ্ছ কয়টি সরাইয়া দিয়া তার মুখখানা তুলিয়া ধরিতে হাত উঠিল না।

কথার জবাব না পাইয়া আবার বলিলাম, কী, জবাবই যে দাও না বড়ো, যা শিখেছিলে—এ ক'দিনে সব ভুলেচ তো?

টুনু মাথা নাড়িয়া জবাব দেয়—ভুলিয়াছে। মাথা নাড়িবার সপ্রতিভ ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, বেশ যত্ন করিয়াই যেন সব ভুলিয়াছে! আপনারাই বলুন, এমন মেয়ের ভবিষ্যৎ যে একেবারেই তিমিরাবৃত, সেকথার মধ্যে মিথ্যা উক্তি আছে কি?

একটু রাগ হইল, ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে শুধাইলাম, তার মানে? পড়াশুনা কি ছেড়ে দিলে?

টুনু এইবার মুখ তুলিয়া ক্ষিপ্রতাসহকারে দুই হাতে চুলের গুচ্ছ পিঠের দিকে সরাইয়া দেয়। তারপর সে এক কাণ্ড!—বিদ্যুতের মতো চঞ্চল ধারালো একটি দৃষ্টি আমার চোখের উপর ফেলিয়াই বন-হরিণীর মতো আমার সুমুখ হইতে ছুট্ দিল এবং দরজার চৌকাঠ মাড়াইবার সময় বলিয়া গ্যালো,—পড়াশুনা আবার নতুন ক'রে সুরু করবো ভাব্চি, কিন্তু উনিশে কি চব্বিশে ফাগুন, সেইটেই যা' একটু—

আর শোনা গ্যালো না।

এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।—একটা খট্কা মনের মধ্যে লাগিয়াই রহিল, টুনু কি সত্যই বোকা? মা কিন্তু বলিয়াছিলেন, টুনু আমার চেয়েও নাকি ঢের চালাক—

মিলার কথাই হয় তো ঠিক, আমি বোকা! আমার চেয়ে সকলেই বেশি বুদ্ধিমান আর ঢের চালাক!

কে জানে?

জানিতে কিন্তু দু'দিনের বেশি অপেক্ষা করিতে হইল না। দু'দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি, সদর-দরজায় তালা-পরানো রহিয়াছে। বিস্মিত হইবার অবকাশ জুটিল না। পাশের বাড়ি হইতে টুনুর ছোট ভাই মন্টু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, অ খোকাদা, জেঠাই-মা আমাদের বাড়ি রয়েচেন যে। তুমিও এসো না,—আজ দিদির পাকা-দেখা—তা জানো তো?

একমুখ হাসিয়াই বলিলাম, তা আর জানিনে? তা তুমি যা'র কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে এসো গে। আমি এখন তোমাদের ওখানে গেলে ঠাট্টা করবে।

কি বুঝিয়া মন্টু চলিয়া গেলো।

মনে মনে বলিলাম, মা'র কিন্তু এটা দস্তুরমতো অন্যায় হইয়াছে। আমাকে এ-বিষয়ে পূর্ব্বেই জানানো উচিৎ ছিলো। মিলার কাছে আর মুখ দেখানো যাইবে না—

মণ্টুর বদলে মা-ই চাবি লইয়া আসিলেন। ভিতরে ঢুকিয়াই মা বলিলেন, আমিও তোর বিয়ে এই ফাগুনের মধ্যেই দোব,—এই আমার জেদ। টুনুর চেয়ে ভালো মেয়ে কি আর দুনিয়ায় মেলে না? তা' ছাড়া—

আর বেশি শুনিবার প্রয়োজন ছিল না; এতক্ষণে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা মগজে ঢুকিল। বলিলাম, টুনুর কোথায় সম্বন্ধ হলো?

ওই বেলগাছিয়ায়, না কোথায়; ছেলে দেড়-শো টাকা পায়,—ওই লাভেই তো—। ভালোই হলো, মিলার সঙ্গে টুনুর ভাব ছিল,—পড়েছেও একই বাড়িতে। টুনুর জা হবে মিলা—

বলিলাম, ও।

মা বলিয়া চলিলেন, তোর ছোট-মামাকে আজ চিঠি দিয়েচি, তোর জন্যে একটি সুন্দরী মেয়ে দেখ্‌তে—এই ফাগুনেই যাতে বিয়ে হতে পারে।

সটান পড়ার ঘরে চলিয়া গেলাম। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বের আকাশে গুটি তিনেক তারা উঠিয়াছে, তা'রই তলে প্রকাণ্ড থালার মতো চাঁদ। বড়ো জোর এই সামান্য পুঁজি লইয়া কবিতা লেখা চলিতে পারে; কিন্তু কবিতা লিখিয়াই বা কি হইবে?

মাঝি

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

রে মাঝি, আজি মোরে ও-পারে নিয়ে চল্
আকুল সাঁঝে আজি
কাঁদিছে বনরাজি
গিরির চোখে ঝরে করুণ আঁখিজল,
রে মাঝি আজি মোরে ও-পারে নিয়ে চল্।
আঁধারে ঘন শোকে ডুবিছে ধরাতল
চপলা চমকিছে
সমীর শিহরিছে
গভীর গরজিছে গগনে মেঘদল
রে মাঝি, আজি মোরে ও-পারে নিয়ে চল্।
পথের মাঝে আজি হয়েছি হীনবল
লহরী সেনাগুলি
হাঁকিছে মাথা তুলি
ফুলিয়া উঠে রাগে সেনানী কালো জল,
রে মাঝি আজি মোরে ও-পারে নিয়ে চল্।
জেলে দে' বুকে আজি অযুত দাবানল
মুছে দে ভীতি-ব্যথা
দৈন্য কাতরতা
এনে দে ফুলরাশি শিশিরে ঝলমল্
রে মাঝি, আজি মোরে ও-পারে নিয়ে চল্।

ধ্বনি

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

আমার হৃদয়ে লাগে ধরিত্রীর হৃদয় স্পন্দন।
ঐ শ্যাম বনানীর শ্যামল নন্দন
যেথা পাতিয়াছে আজি শ্যামল অঞ্চল,
বায়ু যেথা হিন্দোল চঞ্চল
বাঁধিয়াছে বনশাখা শিরে
ধীরে ধীরে ধীরে,
চিত্ত মোর দোলে আর খোলে সব মিথ্যার বন্ধন;
আমার হৃদয়ে লাগে ধরিত্রীর হৃদয় স্পন্দন।

ঐ যেথা গাহে পাখী
নাচাইয়া পুচ্ছটিরে ওঠে ডাকি ডাকি,
কাঁপাইয়া ডানা দুটি ঐ যেথা পতঙ্গ শিহরে
গুঞ্জরিয়া প্রাণসাথী তরে,
সর্ব্ব প্রাণ জগতের সর্ব্বতর ধ্বনি
আমার হৃদয় তারে বারম্বার উঠিছে রণনি'
কাঁদাইয়া মুক্তির ক্রন্দন;
আজি মোর বুকে লাগে ধরিত্রীর হৃদয় স্পন্দন।

ঐ যেথা দিগন্তের তীরে
অনন্তের সুগম্ভীর ধ্যানের তিমিরে
স্তিমিতচেতন যোগী নীল গিরিমালা
তপাসনে একান্ত নিরালা,
সন্ধ্যায় উষায়
শুভ্র লঘু মেঘদল সাজায় ভূষায়,
ওরা মোর বক্ষপটে বার বার লেপে যায় পবিত্র চন্দন।
আমার হৃদয়ে লাগে ধরিত্রীর হৃদয় স্পন্দন।

ঐ যেথা গিরিতললীনা
স্বচ্ছতোয়া নদীধাবা বাজাইছে উচ্ছ্সিত বীণা,
দ্রুত পদ সঞ্চালনে চলে অভিসারে,
উপলে উপলে বারে বারে
প্রতিহত গতি
অন্ধ প্রেমে অতি বেগবতী,
তারি গান দিনমান ঝঙ্কারিছে দয়িতের গভীর বন্দন
আমার হৃদয়ে লাগে ধরিত্রীর হৃদয় স্পন্দন।

আমেরিকার জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণ সমিতি

ডাঃ শ্রীশরৎচন্দ্র মুখার্জী

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কক্ (Koch) যখন তার বিশ্ব বিখ্যাত যক্ষ্মা জীবাণু আবিষ্কার করেন, তখন পৃথিবীর নানা যায়গায় একটা নূতন সাড়া প'ড়েছিল। এর আগে কেউ জানত না যে কেমন ক'রে যক্ষ্মা রোগ হয়। কিন্তু কক্ যখন দেখিয়ে দিলেন যে যক্ষ্মারোগীর থুথু থেকে যক্ষ্মাবীজ নিয়ে অন্য সুস্থ প্রাণীকে যক্ষ্মা রোগ দেওয়া যায় এবং মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে যক্ষ্মাবীজ দেখাও যায়, তখন অনেকের প্রাণে একটা ভরসা এসেছিল যে, তা'হলে চেষ্টা করলে, যক্ষ্মার বিস্তৃতি খানিকটা —এবং সময়ে হয়ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হবে। এই আবিষ্কারটি এযুগের একটী মহৎ আবিষ্কার সে-বিষয়ে কারও সন্দেহ নাই। ককের আবিষ্কারের পর অনেকে অনেক গবেষণা ক'রেছেন—এবং এখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে সত্যই যক্ষ্মাবীজ যতক্ষণ সংস্পর্শে না আসে ততক্ষণ যক্ষ্মারোগ হ'তে পারে না। তাই তখন সকলে আশ্বস্ত হ'লো যে, তাহ'লে যেমন উপায়ে সম্ভব যত যক্ষ্মারোগী আছে, তাদের যদি সুস্থ লোকের সংস্পর্শে আস্তে দেওয়া না হয় তবে যক্ষ্মা-বীজ ছড়াতে পারবে না এবং ক্রমশঃ যক্ষ্মা মৃত্যু সংখ্যা অনেক ক'মে যাবে।

যক্ষ্মা নিবারণের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখ্তে গেলে একখানা বড় বই লেখা যায়। কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, এর সামান্য একটু আভাস দেওয়া মাত্র। আমেরিকার জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণ সমিতির National Tuberculosis Association) কথা লিখ্তে গেলে নিউ ইয়র্কের ডাক্তার বিগ্‌স্ (Dr. Biggs) এর নাম উল্লেখ না করা অসম্ভব। ককের আবিষ্কারের অল্প দিনের মধ্যেই এঁরই চেষ্টায় নিউ-ইয়র্কের যক্ষ্মা নিবারণী কাজ পুরামাত্রায় আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম অনেক ডাক্তার এসব কাজকে "অসম্ভব" ব'লে উৎসাহ দিতে রাজী হন নাই। কিন্তু বিগ্‌স্ তখন নিউ-ইয়র্ক সহরের হেল্‌থ্ কমিশনার, তাঁর হাতে ক্ষমতা খানিকটা ছিল। তিনি তাঁর দেশের লোককে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে যক্ষ্মা নিবারণ পুরা মাত্রায় না ক'রলে দেশের অকাল মৃত্যুর সংখ্যা কিছুতেই ক'মবে না। তখন যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে তর্ক ক'রে কাজে বাধা দিতে চেয়েছিলেন তার পরে তারা অনেকেই সেজন্য লজ্জিত হয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যক্ষ্মা নিবারণী কাজের ফলে যক্ষ্মা মৃত্যুর হার এদেশ থেকে যেমন ক'মেছে, তাতে বিগ্‌স্ এর অদম্য উৎসাহকে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না। এখানে এদেশের যক্ষ্মা-মৃত্যুর হার তুলে দেখাচ্ছি, যে, বিগ্‌স্ কেমন মহৎ আদর্শ নিয়ে এদেশের যক্ষ্মামৃত্যু বন্ধ করার পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

১৮৯০ সালে আমেরিকার প্রতি লক্ষ লোক সংখ্যায় যক্ষ্মামৃত্যুর হার ছিল ২৪৫'৪। ডাক্তার বিগ্‌স্ এর অদম্য উৎসাহে ও চেষ্টায় ১৯০৪ সালে এই হার ক'মে লক্ষ প্রতি ২০০ হয়। এই সময়ে এদেশের জাতীয় যক্ষ্মা সমিতির সৃষ্টি হয়। জাতীয় অর্থে কেউ যেন মনে না করেন যে এদেশের সর্ব্বত্র—অথবা সব ষ্টেটে (মোট ৪৮ টি ষ্টেট্) প্রচারের কাজ তখন আরম্ভ হ'য়েছিল। নিউইয়র্ক, বষ্টন, ফিলা-ডেলফিয়া চিকাগো, ওয়াশিংটন এবং কেম্ব্রিজ (New york, Boston, Philadelphia, Chicago, Washington and Cambridge, Mass) মাত্র এই ৬টী সহরে যক্ষ্মা নিবারণের কাজ চল্‌ছিল। কিন্তু এই কয়েকটী সহরের প্রচারের ফল এত উদ্দীপনাজনক হ'য়েছিল যে এদেশের সর্ব্বত্রই একটা আশ্বাসের চিহ্ন ও উদ্যমের চেষ্টা দেখা গেল। এ উদ্যম যে কত কাজ ক'রেছে তা বোঝা যায় যখন আমরা এদেশের বর্ত্তমান যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির সংখ্যার দিকে তাকাই। ১৯৩১ সালে এদেশে

মোট ২০৪৮টি ছোট বড় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি পূর্ণ উদ্যমে কাজ ক'রেছে। সংখ্যা ক্রমশঃ আরও বাড়্‌ছে এবং আরও যে বাড়্‌বে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এতগুলি সমিতির যুক্ত উদ্যমে যক্ষ্মার ভীতি এদেশে অনেক ক'মেছে, এবং যক্ষ্মামৃত্যুহারও ক্রমশঃ নীচের দিকে যাচ্ছে। ১৯২৯ সালে মৃত্যুহার এসে লক্ষ প্রতি মাত্র ৭৬ জনে দাঁড়িয়েছে। ২৪৫ থেকে ৭৬ জনে কমান বড় কম কথা নয়!

অবশ্য এখানে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। যক্ষ্মা মৃত্যুহার কমার একমাত্র কারণ যে এই সব সমিতি, তা খুব অনায়াসে বলা চলে না। ১৮৯০ সালের সঙ্গে ১৯৩১ সালের তুলনা করতে গেলে অনেক বিষয়ের পার্থক্য দেখা যাবে সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাবিষয়ক, সাধারণ-স্বাস্থ্য-জ্ঞানবিষয়ক নানা রকম পরিবর্ত্তন যে এই ৪০ বছরে হয়েছে সে বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ হতে পারে না। ৪০ বছর আগেকার লোক আজকার মত এত সহজে অনেক কথা বুঝতে পারত না, এত সব নূতন নূতন আবিষ্কার তখন হয় নি। শরীর, স্বাস্থ্য, বা এমন কি অনেক নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ের জ্ঞান এখন তখনকার চেয়ে অত্যন্ত বেশী। সুতরাং হয়ত বা যদি এই সব যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির সৃষ্টি নাও হোত, তবুও যক্ষ্মা মৃত্যুর হার কম্‌ত। কিন্তু এটা বোধহয় খুব জোর গলায় বলা যেতে পারে যে এইসব সমিতির শিক্ষা, প্রচার ও চিকিৎসা প্রণালীর কাজ না হলে এত শীঘ্র মৃত্যুহার কখনও এত কম্‌ত না। অশিক্ষিত লোক আগে যেমনভাবে থুথু ফেল্‌ত, অবহেলায় নিজের যক্ষ্মাবীজ অপরকে দিয়ে দিত ও একবার যক্ষ্মা হলে "শিবের অসাধ্য" ব'লে শেষ দিনের আশায় দিন গণ্‌ত, এখনও হয়ত অনেকটা তাই ক'রত। কিন্তু আমার মনে হয়, এই সব সমিতির প্রচারের ফলে আজ এদেশের যক্ষ্মা রোগের চিন্তার ধারা পর্য্যন্ত বদ্‌লে গেছে। আজ এরা সহজে বুঝ্‌তে পারে যে যক্ষ্মা রোগ অনেকটা অন্য রোগেরই মত। সাবধান মত স্বাস্থ্য রক্ষা ক'রতে পারলে, উপযুক্ত খাবার, ভাল হাওয়া ও যথেষ্ট সূর্য্যালোক পেলে রোগকে চাপা দিয়ে স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়ে পাওয়া সম্ভব। তাই, এখন এদেশে যক্ষ্মা হ'লে তাড়াতাড়ি এরা উপযুক্ত স্যানিটোরিয়ামে যায়। উপযুক্ত খাবার খায়। অল্পদিনে আবার সুস্থশরীর নিয়ে সংসারের কাজে লেগে যায়।

আমার একটী বিশেষ বন্ধু বর্ত্তমানে এদের জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির প্রচারের কর্ত্তা। এঁকে এদেশে বলে ইনি হলেন যক্ষ্মা সমিতির "জন্মদাতা"। সমিতির জন্ম থেকেই ইনি—ডাঃ ফিলিপ জেকব্‌স্ (Dr. Philip P, Jacobs) এঁর সমস্ত সময় প্রচারের কাজেই দিয়ে আস্‌ছেন। কত লোক আস্‌ছে—কত যাচ্ছে—কত আবার আস্‌বে। ডাঃ জেকব্‌স্ সেই পুরান কাল থেকে একান্ত মনে কাজ চালিয়ে নিজেকে ধন্য ও দেশকে বাসোপযোগী করার চেষ্টা ক'রছেন। আমি যখন বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "আপনারা এই যে বিস্তৃত আফিস ক'রে ব'সে আছেন, প্রচার ক'রছেন কখন?"

উত্তরে আমায় একটু লজ্জা দিয়েই বল্লেন—"সব সময় কি শারীরিক পরিশ্রম না ক'রতে দেখ্‌লে—কাজ করা হয় না ব'লতে হয়? তবে শোন, আমরা কি করি। আমরা বছরে ১০,০০০,০০০ খানার বেশী উপদেশপূর্ণ যক্ষ্মা নিবারণ পুস্তিকা বিতরণ করি। তাছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে প্রবন্ধ বছরে বহুবার লেখা হ'চ্ছে। রেডিওতে বক্তৃতা, মুখে বক্তৃতা, ছবিতে দেখান, চলচ্চিত্রে দেখান এ সবই হয়। এগুলো কি কাজ নয়?"

সত্যই এগুলো বড় ভাল কাজ। নিজেই একটু লজ্জিত হ'লাম। ক্ষণিকের জন্য ভুলেছিলাম যে এ হোল আমেরিকার কথা—ভারতের কথা নয়। বন্ধুবর একটু বেশী ক'রে বুঝবার জন্য, তাঁর ডেস্ক্ (Desk) থেকে এক খানা বই খুলে দেখালেন এদেশের সংবাদ পত্রের সংখ্যা কত! একটু অবাক্ হয়েই পড়লাম।

যুক্তরাজ্যের দৈনিক সংবাদপত্র	মোট—	২৯৯১টী
সাপ্তাহিক	মোট—	১৪,৩৩১টী
মাসিক	মোট—	৫,৫২৯টী
মোট সংখ্যা—		২২,৮৫১টী

জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি ধারাবাহিক রকমে এই

সব কাগজগুলোকে সময়োপযোগী প্রবন্ধ পাঠায়। এক সঙ্গে অনেকগুলো ছাপালে "একঘেয়ে" হ'য়ে যায়—তাই সময় বুঝে পাঠান হয়। তাছাড়া, লেখা ভাল হয় বলে কাগজ-ওয়ালারা সর্ব্বদা যক্ষ্মাপ্রবন্ধগুলি ছাপানর জন্য উৎসুক হ'য়ে বসে থাকে। বন্ধুবর আমাকে আরও একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই বোধ হয় তার কয়েকটা প্রবন্ধ আমার সাম্‌নে খুলে ধ'রলেন। এদেশের লেখার দস্তুর এই যে প্রবন্ধ যদি খুব বেশী বড় হয়—বা অতিরিক্ত বাজে কথায় পূর্ণ হয় তবে লোকের পড়ার উৎসাহ ও ধৈর্য্য থাকে না। ভাল প্রবন্ধ লেখক তার প্রথম কয়েক লাইনের মধ্যেই বুঝিয়ে দেয় যে প্রবন্ধে কি ব'ল্‌তে যাচ্ছে। এতে পাঠকের উৎসাহ খুব বেড়ে যায়।

যক্ষ্মা নিবারণের কাজের জন্য টাকা যথেষ্ট দরকার। কি ক'রে এরা এ টাকা তোলে সে এক বড় ইতিহাস। এরা যে ভাবে টাকা খরচ করে তা বোধ হয় আর কোনও দেশে সম্ভব হয় না। শুন্‌লাম যে এই কাজের জন্য জাতীয় সমিতি বার্ষিক ৫,০০০,০০০ ডলার শুধু (Christmas Seals) বড় দিনের সময়-ষ্ট্যাম্প বিক্রী ক'রে তোলে। এই 'শিল্' বিক্রী এক বিরাট ব্যাপার। এদের দেখা দেখি এখন অনেক দেশে এই রকমে টাকা তোলার ব্যবস্থা হ'য়েছে।

আমাদের দেশেও এইভাবে টাকা তোলার জন্য এরা সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছে। "শিল" বিক্রী করার সুবিধা এই যে এতে ধনী দরিদ্র সকলেই সাহায্য ক'রতে পারে। লোকে যেমন ষ্ট্যাম্প্ দিয়ে ডাকে চিঠি পাঠায়, বড় দিনের সময় সকলে চিঠির উপর, বা উপহারের পার্শেলের উপর যক্ষ্মার 'শিল' লাগিয়ে দেয়। "শিলের" দাম খুব কম। ডাকের ষ্ট্যাম্পের দামের মতই সস্তা। অথচ, এই রকম এক পয়সা দুপয়সা ক'রে এরা ৫০ লক্ষ ডলার বৎসরে তোলে। কারও গায়ে লাগে না, অথচ কাজ উদ্ধার হয়।

যক্ষ্মা নিবারণ অনেকটা নির্ভর করে সাধারণের শিক্ষার উপর। সাধারণে যত দিন না বুঝ্‌বে যে এ রোগ সংক্রামক এবং সাবধান হ'লে নিবারণ করা সম্ভব, ততদিন প্রকৃত যক্ষ্মা নিবারণ হবে না। তাই এদেশে এখন প্রচারের জন্য এত চেষ্টা হচ্ছে। এবং এর ফলও ভাল হয়েছে। এখন আর আগেকার মত লোকে যক্ষ্মার নামে যমের কথা ভাবে না। এখন এরা সাহস ক'রে রোগের প্রতিকার চেষ্টা করে। এদের দেখে আমাদের এবিষয়ে শিখ্‌বার যথেষ্ট আছে। হয়ত এদের মত আমাদের এত সুবিধা নাই। এদের এক ভাষা, এক দেশ, এক জাতীয় লোক, শিক্ষিতের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী—পয়সাও যথেষ্ট। তবু আমরা যদি ছোটখাট ভাবেও আরম্ভ করি, একটা জেলা বা অন্ততঃ একটা সহর এক সময়ে হাতে নিই, চলচ্চিত্র বা মৌখিক বক্তৃতায় সকলকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করি, তা হলে সময়ে এর ফল দেখে অন্যান্য সহরে ও প্রদেশে এই রকম কাজ প্রচার হবে, যক্ষ্মা নিবারণ হবে, বহু অকাল মৃত্যু বন্ধ হবে।

ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখার্জ্জী

মিষ্টিক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বাংলাভাষায়—অনেক সমজ্‌দার মিষ্টিক শব্দের তর্জ্জমা করিয়াছেন মরমী কবি, আর একজন করিয়াছেন দরদী কবি,—মরমীই হোক আর দরদীই হোক মূলতঃ অর্থ খুঁজিতে গেলে আমরা এক সংজ্ঞায় উপনীত হই—যিনি মরমী অর্থাৎ সব জিনিষের তলায়ে দেখবার শক্তি সঞ্চয় করেছেন, দরদী অর্থাৎ সব জিনিষ সম্বন্ধে যার বুকে দরদ আছে, যিনি মহৎ হইতে অণুরেণুকণা পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যবৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা প্রত্যেক জিনিষের বিভিন্নরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহাকেই মিষ্টিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

সৌন্দর্য্যবোধের অন্তর্নিহিত সত্যের ধ্যানই মিষ্টিক কবিদের লক্ষ্যের আদি সোপান। Romantic যুগের সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মানদণ্ডের উপর Romance-এর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহা সৌন্দর্য্যবৃত্তির প্রথম পরিচয় মাত্র। সুতরাং সৌন্দর্য্যবৃত্তির পরিচয়কে আমরা Romanticism বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। যে বৈষ্ণব, সাহিত্যে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা মনের উচ্ছ্বাস রোমান্সের পূর্ণ মাত্রায় উঠার আকুল নিবেদন লেখনীতে দুটি কথায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে—

বঁধু কি আর বলিব আমি—
জনমে জনমে মরণে মরণে প্রাণনাথ হৈও তুমি।

সেই লেখনীতে কেন আবার বাঁচামরার হিসাব-নিকাশ বা ভগবতপ্রেমে ভরপুর প্রাণের কাকুতি-মিনতি দেখে অব্যক্ত হাহুতাশ।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
নাহি তার আদি অবসান
তুঁহে জনমি পুন তুঁহে সমাওত
সাগর লহরী সমান।

নিজের ঘরোয়া ধরণেই (domesticated ideas) তার ব্যাপ্তি নয়। সে মহাপ্রলয়ের দিন হতে ধরিত্রীর পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তির বা মরণের কী এক অচিন্ত্যধারার পদ্ধতি আকুলপ্রাণে খুঁজিতেছে

তুঁহে জনমি পুন তুঁহে সমাওত
সাগর লহরী সমান

এখানেই সকল কিছুর শেষ। ভগবতপ্রীতির বা সাধনার ও কর্ম্মপ্রেরণার বিমলমুক্তি আপনা হতে আসিয়াই যেন ধরা দিতেছে

তোমা হতে আসি পুন তব পদে হই লয়,
তবে মাঝখানে অত ফাঁক কেন?
নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতায়—শূন্য থাক্

....

মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক

তোমা হতে আসিয়া তোমাতেই যখন ফিরে যাব—তখন মাঝখানে মহাপ্রলয়, ব্রহ্মা, সৃষ্টি, নদনদী, সাগর, অনন্ত, অসীম অতশত কেন? এই কেনই তাহার প্রধান তাৎপর্য্য।

বস্তুতঃ যাঁহারা মরমী বা দরদী কবি তাঁহাদের অন্তঃ অনুভূতি অতীব সজাগ, তাঁহারাই সৌন্দর্য্যপিপাসু বা worshippers of beauty এন্‌ডিমিয়ন্‌-এর প্রথম ছন্দ। A thing of beauty is joy for everই যাহার আদি ও অন্তিম পরিণতি বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

মিষ্টিকেরা সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা অরূপের মাঝেও রূপ দেখিয়া থাকেন, প্রতি ধূলিকণাও তাঁহাদের নিকট মহান ভাস্বর হইয়া ওঠে, মধুবৎ পার্থিবং রজঃ, মহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধূলিকণা পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট মধুময় বলিয়া অপরূপরূপে পরিগণিত হয়, এরূপ সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারাই মানুষ দেবতা বা extemphor সংজ্ঞায়

উপনীত হইতে পারে, অচেনা জগতের অজানা কাহিনীও তাঁহাদের নিকট চিরপরিচিত বলিয়া বোধ হয় স্বয়ং অন্তর্যামী মরমে বসিয়া তাঁহাদের মুখ দিয়া কথা কহান, রবীন্দ্রনাথই এইভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
তব কথা দিয়ে মোরে কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

অন্তর্যামী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাল কাড়িয়া লন, কাণ্ডারী যেমন তরীকে চালাইয়া লইয়া যায় তিনিও সেইরূপ তরীর ন্যায় চলিয়া থাকেন। বীণাপানি যেন স্বহস্তে তাঁহার মরম-কোঠায় মধুচক্র রচিয়া থাকেন এবং তাহাতেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ আনন্দের উচ্ছ্বাসে রূপকে বাণী দিবার নিমিত্ত আকুল হইয়া ওঠে। এক অজানা বাসন্তী হাওয়ায় মশগুল মনপ্রাণ সমুখ বন্যার বেগ সামলাইতে না পারিয়া দিকে দিকে ছড়ায়ে যায়, এরূপেই—

অন্তঃপ্রাণ পায় গো চেতন
লুটে দিতে চায় তনুমন,

এখানেই নিজের মধ্যে আর একজন এসে দাঁড়ায়, তখন জীবনের তারগুলি ঝমঝম্ করিয়া বাজিয়া ওঠে,

চারিদিকে গান বিশ্বে ছোটে
চারিদিকে প্রাণ নেচে ওঠে।

তখন সমগ্র বিশ্ব যেন আনন্দের তুফানে উদ্বেলিত হইয়া অনন্তের দোলনায় দোল দিবার জন্য লুটোপুটি খায়।

তখন অমৃতরূপমানন্দং যদ্বিভাতি।

সমগ্র বিশ্ব এক অমৃতের আসর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বীণাপাণি স্বহস্তে রাগরাগিণীর মূর্চ্ছনায় দরদী কবিকে পাগল করিয়া তুলেন; তিনি তখন সম্পূর্ণ আত্মহারা হন, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। এই নিঁখুত সৌন্দর্য্যপূজারীকে আমরা mystic বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এ বিষয়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অনেক কাব্যস্রষ্টাদের লেখার মধ্যে এরূপ তন্ময়তা খুঁজে পাওয়া যায় না। অতীন্দ্রিয়তার যে আভাস প্রতি ছন্দে মুখর হইয়া উঠে মিষ্টিকের লেখা থেকেই আমরা উহা পাই। সৌন্দর্য্যধ্যানে মগ্ন কবির কাব্যের রূপ আপনা হতেই ফুটিয়া ওঠে ও অপরূপ হয়। অন্তর্গত লইয়াই তখন তাঁহার সম্বন্ধ, তিনি যাহা শোনেন তাহাই তাঁহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে ও প্রাণ আকুল করে।

এই অনন্ত সৌন্দর্য্যতত্ত্বের একটুকু কণার আস্বাদই তাঁহাদের কাব্যের রসসৃষ্টির উন্মাদনা। কারণ অত উঁচু স্তরে (highest standard) ভাব থাকিলেও ভাষা থাকিতে পারেনা; উহা প্রাণের সরল কথার মত সাদাসিধে হইয়া যায়।

ঐ সৌন্দর্য্যতত্ত্বানুশীলনের অন্তর্বৃত্তি বা তুরীয়বৃত্তি যে স্তরের সেই স্তরে গেলেই প্রকৃত রূপ আস্বাদন করা যায়, কিন্তু অনেক কবির লেখা ঐ স্তরের নাগাল পাইলেও প্রকৃত পক্ষে পায় না। মরুভূমি মরিচীকার ন্যায় বহিরাবরণ দেখিয়াই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায় না, যেমন—

ফুলকরবী ঘোমটা খোলো
ডাকছে ডালে বুলবুলি হায়।

ইহা এমন মিষ্টত্বে ভরপুর হলেও মিষ্টিচিজম্-এর ঘরে যাইবার মত শক্তি রাখে না, কাজেই এই দুটী পংক্তিকেও আমরা রোমাণ্টিক বৃত্তির পরিচয়ের নিদর্শনস্বরূপ ধরিতে পারি, সোজাভাবে বলিতে গেলে রোমাণ্টিচিজম্ সৌন্দর্য্য বোধের প্রথম সংস্করণ আর মিষ্টিচিজম্ চরম সংস্করণ, প্রথমোক্তটিতে মানুষের চিত্তবৃত্তি উতলা হয় বটে কিন্তু শেষোক্তভাবে মানুষ পাগল হইয়া যায়। ঐরূপ আত্ম-ভোলাকবিগণই প্রকৃত রসসৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহারা রূপের পূজারীগণ্য রূপের পূজারী। তাঁহারা প্রকৃতিপক্ষে স্ব স্ব জীবনে সৌন্দর্য্যানুভূতি উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মাণ্ডের বিচিত্র রূপেই মগ্ন হইয়া যান। তাই রবীন্দ্রনাথ—

জগতের মাঝে তুমি বিচিত্ররূপিনী হে—
বিচিত্ররূপিনী।

এখানেই বিচিত্রার রূপ।

তাই বৈরাগ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়—
অসংখ্যবন্ধনমাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।

আবার 'তোমাদের মাঝে আমি পেতে চাই স্থান'।

এরূপেই অসংখ্যবন্ধনের মাঝে বিচিত্ররূপে বিভোর হওয়াই মিষ্টিকের বিশেষত্ব—তাঁহারা মর্ত্তকে স্বর্গে পরিণত করিয়া তুলেন—

Up the heaven down the hell
It'sn't due reasoning
Here's the heaven and here's the hell
This's true and all are nothing.

সৌন্দর্য্যের আবাহন, পূজা ও ধ্যানে যে মর্ত্ত্যও স্বর্গে গড়িয়া ওঠে, অসুন্দরও সুন্দর হয় এ কথা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ যাহারা মরমী তাঁহারা অন্ততঃ নিম্নোক্ত বাণী স্মরণ করিয়াই জীবন পথকে সুন্দর করিয়া তুলেন—

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম—
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

এই সত্য ও শিবসুন্দরের উপাসকেরাই মিষ্টিক, মরমী বা দরদী কবি। সৌন্দর্য্যতত্ত্বে মগ্ন হইয়া তাঁহারা জীবন যাত্রা শেষ করিয়া থাকেন—মধুর হইতে মধুরতর ছন্দে উল্লসিত হইয়া, কিন্তু এই মধুরেণ সমাপয়েৎ ই তাঁহাদের last basis নহে, তাঁহারা light more light, সিঁড়ি কই সিঁড়ি বলিয়া ওপারের আলো দেখিতে তৎপর হন, প্রত্যেক মহাত্মার জীবনেই এরূপ সম্পূর্ণতার অভিযানের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়—শেষ দিনেও এই মরমী বা মিষ্টিকেরা 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো' বলিয়া পথ খুঁজিতে থাকেন; সীমার মাঝে অসীমের রূপ ফুটাইয়া থাকেন।

ওঁ সহনাববতু, সহনৌভুনক্তু,—
সহচিত্তং করবাবহৈ।

চিত্তরঞ্জন দাশ

"স্বপনে হেরিনু করাল ঝঞ্ঝা গ্রাসিছে সোনার চরে!"

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কালি, নিশীথ শয়নে স্বপন দেখিনু
ভাঙন ধ'রেছে চরে—
হেরি, কালো জল-রাশি উঠি' উচ্ছ্বাসি'
কাল ফণা যেন ধরে!

আলোড়ি বিলোড়ি বিপুলোল্লাসে
প্রলয়-মত্ত ঢেউ ছুটে আসে
আঘাতে আঘাতে বালু-পাড় যত
ধ্বসিয়া খসিয়া পড়ে!
কালি, নিশীথে হেরিনু করাল ঝঞ্ঝা
গ্রাসিছে সোনার চরে!

সভয়ে কাঁপিছে সবুজের ক্ষেত,
কাঁপে পীত শস্য ফুল—
থর থর করি' ভূমি উঠে নড়ি'
পলায় বিহগ কুল—

এখনো ঘূর্ণি ঘুরিতেছে যেন
শিরায় শিরায় প্রমত্ত হেন
এখনো নয়নে ভেঙ্গে ভেঙ্গে মাটি
ক্ষুধিত দরিয়া ভরে!
স্বপনে যে ছবি দেখেছি, জাগিয়া
তাই দেখে কাঁপি ডরে!

কর্ম্ম-ভিক্ষু

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

ঘড়ি ধরে ঠিক এগারোটার সময় বেড়িয়ে পড়ে, আর সারাটা দুপুর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ইডেন গার্ডেনে ঝিলের ধারে শুয়ে বসে, মার্কেটের এ মাথা ও মাথা করে, ঠিক পাঁচটায় বাসায় ফিরে আসে।—"না : ভাই বিমল দা' আর পারা যায় না বেশ আছ তোমরা, বাড়ী থেকে মাস মাস টাকা আসচে, আর দিব্যি খাতা হাতে কলেজ যাচ্চো, আর থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখে ফিরচো, আর আমাদের হালটা দেখ একবার, কোন্ সাত সকালে চাট্টে ভাতে ভাত নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়েচি, আর সারাদিন কলের মতো কলম পিষে এই ঘরে ফিরচি,—তাও মাসান্তে মাত্র একশো'টি টাকার জন্তে···টেবলের ওপর ওটা কি হে? বাঃ বেড়ে পাকা পেঁপে তো, পেলে কোথা? দাও দিকিন্ ছুরিটা একটু চেখে দেখি।" —তারপর কাগজ কলম নিয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখতে বসে—'আজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম তার আপিসে, বিশেষ কিছু আশা দিতে পারেন নি, তবে বল্লেন ভ্যাকেন্সি হ'লেই আমায় স্মরণ করবেন,······ আর কুড়িটা টাকা পাঠিয়ে দেবেন' ইত্যাদি।···

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি ডিগ্রিই অবলীলাক্রমে হাতে এসে গেছে, কলেজ বেরোবার ছুতো ক'রে যে আর ক'টা দিন কাটিয়ে দেয়া যাবে তারও উপায় নেই, যা হোক একটা কাজকর্ম্ম জুটিয়ে উদরান্নের সংস্থানটা অন্ততঃ না করলেই আর চলে না। অথচ ললাটে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানের ছাপ, দরজায় দরজায় হাত পেতে উমেদারি করতেও আত্মসম্মানে বাঁধে, কাজেই···

পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে, দৈবাৎ মুখোমুখি হয়ে পড়লে বলে 'রিসার্চ্চ কচ্চি,' ভেতরকার কথা যারা জানে, তারা হাসে, বলে,—রিসার্চ্চই বটে, মিথ্যে নয়, তবে বিষয়টা একটু অভিনব, প্রচলিত জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত বেশী গবেষণা হয়ে গেছে যে এতে আর নতুন কিছু করবার নেই, তাই তার সব্জেক্ট হচ্চে 'আধুনিক জগতে বিশ্বমানবের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা আর তার প্রশান্তির উপায়', এর মেথড্টাও অভিনব, লাইব্রেরী, লেবরেটরির কোন প্রয়োজন নেই, প্রাত্যহিক জীবনের প্রাণান্তকর অভিজ্ঞতা—ঘরে অভাবের তাড়না, পাওনাদারের রক্তচক্ষু, বাইরে প্রতিবাসীদের নির্ম্মম উদাসীনতা—এর matters যোগায়, ফোঁটা ফোঁটা ক'রে হৃদয়ের রক্তে এর থিসিস্ লেখা হয়।···

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে যায়, কাগজওয়ালার দোকানে, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, অমৃতবাজার ক'রে সব ক'টা দৈনিকের কর্ম্মখালির columnগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে এক পয়সা দিয়ে একখানা 'অবতার' কিনে নিয়ে চলে আসে। কোনদিন তাও আনতে পয়সা থাকে না। কাগজওয়ালা রাগ করে, করুক, উপায় নেই।···

বাসায় ফিরে মুখ হাত ধুয়েই আবার বেরিয়ে যাবে, এমন সময় দরজাপথে দেখা দেয় মেসের ম্যানেজারের কালান্তকের মত মূর্ত্তি,—

'সরোজ বাবু, আজকাল ক'রে তো দেড়মাস ঘোরালেন, এবার আমায় কিছু দিন্। এ গরীবের টাকা কয়টা ভাঁড়িয়ে আর আপনার কি হবে বলুন'।

'এই যে রাম বাবু, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম, আপনি কত পাবেন বলুন তো'?

'গত মাসের খোরাকিতে আর ঘর ভাড়ায় পোনেরো টাকা, আর তার আগের মাসের বাকী তিন টাকা সাত আনা তিন পয়সা,—একুনে হলো গিয়ে আঠারো টাকা সাত আনা তিন পয়সা।'

'থাকুগে, আঠারো টাকা আট আনা-ই ধরুন,—তা আজ

হোল শুক্রবার, শনি—রবি—আচ্ছা রাম বাবু, এতদিনই যদি সয়েচেন তবে দয়া ক'রে আর দু'টো দিন অপেক্ষা করুন। এই সোমবার মাইনেটা পেলেই আপনার পাই পয়সা মিটিয়ে দোব।—কি, কি ভাব্‌চেন ?'

'ভাব্‌চি, আপনার এ মাইনে পাওয়ার শেষ হবে কবে ? এ দু'মাস ধ'রে রোজই তো শুনে আস্‌চি, আপনি সোমবার মাইনে পাচ্চেন।'

'তা রামবাবু, আপনাদের আশীর্ব্বাদে কামাচ্চি কি আর কম ? কিন্তু হলে কি হয় ? একত্র কত্তে পাচ্চি না, মাসান্তে যা কিছু পাই সব মানি অর্ডারে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হয়। বাড়ীতে পোষ্য হচ্চে এক পাল, তা ছাড়া ছোট ভাইবোনেরা রয়েচে, তাদের পড়ার খরচ রে, কাপড় জামা রে, হেনো রে, তেনো রে—একটী পয়সা সেভ্‌ কত্তে পারি না। আর কুলোবেই বা কেন ? Earning member তো এক—আপনি এখন তবে আসুন, রামবাবু, আমায় আবার এখুনি বেরোতে হবে টুইশানিতে, মরবার ফুরসুৎটুকু নেই, বলেন কেন ? আপনি ভাব্‌বেন না; সোমবার ঠিক পেয়ে যাবেন।'—

বড় রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়াতে ভরসা হয় না, কি জানি কার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। দুপুর বেলাটা সবাই যে যার কাযে ঘরে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সকালে আর বিকেলে চেনা লোকের জন্ত রাস্তায় পা ফেলা যায় না,—

ঘণ্টা দুই অলিগলি দিয়ে ঘুরঘুর করে বাসায় ফিরে এসে ব্যস্তভাবে নাওয়া খাওয়া শেষ কত্তে লেগে যায়। সব সময় ব্যস্তভাব দেখাতে হয়, নৈলে বাজারে ক্রেডিট্‌ থাকে না।

মেসের লেটার বক্‌স্‌টা দিনে তিনবার যেন দু'হাত তুলে ডাক্‌তে থাকে, দু'জায়গায় Being given to understand পাঠানো গেছে। Leslieর বাড়ী থেকে একটু আশ্বাসের মতও পাওয়া গেছে, কি জানি কখন ওদের appointment letter এসে হাজির হবে,·····হাঁ, এই যে একখানা পত্র আছে, কিন্তু,—কোন আপিসের চিঠি নয় তো! পিতৃদেব লিখেচেন দেশ থেকে—বাবা সরোজ, তোমার পত্র পেয়েচি, কিন্তু টাকা পাঠাবো কোথা থেকে, বাবা ? দেশের অবস্থা অতি মন্দ, আজ তিন মাস একটা কেস্‌ হাতে আসেনি, লোকে মোকদ্দমা করবে কি, খেতে পায় না। তোমার গর্ভধারিণী আজ দু'সপ্তাহ আমাশয় রোগে শয্যাগত আছেন, পয়সার অভাবে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্চে না। তুমি আমার সুযোগ্য পুত্র, এবার সংসারের ভার নিয়ে আমায় মুক্তি দাও' ইত্যাদি,—

পিতা উকীল, ব্যবসায়ে খ্যাতি আর অর্থাগম দুই এক সময় হয়তো ছিল, কিন্তু প্রজার হীন অবস্থা, আর বন্যার খাঁই, দু'য়ে মিলে একটু একটু করে রাজদ্বারের পথ সাধারণের পক্ষে দুর্গম করে তুল্‌লো, আইনব্যবসায়ীদেরও অন্ন গেল।—

পত্র পড়ে খানিক গুম্‌ হয়ে বসে থাকে, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে। ঘামে চট্‌চটে আধময়লা জামাটা দড়ির আল্‌না থেকে খুলে গায়ে দেয়, পিঠের দিকে একটা জায়গা বিশ্রীভাবে ছিঁড়ে গেছে, ময়লা তাঁতের ওড়নাটা জড়িয়ে সেটাকে লোকচক্ষুর আড়াল করবার বৃথা চেষ্টা করে।—জুতোগুলোর অবস্থা একেবারে অকথ্য, এক টাকা দিয়ে 'বাটা'র কেড্‌স্‌ একজোড়া কেনা গেছ্‌ল দু'মাস আগে, এতদিন গেছে, আর যেতে চায় না,—নাঃ, এবার টাকা এলেই first thing এক জোড়া নতুন জুতো কিনে ফেল্‌তে হবে, যায় যাবে এক টাকা—কিন্তু ?—টাকা আসবে কোথা থেকে ? বাবা তো লিখেচেন—টাকা নেই! টাকা নেই! টাকা নেই!—তা হলে কি হবে ? রামবাবুকে কি বলা যাবে ? পকেটে তো একটা আধলাও নেই, কি হবে ? উঃ, আর ভাবতে পারে না, দু'হাত দিয়ে সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে চোখের সমুখ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে একবারে নীচে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। জনস্রোতের মধ্যে মিশে গিয়ে, বিশ্বমানবের চিন্তাসমুদ্রে নিজের এক বিন্দু চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আরাম পেতে চায়।—

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে নেহাৎ অভ্যাসের বশেই যেন একটু দাঁড়ায়। ট্রামগুলো অসংখ্য কেরাণী বুকে বয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসে, একটু থামে, আবার চল্‌তে থাকে। বাস্‌গুলোও আসে, খানিক ওঠানামা, হাঁক ডাক চলে, আবার যে যার পথে পাড়ি জমায়। তাদের যে কাজ আছে, দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করবার বিলাসিতা তাদের সাজে না তো!—

লক্ষ্যপথ ড্যালহৌসি স্কোয়ার, একটা কর্ম্মখালির খবর

পাওয়া গেছে, 'অমৃতবাজারে'।—আচ্ছা, যদি কাযটা হ'য়ে যায়,—মাইনে লিখেচে মাত্র আশী টাকা, তা হোক,—গুটি পঞ্চাশ টাকা অন্ততঃ আগাম চেয়ে নিতে হবে,—রামবাবুর টাকাটা ফেলে দিতেইহচ্চে—বাড়ীতেও কয়টা টাকা না পাঠালেই নয়,—মার অসুখ—অসুদ পত্তরটা চাই, পথ্যিটা চাই। তারপর এদিকে জুতো একজোড়া না কিনলে আর রাস্তায় বেরোবার উপায় নেই—জামাটাও গেছে ছিঁড়ে—

'বাবু আপনার ভাগ্যলিপি অবগত হয়ে যান।—ফলিত জ্যোতিষ, করকোষ্ঠি বিচার, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ যথাযথ বলে দোব,—অদ্যকার দিন আপনার শুভ কি অশুভ,—যে কাযে যাচ্চেন, তাতে সফলকাম হবেন কিনা—'

হাতটা আপনা থেকেই পকেটে গিয়ে ঢোকে, আবার তখ্‌খুনি ফিরে আসে। এ যাত্রার ফলাফলটা জেনে গেলে বেশ হোত। যাক গে, কী-ই আর হবে জেনে? যদি বলে ফল অশুভ? কায নেই আগে থাকৃতে মন খারাপ করে।—

দু'তিনটি স্কুলের ছেলে কলরব কত্তে কত্তে পাশ কাটিয়ে চলে যায় তাদের কথার রেশ কানে এসে লাগে, একজন বলচে—কী হবে আর পড়া শুনো করে?...চাকরির গুড়ে তো বালি, দেব কালই ইস্কুল ছেড়ে, একটা দোকান টোকান যা হয় করে বসবো।—

আর কি রোদই উঠেচে! সহরের বুকে যেন আগুন লেগেচে। মেডিকেল কলেজের লাল দালানগুলো রোদে পুড়ে এক ফোঁটা জলের জন্য হাঁ করে দাঁড়িয়ে মরচে যেন! তার ওপর আবার ধূলোর হোলি খেলা চলেচে। নাঃ, কর্পোরেশনের এ ভারী অন্যায়, ফি মাস মুটো মুটো টাকা গলা টিপে নিচ্চে, কিন্তু poor ratepayers দের জন্যে এতটুকু দরদ নেই! এ বিষয়ে একটু লেখালেখি না করলে আর চল্‌চে না। কালই অমৃতবাজারে একটা কোরেস্‌পনডেন্‌স্‌ লিখে পাঠাতে হবে।

আচ্ছা, কি ভাবে আরম্ভ করা যায়? May I crave the hospitality of your esteemed journal ..নাঃ; too hackneyed......Permit me to draw the attention of our city fathers, through your renowned paper, to the just grievances of the ratepayers regarding the most deplorable state of the public thoroughfares...হঁ্যা, এই ঠিক হয়েচে, আজ রাতেই লিখে ফেলতে হবে।—

'কম্‌ ইন্‌ বাবু—ভালো সু হ্যায়—গুড্‌মেক্‌, চীপ্‌ প্রাইস্‌'—

ধন্য জাতি এই চীনাম্যান্‌রা। কোথায় তাদের দেশ, আর সব ছেড়ে ছুড়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে চলে এসেচে এই সুদূর কল্‌কাতায়। এখানে এসে যা হোক্‌ করে খাচ্ছে তো? নাঃ ব্যবসায় ছাড়া কোন জাতি উঠতে পারে না, পি, সি, রায় দূরদর্শী লোক। হাতে কয়েকটা টাকা এলেই business করব যা থাকে কপালে। চাক্‌রিটা পেলে হয়, খুব economically চলতে হবে এবার থেকে। রামবাবুর মেস্‌ ছেড়ে দোব, বারো টাকার মধ্যে খাওয়া থাকা হয়ে যায় এমন একটা বাসা দেখে নিতে হবে।... তা ছাড়া রামবাবু লোকও ভাল নন্‌, বিপদ আপদ কার না আছে, কথায় অমন নড্‌চড়্‌ সবারই হয়ে থাকে। এক মাসের টাকা বাকী পড়েছে বলে রোজ দু'বার তাগাদা! দেব কালই তার মেস্‌ ছেড়ে, এত-ই কী?—হঁ্যা, ওই বারো টাকার মধ্যে খাওয়া থাকা সেরে নিতে হবে—আর হাত খরচার জন্যে ধর পাঁচ টাকা—না হয় আট টাকাই ধরা যাক, অসুখ বিসুখটাও তো আছে? তা হলে হলো কুড়ি, আশী টাকা হতে গেল কুড়ি, থাকে গে—ষাট। বাড়ী পাঠাতে হবে কুড়ি—এ-না, ত্রিশই ধর, ভুলুর পড়ার খরচ রয়েচে, আর মিনুর বিয়ের জন্যেও তো এখন থেকেই কিছু কিছু সেভ্‌ করা দরকার। যাকগে, সব গিয়ে থুয়ে রইলো তা'লে ত্রিশ টাকা। বেশী কিছু থাকচে না, তা না থাকুক, মাইনেও তো ঐ আশী টাকা মাত্র। প্রতি মাসে মাইনে পেলেই ত্রিশটি করে টাকা সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে জমা রেখে আসতে হবে। বছর ঘুরে আসতে ব্যাঙ্কের খাতায় টাকার অঙ্ক হু হু করে বেড়ে যাবে। এ ভাবে চলতে পারলে, তিন বছরে কোন্‌ না হাজার খানেক টাকা হাতে আসবে?......তখন?...না, অমন ছন্নছাড়ার মতো চিরটা কাল থাকা যাবে না। ভারী ফাঁকা

ফাঁকা মনে হবে। একজন সঙ্গী—অথবা সঙ্গিনী, নয় কেন? হাজার টাকা যার ব্যাঙ্কে জমা, বিয়ে করবার যোগ্যতা তার আছে।...কলকাতায় একখানা বাসা ভাড়া করা যাবে। ছোট্ট বাসা, খান দুই ঘর—একখানা শোবার একখানা বস্‌বার হলেই চলে যাবে। তারপর? উঃ ভাব্‌তেও মন আবেশে মাতাল হয়ে ওঠে। আমি যাবো আপিসে, আর নিঃসঙ্গ মধ্যাহ্নের অলস মুহূর্ত্ত গুলো তার শুয়ে, বসে, বই পড়ে রাস্তার জনস্রোত দেখেও কাটতে চাইবে না। চারটা বাজতে না বাজতেই সে গা ধুয়ে চুল বেঁধে, জানালায় গিয়ে দাঁড়াবে আর তার চঞ্চল দৃষ্টি খুঁজে বেড়াবে গলির পথে আমার আফিস-ফেরত শ্রান্ত, ক্লান্ত মূর্ত্তি। দূরে আমায় দেখতে পেয়ে তার বুক উঠবে দুলে, তার চোখে ফুটে উঠবে এক অভিনব আলোর আভা। চোখোচোখি হতে লজ্জায় রাঙা হয়ে জানালা থেকে সরে দাঁড়াবে সে। তারপর সাজানো টেবলের জিনিষ পত্তর সব এলো মেলো করে অতিব্যস্তভাবে লেগে যাবে সে গুলো নূতন করে সাজাতে। আমি ঘরে ঢুকবো, কিন্তু সে আমায় দেখতেই পাবে না। আমার দিকে পেছন ফিরে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে সে নিজের কায করে যাবে, যেন এর ওপরই তার জীবন মরণ একান্তভাবে নির্ভর কচ্চে। আমি জুতো ঠক্‌ঠক্ করবো, হয়তো একটু কাস্‌বো—চমকের ভান করে ফিরে দাঁড়াবে সে, তার বড় বড় শান্ত, উজ্জ্বল দুটো চোখ তুলে চাইবে আমার পানে—এক মুহূর্ত্ত—তারপর সব দৃষ্টি, সব অনুভূতি লীন হয়ে যাবে একটা গভীর, উষ্ণ, সুদীর্ঘ চুম্বনের মাঝে।—

হয়তো এক দিন আপিস থেকে এসে দেখলুম, সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্চে আর আপন মনে গুন্‌গুন্ করে গান কচ্চে, মেঘের মতো কালো, কুঞ্চিত কেশপাশ তার কোমর ছাড়িয়ে পড়েচে—চুলের মৃদু সৌরভ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে একটা অপূর্ব্ব মাদকতার সৃষ্টি কচ্চে। পেছন থেকে পা টিপে টিপে গিয়ে তার চোখ চেপে ধরলুম। সে আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো—'ওগো বুঝেচি, ছাড় ছাড় এবার, বড্ড লাগচে যে—উঃউঃ—'

'এতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রইলুম্ একবার ফিরেও দেখলে না, তার কী? ফাইন্ দিতে হবে না বুঝি'?

'ওগো নাও, যা খুসি তোমার ফাইন্ নাও, শুধ্ চোখ দু'টো ছেড়ে দাও',—চোখ ছেড়ে দিতেই ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে,—'হুঁ', ভারী দুষ্টু হয়েচো, দেব না তো ফাইন্, কথ্‌খনো দেব না'।

'অমনি না দিলে জোর করে আদায় করে নেব। রাজার আইনে যেমন দণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার রীতি আছে তেমনি আবার দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিনত করবার সুবন্দোবস্তও আছে'।

ফাইন আদায় হোল বিনা বলপ্রয়োগেই, তারপর সে আমার বুকে মাথা রেখে আব্দারের সুরে বললো—'চল না আজ সিনেমায়, কাগজে দেখছিলুম, একটা খুব ভাল বই আছে 'চিত্রা'য়, যাবে তুমি আমায় নিয়ে?'

সমস্ত দেহটা আশ্চর্য্যরকম হালকা হয়ে পড়ে, অলক্ষিতে গতিবেগ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। চলার পথ কখন শেষ হয়ে আসে খেয়াল থাকে না। চমক ভাঙে একটা বিশ্রী, বেসুরো কর্কশ কণ্ঠস্বরে—'রাস্তায় বেরোলে চোখ চেয়ে চলতে হয়, গায়ের ওপর পড়্‌চেন এসে, চোখ নেই সঙ্গে?—'

ডানধারে ডালহৌসি স্কোয়ার, বাঁয়ে, হাঁ এইতো—দি পাওনিয়ার লাইফ এসিওরেন্স্ কোং,—বুকটা হঠাৎ ঢিপ করে ওঠে। চারতলার ওপর অফিস। লিফ্‌টের সাহায্যে উপরে গিয়ে শ্লিপ পাঠিয়ে দিয়ে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়ায়, যদি ততক্ষণ বুকের অবস্থা কতকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে।—ভেতর থেকে ডাক আসে, সসম্ভ্রমে ঘরে ঢুকে বড় টেবলটা আশ্রয় করে দাঁড়ায়,—

Well, what can I do for you?

আজকের অমৃতবাজারে দেখছিলুম আপনাদের একজন Branch Secretary'র দরকার—

It is a fact.

'I—I would like to offer my services'—

'আপনার বয়স কত'?

'চব্বিশ'।

'এর আগে এ লাইনে কাজ করেচেন কোথাও'?

'আজ্ঞে না'।

'Academic qualifications?

'M.A. in Philosophy, Second class Third'.

'I see. Can you name me the several districts in Bihar and Orissa'?

'What a question! I can't, just now.

দেখুন, I appreciate your scholarship, তাই বলচি আপনি কোন স্কুল কলেজে ঢুকে পড়ুন, shine করবেন। আমাদের এ লাইনটা নেহাৎই unintellectual, never meant for scholars like you. আচ্ছা নমস্কার।

আবার পথচলা সুরু হয়!—

এ সব ক্ষুদ্র প্রত্যাখ্যান এখন আর গায়ে লাগে না, তবু পা দু'টো হঠাৎ যেন অসম্ভব রকম ভারী হ'য়ে ওঠে,—লাল দীঘির কাকচক্ষু জলের ওপর রোদের ঝিকিমিকি যেন একটা সাদর আমন্ত্রণের ইঙ্গিত জানায়!—সোজা পথ ধরে দক্ষিণে মাঠের দিকে এগিয়ে চলে।—

মোড়ের ঐ কলের পাহারাওয়ালাটা, কী আশ্চার্য্য ক্ষমতা তার চোখে, চারটা রাস্তার বিরামহীন ট্রাফিককে নিয়ন্ত্রিত কচ্ছে শুধু চোখের ইঙ্গিতে। দৈত্যের মত শক্তিমান সব যানবাহন ঝড়ের বেগে পৃথিবী কাঁপিয়ে ছুটে আসে, আর দু'হাত ঐ খুঁটিটার রক্তচক্ষুর সমুখে ভয়ে জড়সড় হয়ে নিশ্চল, নিস্পন্দ হয়ে থেমে যায়।—

অদ্ভুত যন্ত্রমহিমা!

পৃথিবীর বুক চেপে বসে আছে, বিরাট অতিকায় যন্ত্রদেব; আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অসংখ্য স্তাবকের দল তার জয়গানে আকাশ, বাতাস শব্দময় করে তুলচে। কী বিশ্বগ্রাসী, সর্ব্বনেশে ক্ষুধা এ দেবতার! এই তৃপ্তিলেশহীন জঠরানলের খোরাক যোগাতে গিয়ে শত শত নরনারী আর্ত্তনাদ করে ঢুলে পড়চে এর সদা ঘূর্ণ্যমান দুই চাকার নীচে। দলিত, নিষ্পেষিত, চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে চক্ষের পলকে, কে তার খোঁজ রাখে? সমষ্টির পদতলে ব্যষ্টির আত্মদান, এই তো জাগতিক বিধান!—

'সরোজ—অ সরজ'—

আরো জোরে পা চালিয়ে দেয়, পেছনে যে ডাকচে সে যেন মানুষ নয়, যন্ত্রদেবতার কোন উপাসক, তাঁর পুজোর বলিদান খুঁজতে বেরিয়েচে।

'সরোজ, একটু দাঁড়াও ভাই, একটা কথা শোন'।—

কর্জ্জন পার্কের ভেতর দিয়ে সোজা চৌরঙ্গীর দিকে ছুটে চলে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, প্রাণভয়ে যেন!—কিন্তু পা দু'টো হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসে, এগোতে চায় না। একটা ঝোপের পাশে গাছের ছায়ায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে, দু'হাতে মুখ ঢেকে।—

'কি ভাই সরোজ, অমন করে পালাচ্চিলে যে? ভাবচিলে বুঝি মনিদা' আসচে টাকা চাইতে, না'?

'না, না,—তা নয়, তা তুমি জেল থেকে বেরোলে কবে?'

'সে কথা বলতেই তো আসছিলুম, তা তোমার এ হাল হলো কি করে? 'হা অন্ন' ষ্টেজ এসে গেছে বুঝি'?'

'পুরোদমে, তোমাদের তবু এটুকু সান্ত্বনা আছে যে দেশকে ভালবেসে তাঁর পায়ে নিজের সব সুখ সুবিধে বিসর্জ্জন দিয়েচো, আমাদের যে তাও নেই'।

'ওঃ, তুমি বুঝি তাই মনে করে আছ যে দেশের জন্য আমি জেলে গেছি। হাঃ হাঃ,—ভুল বুঝেচো ভাই সরোজ, ভুল বুঝেচো—আমার এ কারাবরণ দেশের জন্য নয়, নেহাৎই নিজের জন্য'।

'তার মানে'?

'তবে শোন আমার স্বদেশ-প্রীতির ইতিহাস।—যে দিন খবর এলো আমি বি, এ পাশ করেচি, সেদিনই আমার পিতা দেহরক্ষা করলেন। তিন মাসের মধ্যে মাও গেলেন, এতে একটা সুবিধে হলো এই যে ব্যাঙ্কে বাবার সঞ্চিত শো'চারেক টাকা ছাড়া সংসারে আমার বলতে আর কিছু রইলো না।—ভাবলুম, যা হোক একটা কাজকর্ম্ম জুটিয়ে খাওয়া থাকার ব্যবস্থাটা করে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। বাবা, ইউ, পি, গবর্ণমেণ্টে কর্ম্ম করতেন, প্রথমেই গেলুম সেখানে যদি একটা কিছু হয়। সেক্রেটারিয়েটে একটা কর্ম্ম খালিও ছিল, কিন্তু শুনলুম মুসলমান এখানে মাইনোরিটি জাতি, কাজেই পোষ্টটা তাদের জন্য রিজার্ভ করা আছে।—ফিরে এলুম আমার জন্মভূমি বাংলার রাজধানী এই কলকাতায়, এখানেও একটা ডিপার্টমেণ্টে দু'টো পদ খালি ছিল, দরখাস্ত পেশ করা গেল, যথা সময়ে খবর এলো মুসলমান এখানে

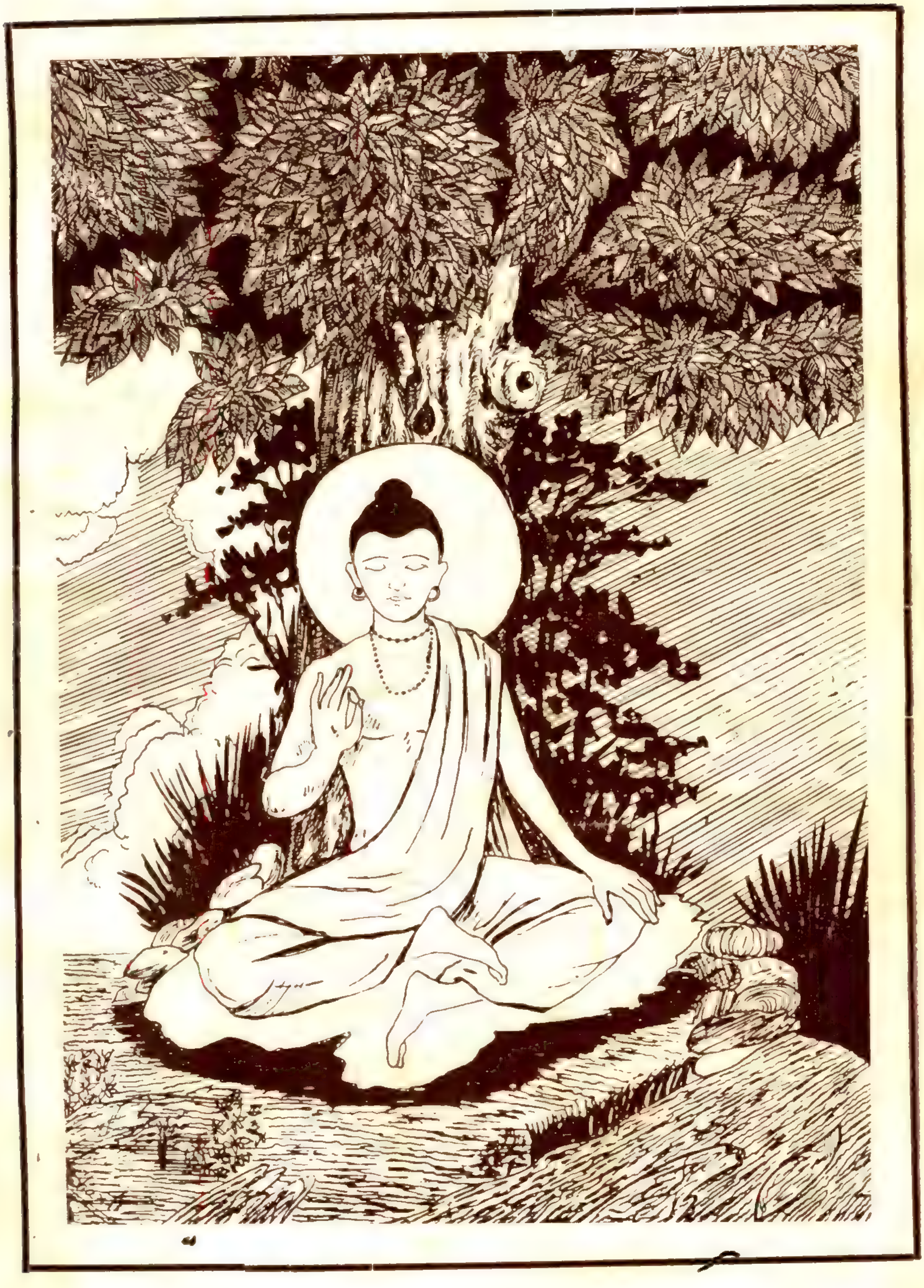

বিচিত্রা
বৈশাখ, ১৩৪১

তথাগত

শিল্পী—শ্রীমতী শান্তি ঘোষাল

ম্যাজোরিটি জাতি কাজেই তাদের দাবী অগ্রগণ্য, একটা পোষ্ট্ তাদের জন্য রিজার্ভড্, আর একটা ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর কোন আত্মীয়কে দেওয়া হবে, সুতরাং আমার চান্স্ নেক্স্ট টু নথিং।

সব খরচ খরচ বাদে ব্যাঙ্কে আর শো খানেক টাকা ছিল, তাই তুলে নিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের উপর একখানা ঘর ভাড়া করে একটা চা'য়ের দোকান করলুম। দিনকতক খুব হাই ষ্টাইলে দোকান চল্‌লো, তিন মাস পরে দেনার দায়ে টেবল চেয়ারগুলো পর্য্যন্ত নীলেম হয়ে গেল।

যাকে বলে একেবারে পথে বসা, তাই হলো আমার!

একদিন দিনরাত্রি উপোস থেকে, পরদিন ভোরে ভবানীপুরে মামার শ্বশুর বাড়ী গিয়ে উঠলুম। মামা, মামী নেই, এ অবস্থায় যতটুকু আদর যত্ন পাওয়া উচিত তাই পেলুম। দুপুরে আহারাদির পর একটু গড়িয়ে নিচ্ছি, পাশের ঘরে স্বামী স্ত্রীর বিশ্রম্ভালাপের একটা অংশ কানে এলো—'যে পুরুষ রোজগার করে পেট চালাতে পারে না, তার মরণ ভালো'—

এক বস্ত্রেই ঢুকেছিলুম, আবার এক বস্ত্রেই বেরিয়ে এলুম।

তারপর দু'দিন শুধু কলের জল আর মাঠের হাওয়ার ওপর থেকে এক রাত্রিতে ঐ ইডেন গার্ডেনে এক গাছের তলায় শুয়ে ভাবলুম—যে পুরুষ রোজগার করে পেট চালাতে পারে না, তার মরণ ভালো,—সত্যি কথা, মরণই ভালো, কিন্তু, কি উপায়ে? বিষ খাই, না গঙ্গায় ডুবে মরি?…কিন্তু এভাবে মরণটা নেহাৎ কাপুরুষের মতো হবে না কি?… তার চেয়ে—তার চেয়ে যখন মরবোই তখন—হোমড়া চোমড়া গোছের একজন কাউকে মেরে ফেললেই তো মরণ এসে হাত ধরে কোলে তুলে নেবে, আরো উপরি পাওনা হবে পৌরুষ আর স্বদেশ প্রেমের খ্যাতি।

হাঁ, সেই ভালো, সে-ই ভালো, কিন্তু?…কিন্তু এ যে অনেক হাঙ্গাম,…এ ক্লান্ত শরীরে কোথায় পাবো পিস্তল, কোথায় পাবো কি? আর তা ছাড়া মরণের পারে দাঁড়িয়ে কেন আর নরহত্যা করে পাপের বোঝা বাড়াবো? তার চেয়ে—হাঁ তার চেয়ে, একেবারে গৌরচন্দ্রিকায়ই ক্রিমিন্যাল না সেজে, সিভিল একটা কিছু করলেই তো অন্ততঃ মাস ছয়েকের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, মরতেও হয় না। না-ই নিলুম প্রথমেই একটা এক্স্ট্রিম ষ্টেপ।—মরণ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। এর পর বুঝে সুঝে যা হয় একটা করলেই চলবে।…

সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল, পরদিন বিকেলে কলেজ স্কোয়ারে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলুম। সত্যিই বলবার ক্ষমতা আমার ছিল না, আবেগে নয়, অনাহারে কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠেছিলো। যাহোক বেশীক্ষণ বকতে হলো না। ইংরেজ রাজত্বে পুলিশের অভাব নেই। আধঘণ্টার মধ্যেই সোজা লালবাজার লক্ আপ…পরদিন বিচারে আইন অমান্য অপরাধে নয় মাসের কারাদণ্ডাজ্ঞা হয়ে গেল—যাক্ নিশ্চিন্ত,—কে বলে আমার পেট চালাবার যোগ্যতা নেই? এই তো বিনা আয়াসে, মাত্র দু'মিনিট একটু মিথ্যে অভিনয় করে ন'মাসের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে নিলুম! হা: হা: হা:—

'এখন তা হলে কি কচ্চো?'

'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। চাকরি বাকরি আর হবে না, গবর্ণমেণ্ট আগেই নেয় নি, এখনতো qualification বেড়েচে। কর্পোরেশনে একটু আশা ছিল, তাও গবর্ণমেণ্টের নেক্‌নজর আবার ওদিকে পড়েচে। পড়ুক, আমার স্বদেশী বেঁচে থাকলেই হলো'!

'আবার স্বদেশী করবে নাকি'?

'নিশ্চয়ই, তবে এবার সিভিল কি ক্রিমিন্যাল, তা ঠিক করে উঠতে পারি নি। হা: হা: হা:'—

রাত্রে আহারাদি শেষ হয়ে গেলে কাগজ কলম নিয়ে বসে 'অমৃতবাজারে' correspondenae লিখতে—Permit me to draw the attention of our cityfathers, through your renowned paper, to the just grievances of the poor ratepayers, regarding the most deplorable state of the public thoroughfares.

রমেশচন্দ্র রায়

মহামানব রবীন্দ্রনাথের প্রতি

(ত্রিসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে)

তুচ্ছতার বহু ঊর্দ্ধে তুলিয়াছ উত্তুঙ্গ শিখর,
দ্যুলোকের দ্যুতি আসি' পড়েছে ললাটে,
পদতলে বিশ্বরূপী পাদপীঠে দিয়াছ হে ভর,
মানবেরে আলিঙ্গিছ বক্ষের কপাটে।
দৃষ্টি সে সুদূরগামী সুন্দরের অভিসারে ধায়,
অতীন্দ্রিয় ধ্বনি লাগি' অতন্দ্র শ্রবণ ;
করে ধৃত ন্যায়দণ্ড জেগে তুমি, বিভ্রম ছায়ায়
দুঃস্বপ্ন-পীড়িত যবে নিখিল ভুবন ॥
প্রেমিক, মরমী, কবি, বজ্রকণ্ঠ হে বিশ্ব প্রহরী,
ধরণী যে ধন্য আজি এ ধ্যান-মূর্ত্তিরে
ধারণায় ধরি' ॥

প্রকৃতির বক্ষোলীন আলিঙ্গনে ছিলে অঙ্গহীন,
কায়া দিল মানবের আকাঙ্ক্ষা মিলিত ;
মনুজের মনোরঙ্গে তাই তব সঙ্গ ক্লান্তিহীন,
প্রকৃতি-রহস্যভরা অন্যদিকে চিত।
মানুষ-পূজারী কবি, যেই কণ্ঠে মানুষের ভীড়
সরিৎ সাগর সেথা মিলাইছে সুর,
নরনারী-মিলন-লীলায় পড়ে ছায়া বনানীর,
বাজে তাহে কোথাকার অরূপ নূপুর ॥
মাটী নীর সাথে নরে কোন্ যন্ত্রে মিলালে হে কবি,
মূক মুখরের মর্ম্মবাণী মিলনের
দেখাইলে ছবি ॥

তরুলতা পশুপাখী নরনারী নদী গিরি বন—
দৃশ্যমান ধরা—তোমা পারেনি বাঁধিতে,
পলাতকা প্রিয়া কোথা খুঁজে ফির, ধরণী-গুণ্ঠন
তুলি' ধরি' অধরারে চাহিছ ধরিতে।
কবিতা কল্পনা-লতা, প্রাণলক্ষ্মী কভুবা মানসী—
খুঁজিলে নায়ক বেশে সঙ্গিনী লীলার ;
চিরন্তনী নারীরূপে পুনঃ প্রিয় প্রাণ-পূর্ণ শশী
খুঁজিলে মথিয়া কভু হিয়ার আঁধার :—
অধ্যাত্ম-রাজ্যের একি অপরূপ যৌন-বিনিময়
দেখাইলে বহুমুখ জীবনে তোমার
অজর অক্ষয় ॥

কীর্ত্তি তব অভ্রভেদী দেশকাল সীমা-পরাজয়ী,
ক্রমায়ত বৃত্তে তুমি উড্ডীন আকাশে,
ধ্রুব কেন্দ্রবিন্দু 'পরে চিত্ত তব স্থির অসংশয়ী,
সুতীক্ষ্ণ শায়ক সম সত্যের সকাশে।
নরে নরে ঐক্যভিত্তি চিরন্তন তোমার চিন্তায়,
আত্মা চির বন্ধ-মুক্ত লঙ্ঘি প্রথা-সীমা ;
সংযম-শৃঙ্খল শুচি পরাইলে সৌন্দর্য্যের পায়,
কর্ত্তব্যেরে প্রদানিলে আনন্দ-মহিমা ॥
বিশ্বেতিহাসের ওহে পূর্ণতম মানব মহান,
সত্য শিব সুন্দরের স্বপ্ন আজ তব
ধরণীর ধ্যান ॥

কিন্তু তব কীর্ত্তি চেয়ে তুমি ওহে বহুগুণে বড়,
নিজ কীর্ত্তি-গুটিকায় পড়নি আটক,
তব স্রোতোগতি পথে মাঝে মাঝে কর্ম্মাবর্ত্তে পড়,
তখনি উত্তরি চল প্রথার ফাটক।
ওহে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম, তোমার উড়ার বেগে
পাথরে পাথরে হলো পক্ষের উচ্ছেদ ;
ভাস্বর জ্যোতিষ্ক, ওহে স্পর্শমণি, তব স্পর্শ লেগে
অঙ্গার হীরক, লৌহ স্বর্ণ সে অক্লেদ ॥
মুখে ভাষা দিয়ে তুমি, প্রাণে দিলে খাদ্য জল বায়ু,
বুকে আত্ম-পরিচয়, প্রিয়তম, তব
ইচ্ছি অমিতায়ু ॥

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

দোকানি

শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস

সে ছিল দোকানি। ছোট্ট ডোঙা নৌকায় ক'রে চল্‌ত তা'র বিপণি—হাট থেকে হাটে—গ্রাম থেকে গ্রামে।

বাংলার শ্যামলিমা তা'কে দিয়েছিল উৎসাহ—নীল গগনের সোনালী রৌদ্র দিয়েছিল শক্তি। দূরের গাছ থেকে ভেসে আসা পাখীর গান তা'র মনে ঢেলে দিয়েছিল মাধুর্য্য তা'র এই বয়সে। দুনিয়ার সব কিছুই যেন সুন্দরের বেশ ধরে তা'র কাছে এসে দেখা দেয়।

পল্লীবধূরা কেনে—আর্শি, চিরুণি, শাঁখা, কেউবা কেনে রেশমী চুড়ি। শিশুরা কেনে খেল্‌না—বাঁশী, বল রেলগাড়ী, রবারের পুতুল।

এম্‌নি ভাবেই তা'র দিন কাটে নানারকম বৈচিত্র্যের মাঝ দিয়ে।...

...সকল শিশুই কিন্‌লো দোকানীর জিনিষ, বাদে একটি শিশু। সে খালি একটা রবারের পুতুল নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌ল। পুতুলটাকে টিপ্‌লে বেশ বেজে ওঠে বাঁশীর সুরে।

তা'র মা দেখ্‌ছিল তাকিয়ে—দূর থেকে দাঁড়িয়ে,—বড় করুণ তা'র চোখের ভাষা।

শিশুটী মনের দুঃখে পুতুলটা রেখে দিয়ে চলে গেল তার' মায়ের কোলে।

—মা, পুতুলটা কেমন সুন্দর বাজে? না, মা?—মা তা'র সন্তানকে বুকে চেপে ধরল, তা'রপর তা'র চোখ মুছ্‌ল কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে।

পাশেই অন্য শিশুরা খেলছিল—তা'দের নতুন-কেনা খেল্‌না নিয়ে, মনের আনন্দে।

দোকানি আর পারল না থাক্‌তে। সেই পছন্দ-করা পুতুলটা নিয়ে সে গেল শিশুর কাছে, তা'র মায়ের কাছে।

—খুকুমণি, পুতুলটা তুমি নিলে না?

—না, আমার পয়সা নেই; আমি নেব না।

দোকানি বল্‌ল—না, তোমার পয়সা লাগ্‌বে না, এ যে তোমারই পুতুল।

খুকুমণি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে তা'র মায়ের দিকে—আদেশের প্রতীক্ষায়।

সলজ্জভাবে মা আপত্তি জানায়—অম্‌নি দিলে আপনার লোকসান হবে যে। আপনি দেবেন না।

লোকসান হ'বে না মা। ছেলেদের আনন্দেই আমার দোকানের লাভ।

...খুকুমণির মুখ আনন্দে মুখর হয়। পুতুল বেজে ওঠে বাঁশীর সুরে।

করজোড়ে দোকানী ভিক্ষা চায় মায়ের কাছে—মা, আজ আমায় আশীর্ব্বাদ করো, আমার খেল্‌না যেন সকল শিশুর হাতেই আমি দিতে পারি। তা' হ'লেই আমার দোকান হ'বে সার্থক—ধন্য হবে আমার জীবন। তুমি এই আশীর্ব্বাদ করো মা।

পল্লীবধূর চোখ দুটী ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌ল—নীরব ভাষাতেই সে তা'র কৃতজ্ঞতা জানায়।

আবার দোকানি তা'র ডোঙা নৌকা খুল্‌ল গ্রামান্তরের উদ্দেশে।

পল্লীবধূ চেয়ে থাকে সেই দিকে নির্নিমেষ নয়নে,—যতক্ষণ না দূরে নদীর মাঝে দোকানির ডোঙা মিলিয়ে যায়।

দোকানির মনে আজ বিপুল আনন্দ।

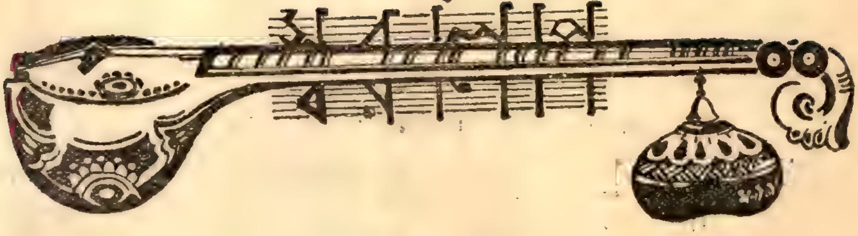

বিভাস—একতালা

জাগিয়ে গোপাল লাল পঞ্ছীবন বোলে।
চন্দ্র কিরণ শীতল ভই, চকই পিয় মিলন গই,
ত্রিবিধ মন্দ চলত পবন পল্লব দ্রুম ডোলে।
প্রাত ভানু প্রকট ভয়ো রজনীকো তিমির গয়ো
ভৃঙ্গ করত গুঞ্জ গান কমলন দল খোলে।

ব্রহ্মাদিক ধরত ধ্যান সুর নর মুনি করত গান
জাগন কী বের ভই নয়ন পলক খোলে।
তুলসীদাস অতি আনন্দ নিরখি কে মুখারবিন্দ
দীনন কো দেত দান ভূষণ বহুমোলে।

কথা—তুলসীদাস

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ
(সঙ্গীত রত্নাকর

আস্থায়ী—

২´				৩				০				১		
সা	-া	রা	।	গা	-া	গা	।	পা	-া	পা	।	না	-ধা	ধা
জা	•	গি		য়ে	•	গো		পা	•	ল		লা	•	ল
পা	গা	গপা	।	ধনা	ধা	পা	।	গপা	রা	গা	।	রসা	সা	-া
প	•	ছী•		••	ব	ন		বো•	•	•		লে•	•	•
সা	-সন্া	ধ্া	।	সন্া	রা	সা	।	সা	রা	গা	।	গরা	সা	-া
চ	••	ন্দ্র		কি•	র	ণ		শী	ত	ল		ভ•	ই	•
সা	রা	গা	।	-পা	পা	পা	।	পা	ধা	ধা	।	পনা	ধা	-া
চ	ক	ই		•	পি	য়		মি	ল	ন		গ•	ই	•
র্সা	র্সা	র্সা	।	র্সনা	র্রা	র্সা	।	র্সা	না	ধা	।	না	ধা	পা
ত্রি	বি	ধ		ম•	•	ন্দ		চ	ল	ত		প	ব	ন
গা	পা	ধা	।	র্সা	ধা	পা	।	গপা	ধনা	র্সনা	।	ধপা	গরা	সন্া
প	•	ল্ল		ব	দ্রু	ম		ডো•	••	••		লে•	••	••

অন্তরা—

২´ ৩ ০ ১
পা গা গা । পা ধপা ধা । র্সা র্সা র্সা । র্সর্রা র্সা -া I
(১) প্রা • ত ভা •• সু প্র ক ট ভ• য়ো •
(২) ব্র • হ্মা দি •• ক থ র ত ধ্যা• • ন
(৩) তু ল সী দা •• স অ তি আ ন• • ন্দ

র্সা র্রা র্সর্রা । র্গা র্রর্সা র্সা । র্রা র্সা নধা । না ধপা -া I
(১) র জ নী• • কো• • তি মি র• গ য়ো• •
(২) সু র ন• র মু• নি ক র ত• গা •• ন
(৩) নি র খি• • কে• • মু খা র• বি •• ন্দ

পা ধপা ধা । ধা র্রা র্সা । র্সা না ধা । না ধা পা I
(১) ভূ •• ঙ্গ ক র ত গু • ঞ্জ গা • ন
(২) জা •• গ ন • কী বে • র ভ ই •
(৩) দী •• ন ন কো • দে • ত দা • ন

গা পা ধা । র্সা ধা পা । গপা ধনা র্সনা । ধপা গরা সন্‌া I
(১) ক ম ল ন দ ল খো •• •• লে• •• ••
(২) ন য় ন প ল ক খো •• •• লে• •• ••
(৩) ভু • ব ৭ ব হ মো •• •• লে •• ••

তান—

২´ ৩ ০ ১
সরা গপা ধনা । পধা র্সর্রা র্গর্রা । র্সর্রা র্সনা ধপা । ধপা গরা সন্‌া I
আ• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

২´ ৩ ০ ১
র্গর্রা র্সর্রা র্সনা । র্সনা ধনা ধপা । গপা ধনা র্সনা । ধপা গরা সন্‌া I
আ• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

ইমন্-পূরিয়া মিশ্র—দাদ্‌রা

আজি আমারি কথা
ওগো বিমনা স৺াঝে
তব স্মরণ-বীণে
যেন বারেক বাজে।
যদি আঙিনা-তলে
তব দীপালি জ্বলে,
জ্বেলো একটি বাতি
মোরে স্মরিয়া লাজে।

মৃদু নিশীথ-বায়ে
তব শেফালি-বনে
ভুলে গোলাপ যদি
জাগে আপন মনে।
ঢালি' নয়ন-বারি
জ্বালা জুড়ায়ো তারি
ডাকি' আমারি নামে
প'রো অলক-মাঝে।

কথা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য স্বরলিপি—শ্রীজগৎ ঘটক সুর—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

সুরসাগর

\+ ২ ||
গরা গা II সা -া ন্সা । -ধ্ন্া রা রগা I সা -া -া । -া সা সগা
আ৹ জি আ ৹ মা৹ ৹৹ রি ক থা ৹ ৹ ৹ ও গো৹

I গাঃ -মঃ রগমা । -রগপা পা পধা I পমা -া -া । -া গা মগা
বি ৹ ম৹৹ ৹৹৹ না স৺া৹ ঝে৹ ৹ ৹ ৹ ত ব৹

I গরা -া রা । -া ধ্া ন্া I ধ্ন্া -সা -া । -া ন্া ধ্ন্া
স্ম ৹ র ৹ ণ বী ণে৹ ৹ ৹ ৹ যে ন৹

I ধপা -া পপা । -া -মা মপা I গমা -গমা -গরা । -সা গরা গা
বা ৹ রে৹ ৹ ক বা জে৹ ৹৹ ৹৹ ৹ আ৹ জি

\+ ২
{ সা সা II মপা -া মপা । -া পন্ধা ধা I পা -া -া । -া পন্ধা পা
য দি আ ৹ ঙি ৹ না ত লে ৹ ৹ ৹ ত৹ ব

I গমা -গনধা পন্ধা । -ধপা ন্ধগা গমা I গা -া -া । -া } { গা গমা
দী৹ ৹৹৹ পা৹ ৹৹ লি৹ জ্ব লে ৹ ৹ ৹ জ্বে লো৹

I মগা -রা -গা । রা -ধ্া ন্া I ধন্া -সা -া । -া } ন্া ধন্া I
এ· · ক্ টি · বা তি· · · · মো রে·

I ধপ্া -া প্পা । -া -মা মপা I গমা -গমা -গরা । -সা গরা গা II
স্ব · রি· · · স্না না রে· ·· ·· · আ· জি

{ সন্া সা II ন্া -া -ন্া । -া ধ্া ন্া I ধস্না -ধ্া -ধগ্া । -া ধস্না ধ্া I
মু· ছ নি · ষী · শ বা রে · · · ত ব

I ন্া -া ন্া । -া সা ঋা I সঋা -ন্সা -া । -া সা সগা I
শে · ফা · লি ব নে· ·· · · ভু লে·

I গা -া ঋগা । -পঋপা গা মা I গা -া -ঋা । -া ঋা ঋা I
গো · লা ·· প থ দি · · · জা গে

I ঋা -সা সা । -া ঋা ন্া I সা -া -া । -া } { সা সা I
আ · প · ন ম নে · · · ঢা লি

[পঋা —ঋপা]

I মপা -া ঋপা । -া পঋা ধা I পা -া -া । -া পঋা পা I
ন · য় · ন বা রি · · · আ· লা

I গমা -গনধা পঋা । -ধপা ঋগা গমা I গা -া -া । -া } { গা গমা I
ভু· ··· ডা· ·· ·· তা রি · · · ডা কি·

I মগা -রগা রা । -া ধ্া ন্া I ধন্া -সা -া । -া } ন্া ধন্া I
আ· ·· মা · রি না মে· · · · প' রো

I ধপ্া -া প্পা । -া মা মপা I গমা -গমা -গরা । -সা -গরা গা II II
অ · লং · ক মা রে· ·· ·· · আ· জি

এই গানখানি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত মতিলাল "হিন্দুস্থানে" রেকর্ড করিয়াছেন। গানটি গাহিবার সময় গায়কেরা নিজ নিজ স্কেলের মকে "সা" করিয়া লইয়া গাহিবেন।

—স্বরলিপিকার।

ভূমিকম্পে উত্তর বিহার

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মজঃফরপুরে ফিরিয়া দেখিলাম সহরের চারিদিকে ধূলিসাৎ দালানের ধ্বংসস্তূপ। সহরটি শোকে ও আতঙ্কে মুহ্যমান ও নীরব। এই শ্মশানদৃশ্য দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যেন পাতালের কোন্ দৈত্যপুরীর দানব প্রচণ্ড শক্তিতে পাকা সহরের ভিৎ নাড়া দিয়া বহু শতাব্দীর গড়া জিনিষকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে। সুদীর্ঘ ও গভীর ফাটল কম্পনরেখার পথ ধরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সহরটিকে চিরিয়া চিরিয়া খাঁক করিয়া দিয়াছে। মালমশলা দিয়া মানুষ ইঁটের পর ইঁট সাজাইয়া লোহাকাঠপাথরের কঠিন বন্ধনে যে হর্ম্ম্য রচনা করিয়াছিল ভূকম্পের বিষম আলোড়নে তাহা পৃথক পৃথক হইয়া স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। সেই ধূলিসাৎ গৃহসামগ্রীর নীচে প্রোথিত হইল অসংখ্য হতবুদ্ধি নাগরিক। গোটা লাল ইঁটগুলি স্তূপীকৃত পড়িয়া আছে, কড়িবড়গাগুলি গা ঝাড়া দিয়া পৃথকভাবে পড়িয়া আছে। এগুলি যে কখনো একত্র মালমশলার দ্বারা দালানের সহিত সংযুক্ত ছিল তাহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। জানালা কপাট চৌকাঠ খসিয়া নানা ভাবে পড়িয়া আছে ও দালানের বীভৎসতার বৃদ্ধি করিতেছে। খোলার বাড়ীও রক্ষা পায় নাই।

ধ্বংসরাশির উপর দিয়া কোনো রকমে পথ করিয়া সহর পরিদর্শন

দ্বারভাঙ্গা মহারাজার নওগাঁ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—দ্বারভাঙ্গা

দ্বারভাঙ্গা মহারাজাধিরাজের ভগ্ন প্রাসাদ—মজঃফরপুর

করিলাম। সর্ব্বত্র ভগ্ন-বস্তুর স্তূপ। পথঘাট বাড়ীঘর বাজার চেনা যায় না। গৃহগুলি ধূলিসাৎ নতুবা বিদীর্ণ। অসংখ্য ফাটল হইয়াছে, বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং প্রাণহানি ঘটিয়াছে। এখানে কোথাও জমি প্রায় ১০।১৫ ফুট নীচে ধ্বসিয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে ভূমির সমতার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং বর্ষায় এখানে গণ্ডক নদীর জলের প্লাবন হইতে পারে আশঙ্কা হইতেছে। আরো সহরের অন্যান্য অঞ্চলে ধ্বংস ব্যাপার কম নয়। সিকান্দ্রাপুর গণ্ডকের তীরবর্ত্তী। এখানে পোলো ও টেনিসের ও বেড়াইবার বিশাল মাঠ। ভূমিকম্পে ইহা ভীষণভাবে ফাটিয়া ধ্বসিয়া গিয়াছে। অতি গভীর ও দীর্ঘ ফাটলে মাঠটি পূর্ণ হইয়াছে। এক এক জায়গায় এক মানুষ সমান ফাটল, ভূখণ্ড নীচের স্তরে নামিয়াছে। বর্ষাকালে এই মাঠটি নদীর কবলে যাইবে আশঙ্কা হয়।

পুরাণী বাজারে সঙ্কীর্ণ গলির ধ্বংস-দৃশ্য—মজঃফরপুর। এই মহাল্লাটির পুনর্গঠন বহুব্যয়সাধ্য ও প্রায় অসম্ভব

বহু জায়গায় বড় বড় ফাটল অতর্কিত পথিকের ভীতি উৎপাদন করে। পুরাণী বাজারে বহুলোক মরিয়াছে। এখানে বহু সঙ্কীর্ণ গলিতে সারি সারি দোকানপাট ও বাসগৃহ ছিল। ভূমিকম্পে এই অঞ্চলটি বিষম বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং ইহার পুনর্গঠন একবারে অসম্ভব ও বহু ব্যয়সাধ্য। এখানকার বাস্তু ভিটার মোহ ত্যাগ করিয়া লোকেদের সহরের অন্য কোনো জায়গায় আবাস গড়িয়া তুলিতে হইবে। কল্যাণী বাজার একটি ব্যবসার কেন্দ্র। এখানে প্রধানতঃ বাঙ্গালীদের ঔষধ সাইকেল প্রভৃতির দোকান, এবং বোসেদের নানা ব্যবসায়। ভূমিকম্পে এই অঞ্চলও আংশিক বিনষ্ট হইয়াছে। চান্দওয়ারা আরেকটি জনপূর্ণ অঞ্চল। এখানে

উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ও মতিলাল সেন মহাশয়ের ধূলিসাৎ গৃহ। ভূমিকম্পে প্রবাসী বাঙালীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে—মজঃফরপুর

ভূমিকম্পের দিন আমি মজঃফরপুরে উপস্থিত ছিলাম না,

পরে ঐ ভীষণ দিনের বিবরণ শুনিয়াছি। এই সহরে লোক-সংখ্যা খুব বেশী এবং আন্দোলনের তীব্রতাও বিশেষ অনুভূত হয়। ২-১৬ মিনিটে আফিস-কাছারী-স্কুল, কলেজের সময়

"ক্ষুধিত পাষাণ"—ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ভায়ার বাসাবাটী, ইহাতে উপেনবাবু তাঁহার কন্যা ও দৌহিত্রীর মৃত্যু হয়—মজঃফরপুর

ছিল, কাজেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী ও শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা বেশী। নানাস্থানে ধ্বংসস্তূপের ফাঁদে পড়িয়া বহু লোকের মৃত্যু বা জীবন্ত সমাধি হইয়াছে, অথবা সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে। ভূমিকম্পের সময়ে উপর-নীচ আন্দোলন হয় তাহার পর এপাশ ওপাশ এবং পরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। এই to and fro এবং twisting আলোড়নে মানুষকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে। তাছাড়া অনেকে নিরাপদ স্থান হইতে পুনর্ব্বার আপনার জনকে বাঁচাইতে দোলায়মান গৃহে ছুটিয়া তাহার নীচে প্রাণ হারাইয়াছে।

একটি বাঙালী অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারের পরিবারে ১১টি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নিজে ভগ্নস্তূপের নীচে প্রোথিত হন। কিন্তু তখনও ফাঁকের মধ্য দিয়া কথা বলিতে সক্ষম হন। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা চলিতে থাকে, সে সময়ে তিনি সহায়কদের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। স্তূপ অপসারণ করিতে করিতে যখন সহায়কেরা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল তখন নাড়াচাড়িতে যেটুকু ফাঁক ছিল তাহা বন্ধ হইল। শেষ হতাশার বাক্য শোনা গেল "তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারলে না" আধঘণ্টা পরে যখন তাঁহাকে উদ্ধার করা গেল তখন তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে।

এভাবে জীবন্ত সমাধি অবস্থায় ৫।৬ দিন থাকিয়া অনেকে তিলে তিলে মরিয়াছেন এমন অনুমান হয়। ৭।৮।১০ দিন পরে জীবন্ত মানুষকে উদ্ধার করা হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই ভগ্ন পাষাণপুরী ভেদ করিয়া সেই আর্ত্তস্বর পাষাণেই মিলাইয়া গেছে, মানুষের কানে পৌঁছায় নাই।

মজঃফরপুর সারাইয়াগঞ্জ বাজার

আলোবাতাস জলের অভাবে পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপের নীচে মানুষের অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু হইয়াছে।

আহতদের কথা কি বলিব? কাহারো পাঁজর ভাঙ্গিয়াছে, কাহারো মাথা ফাটিয়া বড় বড় ক্ষত হইয়াছে, কেহ

পঙ্গু হইয়াছে। শীতকালে এই ঘটনা হওয়াতে ক্ষতগুলি অতি সত্বর আরাম হইতে থাকে। গ্রীষ্মকাল হইলে

মজঃফরপুর বাজার—ভূমিকম্পের পর

আহতদের যে দুর্দ্দশা হইত এবং মহামারির ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইত তাহা নিঃসন্দেহ।

বিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবী আমাদের মজঃফরপুরের বাসিন্দা। তাঁহার স্বামী শেখর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ওকালতী করেন। তাঁহাদের আদরের পৌত্রীটি (অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা) ঠাকুরমার কাছেই থাকিত। তিনি এই নাতনীটিকে আপনার আদর্শ অনুসারে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। ভূমিকম্পে ভগ্নস্তূপের নিষ্পেশনে বালিকাটির শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে। অনুরূপা দেবীও ভীষণভাবে আহত হন। তাহার বুকের কয়েকটি পাঁজর ভাঙিয়া যায় এবং তিনি মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পান। মজঃফরপুরে ডাক্তার বলাই রায় চৌধুরীর অক্লান্ত চিকিৎসায় তিনি প্রাণে বাঁচিয়াছেন। তিনি এখন কলিকাতায় আছেন এবং আরোগ্যলাভের পথে সত্বর অগ্রসর হইতেছেন। ডাক্তার বলাই বাবু নিঃস্বার্থভাবে বহু আহতকে অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়াছেন, একথা এখানে উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকম্পে যে সকল পরিবারের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ে আমার প্রতিবেশী ও বন্ধু ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভায়ার কথা। ইনি বাঙালী বৈদ্য, রাজসাহীতে ইঁহার ভাই সুরেন বাবু সরকারী উকীল। উপেনবাবু স্ত্রী ও দুই কন্যা লইয়া দালানের বাহিরে আসেন, তখন মনে পড়িল ছোট তিনমাসের নাতনীটির কথা, সে উপরতলায় ছিল। তিনি অমনি ছুটিলেন সেই বিপদের মুখে তাকে বাঁচাইতে। পিছন পিছন ছুটিল শিশুটির মা, এবং তাহার পশ্চাতে শিশুর এক বোন। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। নির্ম্মম ভগ্ন স্তূপে অদৃশ্য হইলেন—পিতা, কন্যা ও একটি শিশু। ডাঃ ভায়াকে তখনই স্তূপ সরাইয়া

খ্যাতনামা লেখিকা অনুরূপা দেবীর আবাসগৃহ—মজঃফরপুর। এই গৃহে তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হন এবং তাঁহার পৌত্রী অম্বুজ বাবুর ১২ বৎসরের কন্যার অতি শোকাবহ মৃত্যু হয়

বাহির করা হয় কিন্তু অল্প পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার কোলে পাওয়া গেল সেই তিন মাসের শিশুটি জীবিত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর বাড়ীর উঠান—
এইখানেই তিনি ও তাঁহার পৌত্রী অরুণা চাপা পড়িয়াছিলেন

অবস্থায়। এই প্রাণের কণিকাটিকে বাঁচাইতে তিনটি প্রাণ নিঃস্বার্থভাবে মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দিল। ডাক্তার ভায়া অতি সজ্জন ও লোকপ্রিয় ছিলেন। এই মৃত্যুতে সহরের সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী সাংঘাতিক ভাবে আহত হন এবং এখনও শুশ্রূষাধীন।

এমন সাহসিকতার দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়। ডাক্তার অবিনাশ সেনের পরিবারে তাঁহার দুইটি বিবাহিতা কন্যা এবং মাতৃবক্ষের দুটি শিশু ধ্বংসস্তূপের নীচে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যখন মহিলা দুটীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হইল তখন দেখা গেল তাঁহারা বক্ষের আশ্রয়ে শিশুদের চাপিয়া ধরিয়া নিজেরা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। পিঠের উপর ভাঙ্গা দালানের দুঃসহ ভার পড়িয়া তাঁহাদের দলিত করিয়াছে, স্নেহপরায়ণ মাতা সেই ধ্বংসলীলায় আপনাদের ভুলিয়া শিশুদের আগলাইয়া পড়িয়া আছেন।

রবীন্দ্রনাথের "সিন্ধুতরঙ্গ"—পুরীতীর্থযাত্রী তরণীতে আটশত প্রাণীর নিমজ্জন উপলক্ষ্যে লিখিত। এই কবিতাটির কয়েক ছত্র উপরের ঘটনা দুটীর সহিত মেলে, তাই উদ্ধৃত করিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না—

"প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথা-ভরা স্নেহময়
মানবের মন?

* * * *

ওই যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষপরে সন্তান আপন?
মরণের মুখে ধায়, সেথাও দিবেনা তায়
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন!

* * * *

জড় দৈত্য শক্তি জানে, মিনতি নাহিক মানে
প্রেম এসে কোলে টানে দূর করে ভয়।"

নবনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহের দশা—ইহার মালিক বাঙালী—মজঃফরপুর

ভূমিকম্পে প্রবাসী বাঙালীদের যে দুর্দ্দশা ও ক্ষতি হইয়াছে তা স্বচক্ষে না দেখিলে অনুমান করা যায় না। মজঃফরপুর সহরের কথাই ধরুন। এখানে বহু বাঙালী

উকীল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ও কয়েকটি জমিদারের বাস। যখন বাঙলা-বিহার প্রদেশ এক ছিল, বিহারের সেই শৈশব:

দেওয়ানী আদালত ধ্বংসীভূত—মজঃফরপুর

কাল হইতে অনেক মনীষী বাঙালী নানা কর্ম্মসূত্রে, বিশেষ আইন ব্যবসায়ে, এখানে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহারা এখানকার বহু কল্যাণকর্ম্মে শক্তি নিয়োগ করেন। সেই সকল পুরগামী বাঙালীরা উত্তর বিহারের প্রতি জিলায় পূর্ণিয়া হইতে ছাপরা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়েন এবং বহুধা কর্ম্মে শক্তি ও অর্থ প্রয়োগ করেন। সেই বাঙালীর বহু পুরাতন অট্টালিকাগুলি এই সহরে তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান কালেও বহু আইনজীবী ও ব্যবসায়ী গৃহসম্পত্তি গড়িয়া তোলেন। ভূমিকম্পে বাঙালীদের গড়া সেই সকল বহু সুবৃহৎ গৃহ ভাঙিয়া গিয়াছে এবং এই সকল পরিবারের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। আশ্রয়-সম্বলহীন প্রবাসী বাঙালীদের অন্য কোনো সংস্থানও নাই। এই বাস্তুভিটাতেই পুনর্গঠন কার্য্য সম্পন্ন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে।

সহরের বিপন্ন বাঙালীদের সংখ্যা কম নয় এবং ধূলিসাৎ গৃহ ও ক্ষতির পরিমাণও বিপুল। সমগ্র সহরটীর তুলনায় বাঙালীদের এই গৃহ-সম্পত্তির ক্ষতি অগ্রাহ্য নয়।

দ্বারভাঙ্গাতেও অনেক বাঙালী উকীলের বাসগৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখানেও অনেক বাঙালী অগ্রণী হইয়া বিহারের শৈশব হইতে আজীবন এই প্রদেশের কল্যাণকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। লাহেরিয়া সরাইতে বহু বাঙালীর দ্বিতল গৃহ ভগ্ন হইয়াছে।

বহুযত্নে সঞ্চিত অর্থে নির্ম্মিত এ সকল গৃহ বিনষ্ট হওয়াতে মধ্যবিত্ত লোকেদের অতিশয় দুর্দ্দশা হইয়াছে। এই কথা বিহারের লাটসাহেবের ২রা ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতেও আছে। তিনি বলেন যে সহরে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ব্যবসায়িগণ এবং পেশাদার ব্যক্তিরা। ধনী ব্যক্তিদের কিছু মজুত টাকা আছে, বিপদের দিনে তাহা সম্বল হইবে। মজুর ও কারিগর শ্রেণীর লোকদেরও কাজ জুটিবে, ভাবনা

মজঃফরপুর পুরাণী বাজার—দোকান-পাটের ভগ্নস্তূপ, বিজলী তারের লোহদণ্ড আনমিত, হতবুদ্ধি লোক দণ্ডায়মান

নাই; কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকেদের সব চেয়ে বেশী দুর্দ্দশা। তাঁহাদের গৃহ পুনর্গঠন করিতে এবং নূতন ব্যবসায় বা পেশা সুরু করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থসাহায্য বা ঋণ না পাইলে ইঁহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না।

গণেশজী ভগ্নস্তূপের মধ্যে বিরাজমান—পার্শ্বে মাটীর খেলনা ভগ্নাবস্থায়—মজঃফরপুর

গঙ্গার উত্তরতীরবর্ত্তী পাঁচটী জিলা লইয়া উত্তর বিহার, অর্থাৎ পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, চাম্পারাণ ও সারণ। এতদ্ভিন্ন উত্তর ভাগলপুরের দুটি সবডিভিসন এবং উত্তর মুঙ্গের এই সীমার মধ্যে পড়ে। উত্তর বিহারকে Cream of Bihar বলা হয়, এই অঞ্চলটি বিহারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শস্যশালী ও সমৃদ্ধ। ইহার মাটিতে অড়হর, মটর, কলাই, বুট, মকই, সরিষা, ধান, (উত্তর ভাগলপুর ও উত্তর চম্পারণে) প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তাহা বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে চালান হয়। দ্বারভাঙ্গার তামাক ও মরিচ, সীতামাঢ়ির তিসি, উত্তর ভাগলপুরের মকই ও কলাই, পূর্ণিয়ার পাট ভারতে বিখ্যাত। এই সকল শস্যের রপ্তানির সূত্রে বহু ব্যবসাদারের এই অঞ্চলে সমাগম।

মজঃফরপুর পুরাণী বাজার

ভূমিকম্পে উত্তর বিহারে যে চাষের ক্ষতি হইয়াছে তাহা অতি বিরাট এবং ভীষণ। চাষীদের দুঃখনিবারণের জন্য বহু লক্ষ অর্থের প্রয়োজন হইবে। বিহারের লাট-সাহেবের ২রা ফেব্রুয়ারীর বিবরণটিতে প্রকাশ যে জাপান ও নিউজিল্যাণ্ডে যে ইহার সমতুল্য ভূকম্পন হয় তাহাতে শুধু ২০ মাইল পরিধি বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু বর্ত্তমান ভূমিকম্পের প্রসার মতিহারী হইতে মুঙ্গের পর্য্যন্ত ১৩৫ মাইল। লাটসাহেব বলেন যে কৃষি বিভাগ ভূপরিদর্শনের ফলে অনুমান করেন যে মজঃফরপুর জিলায় প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল জমি এবং দ্বারভাঙ্গা জিলার অর্দ্ধেক জমি ভূমিকম্পের বালি ও জলে বিনষ্ট হইয়াছে।

উত্তর বিহার হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত, ইহাকে গঙ্গানদীর উপত্যকাদেশ বলা যাইতে পারে। উত্তর বিহারে

পরই নেপাল-সীমান্ত, যাহাকে 'তেরাই' বলা হয়। এই নদীবিধৌত হিমালয় সন্নিহিত দেশটির মাটি বিশেষ উর্ব্বর। ইহার ভূনিম্নদিলের স্তর (Subsoil water level) উঁচুতে থাকার দরুণ এই মাটি ইক্ষু চাষের বিশেষ অনুকূল। টাকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া ভারতের চিনির সংরক্ষণের জন্য Sugar Industry Protection Act 1932. এই আইন পাশ করেন। তাহাতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় চিনির সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে। প্রথম

মজঃফরপুর—একটি বনেদী জমিদারের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ (পরমেশ্বর নারায়ণ মাহতার গৃহ)

মজঃফরপুর কল্যাণীর রাস্তা

পূর্ব্বে এখানে কয়েকটি মাত্র চিনিকল ছিল। তাছাড়া Open Pan System-এ কিছু চিনি প্রস্তুত হইত। জাভার চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় এতদিন এই ব্যবসায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। কিন্তু ভারতসরকার প্রায় আটকোটি আট বছরে বিদেশী চিনির উপর ৭।০ প্রতি হন্দর শুল্ক বসিল। ইহার পর ১৷৵০ সারচার্জ্জ বসিয়া প্রতি হন্দর ৯৴০ শুল্ক বসিল। তাহাতে বিদেশী চিনির আমদানী কমিল, সরকারী শুল্ক দশ হইতে দুই কোটিতে দাঁড়াইল

কিন্তু ভারতের চিনির কারবারের প্রসারের পথ সুগম হইল এবং জাভার চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চিনি দাঁড়াইতে সক্ষম হইল। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসরের ভারাক্রান্ত হয়। ১৯৩২ সালের আইন পাশ হইলে বহু চাষী অন্য আবাদ ছাড়িয়া আকের চাষ ব্যাপকভাবে আরম্ভ করিয়াছে। এই ইক্ষুচাষে ইহাদের দুঃখের অবসান হইয়াছে। গত বছর এই আইন প্রচলনের পর চিনির কারখানাগুলির যথেষ্ট মুনাফা হয়। অধুনা চিনির কলের সংখ্যা অতিরিক্ত বাড়িতেছিল, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী অর্থসচিবের বাজেটের বক্তৃতায় তাহার ইঙ্গিত আছে। এই আশঙ্কায় ১।/০ বিদেশী চিনির সারচার্জ শুল্ক উঠাইয়া আগামী ১৯৩৪-৩৫ সালে তাহা ভারতীয় চিনির উপর excise duty হিসাবে বসানো হইল।

মজঃফরপুর পুরাণী বাজারের দৃশ্য—
একটি দ্বিতল ছাদ হইতে এই ছায়াচিত্র গৃহীত। ভগ্ন দ্বিতল গৃহের সারি।

ভূমিকম্পে উত্তরবিহারে ছয়টি চিনিকল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং দুটী আংশিক বিনষ্ট

মধ্যে এই চার জিলায় বহু চিনির যৌথকারবার দেখা দিয়াছে।

উত্তরবিহারে এখন নিম্নলিখিত সংখ্যার চিনির কল বিদ্যমান। ইহার মধ্যে কোনো কোনো কারখানায় এখনো সম্পূর্ণরূপে কল বসাইয়া কাজ সুরু করে নাই।

জিলা	সংখ্যা
সারণ	১১
চাম্পারাণ	৮
মজঃফরপুর	৩
দ্বারভাঙ্গা	৫
পূর্ণিয়া	১
	২৮

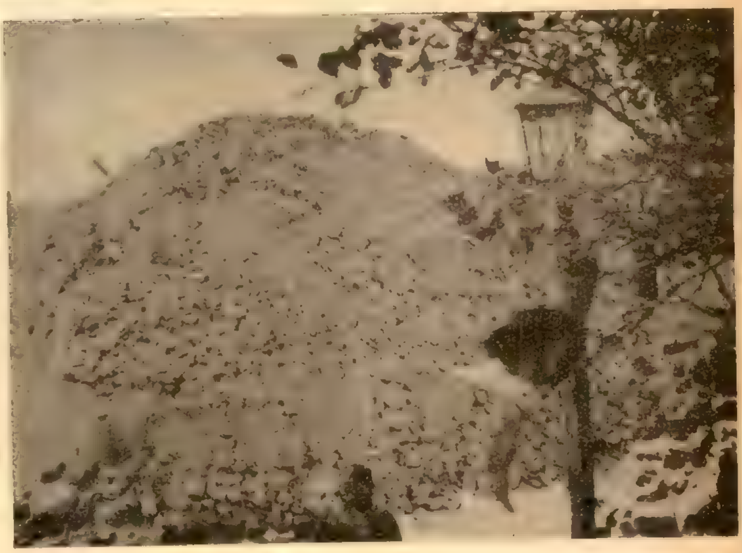

পুরাণী বাজারে ধ্বংস-স্তূপ—মজঃফরপুর

১৯৩১ সাল হইতে উত্তরবিহারে চাষীরা অর্থসঙ্কটের দরুণ শস্যের মূল্য হ্রাস হওয়াতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও ঋণ- হইয়াছে। এই ভীষণ ধ্বংসব্যাপারে ইক্ষুচাষীদের বিষম ক্ষতি হইয়াছে। কারণ ঐসকল কারখানার মালিকদের এবং

আকের ফসলে প্রয়োজন নাই। চিনিকলগুলি নভেম্বর হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে ক্ষেতের আক ক্রমে ক্রমে কারখানায় চালান হয়। কোনো কারণে কল বিগড়াইলে ইক্ষু চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চিনিকলের বিনষ্টির দ্বারা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষের মত ইক্ষুর বিক্রয় সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।

ভগ্ন স্তূপের মধ্যে পথিপার্শ্বে পানের দোকান—মজঃফরপুর

বিহার সরকার ইতিমধ্যে ১০০০টি ছোট বলদ-চালিত 'ক্রশার' এই বিধ্বস্ত অঞ্চলে বিতরণ করিয়াছেন। এই কলে আক মাড়াইয়া আগুনে জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত হইবে এবং এই গুড়ের ক্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উদ্বৃত্ত ইক্ষু যাহাতে চালান করিয়া দূরবর্ত্তী চিনিকলে বিক্রয় করা যায় সেজন্য রেল কোম্পানী মাশুল কমাইতে স্বীকার করিয়াছেন। চাষীদের সমুদয় উদ্বৃত্ত আকের সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা অবিলম্বে না করিলে ক্ষেতের ফসল শীঘ্র নষ্ট হইবে, এখনো বহু 'ক্রশারের' প্রয়োজন আছে। ইহা ছাড়া চাষীদের ইক্ষু যাহাতে কলওয়ালারা সস্তা দরে না কেনে তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতে হইবে। গত বছর চাষীরা ধনী কারখানার মালিকদের কবলে পড়িয়া কোথাও কোথাও নগণ্য মূল্যে আক বেচিয়াছে এমন জনশ্রুতি শুনিয়াছি।

ভূমিকম্পে বহু অঞ্চলে চাষের জমি ভূগর্ভনিঃসৃত বালিতে পূর্ণ হইয়া মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। পল্লীগ্রাম পরিদর্শন করিলে এই দৃশ্য চোখে পড়ে। শস্যশ্যামলা ভূমি ৫।৬ ফুট বালির নীচে অদৃশ্য হইয়াছে; বহু ক্ষেত জলাকীর্ণ হইয়াছে। ভূমির সমতার পরিবর্ত্তন হওয়াতে বর্ষাকালে বহু গ্রাম দুর্গম হইবে এবং নদীর গতি পরিবর্ত্তন হওয়াতে সীতামাঢ়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। জমির এই বালির অপসারণ বহু ব্যয়সাধ্য, হয়তো অনেক ভূখণ্ড ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং

ধ্বংস স্তূপ অপসারণ—
Sapper ও minerগণ দালানের ভগ্নাংশ ফেলিতে ব্যাপৃত—মজঃফরপুর

সেখানকার অধিবাসীদের অন্যত্র গৃহপত্তন করিতে হইবে।

ভূমিকম্পে ভগ্ন ইঙ্কেপ্ সেতু
একটি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এই দুরাবস্থা (সারণ জিলা)

উত্তর বিহার পলিমাটির দেশ, ভূমির সমতার সামান্য পরিবর্ত্তনে নদীর স্রোত ফিরিয়া যায়। উত্তর ভাগলপুরে গত দশ বছর হইতে কোশি নদী (কৌশিকী) যে সাংঘাতিক ধ্বংস সাধন করিতেছে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ধারণা করা যায় না। এই নদীর নিয়ত গতি পরিবর্ত্তনের ফলে বহু জমি বালুতে ও ঝাউকাশের জঙ্গলে পূর্ণ হয়। এখানে অসংখ্য বন্য শূকরের উৎপাত হয়। চাষের কোনো উপায় থাকে না। তারপর বহু বছর গত হইলে এই বালির উপর কিছু পলিমাটি পড়ে, অন্যান্য গাছ জন্মায় এবং ক্রমে মাটির সমাগম হইলে অনেক পরিশ্রম করিয়া পুনরায় আবাদ করা যায়।

বর্ত্তমান ভূমিকম্পে জমিতে বালিস্তরের সঞ্চার হওয়াতে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী—এই সকল উৎপাত হইলে এখানকার অধিবাসীদের দুর্দ্দশার চরম সীমা উপস্থিত হইবে।

উত্তর বিহারকে বাঁচাইতে হইলে বহু অর্থের বহুবর্ষব্যাপী পুনর্গঠন কার্য্যের প্রয়োজন হইবে।

বি, এন, ডবলিউ, রেলওয়ের এজেণ্ট ১২ই ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে ভূমিকম্পে রেলপথের অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন ছাপরাতে গোগরা নদীর উপরের ইঙ্কেপ সেতু বিনষ্ট হইয়াছে, ইহার সংস্কারে তিন লক্ষ টাকা লাগিবে। কম্পনে গঙ্গা ও গোগরা নদীর গতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি আরো বলেন, রেলের বড় বড় সেতু কম্পনের বেগে নানা আকারে বিকৃত হইয়াছে, কোথাও সেতু সম্পূর্ণ উঠিয়াছে, কোথাও নদীগর্ভে ধ্বসিয়াছে, কোথাও ধনুকের আকার ধারণ করিয়াছে। একটি সেতুর মাঝের ১২ ফিট স্তম্ভটি হঠাৎ ২ ফুট ঠেলিয়া উপরে উঠিয়াছে। এই রেলপথের ৯০০ মাইল লৌহবর্ত্ম ভূমিকম্পে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কোথাও লাইন বাঁকিয়াছে, কোথাও বন্যাবিধ্বস্ত হইলে

ভূমিকম্পে ভগ্ন ইঙ্কেপ্ সেতু
ছাপরা হইতে ১১ মাইল দূরে সরযূ (গোগরা) নদীর উপরিস্থিত। (সারণ জিলা)

যে আকার হয় সেই রূপ ধারণ করিয়াছে। বহু সেতুর ইঁটের গাথনীতে ফাট ধরিয়াছে। লোহার সেতুগুলি

বিশেষ বিনষ্ট হয় নাই। সম্পূর্ণ সংস্কার সম্পন্ন করিতে বহু বৎসর লাগিবে এবং অন্ততঃ ২০ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

সারণ জিলাতে গণ্ডক নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইলে ঐ জিলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ বন্যাপ্লাবিত হইবে। সরকার এই আশঙ্কায় বাঁধগুলির মেরামতের কাজে নিযুক্ত আছেন।

রেল সেতুর প্রলয় নাচন—
সাহেবপুর কামালের নিকটবর্ত্তী বড় গণ্ডক নদীর ভগ্নসেতু—
বিরাট স্তম্ভ দ্বিখণ্ডিত হইয়া সরিয়া গিয়াছে। (উত্তর মুঙ্গের)
(শ্রীরাধারমণ ঘোষ (সমস্তিপুর) কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

হায়াঘাটের নিকটবর্ত্তী ভগ্ন রেল-সেতু
(দ্বারভাঙ্গা জিলা)
(শ্রীরাধারমণ ঘোষ (সমস্তিপুর)
কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

পূর্ব্বে বি, এন, ডবলিউ রেলের কিছু লাইন তিরহুত ষ্টেট রেলওয়ে নামে অভিহিত ছিল। ইহা ভারত-সরকারের সম্পত্তি, কিন্তু ঐ কোম্পানীর হাতে পরিচালনের জন্য ন্যস্ত। সরকারী রেলপথের ক্ষতির পরিমাণ (E. I. R, B. N. W. R, E. B. R) ১ কোটি টাকা।

বৈজ্ঞানিকদের মতে নানা কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিশাল পাহাড় আছে এবং বহু গহ্বর আছে। নানা নৈসর্গিক কারণে এই সকল গিরিগহ্বরের স্থানচ্যুতি হয়, সম্ভবতঃ চাপের তারতম্যে ইহাদের নড়চড় হয়, সেই আলোড়নে ভূকম্পনের উদ্ভব হইয়া থাকে ; তাহার ফলে

ধরা-বক্ষ আন্দোলিত হয়, এবং পৃথিবীর মাটির আবরণ বিদীর্ণ হয়। এই কম্পনের বেগ তীব্র হইলেই মানুষের

ভূমিকম্পে রেল লাইনের বক্ররেখা ধারণ—ইহা হইতে আলোড়নের প্রচণ্ডতা বুঝা যাইবে। (দ্বারভাঙ্গা জিলা)
(শ্রীরাধারমণ ঘোষ (সমস্তিপুর) কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

গড়া নানা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস হয় এবং বিষম প্রাণহানি হয়। ইহা ছাড়া আগ্নেয়গিরির সন্নিহিত অঞ্চলেও ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়। ভূগর্ভের বাষ্প ও উষ্ণধাতু অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উৎসৃত হইবার চেষ্টা করে, তাহাতে সেই অঞ্চলে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূবক্ষের বিরাট পাহাড়গুলিরও স্থানচ্যুতি হয়, তাহাতেও ভূমিকম্প হয়। যে সব ভৌগলিক সীমায় পাহাড়গুলির শৈশব কাজ এখনো অবসান হয় নাই এবং তাহাদের ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে, সেখানে ধরা-পৃষ্ঠের আন্দোলন চলিতে থাকে।

গত ১লা মাঘ যে ভূমিকম্প হয়, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে তাহা অগ্ন্যুৎপাত-সম্ভূত নহে, ভূগর্ভের এই গিরিগহ্বর ও আয়তনের স্থান-চ্যুতি হওয়াতেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। তবে অনেকে মনে করেন হিমালয় পাহাড়টিতে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি আছে, তাহারই জাগরণের সূচনা হইল গত ভূকম্পনে। এই ধারণাটি অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরা সমর্থন করেন না এবং সরকারী ভূতত্ত্ববিদগণের যে গবেষণা সুরু হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ না হইলে সঠিক কিছু বলা যায় না। গত ভূমিকম্পের পরিধিটিকে ডাঃ সেন মহাশয় একটি ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের মধ্যে ফেলিয়াছেন। কাটমুণ্ডু, ছাপরা, ও ভাগলপুর

কিষণপুরের নিকট রেল সেতুর দুর্দ্দশা—একটি প্রস্তর স্তম্ভ সটান নদীবক্ষে শায়িত। (দ্বারভাঙ্গা জিলা)
(শ্রীরাধারমণ ঘোষ (সমস্তিপুর) কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

সীমারেখার মধ্যে যে ত্রিভুজ পড়ে ভূমিকম্পের যথার্থ কেন্দ্র তাহার অন্তর্ভুক্ত।

গত ভূমিকম্পের ফলে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহাশয় তাহার যে তালিকা দিয়াছেন তাহা

পূর্ণিয়া সহরের কাপ্টেনস্ ব্রীজ কম্পনের প্রাবল্যে লৌহস্তম্ভ ভাঙ্গিয়াছে (পূর্ণিয়া জিলা)

ধ্বংস স্তূপের জঞ্জাল পরিষ্করণ—মজঃফরপুর

দ্ধৃত করিলাম—ধ্বংসস্তূপ নিষ্কাশন ও সম্পত্তি উদ্ধার; লুপূর্ণ কূপের খনন; বাসগৃহ ও প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন; যের জমির বালি অপসারণ; ক্ষেতের শস্য ও জমি বিনষ্ট ওয়াতে যে খাদ্যাভাব হইবে তাহার দূরীকরণ; ব্যবসায় পেশার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়তা; জমির বালি অপসারণ অসম্ভব হইলে তথাকার অধিবাসীদের অন্যত্র গৃহপত্তনের ব্যবস্থা; সরকারী খাজনা আদায়ে সাহায্যদান; ইক্ষুফসলের বিক্রয়-সমস্যার সমাধান। পাটনার অর্থনৈতিক অধ্যাপক মিঃ বাথেজা (Prof. Batheja) কয়েকটি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে 'Gift' 'Taxation' 'Loan' এই তিনটির দ্বারা বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সহরতলীতে জমি খরিদ করিয়া নূতন সহর গড়িতে হইবে। তিনি কম্পন-পীড়িত স্থান সমূহের রেলের টিকিটে টারমিনাল ট্যাক্স বসানো (যেমন

হাওড়ার আছে), পথ ও সেতুর পারাণী বসানো, কম্পন-বিধ্বস্ত সহরের পণ্যদ্রব্যের উপর চুঙ্গী বসাইয়া মিউনিসি-

ভগ্ন গৃহ হইতে আসবাবপত্র উদ্ধার—মজঃফরপুর
এই গৃহের মালিক মজঃফরপুরের উকীল শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী।

প্যালিটির আয়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানা আভাস দিয়াছেন।

আর্ত্তত্রাণ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ হইতে বহু বিভাগে নানা কাজ হইতেছে। আহত চিকিৎসা, কুটীর নির্ম্মাণ, কম্বল ও চাউল বিতরণ, স্তূপ-নিষ্কাশন, পথ ও সেতুর সংস্কার, কূপ-সংস্কার, টিউবওয়েল স্থাপন, ছোট চিনিকল বিতরণ, ভগ্নগৃহ-নিপাতন, সহরের পথ পরিষ্কার, গৃহসম্পত্তির পাহারা দেওয়া ইত্যাদি নানা কর্ম্মে সকল বিভাগের রাজ-কর্ম্মচারিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে-ছেন। কালেক্টারের আদেশে ও চেষ্টায় সহরগুলিতে বাজারদর সংরক্ষিত হইয়াছে এবং অসঙ্গত লাভের উপায় বন্ধ হইয়াছে।

ভূমিকম্পের আরম্ভেই বড় লাট সাহেব যে আবেদন জারি করেন এবং নানা চেষ্টা করেন তাহার ফলে Viceroy's Fundএ এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। ভারত সরকার বর্ত্তমান বাজেটের উদ্বৃত্ত হইতে বিহার সরকারকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বিহারের লাট-সাহেব অনতিবিলম্বে বিমানবিহারে বিধ্বস্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া সাহায্যের সুব্যবস্থা করেন। বিহারের মন্ত্রী আবদুল আজিজ সাহেবও ইক্ষু-সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং উত্তর-বিহার ও মুঙ্গের পরিদর্শন করিয়া নানা কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত বিভাগীয় কমিশনার, জিলার কালেক্টার, পুলিশ সাহেব প্রভৃতি বহু কর্ম্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। নানা

কূপের বালি নিষ্কাশন—মজঃফরপুর

Special কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া বিহারসরকার ভূমিকম্পের বিরাট সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত আছেন।

সরকারী সাহায্য দান ছাড়া বহু বেসরকারী সহায়ক

"এস এস হে তৃষ্ণার জল"
টিউব ওয়েল (Tube Well) খনন—
বহু কূপ বালুপূর্ণ ও শুষ্ক হওয়াতে জলকষ্ট হইয়াছে—মজঃফরপুর

তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটি, মারওয়ারী রিলিফ সোসাইটী, মেমন রিলিফ কমিটি, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন (I. M. A.), রামকৃষ্ণ মিশন, ভোলানন্দ-গিরি সমিতি, বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতি এবং কল্যাণব্রত সঙ্ঘ। ইহা ছাড়া বহু সহায়ক সমিতি ক্রমে ক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন।

কল্যাণব্রত সঙ্ঘ বাঙালীদের পক্ষ হইতে আর্ত্তত্রাণের জন্য গঠিত হয়। এই সঙ্ঘ বাঙালীদের ওরিয়াণ্ট ক্লাবের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে বহু কুটীর রচনা করিয়া প্রধানতঃ বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারদের আশ্রয় দান করিয়াছে। তাহা ছাড়া নানা হিতকর্ম্মে তাহারা প্রথম হইতে নিযুক্ত আছেন। ইহার অধিনেত্রী লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসান কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া ২৩শে জানুয়ারী হইতে আহত শুশ্রূষা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। অগণিত আহতদের বাড়ী বাড়ী গিয়া ইঁহারা প্রতিদিন শুশ্রূষা করিয়াছেন। পুরাণীবাজার অঞ্চলে যেখানে ধ্বংসলীলা ভীষণ হয় সেখানে ইঁহারা প্রতি গৃহে অনুসন্ধান করিয়া রোগীদের ড্রেসিং ও ব্যাণ্ডেজিং করিয়াছেন। তাছাড়া ইঁহাদের শিবিরেও বহু রোগী ভর্ত্তি হয়।

উত্তরবিহারে সন্ত্রাসের অবসান হয় নাই, সমিতি ও কর্ম্মী ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত সহর ও গ্রামগুলিতে নানা কল্যাণ-কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই সাহায্যকল্পে অসংখ্য সেবা-সমিতি ব্যাপকভাবে কাজ করিতেছেন। তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহাশয়ের সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটিতে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে, কলিকাতা মেয়রের ফাণ্ডে সাড়ে চার লক্ষ সংগৃহীত হইয়াছে। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই যে সকল সমিতি কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া কাজ সুরু করেন

টিউব ওয়েল খনন—মজঃফরপুর। (শ্রীকুলপ্রসাদ সেনগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত চিত্র)

কারণ কম্পনের বিরাম নাই। ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই ভূমির আলোড়ন মানুষকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সহরবাসী এখন কুটীর ও শিবিরেই কালযাপন করিতেছে। পাকা দালানে রাত্রি যাপন নিরাপদ নয়। কখনো কখনো এই কম্পন বেশ নাড়া দিয়া মানুষকে ঘরে-বাইরে ছুটাছুটি করাইয়া নাকাল করিতেছে। তাহার উপর ভবিষ্যদ্বাণীর বিরাম নাই। কখনো কম্পন, কখনো তুফান, কখনো মহাপ্রলয় ঘোষিত হইতেছে, বিশ্বাস-পরায়ণ জনসাধারণের আশঙ্কার অবসান নাই। এদিকে সীতামাঢ়িতে অগ্ন্যুৎপাতের নানা নিদর্শন কল্পনা করিয়া লোকে ত্রাসের বৃদ্ধি করিতেছে। সেখানে নাকি গুরু গুরু ডাক মাটির নীচে প্রায় শোনা যায়।

তাঁবুতে দেওয়ানী আদালত—মজঃফরপুর

মহেঞ্জদারোর কথা মনে পড়িতেছে। ৫০০০ বছর পূর্ব্বে একটি বর্দ্ধিষ্ণু সহর কিরূপে ভূগর্ভে প্রোথিত হইল তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। আধুনিক ভূকম্পন হইতে গুরুতর কোনো কম্পনে সিন্ধুবিধৌত এই নগরীর সভ্যতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল এই অনুমান হয়। বন্ধুবর বলিতেছেন "বাড়ী বাড়ী কিছু শিলালিপি তৈরী কর। যদি উত্তর-বিহারও মহেঞ্জ-দারোর পথানুবর্ত্তন করে তবে বহুযুগ পরে এই শিলালিপি গুলিতে ইহার পরিচয়-সাধন সহজ হইবে।"

তবে বৈজ্ঞানিকগণ ভরসা দিতেছেন আর ভয় নাই। বড় ভূমিকম্পের পরে এমনি ছোটখাট আন্দোলন হয়। অগ্ন্যুৎপাত স্বরূপ কোনো উৎপাতের নাকি আশঙ্কা নাই।

তাঁবুতে মুন্সীফের আদালত—মজঃফরপুর

প্রকৃতির এই আভ্যন্তরীন হিসাবনিকাশ চলিতে থাকুক, ততদিন পর্ণ কুটীরে দিন যাপনের আনন্দ উপভোগ

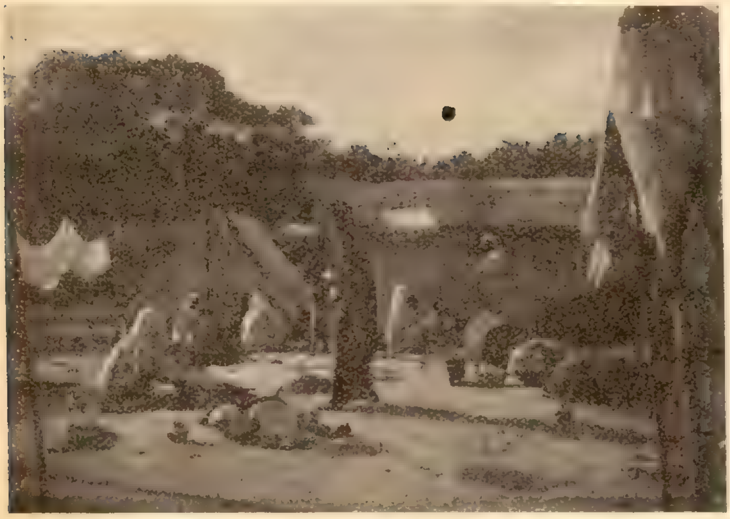

আশ্রিতদের কুটীরের দৃশ্য মাড়ওয়ারী মহিলাদের গৃহস্থালী—মজঃফরপুর

ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল এসোসিয়েসন্ (I.M.A.)-এর শিবির—মজঃফরপুর
(শ্রীকুলপ্রসাদ সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক গৃহীত ছায়াচিত্র)

করা চলিবে। বসুন্ধরা মানুষকে ডাক দিল। নগরীর ইঁট কাঠের পুরীতে সে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া ধরিত্রীর বক্ষ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছিল। তাহার সেই কৃত্রিম রচনা ধ্বংসীভূত হইল, এই ধ্বংসাবশেষের আবর্জ্জনার মধ্যে বসুন্ধরার ডাক পৌঁছাল। আম্রকুঞ্জে ফাল্গুনের পাখীর গানের বিরাম নাই। বনস্থলীতে তৃণাবৃত প্রান্তরে পত্রপুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত প্রকৃতির কোলে সহরের মানুষ পর্ণকুটীর রচনা করিল। দুঃখদৈন্য মৃত্যুশোকের মধ্যেও এই আলোক-বাতাস-আকাশের শান্তি ও মাধুর্য্যে চিত্ত পরিপূর্ণ হোক্।

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

মজঃফরপুর—২২শে ফাল্গুন ১৩৪০

প্রবন্ধলেখক এখনও উত্তরবিহারের ভূকম্প-পীড়িত স্থান সকল পরিদর্শন ক'রে বেড়াচ্ছেন, সুতরাং আগামী সংখ্যায় একটি পরিশিষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা রইল। বিঃ সঃ

পুস্তক পরিচয়

অশোক—(নাটক) শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ; ১২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ; দাম—পাঁচসিকা।

যখনই যে-কোন দেশের সাহিত্যে সার্ব্বজনীন উন্নতি সাধিত হয়েছে, তখনই দেখা গেছে সেই উন্নতির পথে সেই দেশের নাটক এবং নাট্য-সাহিত্যেরও একটি বিশেষ অংশ আছে। অন্যান্য বিভাগের মতো নাট্য-সাহিত্যও জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। লোক-শিক্ষা এবং জাতীয়তা প্রচারের কাজে নাটক যতখানি সাহায্য করতে পারে ততখানি সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগের দ্বারা সম্ভব নয়—একজন রুষ-মনীষী সম্প্রতি এই মত ব্যক্ত করেছেন ; এবং তাঁর সে-মত যে ভীত্তিহীন নয় বর্ত্তমান রুষ-সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে তার প্রমাণের অভাব হবে না।

আমাদের দেশের নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে গৌরব অনুভব করতে পারি—তেমন সৌভাগ্য আজো আমাদের আসেনি। দু'-একখানি ভিন্ন আমাদের সাহিত্যে নাটক নামে যে বইগুলি চ'লে যাচ্ছে তাদের একখানিও সত্যিকারের নাটক নয় ; সেগুলি ইংরাজীতে যাকে Play বলে, তাই।

এই "ড্রামা" এবং "প্লে"র মধ্যে যে তারতম্য আছে তা আমাদের দেশের নাট্যকারগণ বুঝতেন না বা বুঝতে চাইতেন না। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'য়ে যাতে তাঁদের রচনা দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পকেটে অর্থ আনতেও সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তারা নাটক রচনা করতেন—নাটকীয় রীতিনীতির তোয়াক্কা তারা রাখতেন না। রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর", "নটীর পূজা" এবং অন্য দু'-একজন লেখকের দু'-একটি নাটক ছাড়া আমাদের দেশের সকল নাট্যকারদের সম্বন্ধেই উল্লিখিত কথাগুলি খাটে।

অধুনা পাশ্চাত্যদেশে "ড্রামা" এবং "প্লে"-র মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করবার চেষ্টা চলেছে ; অর্থাৎ নাটকীয় নীতি অনুসরণ করেও জনপ্রিয় "প্লে" রচনা করা যায় কিনা, তারই পরীক্ষায় একাধিক নাট্যকার আত্মনিয়োগ করেছেন। নোয়েল কাওয়ার্ড বর্ত্তমানে বিলাতের সব-চেয়ে প্রিয় Playwright ; নাটক লিখে তিনি যত টাকা রোজগার করছেন, এত টাকা অন্য কেউ-ই উপার্জ্জন করতে পারেন নি—শেক্সপীয়র বা বার্ণাড্ শ-ও না। নোয়েল কাওয়ার্ডকে এতদিন আমরা Playwright ব'লেই জানতাম, কিন্তু সেদিন তাঁর এক গুণগ্রাহী সমালোচক কাওয়ার্ডকে প্রথম শ্রেণীর ড্রামাটিষ্ট্ ব'লে অভিনন্দিত করেছেন ; নোয়েল কাওয়ার্ডের Cavalcade নাটকখানির মধ্যে তিনি উচ্চতম শ্রেণীর নাটকীয়তার পরিচয় পেয়েছেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আজকাল ওদেশের Playwrightগণ তাদের রচনার মধ্যে নাটকীয়তা সঞ্চার করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন।

কিছুদিন ধ'রে আমাদের দেশের নাট্যসাহিত্যের মধ্যেও এই জিনিষটি দেখা দিয়াছে ; নবযুগের এমন দু'-একজন নাট্যকারের নাম করতে পারি যাঁরা তাঁদের রচনার মধ্যে এই সামঞ্জস্য ঘটাবার চেষ্টা করছেন ; নাটকখানিকে জনপ্রিয়, মঞ্চোপযোগী অর্থাৎ অর্থকরী ক'রে তোলবার চেষ্টাও যেমন তাঁদের রচনার মধ্যে ধরা পড়েছে, তেমনি সেই সঙ্গে তাঁদের নাটক প'ড়ে একথা মনে হয়েছে যে নাটকখানিকে অনিবার্য্য-ভাবে নাটকীয় কোরে তোলা এবং তার মধ্যে নাটকীয় নীতি অনুসরণ করার কাজেও তাঁদের অবহেলা এবং অমনোযোগ নেই। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়কে আমরা এই শ্রেণী নাট্যকারদের মধ্যে গণ্য করতে আনন্দ উপভোগ করছি।

আলোচ্য নাটকখানি পড়লে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে নাটকীয় রীতি-নীতির সঙ্গে নাট্যকারের পরিচয় নিতা

হাল্কা নয় এবং সেগুলিকে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন বিশেষ কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গেই,—তাঁর নাটক সেই কারণে অসার্থক হয়নি। নাটকের ঘটনাগুলিকে পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ ক'রে তার পরিণতিকে কেমন ক'রে অবশ্যম্ভাবী ক'রে তুলতে হয়, সে-বিদ্যা মন্মথ বাবু ভাল কোরেই আয়ত্ত করেছেন। এবং সেই সঙ্গে নাটকের বিষয়-বস্তুটিকে পাঠক ও দর্শকদের কাছে কেমন ক'রে মনোরম-রূপে উপস্থাপিত করা যায়, সে লিপি-নৈপুণ্যও তাঁর বড় কম নয়। আলোচ্য নাটকখানির দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যে-অভিনব উপায়ে তিনি একটি নারীচরিত্রের একটি বিশেষ জটিল দিককে উদ্ঘাটিত করেছেন, তা সত্যিই প্রথম শ্রেণীর রচনা-কৌশলের পরিচায়ক। এমনিতরো উদাহরণ আরও দিতে পারতাম।

'অশোক' নাটকের আর একটি সম্পদ হচ্ছে এর গান। সুপরিচিত শিল্পী অখিল নিয়োগী গানগুলি রচনা করেছেন। প্রত্যেকখানি গান ছন্দ, মিল ও ভাবের ঐশ্বর্য্যে যথার্থ কাব্যরসাশ্রিত হ'য়ে তাদের রচয়িতার দক্ষতা ও কাব্য-শক্তিকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করেছে।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অন্দরের আলো :—শ্রীলালমোহন দে এম-এ প্রণীত। পি, সি, সরকার এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত এবং সুরেশ চন্দ্র দাস এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৬৬ পৃষ্ঠা—মূল্য ১৷৹ টাকা।

ছয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি। তন্মধ্যে একটি "পাণিনির পরাজয়" বঙ্গশ্রী মাসিক পত্রে ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন প্রকাশিত হয় তখন পড়িয়াই মনে হইয়াছিল এ গল্প ছাপিবার কোন কারণ ছিল না। বাকী পাঁচটি গল্প পড়িয়াও ধারণা বদল হয় নাই। লেখকের হাত এখনো কাঁচা, রসবোধ অপরিণত। একটু উদাহরণ দিই :—হে মা ওলাউঠে, একি চোটে খাঁচার দরজাটি খুলিয়া হুস্ করিয়া শ্রীমান আত্মারামকে উড়াইয়া দিও না যেন!"

মুখবন্ধে ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে বলিয়াছেন যে প্রথম রচনার অসম্পূর্ণতা থাকিলেও লেখকের রচনায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত ও নিদর্শন রহিয়াছে। ভবিষ্যতে তাঁহার রচনা সার্থক হইতেছে দেখিবার কামনায় রহিলাম।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

পদ্মা—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, "গোলাপ পাব্লিশিং হাউস" ১২ নং হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

"পদ্মার" কয়েকটি কবিতা কবির স্বনামে এবং ছদ্মনামে সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইগুলির সহিত নূতন কয়েকটি কবিতা জুড়িয়া বইখানি সঙ্কলিত হইয়াছে।

আজকালকার কোন কবিই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। "পদ্মার" কবিও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবান্বিত। তবে অন্য অন্য কবিদিগের সহিত তাঁহার প্রভেদ এই যে তাঁহার কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের জিনিষ খুব বেশী এবং তাঁহার নিজস্ব জিনিষ অত্যন্ত কম। কোনও কোনও কবিতায় আবার এমন কতকগুলি পদ আছে যাহা অত্যন্ত বেশী রকম কানে লাগে ;—

"ভরা পদ্মার দু'ধারে নিয়ত জাগিছে বালির চর,
কে যেন সুখের এস্‌রাজে শুধু চালায় ব্যথার ছড়।"

অথবা

"লোচন-হরা পরশমণি, আশমানি মোর
বঁধুয়া,
দিল-মজান তোর ছোঁয়াতে ঘোর রঙদার
যাদুয়া।"

প্রভৃতি ধরণের পদগুলিকে আর যাহাই বলা চলুক, কবিতা বলা চলে না। এগুলি কেবল কথার চালাকী মাত্র। ইহার উপর আবার মাঝে মাঝে ছন্দপতনও লক্ষিত হইল।

কিন্তু পঙ্কের ভিতর হইতে পঙ্কজের মত কোনও কোনও কবিতায় স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিতার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—এগুলির সহিত ইহাদের সমগোত্রীয় অন্যান্য কবিতাগুলির কোনও সম্পর্ক নাই। যেমন—

"যেটুকু লুকাতে সবে চাহে যতবার,
নীল নেত্রছায়ে হেরি রহস্য তাহার!"

অথবা—

"লোহার বাসর ঘরে
বেহুলার ব্যথা বুকে জাগে মোর লখিন্দরের তরে।"
—প্রভৃতি।

—এই পদগুলি কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে সাবধানে কবিতা লিখিলে কবির হাত দিয়া ভাল লেখা বাহির হইলেও হইতে পারে।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বিরহ-শতক—শ্রীমতিলাল দাশ এম্-এ, বি-এল্ বেঙ্গল-সিভিলসার্ভিস, মুন্সেফ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলরতন দাশ এম্-এ, বি-এল্, এড্ভোকেট, খুলনা।

চারি চরণযুক্ত একশটি বিরহদগ্ধ কবিতার সমষ্টি লইয়া বিরহশতক রচিত। কয়েকটি কবিতা বাদ দিলে প্রায় সকল কবিতাগুলিতেই ভাবের অভাব ও ভাষার দৈন্য চক্ষুপীড়া-দায়ক ভাবে ফুটিয়া আছে—এমন কি ছন্দপতনও বহুস্থানে পরিলক্ষিত হয়। এক স্থানে কবি অন্য উপমার অভাবে মকরধ্বজের উল্লেখ করিয়াছেন—

"বৃষ্য যেমন স্বর্ণসিন্দুর নবনীসাথে পিষি"—পৃঃ ২২

—কবির অসাধারণ ভূমাপ্রীতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ;

"ভূমার পরশ সুধাসরস আমারি গৃহকোণে"—পৃঃ ১২
"বেদ্য যাহা হৃদ্য যাহা ভূমারি যাহা জাতি" —পৃঃ ২০
"ক্ষোদিষ্ঠানে দোঁহার রতি ভূমারে আজি বন্দে"—পৃঃ২২
"ভূমার সনে সঙ্গোপনে বাঁধিনু প্রীতি ডুরি"—পৃঃ ৩০
"মুগ্ধা মহীর কণায় কণায় প্রস্ফুট ভূমানন্দ"—পৃঃ৩৪

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

স্বপ্ন-ছবি—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক—লালা বিনয়কৃষ্ণ, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ, মূল্য এক টাকা।

"স্বপ্ন-ছবি"র কবিতাগুলিতে প্রথমেই কয়েকটা ত্রুটি চোখে পড়িল, যাহা কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। কয়েকটা কবিতায় এমন কয়েকটী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যাহা সাধারণ পাঠকের সহজ-বোধ্য নহে ; যেমন—সাধারণ অর্থে 'সমান' ; বিভিন্নমূর্ত্তি অর্থে 'বিরূপ' ; দ্যুলোক-ভূলোক অর্থে 'রোদসী' ইত্যাদি। এগুলি কবির বৈদিক সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দেয়। কোনও কোনও কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। ইহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় নহে। কোনও কোনও কবিতায় ছন্দের দিকে একেবারেই লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

এই ছন্দের ত্রুটি সব জায়গায় কবি যে ইচ্ছাবশতঃ করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। অনেক কবিতাতে তাহা অনবধানতার জন্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

কিন্তু এসকল ত্রুটিগুলি বাদ দিলে—এমন কি এসকল ত্রুটিযুক্ত কবিতাগুলিকেও বাদ দিলে যাহারা বাকী থাকে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয় এবং সেগুলি যে কোনও ভাল কবির রচনা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। কেবলমাত্র ভাব ও ভাষার জন্য সেগুলি মূল্যবান নহে, সেগুলি আন্তরিকতাতেও সমুজ্জ্বল। সেগুলির ভিতর আমরা এমন একটি কবি-প্রাণের পরিচয় পাই যিনি বেদনা এবং আনন্দ দুইটিকেই সমানভাবে বরণ করিয়া লইয়া নিজের জীবন-দেবতাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রেমে নিজেকে ধূপের মত বিলাইয়া দিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের এই আকাঙ্খার আকুলতা প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

"হে পাখী, তোমার আমি !
ঘরের প্রদীপ রাখিবে না আর ধরে' !
আকাশের তারা কোথায় যেতেছে সরে' !
দূর বনানীর গুঞ্জন গেছে নামি' !
হে পাখী তোমার আমি।" (সঙ্গী পৃঃ ১০১

—বেদনা এই বিলাইয়া দিবার আয়োজনকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে, কারণ বেদনার অনুভূতি ভিন্ন ত' জীবন-দেবতাকে পাওয়া যায় না ! তাই—

"তোমার ব্যথা হাওয়ার মত লাগে
আমার রাঙা হৃদয় পুরোভাগে :"

—কারণ,

"আমি তোমার প্রেমে বিলীন হ'তে ক্ষণে
চলেছি আজ পরম আয়োজনে।"

(প্রতিরূপ—পৃঃ ৬৬)

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

Various Feats of Hair and Teeth (চুল এবং দাঁতের নানা কেরামতি)—মণিধর (এমেচার) কর্তৃক প্রদর্শিত। ১১নং মধুগুপ্ত লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

পুস্তকখানিতে শ্রীযুত পুলিন দাসের একখানি, প্রোঃ শ্রীযুত রাজেন গুহ ঠাকুরতার একখানি, শ্রীযুত বিষ্ণুচরণ ঘোষের একখানি, শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র দাসের একখানি এবং শ্রীযুত মণিধরের বিভিন্ন সময়ের চারখানি ও নানাবিধ ক্রীড়ারত অবস্থার ছবি নয়খানি মোট সতেরখানি ছবি আছে। প্রত্যেক ছবির তলায় ইংরাজীতে তাহার পরিচয় দেওয়া আছে। পুস্তকের গোড়ায় শ্রীযুক্ত ধর যে যে ক্লাবের সভ্য তাহাদের তালিকা এবং পুস্তকের শেষে যেখানে যেখানে চুল এবং দাঁতের সাহায্যে নানারূপ অত্যাশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শন (যথা ভার তোলা, ভাড়ী গাড়ী টানিয়া লইয়া যাওয়া, মোটর থামান প্রভৃতি) করিয়াছেন তাহাদের তালিকা আছে। একজন বাঙালী যুবকের এইরূপ কৃতিত্ব দেখিলে হৃদয়ে সত্যাই গর্ব্বের সঞ্চার হয়। ছবিগুলির ছাপা বেশ ভালই, বাঁধাইও সুন্দর। ইহাদের সহিত দাঁত ও চুলের যত্ন লইবার সম্বন্ধে কিছু উপদেশ থাকিলে বইখানি আমোদের সঙ্গে শিক্ষাও দিতে পারিত।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

অন্ধকূপ—(যুগসাহিত্য সিরিজ, দ্বিতীয় সংখ্যা)—শ্রীক্ষিতীশ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ১।২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ⁄০ আনা।

—ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বমূলক একটি গল্প।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বিতর্কিকা

১। নামের পদবী

শ্রীনীহার রুদ্র

নামের পদবী সম্বন্ধে শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কিছু লিখে অনেকের দৃষ্টি ওদিকে আকর্ষণ করেছেন। বাস্তবিক আর একটা ভাববার কথা বটে।

যদি কোন নারী বন্ধুকে ভিড়ের ভিতর হতে ডাকতে হয় তবে তাঁর কাছে গিয়ে "শুনছেন" বলতে হবে। কেন, তাঁর নাম ধরে দূর হতে ডাকতে কোন বাধা আছে কি ? অবশ্য যদি তিনি বন্ধু বা বন্ধু স্থানীয়া হন। পুরুষ বন্ধুকে যদি তুমি, তুই সম্বোধন ও নাম ধরে ডাকতে পারি তবে নারী বন্ধুদেরই বা পারব না কেন!

তবে কথা হচ্ছে ব্যাপারটা বলতে যত সোজা, কাজে কিন্তু ততটা নয়। একটু বাধ বাধ ঠেকে, কিন্তু ওটা অভ্যাসের দোষ, ধীরে ধীরে হয়ত সয়ে যাবে।

আর যাঁরা সম্বন্ধে আমাদের বড় বা গুরুস্থানীয়া তাঁদের জন্য কোন চিন্তাই নাই, কারণ দিদি, বৌদি, কাকীমা ও মাসীমা আমাদের হাতেই আছে দরকার মত প্রয়োগ করলেই চলবে।

আর মেয়েরা তাঁদের মেয়ে বন্ধুকে যখন ডাকেন, তখন দিদি বা নাম ধরে ডেকেই সেরে দেন, কাজেই তাঁদের জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। পুরুষ পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে যে অসঙ্কোচ ব্যবহার আছে, মেয়ে মেয়ে বন্ধুদের মধ্যেও তাই আছে।

শ্রীমতি রুবি বা ইলা দেবী যদি কোন পুরুষের intimate friend (?) হন তবে তাঁকে নাম ধরে ডাকতে বাধা কি ? আর যদি শুধু মুখ চেনা বা ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলবার বা জিজ্ঞাসা করবার দরকার হয় তবে, 'দিদি' বা বৌদি বললেই চলবে।

কোন মেয়ের অবর্ত্তমানে আমরা শুধু তাঁর নাম বলে— যথা ইলা দেবী বা রুবি মিত্র পরিচয় দিয়ে কথাবার্ত্তা বলতে যেমন সঙ্কোচ করি না, তাঁর সামনেই বা নাম বলতে সঙ্কোচ করব কেন ? হয়ত নাম ধরে ডাকতে বা বলতে—বিশেষতঃ স্বল্প পরিচিতার সঙ্গে—মুখে প্রথমতঃ একটু বাধবে, কিন্তু তুমি, তুই ও আপনির মধ্যে যদি 'আপনি' উঠে যায় তবে গুরুজনদে[র] যেমন তুমি বা তুই বলা অভ্যাস করে নিতে হবে, সঙ্গে স[ঙ্গে] এও অভ্যাস হয়ে যাবে।

ছোট বেলায় গল্প শুনেছিলাম, কে নাকি তার বাবা[কে] ভিড়ের মধ্যে 'অমুক বাবু' বলে নাম ধরে ডেকেছিল, কা[রণ] ভিড়ের মধ্যে কাকেই বা ডাকবে আর কেই বা সাড়া দেবে[?] আর মেয়ে বন্ধুদের জন্যও তাই করব—নাম ধরে ডাক[ব।] 'বাবা' বলার একটা উপায় সত্ত্বেও যখন ভিড়ের মধ্যে ন[াম] ধরে ডাকতে হয়েছিল, তখন যেখানে কিছু বলবার ... সেখানেই বা নাম ধরে ডাকতে পারবনা কেন ?

যাক, আশা করি এ বিষয়ে আরও অনেক আলো[চনা] হবে ও কিছু নূতন সম্বোধন আবিষ্কৃত হয়ে আমাদের অত[...] বোঝাটাকে কিঞ্চিৎ লাঘব করে দেবে।

২। "তুই, তুমি ও আপনি" সম্পর্কে

শ্রীজ্যোৎস্না নাথ চন্দ এম্-এ

কথা বলাটা যে একটা বিশেষ রকমের আর্ট সেটা লক্ষ্ণৌয়ের অধুনা আমাদের বালীগঞ্জের ধূর্জ্জটী বাবুই প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে রেওয়াজ সৃষ্টি করে[ছেন।] তাঁর প্রতি এজন্য আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। তুই,

ও আপ্‌নি নিয়ে বিচিত্রার বিতর্কিকায় উপেনবাবু যে সুষ্ঠু আলোচনাটীর উদ্বোধন করেচেন তার পেছন থেকেও ওঁর কথোপকথনবিলাসী আত্মাটী উঁকি মারচে। লোকের সঙ্গে কথা কইতে গিয়েই নিশ্চয় উপেন বাবুর মনে এই তিনের ভেতরে পরস্পর কি সম্পর্ক রয়েচে এই প্রশ্নটা জেগেচে। আর সেই সঙ্গে আমার কাছেও একটা "জিজ্ঞাসা"র দাবী এসে পৌঁছেচে।

এই সম্বোধনগুলি যে বিশেষ করেই "সামাজিক" ধূর্জ্জটী বাবুর এই যুক্তিটী মেনে নিয়েও এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে আমাদের প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনে তুই, তুমি এবং আপনি এই তিনেরই এক একটী বিশিষ্ট স্থান এবং প্রয়োজনীয়তা আছে। যে জায়গায় তুমি বলাটাই ঠিক্, সে জায়গায় তুই বল্লে বেমানান্সই হবে। যাকে আপ্‌নি বলাটাই শোভন তাকে তুই বল্লে বিস্তর অনর্থ ঘট্‌বে। বল্‌তে পারেন যে তুই, তুমি ও আপনি এই তিনের প্রয়োগ সম্পর্কে যখন তুমি কোন uniform standard of use বাৎলে দিতে পারছোনা তখন কি করে বল যে অমুক লোককে "তুই" না বলে "আপনি" বলাটাই বেশী শোভন। এর একটা কৈফিয়ৎ পেশ্ করচি। বিলিতি constitution সম্পর্কে যাঁদের একটা মোটামুটি ধারণা আছে তাঁরাই জানেন যে সে ক্ষেত্রে "conventions of the constitution" বলে রাশি রাশি নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রের কাঠামের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে কেবলমাত্র চল্‌তি নিয়মের দোহাই দিয়ে—আপ্‌নি হাজার বই ঘাঁটুন, কোথাও এই নিয়মগুলোর একটা লেখা ধরা-বাঁধা authority নেই। তবু তারা চলে গেছে। ভোল্‌তেয়ারের জ্ঞাতি ভাই Tocqueville তাই লেচেন যে বিলিতি রাষ্ট্র পরিচালনার কোন নিয়মী-কেতাব নেই। তুই, তুমি, ও আপ্‌নি বিশেষ করেই এই ধরণের কটা সামাজিক 'কন্‌ভেন্‌শ্যান্', সুতরাং কোন ইতিহাসেই দের জন্ম-তারিখ লেখা নেই। ধূর্জ্জটীবাবু বিদ্বান্ লোক ও একটা বড় রকমের ভুল করেচেন। তাঁর মতে তুই, মি ও আপ্‌নি'র জন্মের মূলে রয়েচে সমাজ-গত class-stinction. এটা খানিক্‌টে পরিমাণে সত্য হলেও রাপুরিভাবে সত্য নয়। নিম্নতম সমাজের লোককেও আমরা অনেক সময় আপ্‌নি করে বলে থাকি। গোটা কথা হচ্ছে এই যে অধুনা আমাদের সমাজটা ধন-দৌলতের পরিমাণ হিসেবে সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের দিকে পা বাড়িয়েচে। যার টাকা আছে বলে জানি তাকে আপ্‌নি বল্‌তে না বাঁধে সমাজে, না বাঁধে প্রবৃত্তিতে, হোক্ না কেন সে নীচু সমাজের লোক। সুতরাং এতে এই কথাটাই প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা পুরোনো ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ হারিয়ে বসেছি। এটা ভালো-লক্ষণ কি খারাপ-লক্ষণ সে বিচার করবে ভবিষ্যৎ। "ময়লা পোষাক পরা পণ্ডিতকেও, এমন কি ভদ্র মুসলমান ও ভদ্র শূদ্রকেও আমরা তুমি বলি।" ধূর্জ্জটীবাবুর এ কথাটাও আমি মেনে নিতে পার্‌ছিনে। ময়লা পোষাক পরা পণ্ডিত, ভদ্র মুসলমান ও ভদ্র শূদ্র আজ আমাদের কাছ থেকে অতি অনায়াসে "আপনি" আখ্যা পাচ্ছেন এতে আমাদের কোন কুণ্ঠা নেই। সুধীর মিত্র মহাশয়ের "তুই কথাটীর চেয়ে তুমির সম্মান এক ধাপ্ উচুঁতে" এও ঠিক নয়। কলেজে একসঙ্গে পড়্‌বার সময় যাঁরা আমাকে তুই বল্‌তেন তাঁরা এখন অনেকেই তুমি বল্‌তে সুরু করেচেন—এর পেছনে রয়েচে একটা দূরত্ব-জ্ঞাপক আইডিয়া। তুমি বলে তাঁরা আমাকে সম্মান করচেন না, অধিকন্তু আমাকে অপমান করচেন। অনেক জায়গায় দেখে থাক্‌বেন ছেলে মাকে "তুই" বলে—সে বাড়ীর সেইটেই রেওয়াজ। আরেক্‌টী বাড়ী দেখেচি যেখানে ছেলে এবং মেয়েরা সবাই মাকে "আপ্‌নি" বলে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই ক্ষেত্রে "তুই" এবং "আপনি"ও চল্‌তে পারে এবং চল্‌ছে। সুধীরবাবুর লেখার ভেতর পেলুম যে আপ্‌নি (স্বয়ং উপেনবাবু) নাকি তুই, তুমি এবং আপ্‌নির ভেতর এই মামলায় একটা আপোষ দায়ের করেচেন এবং সেই আপোষের ফলে "তুমি"-কে বহাল রেখে বাকী দুটীকে নির্ব্বাসনদণ্ড দিয়েচেন। যদি তা করে থাকেন তো কাজটা ভালো করেন নি, কেন না আমার মতে এদের তিনটীরই এক একটী বিশিষ্ট স্থান রয়েচে এবং সে স্থান থেকে এদের চ্যুত করবার চেষ্টা আদবেই ফল-প্রসূ হবে না। ইংরিজী ভাষাটা বড় ভালো ভাষা। দোহাই আপ্‌নার এই স্বাদেশিকতার দিনে

আমার অপরাধ নেবেন না, তবে কি জানেন এটা বড় খাঁটী কথা যেহেতু এ ভাষায় বড় সুরসাল গালাগালি দেওয়া চলে। গালাগালির সময়ই কেবলমাত্র মানুষ original stateএ ফিরে যায়, অন্য সময়ে সে বড় সাবধানী। তাই বল্‌ছিলুম যে গালাগালির ভাষাই শ্রেষ্ঠ ভাষা। তা'ছাড়া, আরেক্‌টা জিনিষ দেখুন—"you" বল্‌লেই সব ল্যাঠা চুকে গেল। তুই, তুমি ও আপ্‌নির বালাই নেই। বুঝি যে এই রকম একটা সুবিধার কথা পেলে ভারি আরাম হত, কিন্তু উপায় কি বলুন? আমাদের হাইকোর্টের Lordships-দের একটা Full Bench হলেও এ বিবাদ অমিমাংসিতই থেকে যাবে। সুধীর বাবুর মতে আমি যদি আমার বাবাকে তুমি বলি তো তাতে আমার "গোল্লায়"যাওয়া হবে। কিন্তু এ সোজা কথাটা তিনি কি করে ভুল্‌চেন যে বিস্তর ছেলে বিস্তর বাবাকে তুমিও বলে থাকে, আপ্‌নিও বলে থাকে? তাই এই ছোট্ট আলোচনাটুকুনের গোড়াতেই বল্‌ছিলুম্ যে এই তিনের কোন uniform standard of use নেই, থাকাটাও হয়তো সম্ভব নয়। যে যেথানে আছে সে সেইথেনে থাক্ এইটেই হচ্ছে আমার মত। উপেন্‌বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ে তিনি ব্যবহার করেছিলেন "আপ্‌নি", ক্রমে ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সেই জম্‌কালো "আপনি"টী পেকে উঠ্‌লো মধুরতর "তুমি"তে, তাই বলে কি বল্‌বো উপেনবাবু আমার অসম্মান করেচেন? আপ্‌নি কথাটা আমার কাছে একান্ত করেই দূরত্ব নির্দ্দেশক, তবে স্থান বিশেষে এটী সু-প্রয়োজনীয়ও বটে। ধূর্জ্জটীবাবুর শুন্‌লুম সংস্কার আছে, আমার কিন্তু সে বালাই আদবেই নেই।

২ক। তুই, তুমি, আপনি

শ্রীসুধীর কুমার নিয়োগী

তুই, তুমি ও আপনি এই তিনটীর একটীকে রাখা উচিত কি অনুচিত এই নিয়ে যে আলোচনার প্রতিযোগিতা হচ্ছে তাহার অধিকাংশ মত থেকে এই মাত্র বোঝা যায় যে উহাদের তিনটীকে একটী কথাতে Standardised করা দুরাশা ছাড়া কিছুই হবে না। বাস্তবিক ইহাদের তিনটীর একটীকেও বিসর্জ্জন দিলে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনা বেশী। যে যতই উদাহরণ বা যুক্তি দিক না কেন কেহই অস্বীকার করতে পারেন না যে এই তিনটী কথাই সামান্য রূপান্তরিত ভাবে ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। যদি ভারত সমভাষীদের স্থান হত তাহলে উহাদের Standardisation-এর সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু যেথানে সমাজ বা জাতিবিচার সমস্যারই কোনরূপ প্রতিবিধানের সম্ভাবনা নেই সেথানে উপরোক্ত তিনটী কথার ২টী ছাড়িয়া একটী চালান শক্ত নয় কি? কারণ প্রত্যেক কথাটীই বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উচ্চস্তরের লোক নিম্নস্তরের লোককে "আপনি" সম্বোধন করতে পারেই না যতদিন না জাতিগত পার্থক্যের ব্যবধান কিছু কম হয়। অথচ হিন্দুর মধ্যে জাতিভেদ এত বেশী যে পৃথিবীর সব জাতিকেই পরাজিত হতে হয়। গত মাঘ সংখ্যায় সুশীল বাবু বলেছেন যে মহাত্মা গান্ধির ন্যায় ব্যক্তিকে নিম্নস্তরের লোকদিগের সহিত একাসনে রাখতে মন চায় না। তা যদি হয় তবে উর্দ্ধ ও নিম্নস্তরের লোকদের ভিতর সাম্যভাব বা আসবে কেমন করে? কিন্তু আমার মনে হয় মহাত্মা গান্ধির মত ব্যক্তি বরং দরকার হলে সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তুই, তুমি ও আপনির যে কোনও একটী ব্যবহার করতে সঙ্কুচিত হবেন না। কিন্তু এ দেশীয় সম্ভ্রান্ত অর্থাৎ যাঁরা স্ব স্ব সম্মান রাখতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত তাঁহাদিগের কাছে এ সহানুভূতি পাওয়া দুষ্কর হবে। তাঁ "আপনি" কথাটী শুনতে ভালবাসেন কিন্তু শুনাতে নারাজ অর্থাৎ প্রথম দুইটী তাহারা নিজে ব্যবহার করবেন এ অপরটী অন্যকে ব্যবহার করাবেন এই তাঁদের ইচ্ছা তাহলেই বোধ হচ্ছে সমাজ সমস্যা না মিটা পর্য্যন্ত আলোচনার সিদ্ধান্ত হওয়া দুরাশা মাত্র। ইংরাজ জা ভিতর তত জাতিভেদ না থাকাতে একটী কথ

Standardised করে নেওয়া শক্ত হয় না। তবুও You কথার সঙ্গে Please বা Sir না দিলে "আপনির" মত শুনায় না।—তাহাদের Good Mornig কথায় যতই সাম্যভাব থাকুক না কেন ওটা Telephone এর উপর্য্যুপরি Hallow বা Yes এর মতই হয়ে গেছে।—উহাতে প্রাণ ত নেই বরং Etiquette-এর একটি Code word বলা যায়। ভারতের এখনও সংস্কৃত ভাষাতে ওঁ বা বিষ্ণু শব্দ একরূপ অর্থশূন্য ভাবেই ব্যবহৃত হয়। তাই বলি যে সাম্যভাবের দোহাই দিয়াও ইহাদের Standardisation এর প্রস্তাব করা ভ্রমাত্মক, বিশেষতঃ যেখানে সমাজ একস্তরে নেই। সাঁওতালদিগের জাতিগত পার্থক্য না থাকাতে মাত্র "তুই" কথাটীকে ওরা সর্ব্বস্থানে প্রয়োগ করে। আমরাও তাদের কাছ থেকে তুই সম্বোধন পেয়ে অপমান বোধ করি না। আর করা উচিতও নয়।—একটী সাঁওতাল রমণী যদি "তোর বেটা ভাল থাকুক" না বলে "আপনার বেটা ভাল থাকুক" বলে তাহলে বুঝি যে তারা আশীর্ব্বাদ না করে খোসামুদের বুলিই আওড়াচ্ছে। অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে আপনি কথাটা আমরা যেন আশা করতে পারি না। কিন্তু হিন্দুজাতির ভিতর যেখানে সমাজ নানা ভাবে বিভক্ত সেখানে একটী কথা Standardised করা একটু কঠিন হবে না কি?

আর একটি কথা এই যে এই তিনটী কথাকে শিক্ষা বা ভদ্রতার মাপকাটি বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। বালকদের মধ্যে এই কথাগুলির ব্যবহারের তারতম্য থেকে বোঝা যায় তাহারা ভদ্রতার ধাপে কতদূর Promotion পেয়েছে। আবার বালকেরাও অপরের কাছ থেকে এইগুলির উচিত অনুচিত ব্যবহার শিক্ষালাভ করে পরোক্ষভাবে ভদ্রতার পথে অগ্রসর হয়। অবশ্য এ কথা হতে পারে যে শিক্ষার কি আর কোন বস্তু জগতে নেই? আছে, কিন্তু যে কথাগুলি কথাবার্ত্তায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় তার ভিতর যদি শিক্ষার পথ সুগম থাকে তাহাই আমাদের বাঞ্ছনীয় নয় কি? পরিশেষে আমার লেখক ভাইদের নিকট এই নিবেদন যে একটী উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা মারফত তর্কস্থলে থোড়, বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় না লিখে সাধারণ বিবেচ্য যুক্তি সকল দ্বারা তুই তুমি ও আপনির কোনটীর অন্তর্ধান বাঞ্ছনীয় প্রমাণ করাইবেন। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় যদি উচিত বিবেচনা করেন ত এ তর্কের প্রশ্রয় না দিয়া বরং অন্য কোন প্রসঙ্গের আলোচনা করালে বাধিত হইব। কারণ ইহার কোনও স্থির সিদ্ধান্ত হওয়া সুদূরপরাহতই মনে হয়।

২খ। তুই-তুমি- আপনি

শ্রীযতীন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত

তিন চার সংখ্যা "বিচিত্রা"য় এই বিষয়ের আলোচনা লেছে। কেউ "তুমি"র পক্ষে, কেউ "আপনি"র পক্ষে, কউ আবার পরিবর্ত্তনই চান না। যাঁরা "তুমি"র পক্ষে দের উদ্দেশ্য সাম্য প্রতিষ্ঠা, যারা "আপনি"র পক্ষে দের উদ্দেশ্যও তাই—তবে এ দুটোর মধ্যে যেটা চলার ক্ষে অধিকতর সহজ সেইটাই গ্রাহ্য; যদি কোনটাই ার পক্ষে সুবিধাজনক না হয় তা হলে পরিবর্ত্তন দরকার রে না, যেমন আছে তারই কিছু সংস্কার করা দরকার। ব নিয়েই যত মারামারি, সম্বোধনের উপর বিশেষ নির্ভর রে না। কোথাও কোথাওকার লোক আছে, তারা বলে "এ রাজা, তাকে যেতে দিস্ না" তাতে রাজা ক্রুদ্ধ হয় না, জানে মনে, এই উচ্চারণের মধ্যে অনুরোধ আছে, কথার মারামারি কিছুই নয়। তেমনি সবাই নিজের সুবিধানুযায়ী কথা বলে, লক্ষ্য রাখা উচিত যেন তাতে ঘৃণা বা অবহেলার ভাব প্রকাশ না পায়—সেটা তুই, তুমি, আপনির যে কোনটা দিয়েও করা চলতে পারে। আমাদেরও অনেক-স্থলে এমন সব কথা শুনতে হয় যাতে আমাদের সংস্কার অনুযায়ী শ্রুতি-কটু লাগে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখতে গেলে বক্তার অনুযায়ী সেটা সম্মানকর—যেমন সম্মানিত লোকদের প্রতি "তোরেই ত বলেছিলাম" কথার মধ্যে প্রকাশ পায়।

যে কথাই থাক উদ্দেশ্য হবে সাম্য ও সম্বোধন করার যে সঙ্কট তা থাকবে না। ছোটকে আপনি বলতে হলে সম্বোধন-সঙ্কট এসে যায়, কিম্বা অফিসারদের তুমি বললেও সেই সম্বোধন-সঙ্কট। যে নিয়মই স্থাপিত করা হবে তাতে দেখতে হবে যেন বিশৃঙ্খলা না এসে যায়, কাজেই এখানে একটু দূরদর্শিতার দরকার।

একটা বড় উদ্দেশ্য স্থাপিত করবার জন্যে যদি কিছু কিছু সাময়িক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় তা হলে সবারই তা করা উচিত। প্রকৃত পক্ষে দেখতে হবে পরিবর্ত্তন দরকার কিনা। বোঝা যাচ্ছে, এই সাম্য যুগে কাউকে ছোট করে রাখবার অধিকার কারুর নেই, কাজেই যে নিয়মে চলেছে তার পরিবর্ত্তন বা প্রতিকার দরকার। বয়সে ছোটকে তুই বা তুমি সম্বোধন করলে তাদের অবশ্য আত্মসম্মানে ঘা লাগে না, কিন্তু জাতির বা কার্য্যের তারতম্যে যখন বয়োবৃদ্ধকে তুই বা তুমি বলে সম্বোধন করা হয় তখনই প্রশ্ন জেগে উঠে 'এ রকম কেন হবে'। বর্ণের তারতম্যে কনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠকে তুই বা তুমি বলে ডাকছে তাতে বয়োজ্যেষ্ঠের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। তাই বর্ত্তমান সমস্যার অভ্যুত্থান, তাই সবার হৃদয়ে জেগে উঠেছে একটা সমাধান যাতে কোন গোল থাকবে না।

যে কোন পরিবর্ত্তনই করা হোক সংস্কারকদের খুবই বেগ পেতে হবে। তুই, তুমি, আপনির যে কোন একটাকে চালানো কিম্বা চলতি নিয়মের সংস্কার করা কোনটাই একান্ত পরিশ্রম ও সংগঠন ছাড়া হতে পারে না। কাজেই এ স্থলে খুব বুদ্ধিমত্তার সহিত চলতে হবে—যেটাকে বেছে নেবো সেটার সম্বন্ধে আমাদের কর্ম্মঠতার পরিমাপও দেখে নিতে হবে। দলাদলি প্রথমটায় থাকবেই, কিন্তু একটা নিয়ে যদি এগুতে হয় তা হলে অগ্রসরের পদ্ধতি নিয়ন্তাদের পূর্ণভাবে জানা উচিত।

দেখতে হবে তিনটের মধ্যে কোনটাকে চালানো সহজ হতে পারে, এবং তাতে লোকের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে কিনা। জায়গা বিশেষে প্রত্যেকটারই দরকার আছে, সে সব জায়গায় অন্য কথা দিয়ে তাকে চালানো যেতে পারে কিনা তাই বিবেচ্য। অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে 'আপনি'র দরকার খুবই, আবার ছোটদের বা চাকরকে 'আপনি' বললে সবই গোলমাল হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম ত তারা ভাববে লোকটা পাগল হয়ে গেছে, দ্বিতীয়তঃ তাদের কাছ থেকে ঠিক মত কাজ পাওয়া যাবে না। এদের সঙ্গে ডেমোক্রাসী আনলে নিজের হাতেই সব করতে হবে—লোকে যদি তার জন্যে প্রস্তুত হয় তা হলে "আপনি" কথা চালানো সমীচীন কিন্তু এর সম্ভবতা একেবারে সুদূর-পরাহত, কেউ এ বিপদ মাথায় করে নেবে না। মুখেই বলশেভিজম চাইলে হবেনা, নিজের হাতে বাসন মাজতে হবে, তখন পারতপক্ষে চাকরের দরকারও হবে না। কিন্তু চাকর রাখা অবশ্য করণীয় হলে তাকে একটু দাপে রাখতেই হবে, তা নইলে অন্যায় ভাবে মাথায় চড়বে—এরা অশিক্ষিত। সাধারণ-ভাবে শিক্ষিত যারা তাদের মধ্যেই শিষ্টাচার পাওয়া মুস্কিল, অশিক্ষিতের কাছ থেকে আশা করা ত বোকামি। ছোট ভাই বা ছেলেকে 'আপনি' বললে তাতে সংস্কারগত শ্রদ্ধার ভাব আসে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এদের শ্রদ্ধাভাবে আহ্বানে এদের উপর আধিপত্য রাখা চলে না, কাজেই অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে এরা সুপথে নিয়ন্ত্রিত হবে না; কিম্বা এদের স্বভাবের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে এদের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে। বাপ-মা জন্ম দিয়েই খালাস, কোন দায়িত্বই থাকবে না খেতে পরতে দেওয়া ও নিজেকে গঠন করা ছাড়া—এটা কু-প্রথা। ছেলে বাপের কাছে শিক্ষা পাবে কিন্তু বাপের ভাষার মধ্যে একটা দাবীর ভাব ফুটে ওঠা চাই তা নইলে ছেলে মানবেই না, অথবা বাপকে মহাত্মা গান্ধীর চেয়েও বড় কিছু একটা হ'তে হবে ছেলেকে অধীনে রাখবার জন্যে, যা পৃথিবীতে হওয়া এক রকম অসম্ভব।

"তুই" কথারও এক আধ জায়গায় দরকার আছে, শতকরা নব্বই ভাগ স্থলে দরকার নেই, কারণ এটা অবজ্ঞা সূচক কিন্তু যেখানে এটা প্রেমের ভাবে ফুটে ওঠে সেখানে লক্ষ্য করা মুস্কিল। বন্ধুকে "তুমি" বা "আপনি" বলে সম্বোধন করায় যেন অন্তরঙ্গতা কমে যায়—অবশ্য এটা খুবই নগণ্য ব্যাপার। যেখানে ছোটদের "আপনি" বলতে হয় সেখানে বন্ধু কোন ছার। ছোটদের অবশ্য 'তুই' বলা হয়, 'তুমি' বলা চলতে পারে। অবশ্য "তুই" না বলায় সংস্কারে বাধে

কিন্তু যুদ্ধ যখন সংস্কারের বিরুদ্ধে তখন এ সব আপত্তি খাটতে পারে না। "তুই"কে আমরা একেবারে বাদ দিতে পারি।

এবার "তুমি"র সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করা যাক। দেখা যায় "তুমি"র প্রচলনের মধ্যেই তারতম্যের বোধ বিশেষ থাকে না। আমরা বড় ভাই, মা, বাবা, মামা ইত্যাদি গুরুজনদের সম্বোধনে "তুমি" ব্যবহার করে থাকি, আবার ছোট কেউ যথা, ছোট ভাই, বোন কিম্বা ছাত্র ইত্যাদিকেও "তুমি" বলে থাকি—কেবল থাকে মাত্র সুরের অর্থাৎ সম্বোধন করবার ও কথা কইবার ভাবের উপর এই "তুমি"র অর্থ। গুরুজনদের "তুমি আমায় পয়সা দিলে না কেন" কথার মধ্যে ভালবাসার অনুযোগের সুর বেজে ওঠে, আবার শিক্ষক যখন ছাত্রকে বলেন, "তুমি অমুককে মেরেছিলে কেন" তার মধ্যে রাগ ও ভয় দেখানোর ভাব থাকে। ছোটকে "আপনি" বলে এই ভাবের সুর আনা চলে না, এ সব স্থলে "তুই" কথারই প্রচলন বেশীরভাগ দেখা যায়। যেখানে শিক্ষক ছাত্রকে "তুমি" ব'লে কথা বলেন সেখানেও সুরের মিষ্টতা থাকে, কিন্তু তা হলেও "তুমি"র দ্বারা কাজ আমরা পূর্ণ ভাবে নিতে পারি, শুধু প্রয়োজকের সামান্য মাত্র মাত্রাবোধ ও নিজের কৃষ্টির দরকার—তা সহজেই সম্ভব।

এখন সমস্যা, ছাত্র শিক্ষককে কি ভাবে সম্বোধন করবে। যখন একটা বাঁধা নিয়মের পরিবর্ত্তন করতে হবে তখন সবার বিবেচনায় যা মত হয় তাই মেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্র যদি শিক্ষককে "তুমি" বলে সম্বোধন করে তাতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। ভায়ে ভায়েও ত শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ আছে, তারা তখন কথা বলে কি ভাবে? ছোট ভাইকে বড় ভাই যখন শিক্ষক হিসাবে মারেন তখন ছোট ভাই কাঁদতে কাঁদতে এই ভাবেই অনুযোগ করে "তুমিই ত' আমায় কাজে পাঠিয়েছিলে—ইত্যাদি।" যখন একটা ছাত্র শিক্ষককে "তুমি" বলতে পারে তখন অন্যান্য ছাত্র নিশ্চয়ই বলতে পারে। হয়ত শিক্ষকের বন্ধুর ছেলে স্কুলে পড়ে, সে নালিশ করলে, "দেখো কাকা, আমাকে মেরেছে",—কাজেই দেখা যাচ্ছে "তুমি"র প্রচলন "আপনি"র স্থলে আমরা অনেক জায়গায় ব্যবহার ক'রেই থাকি, তাই সার্ব্বজনীন ভাবে এই "তুমি"র প্রচলনই প্রশস্ত ও অধিকতর সহজ সাধ্য। "তুমি"র প্রচলন ভাল ভাবে হ'লে প্রেমভাব ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আসা সম্ভব। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধের দুরত্ব এই "তুমি"র মধ্যে দিয়েই দূর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বিদ্যমান।

মাননীয় শ্রীহরিগোপাল বৈরাগী মহাশয় লিখেছেন, "কিন্তু মার্চ্চেন্ট অফিসের একটী কম মাইনের কেরানী বাবু যদি তাঁর বড় বাবুকে বলেন—'তুমি যদি কাল ছুটি দাও' তা হ'লে আমার মনে হয় যে সেই অফিসে সেই ছুটিই হবে তাঁর শেষ ছুটী।" অনেক অফিসে এমনও ত' আছে, বাপ বড় অফিসার, তাঁরই অধীনে ছেলে কাজ ক'রছে, কোন কিছু ব'লতে হ'লে ছেলে তুমি ব'লেই সম্বোধন ক'রে থাকে—সেখানেও "তুমি"র প্রচলনে বাধা নেই। "তুমি"র প্রচলনে কাজের কোন ক্ষতি হয় না, কেবল দরকার আপোষের সম্মতি। চেষ্টা যখন ক'রতেই হবে তখন যা অধিকতর উপযোগী তার জন্যেই করা যুক্তি সঙ্গত। "আপনি"র প্রচলনে অশিক্ষিত ও কনিষ্ঠদের মধ্যেই বিশেষ ক'রে পরিশ্রম ক'রতে হয়, যেখানে বুঝিয়ে পারা মুস্কিল। শাস্ত্রেই বলে মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি—অর্থাৎ মিষ্টি কথায় মূর্খদের মধ্যে কাজ করা চলে না। তবে ডেমোক্রাসী মতে তাদের সঙ্গে মিষ্টতার সহিত ব্যবহার করতে হ'লেও প্রথম প্রথম চোখ রাঙিয়েই রাখতে হবে, তারপর সমতার অধিকার দেওয়া চলবে। যাই হোক, এই ভাবে কাজ করা যুক্তি-যুক্ত হবে না, কারণ শিক্ষা না হ'লে শিষ্টতা আনা দুষ্কর। "তুমি" নিয়ে কারবার করতে হ'লে সে গোলমালের সম্ভাবনা কম। চোখ রাঙাতে হ'লেও "তুমি" দিয়ে কাজ করা যায়—ছোট ভাইকে বলা চলে, "সেখানে যাবেনা (আজ্ঞা), দুষ্টুমি কোরো না।" "দুষ্টুমি করবেন না" বলায় আজ্ঞার গুরুত্ব ক'মে যায়। "তুমি"কে চালাতে হ'লে ছোটদের বা শিক্ষিতদের সংগঠনের তেমন দরকার করে না, শিক্ষিতদের সংগঠন অনুযায়ী তাদের মধ্যে আপনিই প্রচারিত হবে—তাইই জাগতিক নিয়ম—আস্তে আস্তে উপর থেকেই নীচে

আসবে। কাজেই "তুমি"র প্রচলন ক'রতে হ'লে শিক্ষিত ও অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেই করতে হবে—অফিসের বাবুরাও এই শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত।

অপর স্থানে বৈরাগী মহাশয় লিখেছেন, ধরুন, একটি গ্রামে পাঁচজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আছেন তাঁদের সকলে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে এবং বিশ্বাস করে। এঁরা যদি এ কাজের অগ্রদূত হন তা হ'লে বিশেষ ভাবে উপকার আশা করা যেতে পারে। তাঁরা যদি এরূপভাবে সম্বোধন ক'রতে সুরু করেন এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সকলকে বুঝিয়ে বলেন তা হ'লে তাঁদের অনুসরণ ক'রে সেই গ্রামে এ প্রকারের সম্বোধন প্রচলিত হ'তে পারে। অফিসের বেলাতেও এই পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। তখন বড় বাবুদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হ'তে হবে।" "তুমি" প্রচারের বিষয়েও এই নিয়ম অবলম্বনীয়। অফিসের বড় বাবুকেও সংগঠনে সম্পূর্ণ যোগ দিতে হবে।

৩। বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক।

মোহাম্মদ আবদুল হামিদ।

প্রায় আধ বছর ধরেই চলেছে বিচিত্রার পাতায় বাঙ্গালীর আবরুরক্ষা মামলার শুনানী। ব্যাপারখানা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বঙ্গবাসী মাত্রেরই জীবন যাত্রা সম্বন্ধীয়, তাই আমারও একটা জবানবন্দী দাখিল করছি। ধুতিপরা বহুকাল থেকে আমাদের চলে আস্‌ছে বলে তার বিরুদ্ধে কথা বল্‌তে গেলেই যেন প্রথমটা আমাদের সংস্কারে বাধে। পরিধেয় হিসাবে একখানি চতুষ্কোণ বস্ত্র খণ্ডকে কোমর পর্য্যন্ত জড়িয়ে রাখা নেহাৎ যেন মধ্যযুগের ব্যবস্থা। বস্‌তে, দাঁড়াতে, নীচে দাঁড়িয়ে এক পা উপরের কোন ধাপে বা কিছুতে রাখতে, বা একটু এলোমেলো বাতাস আস্‌তে সদাই সন্ত্রস্ত—কোন দিক থেকে বুঝি বেপর্দ্দা, বেআবরু হন। অনেক কাজের মাঝে,—যথা পরিবেষণ করতে, দুহাতে কোন কালিঝুলি মাখা কাজ করতে প্রায়ই অনেককে আর এক জনকে বলতে হয় "ভাই আমার খুঁট্‌টা ভাল করে গুঁজে দাও ত।" কারও কারও দমকা হাসি হাস্‌তে ধুতির খুঁট খুলে যায়। হঠাৎ কোন শ্রমসাধ্য কাজ সাম্‌নে পড়েছে,—খুঁট্ কষে নাও, মালকোঁচা মার, হাঁটুর কাছটা ক্লিয়ার কর,—তারপর কাজ আরম্ভ। কল কারখানার কাজে ধুতি ত একটা মারাত্মক পোষাক। অনেক জুটমিল এবং ফ্যাক্‌টরীর কর্ত্তৃপক্ষরা ত না পেরে শেষে জোর করেই শ্রমিকদের হাপ্ পেণ্ট্ পরাচ্ছেন। কোঁচার অপকারিতা অনেকেই দেখিয়েছেন,—সুতরাং আমার কথা বাড়ান নিষ্প্রয়োজন। কেউ আবার বলেন ধুতিটাকে খাট করে কোঁচার বাজেট রিট্রেঞ্চ করতে। আচ্ছা তাই যদি হল তবে কোঁচা-শূন্য ধুতির টান্, কোঁচ, বাড়তি কম্‌তিগুলো সমান করে দিলে জিনিষটা কি একটা পায়জামায় দাঁড়ায় না? কেহ হয়ত এখন মনে করবেন এইবার আমি মুসলমানিত্ব উচ্চৈঃস্বরে জাহির করতে আরম্ভ করলাম কিন্তু এইখানে আমি আমার ব্যক্তিগত ঘটনা বলছি যে আমার জীবনের শতকরা সাড়ে নিরানব্বই ভাগ সময় ধুতি পরেই কেটেছে। সুতরাং কথাগুলা আমার নিজের দিক বজায় রেখে মোটেই হচ্ছে না। আর পায়জামা পরলে বছরে কাপড়ে যত খরচ হয়, ধুতি পরলে তার থেকে বেশী খরচ হয় এ একেবারে পরীক্ষিত সত্য—যদিও আমার নিজস্ব পরীক্ষা নয়। এতকাল ধুতি পরে এসেছি বলে যে সেই ধুতিকেই চিরকাল বাহাল রেখে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে এও কোন যুক্তি নয়।

পায়জামা পরলে মুসলমানিত্ব দেখান হয় এ যাঁরা বলে তাঁদেরই কোন পেশায় শতকরা কত লোক ঐ পায়জামার রাজ সংস্করণ পরে কাটাচ্ছেন তার হিসাব পূর্ব্ববর্ত্তী এক লেখক দিয়েছেন। তকে তিনি বলেছেন যে বাঙ্গালী শতকরা ৫৬ জন অর্থাৎ কিনা মুসলমানেরা পায়জামা পরে

যেন উন্মুখ হয়ে আছে। এ কথাটা আমি মানিনে। পায়জামা পরতে যদি তাঁদের এতই আগ্রহ তবে তাঁরা পরেন না কেন? হিন্দুরা কি তাঁদের জোর করে ধুতি পরাচ্ছেন?—তা নয়। পাড়াগাঁয়ে, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলায় এমন হাজার হাজার মুসলমান আছে যে শুধু বিয়ের দিনে ভাড়া করা পায়জামা পরা ছাড়া জীবনে তারা আর কখনও ও "বোগল"তে ঢোকে না। তাদের কাছে পায়জামা পরার প্রস্তাব নিয়ে যদি কেউ উপস্থিত হন ত তিনি পালাতে পথ পাবেন না এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। টুপি পরাও তাদের মধ্যে ঢের কম। কখনও যদি পাল্ পার্ব্বণে পরে ত এমন ভাব খানা দেখায় যেন ও পাপ ঘাড় থেকে নামলেই তারা বাঁচে। জাতীয় পোষাক হিসাবে যদি শিরস্ত্রাণের দরকার হয় তবে যে কোন এক রকম টুপী না হয় ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু একজন লেখক দেখছি পাগড়ীর ব্যবস্থা দিচ্ছেন। যিনি ধুতি থেকে কাছা কোঁচা চেঁচে পুঁছে পায়জামায় রূপান্তরিত করতে বলেন তিনিই আবার মাথায় এক সাড়ে বত্রিশ গজ ফ্যাটা জড়াইবার ব্যবস্থা করেন কি করে ভেবে পাইনে।

কেউ কেউ আবার বলছেন—এটার সঙ্গে ওটা মানায় না, ওটার সঙ্গে সেটা মানায় না। এই মানান্ বেমানান নির্ভর করে আমরা যেমন ভাবে জিনিষটা দেখ্‌তে অভ্যস্ত তারই ওপর। কত জিনিষ পূর্ব্বকালে বেমানান ছিল, পরবর্ত্তী কালে আবার মানানসই হয়ে গেল। যেটা একজনের কাছে বেমানান, সেটা আবার আর একজনের কাছে মানানসই হয়। সংসারের চিরন্তন বিবর্ত্তনের মাঝ দিয়ে আমরা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখানে এখন ভাবতে হবে কোন পোষাকে আমাদের সব চেয়ে কাজের সুবিধা। তার জন্য যদি আমাদের কোট প্যাণ্টের ব্যবস্থা করতে হয় ত ক্ষতি কি? কোট প্যাণ্ট পরলেই মানুষ সাহেব হয়ে যায় না। হয়, যখন তার মনটা হয়ে যায় সাহেবী, যখন সে ভাবে বিলাতটাই বুঝি তার 'হোম'। আমাদের দেশের অনেক মুসলমান কেবল, মুসলমান বলেই, 'স্বদেশ' সম্বন্ধে যেন একটা ধোঁয়াটে ধারণা পোষণ করেন; মনে মনে তাঁরা পশ্চিম দিকটার পানে একটা দেশ খুঁজতে থাকেন। সুখের বিষয় মুসলমানের চোখের এ ঘোর আজ বহু পরিমাণে কেটে গেছে। সাহেবী পোষাক প'রে মানুষের মন যখন এই রকম ভাবে আর ঘরের পানে তাকায় না তখনই সেটা হয় মারাত্মক। তুর্কীও ত কোট প্যাণ্ট পরছে;—কই, সে ত বাইরের লোককে তার ভাইয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে সাহায্য করে না। জাপান দুনিয়ার যেখানে যেটা ভাল পাচ্ছে কুড়িয়ে আনছে, আবার তার ওপরই ওস্তাদী করে ওস্তাদের কান মলে দিচ্ছে।

আমার মনে হয়, আজ যখন সমস্ত ভারত এক জাতীয়তা সূত্রে গ্রথিত হতে চলেছে, আসমুদ্র হিমাচল যখন এক ভাষা প্রচলনের কল্পনা চলেছে, তখন শুধু বাঙ্গালীর বিশিষ্ট জাতীয় পোষাক নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সমস্ত ভারতের একটা জাতীয় পোষাকের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য যাবে তাতে ক্ষতি কি? বাংলাদেশেই ত বাস করব? সুতরাং বাঙ্গালীই রয়ে যাব। ব্রহ্মতেজ যদি থাকে ত আর পৈতের দরকার হবে না। ফরাসী জাতী ইংরাজের তুলনায় তার পোষাকে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য রাখে নি। তাতে তাকে না চেনা গেলেও তার কিছু এসে যায় না।

সুতরাং ঘরোয়া পোষাক পায়জামা-সার্ট, কাজোয়া-পোষাক প্যাণ্ট-কোট, আর মাথায় একটা টুপি, যার ডিজাইন একটা পরে ভেবে দেখা যাবে। 'ধুচুনি' মাথায় না হয় নাই দিলাম।

তক। বাঙালীর জাতীয় পোষাক

শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ সেন

বহুদিন ধরিয়া "বিচিত্রা"তে বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক লইয়া নানাবিধ আলোচনা হইয়া আসিতেছে। এতদিন মুগ্ধচিত্তে পড়িতেছিলাম, আজ কেন জানি না, আলোচনায় যোগ দিবার বাসনা হইল। জানি না হয় ত এতদিনে

সম্পাদক মহাশয়ের আদেশ জারি হইয়া গিয়াছে, যে এ আলোচনা আর অধিক চলার আবশ্যক নাই।

আলোচনার মধ্যে একটী জিনিষ বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে খুব কম লেখকই পোষাকের উপযোগীতার উপর ভিত্তি করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বেশীর ভাগ লেখকই ভিত্তি করিয়াছেন বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বকে। আমরা বিদেশে থাকি, সুতরাং বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে, আমরা অধিকতর সচেতন। কিন্তু ইহাও আমরা জানি, যে মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির ভিতর দিয়া, বাহ্যিক আড়ম্বরের ভিতর দিয়া নহে। গত ফাল্গুন মাসের "বিচিত্রা"য় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যে বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে, আমাদের পোষাক যে রকম আছে, ঠিক সেই রকমই রাখিতে হইবে, একটু অদল বদল করিলেই তাহা অন্য প্রদেশবাসীদের মত হইয়া যাইবে। উপযোগিতার দোহাই দিয়া আমরা বিদেশী সুটকে পরিপূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া লইয়াছি, কিন্তু নিজেদের দেশের অন্য প্রদেশের লোকের সহিত একটু মিল হইলেই তাহা সহ্য হয় না। আমি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গায় গিয়াছি। আমার ভ্রমণ হইতে এই একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে এক মাদ্রাজী ছাড়া, বাঙ্গালীর মত নারীসুলভ (Effiminate) স্বভাব আর কোন প্রদেশবাসীর নাই। অবশ্য বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা শরীর চর্চ্চার দিকে মন দিয়াছেন, তাঁহাদের কথা আমি সসম্ভ্রমে বাদ দিতেছি। যে কোন জাতির চরিত্রের উপর, তাহার ভাষা, খাদ্য এবং পোষাক, যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া শ্রোতাকে কাঁদাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু উত্তেজিত করা যায় না। বাঙ্গলা ভাষা অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্তু যথেষ্ট পুষ্টিকর নহে। বাঙ্গালীর পোষাক শিল্পীর চোখে দেখিলে খুবই সুন্দর, কিন্তু তাহা যথেষ্ট পুরুষত্ব ব্যঞ্জক নহে। ধুতির উপর একটা কোট পরিলেই বুক ফুলাইয়া হাঁটিতে ইচ্ছা যায়, কিন্তু পাঞ্জাবী পরিলেই বুকটা আপনা হইতে নামিয়া আসে। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব যতটা সম্ভব বজায় রাখিয়া আমাদের পোষাকের পরিবর্ত্তন করার সময় আসিয়াছে।

আমার মনে হয় আমাদের দুই রকম পোষাক হওয়া উচিত। প্রত্যেক জাতিরই উহা আছে। একটী পোষাক কাজকর্ম্মের জন্য, আর একটি উৎসবের জন্য। সাহেবরা অপিস যায় Morning Suit এবং Bowler hat মাথায় দিয়া কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যায় Dinner Suit ও Top hat মাথায় দিয়া। কাজ কর্ম্মের জন্য যাহা উপযোগী, তাহাই আমাদের adopt করা উচিৎ। বিবাহ কিংবা শ্রাদ্ধবাড়ীতে আমরা সু,' মালকোঁচা এবং কোটের উপর কলার উল্টানো সার্ট দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, সুতরাং সামান্য একটু পরিবর্ত্তিত বেশ আমাদের চোখে লাগিবে না। আমার মনে হয় সাধারণ সময়ের জন্য মালকোঁচা মারা ধুতী (মাদ্রাজী বা মারাঠি প্যাটার্ণ নহে) পাঞ্জাবী, এবং নাগরা, স্যাণ্ডাল, অথবা চটীই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী পোষাক। শিরস্ত্রাণের কোন প্রয়োজন আমি বোধ করি না। বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি যে সকল প্রদেশের লোকেরা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের চুল ২০ হইতে ২৫ বৎসরের ভিতরেই পাকিয়া যায়।

ফাল্গুন মাসের "বিচিত্রা"য় শ্রীযুক্ত ফকির আহম্মদ সাহেব পায়জামা ও কোটের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পায়জামা জিনিষটা আরাম দায়ক হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের মনোবৃত্তির সহিত উহা একেবারেই খাপ খায় না। তাছাড়া কোট জিনিষটা একেবারেই বাহুল্য। আহম্মদ সাহেব এই সুযোগে Census reportএর কল্যাণে প্রাণ ভরিয়া কয়েকবার "মুষ্টিমেয় হিন্দু" বলিয়া লইয়াছেন। এই "মুষ্টিমেয় হিন্দুর" ভাষাই যে বাংলার ভাষা, ইহাদের পোষাকই যে বাংলার পোষাক, এবং ইহাদের cultureই যে বাংলার cultrue, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাকের ভিতরেও Communal representation টানিয়া আনিবার ইচ্ছা আমার মোটেই নাই, কারণ Communal ব্যাপার মাত্রকেই আমি জাতীয় উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করি, কিন্তু এক্ষেত্রে ইহাও বলা আবশ্যক, যে বাঙ্গালীর পোষাকের আর যাহাই পরিবর্ত্তন হউক না কেন, উহা কখনই ধুতী হইতে পায়জামায় রূপান্তরিত হইয়া যাইবে না। মালকোঁচা মারিয়াও যে যুদ্ধ চলে, তাহার প্রমাণ বাঙ্গালী অনেকবার দিয়াছে। আর যুদ্ধের কথা যখন উঠিবে, তখন ধুতীও থাকিবে না, পায়জামাও থাকিবে না, তখন হাফপ্যাণ্টই পরিতে হইবে, কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের পোষাক লইয়া।

আমরা যদি উৎসবের সময় কোঁচা দিয়া ধুতী পরি, এবং তাহার উপর পাঞ্জাবী ও চাদর গায়ে দিই, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই কারণ উৎসবের সময় সকলেই নিজেকে যথাসম্ভব সুন্দর করিবার চেষ্টা করেন। তখন utilityর প্রশ্ন আসেনা, তখন সৌন্দর্য্যকেই অধিকতর সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের পোষাক যতটা পুরুষোচিত এবং কাজের উপযোগী হয়, তাহাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

আরবের কুৎসা কবিতা

মোহাম্মদ গোলাম মাওলা এম-এ ; বি-এল ; বি-সি-এস,

প্রাচীন আরবের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কবিতা আরবের সাম্প্রদায়িক জীবনে অসীম শক্তি বিস্তার করিয়া রহিয়াছিল। প্রাচীন আরবের মাঝে আমরা গদ্য সাহিত্যের কোন বিকাশ দেখিতে পাই না। কবিতাই তখন সাহিত্য-চর্চ্চার একমাত্র নিদান ছিল।(১) একমাত্র কবিতার ভিতরেই আরব বেদুঈন তখন তাহার সুকুমার ভাব সমূহকে মূর্ত্তি দিত।

কবিতার ভিতর দিয়াই আরব জাতির যাবতীয় মহত্ব, গুণ ও গরিমা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। একাধারে উহাতেই যেন সমস্ত জাতিটার courage, loyalty (to friends), blood revenge, sense of honour স্বরূপ প্রকাশ করিয়া রহিয়াছিল। আরব-বেদুঈন তাহার 'মুরুত্তা' ("muruwa" or virtue) বলিতে যাহা বুঝে তাহা যেন সমস্তই কবিতার ভিতরেই সংবিষ্ট ছিল, এবং তাহাদের কবিতার ভিতর দিয়াই যেন তাহাদের প্রকৃতিগত এই গুণাবলী সমস্ত জাতিটার ভিতরে সংক্রমিত হইত। তৎকালে কোন লিখিত বা রাজশক্তি-প্রণীত আইনের অস্তিত্ব ছিল না।(২) সমস্ত জাতির নির্দ্দেশ ও মনোনয়ন প্রাপ্তি এবং স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসার হেতুটাই যেন ঐ "Sunan" or 'Tradition' বা চিরাচরিত প্রথা সমূহের sanction বা অনুজ্ঞা প্রাপ্তির একমাত্র ভিত্তি ছিল, এবং ঐ অলিখিত বিধি-পদ্ধতি সমূহের ঐ মনোনয়ন-প্রাপ্তি ও শক্তিলাভ কবিতার ভিতর দিয়া উহাদের চির-প্রচলন ও চির-প্রকাশের কারণেই একমাত্র সম্ভব হইয়াছিল। আরব জাতি তাহার প্রিয় ভাষার শ্রেষ্ঠতম সুন্দর জিনিষ কবিতাকে এত প্রিয় মনে করিত যে উহার ভিতরে প্রকাশমান যাবতীয় বিধিনির্দ্দেশও তাহার অন্তর প্রকৃতি ও বাহ্যিক জীবনকে তদ্রূপভাবে অনুপ্রাণিত এবং গঠিত করিয়া তুলিত। এক কথায়, কবিতা যেন সমস্ত জাতিটার জীবনের মাঝে জড় গাড়িয়া বসিয়াছিল। কবিতার প্রভাব দুর্দ্দান্ত আরব জাতির জীবনে রাজ-প্রণীত আইনের যাবতীয় বিধিবিধানের মতই শক্তিশালী ছিল।(৩)

কিন্তু আরবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালিনী কবিতা 'হিযা' (বিদ্রূপ বা কুৎসা) কবিতা। যাবতীয় কবিতার চেয়ে উহাই আঁধার আরবের সাম্প্রদায়িক জীবনে সমধিক প্রয়োজনীয় ছিল। এবং কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও শক্তি উহাতেই নিহিত ছিল এবং উহারই জন্য তাহার স্থান সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি উচ্চে ছিল।

দুর্দ্দান্ত আরব-বেদুইন দুনিয়ার কোন কিছুতেই ভয় করে না, ভয় করে শুধু তিনটি জিনিষকে,—প্রথম যীন (Jin or Genii), দ্বিতীয় সাইমুম (Sand storms) এবং তৃতীয় 'হিযা' (Satire or lampoon) কবিতাকে। বহু প্রাচীন-

(১) "Poetry was then the sole medium of literary expression"—A literary History of the Arabs by Dr. R. A. Nicholson.

(২) "There was no legal code, no legal or religious sanction, nothing in effect save the binding force of traditional sentiment & opinion,—in one word, "Honour."—Ibid.

(৩) It was a poetry rooted in the life of the people that insensibly, moulded their minds and fixed their character (and) animated (them) for some time at least by a common purpose...Thus in the midst of outward strife and disintegration a unifying principle was at work. Poetry gave life and currency to an ideal of Arabian Virtue (Muruwa) which though based on tribal community of blood...nevertheless became an invisible bond between diverse clans,—and formed whether consciously or not a national community of sentiment"—Ibid.

কাল হইতেই মানবের মন যীন প্রেত বা তজ্রূপ কোন অশরীরি আত্মার প্রতি একটা ভীতির ভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। আরব জাতিও বহু প্রাচীনকাল হইতেই তজ্রূপ যীন ও শয়তানের অস্তিত্বে এবং তাহাদের অসীম শক্তির প্রতি বিশ্বাসবান ছিল। তাহারা বিশ্বাস করিত যে মরুভূমির গভীর অভ্যন্তরে, বহু অজানা ভূখণ্ডের মাঝে যীনদের উপনিবেশ ছিল এবং মরুভূমির মাঝে বিচরণ করিতে করিতে ঐ সব ভূখণ্ডের মাঝে কেহ প্রবেশ করিলে তথা হইতে সে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না। এই জন্য শত লুণ্ঠনের মাঝেও মরুচারী বেদুঈন যখন দূর আকাশে আঁধির ঘটা দেখিত, তখন তাহার আত্মা শিহরিয়া উঠিত এবং সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে তাহার ঘোড়ার উপরে লাফাইয়া উঠিয়া পলায়নপর হইত। ভীষণ বাত্যায় বালুকা কণা যখন উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া বহিতে আরম্ভ করিত, —আকাশ যখন আঁধির ঘটায় ছাইয়া যাইত, তখন আরব-বেদুঈন মনে করিত, না জানি কোন অচেনা মরুপ্রান্তরের পাগ্‌লা যীনসর্দ্দার তাহার দলবল লইয়া খুরের দাপটে আকাশ আঁধার করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। লুণ্ঠন ফেলিয়া বাতাসের আগে তাহারা তখন ছুটিয়া পলাইত, অগ্নিকণার মত সাইমুমের বালুর কণা তাহাদের চোখে মুখে আগুন-দানার মত লাগিত, দিশাহারার মত সে তখন ঘোড়ার রাশ ফেলিয়া দিয়া উহার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিত। (৪)

এই ত গেল যীন্ এবং সাইমুমের কথা। কিন্তু প্রাণবিহীন হিযা কবিতাকে আরব এত ভয় করিত কেন? উহার কারণ এই যে হিযা কবিতাকে তাহারা যীনের আবেশ প্রসূত এবং উহার শক্তি-সমন্বিত বলিয়া মনে করিত। যাবতীয় কবিতাকেই তাহারা কোন অদৃশ্য শক্তির আবেশ-প্রসূত মনে করিত, এবং তন্মধ্যে হিযা কবিতাকে অতি অবিশ্বাস্য পরিমানে ভয় করিত (৫) যীনের নাম শুনিলেই দুর্দ্দান্ত আরবের হৃদয় ভয়াতুর হইয়া যাইত। হিযা কবিতাবলী যে বিশিষ্ট প্রণালী ও নিয়মের মাঝে উচ্চারিত হইত তাহা দেখিয়াও কুসংস্কারাপন্ন আরবের মন উহাকে এক অতীব ভীত ত্রস্ততার চক্ষে দর্শন করিত। (৬)

---

(৪) কবি মোহিতলাল মজুমদার এতদ্‌প্রসঙ্গে তাঁহার "বেদুঈন" কবিতার মাঝে যে সুন্দর কয়েকটি লাইন দিয়াছেন তাহা পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার না দিয়া পারিলাম না। মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় ঐ কবিতাটিতে আরব-বেদুঈনের জীবন এমন চিত্তাকর্ষক, স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে ঐ ভদ্রলোক হিন্দু হইয়াও কিরূপভাবে তাহাতে সক্ষম হইলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্ময় লাগে। ১৩২৮ সনের বৈশাখ মাসের (অধুনালুপ্ত) 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকাতে প্রথম যখন তাঁহার এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার এমন কঠিন বিষয়ের এমন সাবলীল বর্ণনা শক্তিতে বিস্ময়ান্বিত হইয়া কোথা হইতে তিনি তাহার কবিতার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিলেন, তাহা জানিতে নিতান্ত বাসনা হয়। পাঠক পাঠিকাগণকে তাঁহার এই কবিতাটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। কবিতাটি তাঁহার 'স্বপন-পশারী' নাকি কি একটা বইএ ছাপা হইয়াছে বলিয়া বহুকাল পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছিলাম।

নিম্নোদ্ধৃত লাইনগুলিতে লুণ্ঠন-ব্যাপৃত বেদুঈন হঠাৎ আঁধির ঘটা দেখিয়া ভীতত্রস্তভাবে তাহার বন্ধুদিগকে বলিতেছে:—

* * * * *

"ওরে আর নয়,—আঁধির পাহাড় দেখা যায় ঐ উড়েছে ধূলা।—
সব পয়মাল! লোকসান ভাই, দিন যে নিবায় দুপুর রাতে,
লক্ষ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসে কারা ঐ চাবুক হাতে।
শুধু ওরি হাতে নিস্তার নেই জিন সর্দ্দার পাগ্‌লা ও যে;
ওর সাড়া পেয়ে আসমানে ঐ দিনের মালিকও আড়াল খোঁজে।
থাক পড়ে থাক উটের বোঝাই সারি সারি ঐ গোলাব-দানি,
পেয়ালা ভরিতে থাম্‌রি খোরাতে বড় মজবুত খুব সে জানি।
তবু ফেলে চল্, দেখ্‌না দখিনে ডাকাতের দল গর্জ্জে আসে,
দাপটে তাদের আলোর ফোয়ারা কালো হয়ে যায় ধোঁয়ার রাশে!
ছেড়ে দাও ঘোড়া রাশ ফেলে দাও, ছুটে যাক ওর যেথায় খুশী!
আরে বেল্লিক কি হবে এখন হাওয়ার উপরে বৃথাই রুষি!

* * * * *

এইবার এল দমকি দমকি বালির ধাক্কা দমক মারে!
একখানি কালো কাফনে ঢাকিল দুনিয়ার মুখ অন্ধকারে!
বাপ্! একি জ্বলে! চোখে মুখে লাগে বালির কণা যে আগুন-দানা!
তারি মাঝে তবু ছোটে দিশাহারা 'বাহাদুর' দেখ মানেনা মানা।"

(৫) "By the ancient Arabs the poet was held to be person endowed with supernatural knowledge and in leag with the spirits (Jin) or Satan"—

(৬) Their pronunciation was attended with pecul ceremonies of a symbolic character, such as anointing t hair on one side of the head, letting the mantle hang do loosely and wearing only one sandal." Ibid,

এই হিযা কবিতা আর কিছুই নহে, ইহা আরবের নিত্যকারের যুদ্ধের মাঝে শত্রুপক্ষের উপরে বর্ষিত নিন্দা ও তাহাদের পিতা পিতামহ এবং বংশের গুপ্ত কুৎসা প্রকাশক কবিতাবলী মাত্র ছিল। কিন্তু এই নিন্দা ও কুৎসা বর্দ্ধক কবিতার শক্তি আরব জাতির বংশগত সম্মানজ্ঞানের উপর এতটা বিষবৎ শক্তি রাখিত যে আরব তাহার বংশের এই কুৎসা প্রকাশক কবিতার উচ্চারণ মাত্র একেবারে উন্মত্ত ও দিশাহারা হইয়া যাইত। কবিতা তখন আরব দেশের টেলিগ্রামের তুল্য ছিল। আরব দেশে কবিতা আবৃত্তি ও কাহিনী কথনের একটা বিশিষ্ট ব্যবসায়ই ছিল। উহাদিগকে 'রাবী' (narrators or story tellers) বলা হইত। তাহারা কবিদের কবিতা সমূহ এবং উহার প্রণয়নের উপলক্ষ বা কাহিনী সমূহ মুখস্ত করিয়া রাখিত এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘুরিয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট আবৃত্তি করিয়া বখ্‌শিস আদায় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত।

এই 'রাবী'দের দ্বারা, আজ এক সম্প্রদায়ের কুৎসা প্রচার করিয়া যে একটি কবিতা প্রচারিত হইত, কাল তাহা সমগ্র আরবে তীরবেগে প্রচারিত হইয়া যাইত। (৭)

আরব জাতি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বাস করিত। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সম্মান আরব-বেদূঈন তাহার নিজের প্রাণাপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান মনে করিত। নিজ নিজ পিতা পিতামহ এবং বংশ-সম্মানের বড়াই করা ও অন্য সম্প্রদায়কে নিজেদের অপেক্ষা হীন প্রতিপন্ন করা এবং নিজেদের সম্বন্ধে গর্ব্ব করিয়া কবিতা বলা আরবদের একটা প্রকৃতিগত সত্ত্বা ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের সকল লোকই ত আর ভাল হয় না। উহার নারীদের মাঝে অনেক গুপ্ত কাহিনীও থাকে। কালক্রমে ঐ সব গুপ্ত ও কুৎসার কাহিনী হয়ত লয় পাইয়া যাইত কিংবা অতি পারিপর্শ্বিকতার লোক ছাড়া বহির্সীমার লোক তাহা জানিতে পারিত না। কিন্তু কবিতার ভিতর দিয়া যখন একবার উহা প্রকাশিত হইত তখন উহা আর প্রচ্ছন্ন থাকার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। সমস্ত রাবীদের মুখে মুখে তখন তাহা প্রচারিত হইয়া আরবের সমস্ত কবিলার (clans বা tribes এর) মাঝে ঐ বংশ-সম্মানকে হীন ও 'জলীন' (নীচ) করিয়া তুলিত। হত্যার প্রতিশোধ বেদূঈন তাহার তরবারির দ্বারাতে লইতে পারিত, কিন্তু এই কবিতার আঘাতের প্রতিশোধ সে তাহার অস্ত্র দ্বারা লইতে পারিত না। তজ্জন্য কবিতার ভিতর দিয়া যখন তাহার বংশের কুৎসা কাহিনী সমূহ কথিত হইতে দেখিত, তখন সে দিশাহারা হইয়া উঠিত, মনের শক্তি তখন তাহার দমিয়া যাইত, হস্তের তরবারি শিথিল হইয়া পড়িত।

এই সমস্ত কারণে আঁধার আরবের সমাজের মাঝে কবির উদ্ভব একটা অতি বিশিষ্ট আনন্দের কারণ ছিল। যেহেতু শত্রু পক্ষীয়ের বর্ষিত কুৎসা কবিতার প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ একমাত্র তাহার দ্বারাই সম্ভব ছিল। এতৎ প্রসঙ্গে Sir Charles Lyall তাহার বিখ্যাত বহিতে (An Introduction into the Ancient Arabian Poetry) লিখিয়াছেন :—

"When there appeared a poet in a family of the Arabs, the other tribes round about would gather together to that family and wish them joy of their good luck. Feasts would be got ready, the women of the tribe would join together in bands, playing upon lutes as they were wont to do at bridals, and the men and boys congratulated one another, for a poet was a defence to the honour of them all, a weapon to ward off insult from there good name, and a means of perpetuating their glorious deeds, and of establishing their fame for ever. And they used not to wish one another joy but for three things,—the birth of a boy, the coming to light of a poet, and the foaling of a noble mare."—p XVII.

(৭) "Their unwritten words flew across the desert like arrows and came home to the heart and bosom of all those who heard them"—Ibid.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরবের কুসংস্কারাতুর মন হিযা * কবিতার উচ্চারণে বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বিত হইত বলিয়া উহাকে আরো বিশেষ ভীতির চক্ষে দর্শন করিত। তজ্জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়িক যুদ্ধের মাঝে হিযা কবিতা অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের মতই এক অত্যাবশ্যক অস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত, এবং শত্রু পক্ষীয়ের উপরে উহা এক অদৃশ্য মন্ত্রঃপূত মৃত্যুবাণ বলিয়া গণ্য হইত। (৮) এইজন্য যুদ্ধশেষে যখন লুণ্ঠনদ্রব্যের ভাগ বাটোয়ারা হইত তখন কবিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ প্রদান করা হইত, কারণ অন্য সকলের ন্যায় সে-ও তাহার কবিতার বাণ দ্বারা যুদ্ধ করিয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইত।

এই হিযা কবিতাবলী জগতের Satire, Lampoon ও sarcasm জাতীয় জিনিষের মধ্যে এক ভীষণ শক্তিশালী ও অতীব মর্ম্মদাহী জিনিষ। উহার ভীষণতা ও মর্ম্মদ্রাহীতার শক্তি আরব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অসমঞ্জস ভাবধারাপূর্ণ আমাদের সমাজ ও ভাষার মধ্যে ফুটাইয়া তোলা বা সম্যক ধারণা করান সম্ভবপর নহে। উভয় সমাজের ভাবধারার প্রকৃতি এত বিভিন্ন ধরণের যে উহার তর্জ্জমার (অনুবাদের) দ্বারা উহার সম্যক উপলব্ধি দূরে থাকুক, সাম্‌নাসাম্‌নি একটা ধারণাও কিছুতেই আমাদের মনের মধ্যে আসিতে পারে না। বিশেষতঃ আরবী ভাষার শব্দাবলী এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশক, এবং একটি ভাবেরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভেদের জন্য এত বিভিন্ন ধরণের শব্দ বর্ত্তমান, (৯) এবং হিযা কবিতাবলী সাধারণতঃই এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশক শব্দমালার দ্বারাতে গ্রথিত হয় যে উহার সম্যক ধারণা একমাত্র আরবী ভাষার ভিতর দিয়া এবং সম্ভবতঃ একমাত্র আরবদের দ্বারাই হইতে পারে।

হিযা কবিতা কিরূপ ধরণের ছিল তাহা জানিবার জন্য হয়ত পাঠকপাঠিকাগণের কৌতুহলের উদ্রেক হইতে পারে। তজ্জন্য আবু তাম্মাম কৃত আধার আরবের কবিতা বহি বিখ্যাত 'হামাসাহ' গ্রন্থ হইতে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা গেল, কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণ যেন উহার দ্বারা হিযা কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা করিয়া না বসেন :—

কালা বাওওাশ্

ওাযাদ্‌তা আবাকা তাবেআন্ কা তাবে'-তাহ্,
ওা আন্‌তা লে উহ্‌হারের রেষালে লাজ্‌মু।
'আলা কুল্লে 'আয়েজিইএন্ দামামার্তুন্,
যুআব্বী বেহাল্ আক্‌ওাম্ হীনা তাকুমু।
ওা আওরায়াহা শারুরাত্ তুরাবে 'আবুহুম্,
কুমাআতা যেসনেও ওার রুওাউ দামীমু॥

"হামাসাহ"

আধার আরবের কবি বাওওাশ্ বলিতেছেন—

বান্দার দল! গর্ব্ব কিসের?
বড়াই করিস্ মোদের সনে?
বাপ পিতামহ'র কেটেছে জীবন,
চিরদাস রূপে হীনতা পানে
তোদের বংশ কোন কবীলার
আছে কিরে জানা বাকী?
তোদের কালিমা ছায়াই তোদেরে
চিনায় চেহারা ঢাকি।
তোদের পূর্ব্ব পুরুষেরা রেখে
তোদের গিয়েছে ভালো!
হ্রস্ব শরীর, গঠন কুশ্রী,
বর্ণ গভীর কালো!

(৮) "The satire or 'Hija' was an element of war just as important as the actual fighting. The menaces which he (the poet) hurled against the foe was believed to be inevitably fatal. His rhymes, often compared to arrows, had all the effect of a solemn curse stolen by a divinely inspred prophet or priest."—Ibid,

(৯) "In one direction the exceeding richness of Arabic poetry becomes so exuberant as to approach redundancy. It (the Arabic language) posseses multitedes of words to express the same thing, which point may best be illustrated by the fact that it offers a choice of a thousand words for camel, about the same number for horse and about five hundred words each for sword and tiger. But the most valuable result of its copiousness is to be looked for in the fact that it possess words expressive of the minute differences of the shades meaning."—Al—Obaidi,

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে আদিম হিযা কবিতাবলীর একটা সামান্যতম অংশও আমাদের হস্তগত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আবু তাম্মাম ও বুহ্ তুরীর বিখ্যাত কবিতা-সংগ্রহ-দ্বয়ে যে হিযা কবিতামালা সংগৃহীত আছে, তদ্বারা আধার আরবের হিযা কবিতার একটা নগণ্য অংশেরও বোধ হয় পরিচয় পাওয়া যায় না।

অনুবাদের দ্বারা হিযা কবিতার শক্তি ও মর্ম্মদ্রাহীতার স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য একটা ধারণা আনয়ন করাও সম্ভাবনার বহির্ভূত হইবে ভাবিয়া অত্র প্রবন্ধে আমি হিযা করিতা সম্পর্কীয় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ দ্বারাই পাঠক পাঠিকা-গণকে উহার ভীষণতার সম্বন্ধে একটা ধারণা প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে কা'আব বিন্ জুহায়র নামক এক বিধর্ম্মী কবি ছিল। কা'আবের পিতা জুহায়রা বিন্ আবী-সাল্মা আরবের 'সপ্ত-কবিতার' (সাবআ মু'আল্লাকার) তৃতীয়(১০) কবি ছিলেন। কা'আব পিতার কবিত্ব শক্তির বহু পরিমাণে অধিকারী হইয়াছিল। সে ইসলাম ও উহার নবীকে আক্রমণ করিয়া কুৎসা কবিতা লিখিতে আরম্ভ করে। আরব জাতির প্রাণ প্রিয় ভাষার সর্ব্বোচ্চ শক্তিবান রচনা এই বিদ্রূপ-কবিতা; আরবী ভাষার ভিতর দিয়া আরবের মনে উহা কী সঙ্গীন শক্তি বিস্তার করিবার ক্ষমতা রাখে তাহা তর্জ্জমার দ্বারা বুঝান যাইবে না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ইসলাম প্রচারের মাঝে কা'আবের ঐ কুৎসা কবিতা প্রভূত পরিমাণে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। করুণার আদর্শ নবী, যিনি মক্কাবাসীদের দ্বারা অতি ভীষণ ভাবে অত্যাচারিত হইয়াও মক্কা জয়ের পরে তাহাদিগকে অম্লান বদনে ক্ষমা করিয়াছিলেন, তিনি কা'আবের এই মর্ম্মন্তুদ কবিতাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। বিরক্ত হইয়া তিনি কা'আবের হত্যার আদেশ প্রদান করিলেন। শান্তির প্রতিমূর্ত্তি নবী কতটা বিরক্তির কারণে এই হত্যার আদেশ দানে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার পড়িবে না। কা'আবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইতঃপুর্ব্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কা'আবকে ইসলাম অবলম্বনের জন্য উপদেশ দান করিয়া পাঠাইলেন। কা'আব তখন প্রাণ ভয়ে কয়েকদিন পাহাড়ে জঙ্গলে ও পর্ব্বত গুহায় অতিবাহিত করিল। কিন্তু এইরূপ জীবন যাপন যখন তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সে একদিন ছদ্মবেশে হঠাৎ নবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা সূচক এক কসীদা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল। এই কসীদাই "বা-নাত্ সু'আদ" নামে আরবী সাহিত্যে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। কা'আবের এই কসীদা ইসলামের নবীর গুণ গানে মুক্তার মালার মত এমনই উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে যে উত্তর কালে বহু মসজেদ গাত্রে উহার শ্লোকাবলী মূল্যবান প্রস্তর সহযোগে লিখিত হইয়া থাকিত। কা'আব ব্যতীত উমায়্যাহ বিন্ আবিস্ সাল্ত্ প্রভৃতি আরও কয়েকজন কবি ইসলামের কুৎসা মূলক কবিতা প্রচার করিত। এই সব কবিতাবলীর দ্বারা ইসলাম প্রচারে বিঘ্ন ঘটিতে দেখিয়া ইসলামের নবী তদীয় সাহাবা-কবি হাস্সান বিন্ ষাবিত্কে ঐ কবিতা সমূহের প্রত্যুত্তর ও প্রতিরোধ কল্পে কবিতা প্রণয়নে আদেশ দিয়া-ছিলেন। এতদসম্পর্কে নবী বলিয়াছেন, "বহু শহীদের (ধর্ম্ম-যোদ্ধার) শোণিত যাহা করিতে পারে নাই, হাস্সানের লেখনী ইসলাম প্রচারে তাহা করিয়াছে।" সাব'আ মু'আল্লাকার অন্যতম কবি লাবীদ ইসলাম গ্রহণ করিলে ইসলামের নবী তাহাকেও বিধর্ম্মী কবিদের প্রত্যুত্তরে কবিতা রচনার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু লাবীদ বলিয়াছিলেন, "হে নবী, আপনি আমাকে আর কবিতা রচনার জন্য অনুরোধ করিবেন না; কবিতার বদলে আমি যাহা পাইয়াছি আল্লার সেই কোরআনই এখন আমার জন্য যথেষ্ট।

(১০) আরবের এই 'সপ্ত-কবিতা'র কথা আমি অন্য এক প্রবন্ধে বলিতে ষ্টা করিব। আরব জাতি কবিতার জন্য বিখ্যাত। আরব কবিদের ধ্য যে সাত জন কবির সাতটি কবিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আরবদের দ্বারা রিগণিত হইয়াছিল, সেই সাতটি কবিতা মিশর দেশীয় কিংখাবের উপরে নার অক্ষরে লিখিত হইয়া আরব জাতির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সম্মানিত স্থান 'বার দ্বারে দোলায়িত হইয়াছিল। তজ্জন্য উহাদিগকে সপ্ত দোলায়িত বিতা (Seven Suspended poems of the Arabs) বা সপ্ত স্বর্ণ কবিতা াব'আ মুজাহ হাবাত্ বা (Seven Golden Poems) নামে অভিহিত া হয়।

কবিদের কুৎসাবর্ষী বাক্যবাণকে আরব জাতি কতটা ভয় করিত তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

উমায়্যাহ্ বংশীয় খলিফাহ্গনের রাজত্বকালে যারীর ও ফারাজ্দাক্ নামক দুই বিখ্যাত কবি ছিল। এই দুই কবির মধ্যে কবিতার যুদ্ধ নিত্য লাগিয়াইছিল, এবং এক কবি অন্য কবিকে আরবীয় ভাষার যাবতীয় বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ ও গালাগালি-বর্ধক কবিতা দ্বারা আক্রমণ করিত। তাহাদের এই দ্বন্দ্ব-কবিতা বা "নাকায়েদ" কি নাগরিক, কি সৈনিক, সমুদয় শ্রেণীর মধ্যেই তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং এতদুভয়ের মধ্যে কে কাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কবি এই আলোচনা নিয়া যাবতীয় নাগরিক, সৈনিক ও কবি দুই প্রকাণ্ড দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। (১১)

এক্ষণে, আমার বর্ণনার ঘটনা এই যে তাহাদের সমসাময়িক সময়ে রা-'ঈল ইবিল নামে এক কবি ছিল। সে ফারাজ্দাক্‌কে যারীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবি বলিয়া উচ্চরবে মত প্রকাশ করিয়া বেড়াইত। এক্ষণে ব্যাপার হইল এই যে যারীর রা-'ঈল ইবিলের বংশ বাহ্নু-নুমায়েরর প্রশংসা করিয়া কবিতা লিখিয়াছিল, কিন্তু ফারাজ্দাক্ তাহাদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করিয়াছিল। একদিন যারীর রা-'ঈলের নিকট গমন করিয়া এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিল, কিন্তু রা-'ঈ কোন উত্তর করিল না। রা-'ঈ তখন খচ্চরারোহণে কোথায় গমন করিতেছিল এবং তাহার পুত্র যান্দাল তাহার অনুগমন করিতেছিল। রা-'ঈকে থামিতে দেখিয়া যান্দাল চীৎকার করিয়া বলিল, "বাহ্নু কুলায়েবের এই কুকুরটার নিকটে দাঁড়াইয়া কেন বৃথা সময় ক্ষেপণ করিতেছ; মনে হয় যেন উহা হইতে তুমি কিছু লাভবান হওয়ার আশা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা কর।" এই বলিয়া সে তাহার পিতার খচ্চরের পৃষ্ঠে খুব জোরে কষাঘাত করিয়া দিল। অবোধ প্রাণী অকস্মাৎ ভীষণ ভাবে প্রহৃত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া দৌড় দিল। যারীর পিছনে দণ্ডায়মান ছিল; সে খচ্চরের লাথির আঘাতে পড়িয়া গেল এবং তাহার টুপী দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। যান্দাল তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করিয়া খচ্চর হাকাইয়া চলিয়া গেল। যারীর মৃত্তিকা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া টুপীটি তুলিয়া লইল, এবং উহা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া মাথায় পড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—

"ওরে যান্দাল, কি বলিবে তোর
বংশ নুমায়ের তবে,
আমার কুৎসা-কবিতার বাণে
বক্ষ বিঁধিবে যবে?"

যারীর নিতান্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ অবস্থায় বাড়ী ফিরিল, এবং সন্ধ্যার উপাসনান্তে একজগ খর্জ্জুর সুরা এবং একটি প্রদীপ আনাইয়া কবিতা লিখিতে বসিল। ঐ গৃহের জনৈক বৃদ্ধা তাহাকে কি বিড়বিড় করিতে শুনিয়া কি হইয়াছে দেখিবার জন্য সিড়ির উপরে আসিল, এবং দেখিল যে যারীর তাহার শয্যার উপরে উলঙ্গ অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। এতদ্দর্শনে বৃদ্ধা দৌড়িয়া যাইয়া গৃহবাসীদিগকে চীৎকার করিয়া জড় করিয়া যারীরের অবস্থা বর্ণনা করিল। তাহারা বলিল, "ওরে বৃদ্ধা, তুমি চুপ কর, সে কী করিতেছে তাহা আমরা জানি।" ভোর হওয়ার পূর্ব্বেই যারীর বাহ্নু-নুমায়েরের বিরুদ্ধে ৮০ চরণের এক কুৎসা কবিতা রচনা করিয়া ফেলিল যখন কবিতা শেষ হইল তখন সে যুদ্ধবিজয়ী সেনানীর মত 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং

১১) "These flytings (nagaid) were recited every where and each poet had thousands of enthusiastic partisans who maintained that he was superior to his rival. One day Mutallab-bin-Abi Sufra, governor of khurasan, who was marching against the Azaiqa, a sect af the khariits, heard a great clamour and tumult in the camp. On enquiring its cause he found that the soldiers had been fiercely disputing as to the comparative merit of Jarir and Farazdaq, and desired to submit the question to his decision. "Would you expose me," said mutallab, "to be torn in pieces by these two dogs? I will not decide between them, but I will point out to you those who care not a bit for either of them. Go to the Azaiqa! they are Arabs who understand poetry, and judge it aright." Next day when the armies faced each other, an Azaigite named Abida bin Hilal stepped forth from the ranks and offered single combat. One of the Mutallabs men accepted the challenge, but before fighting, he begged his adversary to inform him which was the better poet,—Farazdaq or Jarir? "God confound you," cried Abida, "Do you ask me about poetry instead of studying the Qoran and the sacred law?" Then he quoted a verse by Jarir and gave judgment in his favour"—Nicholson.

তৎপরে যেখানে রা-‘ঈ এবং ফারাজ্দাক্ এবং তদ্পক্ষীয় কবিগণের সাক্ষাৎ পাইবে, তথায় গমন করিল, এবং রা-‘ঈর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবা মাত্র রাত্রের রচিত কুৎসা কবিতাটির আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ তাহার আবৃত্তি চলিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ফারাজ্দাক্ ও রা-‘ঈ ও তাহাদের সঙ্গীরা অবনত মস্তকে উপবেশন করিয়া রহিল এবং যখন যারীর তাহার সর্ব্বশেষ চরণদ্বয়,—

“হীন নুমায়ের বংশের তুই
নহিস্ ক আব কেলাব-বীর
অবনত ওরে করে ফেল আঁখি,
লজ্জা ছেয়েছে আপাদ-শির।”

ফাগুদ্দেত্ তার্ফা ফাইন্নাকা মিন্ নুমায়রি,
ফালা কা’বান্ বালাগ্তা ওালা কিলাবা।

— আবৃত্তি করিল, তখন রা-‘ঈ উর্দ্ধশ্বাসে তাহার খচ্চরে আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার পরিজনবর্গকে চীৎকার করিয়া বলিল, “সত্বর অশ্বারোহণ কর, সত্বর অশ্বারোহণ কর, তোমরা এইস্থানে আর তিষ্ঠিতে পারিবে না, আজ যারীর তোমাদের সমুদয় বদন কালিমা-লিপ্ত করিয়া দিয়াছে।” এতদ্শ্রবণে তাহারা তাহাদের মালামাল বাধিয়া ছাদিয়া বসরা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল, এবং যখন তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ে উপনীত হইল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা সমস্ত বংশের প্রতি কুৎসা-কালিমা আনয়নের জন্ম রা-‘ঈ এবং তাহার ছেলেকে ভীষণভাবে ভর্ৎসনা করিল। বহু শতাব্দী পরেও রা-‘ঈ এবং তাহার পুত্রের নাম তাহাদের বংশের কালিমা আনয়নের কারণ স্বরূপে এক প্রবাদ বাক্যের হেতু হইয়া রহিয়াছিল। (১২)

কবিদের মুখরতাকে আরবেরা কিরূপ ভয় করিয়া চলিত তাঁহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আরব মরুভূমির উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের পারে হেরা নামক প্রদেশ ছিল। ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে ‘আম্র্ বিন্ হিন্দ্ হেরার সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। তাঁহার সভাতে তারাফাহ্ বিন্ আব্দিল্ বাক্রী ও তদীয় মাতুল কবি মুতালাম্মিস নামীয় দুই বিখ্যাত কবি ছিল। তারাফার কবিতা আরবের ‘সপ্ত দোলায়িত কবিতা’র মাঝে দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা হইতেই তাহার কবিতার প্রভাব, সৌন্দর্য্য ও শক্তিশালীতা সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণ ধারণা করিতে পারিবেন। (১৩) কথিত আছে যে সে তাহার যৌবন উন্মেষের পর হইতেই এমন উচ্ছৃঙ্খল, ছন্নছাড়া ও লা-পরোওা প্রকৃতির ছিল যে অতি শীঘ্রই সে তাহার ভ্রাতা আবদুল মালেকের সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া হেরায় চলিয়া আসিয়াছিল। কিছুকাল হেরায় অবস্থান করিবার পর মুক্ত মরুচারী তারাফাহ্ সহরের সসীম পরিবেষ্টন এবং রাজসভার বিধি নিষেধের মধ্যে অতিষ্ঠ হইয়া আম্র্ বিন্ হিন্দ্‌কে উপলক্ষ করিয়া এক হিযা কবিতা রচনা করিল,—

“Would that we had instead of ‘Amr,
A milch-ewe bleating round our tent”
—Nicholson

অর্থাৎ রাজ সভার এই জাকজমকপূর্ণ সমারোহের চেয়ে মুক্ত মরুর তাবুর পাশে যে মেষ চরিয়া বেড়ায় তাহাও আমার বেশী নয়নানন্দের জিনিষ। রাজা আম্র্ তারাফার এই কবিতার বিষয় অবগত হইয়া তদ্প্রতি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তারাফাহকে শাস্তি প্রদান করিতে তাহার সাহস হইল না, যেহেতু তাহা হইলে তারাফাহ্ ও তাহার মাতুল তাহাকে আরো ভীষণতর ‘হিযা’র বাণে বিদ্ধ করিয়া মারিবে। সুতরাং রাজা ‘আম্র্’ মনের রাগ মনেই চাপিয়া রাখিলেন। কিন্তু পরোওা বিহীন যুবককবি তারাফাহ্ সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইলে উহার মাধুরী-পানের ব্যাপারে দুনিয়ার কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করিতে শিখে নাই। তাই কিছু কাল পরে একদিন যখন রাজা ‘আম্র্ তাহার অন্তঃপুরে তারাফাহ্‌কে

---

(১২) রান্নাতুল মাষালেষ ওাল মাষানী নামক আরবীয় গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠা হইতে অনুবাদিত।

(১৩) কবি তারাফাহ্ আরবের সপ্ত কবিতার কবিগণের মধ্যে সর্ব্ববয়ঃকনিষ্ঠ ছিল। মাত্র ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে জীবিত ছিল। এই অল্প বয়সের মধ্যে যুবক কবি তারাফাহ্ আরবী কবিতার মাঝে ‘গুবুবিয়্যাত’ বা যৌবন-কবিতার যে দান রাখিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। বাংলা ভাষার মাঝে—(আমার জানা মতে) একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামের ‘পূরবী হাওয়া’ এবং ঐরূপ আর দু’একটি কবিতার মাঝে মাত্র তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাইয়াছি।

নিমন্ত্রণ করিয়া এক সঙ্গে ভোজন করিতে আনিলেন, তখন ঐ দস্তরখানেরই (dinner cloth) অন্য পার্শ্বে যৌবন-উপনীতা অনুপম সুন্দরী রাজ-ভগিনীও আসিয়া উপবিষ্টা হইলেন। তারাফাহ্ তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—

"Behold, she has come back to me,
My fair gazelle, whose ear-rings shine;
Had not the king been sitting here,
I would have pressed her lips to mine"
—Dk Ibid.

দেখ দোস্ত ঐ
হারান আমার
হরিণ আবার
ফিরিয়া এসেছে বুকে,
আহা যদি রাজা
হেথা না থাকিত
কত সাধে ঠোট
চুমিতাম ঠোটে রেখে।

—এতটা ধৃষ্টতার কি আর মার্জ্জনা আছে? 'আম্‌র্ বিন্ হিন্দ্ নিজকে যারপর নাই অপমানিত মনে করিলেন, এবং তারাফার এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাহার নিধন-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু মুতালাম্মিস জীবিত থাকিতে ত তাহা সম্ভবপর হইবেনা, কারণ সে তাহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবেই লইবে। হেরার মাঝে তাহাদিগকে হত্যা করিলে তাহার অন্তঃপুরের এই গুপ্ত কাহিনী কোন না কোন রকমে প্রকাশিত হইয়া তাহার গর্ব্বোন্নত বংশের মাঝে এক চির-কালিমার সৃজন করিবে। তজ্জন্য 'আম্‌র্ বিন্ হিন্দ্ স্থির করিলেন যে উভয়কে দূর বাহ্‌রায়ন প্রদেশে তাহাদের জন্মভূমি পরিদর্শনে প্রেরণের ভাণ করিয়া উক্ত প্রদেশের শাসন-কর্ত্তার নিকট তাহাদের গুপ্ত হত্যার আদেশ প্রদান করিয়া পাঠাইবেন। তদনুসারে উভয়কে তিনি স্বদেশ পরিদর্শনের ছলে বাহ্‌রায়নের শাসন কর্ত্তার নিকট মোহরাবদ্ধ লিপিকাসহ প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে মুতালাম্মিস সংশয়ান্বিত হইয়া হেরার এক খৃষ্টান বালকের দ্বারা লিপিকা খুলিয়া পাঠ করাইয়া উহার গুপ্ত বিষয় অবগত হইল। উহাতে তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত করার আদেশ ছিল। মুতালাম্মিস তারাফাহ্‌কে ঐ বিষয় অবগত করাইয়া তাহার নিজের লিপিকাও উন্মোচন করিয়া পাঠ করাইয়া দেখিতে বলিল। কিন্তু তারাফাহ্ মুতালাম্মিসের কথায় কর্ণপাতও করিল না। মুতালাম্মিস কিছুতেই যখন তারাফাহ্‌কে সম্মত করাইতে পারিল না, তখন স্বীয় প্রাণ রক্ষার জন্য একাই অন্যত্র পলায়ন করিল, এবং দুরদৃষ্ট তারাফাহ্ বাহ্‌রায়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। ফলে যাহা হইবার তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। আরবী সাহিত্যবিদ্ ডক্টর নিকলসন তারাফার এই অকাল মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"Thus perished miserably in the flower of his youth,—according to some account he was not yet twenty,—the passionate and eloquent Tarafah. In his Mu'allaqah he has drawn a spirited portrait of himself. The most striking feature of his poem is his insistence on sensual enjoyment as the sole business of life....He had early developed a talent for satire which he exercised upon friend and foe indifferently, and after he had squandered his patrimony in dissolute pleasures, his family chased him away as though he was a mangy camel":— (pp. 107/8).

আশা করি ইহা হইতেই আমার পাঠক পাঠিকাগণ হিব্বা কবিতার সংঘাতিক শক্তি সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন। প্রবন্ধ অনেকটা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক স্থলেই আমাকে পাদটীকা প্রদান ও উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। পাদটীকা এবং উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে এই ধরণের প্রবন্ধ পাঠক পাঠিকাগণের বোধগম্য করান সম্ভবপর হইত না বলিয়া, বাধ্য হইয়া যাহা আমাকে দিতে হইয়াছে, আশা করি তাহা আমার পাঠক পাঠিকাগণের নিতান্ত অনুপাদেয় হয় নাই। যদি অবসর পাই তবে আরবের যৌবন-কবিতা প্রসঙ্গে আরবের সপ্ত-কবিতার কথা এই প্রবন্ধে আমাকে উল্লেখ করিতে হইয়াছে তদ্বিষয়ে পাঠক পাঠিকাগণকে কিঞ্চিৎ পরিচ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

মোহাম্মদ গোলাম মাওলা

দেশের কথা

শ্রীসুশীল কুমার বসু

আমাদের রাষ্ট্রীক অধিকার

আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্য সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে, পাশ্চাত্যের চিন্তা ও ঘটনা সমূহের প্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। সেখানকার পরিবর্ত্তনশীল নূতন চিন্তা ও মতের দ্বারা আমাদেরও চিন্তা ও আদর্শ নিত্য প্রভাবিত ও সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাতে অন্যায়, দোষের অথবা সঙ্কুচিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু, বিশেষ বিচার না করিয়া, অন্ধভাবে কোনও জিনিসের অনুসরণ আমাদের পক্ষে লজ্জাকর ও ক্ষতিকর হইতে পারে। সকল প্রকার চিন্তাধারা ও ঘটনাবলীর উপর আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং তাহার শ্রেষ্ঠ অংশগুলি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আমাদের দেশের একদল রাজনীতিক যেমন, রাষ্ট্রে বর্ত্তমান সময়ের মধ্যবিত্তদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রাখিবার অন্যায় মত পোষণ করেন, সেইরূপ ইউরোপীয় কমিউনিজম্-এর আদেশে অনুপ্রাণিত একদল তরুণ ভুল করিয়া আমাদের বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে ইউরোপীয় ধনিক সম্প্রদায়ের সমস্থানীয় মনে করেন, এবং ইঁহাদের উচ্ছেদ ও বিলোপ সাধনকে দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশের মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা যে ইউরোপের ধনিক সম্প্রদায়ের মত নহে, অনেক দিক দিয়া যে তাঁহারা কৃষকদের অপেক্ষাও অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত, আমাদের কৃষক বা শ্রমিকেরা যে তাহাদের ইউরোপীয় ভ্রাতৃবর্গের ন্যায় দেশের সঙ্ঘবদ্ধ ধনবলের শিকারের পাত্র নহে, দেশের প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান করিলে, তাহার পরিচয় পাওয়া অসম্ভব হইবে না। আমাদের কৃষক বা শ্রমিকদের কোনও প্রকার দুঃখ দুর্দ্দশা নাই, অথবা দেশের ভূম্যধিকারী বা মহাজনদিগের দ্বারা যে তাঁহারা অত্যাচারিত হন না এবং দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদিগকে শোষণ করেন না, বা তাহাদের উপর অন্যায় সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করেন না, তাহা নহে। কিন্তু, ইউরোপীর ধনিকদের ন্যায় ইঁহাদের পশ্চাতে একত্রিত ধনবল না থাকায় এবং ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা ইঁহাদিগকে বিশেষ কিছু সুবিধা দিতে না পারায়, এই অবস্থার প্রতিকার এবং দেশের মধ্যে আর্থিক সাম্য বিধান বিশেষ কষ্টকর হইবে না। ইঁহাদের অনেকেই দেশের আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

এই সকল অবস্থার কথা পুরাপুরি বিচার না করিয়া যাঁহারা কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাহা আবশ্যক ভাবে দেশের মধ্যে শ্রেণী বিরোধের ভাব জাগাইতেছেন কি না, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

পরমত সহিষ্ণুতা

সকল দিকেই আমরা বিপুল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। ইহার পশ্চাতে যে উদ্যম ও কর্ম্ম প্রচেষ্টা আছে, নানা দলে, নানা মতে এবং বিভিন্ন মুখী কর্ম্মে তাহার আত্মপ্রকাশ নিতান্তই স্বাভাবিক। আমাদের জাতীয় জীবনের নানা দিকে নানা প্রকারের ত্রুটি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের অগ্রগতির পক্ষে ইহার সকল গুলিরই সংশোধনের প্রয়োজন আছে। কোনও বিশেষ ত্রুটির দিকে যে কোন বিশেষ লোকের বা দলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, এবং তিনি বা তাঁহারা তাহার প্রতিকারের জন্য যে চেষ্টা বা কাজ করিবেন, ইহা খুবই সম্ভব। আবার একই জিনিষের প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন লোকের বা বিভিন্ন দলের পক্ষে বিভিন্ন প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন অন্যায় বা অসম্ভব নহে।

এরূপ অবস্থায় আত্ম কলহে অথবা পরস্পরের সহযোগিতার অভাবে যাহাতে আমাদের উদ্যম ও কর্ম্মশক্তির অপচয় না ঘটে, সে জন্য সকল দলের এবং সকল মতের লোককেই সাবধান হইতে হইবে।

কোন বিশেষ অবস্থার প্রতিকারের জন্য যাঁহারা কোন বিশেষ পন্থায় কোনও বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের দল, মত, পন্থা বা কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে, জাতির উন্নতি কল্পে অন্যান্য যে সকল লোক বা দল যে সকল কাজ করিতেছেন, সেই সকল কাজ যদি যুক্তির দ্বারা কোন-না-কোন প্রকারে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত অথবা সমর্থিত হইতে পারে তবে চিন্তা, কথা এবং সহানুভূতির দ্বারা সব সময়েই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে; নিজ দল বা মতের ক্ষতি না করিয়া সম্ভবমত সহযোগিতা করিতে হইবে এবং অন্তরে ও বাহিরে সব সময়েই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে হইবে।

পরমতে অসহিষ্ণুতা এবং দলের বাহিরের লোককে শ্রদ্ধা করিবার ক্ষমতা অথবা অভ্যাসের অভাব আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই। এই মনোভাব নিন্দনীয় এবং আত্মঘাতী। ইহা প্রবল হইলে, দেশের উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে এবং অপরের নিজমত পোষণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। এমনও দেখিয়াছি, যাঁহারা কিছুই করিতেছেন না, অথবা যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কার্য্যে বাধা দিতেছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও প্রতিদ্বন্দীদলের (?) কর্ম্মীদের উপর অশ্রদ্ধার ভাব প্রবলতর হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে লোকচক্ষে হেয় করিবার ন্যায় ও অন্যায় সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোনও দল বা লোকের প্রতি আসক্তি অপেক্ষা সমগ্র জাতির উন্নতির জন্য যাঁহারা অধিকতর আগ্রহান্বিত, তাঁহারা কথাগুলি, আশা করি, ভাবিয়া দেখিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ ইসাক

এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, পারস্য ভাষা ও সাহিত্য সেবার জন্য পারস্যের শিক্ষামন্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ মহম্মদ ইসাককে 'নিশান-ই-নিমি' পদক পুরস্কার দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় এই সম্মান প্রাপ্ত হন নাই।

মিঃ ইসাক পারস্যের আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে 'সুখান-বরণ-ই-ইরাণ-দার-আসব-ই-হাজির' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এই উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন।

পারস্যের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে। জাতি, ধর্ম্ম, এবং সংস্কৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই এই যোগ বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল। মধ্যে যখন সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডেই অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছিল, সেই সময় আমরা পরস্পরকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতাই আজ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সংযোগসূত্র। এই নূতন সভ্যতার আলোকে পরস্পরকে আমরা আবার নূতন করিয়া নূতন রূপে চিনিতেছি। প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত কৃষ্টিগত যোগাযোগ আমাদের মধ্যে মৈত্রীর সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিবে ও বর্দ্ধিত করিবে।

পারস্যের বর্ত্তমান রাজা, রিজা সাহ রবীন্দ্রনাথকে পারস্যে নিমন্ত্রণ করিয়া এবং শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক প্রেরণ করিয়া পূর্ব্বেই ভারতের প্রতি তাঁহার বন্ধু মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যেমন পার্শীর চর্চ্চা হয়, পারস্যেও তেমনই হিন্দি, বাংলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষার চর্চ্চার ব্যবস্থা করিলে ও ইহা শিখিবার জন্য ছাত্রদের যথোপযুক্ত উৎসাহ প্রদান করিলে, উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইবে।

সন্ত্রাসবাদ ও দমন আইন

বাঙ্গালী তরুণদের একাংশের মধ্যে [সম্ভবতঃ সংখ্যায় ইঁহারা অধিক হইবেন না] সন্ত্রাসবাদ যে কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল, স্বদেশহিতৈষী বাঙ্গালীরই চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। কোন লোকেরই পক্ষে ইহা ইচ্ছা না করাই স্বাভাবিক যে, তাঁহার পুত্র, ভ্রাতা অথবা কোন আত্মীয় এরূপ কোন নীতিতে দীক্ষিত হইবেন বা এরূপ কোন কার্য্যে

লিপ্ত হইবেন, যাহাতে তাঁহারা বিপদাপন্ন হইতে পারেন, তাঁহাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে পারে এবং যাহার জন্য সমবেত ভাবে তিনি এবং তাঁহার অনেক আত্মীয়ের নানাবিধ ক্ষতি ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতে পারে। সকল পিতা-মাতা, অভিভাবক, এবং স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি এই প্রকার নীতি এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাহাতে দেশ হইতে দূরীভূত হয়, তাহার ইচ্ছা করেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী চেষ্টা করেন। তাহা হইলেও, ইহা দূর করিবার পন্থা সম্বন্ধে সরকারের সহিত দেশের লোকের মতভেদ রহিয়াছে।

দেশের অধিকাংশ চিন্তাশীল লোক মনে করেন, সৈন্য বিভাগের প্রবেশাদির ন্যায় সাহসিক কার্য্য করিবার, আইন ও ন্যায়সঙ্গত উপায় থাকিলে, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অত্যন্ত তীব্রভাবে অর্থাভাব ও কর্ম্মাভাব দেখা না দিলে, যুবকদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ব্যাপকতা লাভ করিতে পারিত না। শিক্ষিত যুবকদের জীবিকার উপায় অপেক্ষাকৃত সহজ হইলে যে, তাহাদের মধ্য হইতে সন্ত্রাসবাদ লুপ্ত হইতে পারিত তাহা লর্ড উইলিংডন ও অন্য অনেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষও স্বীকার করিয়াছেন।

দেশের সকল সংবাদপত্র, প্রধান ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নেতা এবং সকল প্রকার দমন আইনের বিরোধীরা এবং তীব্র সমালোচকেরা বার বার সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করিয়াছেন ও ইহার অনিষ্টকারিতার কথা বলিয়াছেন। আমরাও আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্য অনুসারে ইহার নিন্দা করিয়াছি ও ইহার ক্ষতিকর দিকগুলি উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোন প্রকার গুপ্তহত্যা বা ষড়যন্ত্র প্রভৃতি যে নিতান্ত ঘৃণ্য ও কাপুরুষোচিত, ইহা যে ভারতের চিরন্তন নীতি ও আদর্শের বিরোধী, কয়েক লক্ষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে সংগৃহীত অল্পসংখ্যক যুবকের এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নহে, আধুনিক মারণাস্ত্র সমূহ এবং আধুনিক রণনীতিতে শিক্ষিত সৈন্যদলের সম্মুখে ২।১ টি বোমা বা রিভলবার যে কিছুমাত্র ফলপ্রদ নহে, যে সকল যুবক অন্য দিক দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের কেহ কেহ যে সন্ত্রাসবাদের আওতায় আসিয়া নিজেদের ও দেশের ক্ষতির কারণ হইয়াছেন, একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছি। কোন হত্যা বা ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে যাঁহারা লিপ্ত আছেন তাঁহারা কঠোর দণ্ডভোগ করুন, ইহাও আমরা চাই। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চাই যে, শাস্তি দিবার পূর্ব্বে ইঁহাদের অপরাধ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান, সাধারণ আদালতে উপযুক্ত সঠিক সাক্ষ্যাদি গ্রহণের দ্বারা তাঁহাদের দোষ প্রমাণিত হউক এবং তাহাদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ও নিজেদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার সুযোগ প্রদান করা হউক। নহিলে, অনেক নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ লোকের লাঞ্ছনা ভোগ করিবার আশঙ্কা থাকে।

দেশের শান্তি ও কল্যাণের জন্য, রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের পথে বাধাহীন অগ্রগতির জন্য সর্ব্বোতোভাবে আমরা দেশ হইতে সন্ত্রাসবাদের উচ্ছেদ সাধন চাই। কিন্তু, এই উদ্দেশ্যে বাংলা কাউন্সিলে, সম্প্রতি যে আইন সমর্থিত হইল, তাহা বহুল পরিমাণে দেশের লোকের চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবে, ও অনেক নিরীহ লোকের নানাবিধ দুঃখ ও শাস্তিভোগ করিবার কারণ স্বরূপ হইবে বলিয়া এই আইনকে আমরা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করি।

বাঙলা কাউন্সিল ও নূতন আইন

সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে বাঙলা কাউন্সিলে দণ্ডবিধির যে নূতন সংশোধন হইল, তাহা ৬১—১৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। সন্ত্রাস দমনের জন্য সরকার যে প্রকার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা তাঁহাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রত্যাশিত হয় নাই। কাউন্সিল কর্তৃক ইহা পরিত্যক্ত হইলেও, রক্ষিত অতিরিক্ত ক্ষমতার বলে এই আইনকে কার্য্যকরী করা হইত,—ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

তাহা হইলেও, কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যেরা দেশ ও জনমতের প্রতিনিধি, একথা দেশের এবং বিদেশের লোকের পক্ষে ধরিয়া লওয়া অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। তাঁহাদের অধিকাংশের দ্বারা কোনও বিধি গৃহীত হইলে, তাহার

পশ্চাতে জনমতের সমর্থন আছে, এরূপ অনুমান করা নিতান্তই স্বাভাবিক। বাংলা কাউন্সিলের ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২৬ জন সদস্য মনোনীত; ইহার সহিত ১৮ জন ইউরোপীয় এবং ৩ জন ইঙ্গ-ভারতীয়কে ধরিলেও,—মাত্র ইঁহাদের দ্বারা কোন জনমতবিরোধী আইন গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে। অথচ, সমগ্র দেশের জনমত যে এই আইনের বিরুদ্ধে ছিল, সম্ভবতঃ তাহা সপ্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এই আইনের পক্ষে যে সকল নির্ব্বাচিত সদস্য ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর প্রতি কি প্রকার সুবিচার করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় তাঁহারা অবগত আছেন।

শ্রীযুক্ত এন-কে-বসু প্রমুখ যে ক্ষুদ্র দলটি ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁহারা যে প্রকার ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন,—আইনটিকে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও ভাল করিবার জন্য যেরূপ অবিরত নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহার সকল মন্দ দিক যেরূপ দক্ষতার সহিত উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা কালে, খালিফা সুজা-উদ্দিন সিনেট সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে অন্তত অর্দ্ধেক যাহাতে মুসলমান হন, এরূপভাবে সিনেট পুনর্গঠিত হওয়া উচিত।

একজন শিখ-সদস্য প্রস্তাব করেন যে, সিনেটের এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব শিখদিগের পাওয়া উচিত।

এই দুইটি প্রস্তাবই অল্প ভোটাধিক্যের সাহায্যে পরিত্যক্ত হইলেও, ইহা তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচায়ক।

ডাঃ লুকাসের যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত মৃদু হইলেও, এবং তাহাতে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ না থাকিলেও, তাহা সমানই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ হইতে উদ্ভূত এবং তাহা সমভাবেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়িয়া তুলিবে। অথচ ১৯২৪ সালে এই ডাঃ লুকাস্‌ই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিরোধী প্রস্তাব আনিয়াছিলেন।

তদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের অংশ নির্ণয় যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেশে কোন্ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কত, তাহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ বিচার করা সঙ্গত হইবে না।

যাহাদের অর্থে, চেষ্টায় ও আত্মত্যাগে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান-গুলিতে অধ্যয়ন করে, তাহাদের সাম্প্রদায়িক অনুপাত অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

১৯৩২ সালে সিনেটের ২৪ জন হিন্দু সদস্যের মধ্যে চ্যান্সেলর কর্তৃক মাত্র ৮ জন মনোনীত হইয়াছিলেন এবং ২৪ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে ২০ জন চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত হন।

হিন্দু সিনেটরদের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইয়া অন্যান্য সংখ্যা পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান
১৯২৭	৩০	২১	২৮
১৯৩২	২৪	২৪	৩০

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু মুসলমানের আরও ২।১টি তুলনামূলক হিসাব :—

	হিন্দু	মুসলমান
১৮৮৪-১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত মোট গ্রাজুয়েট	১১,৫৪০	৪,৩২১
১৯৩২ সালের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা	১৭,৬৪১	১০,৯৮২
১৯৩১ সালে পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে ফীঃ স্বরূপে প্রাপ্ত টাকা	৩,৭১,৩১২,	২,০৭,১৬৭
১৯৩২ সালের রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট	৯৪১	৯১
হিন্দু বা মুসলমান পরিচালিত স্কুল	১০২	৪২
ঐ কলেজ	১০	২

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা

একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যাঁহারা বাস করেন, বর্ত্তমানে জাতি বলিতে আমরা তাহাদিগকে বুঝিতেছি। সাধারণতঃ ইঁহাদের সকলের স্বার্থই অভিন্ন এবং এই মিলিত স্বার্থকে আমরা জাতীয় স্বার্থ বলিয়া থাকি। একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করিয়া ধর্ম্ম বা অন্য কোন কোন বিষয়ে যাঁহারা পৃথক পৃথক কতকটা স্থায়ী দলের অন্তর্গত তাঁহারা সম্প্রদায় নামে অভিহিত হন। একই দেশের অন্তর্গত সম্প্রদায়গুলির জাগতিক স্বার্থ প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বার্থ হইতে পৃথক বা তাহার বিরোধী হইতে পারে না। কারণ, সকল লোকের এবং সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থই জাতীয় স্বার্থ। কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা দলের প্রকৃত স্বার্থ (কল্পিত নহে) যদি অন্য কোন বিশেষ দলের দ্বারা প্রভাবিত সরকারের কার্য্যে ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে, সেই কার্য্য জাতীয় স্বার্থ ও শক্তিকেই আঘাত করে। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া সকল সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোকেরই তাহাতে বাধা প্রদান করা উচিত। কিন্তু, ব্যাপার যখন এই প্রকার স্বাভাবিক থাকে না, বিভিন্ন সম্প্রদায় যখন পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হয়, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মনোভাব যখন এই হয় যে, অপর সম্প্রদায়গুলিকে কোণঠাসা করিয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে তখন এই কৃত্রিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থ জাতীয়তা এবং জাতীয় সংহতিকে নষ্ট করে। আমাদের মধ্যে জাতীয়তা এখনও ঠিক গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া, আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব আরও অনেক অধিক ক্ষতিকর। আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব সর্ব্বক্ষেত্রে জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধার সৃষ্টি করিতেছে।

আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনকে এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে হইলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ...্য দিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। সেখানেই আমাদের একমাত্র আশা। কাজেই অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতিকর প্রভাব অনেকটা বর্ত্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতার ফল দূর ভবিষ্যতের মধ্যেও প্রসারিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাঁহারা শুধু বর্ত্তমান নহে, জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও বাধাসঙ্কুল করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমানদিগের স্বার্থ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের বাঙ্গালীরই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও গৌরবের বস্তু। ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর শিক্ষাবিধানের, সকল কৃতী বাঙ্গালীকে সমান সুযোগ প্রদানের অপক্ষপাত ব্যবস্থা এখানে থাকিবে, ইহা সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের ধর্ম্মগত বা জাগতিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিলে, অথবা পক্ষপাতিত্ব দেখাইলে, তাহা নিঃসন্দেহ নিন্দনীয় হইত। কিন্তু, বাংলা কাউন্সিলে আলোচনা কালে, যে সকল মুসলমান সদস্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের স্বার্থ অবহেলা করিবার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এরূপ কোন দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া সিনেটে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যাল্পতার জন্য ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সমর্থনযোগ্য মনোভাব নহে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ রহমান বলেন, মুসলমানদিগের প্রয়োজন, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না। কিন্তু, তিনিই আবার বলিয়াছেন, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি জনসাধারণের জীবন, প্রয়োজন এবং চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহা সাধারণের চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই এবং এই প্রদেশের জীবন ও চরিত্রের উন্নয়নে প্রত্যাশিত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে যদি শেষের কথাগুলি সকলের পক্ষেই সত্য হয়, তাহা হইলে মুসলমানদিগের বিশেষ অভিযোগের আর কিছু থাকে না।

বর্ত্তমানে ১০০ জন সিনেটরের মধ্যে ২০ জন মুসলমান। অথচ, ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন হিন্দু এবং ১২ জন মাত্র মুসলমান।

এই কথার উত্তরে খান্ বাহাদুর মমিন বলেন, মুসলমানদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব না থাকায়, এরূপ ঘটিয়াছে। এই যুক্তি আমরা অনুসরণ করিতে পারি নাই। প্রতিনিধিত্বের সাম্প্রদায়িক দাবী যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে এই কথা বলা হয়ত কতকটা শোভন হইতে পারিত যে, অমুক সম্প্রদায়ের এত সংখ্যক ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, অথচ, তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজনের (?) দিকে দৃষ্টি রাখিবার মত উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি সেই সম্প্রদায় হইতে গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু, কোন সম্প্রদায়ের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে থাকিলে, তবে, সেই সম্প্রদায় হইতে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে, এমন অদ্ভুত এবং অসম্ভব কথা আমরা আর শুনি নাই। কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বা তদন্তর্গত স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসংখ্যা দেখিয়া, তবে নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসংখ্যার অনুপাতে সেই সম্প্রদায় হইতে ছাত্র আসিতে থাকে, এরূপ ইঙ্গিত নূতন এবং মৌলিক বটে।

হিন্দুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়কে কোন বিশেষ সুবিধা বা সুযোগ দানের নিমিত্ত নহে। তাহার দ্বারা বাঙ্গালী মাত্রেই উপকৃত হইলে, তাঁহাদের দানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হইবে। তাহা হইলেও, কোন সম্প্রদায় নিজেদের জন্য বিশেষ কোন দাবী করিতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহারা অর্থের দ্বারা কতটা সাহায্য করিয়াছেন, তাহাও দেখান আবশ্যক।

গত পাঁচ বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয় ১৬ লক্ষ টাকা দানস্বরূপে পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা একজন খৃষ্টান ভদ্রলোক দিয়াছেন এবং মুসলমানদের নিকট হইতে মাত্র ৬ শত টাকা পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা সহর ও বাংলা ভাষা

কলিকাতার ১১,৯৬,৭৩৪ জন অধিবাসীর মধ্যে অন্ততপক্ষে ৫০টি ভাষা প্রচলিত এবং ইহার মধ্যে বাংলা ভাষার সংখ্যা ৬,৪৮,৪৫১ জন মাত্র। অর্থাৎ কলিকাতা বাংলার সহর হইলেও বাঙ্গালীর সহর নহে।

কলিকাতা যখন ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, তখন ইহার উপর সমগ্র ভারতবর্ষেরই একটা দাবী ছিল, এবং ইহার সার্ব্বজনীনত্বে বাঙ্গালীদের ততটা ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ থাকিত না। কিন্তু, খুব বড় সহর হইলে, এবং বাণিজ্য, বিদ্যা ও দেশের নানা অংশের সহিত যোগাযোগের বড় কেন্দ্র হইলে, সেখানে নানাদেশের লোকের সমাগম স্বাভাবিক। এইজন্য সব বড় সহরেরই কতকটা সার্ব্বজনীনত্ব আছে। কিন্তু, বাঙ্গালীরা যদি শারীরিক শ্রমে, ব্যবসায়ে, দক্ষতাসাপেক্ষ নানাবিধ শ্রম শিল্পে অধিকতর পটু হইতেন এবং ইহার অনেক কার্য্যে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁহাদের থাকিত, তাহা হইলে, কলিকাতা সহরে বাঙ্গালীর সংখ্যা আরও বেশী হইত এবং অন্য প্রদেশ বা দেশের লোকের সংখ্যা স্বভাবতই কম হইত।

অন্যদেশ বা প্রদেশ হইতে যে সকল লোক বাংলায় আসেন, এবং এখানে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী হইলেও দীর্ঘ দিন বাস করেন, তাঁহাদের অত্যন্ত বেশীর ভাগ লোকের উদ্দেশ্য হইতেছে অর্থোপার্জ্জন। কাজেই, বাঙ্গালীদের, তাঁহাদের নিকট বিশেষ কিছু ঋণ নাই; কিন্তু, যে-বাংলা হইতে তাঁহারা অর্থশোষণ করিতেছেন, তাহার প্রতি প্রতিদান স্বরূপেও তাঁহাদের কিছু কিছু কর্ত্তব্যের কথা অন্ততঃ অস্বীকার করা যায় না। ইহার মধ্যে, বাংলার শিক্ষার ধারাকে তাঁহারা পুষ্ট করিবেন, ইহার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিবেন, এ আশা করা অন্যায় নহে। অন্ততঃ ইহার শিক্ষাবিধানের মধ্যে নিজ নিজ ভাষা চালাইবার চেষ্টা করিয়া যে জটিলতার সৃষ্টি করিবেন না, এটুকু সহজেই আশা করা যাইতে পারে। বাংলা একমাত্র প্রদেশ যেখানে ভিন্ন প্রদেশ ও দেশবাসীরা স্থানীয় ভাষা না জানিয়াও কোন প্রকার অসুবিধায় পতিত হন না, অথবা যেখানে এই সকল অবাঙ্গালীদের শিক্ষার জন্য বাংলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষার মধ্যবর্ত্তিতার কথা উঠিতে পারে। রায় বাহাদুর ডাঃ সুরেশচন্দ্র সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা কর্পোরেশনকে কয়েকটি পরামর্শ প্রদান করেন; তাহার মধ্যে তিনি বলেন, "বাংলায় প্রতি একহাজার লোকের মধ্যে

নব্বশত নিরনব্বই জনের মাতৃভাষা বাংলা, এখানকার শিক্ষার বাহন বাংলা হওয়া উচিত। যদি অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাস করিবার জন্য অথবা জীবিকার্জ্জনের জন্য লোক বাংলায় আসে এবং আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে, তাহাদের ছেলেদের শিক্ষা দিতে চায়, তবে তাহাদিগকে, **ছেলেদের বাংলায় শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।** বর্ত্তমানে আমাদের স্কুলগুলিতে বিভিন্ন ভাষার এরূপ অদ্ভুত মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পৃথিবীর আর কোথায়ও একদিনের জন্যও থাকিতে পারিত না।... ......লণ্ডন অপেক্ষা অধিকতর সার্ব্বজনীন সহর পৃথিবীতে আর নাই। অন্যান্য জাতির লোকের কথা বাদ দিলেও, লণ্ডনে হাজার হাজার স্কটস্‌মেন ও ওয়েল্‌সমেন বাস করেন। তবুও, ইহার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার বাহন স্বরূপে ইংরাজী ব্যতীত অন্য ভাষা প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব, লোকের নিকট হইতে উপহাস লাভ করিবে। শুধু মাত্র আর্থিক দিক দিয়া নহে, **জাতীয়তার দিক হইতেও ভাষার সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষভাবে ক্ষতিকর।"**

বাঙ্গালীরা আত্মনাশের পরিবর্ত্তেও অপরের স্বার্থরক্ষা করিবার মত ঔদার্য্য কোন দিন হারান নাই; কাজেই, ডাঃ সরকারের এই প্রস্তাব যে কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা বর্ত্তমানে কার্য্যোপযোগী মনে করিবেন না, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

সরকারের সম্মতি

প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহন প্রধানতঃ বাংলা করিবার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে গৃহীত প্রস্তাবের মূলনীতিতে সরকার এতদিন পরে সম্মতি জানাইয়াছেন। এই ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য শীঘ্রই একটি বৈঠক আহূত হইবে।

প্রবেশিকা এবং শিক্ষার উচ্চ বিভাগে শিক্ষার বাহন বাংলা করিবার আবশ্যকতার কথা আমরা ইহার পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। প্রবেশিকা পর্য্যন্ত আংশিকভাবেও এই নীতি অনুসৃত হইলে, আমাদের ছাত্রসমাজের উপর তাহার সুফল দেখা যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান সমিতির সুপারিশ অনুসারে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, দশবৎসরের মধ্যে স্কুলে ইংরাজী ব্যতীত সকল বিষয় দেশীয় ভাষার সাহায্যে পড়াইবার ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বিভাগেও অনেক বিষয় হিন্দীতে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্মিলনেও শিক্ষার প্রাথমিক ও মধ্যবিভাগে দেশীভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ

আমাদের জাতীয় জীবনের নানাদিকে উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। দেশে জাগরণের ঢেউ যখন প্রথম আসিয়াছিল, সমাজের সর্ব্বস্তরে যখনও তাহা ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে নাই, তখন আমাদের কর্ম্ম ও চিন্তার ক্ষেত্র শুধুমাত্র সহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। আশানুরূপ না হইলেও, বর্ত্তমানে এই নূতন চিন্তা ও নূতন ভাব নানা ছোটখাট প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া সমগ্র দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র সংবাদ আদান প্রদানের ভাল ব্যবস্থা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতার অভাবে এই সকল প্রচেষ্টার পূর্ণপরিচয় সাধারণের সমক্ষে ঠিকভাবে উপস্থিত হয় না। এই সকল প্রচেষ্টার সহিত সংযুক্ত কর্ম্মীরা দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে যেসকল চিন্তা করিতেছেন, তাহাও নানাকারণে পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতিতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইতেছে না।

সম্প্রতি যশোরের অন্তর্গত পাঁজিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উৎসব সভায় দেশের কথার লেখকের উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এখানে বালিকারা নানাবিধ ক্রীড়া, ব্যায়াম এবং আবৃত্তি প্রভৃতিতে যে প্রকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, একটি গ্রাম্য স্কুলের পক্ষে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণে

মেয়েদের শিক্ষার আদর্শ, বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের সহিত শিক্ষার বৈষম্য, এবং শিক্ষা ও মেয়েদের স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রতিধানযোগ্য ও চিন্তা-উদ্দীপক।

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ। মেয়েরা যাহাতে সুমাতা এবং সুগৃহিণী হইতে পারেন, স্বামীর অধিকতর উপযুক্ত সহচরী হইতে পারেন, তাহাই মাত্র মেয়েদের শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য এই কথা আমরা অনেকে মনে করিয়া থাকি। অথচ, যদি বলা যায় যে, পুরুষদের শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য সুপিতা হওয়া বা স্ত্রীর উপযুক্ত সহচর হওয়া, তাহা হইলে তাহা সকলের নিকটই নিতান্ত হাস্যকর মনে হইবে। সভাপতি মহাশয় এদিকে বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং মেয়েদের শিক্ষাকে দাম্পত্য জীবনের ছাঁচে ঢালাই করিবার মনোবৃত্তিকে নিন্দা করেন।

স্ত্রীশিক্ষার সহিত স্ত্রীস্বাধীনতার সম্পর্ক যে অবিচ্ছেদ্য একথা সভাপতি মহাশয় বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলেন এবং যাহাতে আমাদের মনের "ভীতিপুষ্ট" দুর্ব্বলতা দিয়া, স্ত্রীস্বাধীনতার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া পরোক্ষভাবে স্ত্রীশিক্ষাকে বাধা না দিই, সেজন্য অনুরোধ করেন।

পাট রপ্তানি শুল্কের অর্দ্ধাংশ

পাট রপ্তানি শুল্কের প্রায় অর্দ্ধাংশ, ১৬৭ লক্ষ টাকা, ১৯৩৪-৩৫ বাজেটে বাংলাকে প্রত্যর্পণ করায়, বাংলার প্রতি বহু-বিলম্বিত সুবিচারের অর্দ্ধেকটা করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে বাংলা সরকারের বর্ত্তমান ঘাট্তি পূরণ হইল বটে, কিন্তু, বাংলার জাতিগঠনকর বিভাগগুলিকে উপবাসীই রাখিতে হইল। পাট রপ্তানি শুল্কের সমগ্র টাকাটা পাইলে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য হয়ত কিছু ব্যয় করিতে সরকার বাধ্য হইতেন।

পাট রপ্তানি শুল্কের উপর বাংলার দাবীর ন্যায্যতা গোলটেবিল বৈঠকে এবং সিলেক্ট্ কমিটিতে বাঙ্গালী প্রতিনিধিরা বিশেষ দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছিলেন। হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

যে করভার শুধুমাত্র কোন একটি প্রদেশের উপর পতিত হয়, ন্যায়তঃ সেই কর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হইতে পারে না। পাটের দর এবং চাহিদা যখন খুব বেশী ছিল, অর্থাৎ পাটের উপর যে শুল্ক বসিত, ক্রেতারা যখন সেই শুল্কের জন্য বর্দ্ধিত মূল্যে পাট ক্রয় করিতেন, তখন প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদকদিগের উপর ইহার সব বোঝা পড়িত না। কিন্তু, বর্ত্তমানে পাটের চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন বেশী হওয়ায়, পাটের মূল্য অসম্ভবরূপে নামিয়া গিয়াছে এবং প্রচুর মাল মজুত থাকায় ক্রেতারা একটা নির্দ্দিষ্ট দর অপেক্ষা অধিক মূল্যে পাট কিনিতেছেন না। কাজেই, এই শুল্ক বর্ত্তমানে উৎপাদকদিগকে দিতে হইতেছে। এই হিসাবে পাটরপ্তানি শুল্কের সবটাই বাংলার প্রাপ্য। তদ্ব্যতীত, পাটের জন্য বাঙ্গালীদের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। অর্থের দ্বারা হয়ত তাহার সম্পূর্ণ পূরণ সম্ভব নহে; তবে, সব টাকাটা পাইলে, হয়ত আংশিক পূরণ অসম্ভব হইত না।

বাংলা সরকারের বাজেটে প্রতি বৎসরই ঘাটতি পড়িয়া আসিতেছে। এই দেনা বাংলাকে বহন করিতে হইবে; আগামী বৎসরে ইহার পরিমাণ ৭ কোটি টাকায় পৌঁছিবে। বাংলা সরকারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলে একথা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, ইহা বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলার উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে।

নববর্ষের শুভ মহরতে নানাবিধ মিষ্টান্নের বিরাট আয়োজন!
বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
১১৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট (পোষ্ট অফিসের সম্মুখে) কলিকাতা। ফোন ৩১৪৭ বড়বাজার

বাংলা এই টাকাটা পাওয়ায়, সর্ব্বাপেক্ষা বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে বম্বেতে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন, যদি সমগ্র ভারতের উপর বোঝা চাপাইয়া, বাংলাকে সাহায্য দেওয়া হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও, বম্বের ভাগে ২০ লক্ষের উপর টাকা পড়ে নাই। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, কে উপকৃত হইবে, তাহা না ভাবিয়াই বাংলা বহু বোঝা বহন করিয়াছে। ভারতে উৎপাদিত বস্ত্রের প্রধান খরিদ্দার যখন বাংলা ছিল এবং বাংলায় যখন বস্ত্র উৎপাদিত হইত না বলিলেই হয়, তখনও কার্পাস শিল্প সংরক্ষণের জন্য বাংলা বম্বের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে। বস্ত্রের উৎপাদন শুল্ক উঠাইবার আন্দোলনে বাংলা অপেক্ষা বম্বেকে আর কেহ অধিক সাহায্য করে নাই। ইহাতেও কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হ্রাস পাইয়াছিল, এবং তাহার ফলে, অন্যান্য প্রদেশকে বর্দ্ধিত করভার বহন করিতে হইয়াছিল। সে সময় বাংলা অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই।

বাংলা অপেক্ষা বম্বের রাজস্ব অনেক বেশী; লোক সংখ্যার অনুপাত ধরিলে, ইহা আরও অনেক অধিক হয়। বম্বে সরকার প্রদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য বাংলা সরকার অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করিতে পারেন। কিন্তু, বাঙ্গালীরা হীনস্বাস্থ্য ও মূর্খ হইয়া থাকিলে ভারতের এবং ফলে বম্বেরও লাভ হইবে না।

জার্ম্মানিতে সংস্কৃতের আদর

মাদ্রাজের পণ্ডিত কাশী কৃষ্ণকামাচার্য্যের কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তকের জার্ম্মান-অনুবাদের জন্য জার্ম্মানির কয়েকজন অধ্যাপক উক্ত পণ্ডিতের নিকট অনুমতি চাহিয়াছেন।

জার্ম্মানির স্কুল কলেজে পড়াইবার উপযোগী একটি সংস্কৃত পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য পণ্ডিত কৃষ্ণাচার্য্যের বিশেষ খ্যাতি আছে। হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে ইঁহার মতামত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

নানা কথা

ইষ্ট বেঙ্গল সুগার মিল্‌স্‌ লিমিটেড

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলে বিখ্যাত কিন্তু এমন দিন এসেছে যখন আর শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করে থাকলে চল্‌বে না; কল কারখানাও চাই। যে সব জিনিষ আমরা বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করি অথচ অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসেই যা দেশেই উৎপন্ন করা সম্ভব সে সব জিনিষের মধ্যে চিনি অন্যতম। সুখের বিষয় চিনির কারখানা সম্প্রতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এখনও অনেকগুলির প্রয়োজন। পরিষ্কার সাদা চিনি আমরা বছরে আমদানি করি প্রায় ন দশ লক্ষ টন; চিনির কারখানা আজ পর্য্যন্ত দেশে যতগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে চিনি উৎপন্ন হয় মাত্র তিন লক্ষ টন। এতেই বোঝা যায় দেশীয় চিনির কারখানার প্রয়োজন এখনও কত বেশী।

আমরা বিশেষ করে ইষ্ট বেঙ্গল সুগার মিল্‌স্‌ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠায় আনন্দিত হয়েছি তার কারণ ভারতবর্ষে চিনির কারখানা কয়েকটি থাকলেও বাংলাদেশে এই প্রথম। অথচ চিনি উৎপাদনে যে সব সুবিধাজনক ব্যবস্থা তা' অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম নয়। বাংলা দেশে ইক্ষু চাষের জমি প্রায় দু' লক্ষ একর হবে, অন্যান্য প্রাকৃতিক সুবিধাও অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশে কম নয় বরং বেশী। অতএব আশা করা যায় অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কম খরচেই বাংলা দেশে চিনির উৎপাদন সম্ভব হবে। আমরা আশা করি বর্ত্তমানের অর্থের অনাটনের দিনেও এই কারখানার উন্নতির পথ সুগম হবে। কর্ত্তৃপক্ষেরা সকলেই ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ভদ্রলোক। আমরা প্রার্থনা করি শ্রীযুক্ত রমানাথ দাসের সুদক্ষ পরিচালনায় এই কারখানার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হো'ক।

পরলোকে কে-এন্‌ চৌধুরী

প্রসিদ্ধ ব্যরিষ্টর ও শিকারী শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরীর সহসা মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হ'য়েছি। তাঁর মত সুদক্ষ শিকারী বাংলাদেশে বোধ করি আর কেউ ছিল না। শিকারের সময় কোন্‌ দিকে কত বিপদ এড়িয়ে চল্‌তে হয়, এ বিষয়ে তিনি সুচিন্তিত বিশদ প্রবন্ধ লিখে শিকারীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছিলেন। নিয়তির এমনই পরিহাস, তাঁকেই শেষ পর্য্যন্ত আহত ব্যাঘ্রের কবলে প্রাণ দিতে হোলো!

মৃত্যুর সময় কুমুদনাথের বয়স হয়েছিল প্রায় সত্তর। এই বয়সে শিকারে প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে যে দৈহিক ও মানসিক শক্তির পরিচয় আছে তা' সত্যই বিস্ময়কর। আমরা কুমুদনাথের আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা নিবেদন করি।

নিখিলবঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ-মহাসম্মেলন

বিগত ১৬ই চৈত্র হ'তে তিন দিন কলিকাতা এলবাট হলে নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়ে গেছে। সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, এব মূল সভাপতির আসন অধিকার করেছিলেন কবিরা শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়। কি উপায় অবলম্বন করলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আয়ুর্ব্বেদী প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেত উন্নতি সাধন হ'তে পারে এ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রাধান্য লা করতে পারে তদ্বিষয়ে গবেষণা এবং প্রচেষ্টার জন্য এক নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদ সমিতি আছে। এতাবৎ উ সমিতির ২৪টি অধিবেশনের মধ্যে অন্তত সাতটি অধিবেশ

সভাপতির আসন বাঙলা দেশের কবিরাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। সুতরাং নিখিল ভারত সমিতির কার্য্যে বাঙলা দেশের দান যে অল্প নয় সে কথা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ এবং পাঞ্জাবে যেমন প্রাদেশিক আয়ুর্ব্বেদীয় সমিতি সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে বাঙলা দেশে এ পর্য্যন্ত তা হয় নি। সেই অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নিখিলবঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনের সৃষ্টি এবং প্রথম অধিবেশন। এই সম্মেলনের যাঁরা প্রধান উদ্যোক্তা তাঁরা বহুবিখ্যাত বিচক্ষণ কবিরাজ। সুতরাং তাঁদের নেতৃত্বে সম্মেলনটি যে অভিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে।

এক সময় সমস্ত জগতের মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্রে ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদ প্রাধান্য ভোগ করেছিল। নানা কারণে, বিশেষত রাজপৃষ্ঠ-পোষকতার অভাবে এই চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক অবনতি ঘটেছে। এই জাতীয় জাগ-রণের যুগে যদি এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টির পুনরুদ্ধারের প্রতি যথোচিত যত্ন না নেওয়া হয় তা' হলে গভীর পরিতাপের বিষয় হবে। আয়ুর্ব্বেদের মূল গ্রন্থ অনেকগুলি, সম্ভবত পঞ্চাশের কম নয় এবং প্রায় সবগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করতে হলে সংস্কৃতের জ্ঞান অনিবার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমানে সাধারণত যে সকল ছাত্র কবিরাজী শিখে তাদের অধিকাংশের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয় বলে কবিরাজী শিখবার পূর্ব্বে দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং আমাদের মনে হয় সংস্কৃত ভাষায় বিচক্ষণ কবিরাজগণের দ্বারা মূল সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলি নির্দ্দোষ ভাবে বাঙলা ভাষায় অনূদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা আশা করি নিখিলবঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করবেন।

সন্তরণ-বীর প্রফুল্ল ঘোষের নূতন কৃতিত্ব—

বিগত ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৩ রেঙ্গুন রয়েল লেক্‌স্-এ ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট নিরবসর সাঁতার কেটে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ সহন-সন্তরণে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন একথা সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি তিনি সন্তরণ বিষয়ে একটি নবতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গত ৩১শে মার্চ্চ শনিবার তাঁকে একটি ইউরোপীয়ান্ সার্জ্জেন্ট্ দু হাত একত্র করে হাত-কড়া লাগিয়ে দেয়, তৎপরে তিনি অপরাহ্ন ৫টা ৩৪ মিনিটের সময় ঐ অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা নিরবসর সাঁতার কাটবার প্রতিশ্রুতিতে

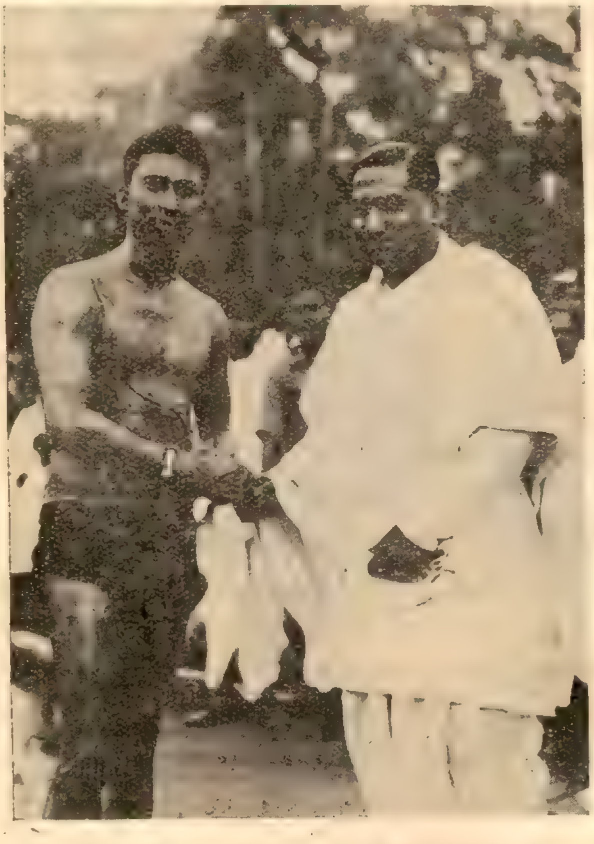

জলে অবতরণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর সঙ্গে প্রফুল্লকুমারের করমর্দ্দন।
(ফটো গ্রহীতা শ্রীযুক্ত বি, সি, চম্পটীর সৌজন্যে)

হেদুয়ার জলে অবতরণ করেন। সে-সময় সেখানে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু মহাশয় এবং

হাত-কড়া বদ্ধ অবস্থায় প্রফুল্লকুমার সাঁতার দিতেছেন।
(ফটো-গ্রহীতা শ্রীযুক্ত বি, সি, চম্পটির সৌজন্যে)

আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পরদিন বৈকালে ৫টা ৪৪ মিনিটের সময় অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট হাতকড়া লাগিয়ে সাঁতার কাটবার পর বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং জল হইতে সিড়ি বেয়ে মঞ্চের উপর ওঠেন। সে-সময়েও মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রফুল্ল কুমারের সহিত করমর্দ্দন ক'রে সানন্দে তাঁর হাত-কড়া উন্মোচন করেন। এই ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রফুল্ল কুমার তাঁর স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পেয়ে রাজপথে বহির্গত হন।

যে কোনো সুদক্ষ সাঁতারুর পক্ষে দুই হাত একত্র আবদ্ধ করে একঘণ্টা কাল সাঁতার কাটা কঠিন ব্যাপার। সে অবস্থায় ২৪ ঘণ্টারও বেশী সময় সাঁতার কেটে প্রফুল্ল কুমার সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও আশ্চর্য্যতর কোন কীর্ত্তি সাধন করে তিনি সকলকে চমৎকৃত করেন জন সাধারণ এই সম্ভাবনায় উদগ্রীব হয়ে রইলো। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রফুল্লকুমারের দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং আশা করি অচির কাল মধ্যেই ইংলিশ চ্যানেলের শীতল জলরাশী তাঁর নিকট পরাভূত হবে।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষের সন্তরণ বিষয়ে তাঁর গুরু শ্রীযুক্ত শান্তি পাল বিচিত্রায় মাসে মাসে ধারাবাহিক যে প্রবন্ধ লিখছেন এবার প্রফুল্লকুমারের হাত-কড়ি সাঁতারের ব্যবস্থায় তিনি ব্যস্ত থাকায় বর্ত্তমান সংখ্যায় সেটি বাদ পড়ল। আগামী মাসে পুনরায় প্রকাশিত হবে।

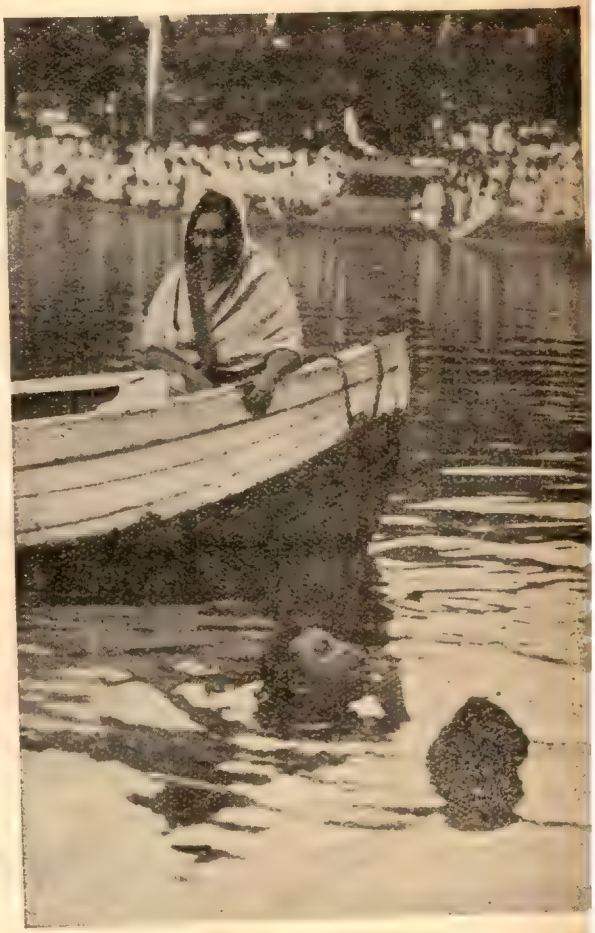

হাত-কড়া বদ্ধ অবস্থায় সাঁতার কাটিতে কাটিতে প্রফুল্লকুমারের সন্দেশ ভক্ষণ, নৌকায় শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী (ফটো গ্রহীতা শ্রীযুক্ত ভক্তকুমার ঘোষের সৌজ

কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলন

বিগত ১৫ই চৈত্র হইতে ১৯শে চৈত্র পর্য্যন্ত তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে ৪৬নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট কুমার সিং হলে 'কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের' দ্বিতীয় অধিবেশন হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এম্-এ, বি-এল, এম্-আর্-এ-এস, মহাশয় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং বিভিন্ন শাখাগুলির পৌরহিত্য করেছিলেন বাঙ্‌লা সাহিত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক। 'কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনে'র ক্রমোন্নতি দেখে আমরা সুখী হয়েচি। এবিষয়ে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উৎসাহ এবং প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য।

কর্ণওয়ালিস্ ইউনিয়ন্ ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী

এই পাঠাগারটি উত্তর কলিকাতায় ৬নং আর, জি, কর রোডে অবস্থিত। ১৮৯০ সালে পাঠাগারটি স্থাপিত হয়, সুতরাং এখন ইহার বয়ক্রম প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর। শুধু বয়সেই নয় পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা গৌরবেও এই পাঠাগারটি কলিকাতার সাধারণ পাঠাগারগুলির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পাঠাগার। সাধারণ পাঠাগারে শিশু-সাহিত্য এবং শিশু-পাঠকেরও একটা দাবী আছে একথা হৃদয়ঙ্গম ক'রে কর্ণওয়ালিস্ লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি শিশুবিভাগ খুলেচেন। বিগত ২রা এপ্রিল সমারোহের সহিত উক্ত শিশুবিভাগের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়েচে এবং সে উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেব রায় এম, এল, সি মহাশয়। শিশুচিত্তের জ্ঞানোন্মেষ সম্বন্ধে মুনীন্দ্রবাবুর গবেষণা কত বিস্তৃত তা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং উপস্থিতক্ষেত্রে সভাপতি নির্ব্বাচন যে বিশেষ সন্তোষজনক হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বহু সারগর্ভ তথ্যে এবং উপদেশে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ এবং পাঠাগারের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল শ্রীমানি মহাশয়ের লিখিত বিবরণী উপভোগ্য হয়েছিল। এই সাধু কার্য্যের জন্যে আমরা কর্ণওয়ালিস লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করছি এবং কলিকাতার ও বাঙলা দেশের অন্যান্য লাইব্রেরী, যাঁরা এ পর্য্যন্ত শিশুবিভাগের প্রতি মনোযোগ দেননি, তাঁদের এবিষয়ে কর্ণওয়ালিস্ লাইব্রেরীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে অনুরোধ করছি।

বেঙ্গল ইকনমিক কেমিক্যাল ওয়ার্ক্‌স্

আমরা বেঙ্গল ইকনমিক্ কেমিক্যাল্ ওয়ার্ক্‌স্ কর্তৃক প্রস্তুত 'ভৃঙ্গরাজ' এবং 'কেশল' তৈল দুটি উপহার পেয়েছি এবং ব্যবহার ক'রে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েচি। দুটি তৈলের মধ্যে 'ভৃঙ্গরাজ' তৈলের ভেষজগুণ অধিক, সুতরাং মস্তিষ্ক যাঁদের পীড়িত তাঁরা 'ভৃঙ্গরাজ' তৈল ব্যবহার ক'রে বিশেষ উপকার পাবেন। কিন্তু যাঁদের মস্তিষ্কের কোনো পীড়া নেই তাঁরা স্নানের সময় 'কেশল' তৈলটি ব্যবহার ক'রে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করবেন। তৈলটির সুমিষ্ট সৌরভ স্নানের বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত মনকে প্রফুল্ল রাখে। শিরোঘূর্ণনে 'ভৃঙ্গরাজ' তৈলের উপকারিতা প্রত্যক্ষ ক'রে আমরা আনন্দিত হয়েছি। বেঙ্গল ইকনমিক কেমিক্যাল ওয়ার্কসের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং প্রসার দেখ্‌লে আমরা সুখী হব।

ভ্রম-সংশোধন

গত চৈত্র মাসের নানা কথায় "বাঙ্‌লার বিশুষ্ক নদ-নদীর পুনরুদ্ধার" প্রসঙ্গে অনবধানতা বশতঃ একটি ভ্রম-প্রমাদ ঘটেছে। ইজিপ্টের যে ইরিগেশন্ এক্সপার্টের কথা উল্লেখ করা হয়েচে তাঁর নাম স্যর উইলিয়াম্ উইল্‌কক্‌স্ (Sir William Willcocks),—স্যর উইলিয়াম্ বেণ্ট্‌লী নয়। যে সময় স্যর উইলিয়াম্ উইলকক্‌স্ বাঙলা দেশে আসেন ডক্টর সি, এ, বেণ্টলী তখন বাঙলা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন।

আমাদের জনৈক পাঠক শ্রীযুক্ত অমলেশ ঘোষ এই ভ্রমটির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করায় আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ ডি-এস্ দাসগুপ্ত ডি-ই, ডি-এফ্ (প্যারী)

কলিকাতার দন্ত-চিকিৎসার ব্যবসা করে যাঁরা যশস্বী হ'য়েছেন, তাঁদের মধ্যে ডাক্তার ডি-এস্ দাশগুপ্ত অন্যতম। তিনি প্যারী নগরীতে সুদীর্ঘ চার বৎসরকাল দন্ত-চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছিলেন। দেশে ফিরে ১৮৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে এক আধুনিক উন্নত প্রণালীর দন্ত-চিকিৎসার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সম্প্রতি তিনি আধুনিক প্রণালীতে কয়েকটি রোগীর উচ্চ ও বক্র দন্ত উৎপাটন না করেও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ কৌশল তিনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত প্যারী নগরীতে অর্জ্জন করেছিলেন, এবং এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও লাভ করেছেন বিস্তর। তাছাড়া পাইওরিয়া প্রভৃতি যাবতীয় কঠিন দন্তপীড়া তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সারাইয়াছেন।

ডাক্তার দাশগুপ্ত প্যারী নগরীর ক্লিনিক দাঁতেয়ার ফ্রাঁসেজ (Clinique dentaire francaise) এ কিছুকাল কার্য্য করে বিশেষ প্রসংসা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে এসেছেন। আমরা আশা করি তাঁর সেই অভিজ্ঞতা দেশবাসীর বিশেষ উপকারে আস্‌বে। আমরা এই তরুণ দন্তচিকিৎসকের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ও উত্তরোত্তর যশ কামনা করি।

ইংলণ্ডে বাঙ্গালী ছাত্রের অসামান্য কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে সম্প্রতি ইংলণ্ড থেকে ফিরে বিহারে এ্যাসিষ্টেন্ট্ ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব কৃতী ছাত্র। সেখানকার বিহার কলেজ অফ্ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে তিনি আই-সি-ই এবং বি-সি-ই উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩২ সালে তিনি প্রিন্স্ অফ্ অয়েল্‌স্ স্কলারসিপ্ (Prince of Wales Scholarship) নিয়ে প্রাকৃটিকেল্ ট্রেনিংএর জন্যে ইংলণ্ডে যান্। মাত্র দেড় বৎসর কাল তিনি সেখানে ছিলেন। এই অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিনি সমুদয় বাঙ্গালী জাতির গৌরব বাড়িয়ে এসেছেন। A. M. S. E, M. R. San. I., A. M. I. San. E., S. I. Mech-E. Grad. I. Struct. E., A. M. Inst. M. & Cy. E., Stud. Inst. C. E. ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এই সাতটি উপাধিতে তিনি ভূষিত হয়েছেন। সম্প্রতি তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর।

শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়

লণ্ডন নগরীতে ১৯৩৩ সালে কংগ্রেস্ অফ্ এঞ্জিনিয়ার্স-এর সম্মেলনে তিনি যোগ দেন। সেই সম্মেলনে ভারতবাসী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র বক্তা। গিলফোর্ডের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার হিপ উড্ সাহেব (Mr. Hipwood) তাঁর অভিভাষণ পাঠ করবার পর হরিহর বাবু সে-সম্বন্ধে তাঁকে এমন প্রশ্ন করেন যে বিদ্বান্ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই তরুণ বাঙালী ছাত্রের প্রতিভা স্বীকার করে বলেন—"Mr Banerjee went too quickly through the detailed points he raised for me to be able to reply to them now, but I shall be pleased to let him have the exact delails."—

(Journal of the Institution of Sanitary Engineers) এই পত্রিকায় হরিহর বাবু সম্বন্ধে লিখেছে—"Mr. Banerjee who has had a distinguished career,...headed the list of successful candidates in the final examination of the degree of Bachelor of Civil Engineering.... He carries with him our best wishes for a successful career in India".

এসেক্স্ নগরীর Engineer's and Surveyor's Department of the Dagenham urban District Councilএর চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার হরিহর বাবুর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বলেছেন—"In summary I may state that Mr. Banerjee has given every indication of developing into an exceptionally skilled engineer. He has maintained the very high standard of his precursors in this scholarship. ...He has justified my attention and has certainly proved a credit to his Principal and Professors of the Bihar College of Engineering".

হরিহর বাবু যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। তাঁর পিতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় পাট্না কলেজের ভূতপূর্ব্ব ইংরাজীর অধ্যাপক। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ।

আমরা এই প্রতিভাবান্ বাঙ্গালী যুবকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ভগবান তাঁর সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

এডুকেশন গেজেট

আমরা এডুকেশন গেজেটের কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি পেয়েছি। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশিত করলাম।

"প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "এডুকেশন গেজেটের" নাম সুধী বঙ্গবাসী মাত্রই অবগত আছেন। বর্ত্তমান যুগে এদেশে শিক্ষার বিস্তার হওয়ার সময় হইতেই এডুকেশন গেজেট বাংলার শিক্ষা-ক্ষেত্রে সমাজের কল্যাণকর সমাচার-পত্ররূপে দেশ সেবার কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। এক সময় উক্ত পত্রিকা যেরূপ প্রভাবশালী ছিল এবং নব বঙ্গ-সংগঠন কার্য্যে যে সহায়তা দান করিয়াছিল দেশের প্রবীণগণ তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। ইহাও সুবিদিত যে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পূজ্যপাদ ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে এই পত্রিকা দীর্ঘকাল যাবৎ সুপরিচালিত হইয়াছিল। তৎপর বহুদিন নানা বিপদ্পাতের মধ্য দিয়া এডুকেশন গেজেট আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—সমাজ সেবার ব্রতে এবং ভারত-ধর্ম্মের আদর্শ সংরক্ষণে কোন অবস্থাতেই কুণ্ঠিত হয় নাই।

বর্ত্তমান সময় দেশে নানা দিকে বিপুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। নানা জটিল প্রশ্ন এখন দেশবাসীগণের সম্মুখে উপস্থিত। শিক্ষার প্রশ্নই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিতে হইবে। শিক্ষার সমুচিতরূপ বিস্তার লাভ হইলে, এবং সুশিক্ষার আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলে, জাতীয় আর সমুদয় প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হইয়া যাইবে। বঙ্গে আজকাল নানা বিষয়ে নিয়োজিত নানাবিধ সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে; অনেক নূতন নূতন ভাবের খেলা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও নূতন কাগজ বা ভাব তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে আমরা এডুকেশন গেজেটখানিকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার অনুযায়ী একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষার সহায়ক যন্ত্ররূপে পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সাধারণ শিক্ষানীতির আলোচনার সহিত দেশের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী এবং বিভিন্ন শিক্ষালয়গুলির অভাব ও আবশ্যকাদির পর্য্যালোচনা এডুকেশন গেজেট আপন কর্ত্তব্য-রূপেই গ্রহণ করিবে। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্যক-রূপ পরিস্ফুট করিয়া দেশবাসীকে বর্ত্তমান জগতের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সুস্থির ও সবল রাখিতে পারে, এতদর্থে গেজেট বিশেষরূপে নিয়োজিত থাকিবে।

প্রোক্ত উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমরা দেশবাসী শিক্ষাভিজ্ঞ, শিক্ষা-সেবী, এবং শিক্ষা-প্রেমী স্ত্রী ও পুরুষ মাত্রেরই সহানুভূতি ও সহায়তা প্রার্থনা করি। বৈশাখের প্রথম হইতে শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত সহযোগে সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী এই পত্রিকা সম্পাদন করিবেন।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works
259 Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

কৌতূহল

শিল্পী—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Class No....
Book No....
LIBRARY

বিচিত্রা

সপ্তম বর্ষ, ২য় খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ | ৫ম সংখ্যা

ইংরেজি গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে
লিখিত পত্র

Ludgate Circus, London
৬ই মে, ১৯১৩

কল্যাণীয়াসু,

গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমার কথা লিখেছিস্। ওটা যে কেমন করে লিখলুম এবং কেমন করে লোকের এত ভাল লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্য্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজি লিখতে পারিনে, এ কথাটা এমনি সাদা যে এ সম্বন্ধে লজ্জা করবার মত অভিমানটুকুও আমার কোনদিন ছিল না। যদি আমাকে কেউ চা খাবার নিমন্ত্রণ করে ইংরেজিতে চিঠি লিখত, তাহলে তার জবাব দিতে আমার ভরসা হত না। তুই ভাবছিস আজকের বুঝি আমার সে মায়া কেটে গেছে—একেবারেই তা নয়; ইংরেজিতে লিখেছি এইটেই আমার মায়া বলে মনে হয়। গেলবারে যখন জাহাজে চড়বার দিনে মাথা ঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্ক ষোলো আনা সবল না থাকলে একেবারে বিশ্রাম-করবার মত জোর পাওয়া যায় না। তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্যে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। তখন চৈত্র মাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না, এবং পাখীর ডাকাডাকিতে দিনের বেলাকার সকল ক'টা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল। ছোট ছেলে যখন তাজা থাকে তখন মার কথা ভুলেই থাকে, যখন কাহিল হয়ে পড়ে তখনি মায়ের কোলটি জুড়ে বসতে চায়—আমার সেই দশা হল। আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে আমার সমস্ত ছুটি দিয়ে ঐ চৈত্র মাসটিকে যেন জুড়ে বসলুম—তার আলো তার হাওয়া, তার গন্ধ, তার গান একটুও আমার কাছে বাদ পড়ল না।

কিন্তু এমন অবস্থায় চুপ করে থাকা যায় না—হাড়ে যখন হাওয়া লাগে তখন বেজে উঠতে চায়, ওটা আমার চিরকেলে অভ্যাস জানিস্‌ত। অথচ কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মত বল আমার ছিল না। সেই জন্যে ঐ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করতে বসে গেলুম। যদি বলিস্, কাহিল শরীরে এমনতর দুঃসাহসের কথা মনে জন্মায় কেন—কিন্তু আমি বাহাদুরি করবার দুরাশায় এ কাজে লাগিনি। আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে উঠেছিল, সেইটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত করে নেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল। একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল। এইটি পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে, ভাবলুম সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখন উস্‌খুস্ করে উঠবে, তখন ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি দুটি করে তর্জ্জমা করতে বসব। ঘটলও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছন গেল।

রোটেন্‌ষ্টাইন আমার কবিযশের আভাস পূর্ব্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিতমনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য়েট্‌সের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন—তার পরে কি হল সে ইতিহাস তোদের জানা আছে। আমার কৈফিয়ৎ থেকে এটুকু বুঝতে পারবি আমার কোনো অপরাধ ছিল না—অনেকটা ঘটনাচক্রে হয়ে পড়েছে।

তারপরে যখন আমেরিকায় গেলুম, ভাবলুম কিছুদিন চুপচাপ করে বিশ্রাম করব। কিন্তু চুপ করে থাকবার জায়গা আমেরিকা নয়। ও দেশ মূকং করোতি বাচালং—বিদেশ থেকে যে কেউ গেলেই আমেরিকা তার কাছ থেকে বক্তৃতা দাবী করে বসে। আমি আর্ব্বানা সহরে একটু গুছিয়ে বসবামাত্রই বক্তৃতার জন্য তাগিদ আসতে লাগল। আমি বল্লুম আমি ইংরেজি ভাষা জানিনে, কিন্তু সেটা ইংরেজি ভাষাতেই বলতে হয় বলে কেউ বিশ্বাস করে না, বলে, তুমি ত বেশ খাষা ইংরেজি বলচ। অনুরোধ এড়ানোর বিদ্যাটা আজও আয়ত্ত হয়নি। বলতে পারব না—এ কথা বার বার বলার চেয়ে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সহজ। এমনি করে আমেরিকায় আমার টুঁটি চেপে ধরে বক্তৃতা বের করে নিলে। এ সম্বন্ধে সেখানে খ্যাতিও লাভ করেছি—কিন্তু তবু আজ পর্য্যন্ত আমার মনে হয় ওগুলো দৈবাৎ লেখা হয়ে গেছে। ইংরেজি ভাষায় যে অনেকগুলো অত্যন্ত নড়নড়ে জিনিষ আছে—যেমন ওর articleগুলো, ওর prepositionগুলো, ওর shall এবং will—ওগুলো ত সহজ জ্ঞান থেকে জোগান দেওয়া যায় না, ওর শিক্ষা থাকা চাই। এখন বুঝতে পারচি আমার মগ্নচৈতন্য অর্থাৎ আমার subliminal consciousnessএর মধ্যে ওগুলো মাটির তলার গর্ত্তের ভিতরকার কীটসম্প্রদায়ের মত বাসা বেঁধে রয়েছে—যখন হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে লিখতে বসি, তখন অন্ধকারে ওরা সুড়সুড় করে বেরিয়ে এসে আপনাদের কাজ সেরে দিয়ে যায়, কিন্তু জাগ্রৎ চৈতন্যের আলো দেখলেই ওরা অত্যন্ত এলোমেলো হয়ে দৌড় দিতে থাকে—সুতরাং ওদের সম্বন্ধে কোনমতেই শেষ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ভরসা পাইনে। সুতরাং আজ পর্য্যন্ত এ কথাটা সত্য

রয়ে গেল যে, আমি ইংরেজি ভাষা জানিনে। ঠিক জানিনে বল্লে একটু অত্যুক্তি করা হয়, কিন্তু নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। আমি তোকে সত্য কথাই বলচি, এ কয়টা ইংরেজি প্রবন্ধ লিখতে পেরেছি বলে আমার মনে একটা দুশ্চিন্তা জাগ্‌ছে এই যে, এই নজিরের উপর বরাবর আমি চল্‌ব কি করে? কৃতকার্য্য হবার মত শিক্ষা যাদের নেই, যারা কেবলমাত্র নেহাৎ দৈবক্রমেই কৃতকার্য্য হয়ে ওঠে, তাদের সেই কৃতকার্য্যতাটা একটা বিষম বালাই। * * * * *

আমার এখন ফেরবার জো নেই। কারণ জুন মাসের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত আমি এখানে বক্তৃতার দায়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। তারপরে Irish Theatreয়ে আমার ডাকঘরের ইংরেজি তর্জ্জমাটা অভিনয় হবার আয়োজন চল্‌চে—ওটা য়েট্‌স্ এবং তাঁর দলের বিশেষ ভাল লেগেছে। তারপরে আমার আরো একটা বড় খাতাবোঝাই তর্জ্জমা সারা হয়েছে—সেগুলোও রোটেন্‌ষ্টাইন প্রভৃতি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, এবং এগুলি ছাপবার বন্দোবস্ত করতে তাঁরা উৎসুক হয়েছেন। ম্যাক্‌মিলানরা আমার প্রকাশক। গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় সংস্করণটা অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, এতে ম্যাক্‌মিলানরা উৎসাহিত হয়েছে। নতুন লেখাগুলো সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় প্রবৃত্ত হতে হবে। এই সব কাজে সময় লাগবে। ওদিকে আমেরিকায় হার্ভার্ড য়ুনিভর্সিটিতে আমি যে বক্তৃতাগুলি পাঠ করেছিলুম, সেগুলি বই আকারে বের করবার জন্যে সেখানকার একজন অধ্যাপক আমাকে অনুরোধ করচেন। বই তাঁরা বিনামূল্যে ছাপিয়ে দেবেন, এবং তার সমস্ত মুনফা বোলপুর বিদ্যালয় পেতে পারবে। আমার এ লেখাগুলো এখানকার সমজদারদের কাছে একবার যাচাই না করে ছাপব না বলেই দেরি করচি। ওর মধ্যে একটা প্রবন্ধ Hibbert Journalএর সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলুম, তিনি সমাদর প্রকাশ করে গ্রহণ করেছেন। তাতে বোধ হচ্চে এগুলো চলতে পারবে।

প্রমথর সনেটপঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি। আমার মেঘদূতের যক্ষবধূর বর্ণনা মনে পড়ে—এই বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর দশনপংক্তি তীক্ষ্ণশিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই—"মধ্যে ক্ষাম" দুটি লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট—তার উপরে "চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা"। এ যেন চোদ্দনলী হার একেবারে ঠাসা গাঁথুনি, আর ভাবটুকু এক একটি নিরেট মাণিকের বিন্দুর মত ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলচে। কেবল আমি এই আশা করচি, কবিত্বের এই সুতীক্ষ্ণতা ক্রমে প্রশস্ত হয়ে আসবে, এর ধারালো নবযৌবন পূর্ণযৌবন রসভারে বিনম্র হয়ে পড়বে, এবং এখন পাঠকের মনকে প্রতিছত্রে ফুটিয়ে দেবার দিকে এর যে ঝোঁক আছে সেটা আপনি ফুটে ওঠবার দিকেই সম্পূর্ণ হবে,—তখন কবিতা এমন নির্ম্মমভাবে নিখুঁত হবে না। বীণাপাণিকে প্রমথ খড়্গপাণি মূর্ত্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন। ভাষার ছন্দে ও ভাবের সংযমে ও নৈপুণ্যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। * * * * *

এ কথা খুবই সত্য, ইংরেজি ভাষা নিয়ে অভিমান করতে পারি এমন আয়োজন আমার জীবনে কখনো হয়নি—কিন্তু যে কারণেই হোক্, জগৎটাকে আমি যেমন করে উপলব্ধি করেছি, সেটা আমার আন্তরিক সত্য জিনিষ—সেই সত্যটুকুকে তার নিজের তাগিদেই আমি প্রকাশ করবার চেষ্টা করে এসেছি। এইজন্য ইস্কুলমাষ্টারকে ফাঁকি দিয়েও আমি নিজের জীবনটাকে ফাঁকি দিই নি—ইংরেজি ব্যাকরণের কাছে আ

যত অপরাধই থাক, সাহিত্যের কাছে অপমানিত হবার মত অপকর্ম্ম খুব বেশি করিনি। * * * * * * * *

মে মাস পড়েছে, আজ ২২শে বৈশাখ, কিন্তু তবু এখানে আকাশ ঝাপসা, আলো ঘোলা এবং সূর্য্য-দেবের সোনার ভাণ্ডারের দ্বার একেবারে এঁটে বন্ধ ; মাঝে মাঝে মন্দ মন্দ বৃষ্টিও হচ্চে, ভিজে স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় আজও ঘরে আগুন জ্বালাতে হচ্চে। ভাল লাগচে না—কেননা আমি আলোর কাঙাল ; আমার সেই বোলপুরের মাঠের উপরে একেবারে আকাশ-উপুড়-করে-ঢালা আলোর জন্যে হৃদয় পিপাসিত হয়ে আছে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি, দেশে ফিরে গিয়ে চারিদিক থেকে কত ছোট কথাই শুনতে হবে, কত বিরোধ বিদ্বেষ, কত নিন্দাগ্লানি, তখন মনে মনে ভাবি আরো কিছুদিন থাক, যতদিন পারি এই সমস্ত বকাবকি থেকে দূরে থাকি। কিন্তু অপ্রিয়তাকে পাশ কাটিয়ে চলা চলে না, তাকে ঠেলে চলাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট পন্থা—নদীর ধার দিয়ে দিয়ে গিয়ে নদী পার হওয়া যায় না, একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে ঢেউ কাটিয়ে তবেই পারের ডাঙায় ওঠা সম্ভব—যা ভাল লাগে না তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে ডরিয়ে ডড়িয়ে যাব না, তাকে সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলা দিয়ে চলে যাব এই প্রতিজ্ঞাকেই আঁকড়ে ধরে রাখা ভাল।*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* আজ থেকে একুশ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন থেকে আমার স্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে যে পত্রখানি লেখেন, সেখানি প্রকাশ করবার অভিপ্রায় আমার প্রথম থেকেই ছিল। এর কারণ, গীতাঞ্জলি দেহমনের কোন্ অবস্থায় এবং কি কারণে তিনি ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত করেন, এ চিঠিখানিতে তার সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে সেখানি প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করেছি এই কারণে যে, এ চিঠিতে সে যুগে আমার সদ্য-প্রকাশিত সনেট-পঞ্চাশৎ সম্বন্ধে এমন দুচারটি কথা আছে, যা শুনে লেখকের মন যতটা খুসী হয়, অপর পাঠকের মন ততটা না হ'তে পারে। আজ যে চিঠিখানি প্রকাশ করছি, তার কারণ নিজের সার্টিফিকেট ছাপার অক্ষরে তোলাই যে এ পত্রপ্রকাশের প্রধানতম উদ্দেশ্য, এ সন্দেহ আমি যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা কেউ করবেন না এ ভরসাটুকু করি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বসন্ত

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কান্তারে আজি মুঞ্জরি' ওঠে বনদেবী-আরাধনা
বনফুলদল-দোলে,
ভৃঙ্গের যত গুঞ্জনে বাজে সঙ্গীত-উপাসনা
সমীরণ-হিল্লোলে,
বল্লরী যত বল্লভে খুঁজি' স্পন্দিত কাঁপে বা'য়
সরমের কথা স্মরি',
অঙ্গন নভ ছন্দিত করি' নব ঘন নীলিমায়
দিক দেশ গেল ভরি'।

শৈত্যের মাঝে সঞ্চিত যাহা হ'ল ঋতুকাল ধরি'
তার মাঝে প'ল সাড়া।
ঝর্ণার ধারা ঘূর্ণির বেগে বাহিরিল যেন অরি
ভাঙিবারে গিরি-কারা।
সঙ্গীত-রাগে উচ্ছল প্রাণ উচ্ছ্বাসে ওঠে মাতি'
পৃথ্বীর বুক চিরি',
পান্না ও চুণি মুক্তা ও মণি শত রঙ্ ওঠে ভাতি'
রিক্ত ধূনারে ঘিরি'।

ফাল্গুন আজি কল্পনা তার বিশ্বের অটবীতে
ছায় পাগলের পারা,
নন্দিত করি' গন্ধে ও গীতে বল্লরী বিটপীতে
বহাইল প্রাণ-ধারা;
পঙ্কের থেকে পঙ্কজ জাগি' বিস্মিত চোখে চায়
নির্জ্জন পল্বলে!
ক্রন্দসী যেন ক্রন্দনে তার জাগাইল বঁধুয়ায়
নিদ্রিতা জলতলে!

লাস্যের মতি হাস্যের রতি রঙ্ রস রূপ গানে
নন্দিল নগ্নতা;
যৌবনা নব উর্ব্বশী যেন কুণ্ঠিতা নহে জ্ঞানে
বেকত নৃত্যরতা।
শিঞ্জিনী তার সিঞ্চনি বোনে জল থল নভ গায়
নাহি কাটে কোথা তাল,
দৃষ্টিতে তার রূপকথা জাগি' পৃথ্বীর দিকে চায়
জ'মে ওঠে মোহ-জাল।

রঙ্গিলা আজি বিশ্ব-প্রকৃতি মদিরার পরিমলে
ফাগুনের পেয়ালায়,
দিকে দিকে তারি মত্ততা জাগি' প্রাণ গান উচ্ছলে
রঙ্ রস তনু পায়।
সঙ্গীতে যাহা সঞ্চিত ছিল মৌনতা ঘিরি' মাঘে
কৃপণতা অবসানে
উচ্ছ্বসি ওঠে পুষ্পিত বনে আকাশের অনুরাগে
ফাগুনের গানে গানে।

কান্তারে আজি মুঞ্জরি' ওঠে বনদেবী-আরাধনা
বনফুলদল-দোলে,
ভৃঙ্গেরা যত গুঞ্জনে করে সঙ্গীত-উপাসনা
সমীরণ-হিল্লোলে,
বল্লরী যত বল্লভে খুঁজি স্পন্দিত কাঁপে বা'য়
সরমের কথা স্মরি',
অঙ্গন নভ ছন্দিত আজি নব ঘন নীলিমায়
দিকে দেশে সঞ্চরি'। *

* গত ফরিদপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে শ্রীযুত মুন্সী মোতাহার হোসেন কর্ত্তৃক পঠিত।

কাব্য-কথা

অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ

'ঠাকুর ঘরে কে ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে, 'কলা খাইনে' বলিতে গিয়াই কদলী-গৃধ্নু আসল কথাটি ফাঁস ক'রে দেয়। সাহিত্য মন্দিরে আমার এই অনধিকার প্রবেশের জন্য পূজারিদের নিকট সেরূপ একটা ধাপ্পা দিতে গিয়ে ধরা পড়্‌তে চাইনা। প্রথমেই অপরাধ স্বীকার করে মার্জ্জনা ভিক্ষা করলে হয়ত গুরুপাপে লঘু দণ্ড হ'তে পাবে। যে আসনে আপনারা আমাকে আজ বসালেন তা' গ্রহণ করবার যোগ্যতা যে আমার নাই, সে কথা আপনারাই আমাকে ভুলিয়েছেন। এই ফরিদপুরে একদা আমাদের পৈত্রিক ভিটা ছিল। আপনাদের সাহিত্য-পরিষদের আমন্ত্রণ যখন সেই কথাটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল, তখন দেশ-মাতৃকার সাদর আহ্বান মা-হারা সন্তানের কানে এসে পৌছিল। তখন আর আপনার অযোগ্যতার কথা মনে রইল না। আমি কবি নই, তবে কাব্যরসভিক্ষু ত বটে। রসোৎসবের নিমন্ত্রণে ভিখারীকে যদি আপনারা সম্মানের আসন দান করেন, এবং সে যদি লোভবশে ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হয় আপনাদের বদান্যতার দোহাই দিয়াই সে আত্মরক্ষা করতে চাইবে।

তবু, একটা প্রশ্ন কিন্তু মনে জাগ ছিল। এত যোগ্যতর ব্যক্তি থাকতে আপনারা কাব্যশাখার সভাপতিত্বে আমাকে বরণ করলেন কেন ? শুনেছিলাম শিলং পাহাড়ে খাসিয়াদের ভূত পূজায় কমলা লেবু লাগে। কিন্তু সে কমলা-লেবুর পুনর্যৌবন হওয়া চাই। কথাটা প্রকাশ করে বলি। এমন এক একটা কমলা লেবু সেখানকার জঙ্গলে ফলে যা' পাক রে রাঙা হয়ে যাবার পর, বোঁটার থেকে না খ'সে, ধীরে ীরে যেন পিছু হেঁটে ক্রমশঃ সবুজ হ'তে থাকে। খাসিয়ারা খুঁজে খুঁজে বন থেকে সেই পুনর্নবীন কমলা লেবুটি এনে ভূতের উদ্দেশে উৎসর্গ করে। যে বার্দ্ধক্যে মানুষ দ্বিতীয় শৈশবে পৌছায়, আমি এখনো ততদূর অগ্রসর হ'তে পারিনি। তবে, স্থবিরত্বের পথে পিছু হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে, বোধকবি আবার যৌবনের এলেকায় এসে পৌছে থাকব, ওই শিলং পাহাড়ের কমলালেবুর মত। তাই আপনারা পিঁজ্‌রাপোল্ থেকে এই দ্বিতীয় শৈশবযাত্রী পুনর্যৌবন-পান্থ বৃদ্ধকে ধরে এনেছেন ভূত-পূজায়। কারণ, কাব্য-চর্চ্চা যে ভূতার্চ্চনা, তা শত্রু-মিত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। শত্রুপক্ষের কথা এখন ছেড়ে দিই। কিন্তু সুহৃদবর্গের ত অগোচর নাই যে কাব্যলোক স্থূল জগতের অন্তরালে অতীন্দ্রিয় অন্তরীক্ষে। কবির ভাষায় বলতে গেলে,—

"নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।

* * * *

এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা,
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তায় ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।"

কবির কারবার এই অন্তর্লোকে। এই লোক যখন নীহারিকার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকে তখন আদিম-মানবের বিস্ময়-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তা হয় ভূত-লোক। প্রধান মানবের সমীভূত দৃষ্টিতে হয় ভূর্ভুবঃস্বর্লোক, যেখানে আবির্ভূত হন সবিতা,—ধীয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ। আর কবির আনন্দোৎফুল্ল নয়নে এ রূপান্তরিত হয়ে যায় সেই লোকে, যেখানে শ্বেত-

১৪ই মাঘ ১৩৪০ ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনে কাব্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

শতদল আসনে আসীনা বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তা ভগবতী ভারতী।

আমরা বাস করি এই জড় জগতে। এখানে ভাল ক'রে বনেদ খুঁড়ে ঘর গড়ি। তেজারতি করি, ঠকি এবং ঠকাই। কীট পতঙ্গ পশুপক্ষীদের মত এই দৃশ্য জগৎটার সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রাম ও সহযোগ ক'রে বংশপরম্পরা ক্রমে বেঁচে আর মরে আস্‌ছি বহুযুগ ধরে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কিছু করি যা অন্য জীবের অসাধ্য। রূপময় বিশ্বটাকে নিংড়ে বিচিত্র বর্ণের নির্য্যাস আহরণ করি। ধ্বনিময় আকাশকে মন্থন করে সংগ্রহ করি ছন্দ এবং সুর। আর প্রাণের অন্তস্থল থেকে জোগাই প্রেম এবং আনন্দ। তারপর তুলি ধরে আঁকি ছবি, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রচনা করি কবিতা এবং সঙ্গীত। এই সৃজনলীলায় দুনিয়ায় আর সকল থেকে আমরা স্বতন্ত্র। বিশ্ব-স্রষ্টা যিনি, তাঁর সঙ্গে এই স্বচেষ্ট সৃষ্টি প্রযত্নে আমরা স্বগোত্র। সাহিত্য মানবের চিরন্তন সৃষ্টি ক্ষেত্র। বনভূমি যেমন কথা কয় তার ফুলে ফলে তরু মর্ম্মরে, মানব হৃদয় তেমনি আত্মপ্রকাশ করে তার কাব্যে সঙ্গীতে শিল্প চিত্রকলায়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ়তম যোগ সূত্রটি প্রেম। এই প্রেমের উদ্বোধন সৌন্দর্য্যে, এবং অভিব্যক্তি আনন্দে। যে ভাষার সাহায্যে আমাদের দৈনিক আদান প্রদান চলে তাকে সুন্দর এবং আনন্দময় করে তোল্‌বার তাগিদেই বোধ করি কাব্য সৃষ্টির সূচনা। চল্‌তি ভাষায় আমাদের হাটবাজার ঘরকন্নার কাজকর্ম বেশ চলে যায়, যে কথাটা বল্‌তে চাই স্বচ্ছন্দে বলে ফেলি, কোথাও বাধে না। কিন্তু এমন সব অনুভূতি অভিজ্ঞতা আছে, এমন সুখ এমন দুঃখ এমন আনন্দ প্রাণে জাগে, যা প্রকাশ কর্‌তে গেলে সে আটপৌরে ভাষায় আর হালে পানি পায়না। তখন তাকে উল্টে পাল্টে, ছন্দের বাঁধনে নিপীড়িত করে, মিত্রাক্ষরের রিনিঠিনিতে পদে পদে ঝঙ্কৃত করে তুলে তাকে অভিনব আবেগ ও তাৎপর্য্য দান করি। বাখারি তখন হয় বাঁকা ধনুক গুণের টানে, কথাগুলো ছুঁচ্‌লো তীরের মত হৃদয় হ'তে হৃদয়ান্তরে গিয়ে বেঁধে। অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশ করবার বেদনায় গদ্য হয়ে ওঠে পদ্য।

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রবর্ত্তনায় যখন কাব্যের উৎপত্তি, তখন একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে কবির পক্ষে গভীরতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কাব্য সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। শুধু একা কবির পক্ষে নয়; আমরা, যারা কাব্যরসপ্রার্থী, কবির পারিপার্শ্বিক মণ্ডলী, যাদের উদ্দেশে তাঁর আত্মপ্রকাশ,—আমাদের ভাবসম্পদ ও ভাবগ্রাহিতা পরোক্ষ ভাবে কবিকে উদ্বুদ্ধ করে। স্বভাব কবি যিনি, প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ আছে। এই নিগূঢ় প্রেমের আনন্দে পুষ্পোদ্গমের মতই তাঁর বাণী বিচিত্র কুসুমে পুষ্পিত হয়ে ওঠে।

শিক্ষিত বাঙ্গালী যেদিন থেকে পল্লী সম্পর্ক ঘুচিয়ে সহুরে হয়েছে সেদিন থেকে তার অন্তরের ভরা গাঙ্ পরিণত হয়েছে মরা বালুচরে এবং

> 'যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল,
> কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফুটে ফুল।'

তারপর ত আছে দারিদ্র্য, হিংসা, অপ্রেম, অসুহৃদ্‌তা, চিত্তবিক্ষেপ। এরূপ অবস্থায় কোথায় সে স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবন, যা কেবল অন্তঃসলিলার রসে পুষ্পিত হয়ে উঠ্‌বে? একথা বল্‌তে চাই না যে, সহুরের সঙ্কীর্ণতা ও সংঘর্ষের মধ্যে কাব্য সৃষ্টি অসম্ভব। কিন্তু যে জনতার ভিতর দেখা হয় অনেকের সঙ্গে কিন্তু আত্মীয়তার অবকাশ সেই অনুপাতেই সঙ্কুচিত, সেখানে কবির পক্ষে অনুকূল সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যের শুভ অবসর কতটুকু?

ধরিত্রী যেমন সিন্ধু বলয়িত, মানুষের প্রাণেও তেমনি অনন্তের চক্রবাল। উপকথার রাজপুত্রের মত মানুষ সংসারের হাটে কেনে ছোট্ট একটি ধামা আর হাতীর বাচ্চা। তারপর তার অবোধ আব্‌দার,—ওই ধামার মধ্যে হাতীর বাচ্চা পুর্‌তে হবে! ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মধ্যে পায় সে বিরাটের পরিচয়, আর চায় তাকে "করতলগত আমলকবৎ" কর্‌তে। কবির কাজই ত যেমন করে হোক্ অসীমকে, অরূপকে বাঁধনের ভিতর আনা, আর, ক্ষণিককে চিরন্তন এবং ক্ষুদ্রকে ভূমায় বিলীন করা। কবি তাই যুগপৎ বস্তু-তান্ত্রিক ও অধ্যাত্মরসিক। তাঁর কাছে দেহ ঘনীভূত আত্মা,

প্রাণ বাষ্পীভূত দেহ। জড়প্রকৃতি তাঁর চক্ষে প্রাণময়ী, ভুজবন্ধনের প্রিয়া বিশ্বব্যাপিনী।

বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। অর্থাৎ বিশেষ ভাবে বিচার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধিৎসার যুগ। যাকে যতটুকু জানি সেই অনুসারে তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের বৈচিত্র্য ও নিবিড়তা নিরূপিত হয়। সত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটায় বিজ্ঞান। সে পরিচয় যখন নিবিড়তর আত্মীয়তায় পরিপাক লাভ করে, তখন তার নিদর্শন পাই কাব্যে। বর্ব্বর যুগে কাব্য-সাহিত্য শিল্পকলার অবকাশ ছিলনা। তখন মানুষকে প্রাণ রাখ্‌তেই প্রাণান্ত হ'তে হ'ত। প্রথম পরিচয় লব্ধ সংসারের সঙ্গে যখন তার সম্বন্ধটা কতকটা স্থিতি-স্থাপক হল তখন এল ললিতকলা, প্রেমের প্রসাধন, ভাষায় সঙ্গীতে, শিল্পে স্থাপত্যে সুন্দরকে সুন্দরতর করার এই প্রচেষ্টা ও সাধনা। সত্য পরিণত হ'ল রসে, প্রবৃত্ত হ'ল কাব্যসৃজনে। সম্প্রতি বিজ্ঞানের কল্যাণে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে মানুষের যে নূতনতর পরিচয় ঘটেছে সেটা কাব্যরসাত্মক হয়ে উঠ্‌তে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের অভিনব সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। সে সামঞ্জস্যের সমাধান পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মহামিলন ক্ষেত্রে হ'বে। ভারতবর্ষ সেই পুরাণ বোতল যা'তে নূতন মদ বোতল না ভেঙে আপনাকে অমৃতমদিরা করে তুলবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষায় আমাদের যে পরিমাণে চিত্তবিক্ষেপ ও পল্লবগ্রাহিত্ব হয়েছে, তদনুরূপ নূতন মন্ত্রের নিদিধ্যাসন হয়নি। যাকে বাহিরে পেয়েছি তাকে অন্তরে আনতে পারিনি। সেইজন্য আমাদের কাব্য সৃষ্টি সাধারণতঃ এরূপ বন্ধ্যা। এই অক্ষমতার কারণ আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব। যে গাছের শিকড়ের গ্রন্থি শিথিল, বাতাস তাকে সমূলে উৎপাটিত করে, রৌদ্রাতপ তাকে জীর্ণ পত্রে কঙ্কালসার করে। ওই বাহিরের আলো বাতাস যে গাছের প্রাণ, তার প্রমাণ পাই আমাদের যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায়, এবং সাহিত্যে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের নবনবোন্মেষশালিনী সৃজনী লীলায়। কারণ, এঁদের প্রাণ-মূল ভারতবর্ষের অন্তস্থলে, শাখাবলী প্রসারিত উদার আকাশে, জ্যোতির্বায়ুমণ্ডলে। শিক্ষিত বাঙালীর মত "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ" সম্প্রদায় অন্যত্র দুর্ল্লভ। ক্রোটনের ভাঙা ডাল এক বোতল জলে ডুবিয়ে রাখ্‌লে তার যে শিকড়গুলি গজায়, তারা যেমন মাটি না পেয়ে শূন্যে হাতড়ায়, আমাদের মগজে তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষার পল্লব অঙ্কুরিত হয় মাত্র, আশ্রয়ভূমি পায়না। আমরা বিজ্ঞান পড়ি, কিন্তু ক'জনের প্রাণে অনুসন্ধিৎসা জাগে, চিন্তায় শৃঙ্খলা আসে? সাহিত্য চর্চ্চা করি, জীবনের ক্ষেত্রে তার অভিব্যক্তি কতটুকু?

রৈক্তের নাভিশ্বাসটুকু ধরে রাখে আশা। সে আশা যে আকাশকুসুম নয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সাহিত্য-পরিষদের মতন প্রতিষ্ঠানগুলি। আমরা যে মরেও মরিনি তার নিদর্শন পাই আমাদের জাতীয় জীবনের জীর্ণতার মধ্যে নবনব প্রচেষ্টার অঙ্কুরোদ্গমে। ফরিদপুরের সাহিত্য-সেবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যে মধুচক্রটি রচনা করেছেন তার সুধাভাণ্ডার স্বয়ং বীণাপাণি যে পূর্ণ করে দেবেন সেই আশা ও প্রার্থনা আজ আমাদের সকলের প্রাণেই জাগ্‌ছে।

এমন অনুযোগ মাঝে মাঝে শোনা যায় যে দেশের বর্ত্তমান্ দুর্দ্দশার দিনে কাব্যচর্চ্চা এক প্রকার নিষ্ক্রিয় ভাববিলাস মাত্র। কিন্তু মুমূর্ষু যে, তার মুখেই ত অমৃত বিন্দু দিতে হবে। দেশের কবি যাঁরা, জীবন্মৃতদের বাঁচাবার ভার তাঁদেরই উপর। তাঁরা ত শুধু কবি নন, কবিরাজও বটে, মৃত্যুঞ্জয় বটিকার রসায়ন তাঁদের রচিত পরমায়ুর্ব্বেদে নিহিত আছে।

এই নবজীবন ও নবযুগকে যাঁরা আ'নবেন তাঁদের প্রাণের মূল শিকড়টি "বাংলার মাটি বাংলার জলে লালিত হবে।" তাঁদের শাখা প্রশাখা মুক্ত আলো বাতাস নব-কিশলয়ের অঞ্জলিতরে পান করবে। এইজন্য একদিকে যেমন সংস্কৃত আরবী পারসীর অনুশীলনের প্রয়োজন, অপর পক্ষে তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশিষ্ট চর্চ্চা ও অনুবাদ প্রচারের আবশ্যক। নোবেল্ প্রাইজ প্রাপ্ত লেখকের রচনা প্রকাশিত হওয়া মাত্র ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই অনুবাদিত হয়ে যায়। কিন্তু বাংলায় এ পর্য্যন্ত ক'খানা অশ্বমেধের ঘোড়া-মার্কা কেতাবের তর্জ্জমা হয়েছে?

সর্ব্বোপরি চাই, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর

আত্মীয়তা। কাব্য রচনা ত কেবল সুনিপুণ বাক্যবিন্যাস নয়। এ যে প্রাণসিন্ধু মন্থন, ভাষা যার অস্ফুট কল্লোল ধ্বনি মাত্র। একটা যুগ সন্ধি ক্ষণে আমরা এসে পড়েছি। আলোক বিজ্ঞান বলে, সূর্য্যোদয়ের আগে উদয়াভিমুখ রবির একটা বিচ্ছুরিত ছায়া (Refracted image) পূর্ব্বাচলে দেখা দেয়। হোক্ অস্পষ্ট, তবু সে আলোয় ঘুম-ভাঙ্গা দুএকটি পাখীর গান নিদ্রালস প্রাণে এসে পৌঁছেচে। সে সুরে বাংলার মর্ম্মোক্তি আছে। অতি আধুনিক বাংলা গদ্যে ও পদ্যে এমন নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যাতে আর সংশয় থাকে না, আমাদের প্রাণে যেটা অন্ধ অনুভূতি মাত্র, সেটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পেয়েছে এই সকল লেখকের রচনায়। বাংলার পল্লীর সঙ্গে এঁদের নাড়ীর যোগ আছে। তাই এঁদের কণ্ঠে যে বাণী ফোটে, সেটা হয় কাব্য, রসাশ্রিত বাক্য।

প্রত্যেক দেশের মাটির বিশিষ্টতা স্থানীয় ফসলের ভিতর যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি সেখানকার মানুষেরও একটা অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ভাবে ও ভাষায় সম্ভবতঃ আত্মপ্রকাশ করে। ফরিদপুরের পল্লীলক্ষ্মীর শ্যামাঞ্চল ও সামাজিক আবেষ্টনের প্রভাব তদ্দেশীয় কবির রচনায় এমন একটি অনুরঞ্জনা এমন একটি সুর ফুটিয়ে তুলবে যা অন্যত্র দুর্লভ। বাংলা ভাষা এই রকম করে নানা পল্লীর মর্ম্মবাণীর আনুকূল্যে সমৃদ্ধিশালিনী হবে। এখনো যে আমাদের ভাষার কত অপূর্ণতা আছে, তা যে কোনো ইংরাজি লেখা তর্জ্জমা করবার চেষ্টায় ধরা পড়ে। বাংলাভাষা যদি সমগ্র বাংলার মাতৃভাষা হয় তবে সৎসাহিত্যের শাখা উপশাখাগুলিকে মিলাইয়া দিতে হবে। এইজন্য বহুকেন্দ্রে সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। ভাষার বাণিজ্য সাহিত্যিক বজরার পণ্যভারে। অনেক সুশ্রী কথা "ভরার মেয়ের" মত, কুলীন সাহিত্যের ঘর আলো করবে গৃহদীপখানি জেলে। কোন্ কথাটি সাহিত্যে চল্‌বে, কি অচল হবে তার কোনো বিশেষ আইন কানুন আছে কিনা জানিনা। তবে মানুষ যেমন আপন সহৃদয়তার গুণে পরকে আপন করে, তেমনি একটি অচিন্ কথা ভিন্‌গাঁয়ের মেয়ের মত নিজ গুণেই দুর্দ্ধর্ষ শাশুড়ীর হৃদয় হরণ কর্‌তে পারে। যিনি প্রকৃত কবি, তিনি জহুরীর মত জহর চেনেন, এবং যে কথাটি বরণ করে ঘরে আন্‌বেন কাব্যামৃতের পরিবেশনে তার পাকস্পর্শ হ'য়ে যাবে। কেউ তার গাঁইগোত্রের অনুসন্ধান করবে না। ভাষা জিনিষটা বড় রক্ষণশীল, কারণ সকলের সঙ্গে তার কারবার, ভদ্রাভদ্র অনেকের মন জুগিয়ে চল্‌তে হয়। গায়ের জোরে কাউকে চালাতে গেলে স্বয়ং চালককেই অচল হ'তে হয়। যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, তিনি প্রবীণই হোন্ আর নবীনই হোন্, তাঁর সুরের সঙ্গে যে কথাটি সুর মিলাতে পেরেছে, সম্ভ্রমের আসন তার জন্য সর্ব্বত্র অবারিত।

সমগ্র ভারতব্যাপী মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যে একটি মাত্র মৌমাছির দ্বারা কত সুধা কত মধুর সঞ্চয়ন হ'তে পারে, তা সুরসিক সুপণ্ডিত অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন-সেনের ভাণ্ডারের সঙ্গে যাঁদের অণুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরা জানেন। দুইয়ে দুইয়ে চার হয় পাটীগণিতে। কিন্তু মানুষে মানুষে যখন যোগ হয় তখন তার অঙ্কফল যে কত বিপুল হ'তে পারে, কোন্ গণিতে তার সীমা নির্দ্দেশ করবে? এই সঙ্ঘ শক্তিকে অর্জ্জন করে আপনারা ফরিদ-পুরের এক কোণে যদি একটি মৌচাক্ বাঁধ্‌তে পারেন, তাহ'লে হয়ত অনেক অজানা ফুলের মধু সংগৃহীত হ'তে পারে। সম্প্রতি আপনাদের প্রকাশিত "বারমাসী" পত্রিকা খানি দেখে আশা হয় যে পরিচালকবর্গ সুযোগ্য সম্পাদকের নেতৃত্বে বদ্ধপরিকর হয়েছেন স্বদেশবাসী সাহিত্যসেবীদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তাঁদের চেষ্টা জয়যুক্ত হোক্।

আজ এই কথা বলে শেষ কর্‌তে চাই যে, কবয়ঃ স্বপ্নদ্রষ্টারঃ, যে স্বপ্নে অন্তরের উপলব্ধি ও অনলব্ধি দানা বেঁধে ওঠে বাঙ্‌ময় রূপে। ইহাই কাব্যলোক। সমগ্র মানব হৃদয় ভরিয়া ইহার আকাশ, যেখানে নক্ষত্রেরা আপন হাতে প্রদীপ জ্বালে। কবিরা সেই নক্ষত্রদীপালি মৃণ্ময় পাত্রে যাঁদের স্নেহ সঞ্চয়, লিপি-রেখায় যাঁদের অমরশিখা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

মুক্তধারা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

'মুক্তধারা'র গল্পটা সংক্ষেপে এই :—মুক্তধারা নামক ঝরণার জল চিরকাল সকল মানুষকে সমান ভাবে তৃষ্ণার জল জুগিয়ে আস্চে—এই অব্যাহত জলদানের মধ্যে কোন দিন কোন রাজনৈতিক কারণ উঁকি মারেনি। কিন্তু সেবার উত্তরকূট পার্ব্বত্য প্রদেশাধিপতির অধীনস্থ শিবতরাইয়ের বিদেশী প্রজারা দুর্ভিক্ষের জন্যে রাজার প্রাপ্য দিতে পারলে না—তখন স্থির হ'ল মুক্তধারাকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে শিবতরাইয়ের প্রজাদের জল থেকে বঞ্চিত করলেই তারা জব্দ হবে এবং তারপর রাজার প্রাপ্য আদায় হ'য়ে যাবে। যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধ'রে পরিশ্রম ক'রে এই বাঁধ বাঁধলেন—রাজ্যময় সেদিন উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। যন্ত্ররাজ বিভূতি অসাধ্য সাধন করেছেন—যন্ত্রের কাছে দেবতার পরাভব ঘটেচে। উত্তরকূটের পুরদেবতা উত্তর ভৈরবের মন্দির চূড়ার ত্রিশূলের চেয়েও উঁচু হ'য়ে উঠ্‌লো মুক্তধারার বাঁধের লৌহযন্ত্রের অভ্রভেদী মাথাটা। কিন্তু নৃত্যচ্ছন্দা স্রোতস্বতীর এই বন্ধন একজনের বুকে ভীষণ ভাবে বাজ্‌লো—তিনি যুবরাজ অভিজিৎ। তিনি জন্ম থেকেই মুক্ত, কোন বন্ধনই কোনদিন তাঁকে বাঁধ্‌তে পারে নি। ঘরের শঙ্খ তাঁকে ঘরে ডাকেনি, মুক্তধারার ঝরণাতলায় কোন্ ঘরছাড়া মা তাঁকে জন্ম দিয়ে গিয়েছিল। তিনি বল্‌তেন যে পৃথিবীতে পথ কাট্‌বার জন্যেই তাঁর জন্ম—কেননা যে পথ খুলে যায় সে পথ কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, সে পথ সকলের। তিনি ছিলেন শিবতারাইয়ের শাসনকর্ত্তা। শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় সেই জন্যে নন্দিসঙ্কটের পথ বহুদিন থেকে আটক করা ছিল। অভিজিৎ দিয়েছিলেন এই পথ খুলে। এতে শিবতরাইয়ের নিত্য দুর্ভিক্ষ বাঁচলো বটে কিন্তু উত্তর কূটের অন্নবস্ত্র দুর্ম্মূল্য হ'য়ে উঠ্‌লো। সুতরাং রাজা এবং উত্তরকূটের প্রজারা যে যুবরাজের উপর খুসী হলেন না সে কথা বলা বাহুল্য। মহারাজ যুবরাজকে বন্দী করলেন কিন্তু তাঁবুতে আগুন লাগার ফলে এবং রাজা রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিতের চেষ্টায় যুবরাজ মুক্তিলাভ করলেন। যে রাত্রে মুক্তিলাভ করলেন সেই অমবস্যার রাত্রে ভৈরবের মন্দিরে উৎসব এবং পূজার আয়োজন চল্‌ছিলো। যুবরাজ সোজা চল্লেন মুক্তধারার বাঁধের কাছে মুক্তধারাকে তার বন্ধনদশা থেকে মুক্তি দিতে। এই লৌহসেতুর একটা জায়গায় একটা ছিদ্র ছিল—বিরাট যন্ত্রদানবের সেই ছিল একমাত্র দুর্ব্বলতা। যুবরাজ সেইখানে আঘাত ক'রে বাঁধ ভেঙে ফেল্লেন, কিন্তু সেই বিপুল স্রোতের মুখে নিজেকে উৎসর্গ করতে হ'ল। যে স্রোতস্বতীর কলরোলে তিনি তাঁর মাতৃভাষা শুন্‌তে পেতেন সেই স্রোতোবেগ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অমাবস্যার রাত্রে ভৈরবকে জাগানোর সাধনা চল্‌ছিলো—ভৈরব জাগ্‌লেন এবং নিজের বলি গ্রহণ করলেন।

এই হ'ল গল্পের কাঠামো। এখন এই রূপকের বহু অর্থ বহু পাঠক করতে পারেন। সব চেয়ে সোজা অর্থ যেটা মনে পড়ে সেটা হচ্চে এই যে মানুষ না চাইতেই বিধাতা তাকে তার তৃষ্ণার জল দিয়েচেন—সুতরাং সেই জলে তার অবাধ অধিকার এবং এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা স্বয়ং রাজারও নেই। কিন্তু যদি এমন দিনও আসে যে এই প্রাথমিক অধিকারে হস্তক্ষেপ ঘটে তবে সেই অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষকে তার মূল্য দিতে হয়। বক্ষ্যমান নাটিকায় যুবরাজ অভিজিৎকে সেই মূল্য দিতে হয়েছিল।

আর একটা অর্থ এই হতে পারে যে কবি পাশ্চাত্যের

যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে প্রাচ্যের হৃদয়বৃত্তি মূলক সভ্যতার তুলনা করচেন। পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা যন্ত্রকেই জানে—মানুষকে জানে না, চেনে না বা চিনতে চায় না। তারা যন্ত্র দিয়েই সমস্ত জয় করতে চায়—দেবতার আসন টলাতে চায়। কিন্তু যন্ত্র যত পূর্ণতাই প্রাপ্ত হোক তার একটা মারাত্মক দুর্ব্বলতা থাকবেই এবং সেই দুর্ব্বলতার ছিদ্র দিয়েই একদিন আসবে তার ধ্বংস। দেবাদিদেব মহাদেবের কমণ্ডলু নিঃসৃত যে জলধারা সে বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্য, বিদ্রোহী শিবতরাইয়ের প্রজাদের শাসন করবার জন্যে তাকে রুদ্ধ করবার মধ্যে একটা মারাত্মক ভুল ছিল। মন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছিল যুবরাজকে শিবতরাই-এ পাঠিয়ে প্রজাদের হৃদয় জয় করতে এবং সেই ছিল প্রাচ্যের উপযুক্ত মন্ত্রণা। কিন্তু রাজার ছিল যন্ত্রদানবের উপর অতিবিশ্বাস—তিনি উত্তরকূটের পুরদেবতার দাক্ষিণ্যের কথা ভুলতে বসেছিলেন। তাই যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধ'রে পরিশ্রম ক'রে বক্ষে বিজয়কেতন উড়ালেন কিন্তু তাকে নির্দ্দোষ করতে পারলেন না। কেননা যান্ত্রিক সভ্যতা নির্দ্দোষ হতে পারে না—সে সভ্যতা মানুষের মিলিত সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধ'রে যে টাকাটা খরচ করলেন শিবতরাইয়ের প্রজারা নিশ্চয়ই তত রাজস্ব বাকী ফেলেনি। সুতরাং রাজার আর ব্যয়ের হিসাবে একটা অর্থ নৈতিক ভুলও ছিল এবং সে ভুল সম্ভব হয়েছিল শুধু জেদের বশে। তখন শিবতরাইয়ের প্রজাদের পীড়ন করার কথাটাই বড় হ'য়ে উঠেছিল। ক্ষুধার উদ্বৃত্ত অন্নে যে রাজার অধিকার, ক্ষুধার অন্নে নয় এ সত্য তখন রাজা ভুলেছিলেন। পঁচিশ বছর ধ'রে যে যন্ত্রদানবকে গড়ে তোলা হ'ল তার বিরাট স্ফীতির মধ্যে চণ্ডপত্তনের অনেক ঘরের আঠারো বছরের বেশী বয়সের ছেলের আত্মাহুতি ছিল, অনেক মায়ের কান্না লুকিয়ে ছিল কিন্তু তাতে যন্ত্ররাজ বিভূতির কিছুমাত্র চাঞ্চল্য ঘটেনি। যেদিন নির্ম্মাণ শেষ হ'ল সেদিন সে বলেছিল যে যারা এর জন্যে প্রাণ দিয়েচে তাদের সে ত্যাগ সার্থক হয়েচে, কেননা আজ যন্ত্র জয়ী হ'ল। আমরা পূর্ব্বদেশের মানুষ—আমরা একথা বলিনে। আমরা বলি যে কোন যন্ত্রকে জয়ী করার উদ্দেশ্যেই একটি প্রাণেরও বিনিময় করা যায় না। কেননা যন্ত্রের চেয়ে প্রাণ বড়—মানুষ বড়। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সভ্যতার মূলগত পার্থক্য এইখানে। "ধ্বংস-বিকট-দন্ত" যান্ত্রিক সভ্যতার নিজের ভিতরেই ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে।

আর একটা অর্থের কথা মনে আসে যাকে কবিজন-সুলভ বা কাব্যিক বলা যেতে পারে। সেটা হচ্চে এই যে অবারিত আকাশের তলে সূর্য্য চন্দ্র তারকার নীচে এক বিরাট যন্ত্রদৈত্যের গর্ব্বোদ্ধত শির দৃষ্টিকে পীড়িত করে। নীচের ধরণী থেকে অহরহ যে সঙ্গীত উপরের আকাশের দিকে উঠ্‌চে ঐ বিরাটকার লৌহদৈত্য যেন তার টুঁটি টিপে ধরেচে। সূর্য্য চন্দ্র তারকার দৃষ্টিকে প্রহত করে ও যেন লোহার দাঁত মেলে আকাশে অট্টহাস্য করচে। প্রকৃতির চিরসুন্দর শোভার নীচে এ যেন মানুষের এক দারুণ অপকীর্ত্তি। যাঁর চোখ ফুটেচে, যিনি ধরণীর এবং সৌরজগতের সৌন্দর্য্যলীলা প্রত্যক্ষ করতে পারেন তাঁর চোখে মানুষের এই অসুন্দর সৃষ্টির নিষ্ঠুর মহিমা ধরা পড়ে—সাধারণ বস্তুজীবী মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে এর কোন অপকারিতা নেই, বরঞ্চ উপকারিতা আছে তাই তাদের দৃষ্টিতে আকাশতলের এই বাধা কোনদিন প্রত্যক্ষীভূত হয় না।

মহারাজার গুরুর গুরু অভিরাম স্বামী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যুবরাজ অভিজিৎ রাজচক্রবর্ত্তী হবেন। আপাতদৃষ্টিতে এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি কিন্তু সত্যিই এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। যুবরাজ অভিজিৎ যদি উত্তরকূটের রাজা হ'য়ে বসতে পারতেন তবে তিনি রাজাই হতেন মাত্র, রাজচক্রবর্ত্তী হতেন না। কিন্তু তিনি যে মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে উদার আকাশতলে জন্মেছিলেন তার ফলে তিনি সকলেরই হৃদয়ের রাজা হ'তে পেরেছিলেন। একটি মেয়ের মুখ দিয়ে কবি এই চিত্রটি অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়েচেন। মেয়েটি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়না যে যুবরাজ কিছু অন্যায় করেচেন বা করতে পারেন। শিবতরাইয়ের প্রজাদেরও সেই অবস্থা। উত্তরকূট যুবরাজকে চায়না শুনে তারা শিবতরাইয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। রাজার খুড়া বিশ্বজিৎ ত যুবরাজের মতাবলম্বী হ'য়ে নিজের

পূর্ব্বমত সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। কোন যন্ত্র দেবতার সাধ্যও ছিল না যে মানুষের মনের এই সব পরিবর্ত্তন ঘটায়। যুবরাজ যখন শুনলেন যে মুক্তধারা বাঁধা পড়েচে তখনি তাঁর মনে হ'ল যে উত্তরকূটের রাজসিংহাসনও তাঁর জীবন-স্রোতের পক্ষে বাঁধ স্বরূপ। কেননা এ তাঁর জীবন-স্রোতকে স্বেচ্ছানুযায়ী প্রবাহিত হ'তে দেবে না। এর অনেক নিয়ম অনেক কানুন, অনেক মাপজোখ। তাই তিনি নিজের জীবনস্রোতকে মুক্তধারার স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন।

এই নাটিকাখানির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক লাইনে এমন একটি সূত্র দিয়েচেন যার সম্বন্ধে দু' একটি কথা না বললে সেটি পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। সে লাইনটি হচ্চে এই :—"মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগ্‌চে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।" মার খেতে ভয় নেই, কেননা "আসল মানুষটি যে তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কাঁই কাঁই ক'রে মরে"। (৫৫ পৃঃ) বলা বাহুল্য এর সঙ্গে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ের আইডিয়ার কোন প্রভেদ নেই। সুতরাং এই সত্যটি সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের এবং সকল মানুষের। আর এ যে কেবলমাত্র আইডিয়ার জগতে সত্য তাই নয়, ব্যবহারিক জগতেও এর সত্যতার আমরা প্রমাণ পেয়েছি।

নাট্যকার আর এক জায়গায় রাজার প্রমুখাৎ বলেছেন যে 'প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।' জীবনের বহুদর্শিতা থেকে জানা যায় যে এই সূত্রটিও জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রেব পরীক্ষিত সত্য নয়। বরঞ্চ এর উল্টোটাই সত্য অর্থাৎ প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় সকল লোককে। বলা বাহুল্য ব্যবহারিক জগতে এই নীতি সর্ব্বত্র পালিত হয় না, হলে হয়ত জগতটা আরো সুখের হ'ত।

যন্ত্রদানবের পরিকল্পীতির মধ্যে অনেক মায়ের চোখের জল লুকিয়ে আছে এ কথা আগেই বলেছি। এর খুব একটি করুণ চিত্র কবি ফুটিয়েচেন অম্বার চরিত্রের ভিতর দিয়ে। তার ছেলেকে বাঁধ নির্ম্মাণের কাজে ধরে নিয়ে গেছে—সে সেখানে দৈত্যের লেলিহান জিহ্বায় উৎসর্গ হ'য়ে গেল কিন্তু তার মা এদিকে তার আশাপথ চেয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্চে। সে ভাব্‌চে সন্ধ্যাবেলার শেষ দান নিয়ে তার ছেলে তার কাছে ঘরে ফিরে আসবে। রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে, তোমার পরিচয় কি, তখন সে বললে, আমি কেউ না, যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে ধ'রে নিয়ে গেল—অতএব তার অভাবে আমার আর কোন পরিচয় নেই। এর চেয়ে মানুষের বড় রিক্ততা আর হয় না, আর কত বড় সর্ব্বনাশের আঘাতে মানুষ নিজেকে এই রকম পরিচয়হীন ক'রে একেবারে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারে তার ধারণা করাও শক্ত। মানুষের এই সর্ব্বনাশ যান্ত্রিক সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফল।

উপনিষদে আছে "শিবায় চ, শিবতরায় চ।" উত্তর ভৈরব শিবের যে দাক্ষিণ্য অজস্র ধারায় শিবতরাই ভূখণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছিল রাজা যান্ত্রিক সভ্যতার বশবর্ত্তী হ'য়ে তার মূলোচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। রাজা সফলও হয়েছিলেন কিন্তু ভৈরব তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানকে বলি দিয়ে নিজের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

(বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের নাটিকাগুলিকে নাটকের পর্য্যায়ে ফেলা শক্ত এবং সেগুলি যে কি তার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা আরো শক্ত। কেননা তারা নাটকের কোন রীতি নীতিই মেনে চলে না। রবীন্দ্রনাথ অজস্র আইডিয়ার জনক—এক সেক্‌সপীয়র ব্যতীত পৃথিবীর অপর কোন স্রষ্টার রচনায় এত অজস্র আইডিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কাব্যে, উপন্যাসে, গল্পে এবং চিঠিতে সমস্ত আইডিয়াকে মুক্তি দিতে না পেরে তাঁকে নাটকের আশ্রয় নিতে হয়। তাঁর নাটকের এক একটি চরিত্র তাঁর আইডিয়ার এক একটি প্রতিরূপ। তাদের প্রত্যেকের মুখ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ কথা কন। এই হচ্চে যুগপৎ তাঁর নাটকের দোষ এবং গুণ। এক মেটারলিঙ্ক ব্যতীত এই বিষয়ে আর কেউ তাঁর স্বগোত্র দেখা যায় না। নাটকের রীতি অনুসারে প্রত্যেকটি চরিত্র হবে স্বতন্ত্র এবং তাদের কথাবার্ত্তার (dialogue) ধরণ এবং ভঙ্গী হবে পৃথক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক চরিত্রের বা আইডিয়ার পেছনেই রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান। অতএব তাঁব নাটিকাগুলিকে নাটকের পংক্তিতে না ফেলে যদি কেবলমাত্র এগুলিকে তাঁর ভাবাবেগের মুক্তি নাম দিই ত' হ'লে আশা করি কেউ অপরাধ নেবেন না।)

শ্রীঅবনীনাথ রায়

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য *

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহোদধি তীর্থে যে পরমপুরুষের মাহাত্ম্য গাহিবার জন্ত অত্য এই সুধী সমাজে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার মাহাত্ম্য গাহিবার স্পর্দ্ধা আমার মত একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির কেন হইল তাহা অবতারণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই পুরুষোত্তমের মাহাত্ম্য আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বর্ণনা করিবার ধৃষ্টতা আমি আদৌ হৃদয়ে পোষণ করি না। শুধু উড়িষ্যার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে যেটুকু ইতিহাসের ক্ষুদ্র উপাদানের রেণুকণা আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহারই অস্পষ্ট আভাষটুকু আপনাদিগের সম্মুখে চিত্রিত করিবার প্রয়াস মাত্র পাইয়াছি। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য ঠিকভাবে গবেষণা করিতে হইলে তিন চারি খণ্ড বৃহৎ পুস্তক সঙ্কলন করা যায়, কারণ ঐতিহাসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করিয়া এই জটিল গবেষণাপূর্ণ বিষয়টী সুন্দরভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। আমি শুধু বিদ্বৎ সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিন্তার ধারা এই দিকে আকর্ষণ করিবার জন্ত এই ক্ষুদ্র খসড়া নক্সা মাত্র আঁকিয়াছি। আশা করি ভবিষ্যতে যোগ্যতর ব্যক্তি এই জটিল বিষয়টী হস্তক্ষেপ করিয়া সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করিবেন।

প্রথমতঃ—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অনার্য্যদিগের নীলমাধব দেবতারূপে লুক্কায়িত থাকিয়া আর্য্য অনার্য্যের মিলন-ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দেন, অনার্য্য শবর জাতিদের কতিপয় আচার পদ্ধতি আজও পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, জগন্নাথদেব এখনও পর্য্যন্ত শবর জাতিসম্ভূত দৈত্যারী পাণ্ডা বা দৈত্য পাণ্ডাদের হস্তে সেবা গ্রহণ করেন। স্নান-যাত্রা, রথযাত্রা ও নব কলেবরের উৎসবে তাহাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। দ্বিতীয়তঃ, পাণ্ডারা যে বেতের গুচ্ছ সকলের গাত্র ও মাথায় স্পর্শ করে তাহা অনার্য্যদের শক্তি প্রেরণ করা বা শক্তি পরিবর্ত্তন করা বলিয়া কথিত হয়। সাধারণতঃ মণ্ডলীর মোড়ল তাহার প্রতিনিধিকে শক্তি সঞ্চারিত করে। তৃতীয়তঃ—রথের সময় যে অশ্লীল গান সারথিদের দ্বারা গীত হয় তাহার মধ্যে অনার্য্যদের Evil Power বা ভূত প্রেতদের তাড়ানর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আর্য্যদিগের সভ্যতার বিকাশ ও আচার-পদ্ধতি এই পুরুষোত্তমের সেবা, পূজা, মন্দিরনির্ম্মাণ, দেবতগঠন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, সামাজিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে স্তরে স্তরে সুন্দরভাবে বিকশিত রহিয়াছে।

প্রথমতঃ—বৈদিক যুগের অগ্নি, বৃক্ষ, জল, বায়ু ইত্যাদি উপাসনা পদ্ধতির প্রথম স্তরে পরমেশ্বরকে নিম্ব বৃক্ষরূপে বিরাজিত দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ—কোন অবস্থার বা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া "জগতের নাথ" নামে অভিহিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ যুগের কথা ঃ—

গোদাবরী হইতে মহানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশ পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ নামে কথিত হইত। এবং এইখানে সম্রাট অশোক আট বৎসর ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৬১ সালে কলিঙ্গ বিজয় করেন। কলিঙ্গর ভয়াবহ যুদ্ধই অশোকের চরিত্রকে হঠাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। এই যুদ্ধ কলিঙ্গর মহাক্ষত্রিয় বলকে চিরদিনের জায় নষ্ট করিয়া দেয়। ঐ যুদ্ধে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কলিঙ্গ পদাতিক বন্দী হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে এক লক্ষ কলিঙ্গ সৈন্ত হত হয় এবং ঐ সংখ্যার তিনগুণ লোক শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত ও লুণ্ঠিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধের পরিণামই অনুতাপদগ্ধ সম্রাট অশোককে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি দেয় এবং জগতে সাম্য, মৈত্রী

* পুরী বঙ্গসাহিত্য পরিষদে পঠিত।

করুণা ছড়ানই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়ায়। কলিঙ্গের উপর তাঁর অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী স্মরণ করিয়া তিনি কলিঙ্গর সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রেরণ করেন এবং মৈত্রী করুণা দিয়া সমস্ত কলিঙ্গ দেশকে একদিন আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। বিখ্যাত চীন পর্য্যটক হিয়ং সিকিয়ং যখন ৬২৯ খৃষ্টাব্দে এই দেশ ভ্রমণ করিতেছিলেন (উঁচা প্রদেশ নামে কথিত) তখন অনেক স্তূপ সঙ্ঘরামে এ দেশ পরিপূর্ণ দেখেন। চেলিটা-লোচিং বা চরিত্রপুর বা বর্ত্তমান পুরী পাঁচটী বড় বড় স্তূপ সৌধ এবং খুব উচ্চ সঙ্ঘবাম একত্রে দেখিতে পান এবং তাহার মধ্যে বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘের ত্রিরত্ন দর্শন করেন। সেই সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব ত্রিরত্ন-ভাবে পূজিত হইতেন এবং আজও পর্য্যন্ত তাহার ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ—মূর্ত্তিত্রয়ের মধ্যে ত্রিরত্ন চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্নের আকারের সঙ্গে মিলিয়া যায়—হিন্দুদের এইরূপ অদ্ভুত মূর্ত্তি কেন হইল তাহার মীমাংসা সমাধান করিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ—ভ্রাতাভগ্নীর সম্বন্ধ ধারার পূজা পদ্ধতি বৌদ্ধধর্ম্মের Brotherhood and Sisterhood অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব ও ভগ্নীত্ব হইতে উদ্ভূত। হিন্দুদিগের সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধযুক্ত যুগল মূর্ত্তির পূজা পদ্ধতি দেখা যায়, বিশেষতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিকেতন দ্বারকা, মথুরা বা বৃন্দাবনে সুভদ্রা, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পূজার পরিবর্ত্তে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ হিন্দুদের স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ এইরূপ মধুর ও পবিত্র যে তাহাদের দেব দেবীও সর্ব্বত্রই ঐ সম্বন্ধেই স্থাপিত ও পূজিত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, উড়িষ্যার মন্দিরগুলি একটী বৃহৎ স্তূপের আকারে কল্পিত ও গঠিত এবং ইহার গাত্রে ছোট ছোট মন্দিরের খোদিত শোভা votive স্তূপ বা ক্ষুদ্র স্তূপ মালার সুদৃশ্য পরিকল্পনা। চতুর্থতঃ—জগন্নাথ দেবের রথোৎসবটী পূর্ব্বকালে দন্তোৎসব নামে কথিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য সম্রাট অশোক বৌদ্ধের দন্তরক্ষিত স্বর্ণ কৌটাটী কাষ্ঠনির্ম্মিত রথোপরি স্থাপিত করিয়া পাটলীপুত্র নগর পরিক্রমপূর্ব্বক এই দন্তোৎসব ব্রত উদ্যাপন করিতেন। এবং প্রতি বৎসর নূতন কাষ্ঠ রথ নির্ম্মিত হইত। ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে ইহার পূর্ব্বে রথোৎসবটী ঐতিহাসিক উৎসব ভাবে পরিগণিত হয় নাই—শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। পঞ্চমতঃ—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বজাতি স্পর্শিত অন্নগ্রহণ কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না—এই দেশে ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যখন এক সময় উড়িষ্যা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, সেই সময় জাতিভেদ অস্তিত্বে প্রবল কুঠারাঘাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নমহাপ্রসাদ বিতরণের প্রণালী ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ষষ্ঠতঃ—এখানে দশ অবতার মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বুদ্ধ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়—কি ভাস্কর্য্যে, কি চিত্রপটে সর্ব্বত্রই এই মূর্ত্তি লক্ষিত হয়। সপ্তমতঃ—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে সূর্য্য মন্দিরের অভ্যন্তরে সূর্য্যমূর্ত্তির পশ্চাতে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত ও লুক্কায়িত রহিয়াছে। অষ্টমতঃ—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নব কলেবরের উৎসবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটী আবদ্ধ স্বর্ণ কৌটায় রক্ষিত সামগ্রী বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় জগন্নাথদেবের দারু মূর্ত্তির হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করা হয়। যে পাণ্ডা ইহা স্থাপন করেন তাঁহার চক্ষু বস্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়, কারণ ইহা কথিত হয় যে এই বিষয়টী বিশেষ গোপনীয় ও ভয়াবহ। কেহ বলেন এই কৌটার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অস্থি রহিয়াছে—কেহ বলেন শালগ্রাম শিলা রহিয়াছে—কেহ বলেন কালা পাহাড় কর্ত্তৃক দগ্ধ দারুমূর্ত্তির খণ্ড রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন ইহার মধ্যে বৌদ্ধ দণ্ড স্থাপিত রহিয়াছে—এবং ইহা সম্ভবও হইতে পারে কারণ এই প্রদেশে দুই স্থানে দুইটী বুদ্ধদণ্ডের অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়। একটী পরে সিংহল দেশে লইয়া যায়, অন্যটীর অস্তিত্বের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

তন্ত্র যুগের কথা:—

তন্ত্রধর্ম্মের আধিপত্য বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রথমতঃ—"বিমলা ভৈরবী যত্র, জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ" তন্ত্রসারে পীঠস্থান মাহাত্ম্যে কথিত রহিয়াছে এবং তন্ত্রযুগে ভৈরব ভৈরবী ভাবে পূজা পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয়তঃ,

মণ্ডলী কারণাৎ স্মৃতি তন্ত্র স্থাপত্য অনুযায়ী শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বিশাখা যন্ত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিকে মহাকালী—মহাসরস্বতী—মহালক্ষ্মী, মধ্যে "শ্রীনাথাদি গুরুং ত্রয়ং"—একদিকে মঙ্গলা, অন্যদিকে উত্তরাণী, মধ্যে গণপতি, পার্শ্বে ঈশানেশ্বর, পাতালেশ্বর, অগ্নিশ্বর ভৈরবত্রয়; অন্যদিকে আটটি পদ্মের মধ্যে অষ্ট শিব মন্দির, ইহা তন্ত্রস্থাপত্য বিস্তার উজ্জ্বল নিদর্শন। তৃতীয়তঃ—বলরাম দেব—ওঁ, জগন্নাথ দেব—অং, সুভদ্রা দেবী—হ্রীং অর্থাৎ ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে পূজিত হয়। সুভদ্রাদেবীর বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় অর্থাৎ হলুদ বর্ণ। সমস্ত পূজা পদ্ধতি তন্ত্রসার অনুযায়ী হয়। চতুর্থতঃ—মাংসের অনুকল্পে আদা প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত মাসকলাইএর পিঠে বা হংসকেলী ভোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কারণ বারির অনুকল্পে "জায়কলোদকং" বা ঘসা জল ও কাংস্য বা তাম্রপাত্রে নারিকেল বারি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ভোগ পূজাতে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চমতঃ—রত্নসিংহাসনের নিকট ভৈরবের বাহন কুকুরের মূর্তি খোদিত ছিল এবং দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে ছিল বলিয়া পুরাতন ব্যক্তিরা সাক্ষ্য প্রদান করে। রামানুজ সম্প্রদায়রা ইহা উঠাইয়া মুক্তিমণ্ডপের নিকট স্থাপিত করিয়াছেন এবং প্রতিদিন জগন্নাথ দেবের ভোগের পর তাঁহার ভোগ কুকুরকে দেওয়ার বিধি আছে। এবং এই কুকুরেরও নিয়মিত পূজা হয়। ষষ্ঠতঃ—রত্নবেদীস্থানটী মহানির্ব্বাণ ক্ষেত্র বলিয়া কথিত এবং পূজিত হয় এবং ইহার ভিতরে তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী উড্ডয়র যন্ত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী স্থাপিত রহিয়াছে। সপ্তমতঃ—শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা উপলক্ষে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে প্রতিদিন দুইটী করিয়া ছয়টী ছাগ শিশু শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রাঙ্গণে ৺বিমলা দেবীর মন্দির পার্শ্বে গভীর রাত্রে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী এই বিধি আবাহমান-কাল চলিয়া আসিতেছে। অষ্টমতঃ—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অন্নভোগ মহাপ্রসাদ শ্রীশ্রীবিমলা দেবীকে অর্পিত হয়, কিন্তু মন্দিরের অন্য কোন দেবদেবীকে অর্পিত হয় না। এমন কি শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর ভোগও পৃথকভাবে রান্না হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব ও শ্রীশ্রীবিমলা দেবীর নিকটতম সম্বন্ধ তন্ত্রযুগ হইতে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য স্থাপিত বৈদিক পূজা প্রণালীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অ, উ, ম, ওঁকার রূপে তিন অংশ পূজিত হইত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই ভাবে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের দ্বারা স্তব পঠিত হইতে দেখা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম খণ্ডন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে বৈদিক মন্ত্রে স্থাপিত করিয়া শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য দেব মন্দিরে ভোগ রন্ধনের পার্শ্বে তাঁহার আসন স্থাপিত করেন এবং ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ নামে চারি বেদের মধ্যে একটী বেদের শ্রেষ্ঠ স্থান এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকের ধর্ম্মদুর্গ নামে এই মঠ মন্দিরের মধ্যেই স্থাপন করেন, এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য শ্রীপদ্ম-পাদাচার্য্যকে প্রথম মঠাধীশ করেন। এখনও পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য মঠের বিধান অনুযায়ী মন্দিরের কার্য্যাদি হইয়া থাকে। অনঙ্গভীমদেবের সময় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের এই মঠ সমুদ্র তীরে বালুকারাশির মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।

শৈব যুগে শিব দুর্গা গণেশভাবে ত্রিমূর্ত্তির পূজা দেখা যায় এবং চতুর্দ্দিকে শিব-মন্দির স্থাপিত হইয়া থাকে, এখনও পর্য্যন্ত খণ্ড ও ত্রিশূলের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় এবং বলদেব ত্র্যম্বক মন্ত্রে বা শিবমন্ত্রে পূজিত হয় এবং বলদেবের শুভ্র মূর্ত্তি দেখা যায়।

গাণপত্য যুগের নিদর্শন স্বরূপ এই স্থান "গণপতি পীঠ ত্রয়ম্" নামে অভিহিত হয় এবং স্নানযাত্রা উৎসব কালে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের গণপতি বেশের পূজা হয়।

সৌর যুগের নিদর্শন স্বরূপ প্রতিদিন শ্রীমন্দিরে আদিত্য পূজা প্রথমে হইয়া জগন্নাথ দেবের সম্মুখে অগ্নি স্থাপন করা যায়। জগন্নাথ দেবের তেজোময় চক্ষুদ্বয়কে "দ্বিবিধ চক্ষুরা-ভতম্" নামে কথিত হয়। মকর সংক্রান্তিতে শ্রীসূর্য্যদেবের উপাসনায় শ্রীজগন্নাথ দেবের স্বরূপ পূজা কল্পিত হয় এবং সূর্য্যনারায়ণ নামে অভিহিত হয়।

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ভাবে এক সময় এই ত্রিরত্ন পূজিত হইয়াছে তাহার আভাষ এখনও পর্য্যন্ত রহিয়াছে, যথা—রাম জন্মোৎসব, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রঘুনাথ বেশ এবং রাম নবমী উপলক্ষে সপ্ত দিনের যাত্রাকথা ইত্যাদি।

বৈষ্ণব যুগের প্রভুত্ব বা বিশিষ্টতা এই ত্রিরত্নের মধ্যে

বিশেষভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য আরও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহাদের উদারতায় সমস্ত ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক অংশকে ইহার মধ্যে স্থান দিয়াছে, তাঁহাদের বিশিষ্টতা নষ্ট না করিয়া। প্রথমতঃ—অতীত যুগের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীমন্দির স্থাপনার বর্ণনার মধ্যে নীল মাধব বা চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে আমরা এই নীলাচলে দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ—

অনন্তম্ শেষদেবাখ্যং
সুভদ্রা লক্ষ্মী সংযকম্
বাসুদেব জগন্নাথ
চতুর্ধাং মূর্ত্তয়ে নমঃ।

তৃতীয়তঃ—অন্ধ্র সভ্যতার সংস্পর্শে জগন্নাথ দেবের নৃসিংহ মূর্ত্তির পরিকল্পনা ও পূজা এদেশে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দশাবতারের অন্যান্য দেবতারও পূজা পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থতঃ—শ্রীরামানুজ সম্প্রদায় অনুযায়ী এই ত্রিরত্ন লক্ষ্মী-নারায়ণ ও শেষ নাগ ভাবে পূজিত হয় অর্থাৎ শেষ নাগের কোলে লক্ষ্মী-নারায়ণ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন এই চিত্রখানি উদ্ভাসিত হয়। এখনও পর্য্যন্ত মন্দিরের উচ্চ শৃঙ্গে ও ত্রিমূর্ত্তির মস্তকের উপর রামানুজ সম্প্রদায়ের তিলক বা ছাপ দেখা যায়। পঞ্চমতঃ—শ্রীচৈতন্য পন্থানুযায়ী—বৃন্দাবন লীলা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য লীলা গুপ্তভাবে প্রকটিত হইতেছে এই নীলাচলে। বাল্যে—ভগ্নী ভ্রাতার মধুময় স্নেহ প্রীতিভাব। যৌবনে—রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার রসময় প্রেমের ভাব। বার্দ্ধক্যে—সারথি বেশে রথের উপর উপবিষ্ট মধুর সখ্যভাব। এই ভাবের লীলা যেই রসিক সে-ই এই নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মধ্যে আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেছে এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবই সেই ভাবতরঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া এই নীলাচল ধন্য করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের বালগোপাল বেশের আহ্বানে একদিন শ্রীচৈতন্যদেবকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল।

অন্যদিকে—অব্যক্ত উপাসনায় দারু-ব্রহ্মের অপূর্ব্ব বিকাশ যাহার হাত নাই, পা নাই, মুখ নাই, চক্ষু নাই সেইরূপ পরমাত্মা বা পরম পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ নীলাচলের এই অনন্ত লীলার মধ্যে কলিযুগে উজ্জ্বলতর রূপে পরিদৃশ্যমান। সত্যম্ শিব সুন্দরের এই ত্রিরত্ন সর্ব্বজগতে আজ নূতন আলোক, নূতন স্পন্দন, নূতন সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছে নীলাচলে জগত নাথের অনন্ত ভাবময় মাহাত্ম্য। আমরাও সেই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় দারু-ব্রহ্মের মধ্যে আমাদের অভিষ্ট দেবতাকে লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই এই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া যদি কোনও ভক্তের প্রাণে অজ্ঞাতে আঘাত দিয়া থাকি তবে সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ঐতিহাসিক সত্যের মধ্য দিয়া উপনিষদের ব্রহ্মসাগরে সমস্ত ধর্ম্ম বা নদীর পরিণতি দৃষ্টিগোচর করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পুরুষোত্তম যে কত বৃহৎ ও মহৎ তাহাই প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসমাত্র করিয়াছি।

যে পুরুষোত্তম এই মহাতীর্থে দারু-ব্রহ্মরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনি ত্রিসংখ্যক নিম্ব-বৃক্ষ মাত্র এবং ইনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের উজ্জ্বল ত্রিরত্ন—সমস্ত হিন্দুধর্ম্মকে আপনার মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন ঐ ত্রি-মূর্ত্তি—অনার্য্য, শবর, আর্য্য সভ্যতার স্তরে স্তরে বিকশিত বৈদিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন, গাণপত্য, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব সমস্ত ধর্ম্মের নানা ধর্ম্মের নানারূপে অলঙ্কারে সুসজ্জিত রহিয়াছেন আমাদের এই পুরুষোত্তম—যার একধারে বিশাল বারি-রাশির মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের তরঙ্গনিচয়—অন্য দিকে আকাশ-ভেদী উচ্চ মন্দিরের শৃঙ্গে ভক্তি ও বিশ্বাসের উড্ডীয়মান ধ্বজা—আর মধ্যে নীলাচলের সমতল ক্ষেত্রে পঞ্চভূত আসিয়া মিশিয়াছে এক বিশাল অন্তহীন অবস্থায়। ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম্ সমস্তই মহানের আকারে এখানে বিরাজমান—বারি-ব্রহ্মের সীমা নাই, শব্দ-ব্রহ্মের সীমা নাই, বায়ু-ব্রহ্মের সীমা নাই, বালি-ব্রহ্মের সীমা নাই, তেজোময় অর্কের উজ্জ্বলতা ও তপ্ততার সীমা নাই—সমস্তই অসীম, অনন্ত ও মহান্—আর ইহারই মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ঐ বৃহৎ দারু-ব্রহ্ম অন্ন-ব্রহ্ম, একটী অব্যক্ত—অন্যটী ব্যক্ত, একটী পুরুষ—অন্যটী প্রকৃতি, একটী সাক্ষী-স্বরূপ—অন্যটী প্রাণ-স্বরূপ, একটী জ্ঞান—অন্যটী ভক্তি, একটী potential বা বৃক্ষ-শক্তি—অন্যটী kinetic বা বীজ-শক্তি।

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

অন্তরের অবিচল ভালোবাসা দিয়া
তোমারে যে চিরদিন ক'রেছি বরণ
তুমি কি বুঝেছ তাহা ? রেখেছি স্মরণ
মৃত্যুহীন আনন্দের রসে ভরি হিয়া
বৈশাখের পঁচিশের কথা, তা কি জানো ?
বার বার এই দিন বরষে বরষে
সে কী নব মাধুরীর পাবন পরশে
মরমের সুনিভৃত শয়নে লুকানো,
প্রেমকে গিয়াছে দিয়া গাঢ় আলিঙ্গন
বলিয়াছে 'আপনারে রাখিয়ো নির্ভয়
আয়ু মোর দীর্ঘতম, বহু দূরে ক্ষয়' ;
তুমিও কি পাও নাই তাহার লিখন ?
বাঙালীর তুমি সব, পঁচিশে বৈশাখ
তাহাদের সকলের প্রাণে প্রাণ পা'ক্।

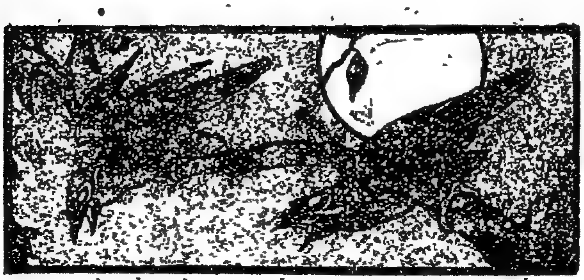

সাগর দোলায় ঢেউ

শ্রীনবগোপাল দাস আই-সি-এস্

*
* *

শীলার ডায়েরী হইতে :

বুধবার, সকালবেলা। আজ আমার এত ভালো লাগ্‌ছে যে কী বল্‌ব! জাহাজটার প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন মধুতে স্নাত বলে মনে হচ্ছে।…সূর্য্যোদয় ত রোজই দেখি, রোজই সুন্দর লাগে, কিন্তু আজকের সৌন্দর্য্য যেন সব সৌন্দর্য্য-গরিমা ছাপিয়ে উঠেছিল। মনটা হয়ে উঠেছে খুঁতখুঁতে ছেলের মত, কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না… অথচ একটুখানি চাঞ্চল্যের পরই কী জানি কেন ফেণিয়ে ওঠা মদের মত শান্ত-সমাহিত হয়ে পড়্‌ছে।

কাল ডিনারের পর নাচ হ'ল। নাচটা চিরকালই আমার ভালো লাগে…সুরের মূর্চ্ছনা আর সমুদ্রের বাতাস এই দুই মিশে ভারী রোম্যান্টিক্ একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। আমি সুন্দর নীলরঙের একটা গাউন পরেছিলুম, আর আমার গলায় ছিল নীল পাথরের ছোট্ট একটি দ্যুতি।… কর্ণেল গ্রীণ ত সারাটা সময় আমাকে কম্‌প্লিমেণ্ট দিতেই ব্যস্ত ছিলেন! বুড়োকে আমার বড্ড ভালো লাগে, ভয়ানক আমুদে ও রসিক লোক কিন্তু! আর কী ভীষণ হুইস্কি আর সোডা খেতে পারে! আমি ওকে বল্‌ছিলুম, এবার কিন্তু তুমি আর টাল সাম্‌লাতে পারবে না, শেষে তোমার হাতে বদ্ধ হয়ে আমি ও কি সমুদ্রের জলে পড়ে যাব?… কর্ণেল তাতে একটুখানি হেসে বলেছিলেন, এ ওস্তাদ বহুদিন এর মধু খেয়ে খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে গেছে, এ তাতবে কভু নড়বে না!

নাচের মাঝখানে হঠাৎ একবার সেনের কথা মনে হয়েছিল। ভাব্‌ছিলুম, ও যদি আমায় এম্‌নি ভাবে নাচ্‌তে দেখে তাহ'লে কী ভাব্‌বে?…ওর যা' মন তাতে হয়ত বিচ্ছিরি একটা কিছু ভেবে বস্‌বে, আর আমার সাথে জীবনেও কথা কইবে না! অবশ্যি ওকে দোষও দেওয়া যায় না…নাচের মধ্যে না হোক্, নাচের পর অনেক সময় যা' সব কাণ্ড হয় তাতে যে-কেউ শক্ পেতে পারে!… প্যাট্রিশিয়ার যৌবন বোধ হয় প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় এসে ঠেকেছে, তবু সে কী ঢলাঢলিটা না করলে! সবাই একটুখানি হাস্‌লে তাদের উপরের ডেকে চলে যেতে দেখে। কর্ণেল গ্রীণ আমার কানে অস্ফুটস্বরে বল্‌লেন, ওদের সী-সিক্‌নেস্ হয়েছে…

কাল রাতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম হয়নি, বোধ হয় নাচের উত্তেজনার ফলে। বারোটায় সময় নাচ শেষ হবার পর অনেকক্ষণ আমি ডেকে দাঁড়িয়েছিলুম, কর্ণেল গ্রীণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস্ করছিলেন, ইণ্ডিয়া কেমন লাগ্‌ল।…আমি কী জবাব দেব বুঝ্‌তে পারছিলুম না। যেভাবে দেশটা দেখেছি তা' না দেখারই সমান। গেলুম একটা নতুন দেশ দেখ্‌তে, কিন্তু সব সময় রইলুম আমার রং এবং রক্তের মর্য্যাদা নিয়ে দেশের লোকদের এড়িয়ে। মিস্ হিলকে কত ক'রে বল্‌লুম, চলো, এসব বড় বড় হোটেল ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট একটি সহরে দিশী কোন একটা ধর্ম্মশালায় জাতীয় জায়গায় গিয়ে বসি।…শুনে মিস্ হিলের মূর্চ্ছা হয় আর কি! তাঁর ক্ষীণ বপু, ঋজু দেহ আর চশমার ভিতর দিয়ে জ্বলজ্বলে চাউনি নিয়ে তিনি বল্‌লেন, তোমাকে শয়তানে পেয়েছে নাকি?

সত্যি, এত বড়ো একটা দেশ, এর মধ্যে যে কোন মর্ম্মভেদী বেদনা প্রচ্ছন্ন আছে তা' আমরা বাইরের পথিকেরা কতটুকুই বা বুঝ্‌তে পারি?…আসি, বড় বড় হোটেলে থাকি, তাজমহল, উদয়পুর, দার্জ্জিলিং আর কল্‌কাতা দেখি, তারপর দেশে ফিরে একটা ইম্প্রেশন্‌স্-এর বই লিখে বসি…

The mysterious East…The glamorous East! কিন্তু এই রহস্য, এই বৈভবের পেছনে যে কতো বড়ো যন্ত্রণা লুকানো আছে সেটা আমাদের চোখে আসে না, এলেও তার কুশ্রীতা আমাদের মনের ভাবসাম্যকে এতখানি চঞ্চল করে দেয় যে তা' কোন রকমে বিদায় করতে পারলে বাঁচি!

কর্ণেল গ্রীণ যখন সাড়ে বারোটার সময় আন্দাজ বিদায় নিয়ে তাঁর ক্যাবিনে শুতে চলে গেলেন তখনও আমি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে রইলুম। কালো নিষ্ঠুর জল ভেদ করে আমাদের জাহাজ চল্‌ছিল, আর ট্রপিক্যাল্ আকাশে তারার শোভা যেন শা'জাহানের হারেমের রূপসীদের হীরকখচিত শাড়ীর আঁচলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমি শুধু ইণ্ডিয়ার কথা ভাব্‌ছিলুম; যতদিন সেখানে ছিলুম আমার মনের গোপন অন্তঃপুর মথিত ক'রে একটা অসোয়াস্তির ভাব জেগে উঠেছিল; কিন্তু তার বেশী কিছু আলোড়ন হয়নি।… এখানে এসে সেনের সাথে দু' চারটি কথাবার্তা হওয়াতে যেন একটা বিপ্লবের নৃত্য সুরু হ'ল। তার শান্ত দৃঢ়তা আর আবেগময়ী চাউনিতে দেশের সব অর্দ্ধস্ফুট ভাব যেন সবাক্ ভাষা হয়ে ফুটে বেরুল।

আজ সকালবেলা যখন সেনেদের ডেকে গিয়েছিলুম তখন কেউই ছিল না সেখানে। কাল একটু ঠাণ্ডা পড়েছিল কিনা, তাই ডেকের উপর শোবার সাহস কেউ করেনি' এবং ভোরের আলো ফুটে ওঠা সত্ত্বেও কম্বলের সুখস্পর্শ ছেড়ে কেউ বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে চায় নি'।

আমি প্রতীক্ষমানা মূর্ত্তিতে ডেকের উপর একটা চেয়ার নিয়ে রেলিংএর সাথে গাল্‌টি ঘেঁসে বসেছিলুম। আর লাল আলো আগমনের ঔৎসুক্যে আমার সব ইন্দ্রিয়কটাকে সচেতন রাখ্‌বার চেষ্টা করছিলুম, এমন সময় স্লিপারের মৃদুশব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালুম। দেখ্‌লুম, সেন, পাত্‌লা এক কিমোনো পরে এসেছে। চোখে তার তখনও ঘুমঘোর, ঠোঁট দুটো আলস্যে ভরা, চুলগুলো দুষ্টু ছেলের মত বেপরোয়া।

বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা ছিল কিন্তু সূর্য্য উঠবার আগে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলুম, আপনার শীত করছে না? এরকম পাত্‌লা একটা কিমোনো পরে আছেন!

সে আমাকে প্রথমে দেখ্‌তে পায়নি', আমার কথা শুনে একটুখানি চম্‌কে উঠে বল্‌লে, ওঃ, আপনি বসে আছেন… না; ঠাণ্ডা আর এমন কি!

বেশ হাসি মুখেই সে কথাক'টি বল্‌লে, কিন্তু তার পরই পলকের মধ্যে তার মুখ ভয়ানক ভাবে গম্ভীর হয়ে গেল, সে বল্‌লে; আমি ত তবু দিব্যি এখানে কিমোনো গায়ে ঘুরছি, কিন্তু আমার দেশের লোকেরা একটি ছেঁড়া কাঁথার অভাবে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছে।

মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। সেনের কথার সুরে মনে হ'ল যেন আমাকে খোঁচা দেবারি জন্যেই ও এম্‌নি করে বল্‌লে। আমি একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বল্‌লুম, আমার সাধারণ একটা কথার উত্তরে এরকম জবাব দেবার উদ্দেশ্য কি আমার রক্ত আর রংএর কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া, মিঃ সেন?

মিঃ সেন এর উত্তরে মাত্র একটি কথা বল্‌লে, সেটা সত্যি হত, যদি একথাটি শুন্‌তেন কাল বিকেলের আগে মিস্ রজার্স…এখন এটা যে বল্‌লুম তা' বিবাদ বা অভিযোগের অভিপ্রায়ে নয়, আপনি আপনার সমবেদনা দিয়ে বুঝ্‌তে পারবেন এই বিশ্বাসে…

মুহূর্ত্তের জন্য অবগুণ্ঠন সরে গেল। বিদ্যুতের ঝিলিকে যে আমি একটি মনের ছবি দেখ্‌তে পেলুম তার জন্য আমি আমার নিয়তিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাই আমার মন আজ সকালবেলাটা এত খুশীতে ভরে আছে।

বুধবার, চায়ের আগে। মিস্ হিল কি আমায় শান্তিতে থাক্‌তে দেবেন না? কাল থেকেই লক্ষ্য করছিলুম উঁর মুখখানা যেন শ্রাবণ-মেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন। আজ লাঞ্চের পর আমি সেকেণ্ডক্লাস ডেকে যাব এমন সময় আমাকে ডেকে গুরুগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাচ্ছ?

আমি জবাব দিলুম, একটি বন্ধুর সাথে দেখা করতে।

ভ্রূকুটিকুটিল চক্ষে প্রশ্ন করলেন, সেই ভারতীয় ছোকরা ছুটো বুঝি?

তাঁর কথার ভঙ্গীতেই আমার মেজাজ খিঁচ্‌ড়ে গিয়েছিল, আমি সোজা জবাব দিলুম, যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে ক্ষতি আছে কি?

হঠাৎ পায়ের সামনে সাপ দেখ্‌লে মানুষের মুখের চেহারা কেমন হয় কেউ দেখেছ কি? মিস্ হিলের মুখের বর্ণবৈচিত্র্যও ঠিক তেম্‌নি হ'ল। আমার মত শান্ত সুবোধ মেয়ের কাছ থেকে বোধ হয় এরকম জবাব তিনি স্বপ্নেও আশা করেন নি'…তিনি খানিকটা স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন…তাঁর সে সময়কার চাউনি আমি কখনও ভুলতে পারব না।

পরে একটু ক্রূর হাসি হেসে বল্‌লেন, সাগর জলের হাওয়া লেগেছে কি না, তাই একটুখানি স্বেচ্ছাচারের স্পৃহা জেগে উঠেছে, না?…তা' মন্দ নয়, যদি সীমানা ছাড়িয়ে না যায়।

মিস্ হিলের এই বক্র ইঙ্গিতে আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌লুম। তীব্রকণ্ঠে বল্‌লুম, নিজের স্বৈরিতা দিয়ে অপর লোকের ভদ্রব্যবহারকে বিচার করতে যাওয়াটা তোমার ত ইতর মেয়েরই পরিচায়ক!

রাগে আমার মাথার শিরাগুলো দপ্‌ দপ্‌ ক'রে লছিল। মিস্ হিলের সামনে আর দাঁড়াতে পারছিলুম ', কেবলই ভয় হচ্ছিল হয়ত অসম্ভব একটা চীৎকার রে একটা সীন্ করে বস্‌ব!

মনটা বড্ড অবসন্ন হয়ে গেছে। মিস্ হিল যে বাবার তখানি বিশ্বাসের পাত্রী তা' আমি একেবারেই ভুলে য়েছিলুম। লণ্ডনে পৌঁছ্‌বার সাথে সাথেই ও সব না বাবার কাছে রিপোর্ট হয়ে যাবে, আর তাঁর স্বভাব আমি জানি! খাঁটি ব্রিটিশার ছাড়া আর কারো া মাড়ালেও যাঁর আভিজাত্যের গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হয় তিনি মার এই যোশী আর সেনের সাথে বন্ধুতাকে কখনই চক্ষে দেখ্‌তে পারবেন না!

দূর হোক্‌গে ছাই! কী সব আজ্‌গুবি ব্যাপার ছি!…লণ্ডনে পৌঁছে কী হবে তা' নিয়ে এখন ঘামিয়ে লাভ কি? যা' ভালো এবং সঙ্গত বলে হচ্ছে তা' করে যাই, পরের ভাবনা পরে হবে!…তাপ করাটা আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে, কাজেই মিস্ লের সাথে আজকের এই বচসা বা সেনের প্রতি আমার টুখানি আকর্ষণ এর কোনটার জন্যেই অনুশোচনা আমার কোনদিন হবে না! বার্ণার্ড শ' না কে যেন বলেছিলেন, অনুতাপ করে মূর্খেরা, যাদের মনের দৃঢ়তা নেই, সত্যে নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের অভাব যাদের অণুপরমাণুতে।

বুধবার, ডিনারের পর। সবাই সিনেমা দেখ্‌তে চলে গেছে, আর আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখ্‌ছি। মিস্ হিলের শ্যেনদৃষ্টির বিভীষিকা থেকে কয়েকটি ঘণ্টার জন্য যে বেঁচেছি এই আমার আনন্দ। এমন নীরস, কল্পনা-বোধহীন মেয়েমানুষ আমি আর দেখিনি'…আমার এ ডায়েরী লেখাকে মিস্ হিল দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারেন না, বোঝেন না যে এ আমার মনের একটা অভিব্যক্তি মাত্র, এর মধ্যে যুক্তি বা বুদ্ধি নেই। রক্ত যখন যুক্তির নিগড় ছাড়িয়ে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে এবং তার উপর সাগরের দোলা এসে লাগে—তখনই আমি আমার এলোমেলো কাগজের-টুক্‌রোগুলো নিয়ে বসি।

সাগরদোলার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা উচ্ছৃঙ্খল বাঁশীর সুর আছে। নইলে সেনের মত লোকও আস্তে আস্তে আমার পাশে সোফাটির উপর এসে বস্‌লে। সন্ধ্যার ঠিক আগে কার্ড্‌রুমে ডেকে একবার ঢুঁ মারাটা যেন ওর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে গেছে।…আজও সে স্মোকিং-রুমে ঢুকেছিল, চলে যাবার ছলও করেছিল, কাজেই আমাকেই ডাক্‌তে হ'ল। সে ফিরে এল, এসে খানিকক্ষণ নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলে; তারপর ছোট্ট একটি কম্প্লিমেণ্ট দিলে, আপনাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে!…তার পর অনুমতির অপেক্ষা না রেখে আমার ডান পাশে সোফার উপর বসে পড়্‌লে।

আমি একটু খুশী যে হলুম তা' বলাই বাহুল্য। এতদিন যেন ওর ধরা-ছোঁয়া পাচ্ছিলুম না, ওর মনের আলো-আঁধারের ইসারায় আমার বুদ্ধি ধাঁধাঁর মধ্যে ঘুর্‌ছিল; আজ সন্ধ্যায় ইসারাটা যেন একটু সহজ হয়ে উঠ্‌ল।

এরপর ঘণ্টাখানেক যা' হ'ল তাকে সোজা ভাষায় বল্‌ব—tête-à-tête. মঁপাসাঁ যখন এর মাধুর্য্যের ব্যঞ্জনা করেছিলেন তখন আমি হেসেছিলুম মনে মনে, কিন্তু আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনের পাশাপাশি বসে আমি ওর প্রাণের

প্রত্যেকটি স্পন্দন যেন অনুভব করছিলুম, ওর কথার মূর্চ্ছনায় আমার মন তালে তালে নেচে উঠ্‌ছিল···আমার মনের গুটি থেকে আনন্দের দ্যুতি বেরিয়ে আস্‌ছিল প্রজাপতির মত।

সেন কথা বলে কম, একটু লাজুক স্বভাব কি না! কিন্তু দু'একটি টুক্‌রো যা' বলে তাতেই মনের বাঁধন খসে যায়। মাঝে মাঝে তার চোখে অস্বাভাবিক এক দীপ্তি ফুটে ওঠে। দেশকে ও যে কী প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তা' ওর সাথে খানিকক্ষণ নিবিড়ভাবে আলোচনা না করলে বোঝা অসম্ভব; ও হচ্ছে অথই জলের মাছ, ভাসাভাসা স্তুতি বা উচ্ছ্বাস ওর মনের গভীরতার কাছে সাগরজলের বুদ্‌বুদের মত।

তবু দেখ্‌তে পাই মাঝে মাঝে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সে বোধ হয় আমার সান্নিধ্যের জন্যে। সে কখনই আমায় ভুলতে দেয়না যে আমি হচ্ছি তার শাসকদেরই জাতের মেয়ে···তাই নিবিড়তা আস্‌বার পথে বাধা ফুটে ওঠে, ব্যবধানের পাঁচীল এসে সহজতার মাঝেও একটা অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে।

আমি সেনকে তার আগের দিনকার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলুম। সে ভুলেই গেছ্‌ল প্রায়। আমি বল্‌লুম, আপনি আপনার দেশের কথা আমাকে বল্‌বেন কাল প্রতিশ্রুতি করেছেন, আজ বল্‌তেই হবে···

সে কথাটি এড়িয়ে জবাব দিলে, আপনি ত' নিজেই দেখে এসেছেন, আমায় আবার প্রশ্ন কর্‌ছেন কেন?

আমি বল্‌লুম, আমি কিছুই দেখিনি' আপনার দেশের। আমি দেখেছি শুধু গুটিকয়েক প্রাসাদ আর স্তূপ···আপনাদের জীবন্ত দেশ একেবারে এড়িয়ে এসেছি।

মলিন হাসি হেসে মোহিত বল্‌লে, আমাদের দেশ জীবন্ত নয়, ও হচ্ছে মৃত্যুপথের যাত্রী···

আমি নাছোড়বান্দা হয়ে আবার বল্‌লুম, তারই একটু ছবি আমায় বলে দিন্ না।

বোধ হয় আমার কণ্ঠের মধ্যে সত্যিকারের আগ্রহের সুর ফুটে উঠেছিল, সে আর কোন প্রকার দ্বিধা করলে না। অতি সংক্ষেপে দু'চারটি কথায় আমার চোখের সামনে এমন একটি ছবি এঁকে তুল্‌লে যে আমি ওর ক্ষমতাকে মনে মনে প্রশংসা না ক'রে পারলুম না।···কথা যখন শেষ হল তখন দেখ্‌লুম অন্তর-নিংড়ানো আবেগে সে অবশ হয়ে পড়েছে।

আমি প্রশ্ন করলুম, ক্লান্তি লাগ্‌ছে? আপনাকে কষ্ট দিলুম?

বল্‌লে, না···একটুখানি বিস্ময় বোধ করছি মাত্র—আপনার কাছে এসবকথা এমন আগ্রহভরে বল্‌ব এ আমি কখ্‌খনও ভাবিনি' কিন্তু।

আমি ভয়ানক ভাবে পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লুম, জয়ের গৌরবে আমার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল।

* * * *

মিস্ হিল সিনেমা দেখে ফিরে এসেছেন, মুখখানি খুব হাসি-হাসি। কর্ণেল গ্রীণ বোধ হয় ওঁর গাউনটার প্রশংসা করেছেন আজ।··কর্ণেল গ্রীণ খুব লোকভুলানো পুরুষ বটে।

আমি মিস্ গ্রীণকে প্রশ্ন করলুম, কেমন ছবি দেখ্‌লে?

— বেশ হয়েছিল, তুমি গেলে না, কর্ণেল এবং আরো অনেকে তোমার কথা জিজ্ঞেস্ করলেন।

— আরও অনেকের মধ্যে কারা আছেন?

— জিমি, ব্ল্যাকি এরা সবই!

জিমিকে আমি বেশ ভালোরকমই জানি। আমার দুর্ভাগ্য হয়েছিল দিল্লীতে ওর ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলুম, তারপর থেকে সে যে আমার পেছনে লেগেছে আমার একদণ্ডও শান্তি নেই। আমারই জন্যে সে ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে।···কিন্তু কাল ওকে আমি বেশ শক্তরকম দাব্‌ড়ানি দিয়েছি, তার ফলে আজ সারাদিন আমায় বিরক্ত করতে আসেনি'।

মিস্ হিল আমার মৌনতায় খুব প্রসন্ন হলেন না আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌লেন, ওরা তোমার কথা নিয়ে যেন একটু হাসাহাসি করছিল বলে মনে হল···আর ওদের দোষ দেওয়া যায় না!

আমি বুঝ্‌তে পারলুম মিস্ হিল কোন্ বিষয়ে ইঙ্গি[ত] করছেন। ওর সাথে এসব বিষয় নিয়ে তর্ক করাটাও আমা[র]

কাছে অপমান বলে মনে হচ্ছিল, আমি কিছু জবাব দিলুম না।

মিস্ হিল আপন মনে অস্ফুটস্বরে গজ্‌গজ্ করতে লাগ্‌লেন, কিন্তু দেখ্‌লেন আমার গাম্ভীর্য্য অটল এবং দুর্ভেদ্য। শোবার পোষাক পরে আমাকে প্রশ্ন করলেন, রাত হ'ল, শোবে না?

আমি বুঝ্‌লুম, আলোটাতেই মিস্ হিলের আপত্তি। আমি বেড্‌সুইচের আলোতে লিখ্‌ছিলুম, কিন্তু ঝাল মেটাতে হ'লে একটা বস্তু চাই! মিস্ হিলের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়্‌ল আমার শিয়রের কাছের বাতিটার উপর।

সারাদিন ডায়েরী লিখে লিখে আমারও চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে, আমি আর কিছু না ব'লে বাতিটা নিবিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্যুৎবার, সন্ধ্যার পর। আজ সারাটি দিন ডায়েরী লিখ্‌বার অবসর পাইনি। সকালবেলায় যখন শুনলুম যে আমরা আজ বিকেলে এডেন্ পৌঁছ্‌ব তখনই মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। এতদিন শুধু জলের রাশি দেখে আর সাগরের দোলা খেয়ে মনটা ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। তাই মাটির স্নেহস্পর্শ পাবার আশায় খেয়ালী আমি আনন্দোন্মুখ হয়ে উঠ্‌লুম।

সারাটা সকাল ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি। খানিকক্ষণ কর্ণেল গ্রীণ-এর সাথে গল্প করলুম। কর্ণেল গ্রীণ বেশ একটুখানি চোখের ভঙ্গী ক'রে আমাকে প্রশ্ন করলেন, নতুন বন্ধুদের কেমন লাগ্‌ছে?

আমি ওঁর ইঙ্গিত বুঝ্‌লুম। কর্ণেলের কথার ভঙ্গীটির মধ্যে কিন্তু কোনই বিষ নেই, তাই হাসিমুখে বললুম, মন্দ লাগ্‌ছে না, কর্ণেল, তবে জানই ত', পুরাণো জিনিষ হচ্ছে সব চেয়ে সেরা, তার সাথে কিছুরই তুলনা হয় না।

কর্ণেল হেসে বল্‌লেন, কথাটা কিন্তু মাত্র আংশিকভাবে সত্যি! এই ধর না, যদি আমার ছেলেবেলাকার একটি মিসেস্ গ্রীণ এখন পর্য্যন্ত বেঁচে থাক্‌তেন তাহ'লে কি আর আজ তার সাথে প্রেম করতে পারতুম?···তরুণী যুবতী শীলা রজার্স এমন মিষ্টি প্রৌঢ়া বর্ষীয়সী মিসেস্ গ্রীণ কি তেমন মিষ্টি হতে পারেন?

এখানে বলে রাখি, কর্ণেল গ্রীণ হচ্ছেন কুমার। তাই তাঁর মুখে রসের ফোয়ারার কখনও কম্‌তি নেই। আমি কর্ণেলের কথার একটুখানি তর্জ্জন করে বললুম, তুমি তরুণী যুবতীদের মধুই দেখ্‌ছ, কর্ণেল, মধুর পেছনে যে হুল আছে সেটা ভুলে যেয়োনা যেন!

কর্ণেল বল্‌লেন, কিন্তু মধুভরা হুল ত? মধুর খাতিরে সে হুলটুকু সহ্য করা যায়।

আমি দেখ্‌লুম কর্ণেলের সাথে কথায় পারবার যো নেই। তাঁর আগেকার প্রশ্নের সোজা উত্তর দেই নাই সেটা মনে হ'ল। বললুম, কর্ণেল, তোমরা ভারতীয় ছেলেদের সাথে আমাদের মিশ্‌তে দেখ্‌লে এমন আঁৎকে ওঠ কেন, বলত?

কর্ণেল আমার প্রশ্নে খুবই প্রীত হ'লেন বলে বোধ হল। বল্‌লেন, যারা বুদ্ধিমান্ তারা কখনই আঁৎকে উঠ্‌বে না··· কারণ এদেশের শিক্ষিত ছেলেরা যথার্থ ভদ্রতায় আমাদের শিক্ষিত ছেলেদেরও ছাড়িয়ে যায়। তবে কি জানো, আমাদের একটা কম্‌প্লেক্স্ আছে, সেটা হচ্ছে রংএর, রক্তের, মিথ্যা আভিজাত্যের। পাছে তার কোন হানি হয় এই ভয়ে আমরা সর্ব্বদাই সজাগ থাকি যেন! বুঝি, এরকম কম্‌প্লেক্স অন্যায়, অন্ধ···কিন্তু সংস্কারের স্বভাবই এই, বুদ্ধি দিয়ে মানুষ তার বিচার করে না, তার বিচার করে নিজের কতকগুলো প্রবৃত্তি দিয়ে!

—কিন্তু আমরা যারা শিক্ষিত তারাও যদি এমন করি তাহ'লে আমাদের শিক্ষার দাম কতটুকু?

হেসে কর্ণেল বল্‌লেন, সেইজন্যেই ত আমি বলি, আমরা ব্রিটিশাররা সব চেয়ে বেশী অর্দ্ধ-শিক্ষিত জাত।

কর্ণেল ভয়ানক চালাক কিন্তু! কোন একটা সমস্যা উঠ্‌লেই ভারী চমৎকারভাবে সেটা এড়িয়ে যান্। অথচ এমন ভাবে সেটা করেন যে কেউ তাতে রাগ করবার অবকাশও পায়না, তাঁর আমুদে কথায় প্রীত হয় বেশী।

কর্ণেল গ্রীণের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গেলুম সেকেণ্ড-ক্লাশ ডেকে। যোশী আর আর-একটি ছেলে দাঁড়িয়ে কী যেন গল্প করছিল। আমাকে দেখে যোশী একটু হাস্‌লে, কিন্তু তখ্‌খুনই সরে এল না। বুঝ্‌লুম অভিমান হয়েছে।

চোখের ইঙ্গিতে ডাকলুম, আমার ভাষা যোশী বুঝ্‌লে। ছেলেটির কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে এল।

প্রশ্ন করলে, মিস্ রজার্স এর হুকুম?

যোশীর কথা বলবার ভঙ্গীটি ভারী চমৎকার—ওর মধ্যে প্রাচ্যের লজ্জা বা আড়ষ্টতা নেই, অথচ মাধুর্য্য আছে বেশ।... ঘণ্ডনে ও আমার সাথে ভাব জমাবার জন্যে কী কম চেষ্টা করেছিল। মুস্কিল হচ্ছে এই যে এরকম ভাব জমানো আমার ধাতে সয় না। আমি চাই সবার বন্ধু হ'তে—যারা আমার সংসর্গ এবং সাহচর্য্য কামনা করে তাদের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য করাটা আমার ভয়ানক খারাপ লাগে।

আমি যোশীর কথার জবাব দিলুম, বহুদিন তোমার দেখাশুনো নেই, ভাব্‌লুম এডেন পৌঁছবার মুখে সী-সিক্‌নেস্ হ'ল নাকি?

যোশী বল্‌লে, যদি হ'ত তাহ'লেও কি আর মিস্ রজার্স দয়া করে এই রোগীকে দেখ্‌তে আস্‌তেন?

আমি ওর বাহুতে একটা ঠোনা মেরে বল্‌লুম, তুমি ভয়ানক আদুরে হয়ে উঠ্‌ছ, যোশী। তুমি ভুলেই যাচ্ছ যে আদর পাবার যোগ্য তুমি মোটেই নও।...উচ্ছৃঙ্খলতার শিখা যাদের রক্তের শিরায় শিরায় তারা আদর চাইবে কেন?

আমি জান্‌তুম ঐখানেই যোশীর দুর্ব্বলতা। ওকে যদি কেউ উচ্ছৃঙ্খল বলে তাহ'লে সে ভয়ানক মুষ্‌ড়ে পড়ে। অথচ মনে প্রাণে আমি জানি যাকে উচ্ছৃঙ্খল বলে ও তা' নয়, ও হচ্ছে একটু খেয়ালের চরম সুরে গাঁথা।

যোশী মুখখানা একটু ভার করলে। আমি প্রশ্ন কর্‌লুম, তোমার সুবোধ বন্ধুটি কোথায়?

একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি, যোশীর মধ্যে শেষ বিপুটার বিষ খুবই কম। ও আমাকে খানিকটা ভালোবাসে তা' আমি জানি, কিন্তু এটা ও জানে যে আমি ওর বন্ধুকে পছন্দ করতে আরম্ভ করেছি। তার জন্যে একটুও ঈর্ষান্বিত ও হয়নি'।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লে, কুকের গাইড্ দেখ্‌ছে—এডেন সম্বন্ধে।

প্রশ্ন কর্‌লুম, কোথায়?

—উপরে, স্পোর্ট্‌শ্ ডেকে।

বল্‌লুম, এসো না, সেনকে দেখে আসি...

যোশী ভারী সুন্দর একটি হাসি হাস্‌লে, তারপর বল্‌লে, আমার এই বন্ধুটির সাথে গল্প কর্‌ছিলুম, তা' শেষ হয়নি' ত এখনও!

কী সহজ ও সরলভাবে যোশী নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে! আমি মনে মনে তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পার্‌লুম না।

স্পোর্ট্‌শ্ ডেকে সেন গভীর অভিনিবেশের সহিত কুকের বই পড়্‌ছিল—আর ঘণ্টা কয়েক পরেই জাহাজ ডাঙায় ভিড়্‌বে কি না। কিন্তু ওর মুখের ভঙ্গী দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিলুম যে মনের সঙ্গে বইএর আলাপ পুরোপুরি ঘনিয়ে উঠ্‌ছে না।

আমি যে এগিয়ে আস্‌ছি সেটা ওর চোখ এড়ায়নি', যেন আমারই অপেক্ষায় বসেছিল। পরিচিত হাসি হেসে সে আমাকে অভিনন্দন জানালে।

আদবকায়দা যে ও শেখেনি' এখনও তার পরিচয় হ'ল এইতে যে সে আমাকে আস্‌তে দেখে উঠে দাঁড়ালে না। ...আমার কিন্তু সেনের এই সহজ স্বাভাবিক অভদ্রতাটুকুই ভালো লাগে।

আমি কাছে গিয়ে রেলিংটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালুম। বল্‌লুম, এডেন দেখতে যাবেন ত?

—হাঁ, সেইজন্যেই ত আগেই একটুখানি খবর সংগ্রহ করে রাখ্‌ছি।...আপনাদের বাহাদুরি আছে বা'হোক্...পথের আনাচে-কানাচে আপনারা ঘাঁটি বেঁধে রেখেছেন, আপনাদের নিশানের কাছে একবার মাথা না নুইয়ে যাবার যো কি আর আছে?

কথার মধ্যে একটুখানি শ্লেষের সুর বোধ হয় ছিল, কিন্তু এতদিনে সেটা আমার গা'সহা হয়ে গেছে, কাজেই আমি রাগ কর্‌লুম না। আমার মনের ক্ষোভ বা বিরক্তি যা' কিছু ছিল তা' আগেই স্থির হয়ে জমে গিয়েছে কি না। বল্‌লুম, আপনার জন্য দুঃখ হচ্ছে...কিন্তু কাজের কথা বলছি, আমি যদি আপনার সহযাত্রী হই তাহ'লে কি আপনার আপত্তি হবে?

পলকের জন্য সেনের মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল, সে কী বলবে যেন ভেবে পেল না। আমার সহযাত্রী হবার

প্রস্তাবটা শুনে সে কী ভাবলে সেই জানে। মনে হ'ল আমার উপর ওর শ্রদ্ধা অনেকখানি কমে গেল। আস্তে আস্তে সে বল্‌লে, যোশী যাচ্ছে ত?

আমি বল্‌লুম, জানিনে...যেতেও বা পারেন। আর যোশী না গেলে কি আপনার সাথে আমার যাবার পক্ষে কোন বাধা হতে পারে?

আমি খুব তীক্ষ্ণভাবে সেনের মুখের ভাব লক্ষ্য কর্‌ছিলুম...যেন একটা নতুন গ্রহের মধ্যে এসে পড়েছে সে, সেখানকার আলোছায়ার লুকোচুরি যেন পৃথিবীর নিয়মে চলে না, বাতাসের গুরুত্ব যেন সেখানে কম, মাটির আকর্ষণ যেন নতুন ছাঁদে বাঁধা!

অবশেষে বল্‌লে, বাধা হতে যাবে কেন?

আমার মনটা শঙ্কায় ঝাপ্‌সা হয়ে উঠ্‌ছিল, সেনের একটি কথায় আলোর প্রবাহ এসে সব আবিলতা ধুইয়ে দিলে।

* * *

জাহাজ যখন এডেনে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হ'তে আরম্ভ করেছে।...এডেনে সেনের সাথী ছিলুম শুধু আমিই; এই সন্ধ্যাটির কথা আমি ডায়েরীতে লিখ্‌ব না, কারণ এ ডায়েরী হচ্ছে সাগরের দোলার একটি ছোট্ট ঢেউ, আর এর তুলনায় এই সন্ধ্যাটি হচ্ছে অনেক বড় অমর্ত্ত্য জগতের একটা অব্যক্ত ধ্বনি।

*

* *

মোহিত একদৃষ্টিতে লোহিত সাগরের ঘোলাটে জলের দিকে তাকিয়েছিল।...এডেনের কাছে বিদায় নিয়ে আবার তারা চলা সুরু করে দিয়েছে...অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখীর মত তার মন ঘুরে বেড়াচ্ছিল সাম্‌নের দিনগুলোর দিকে। এডেনের স্মৃতি তার মনে যতই জাগ্‌ছিল ততই তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্তে সে এগিয়ে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল।...যেন স্বপ্নোত্থিত সে, স্বপ্নের স্পর্শটুকুর মাধুর্য্যের চেয়ে তার অস্বাভাবিক অতীন্দ্রিয়তায়ই যেন সে শিউরে উঠ্‌ছিল।

এডেনের শুষ্ক কঠোর পাহাড়ের মাঝে কী মাদকতা ছিল মোহিত জানেনা, তবে যা' কাণ্ড ঘটে গেল তাতে সে বিস্ময়ের চেয়ে ব্যথা অনুভব কর্‌ছিল বেশী। ব্যথা হচ্ছিল এই ভেবে যে সে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়ে ফেলেছে একটি বিদেশিনী মেয়ের দুর্দ্দান্ত উচ্ছ্বাসের সম্মুখে।

শীলা আর মোহিত এঁকে বেঁকে এডেনের মরুপাহাড় ধরে উঠ্‌ছিল। শীলা ছিল আগে, আর পেছনে ছিল মোহিত। শীলা বর্ষার সদ্যোজাত ঝরণার মত উচ্ছ্বসিত ভাবে আপন মনে বকে চল্‌ছিল, আর পেছনে পেছনে মোহিত শুধু দু'একটি "হুঁ—হাঁ" ব'লে কথোপকথনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কর্‌ছিল।

অনেকখানি উঁচুতে উঠে তারা একবার সাগর পানে তাকালে। দেখ্‌লে, তাদের জাহাজের বাতিগুলো জ্বলছে...যেন বহুদূরে কোন্ গ্রহের অপরিচিত অধিবাসীরা সঙ্কেতের নিশান উঁচিয়ে রেখেছে—পৃথিবীর পথিকের পদধূলির প্রতীক্ষায়।

শীলা চুপটি করে তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, কী সুন্দর!

মোহিত প্রথমে কোন কথা বল্‌লে না।...দেশ ছেড়েছে সে মাত্র পাঁচ দিন, এরই মধ্যে যে সে একটি বিদেশিনী মেয়ের সাথে এম্‌নি ভাবে ঘুরে বেড়াবে সে তার স্বপ্নেরও অগোচর।...ফস্ করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, তোমার নামের চেয়েও সুন্দর কি?

শীলা মোহিতের কাছ থেকে এমন জবাব মোটেই প্রত্যাশা করেনি। ক্ষণিকের জন্ত তার মধ্যে একটা ইচ্ছা অশান্ত হয়ে উঠ্‌ল, সে বল্‌লে, তাহ'লে সুন্দরকে উপেক্ষা কর কেন? আমার নাম ধরে ডাক্‌লেই ত পার!

দিনের পর দিন নীরবে চলে যায়, কিন্তু মনের রুদ্ধ ভাষা যখন দুয়ারে এসে আঘাত করে তখন তার আকস্মিকতায় নিজেই বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।...মোহিত গভীর ভাবে বল্‌লে, তাই ডাক্‌ব, শীলা...

পুলকে শীলার মনটি নেচে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, তোমার নামটিও আমায় বল্‌তে হবে সেন।...একতরফা স্বাধীনতায় আমি কিন্তু কিছুতেই রাজী নই!

নামটি জেনে নিয়ে শীলা যখন পাহাড় থেকে নাম্‌লে তখন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে তার খবর দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল, ওগো, তোমরা সবাই শোন, আমি মোহিতের মনের স্নেহ

পেয়েছি···তার স্থির অটল গাম্ভীর্য্যের মধ্যেও দোলার চাঞ্চল্য এনেছি...

মোহিত এই ঘটনাটির কথাই ভাব্‌ছিল, এবং এর পর শীলার সম্মুখীন কী ক'রে হবে তা' চিন্তা করে আকুল হয়ে উঠ্‌ছিল।···গভীর একটা অবসাদ, নিবিড় একটা নৈরাশ্যে তার মন ভরে উঠ্‌ছিল।

যোশী এসে প্রশ্ন করলে, কাল এডেন কেমন দেখলে ?

যেন অপরাধ করেছে এম্‌নি এক চাউনি নিয়ে মোহিত নতমুখে জবাব দিলে, মন্দ নয়।

যোশী হেসে প্রশ্ন করলে, তা' অমন গম্ভীর যে? শীলা রজার্স'এর সাহচর্য্য কি ভালো লাগ্‌ল না?

মোহিত প্রথমে কোন জবাব দিলে না। তার মনে হচ্ছিল যোশী সব কথাই জানে···হয়ত বা শীলা রজার্সই কৌতুকভরা সুরে যোশীকে তার পরাভবের কথা বলেছে! একটু তীব্রকণ্ঠে বল্‌লে, তোমার নিজের অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে কী বলে?

তাহার কথার তীব্রতায় যোশী অবাক্‌ হয়ে বল্‌লে, হঠাৎ এমন ধারা চটছ কেন?...আমার অভিজ্ঞতার মাপকাঠি দিয়ে ত তোমার আনন্দ বা বিপদের বিচার হবে না!

একটুখানি নরম হয়ে মোহিত জবাব দিলে, কাল একটা কাণ্ড হয়ে গেছে, যোশী···মিস্‌ রজার্স আর আমি আমাদের পরস্পরের নাম ধরে ডাক্‌ব এরকম একটা under-standing এ এসেছি!

যেন কিছুই হয় নাই এম্‌নি একটা তাচ্ছিল্যভরা সুরে যোশী বল্‌লে, ওঃ, এই! আর এরই জন্যে তুমি এতখানি ভাব্‌ছ!···তোমার মনের শুচিতায় আঘাত লেগেছে বুঝি?

আসলে কিন্তু যোশী একটু বিস্মিতই হয়ে উঠেছিল। যে শীলা রজার্স সহজে কাউকে তার নাম ধরে ডাকবার অধিকার দেয় না সে শুধু তিনদিনের পরিচয়েই কী করে মোহিতকে এতখানি আপনার করে নিলে তা ভেবে সে অবাক্‌ হয়ে গেল। সাগর সম্মোহনে অনেক কিছু সম্ভব হয় সে জান্‌ত, কিন্তু এতকাল শীলা রজার্সকে সে সেই সম্ভবনীয় সমষ্টি থেকে পৃথক্‌ করেই রেখেছিল।

মোহিত কিন্তু ভয়ানক ভাবে অস্বস্তিবোধ কর্‌ছিল। অলঙ্ঘনীয় এক নিস্তব্ধতা যেন তার আর যোশীর মাঝে পাঁচিল তুল্‌ছিল, সমস্ত শক্তি সংহত ক'রেও মোহিত তাকে ভাঙতে পার্‌ছিল না। খানিকক্ষণ পর সে হাই তুলে বল্‌লে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আজ, যোশী···

যোশী বুঝ্‌লে মোহিতের চিত্ত একটু বিক্ষিপ্ত, ভাব্‌বার অবসর চায় সে। কিছু না ব'লে সে চিদম্বরম্‌এর খোঁজে চলে গেল।

মোহিত চোখ মুদে অসাড়ের মত পড়ে রইল। তার মনের মধ্যে কালের প্রবাহ যেন থম্‌কে গিয়েছিল, চিন্তা করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত যেন সে হারিয়ে ফেলেছিল।

চিদম্বরম্‌ তখন মহোৎসাহে ব্রিজ্‌ খেল্‌তে আরম্ভ করেছে। যোশী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার খেলা লক্ষ্য করলে, তারপর বিরক্ত হয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশ ডেকের দিকে চলে গেল।

শীলা রজার্স যোশীর প্রতীক্ষায়ই যেন ছিল। যোশীকে আস্‌তে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, এসো; তোমাকে ভয়ানক দরকার কিন্তু···

যোশী কাছে এসে বস্‌লে, তারপর বল্‌লে, আমার বন্ধুটির কী অবস্থা তুমি করেছ তা' একবার ভেবে দেখেছ কি মিস্‌ রজার্স?···এডেনের বাতাস তার মনের উপর ইডেন্‌এর কাজ যে করেনি' তা' আমি হলপ নিয়ে বল্‌তে পারি!

শীলা মোহিতের সংবাদের প্রত্যাশায়ই বসে ছিল। সে আগ্রহের সুরে বল্‌লে, কী হয়েছে?

—হবে আবার কী! যা' হবার তা' হয়েছে!···ছিল বেশ, কী মোহিনীশক্তিতেই যে তুমি ওকে ভুলোলে, সে এখন চুপটি ক'রে চোখ মুদে স্বপ্ন দেখ্‌ছে!...বোধ হয় শীলা রজার্স'এর মুখখানি ধ্যান কর্‌বার চেষ্টা করছে!

কথাটা শীলার বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিল না; কিন্তু মনের মধ্যে কৌতূহল তার দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠ্‌ছিল।···ঘরে যদি নানা জিনিষ ভিড় ক'রে থাকে তাহ'লে তার মধ্যে সুন্দর একখানা ছবিও শুধু একখানা আস্‌বাবের চেয়ে বেশী মর্য্যাদা পায়না; কিন্তু রিক্ততার মাঝে ছবির সৌন্দর্য্য ফুটে

ওঠে।…শীলা কল্পনা করছিল, ঠিক তেম্‌নি বোধ হয় মোহিতের মনের অন্দরে তার মুখচ্ছবির জ্যোতি প্রকাশিত হয়ে উঠ্‌ছে।

যোশীকে প্রশ্ন করলে, আমার কথা কিছু বললে সে?

—ঐখানেই ত গলদ, মিস্ রজার্স…যদি কিছু বলত তাহ'লে না হয় বুঝ্‌তুম ব্যাধি কোথায়, প্রতীকারের চেষ্টাও দেখ্‌তুম। কিন্তু হতভাগা যে মনের মধ্যে গুমরে গুমরে মরতে চায়, কাউকে তার অংশটুকুও দিতে সে ভয়ানক ভাবে নারাজ!

—কিছু্ই বলেনি' মোহিত?

—বলেছিল, কাল্‌কে নাকি কী একটা কাণ্ড হয়েছে তোমাদের…তোমরা পরস্পরের সম্বোধনটাকে নাকি একটু সংক্ষিপ্ত এবং সু-উচ্চার্য্য করে নিয়েছ!

হেসে শীলা বল্‌লে, যদি শুধু এই ঘটে থাকে তাহ'লে এর জন্যে এতখানি ব্যাকুলতার প্রয়োজন যে কী সে ত আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, যোশী…

—ব্যাকুলতা আমার হতনা, যদি সেন আমার মত ছন্নছাড়া উদাসী হত!

প্রতিবাদ ক'রে শীলা বল্‌লে, নিজের প্রতি অবিচার করোনা, যোশী…তুমি যদি ছন্নছাড়া উদাসী তাহ'লে ভোগকামী কে?

কথোপকথনে তাদের উপস্থিত সমস্যা সেনের মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোনই সমাধান হ'ল না। অবশেষে শীলা বল্‌লে, আমি একবার দেখে আসিগে মোহিতের কী হয়েছে, কী বল?

যোশী বল্‌লে কী আর বল্‌ব?…ওষুধও তুমি, বিষও তুমি; তোমার একটা বিষে যদি আরেকটা বিষ ছাড়ে তাহ'লে আমি আমার বন্ধুর হ'য়ে তোমার কাছে চিরদিনের জন্য কেনা হয়ে থাক্‌ব।

হেসে শীলা বল্‌লে, শুধু বিষে বিষ ছাড়ে না, যোশী, ওষুধেও বিষ ছাড়ে।

পথে মিস্ হিলের সাথে দেখা। এডেনে সে যে কালো ছেলেদের একজনের সাথে গিয়েছিল তা' মিস্ হিলের নজর এড়ায়নি'। রাত্রিবেলা শীলা খুব দেরীতে শুতে আসায় এবং ভোরবেলার সকলের আগে বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়ায় মিস্ হিল শীলার সাথে একবার বোঝাপড়া করতে পারেননি'। এখন শীলাকে দ্রুতগতিতে সেকেণ্ডক্লাসের দিকে যেতে দেখে পথ রুখে দাঁড়িয়ে মিস্ হিল বল্‌লেন, শীলা, তোমার সাথে আমার খুব দরকারী এবং জরুরী একটা কথা আছে।

কথাটা যে কী শীলা তা' মিস্ হিলের মুখভঙ্গী থেকেই খানিকটা আঁচ করে নিয়েছিল। শ্রাবণ গগনের থম্‌থমে মেঘভরা মিস্ হিলের মুখ—যেন কোন একটা উচ্ছ্বাসে নিজেকে নিষ্কাশিত করে ফেল্‌তে পার্‌লে বাঁচে!

শীলা প্রতীক্ষমানা মুখে তাকালে।

মিস্ হিল প্রশ্ন কর্‌লেন, কাল এডেনে কার সাথে যাওয়া হয়েছিল শুনি?

খুবই শান্তস্বরে গম্ভীর ভাবে শীলা বল্‌লে, আমার এক ভারতীয় বন্ধুর সাথে…

মিস্ হিল দপ্ করে জ্বলে উঠে বল্‌লেন, তোমার হয়ত আত্মসম্মান জ্ঞান থাক্‌তে না পারে, শীলা, কিন্তু চোখের সাম্‌নে আমি আমাদের সবাকার এই অপমান ভরা প্রহসনের খেলা ঘট্‌তে দেব না!

দৃঢ়স্বরে শীলা জবাব দিলে, অপমান বোধ যদি তোমাদের থাক্‌ত, মিস্ হিল, তাহ'লে এমন নির্লজ্জের মত এমন কথা আজ তুমি বল্‌তে না!…আমার ব্যবহারের মধ্যে তুমি অন্যায়টা দেখ্‌লে কোথায় শুনি?…যোশী, সেন এরা তোমার জিমি আর ব্ল্যাকির চেয়ে কোন্ অংশে ছোট?…আমি যদি আজ সারারাত জিমির সাথে ঢলাঢলি করি তাতে আমার বা তোমার মর্য্যাদা ও শ্রী একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না, অথচ যোশী বা সেনের সাথে খানিকক্ষণ বেড়ালে বা গল্প কর্‌লে তোমাদের সবার মুখে চুণকালি পড়বে!

রাগে মুখ চোখ লাল ক'রে মিস্ হিল বল্‌লেন, সাবধান হয়ে কথা ব'লো, শীলা…কাদের সাথে কাদের তুলনা কর্‌ছ একবার ভেবে দেখ!

তীব্রকণ্ঠে শীলা জবাব দিলে, তুলনায় ভুল হয়েছে সে আমি স্বীকার কর্‌ছি!…মানুষের সাথে বাঁদরের তুলনা কখনও শোভা পায়না!

ব'লে আর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে শীলা গট্‌গট্‌ ক'রে তার গন্তব্যপথে চলে গেল।

মোহিত তখনও ডেক্‌চেয়ারে নিমীলিত চোখে শুয়েছিল। শীলা এসে মুগ্ধনেত্রে খানিকক্ষণ মোহিতের তন্দ্রালস মুখটির দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর আস্তে আস্তে তার কপালে হাতটি দিয়ে ডাক্‌লে, মোহিত···

মোহিতের কাছে এই আহ্বান ঠেক্‌ল দূরাগত বাঁশীর ডাকের মত। সুরের রেশটি তার অর্দ্ধচেতন মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মৃদু এক নৃত্যের সুরু ক'রে দিলে।

শীলা আবার ডাক্‌লে, মোহিত···

এবার মোহিতের তন্দ্রা ভাঙ্‌ল। চোখ খুলে সম্মুখেই শীলাকে দেখে সে প্রথমে একটুখানি চম্‌কে উঠ্‌লে, আর তার দৃষ্টি গেল ডেকটার একটা survey দিতে···কেউ শীলার এই স্নেহভরা ডাক শুনেছে কিনা।

ডেক্‌ লোকের ভীড়ে জম্‌কালো না হ'লেও দর্শক এবং শ্রোতার অভাব ছিলনা। মোহিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত এদিক্‌ ওদিক্‌ তাকালে, কিন্তু শীলা একটুও ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মোহিতের পাশে বসে প্রশ্ন করলে, শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে কি, মোহিত?

মোহিত এর কী জবাব দিবে বুঝতে পারলে না। ঘাড়টি নেড়ে জানালে যে শারীরিক সে বেশ সুস্থই আছে।

শীলা আবার প্রশ্ন করলে, তাহ'লে কি মন ভারী হয়েছে তোমার? দেশের কথা মনে পড়েছে?

শীলার এই প্রশ্নে মোহিতের চোখ দিয়ে হু হু করে জল-ধারা বেরিয়ে এল। সে কোন ক্রমে অশ্রু সংবরণ করে বললে, আমাকে প্রশ্ন করোনা, শীলা...

শীলা আস্তে আস্তে দরদমাখা ভঙ্গীতে তার মাথাটার উপর হাত রাখলে, তার অসম্বৃত চুলগুলোর মধ্যে চাঁপার কলির মত আঙুলগুলো একবার চালিয়ে দিলে।

মোহিত খানিকক্ষণ নীরবে শীলার স্পর্শটুকু উপভোগ করছিল, তারপর আস্তে আস্তে বললে, আমার মন যে এত কোমল তা' আমি জান্‌তুম না···

শীলাও তেমনি সুরে, যেন আর কেউ শুনতে না পায় এম্‌নি ভঙ্গীতে বললে, তাতে লজ্জার কি আছে মোহিত?

একটি অদ্ভুত হাসি হেসে মোহিত বললে, লজ্জার কিছু আছে তা' ত' আমি বলিনি', শীলা।···আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি শুধু এই ভেবে যে এ কয়দিনের পরিচয়ে তুমি কী করে আমায় এতখানি আপন করে নিলে।···আর যে আমি তোমাদের জাতকে কখনও ভালোবাস্‌তে পারব এই কল্পনাটাকেই স্বপ্নেরও অতীত ব'লে ভাবতুম সেই আমি ও কী ক'রে তোমার কাছে এত শীগ্‌গীর ধরা দিলুম!

মৃদুকণ্ঠে শীলা বললে, সাগরের দোলানিতেই এসব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে, মোহিত। তুমি ভেবোনা, দোলানি যেই থাম্‌বে তোমার মনের নাচও বন্ধ হবে!

আহতকণ্ঠে মোহিত বললে, তুমি ভুল বুঝ্‌ছ, শীলা, দোলানিকে আমি খারাপ বল্‌ছি না মোটেই, শুধু ভাবছি, দোলানি ত বন্ধ হবে, কিন্তু মনের নাচ যদি বন্ধ না হয়!

হেসে শীলা বললে, তোমার অন্তর স্পন্দনের উৎস হচ্ছে এই দোলানি; উৎস যখন শান্ত হয়ে যাবে, স্পন্দন বন্ধ হ'তে বাধ্য!

দুপুরবেলা সেকেণ্ডক্লাশ স্মোকিং-রুমে এককোণে খুব জটলা হচ্ছিল। শীলা আর মোহিতের নিবিড় আলোচনার দৃশ্যটুকু অনেকের চোখই এড়ায়নি'; এরকম ঘটনা সেকেণ্ড ক্লাশ ডেকে সচরাচর ঘটেনা, তাই আলোচনা আর মন্তব্যের প্রস্রবণ ছুটেছিল অবাধে।

ডাক্তার বর্ম্মণ খুব বিজ্ঞের হাসি হেসে বল্‌ছিলেন, অভিনয় এ জাহাজে অনেক দেখেছি, মশাই, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এমন সাদাসিধে গোবেচারীকে এমন ফাঁদে পড়তে কখনও দেখিনি'।

আহম্মদ প্রতিবাদ ক'রে বললে, সাদাসিধে বল্‌বেন না, ডাক্তার···ওর পেছনে অনেকখানি দুষ্টবুদ্ধি লুকানো আছে এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি।

চিদম্বরম্‌ এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল; একটা নতুন কিছু বল্‌বার জন্যে তার মন উৎসুক হ'য়েছিল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লে, ও ত আমারই ক্যাবিন্‌-মেট্‌, আমি ওর খবর

বেশ জানি! কালকে দু'জনে একা গিয়েছিল এডেনের পাহাড়ে...বেড়াতে···

ডাক্তার বর্ম্মণ একটু ক্রূর হাসি হেসে বল্‌লেন, শুধু বেড়াতে নয়, মশাই!...বলুন, চোখ টিপ্‌তে, মুচ্‌কে হাস্‌তে, মাথায় হাত বুলাতে, আবো কত কি!

সবাই ডাক্তার বর্ম্মণের কথায় হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লে।

ডাক্তার বর্ম্মণ বল্‌লেন, আর একটা ছোকরা যে আছে, যোশী না কোশী কী নাম ওর, সে ভয়ানক ধুরন্ধর কিন্তু!... ওর চেহারা দেখ্‌লেই বোঝা যায় বেশ কিছু ফূর্ত্তি ক'রে নিয়েছে মেয়েটার সাথে, তারপর বুদ্ধিমানের মত সরে পড়েছে।

চিদম্বরম্ বল্‌লে, তাইত সেনের জন্য দুঃখ হয়, মশাই! যোশীর সাথে আমারও আলাপ আছে, সেনের গভীর বন্ধু সে, তাই ওর কাছ থেকে কথা বার করা মুস্কিল।...কিন্তু আগুন তো আর লুকানো থাকে না। যোশীর সাথে মেয়েটার পরিচয় বহুদিনের...

আহম্মদ হাই তুলে বল্‌লে, সে যাই হোক্, সেনকে একটু হিংসে না ক'রে পাচ্ছি না, ডাক্তার বর্ম্মণ। এই ত আমরাও যাচ্ছি, আমাদের ভাগ্যে ত এমন তুষারনিন্দিত শুভ্রকোমল হাতের স্পর্শ জুটল না।

ডাক্তার বর্ম্মণ একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্‌লেন, ভারী ত ভাগ্য! এমন ভাগ্যের মুখে আগুন!...কোথাকার কোন এক ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে, সে আমার প্রেমে পড়্‌ল না ব'লে বুঝি আমার ঘুম হবে না?...ছোঃ!···

চিদম্বরম্ প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, ওখানে ভুল করলেন, ডাক্তার। ও ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে যে নয় তা' ওর চালচলন থেকেই বোঝা যায়।...তাছাড়া যোশী আমায় বলেছে, মেয়েটার সাথে তার আলাপ হয় কলেজে, যেখানে যোশী পড়্‌ত।

আহম্মদের এই প্রথম বিলাত যাত্রা, এর আগে সে কখনও বিলাত-ফেরত সমাজের সংস্পর্শে আসেনি'। ল্যাণ্ড্‌লেডী এবং অভিজাতের মধ্যে তফাৎটা কোথায় তা' তার বিচারের অতীত। সে চুপ ক'রে রইলে।

ডাক্তার বর্ম্মণ আগেরই মত তাচ্ছিল্যের সুরে বল্‌লেন, আপনিও যেমন, যোশীর কথা বিশ্বাস করেন!...আর, আমি নিজেই কতবার আমার মেয়ে-বন্ধুদের সম্বন্ধে বলে বেড়িয়েছি যে তারা অমুক ব্যারন্ বা নাইট্‌এর দৌহিত্রী বা ভাইঝি! তাই বলে কি সত্যিই তারা তাই ছিল?

অকাট্য যুক্তি!···নিজের ব্যবহারগত অভিজ্ঞতার দোহাই, এর সাথে আর তর্ক চলে না!

আহম্মদ বল্‌লে, মেয়েটির চেহারার মধ্যে লালিত্য আছে কিন্তু বেশ!

ডাক্তার বর্ম্মণ জবাব দিলেন, ওরকম চেহারা অনেক দেখ্‌তে পাবেন, মশাই; একবার বিলিতি ডাঙায় পা' দিন! তখন আপনাকে খুঁজে পেলে হয়!···ভারী ত' চেহারা, যেন আদরে খুকী আর কি!

চিদম্বরম্ সায় দিয়ে বল্‌লে, আর কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে! আমি একটুখানি শুন্‌ছিলুম, সাগর দোলা সম্বন্ধে কী যেন বল্‌ছিল।

প্রাজ্ঞের মত ডাক্তার বর্ম্মণ বল্‌লেন, বল্‌ছিল বোধ হয়, আমাদের এই ভাবটুকু সাগর দোলারই মত···তোমাকে খানিকটা চঞ্চল ক'রে রেখে আমি অন্য নৌকায় দোল দিতে যাব!

লীলা চলে যাবার পরও মোহিত চুপ করে শুয়ে রইলে। তার অস্পষ্ট ভাবনাগুলোর উপর ঝরে পড়্‌ছিল সমুদ্রের ছলছল্ শব্দ···ধারা হ'য়ে। নিবিড় তরুপল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট ছোট্ট একটি দ্বীপের মত সে সর্ব্বান্তঃকরণে নিজকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিল।...লীলার স্নেহস্পর্শে তার মনের সঙ্কোচ অনেকখানি কেটে গিয়েছিল...তার সমস্ত অন্তর ছাপিয়ে একটি ঘনীভূত অনুভব জেগে উঠ্‌ছিল, যার নাম দেওয়া যায়, তৃপ্তি। অনবচ্ছিন্ন এক গভীর ভাবে তার মন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

চুপটি ক'রে সে লোহিত সাগরের বুকে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলোর খেলা দেখ্‌ছিল। রূপে, রং-এ, আলোয় সেগুলো তার মনের অস্ফুট অথচ পরিপূর্ণ ভাষার প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল। সে ভাব্‌ছিল, সংসার কি বিচিত্র! যে বিরাট শূন্যতা তার মধ্যে এতদিন ছিল, যার কথা সে

এতদিন চিন্তাই করেনি, তা' যেন ধীরে ধীরে সমুদ্রের কল্লোলে পূর্ণ এবং সমগ্র হ'য়ে উঠ্‌ছিল। সমুদ্রের এই দুঃসাহসিক স্পর্দ্ধায় তার মনে গভীর বিস্ময়ের সুর বেজে উঠ্‌ছিল।

যে ব্যথার ভাবটা তাকে এতক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল তা' আস্তে আস্তে কমে আস্‌ছিল। শীলার সাথে তার মনের সম্বন্ধটা সে একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করবার চেষ্টা করছিল। শীলার সাহচর্য্য তার ভালো লাগে এটা মনের কাছে স্বীকার করতে সে আর দ্বিধাবোধ করছিল না।... এই ভালো লাগাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা' নিয়ে এখনই গবেষণা করাটা সমীচীন নয় এ সিদ্ধান্তে সে এসে পড়েছিল। ভালো লাগে, এই যথেষ্ট নয় কি? মানুষ ত' আর একটা জায়গায় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে না—প্রবহমান ঘটনার সাথে সাথে পরিচয়ের দ্বার সে উদ্ঘাটন করতে থাকে।

মনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ক'রে নিয়ে মোহিত উঠে দাঁড়ালে। রেলিং-এর সাম্‌নে এসে একবার ঝুঁকে জলের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে—মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণ-সম্পাতে জলটা ঝল্‌সে উঠেছে।

শীলা যখন মোহিতকে ওষুধ দিতে চলে গেল তখন যোশী খানিকক্ষণ চুপটি ক'রে শীলার চেয়ারে বসে রইলে। অন্যমনস্কভাবে সে শীলার পরিত্যক্ত একখানা মাসিক কাগজের পাতা উল্‌টাচ্ছিল এমন সময় কর্ণেল গ্রীণ এসে হঠাৎ বল্‌লেন, মাপ করবেন, আপনার সাথে একটু আলাপ করতে পারি কি?

যোশী মুখ তুলে তাকিয়ে দেখ্‌লে আগন্তুককে সে চেনে না। একটু বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বল্‌লে, নিশ্চয়ই...

—আমার নাম হচ্ছে কর্ণেল গ্রীণ, আমি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছি...আপনি বোধ হয় এই প্রথম ইণ্ডিয়া ছাড়্‌ছেন?

যোশী এর আগে কর্ণেল গ্রীণের নাম শোনেনি...শীলা এর কথা গল্পচ্ছলেও কখনও বলেনি। বল্‌লে, oh no, আমি দু'বছর বিলেতে ছিলুম, ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসেছিলুম, আবার ফিরে যাচ্ছি...আমার নাম হচ্ছে যোশী...

কর্ণেল একটুখানি দমে গেলেন। তারপর বল্‌লেন, আপনার সাথে শীলা রজার্স বলে একটি প্যাসেঞ্জারের পরিচয় আছে?

যোশী ধীরে ধীরে ব্যাপারটা আঁচ করে নিচ্ছিল। বল্‌লে, সে সম্বন্ধে আপনার সাথে আলোচনা করতে আমি বাধ্য কি?

কর্ণেল দেখ্‌লেন যোশী খুব সোজা প্রকৃতির ছেলে নয়। বেশ মোলায়েম সুরে বল্‌লেন, অবশ্যি আপনি বাধ্য নন্, তবু জিজ্ঞেস্ করছি এই জন্যে যে মেয়েটি আমাদেরই সহযাত্রিণী, আমি তার একপ্রকার অভিভাবক বল্‌লেই চলে এবং আইন অনুসারে সে এখনও নাবালিকা...

যোশী খুবই শান্তসুরে বল্‌লে, এসব বলার তাৎপর্য্য?

—তাৎপর্য্য বিশেষ কিছুই নয়; তবে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, মিঃ যোশী, মেয়েটির বাবা যদি শুনতে পান যে সে তার অভিভাবকদের কথা শুনছে না, আর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহ'লে তার অনেক দুর্গতি হবার সম্ভাবনা আছে।

যোশী বেশ শান্তসুরে বল্‌লে, তার মানে আপনি বল্‌তে চান যে মিস্ রজার্স আমার এবং আমার বন্ধুর সাথে মাঝে মাঝে আলাপ করেন ব'লে তাঁর বাবা তাঁকে লাঞ্ছনা এবং অবমাননায় ফেল্‌বেন, এবং প্রকারান্তরে তার জন্যে আমরাই হব দায়ী?

কর্ণেল গ্রীণ মনে মনে যোশীর বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে থাক্‌তে পারছিলেন না। বল্‌লেন, আপনি সংক্ষেপে বিষয়টা ঠিকই বর্ণনা করেছেন, মিঃ যোশী...

যোশী বল্‌লে, মিস্ রজার্স এর অবমাননা বা লাঞ্ছনার কারণ আমরা কেউই হ'তে চাইনে, কর্ণেল গ্রীণ, এটা আপনি তাঁকে খুব বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। আর, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে অপমানের মুখে ফেল্‌বার জন্যে আমাদের কারোরই আগ্রহ নেই...তার চেয়ে সময় কাটাবার মত উপযোগী কাজ আমাদের অনেক আছে।

শান্তভাবে কথাটা বল্‌লেও তার মধ্যে খোঁচা ছিল অনেকখানি। কর্ণেল গ্রীণ একটুখানি লজ্জিত হয়ে বল্‌লেন, আপনারা ইচ্ছা করে মিস রজার্সকে অপমানের মুখে ফেল্‌তে চাচ্ছেন এমন ইঙ্গিত আমি করিনি', মিঃ

যোশী।···সত্যি কথা বল্‌তে কি, মিস্ রজার্স যদি আমার মেয়ে হ'ত তাহ'লে আমি এরকম ভাবে আপনার কাছে এ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উপস্থিত হতুম না।···মানুষে মানুষে-সম্বন্ধের মর্য্যাদা আমিও একটু বুঝি, মিঃ যোশী; কেবল মেয়েটার ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনার কথা ভেবেই আপনার সাথে এ আলাপটুকু করলুম, আপনি কিছু মনে করবেন না।

যোশী হাসিমুখে বল্‌লে, মনে কিছু করি আর নাই করি, কর্ণেল, আপনাদের এই বর্ণ-সমস্তার সমাধান ত' তাতে হবেনা!

ফার্ষ্টক্লাশ স্মোকিং-রুমেও আলোচনা হচ্ছিল মন্দ নয়। মিস্ হিল ছিলেন তার উদ্যোক্তা। যেন ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটেছে এম্‌নি ভাবে জল্পনা হচ্ছিল আর প্রতীকার নির্দ্ধারণের চেষ্টা হচ্ছিল। জিমি আর ব্ল্যাকি দলের মধ্যে যে ছিল সেটা নিশ্চয়ই আর বিশেষ ক'রে বলে দিতে হবে না···আর অপবিত্রতার সাথে ভারসাম্য রক্ষা কর্‌বার জন্যে ছিলেন দু'জন মেয়ে মিশনারী যাত্রী।

শীলা রজার্স্‌কে যে কিছুতেই উচ্ছন্নের পথে যেতে দেওয়া হবে না এ বিষয়ে তারা সবাই একমত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কী ক'রে স্রোতকে রোধ করা যায় সেটা তারা কিছুতেই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না।

মিস্ হিল বল্‌লেন, আমি ওকে অনেক ভয় দেখিয়েছি, বাপু, কিন্তু এমন লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, একটুখানি ও কাঁপে না।

জিমি বল্‌লে, আমার মনে হয় এর মধ্যে সেই কালো ছেলে ছুটোর যোগ আছে। শীলাকে আমি খুব ভালো রকমই জানি, নিজে ওর এতখানি সাহস হবে না যে আমাদের সকলের বিরুদ্ধে যায়।

ব্ল্যাকি প্রস্তাব করলে, একবারটি ওদের একটুখানি নাকানিচুবানি দিলে কেমন হয়?···বলেই সে আস্তিন গুটালে, তার স্ফীত মাংসপেশীগুলোর দিকে প্রশংসাসূচক চোখ কয়েক জোড়া পড়্‌বে এই আশায়।

জিমি দুঃখভরা সুরে বল্‌লে, মুস্কিল হচ্ছে এই যে এটা একটা জাহাজ, এবং এর মধ্যে যা' কিছু কর্‌তে হয় সাবধানে কর্‌তে হ'বে।

কর্ণেল গ্রীণ এমন সময় যোশীর সাথে কথাবার্ত্তা শেষ করে তাঁর ক্যাবিনের দিকে যাচ্ছিলেন। মিস্ হিল তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে ডাক্‌লেন, কর্ণেল, এখানে এসো, বড্ড জরুরী কাজ আছে।

কর্ণেল এগিয়ে এলেন। মিস্ হিল বললেন, আমরা বড্ড সমস্যার মধ্যে পড়েছি শীলাকে নিয়ে, কর্ণেল। তুমি ত' অনেক ফন্দীফন্দী জান, কী ক'রে ওকে ঠিক আগেরটির মত ক'রে নেওয়া যায় বল দেখি!

খুবই গম্ভীরভাবে কর্ণেল গ্রীণ বল্‌লেন, মিস্ হিল, আমার উপদেশ আপনারা শুন্‌বেন না জানি···তবু আমি বল্‌ছি, শীলা রজার্স এর এই ব্যাপারে আপনারা হস্তক্ষেপ না করে তাকে তার স্বাধীনতাসহ ছেড়ে দেওয়াই বোধ হয় সুরুচিসঙ্গত হত।

তাঁর উপদেশ কারো মনঃপূত হবেনা তা' কর্ণেল জান্‌তেন। মিস্ হিলের আহ্বানের জবাব দিয়ে তিনি আর কোনপ্রকার আলোচনার অপেক্ষা না রেখে চলে গেলেন। ভিজিল্যান্স কমিটির সভা ভাঙ্‌ল লাঞ্চের ঘণ্টার সাথে সাথে।

কর্ণেল গ্রীণের সাথে যে কথোপকথন হ'ল তা মোহিতকে বলা সঙ্গত কিনা যোশী বার কয়েক ভাব্‌লে। তারপর স্থির কর্‌লে সব ঘটনা মোহিতকে জানিয়ে রাখাই ভালো। ঘটনার সমাবেশ যা' হয়েছে তাতে কখন কী হয় তা' বলা যায় না, তখন যদি মোহিত বেচারীকে দ্বিধা এবং দ্বন্দের মাঝখানে পড়্‌তে হয় তার জন্যে দায়ী হবে যোশী নিজে।

মোহিত খুব গম্ভীরভাবে যোশীর কথাগুলো শুন্‌লে। প্রথমে কর্ণেল গ্রীণের উপর সে অনেকখানি রুষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। অবশেষে সে স্থির কর্‌লে যে যা' হবার হয়েছে, বেশীদূর আর সে এগোবেনা···মিস্ রজার্স এর সান্নিধ্য সে এড়িয়ে চল্‌বে।···এত' সাগরদোলায় ঢেউ, বাতাসের গতি বদ্‌লে গেলে ঢেউএর উত্থান পতনও নতুন এক সীমারেখার দিকে ছুটবে!

মনকে বোঝান কিন্তু শক্ত। সারাটি দিন মনের সাথে তার বোঝাপড়া চল্‌ল। যোশীব কথার এক ধাক্কায় তার

মনের বেড়া গেল ভেঙে। দেখ্‌লে, এতদিন সে যাকে ভেবেছিল শুধু ভালোলাগা, তা' তার অজ্ঞাতে কোন্ এক ফাঁক দিয়ে এসে জড়িয়েছে তার সমস্ত সত্তাকে—বেদনা এবং আনন্দ নিবিড়ভাবে মিশে মনটাকে করে দিয়েছে এলোমেলো।

ইজিপ্ট্ থেকে বন্ধু শোভনলালকে কল্‌কাতায় সে চিঠি লিখতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল। সে লিখ্‌লে:

"ভাই শোভনলাল,

যদিও দেশের মাটি ছেড়েছি আজ হপ্তাখানেকের বেশী হয়নি', তবু যেন মনে হচ্ছে দেশ ছেড়ে এসেছি যুগযুগান্তর আগে। একটা ধূমকেতুর ধাক্কায় যেন দেশের বুক থেকে ছিট্‌কে পড়েছি, মাধ্যাকর্ষণটা কেটে গেছে, তাই ফির্‌বার আর পথ খুঁজে পাচ্ছিনা। ...মাটির বাঁধন ত' খুলেই গিয়েছিল, চলার বাঁধনও বুঝি এবার খুল্‌তে চল্‌ল। পথহারা আমি ভাব্‌ছি মিশরের মরুস্থানের মধ্যেই আমার আস্তানা গাড়্‌ব কি না!

তুমি তোমার নৃতত্ত্বের রসের মধ্যে বসে বসে হাস্‌বে তা' আমি জানি। এসব বাঁধনের খবর তোমার পাথরে গড়া মনের ত্রিসীমানার মধ্যেও পৌঁছায় না। আমি মিশরের যেখানেই বাসা করিনা কেন, তুমি ভাব্‌বে ভালোই আছে সেখানকার মামি এবং ফারাওদের মধ্যে।...এদের বাদ দিয়ে শুধু আমার কথাটি যদি কখনও তোমার মনে উঁকি মারে সে আমার সৌভাগ্য।

তুমি ভাব্‌ছ, বন্ধুটির আমার হ'ল কী? হ'বার মত যদি কিছু হ'ত তাহ'লে তবু একটা সান্ত্বনা থাকত।...না হওয়ার অতৃপ্তি আমায় পেয়ে বসেছে, শোভনলাল। বাঁশীর সুর কানে এসে পৌঁছেছিল, সুরের অধিনায়িকার স্পর্শটুকু কিন্তু পেলুম না।

কানে না আস্‌তে আস্‌তেই এই হারিয়ে যাওয়ার জন্যে দুঃখ একটু হচ্ছে বৈ কি! তুমি বল্‌বে, মেলানেশিয়ার অনেক দ্বীপপুঞ্জেই সেখানকার আদিম অধিবাসীদের কানে এমন অনেক সুর এসে লাগে, আবার হারিয়ে যায়...তাতে তারা ভ্রূক্ষেপও করে না। তারা নিজেদের প্রাণের স্পন্দনে চল্‌তে থাকে, মনের গানের তালে তালে—বাইরের সুরের প্রতীক্ষায় নয়।

সে যাই হোক্, বন্ধু, এই আলো-ছায়ার মাঝখানে অস্পষ্ট আঘাতেরও দাম আছে, তাই আমি ব্যথার মধ্যেও আলোর রেখা দেখ্‌তে পাচ্ছি।

মনে কী হচ্ছে তা' বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পার্‌লুম না।...তোমার ল্যাবরেটারী হচ্ছে বিশ্বজোড়া মানুষের মন আর তার ব্যাপকতা হচ্ছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। আমার চিঠিখানা তোমার ল্যাবরেটারীর মধ্যে যদি তোমার সাধনায় একটুও বিঘ্ন ঘটায় তাহ'লে আমার আনন্দ হবে অপরিসীম।

—তোমার মোহিত।"

চিঠি লেখা ত' শেষ হ'ল, কিন্তু ইজিপ্টে পৌঁছবার যে তখনও আরো আড়াই দিন বাকী! চিঠিখানা নিয়ে মোহিত খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া কর্‌লে, তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ষ্টীমারের ডাক বাক্সে ফেলে দিলে।...যদিও সে জান্‌ত, ইচ্ছা কর্‌লেই ষ্টুয়ার্ডকে ব'লে সে চিঠিখানা আবার তুলে নিতে পারে, তবু সেটা ফেলার সাথে সাথেই তার এক স্বস্তির নিঃশ্বাস্ বেরুল, যেন সে তার মনের রুদ্ধ আবেগ পরিচিত কারও কাছে বলে ফেল্‌লে।

সারাটা দিন মোহিত একটু অন্যমনস্কভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালে। যোশী মোহিতকে খানিকটা ভাব্‌বার অবসর দিয়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। চিদম্বরম্, ডাক্তার বর্ম্মণ প্রমুখ সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে খুব হাসি ঠাট্টা কর্‌ছিলেন · বোধ হয় মোহিতকে নিয়েও খানিকটা।

শীলা রজার্স সেই যে ফার্ষ্ট ক্লাশ ডেকের মধ্যে আত্ম-গোপন করেছিল তার আর পাত্তাই ছিল না। এক একবার মোহিতের মনে দুর্দ্দমনীয় একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌ছিল শীলা রজার্স্‌এর মুখোমুখী হ'য়ে তাকে প্রশ্ন করে, এমন প্রহসন কর্‌বার প্রয়োজনটা কী ছিল?...তীব্রস্বরে সে শুধোবে, তরুণ একটা মন নিয়ে না খেল্‌লে কী চল্‌ত না?...ব'লে তার মুখের উপর রেখার বিন্যাস দেখ্‌বে, তার আঁখির পাতা নড়ে কি না লক্ষ্য কর্‌বে...

(ক্রমশঃ)

নবগোপাল দাস

দারা ও সুজার শেষ জীবন

অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু এম-এ

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৪

২রা জুলাই তারিখে সম্রাট আওরংজীব জিওয়নএর দ্বারা লিখিত এক পত্রে জানিতে পারিলেন যে, দারা বন্দী হইয়াছেন। এই পত্রটি তিনি দরবারে সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিলেন। "হৃদয়াবেগ দমন করিবার কী অদ্ভুত তাঁহার ক্ষমতা। তিনি কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি কোন উল্লেখই করিলেন না। রাজ বাদ্যকারেরা জয়সূচক কোন রাগিনী আলাপ করিল না।" তাঁহার এক প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবম্বিধ উপায়ে বন্দী হইবার সংবাদে তিনি যে মনের মধ্যে উৎফুল্ল হন নাই এমত হইতে পারে না। তবে তিনি কেন নিজের ভাব তরঙ্গ রোধ করিলেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তিনি এই সংবাদের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। সম্রাট যখন বাহাদুর খাঁ কর্ত্তৃক লিখিত এক পত্রে জানিতে পারিলেন যে, দারা তাঁহার নিকট বন্দী রহিয়াছেন তখন আর তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। দরবারে তখন আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল।

বন্দীগণ দিল্লী পৌঁছিল। দারাকে অবজ্ঞাভাজন করিবার জন্য জনসাধারণ সমক্ষে প্রদর্শন করা হইল। এই উপেক্ষিত ব্যক্তিই যে দারা ইহা পুরবাসী সকলকে নিঃসন্দেহ-রূপে জানাইবার উদ্দেশ্যেই সম্রাট আওরংজীবের এই ব্যবস্থা। এইরূপ করিলে ভবিষ্যতে কোন কৃত্রিম দারা উদ্ভূত হইয়া প্রজাবর্গের সাহায্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। সহরের প্রধান রাজপথ দিয়া বন্দীদিগকে লইয়া যাওয়া হইল। ধুলায় ধূসরিত এক হস্তিনীর পৃষ্ঠে, নগ্ন হাওদার উপর দারাকে বসান হইল। পার্শ্বে তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয় পুত্র সিপির সুকোর আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। উভয়ের পশ্চাতে নিষ্ঠুরতার প্রতীক ভীষণকায় নজর বেগ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে উপবিষ্ট। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সিংহাসনের নির্ব্বাচিত উত্তরাধি-কারীর পরিধানে আজ এক মোটা পরিচ্ছদ; তাহাও আবার পর্য্যটনজনিত ধুলা ও মলিনতায় পরিপূর্ণ! শিরোদেশে ভিখারীর উপযোগী কাল রঙ্গের এক অপরিষ্কার উষ্ণীষ! পিতাপুত্রের সুকোমল অঙ্গ আজ অলঙ্কার বিহীন! পাদদেশ লৌহ নিগড়ে বদ্ধ, কিন্তু দুইটি কর শৃঙ্খলমুক্ত। সেই পুরাতন দৃশ্যপট—সেই চিরপুরাতন রাজপথ, অট্টালিকা সমূহ বৃক্ষ শ্রেণী; এমন কি, প্রত্যেক ধূলিকণা পর্য্যন্ত সাহজাদার স্মৃতির সহিত বিজড়িত। সম্রাটের প্রিয়তম পুত্র দারা একদিন কতই না গৌরব ও মর্য্যাদার সহিত কতবারই না এই পথে যাতায়াত করিয়াছেন। আর আজ তাঁহার এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের দিনে, আগষ্ট মাসের দুঃসহ উত্তাপের মধ্যে এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় সেই চিরপরিচিত স্থান দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল দারুণ অপমানে মৃতপ্রায় সাহজাদা মুখ উত্তোলন করিতে পারিলেন না। নিষ্পিষ্ট পেলব বৃক্ষশাখার ন্যায় তিনি বসিয়াছিলেন। এমন সময় পথের পার্শ্বে এক ভিখারীর করুণ চীৎকারে দারা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ভিখারী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এই দীনহীন ভিখারীকে কি স্মরণ হয় সাহজাদা? তুমি যখন ক্ষমতার শিখরদেশে অধিষ্ঠিত ছিলে, এই দীন দরিদ্র এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষার জন্য লালায়িত কাঙ্গালকে কখনও তুমি বিমুখ কর নাই; আর, আজ—বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—তোমার নিজের এমন কিছুই নাই যাহা এই দরিদ্রকে দান

করিতে পার!" সাহজাদা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্কন্ধ হইতে নিজের উত্তরীয় উন্মোচন করিয়া ভিখারীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

সাহজাদার বাহ্যিক আড়ম্বর ও অদ্ভুত দানশীলতার জন্য নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। সুতরাং এই দুর্দ্দিনে তাঁহার এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে সকলেই শোকাকুল হইল। পুরবাসীগণের মনঃকষ্ট তাহাদের অন্যান্য হৃদয়বৃত্তি ভাসাইয়া লইয়া গেল। পথের উভয় পার্শ্ব লোকে লোকারণ্য হইল। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি শিশু সকলেই দারার দুর্গতির জন্য ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া মনে হইল যেন তাহাদেরই কোন বিপদ ঘটিয়াছে। কিন্তু হায়, বন্দীকে সাহায্য করিবার কোনই উপায় নাই। বন্দীদিগের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া উন্মুক্ত শাণিত তরবারি হস্তে অশ্বারোহী সিপাহীর দল ও তীরন্দাজগণ ধনুকের ছিলায় তীর রোপন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেছিল। আর, সর্ব্বাগ্রে সেনাপতি বাহাদুর খাঁ হস্তীপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতেছিলেন। এইরূপে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করাইয়া বন্দীদিগকে খাওয়াশপুরা প্রাসাদে কারারুদ্ধ করা হইল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময়, দারার সম্বন্ধে কি করা হইবে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য, আওরংজীব তাঁহার মন্ত্রীদের আহ্বান করিলেন। দানিশমন্দ খাঁ দারার পক্ষ হইয়া সাহজাদার প্রাণরক্ষার জন্য অনেক তর্কবিতর্ক করিলেন। কিন্তু, সায়েস্তা খাঁ, মুহম্মদ আমিন খাঁ ও বাহাদুর খাঁর মত হইল যে, ইসলাম ধর্ম্ম ও দেশের হিতের জন্য দারাকে মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া উচিত। অন্তঃপুর হইতে কনিষ্ঠ রাজনন্দিনী সাহজাহান-দুহিতা রৌশনারাও আওরংজীবের নিকট দারার মৃত্যু কামনা করিলেন। সুতরাং দারার যাহাতে প্রাণরক্ষা হয় এই ইচ্ছা অনেকের ভিতরে ভিতরে থাকিলেও সাহজাদী রৌশনারার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহই কিছু বলিতে সাহস করিল না। আওরংজীবের বেতন ভোগী মোল্লারা ফতোয়া (বিচার আজ্ঞা) দিলেন যে, দারা ইসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

হতভাগ্য সাহজাদা নিজের প্রাণরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। তিনি সম্রাটের নিকট সালিশি করাইলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। অবশেষে তিনি এই প্রার্থনা পত্র সম্রাট আওরংজীবকে লিখিলেন, "হে আমার সম্রাট ভ্রাতা। সিংহাসন লাভ করিবার আর কোন ইচ্ছাই আমার নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি ও তোমার পুত্রেরা এই সিংহাসন সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। আমাকে বধ করিবার যে ইচ্ছা তুমি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছ ইহা ন্যায়-সঙ্গত নহে। দয়া করিয়া, আমাকে একটি বাসোপযোগী বাটী দাও ও আমার সেবা করিতে পারে এমন এক পরিচারিকা আমার জন্য নিযুক্ত করিয়া দাও। আর আমি কিছুই চাহি না। তোমার এ উপকার আমি কখন জীবনে বিস্মৃত হইব না। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন তোমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমি প্রার্থনা করিব। আমায় প্রাণভিক্ষা দাও!" দারার আবেদনপত্রের এক পার্শ্বে আওরংজীব স্বহস্তে লিখিলেন, "তুমিই প্রথমে অন্যায়রূপে সিংহাসন অধিকার করিতে চাহিয়াছিলে। সমস্ত গোলযোগের মূলে তুমিই ছিলে।" দারার আবেদন অগ্রাহ্য হইল।

যে অপরাধ দারা করিয়াছেন তাহার ক্ষমা নাই! কিঞ্চিদধিক ষোড়শ বর্ষ কাল তিনি আওরংজীবের সুখ শান্তি, আশা ভরসা সমস্তই নষ্ট করিয়া আসিতেছেন। আওরংজীবকে তিনি পিতার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার কূট কৌশল ব্যর্থ করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট কুমন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে, আর ইহার ফলে সাহজাহানের নিকট আওরংজীব তিরস্কৃত হইয়াছেন। দারা আওরংজীবের বিরুদ্ধে গোলকোণ্ডা ও বিজাপুরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। আওরংজীবের প্রত্যেক শত্রুই দারার নিকট সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে। দারার কর্ম্মচারীরা আওরংজীবকে অপমানে ব্যথিত করিয়াছে, অথচ দারা তাহার কোনই প্রতিকার করেন নাই। এতদিন—এই সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসর কাল—আওরংজীব এই সকল অত্যাচার, অবমাননা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছেন। আর, আজ, তাঁহার প্রতিশোধ লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ সুযোগ তিনি কি করিয়া পরিত্যাগ করেন?

বিশ্বাসঘাতক মালিক জিউন সম্প্রতি একহাজারি পদে উন্নীত ও বখতিয়ার খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। একদিন—

সে দরবার অভিমুখে যাইতেছিল, এমন সময়ে দিল্লীর অধিবাসীরা তাহাকে আক্রমণ করিল (৩০এ আগষ্ট)। এই ঘটনাই দারার মৃত্যুর কারণ হইল। সেদিন রাত্রে কারাধ্যক্ষ নজর বেগ ও অপরাপর কতিপয় ক্রীতদাস খাওয়াসপুরা প্রাসাদের যে গৃহে দারা বন্দী ছিলেন, সেই
১ গৃহে প্রবেশ করিল। দারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। আগমণকারীদিগের নতজানু হইয়া দারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ?" তাহারা বলিল, "আমরা সিপির সুকোকে অন্যত্র লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।" বালক সিপিরও নতজানু হইয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। নজর বেগ রুক্ষ স্বরে বালককে দাঁড়াইতে আদেশ করিল। বালক আরও ভীত হইয়া পিতার পাদদেশ জড়াইয়া ধরিল। পিতা-পুত্র পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে, আততায়ীরা বালক সিপিরকে পিতার বাহুপাশ হইতে সবলে পৃথক করিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট জানিতে পারিয়া দারা তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করিলেন। তিনি এক শাণিত ছুরিকা লইয়া আততায়ীদের আক্রমণ করিলেন। ফলে, হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল ও দারাকে সকলে মিলিয়া নিরস্ত্র করিল। পরে, সব শেষ হইল। প্রকোষ্ঠে রক্তের ঢেউ খেলিয়া গেল। দারার দ্বিখণ্ডিত মস্তক আওরংজীবের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি ইহা দেখিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন,—"জীবিতাবস্থায় আমি এই স্বধর্মত্যাগী কাফেরের কখনও মুখ দর্শন করি নাই। তাহার মৃত্যুর পর তাহার দ্বিখণ্ডিত মস্তক দর্শন করিতে চাহি না।"

আওরংজীবের আজ্ঞানুসারে দারার মৃতদেহ হস্তীর পৃষ্ঠে বসাইয়া রাজপথ দিয়া দ্বিতীয়বার লইয়া যাওয়া হইল। পরে সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের গম্বুজের নিম্নে দারার নশ্বর দেহ সমাধি দেওয়া হইল।

৫

দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান সুকোর বিষয়ে এখন কিছু লা যাইবে। বেনারসের নিকট সুজাকে পরাজয় করিয়া, বিহার হইতে মুঙ্গের পর্য্যন্ত খুল্লতাতকে অনুসরণ করিবার সময় (মে, ১৬৫৮) সুলেমান সুকো পিতার নিকট শীঘ্র ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ পাইয়াছিলেন। ধর্ম্মৎ যুদ্ধে আওরংজীবের নিকট দারার পরাজয় হেতু সাহজাদা সুলেমান পিতার নিকট যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই কারণে সুলেমান খুল্লতাতের সহিত শীঘ্র সন্ধি করিয়া পিতার নিকট ফিরিলেন। পথে, এলাহাবাদ হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধ একশত মাইল পশ্চিমে সাহজাদা সংবাদ পাইলেন যে, সামুগড় যুদ্ধে তাঁহার পিতা পুনরায় আওরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সৈন্যেরা বিচলিত হইল। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুই সেনাপতি জয়সিং ও দিলির খাঁ ও অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীরা সাহজাদাকে পরিত্যাগ করিয়া আওরংজীবের পক্ষ লইল। সুলেমানের এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মাত্র ছয়হাজার সিপাহী তাঁহার সহিত যাত্রা করিল (৪ঠা জুন)। কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া এক সপ্তাহ সময় তিনি বৃথা নষ্ট করিলেন। তাঁহার সহিত মূল্যবান জিনিষপত্র, বাসন ও পুরমহিলারা ছিল। সাহজাদা উতলা হইলেন। অবশেষে, তাঁহার প্রধান অনুচরবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, বারহার সৈয়দ বংশধরের পরামর্শানুসারে সাহজাদার কাজ করা উচিত। সুলেমান দিল্লী সহরটিকে বেষ্টন করিয়া, গঙ্গার উত্তর তট দিয়া অগ্রসর হইয়া বারহার সৈয়দদিগের আবাস স্থান দোয়াবের মধ্যস্থল দিয়া যাত্রা করিবেন। পরে, পঞ্জাব প্রদেশে পিতার সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে পর্ব্বতের পাদমূলে নদী উত্তীর্ণ হইবেন।

নগিনা দেশের মধ্য দিয়া হরিদ্বারের অপরদিকে গঙ্গাকূলে অবস্থিত চণ্ডীনামক স্থানে সাহজাদা সুলেমান ছুটিলেন। প্রত্যহ বহু সংখ্যক সিপাহী তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। দিল্লী হইতে প্রেরিত আওরংজীবের সৈন্য, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে তাঁহার গতিরোধ করিল। সুতরাং সুলেমান আশ্রয় লাভের আশায় শ্রীনগরের দিকে ছুটিলেন। সাহজাদা কোন সৈন্য লইতে পারিবেন না, তবে তাঁহার সহিত তাঁহার পরিবারবর্গ ও মাত্র সতেরটি পরিচারক থাকিতে পারিবে, এই সর্ত্তে শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বী সিং

সুলেমানকে নিজের সহরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। পৃথ্বী সিং বিশেষ যত্ন সহকারে অতিথি সৎকার করিলেন। বিপদে পতিত রাজকুমারের যত্নের ত্রুটি হইল না। এই রাজার ব্যবহার ক্রমে অশিষ্ট হইলেও, সুলেমান এক বৎসর কাল তাঁহার নিরাপদ আশ্রয়ে বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করিলেন।

কিন্তু অবশেষে, আওরংজীব ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহোদরদিগকে পরাভূত করিয়া সুলেমানের বিপক্ষে অগ্রসর হইলেন। কাশ্মীর প্রদেশের রাজা যাহাতে সুলেমানকে সমর্পণ করেন এই উদ্দেশ্যে আওরংজীব রাজা রাজরূপকে পৃথ্বীর নিকট প্রেরণ করিলেন (জুলাই, ১৬৫৯)। কিন্তু প্রায় দেড়বৎসর কাল আওরংজীবের সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। পরে, জয়সিং, সম্রাটের আজ্ঞায় এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। জয়সিং পৃথ্বীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, সম্রাটের আজ্ঞা অমান্য করিলে মুঘলবাহিনী তাঁহার দেশ ধ্বংস করিয়া দিবে। কাশ্মীর নরপতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। আশ্রিতের সহিত তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিলেন না। কিন্তু বৃদ্ধ রাজার পুত্র ও কাশ্মীর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মেদিনী সিং ঘোর সংসারী ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, আওরংজীব নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পার্ব্বত্য রাজাদের কাশ্মীর আক্রমণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে তাঁহাদের এই অতিথিটিকে সম্রাটের নিকট সমর্পণ করিতে হয়। আর, এই কার্য্য করিলে সম্রাটের নিকট প্রচুর পারিতোষিক পাইবারও আশা আছে। সুতরাং, রাজকুমারের মন টলিল। তিনি সাহাজাদাকে ধরাইয়া দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ওদিকে, সুলেমান আশ্রয়দাতার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তুষারাবৃত পথের উপর দিয়া লদক দেশে পলায়ন করিলেন। তাঁহাকে অনুসরণ করা হইল। তিনি আহত অবস্থায় বন্দী হইলেন ও আওরংজীবের প্রতিনিধির হস্তে সমর্পিত হইলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁহাকে দিল্লী আনা হইল (জানুয়ারী, ১৬৬১)।

দিল্লী রাজপ্রাসাদের "দেওয়ানী খাস"-এ তাঁহাকে তাঁহার ভয়াবহ শৃঙ্খলতাতের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহ অল্প বয়স, অনুপম রূপরাশি, সামরিক খ্যাতি ও এবং দুর্গতি সভাসদবর্গের ও পুরমহিলাদের মনোযোগ আক করিল। কেহই অশ্রুরোধ করিতে পারিল না। অদৃ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সম্রাট সাহজাহানের জ্যেষ্ঠ ও প্রিয় পৌত্র সুলেমান হয়তো একদিন এই কক্ষের সিংহা অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন, কিন্তু হায়, আজ সাম এক বন্দীর মত তিনি তথায় নীত হইয়াছেন!! সম্র মনে করিলেন সুলেমান মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ভী হইয়াছেন, সেই জন্য সাহজাদার ভয় অপনোদন করিব উদ্দেশ্যে আওরংজীব বাহ্যতঃ তাঁহার সহিত সদয় ব্যবহ করিলেন। আওরংজীব সুলেমানকে সম্বোধন করি বলিলেন, "বালক! স্থির হও। তোমার সহিত কে নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইবে না। জগদীশ্বরের প্রতি অবিশ্বা হইও না। তোমার পিতা স্বধর্ম্মত্যাগী 'কাফের' ছিলে সেই অপরাধে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তু ভয় পাইও না।" সাহজাদা কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্যবাদ প্রদান সম্রাটকে কুর্নীশ করিলেন, ও কিছু পরে, কিছুমাত্র বিচলি না হইয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা! যদি 'পোস্তা' পান করাই আমায় বধ করিবেন সাব্যস্ত করিয়া থাকেন, তাহা হই আমি করযোড়ে মিনতি করি, এইমাত্র আমার জীবনলীল অবসান করুন।" তখন আওরংজীব ঈশ্বরের নামে শপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বালক, তুমি নিশ্চিন্ত হও এই পানীয় তোমাকে কখনও দেওয়া হইবে না।"

এই স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, উল্লিখিত "পোস্তা" ে যুগের এক পানীয়বিশেষ। পোস্তার বীজ পেষণ করিয় সমস্ত রাত্রি ইহা ভিজাইয়া রাখা হইত। সম্রাট, লোব লজ্জার ভয়ে গোয়ালিওর কারাগারে বন্দী যে রাজকুমারে প্রকাশ্যে বধ করিতে পারিতেন না, তাহাদিগকেই এ পানীয় সাধারণতঃ দেওয়া হইত। এই পোস্তা পানের ফলে হতভাগ্য বন্দী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়িত, ধীরে ধী তাহাদের শারীরিক বল ও বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হইত, এবং প অচৈতন্য অবস্থায় জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতি হইত।

সোলেমান গোয়ালিওর-এর সেই ভীষণ সরকারী কারাগারে প্রেরিত হইলেন (জানুয়ারী)। সম্রাট তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন। বন্দীকে অতিরিক্ত মাত্রায় "পোস্তা" সেবন করাইয়া তাঁহার প্রাণবধ করা হইল, (মে, ১৬৬২)। যে পুষ্পকোরকের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছিল, সেই সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প আজ অকালে বৃন্তচ্যুত হইল। গোয়ালিওর পর্ব্বতের উপর, মোরাদের সমাধির পার্শ্বে, সুলেমানের মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হইল।

৬

সম্রাট সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র, সাহজাদা মুহম্মদ সুজা বাঙ্গলা দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সৎ প্রবৃত্তি এবং মধুর স্বভাব ছিল। আর, আমোদ প্রমোদে তাঁহার আসক্তি ছিল যথেষ্ট। সুদীর্ঘ সতের বৎসর কাল বাঙ্গলা দেশের সহজ-সাধ্য শাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সাহজাদা দুর্ব্বল, অলস ও অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পরিশ্রমী বা উদ্যমশীল ছিলেন না। চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার সে ক্ষমতা বা একত্র হইয়া কার্য্য করিবার সে শক্তি তাঁহার না থাকায়, বাঙ্গলার শাসন-পদ্ধতি ক্রমে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সৈন্যেরা অক্ষম হইয়া পড়িল। শাসন বিভাগে শিথিলতা দেখা দিল।

সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, সম্রাট সাহজাহানের পীড়ার সংবাদও তদ্রূপ, অতিরঞ্জিত হইয়া রাজমহলে সাহজাদা সুজার নিকট পৌছিল। সে সময়ে রাজমহল বাঙ্গলার রাজধানী। সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পাইয়া সুজা সম্রাট হইয়া বসিলেন, ও "আবুল ফৌজ নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ তৈমুর ওয় আলেকজান্দার ২য় সাহ সুজাগাজী"— এই প্রকাণ্ড উপাধি গ্রহণ করিলেন।

সাহজাদা এক বিরাট বাহিনী, উৎকৃষ্ট কামানশ্রেণী ও বাঙ্গালাদেশে নির্ম্মিত কতকগুলি জলযান লইয়া যাত্রা করিলেন, ও শীঘ্রই বেনারস পৌছিলেন (জানুয়ারী, ১৬৫৮)। ইতিমধ্যে, দারা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান সুকোর অধীনে এবং দক্ষ ও প্রবীণ সেনাপতি জয়সিং ও দিলির খাঁর সাহচর্য্যে বাইশ হাজার সৈন্য সুজার বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন।

সুলেমান একদিন খুব প্রাতঃকালে বেনারসের পাঁচ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বাহাদুরপুর নামক স্থানে সুজার শিবির আক্রমণ করিলেন (ফেব্রুয়ারী)। নিদ্রিত বাঙ্গলা দেশের সিপাহীরা ও তাহাদের সেনাপতিরা, এই অতর্কিত আক্রমণে, নিজের নিজের অঙ্গাবরণ পরিধান করিবার সময় পাইল না। সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সুজা হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহুকষ্টে বিপক্ষের বেষ্টনী হইতে বাহির হইলেন ও জলযানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নৌকা হইতে গোলাবর্ষণ করায় শত্রুপক্ষ অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না। বিজেতা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের শিবির ও অন্যান্য জিনিষপত্র লুট করিল।

ভীত সৈন্য স্থলপথে সসারাম হইয়া পাটনা পলায়ন করিল। পথে, গ্রামবাসীরাও তাহাদের লুট করিল। অনুসরণকারী সম্রাট বাহিনীর আগমন সংবাদে সুজা মুঙ্গের পলায়ন করিলেন, ও পরে, তিনি পরিখা খনন করাইয়া ও কামান শ্রেণী বসাইয়া বিপক্ষের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। ওদিকে বিজয়ী সাহজাদা সুলেমান মুঙ্গের হইতে পনের মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সুরজগড় নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া মাসাধিক কাল অমূল্য সময় নষ্ট করিলেন। পরে, ধর্ম্মৎ যুদ্ধে তাঁহার পিতার পরাজয় হইয়াছে এই সংবাদে সুলেমানকে সুজার সহিত সন্ধি করিতে হইল। সুলেমান বাঙ্গালাদেশ, বিহার প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চল ও উড়িষ্যা প্রদেশ সুজাকে অর্পণ করিয়া, আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

এইরূপে সুজা সে যাত্রা বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। তিনি বিশ্রাম লাভ করিবার অবকাশ পাইলেন। ইতিমধ্যে আওরংজীব দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করিয়া (২১শে জুলাই, ১৬৫৮) সুজাকে এক পত্র লিখিলেন। এই পত্রের প্রতি-ছত্রে আওরংজীবের ভ্রাতৃ প্রেমের (?) পরিচয় ছিল। পত্রে লেখা ছিল, "বিহার প্রদেশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় আপনি প্রায়ই সম্রাট সাহজাহানের নিকট আবেদন করিতেন। আমি এই প্রদেশ আপনাকে অর্পণ করিলাম। আপনি এখন নির্ব্বিঘ্নে শাসন কার্য্যে রত থাকুন ও আপনার নষ্ট শক্তি পুনরুদ্ধার করুন। দারার সম্বন্ধে যাহা হউক একটা কিছু

ব্যবস্থা করিয়া, পরে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। আমি আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী কনিষ্ঠ ভ্রাতা—আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।" কিন্তু সুজার অজানা কিছুই ছিল না। তিনি আওরংজীবকে বিলক্ষণ চিনিতেন। আওরংজীব তাঁহার স্নেহশীল পিতা বা অপরিণামদর্শী কনিষ্ঠ সহোদর মোরাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহা তিনি বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং তিনি মোহে না পড়িয়া আওরংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে দারাকে অনুসরণ করিবার জন্য আওরংজীব সুদূর পঞ্জাব প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন। আগ্রা আক্রমণ করিয়া সাহজাহানকে মুক্তি দিবার ইহাই প্রকৃষ্ট অবসর। সুজা পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী, কামান ও নৌকা লইয়া পাটনা হইতে রওনা হইয়া (অক্টোবর, ১৬৫৮), এলাহাবাদ হইতে তিন দিনের পথে অবস্থিত খাজওয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। আওরংজীবের পুত্র সুলতান মুহম্মদ এইস্থানে সুজার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ওদিকে, আওরংজীব মুলতান হইতে দারার অনুসরণে নিবৃত্ত হইয়া দিল্লী ফিরিলেন (নভেম্বর) ও এলাহাবাদের নিকট অবস্থিত নিজের বাহিনীকে লোক ও অর্থবল পাঠাইয়া সাহায্য করিলেন। এখন আগ্রার দিকে যাইবার পথ বন্ধ হইল। পরে, আওরংজীব, সুজা যেস্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন সেই স্থান হইতে মাত্র আট মাইল পশ্চিমে সুলতান মুহম্মদের সহিত যোগদান করিলেন (জানুয়ারী, ১৬৫৯)। সেই দিবস মীরজুমলা দাক্ষিণাত্য হইতে সম্রাটের নিকট পৌঁছিলেন।

৭

আওরংজীব নিখুঁত ব্যবস্থা করিয়া অগ্রসর হইলেন ও শত্রুশিবির হইতে এক মাইল দূরে ছাউনী করিলেন। আওরংজীবের প্রত্যেক সিপাহী স্ব স্ব বর্ম্ম পরিধান করিয়া ভূমির উপর শয়ন করিত। তাহাদের শিয়রে অশ্ব প্রস্তত থাকিত। মীরজুমলা দুই বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী এক উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়া বহু কষ্টে চল্লিশটি কামান ইহার উপর উঠাইলেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা সমস্ত রাত্রি সজাগ রহিল।

যুদ্ধের দিন, সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে আওরংজীবের সৈন্যের সম্মুখভাগে হঠাৎ এক কলরব উত্থিত হইল (৫ই জানুয়ারী)। ক্রমে সমগ্র শিবিরে গোলমাল দেখা দিল। মনুষ্যের চীৎকার ও ক্রন্দনে এবং ধাবিত অশ্বের পদশব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। অন্ধকারে গোলমাল আরও বৃদ্ধি পাইল। মহারাজ যশোবন্ত সিং এই বিপদের মূলে ছিলেন। ইনি সম্রাট বাহিনীর দক্ষিণ অংশের সেনাপতি ছিলেন। বিনা কারণে নিজে উপেক্ষিত হইয়াছেন মনে করিয়া ইনি প্রতিশোধ লইবার জন্য এক অভিসন্ধি করিলেন। সুজাকে গোপনে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, রাত্রিশেষে তিনি সম্রাট সৈন্য আক্রমণ করিবেন, এবং আওরংজীব যখন তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য ছুটিয়া যাইবেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যেন সুজা অগ্রসর হইয়া দুই শত্রু সৈন্যের মধ্যে অবস্থিত সম্রাট বাহিনী নির্ম্মূল করেন। সুতরাং যশোবন্ত দ্বিপ্রহর রাত্রের কিছু পরে চৌদ্দ হাজার রাজপুত সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহির হইলেন। পথে সাহজাদা মুহম্মদ সুলতানের শিবির আক্রমণ করিয়া যাহা পাইলেন সমস্ত লুঠ করিলেন। সম্রাট শিবিরেরও সেই এক দশা হইল। রাজপুত সৈন্য আগ্রার দিকে ছুটিল। এই আকস্মিক ঘটনার জন্য আওরংজীবের সৈন্যের সম্মুখভাগে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

নিজের অসাধারণ ধৈর্য্য ও সুজার সংশয়, এই দুই কারণে আওরংজীব সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সুজা যশোবন্তের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলেন; আওরংজীবের সৈন্যে যে তুমুল শব্দ উত্থিত হয় তাহাও তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই রাত্রে নিজের শিবির হইতে বাহির হইলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্যই আওরংজীব ও যশোবন্তের ইহা এক চাতুরী মাত্র।

নিজের শিবিরে সম্রাট উপাসনায় নিযুক্ত, এমন সময় যশোবন্তের আক্রমণ ও পলায়ন সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তখন সম্রাট কোন কথা না বলিয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, "যদি যশোবন্ত গিয়া থাকে, তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই। তাহাকে যাইতে দাও।" ক্রমে উপাসনা শেষ হইল। সম্রাট বাহিরে আসিলেন তিনি

পদস্থ কর্ম্মচারীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই ঘটনা আমাদের উপর ভগবানের অনুগ্রহের পরিচয় দিয়া থাকে। যদি যুদ্ধের সময় এই কাফের বিশ্বাসঘাতকতা করিত তাহা হইলে আমাদের কী সর্ব্বনাশই না হইত। তাহার পলায়নে আমাদের মঙ্গল হইয়াছে।"

আওরংজীব অবিচলিত ভাবে নিজের স্থানে রহিলেন, ও সৈন্যের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতে দিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন সেনানায়কদিগের উপর আজ্ঞা হইল, তাঁহারা যেন নিজের নিজের স্থান ছাড়িয়া না গমন করেন, এবং ছত্রভঙ্গ সিপাহীদের যেন একত্র করেন। ক্রমে ভোরের আলো দেখা দিলে পলাতক বহু বিশ্বস্ত পদস্থ কর্ম্মচারী ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সম্রাটের পক্ষ গ্রহণ করিল। সম্রাট পক্ষের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক, এবং সুজার পক্ষে মাত্র পঁচিশ হাজার।

৮

সুজা জানিতেন তাঁহার পক্ষে যুদ্ধের সাধারণ রীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়। বিপক্ষের ব্যবস্থা অনুযায়ী, শত্রু সৈন্যের এক বিভাগের বিপক্ষে নিজের এক বিভাগ সম্মুখীন করা সহজসাধ্য নহে। তাঁহার এই অল্প সংখ্যক সৈন্য বিশাল শত্রুবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। সুতরাং সুজা এক নূতন প্রণালীতে সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। কামান শ্রেণীর পশ্চাতে এক পংক্তিতে তাঁহার সমস্ত সৈন্য সজ্জিত হইল। প্রকৃত সেনানায়কের মত তিনিই প্রথমে আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। কারণ, আক্রমণকারী সৈন্যই চিরকাল বিপক্ষ সৈন্যের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে।

বেলা আটটার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে তোপ, হাউই ও বন্দুক ছোঁড়া হইল। পরে তীর চলিল। শেষে, সুজার সেনাপতি সৈয়দ আলম নিজের সম্মুখে তিনটি উন্মত্ত হস্তী পরিচালন করিয়া সম্রাট বাহিনীর বাম অংশ আক্রমণ করিল। ফলে, এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কেহই দাঁড়াইতে পারিল না। সম্রাট সৈন্যের বাম অংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এইবার সম্রাট-বাহিনীর মধ্য অংশেও আতঙ্কের সৃষ্টি হইল; সিপাহীরা এধার ওধার দৌড়াইল। সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে এই মিথ্যা সংবাদ হঠাৎ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায়, অনেকে পলায়ন করিল। অবস্থা আরও মন্দ হইল। এবার, আলমের সৈন্য সম্রাটের মধ্য অংশ আক্রমণ করিল। এই স্থানে মাত্র দুই হাজার সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। সুতরাং ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য রক্ষিত সম্রাট পক্ষের দুই দশ সৈন্য অগ্রসর হইয়া শত্রুর গতিরোধ করিল। সম্রাট হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার সৈন্যের বিধ্বস্ত বাম অংশকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সৈয়দ আলম আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া যে পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া সে পলায়ন করিল।

কিন্তু হস্তী তিনটি প্রবল বেগে অগ্রসর হইতে থাকিল। আহত হইয়া তাহারা ভীষণতর হইল। অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। সম্রাট পশ্চাৎপদ হইলে তাঁহার সমগ্র সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইবে। পর্ব্বতের ন্যায় সম্রাট দণ্ডায়মান রহিলেন। স্বপক্ষের হস্তীর পলায়ন রোধ করিবার জন্য তাহাদের পাদদেশ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিলেন। সম্রাটের আজ্ঞায় আক্রমণকারী হস্তীর মাহুতকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়া হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সম্রাট পক্ষের এক সাহসী মাহুত ক্ষিপ্রতার সহিত সেই হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আরোহীহীন পশুটিকে শান্ত করিল। সম্রাট নিঃশ্বাস লইবার অবসর পাইলেন। তিনি, তখন, নিজের সৈন্যের দক্ষিণ অংশকে সাহায্য করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। সেই অংশে, তাঁহার সৈন্যেরা শত্রুর আক্রমণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতেছিল। কিন্তু সঙ্কটকালে এবং ভীষণ বিপদেও সম্রাট নিজের ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারাইতেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি প্রথমে বাম দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এখন যদি তিনি হঠাৎ দক্ষিণ দিকে আক্রমণ করেন তাহা হইলে তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহার এই আবর্ত্তন গতিকে পলায়ন বলিয়াই মনে করিবে। সুতরাং, সম্রাট নিজের কি উদ্দেশ্য তাহা চরের দ্বারা তাঁহার সৈন্যের সম্মুখ অংশের সেনাপতিদের বলিয়া পাঠাইলেন এবং তাহারা যাহাতে ভীত না হইয়া যুদ্ধ করে ইহাও বিশেষ ভাবে আজ্ঞা করিলেন।

পরে, সম্রাট স্বয়ং শত্রু সৈন্যের দ্বারা প্রবল বেগে আক্রান্ত তাঁহার সৈন্যের দক্ষিণ অংশকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সাহায্য পাইয়া সম্রাট-বাহিনীর দক্ষিণ অংশ বিপক্ষকে পাল্টা আক্রমণ করিয়া তাহাদের হটাইয়া দিল।

ইতিমধ্যে জুলফিকর খাঁ ও সুলতান মুহম্মদ সুজার সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া অগ্রসর হইলেন ও বিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিলেন। আওরংজীবের গোলাগুলি ও হাউইএর মুখে শত্রু সৈন্য দাঁড়াইতে পারিল না। তখন, আওরংজীবের সৈন্য পুঞ্জীভূত কৃষ্ণকায় জলধরের মত সুজার সৈন্য বেষ্টন করিল। সুজা নিরুপায় হইয়া হস্তী পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

এইবার যুদ্ধ শেষ হইল। হস্তী পৃষ্ঠে সুজাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সৈন্যেরা মনে করিল যে, সাহজাদা মারা পড়িয়াছেন। তখন তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। সুজা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ঘোড়া ছুটাইয়া বাহির হইলেন। সুজার পুত্রেরা, সেনাপতি সৈয়দ আলম এবং অল্পসংখ্যক সৈন্য তাঁহার সঙ্গ লইল। বিজয়ী সম্রাট-সৈন্য সুজার সমস্ত শিবির, জিনিষপত্র, ১১৪টি কামান এবং এগারটি হস্তী লুঠ করিল।

৯

খাজওয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আওরংজীব সুজাকে অনুসরণ করিবার জন্য সাহজাদা মুহম্মদ সুলতানের অধীনে এক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি মীরজুমলা এই দলে যোগদান করায় সাহজাদা মুহম্মদের সৈন্য সংখ্যায় তিন হাজার হইল। সুজা মুঙ্গের পলায়ন করিলেন এবং এইস্থানে প্রায় একপক্ষ কাল শিবির স্থাপন করিলেন। (ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ)। গঙ্গানদী এবং খরগপুর গিরিশ্রেণীর মধ্যস্থিত, আড়াই মাইল প্রস্থ এক সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডের উপর এই মুঙ্গের সহর অবস্থিত ছিল। পাটনা হইতে বাঙ্গলা দেশে যাইতে হইলে মুঙ্গের দিয়াই সকলকে যাইতে হইত। সুজা নদী এবং গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রাচীর ও পরীখা নির্ম্মাণ করিয়া অনুসরণকারী সম্রাট-বাহিনীর গতিরোধ করিলেন। ত্রিশ গজ দূরে এক একটি বুরুজ নির্ম্মিত হইল। প্রত্যেক বুরুজে কামান বসান হইল ও সৈন্য রাখা হইল।

মীরজুমলা মুঙ্গের পৌছিয়া সদর রাস্তা বন্ধ দেখিলেন (মার্চ্চ)। তিনি, তখন খড়্গপুরের রাজাকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া তাহার নেতৃত্বে, মুঙ্গের দুর্গের দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত গিরিশ্রেণী এবং অরণ্যের মধ্য দিয়া সুজা যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন। সুজা নিরুপায় হইয়া সাহেবগঞ্জে পলায়ন করিলেন। সাহেবগঞ্জ যাইবার পথে এক সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম পড়ে। সুজা এই পথটি প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করিলেন। কিন্তু সম্রাট-বাহিনী বীরভূম ও ছাটনগরের আফগান জমিদারকে হস্তগত করিয়া তাহার পথপ্রদর্শনে মুঙ্গের জিলার দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশ বেষ্টন করিয়া সিউরী পৌছিল।

দারা আজমীরের নিকট যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন ও তিনি রাজপুত রাজাগুলির উপর প্রতিশোধ লইতেছেন, এই মিথ্যা জনরবের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, মীরজুমলার অধীন রাজপুত সৈন্য তাঁহার পক্ষ ছাড়িয়া নিজেদের দেশে ফিরিল। এইরূপে সম্রাট পক্ষে প্রায় আটহাজার সিপাহী হ্রাস পাইলেও, সুজার সৈন্য সংখ্যার তুলনায় সম্রাটবাহিনী দ্বিগুণ ছিল।

ইতিমধ্যে সুজা সাহেবগঞ্জ হইতে রাজমহল (মার্চ্চ) এবং সেখান হইতে মালদহ পলায়ন করিলেন (এপ্রেল)। আলাওর্দ্দী নামে সুজার জনৈক অমাত্য মীরজুমলার পক্ষ লইবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করিল। এই অপরাধের জন্য সাহজাদা তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন। সম্রাট-বাহিনী রাজমহল অধিকার করিল। এইরূপে গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত সমস্ত ভূমি সুজার হস্তচ্যুত হইল।

উভয় পক্ষে এইবার তুমুল সংগ্রাম চলিল। সুজার পক্ষে মাত্র পাঁচ হাজার সিপাহী অবশিষ্ট রহিল। মীরজুমলার সৈন্য সংখ্যা সাহজাদার সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক দাঁড়াইল। মীরজুমলার প্রত্যেক সিপাহী সুজার প্রত্যেক সিপাহী অপেক্ষা যুদ্ধে নিপুণতর ছিল। স্থলযুদ্ধে তাহারা অধিকতর দক্ষ ছিল। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের চতুর্দ্দিকেই নদী

বা জলপ্রণালী। জলের উপর দিয়া যাতায়াত করিবার জন্য মীরজুমলার একটিও নৌকা ছিল না। ইহার উপর, সুজার কামানের তুলনায় মীরজুমলার কামানগুলি সংখ্যায় অল্প ও আকারে ছোট ছিল। সুজার কামানশ্রেণী ইউরোপীয় এবং বর্ণশঙ্কর গোলান্দাজদিগের পরিচালনায় বিশেষ কার্য্যকরী ছিল। সুজার অধীনে বাঙ্গলাদেশের জলযান সমূহ থাকায়, তিনি ইচ্ছামত নদী পার হইতে বা সৈন্য স্থানান্তরিত করিতে পারিতেন, বা প্রয়োজন মত বিপক্ষের শিবিরগুলির উপর গোলাবর্ষণ করিতে পারিতেন। এই কারণে, সুজার অল্পসংখ্যক সৈন্য খুব গতিশীল এবং কার্য্যতৎপর ছিল। স্থলযুদ্ধে মীরজুমলার সৈন্যরা কার্য্যকুশল হইলেও, নৌকার অভাবে সেনাপতি কিছুই করিতে পারিলেন না।

সুজা, গৌড়এর চারিমাইল পশ্চিমে শিবির স্থাপন করিলেন। মীরজুমলা যাহাতে নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারেন এই উদ্দেশ্যে সাহজাদা গঙ্গার পূর্ব্ব কূলে স্থানে স্থানে পরিখা নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু সাহজাদার চেষ্টা সফল হইল না। মীরজুমলা বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত দেশান্তর হইতে নৌকা সংগ্রহ করিলেন। আওরংজীবের আজ্ঞাক্রমে পাটনার শাসনকর্ত্তার অধীনে এক সৈন্য বঙ্গদেশে পাঠান হইল। রাজমহল হইতে তের মাইল দক্ষিণে, নিজের আড্ডা দোগাচী হইতে, মীরজুমলা উপর্য্যুপরি দুইবার সুজাকে আক্রমণ করিলেন।

গঙ্গার সমগ্র পশ্চিমকূলে দিল্লীশ্বরের সৈন্য ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সাহজাদা মুহম্মদ সুলতান, মুহম্মদ মোরাদ বেগ, জুলফিকর খাঁ, ইসলাম খাঁ, আলী কুলী ও মীরজুমলা প্রত্যেকেই সৈন্য লইয়া স্থানে স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এইবার, মীরজুমলা বিপক্ষ সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন (মে, ১৬৫৯), কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই যুদ্ধে সম্রাট পক্ষীয় চারিজন পদস্থ কর্ম্মচারী ও শতাধিক সিপাহী প্রাণ দিল ও এতদ্ব্যতিরেকে পাঁচশত সৈন্য বন্দী হইল।

সাহজাদা মুহম্মদ সুলতান অকস্মাৎ সুজার নিকট পলায়ন করিলেন (জুন)। অনেকদিন হইতেই মীরজুমলার রক্ষণাবেক্ষনে থাকা সাহজাদার মনঃপুত হইতেছিল না। তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এখন স্বীয় কন্যার গুলরুখ বাণুর সহিত মুহম্মদের বিবাহ দিবেন ও তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন গোপনে এই আশা দিয়া, সুজা এই অপরিণামদর্শী যুবককে নিজের দলে আনিলেন। এই সংবাদ মীরজুমলার নিকট পৌঁছিলে, তিনি পলাতক সাহজাদার নেতৃবিহীন সৈন্যদের ভরসা দিয়া তাহাদের মধ্যে সাহস ও আশার সঞ্চার করিলেন। এক যুদ্ধসভা বসিল। এই সভায় স্থির হইল যে, অন্যান্য সেনানায়কেরা মীরজুমলার আজ্ঞাধীন হইয়া কার্য্য করিবেন।

এই ঘটনার অনতিবিলম্বে মুষলধারায় বারিপাত হওয়ায় যুদ্ধ স্থগিত রহিল। বৃষ্টির জন্য রাজমহলের আশপাশ দেখিতে এক বিস্তীর্ণ হ্রদের মত হইল। সুজা উত্তর পশ্চিমদিকের গিরিশ্রেণীর রাজাকে উৎকোচ দিয়া সেই অঞ্চল হইতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিলেন। সুজার নৌকাশ্রেণী জলপথ বন্ধ করিল। সুতরাং, রাজমহলে অবস্থিত সম্রাটবাহিনী খাদ্যাভাবে বিশেষ কষ্টে পড়িল। এইরূপ অবস্থায়, সুজা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বিপক্ষের মালপত্র শুদ্ধ রাজমহল সহর অধিকার করিলেন (আগষ্ট)।

১০

কয়েকমাস পরে, সুজা রাজমহল হইতে মীরজুমলার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন (ডিসেম্বর)। মুঘল সেনাপতি সে সময়ে মুরশিদাবাদ জিলার অবস্থিত জঙ্গীপুর সহর হইতে বিয়াল্লিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থান করিতেছিলেন। এই আক্রমণের ফলে, মীরজুমলা ক্ষতি স্বীকার করিয়া মুরশিদাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুজাও নশীপুর রওনা হইলেন। ওদিকে বিহারের শাসনকর্ত্তা দায়ুদ খাঁ সৈন্যসহ যাত্রা করিয়া সুজার সৈন্য পরাস্ত করিলেন। সুজা দায়ুদ খাঁর বিরুদ্ধে টাণ্ডা অভিমুখে অগ্রসর হইলে, মীরজুমলা সাহজাদাকে অনুসরণ করিয়া টাণ্ডা আয়ত্ত করিলেন।

এইবার মীরজুমলা এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। সুজার সৈন্য রাজমহলের অপর পার্শ্বে অবস্থিত সামদা দ্বীপ হইতে টাণ্ডা পর্য্যন্ত এক পংক্তিতে অবস্থান করিতেছিল।

মীরজুমলা স্থির করিলেন যে, তিনি রাজমহল, আকবরপুর এবং মালদার পথে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়া অকস্মাৎ দক্ষিণে রওনা হইবেন এবং পূর্ব্বদিক হইতে শত্রু সৈন্যকে আক্রমণ করিবেন। পাটনা হইতে আনীত ১৬০টি নৌকার সাহায্যে রাজমহল হইতে দশ মাইল উত্তরে সেনাপতি তাঁহার সৈন্য নদী পার করিয়া দায়ুদখাঁর সহিত যোগদান করিলেন।

প্রথম হইতেই সম্রাটের বাহিনী সুজার সৈন্য অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ছিল। এখন দক্ষিণে সুজার পলায়ন পথ বন্ধ হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৬৬০)। ওদিকে সাহজাদা মুহম্মদ সুলতান সুজার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিলেন। পিতার পক্ষ পরিত্যাগ করা জনিত অপরাধ হেতু সাহজাদা তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় কারাগারে কাটাইলেন।

মীরজুমলা স্থির করিলেন, এইবার একচালে সুজাকে পিষিয়া মারিতে হইবে। সেনাপতি নিজের আড্ডা হইতে বাহির হইয়া মহানন্দা নদীর খেয়াঘাটের নিকট শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া মীরজুমলার সৈন্যেরা নদীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গোলমালে কোন ব্যবস্থা রহিল না, খেয়াটি পর্য্যন্ত হারাইয়া গেল। সহস্রাধিক সিপাহী নদীর জলে ভাসিয়া গেল। সেনাপতি দিলীর খাঁর এক পুত্রকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

সুজার সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল। শত্রুপক্ষ তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করিবার পূর্ব্বে তিনি ঢাকা পলায়ন করিবেন স্থির করিলেন। টাণ্ডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেগমদের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবার সময় না দিয়া তিনি তাহাদের সেই মুহূর্ত্তে স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। চারিটি বড় বড় নৌকায় তাঁহার ধনসম্পত্তি ও বাছাবাছা জিনিষপত্র ভর্ত্তি করিয়া স্রোতের মুখে রওনা করা হইল। তাঁহার দুই কনিষ্ঠ পুত্র বুলন্দ আখতর ও জইন-উল্-আবিদিন, জনকয়েক অমাত্য, যথা মিরজা জানবেগ, বারহার সৈয়দ আলম, সৈয়দ কুলি উজবগ ও মিরজা বেগ, এবং অল্পসংখ্যক সিপাহী, পরিচারক ও খোজা, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিনশত লোক সাহজাদার সহিত চলিল।

ওদিকে, মীরজুমলা টাণ্ডা অধিকার করিয়া সহরে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। সুজার জিনিষপত্র লুঠ করিয়া সরকারএ জমা করিলেন। সুজা যে সকল মহিলাদের পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন তাহাদিগকে যথাযথ যত্ন ও রক্ষা করা হইল। এবার সেনাপতি টাণ্ডা হইতে ঢাকা রওনা হইলেন।

১১

সুজা ঢাকায় পৌছিয়া কোনস্থানে আশ্রয় পাইলেন না (এপ্রেল)। স্থানীয় জমীদারেরা তাঁহার বিপক্ষে ছিল। সুতরাং সুজা ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া নদীপথে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে, বহু সৈন্য ও নৌকার মাঝিরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে সুজা আরাকান দেশের রাজার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঢাকা পরিত্যাগ করার দুই দিন পরে আরাকান রাজার অধীন চাটগাঁ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে একান্নটি নৌকা পৌছিল। সুজা, তখন, বঙ্গদেশের উপর নিজের আধিপত্য পুনঃস্থাপন করিবার আশা জলাঞ্জলি দিয়া বর্ব্বর মঘ জাতির দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এই সংবাদে সাহজাদার পরিবারবর্গ ও অনুচরেরা ভীত হইয়া পড়িল। পূর্ব্ববঙ্গের নদীগুলির উপর চাটগাঁর আরাকানিদের দস্যুবৃত্তির কথা সকলেই বিদিত ছিল। তাহাদের উপদ্রবে সমস্ত বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলা দুইটি বসতিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই জল দস্যুদিগের অসমসাহসিক আক্রমণ, ভীষণ নিষ্ঠুরতা, কুৎসিত চেহারা, অসভ্য ব্যবহার, কদর্য্য রীতিনীতির জন্য পূর্ব্ববঙ্গের কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই তাহাদের ভয় ও ঘৃণা করিত।

সুজা যদি আওরংজীবের হস্তে দারা সুকো বা মোরাদ বক্সের ন্যায় শোচনীয় মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে চাহেন, তাহা হইলে মগদেশে পলায়ন করা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং, তিনি চিরজন্মের মত নিজের পূর্ব্বপুরুষদিগের আবাসভূমি হইতে বিদায় লইলেন (মে, ১৬৬০)। তাঁহার পরিবারবর্গ ও চল্লিশটিরও কম অনুচর লইয়া তিনি আরাকান যাত্রা করিলেন।

সুজা তাঁহার নূতন আবাস স্থানে সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার দুর্দ্দমনীয় উচ্চাশা তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। সুজা আরাকান রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তিনি এই রাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিবেন ও বাঙ্গলা দেশে পুনরায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা দেখিবেন। এই সংবাদ পাইয়া আরাকান রাজ সুজাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুতরাং সুজা, অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া অরণ্যে পলায়ন করিলেন। পরে, মঘেরা এই হতভাগ্য সাহজাদাকে অনুসরণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল (ডচ্ রিপোর্ট, ফেব্রুয়ারী, ১৬৬১)।

শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু

সূর্পনখা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(সমুদ্রতীরে রাক্ষুসে উৎসব। রাক্ষসেরা জাতীয় সঙ্গীত সহ যুদ্ধ-নৃত্য করিতেছে। নৃত্য-গীতের সাথে রাক্ষুসে বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে।)

রাক্ষসদের গান

থং থং থং
ঘোনং ঘোনং ঘং ;
লঙ্কাপুরে শঙ্কা নাই
জোরসে বাজাও ডঙ্কা ভাই,
শঙ্খ বাজাও, ঘণ্টা বাজাও
ঠনং ঠনং ঠং।
থং থং থং
ঘোনং ঘোনং ঘং।
মুই সকলে মল্ল বীর,
চালাই জোরে ভল্ল, তীর,
খাণ্ডা, মুষল, ডাণ্ডা হাতে
সদাই রেগে টং।
থং থং থং
ঘোনং ঘোনং ঘং ;
দেখলে মোদের লক্ষ দান,
দেব্‌তা-দানব কম্পমান,
আঁৎকে ওঠে দেখ্‌লে মোদের
রক্ত-ভরা ঢং ;
থং থ. থং
ঘোনং ঘোনং ঘং।

(দূরে ভেরীধ্বনি শোনা গেল। রাক্ষস বিরূপাক্ষ দুইজন নিশাচর লইয়া উপস্থিত হইল। নিশাচরদ্বয় বিরূপাক্ষের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভেরীধ্বনি করিল। রাক্ষসদের নৃত্যগীত থামিয়া গেল। বিরূপাক্ষ হাত তুলিয়া রাক্ষসদের লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—)

বিরূপাক্ষ

হঁঃ হঁঃ হঁঃ। রাজকুমার ইন্দ্রজিতের আজ জন্মোৎসব। রাবণ রাজার সভায় অপ্সরীদের নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়েছে। তোমাদের সে উৎসবে যোগ দিতে হবে—রাজা দশাননের আদেশ।

(আবার ভেরীধ্বনি হইল। রাক্ষসদের মধ্যে আনন্দ কোলাহল উঠিল। লম্ফঝম্পে তাহারা সম্মতি জানাইল। বিরূপাক্ষ নিশাচরদ্বয়কে লইয়া প্রস্থান করিল। রাক্ষসেরা দল বাঁধিয়া গীতবাদ্য করিতে করিতে রাবণের সভায় চলিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাবণের রাজসভায় অপ্সরীদের নৃত্যগীত আরম্ভ হইবে। রাজা রাবণ উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাহার নীচে সিঁড়ির উপর অপ্সরীরা বসিয়াছে। একে একে সমস্ত রাজপরিবারের

রাক্ষসেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজসভার একদিকে রাক্ষসীরা বসিয়াছে, অন্যান্য দিকে রাক্ষসদের আসন। রাজপরিবারের সকলেই উচ্চ আসনে উপবিষ্ট। এমন সময় কোলাহল করিতে করিতে সমুদ্রতীরের উৎসব-মত্ত রাক্ষসগণের আগমন। রাবণের সেনাপতি প্রহস্ত উঠিয়া চীৎকার করিয়া তাহাদের কহিল।)

প্রহস্ত

হঁঃ হঁঃ হঁঃ। সব নিজের নিজের জায়গায় বসে যাও— মহারাজ দশাননের আদেশ।

কুম্ভকর্ণ

(সকলে নিজের নিজের আসনে বসিল। রাবণ সিংহাসন হইতে উঠিয়া প্রহস্তকে কহিল।)

রাবণ

রাজপরিবারের সকলেই উপস্থিত?

প্রহস্ত

(চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) না মহারাজ, দানব কুম্ভকর্ণ অনুপস্থিত।

রাবণ

কেন?

মহাপার্শ

দাদা গাঢ় ঘুমে অচেতন।

রাবণ

বেরসিক! প্রহস্ত, তাকে জাগ্রত করার ব্যবস্থা কর। ততক্ষণ নৃত্যগীত চলুক।

(প্রহস্ত একদল রাক্ষসকে কুম্ভকর্ণকে জাগাইতে পাঠাইল। অপ্সরীদের নৃত্যগীত আরম্ভ হইল।)

অপ্সরীদের গীত

ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্-নাচি
ফুর্ ফুর্ হাওয়াতে—
ভরপুর প্রাণ আজ
কার আঁখি চাওয়াতে?
স্বর্গের অপ্সরী
নাচি মোরা সব পরী,
মেতে উঠি বঁধুয়ার
সন্ধান পাওয়াতে।
বনের বিহগী মোরা
মন বন-চারিণী,
মোদের মদির গীতি
জন-মন-হারিণী,
নিশিদিন প্রাণ ভরি
সোহাগের গান করি,
বিরহী পরাণ কাঁদে
সেই গান গাওয়াতে।

(নৃত্যগীত চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিকে রাক্ষসদের মধ্যে ভীষণ কোলাহল উঠিল। অপ্সরীগণ ভয় পাইয়া নৃত্যগীত থামাইল।)

রাবণ

দেখতো প্রহস্ত কি ব্যাপার!

প্রহস্ত

(উঠিয়া) হঁঃ হঁঃ হঁঃ! কার আস্পর্দ্ধা রাজা দশাননের সম্মুখে কোলাহল করে!!

(রাক্ষসদের মধ্য হইতে একজন উঠিয়া)

মহারাজ, অকম্পন অপ্সরীদেব দিকে চোখ্ মারছিল।

মহাপার্শ

বেরসিক!

মকরাক্ষ

বেল্লিক!

বজ্রদংষ্ট্র

বেকুব!

রাবণ

প্রহস্ত, তুমি স্বহস্তে অকম্পনের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের' করে' দাও।

(রাক্ষসদেব মধ্যে আর একজন উঠিয়া কহিল।)

মহারাজ, অকম্পনের কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে; এবারের মত মার্জ্জনা করুন।

বিরূপাক্ষ

অকম্পনের কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে? বটে? সমুদ্রতীরে ওই-তো বেশী লম্ফঝম্প করছিল।

রাবণ

প্রহস্ত, যে হেতু অকম্পনের কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে সে হেতু তার আর এ উৎসবে থেকে কাজ নাই, তাকে রাজবৈদ্য ভস্মকেতুর কাছে যেতে বল। না হ'লে উৎসবের রসোভঙ্গ হবাব যথেষ্ট সম্ভাবনা।

(প্রহস্তের ইঙ্গিতে অকম্পন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথানীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল। রাক্ষসেরা হোঃ হোঃ কবিয়া হাসিয়া)

হুয়োঃ হুয়োঃ হুয়োঃ—

প্রহস্ত

হঁঃ হঁঃ হঁঃ? চুপ্।

রাবণ

নৃত্যগীত চলুক।

অপ্সরীদের গীত

নন্দন বনে ফোটে মন্দার ফুল;
মন্দাকিনীর জল চলে কুল্ কুল্,—
আমরা তাহার তীরে
নাচি গাই ঘুরে ফিরে
মদির আবেশে সদা আঁখি ঢুল্ ঢুল্।
মোরা যুগ যুগ ধরি
প্রেমের বেসাতী করি,
আঁখি ঠারে সবাকার পরাণ আকুল।

তৃতীয় দৃশ্য

(কুম্ভকর্ণ ভীষণ গর্জ্জনে নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছে। একদল রাক্ষস তাহাকে ঘিরিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে কানের কাছে চীৎকার করিয়া গান করিতেছে। কেহ কীলচড় মারিতেছে, কেহ লাঠির খোঁচা দিতেছে।)

রাক্ষসদের গান

ওঠো ওঠো কুম্ভকর্ণ
ঘুমে ঘুমে দেহ তোমার
হ'য়ে গেছে ধূম্র বর্ণ,
ওঠো ওঠো কুম্ভকর্ণ।

(কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাহার নাসিকা আরো জোরে গর্জ্জন করিতে লাগিল। নিশ্বাসের চোটে রাক্ষসগণ ঠিক্‌রিয়া পড়িতে লাগিল।)

চতুর্থ দৃশ্য

(রাবণের সভায় অপ্সরীদের নৃত্যগীত চলিতেছে।)

অপ্সরীদের গীত

তোল্ তোল্ মুখ তোল,
ফুল-দোল আজ,
বঁধুর বাঁশীর শোন
মধুর আওয়াজ।
হেসে হেসে কাছে এসে
কথা কয় ভালোবেসে,
ভিখারীর দ্বারে এলো
রাজ অধিরাজ।
এখন বাগান খালি
কেন এলে ফুল মালী!
কি দিয়ে সাজাব তোমা
ভেবে পাই লাজ।

(নৃত্যগীত চলিতেছে এমন সময়ে সভাশুদ্ধ সকলে প্রবলভাবে হাঁচিতে ও কাশিতে লাগিল। নৃত্যগীত থামিয়া গেল।)

রাবণ

প্রহস্ত, একি ব্যাপার !!

(দ্বারের নিকট হইতে একটি রক্ষ প্রহরী কহিল)

মহারাজ, অকম্পন লঙ্কা পোড়াচ্ছে—

(চারিধারে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। বিপদ সূচক ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। রাবণ উঠিয়া দাঁড়াইল। সভাশুদ্ধ সকলেই হুঙ্কার করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।)

রাবণ

(দাঁত কড়্মড়্ করিয়া) প্রহস্ত, অকম্পনের এতদূর আস্পর্দ্ধা, সোনার লঙ্কাপুরী সে পোড়াতে সাহস করে ?

অন্যান্য রাক্ষসেরা

মর্কট অকম্পনের এতদূর আস্পর্দ্ধা।

রক্ষ প্রহরী

মহারাজের বুঝ্তে ভুল হয়েছে, অকম্পনের বাপের সাধ্য কি সোনার লঙ্কার গায়ে আঁচড় কাটে !!

প্রহস্ত

তবে কি পোড়াচ্ছে সে ?

প্রহরী

রাজবৈদ্য ভস্মকেতুর আদেশে দশমণ শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে সে নাকে নিচ্ছে। তার সর্দ্দি জ্বরের ওষুধ।

(সভাশুদ্ধ সকলে অট্টহাস্যে নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিল।)

প্রহস্ত

মহারাজ, তবে নৃত্যগীত চলুক।

রাবণ

না, নর্ত্তকীরা পরিশ্রান্ত, সভাস্থ সকলেই ক্লান্ত, এখনকার মত সভা ভঙ্গ হোক। কাল পূর্ণিমা রজনীতে নর্ত্তকীর যে নূতন দল এসেছে তাদের নাচের আয়োজন করা হোক অশোক বনের নব-নিকুঞ্জে।

পঞ্চম দৃশ্য

(উদ্যানে একটি বৃক্ষের তলায় বসিয়া মন্দোদরী সূর্পণখা। সূর্পণখা মন্দোদরীর গলা জড়াইয়া ভেউ ভে করিয়া কাঁদিতেছিল।)

মন্দোদরী

এমন ভেউ ভেউ করে' কাঁদছিস্ কেন লা সূর্পণখা ?

(কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্পণখার গান)

কেমন ক'রে বুঝবি সখি
কাঁদছি কেন ভেউ ভেউ ভেউ;
কি দিবে আজ রাখব চেপে
বুকের ভিতর ওঠে যে ঢেউ।
যৌবনের এ ভিটের পরে
দিবারাতি ঘুঘু চরে,
উহুঃ উহুঃ মরি মরি
প্রাণের ব্যথা বোঝে না কেউ।

মন্দোদরীর গান

কাঁদিস্ কেন ননদিনী, কি হয়েছে বল্—
এমন করে' কাঁদতে কি হয়, মোছ্ রে আঁখি জল;
মনের কথা আমি বুঝি
মনের মানুষ দেব খুঁজি,
নতুন পাখী পড়বে ধরা, খাবি এখন চল্।

কাঁদিস্ না লো সই, খাবি চল্, তোর জন্যে তোর প্রি খাদ্য হাতীর কলজে ভাজা তৈরি করে' রেখেছি।

সূর্পণখা

(কাঁদিতে কাঁদিতে) সখি রে, কিসের খাওয়া দাওয় কিসের এই রূপ যৌবন। দাদা দশানন আমার আননে যে দশা করেছেন তা' আর কাকে বুঝাব সই? বাগা খালি করে' মালী চলে গেছে।

মন্দোদরী

ভাবিস্ না সই, তোর রূপ আছে, যৌবন আছে,—তে বাগানে ফুলের অন্ত নেই—আবার কত মালী আস্ ভাবিস্ কেন?

সূর্পণখা

(নিশ্বাস ফেলিয়া) মনের মত পতি পেয়েছিলাম, কিন্তু এ পোড়া বরাতে তাও টিক্‌ল না। হুল্ ফুটিয়ে বোল্‌তা উড়ে গেল। খাম্‌চি মেরে চাম্‌চিকে পালিয়েছে। মাঠে মারা গেলাম সই, মাঠে মারা গেলাম। (ক্রন্দন)

মন্দোদরী

চুপ, চুপ, তোর দাদা দশানন এইদিকে আস্‌ছে—।

সূর্পণখা

সর্ব্বনাশ, আমি ঐ ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকাই।

(সূর্পণখা কিছুদূরে একটি ঝোপের আড়ালে গিয়া লুকাইল। রাবণের প্রবেশ)

রাবণ

(মন্দোদরীর প্রতি) ভেটকী লোচনি, গণ্ডার মর্দ্দিনী, মন্দোদরি! তুমি এখানে?

মন্দোদরী

আহা বুড়ো মিন্‌সের আর পিরীতের কাজ নেই। বেলা বাড়ছে তবু রোদের ঝাঁঝ কমে না।

রাবণ

গজেন্দ্র-দলনি, প্রাণাধিকে, উৎসব সভা থেকে সটান্ অন্তঃপুরে এসে দেখি সকলেই রয়েছে—কিন্তু তবু যেন মনে হল্ কেউ নেই। তোমায় না দেখ্‌লে মনে হয় আমার সোনার লঙ্কায় যেন নোনা ধরছে।—

মন্দোদরী

থাক্ থাক্ আর কপট সোহাগের দরকার নাই। নিজে আমোদ প্রমোদ নিয়ে মেতে আছ, এদিকে ধিঙ্গী বোন্‌টার দুর্দ্দশা করেছ তার খোঁজ রাখ কি?

রাবণ

ওহো, তুমি সূর্পণখার কথা বলছ? তাইতো, আমার গা এতদিন খেয়ালই হয় নাই। সত্যিই তো আমি পরাধী। কালকেয়-দৈত্যবংশীয় বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানব প্রবরের সঙ্গে আমি ভগিনী সূর্পণখার বিবাহ দিয়েছিলাম। তারপর দিগ্বিজয় করতে বার হয়ে ভ্রমক্রমে তাকে আমি বধ করেছি। ঠিক্ ঠিক্, আমার ভগিনী সূর্পণখার বৈধব্যের জন্য আমি দায়ী। এ কথাতো আমার মনে কথনো জাগে নাই।

মন্দোদরী

সে রাতদিন কাঁদে, খায় না, দায়না; অমন কয়লা-পোড়া শরীর শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে। তার এমন সাধের খাদ্য হাতীর কলজে ভাজা, গণ্ডারের মেটুলীব চচ্চরী তাও আর মুখে রোচে না।

রাবণ

বটে, বটে। সূর্পণখা কই?

মন্দোদরী

সে শিংশপা গাছের তলায় ধুলায় লুটোপুটি খাচ্ছে।

রাবণ

বটে, বটে? আচ্ছা তার ব্যবস্থা আমি করছি। ভগ্নির প্রতি ভ্রাতার একটা কর্ত্তব্য আছে বৈ কি। হাঁা শোন প্রাণবল্লভি, মন্দোদরী, সূর্পণখাকে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য আমি পঞ্চবটী বনে পাঠাব। স্থানটি অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। আর ভগ্নি সূর্পণখাকে এ কথাও জানিয়ে দিও—সে যদি সেখানে মনোমত পাত্র পায়—তাকে সে অনায়াসে আবার পতিত্বে বরণ করতে পারে—এতে রাবণ রাজার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

মন্দোদরী

সেই ভালো হবে। ছুঁড়িটার যে অবস্থা হয়েছে ভাব্‌লে দুঃখ হয়। পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, শত হোক্ মেয়েমানুষ তো।

রাবণ

সূর্পণখার পরিচর্য্যা করবার জন্যে সঙ্গে যাবে তার মাসীর দুই পুত্র খর ও দূষণ—আর প্রহরী যাবে চৌদ্দ হাজার নিশাচর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(পঞ্চবটী বন—গোদাবরীর তীর। নানারকম পাখী ডাকিতেছে, হরিণ চরিতেছে ইত্যাদি। সুর্পনখা গান গাহিতে গাহিতে নদীর তীর দিয়া আসিতেছে।)

সুর্পণখার গান

বুক-ভরা জ্বালা নিয়ে
ঘুরিয়া বেড়াই,
কোথায় জুড়াব হিয়া
ভাবিয়া না পাই।
খাঁচার দুয়ারটারে
খুলে দিনু একেবারে,
হে পাখী দিও না ফাঁকি
মিনতি জানাই।
উড়ে এসো তাড়াতাড়ি
বিরহ সহিতে নারি,
দিবানিশি প্রাণ মোর
করে আঁই ঢাঁই।

কি সুন্দর এই পঞ্চবটী বন। গোদাবরী নদীর হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল। বসে একটু হাওয়া খাওয়া যাক্।—

(একটি ঝোপের আড়ালে বসিয়া আপন মনে বেণী দোলাইতে লাগিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বনপথ দিয়া লক্ষ্মণ তীর ধনু হাতে ছুটিয়া আসিতেছে।)

লক্ষ্মণ

কোথায় গেল হাতীর ছানাটা? দিব্বি নাদুস্ নুদুস্ বাচ্ছাটা। ভাব্‌লাম ধরে নিয়ে সীতাদেবীকে উপহার দেব—তাও ছাই বরাতে নাই। যে করেই হোক্ হাতীর ছানাটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। লক্ষ্মণের হাত থেকে একটা পিঁপ্‌ড়েও এড়াতে পারে না। এই দিকেই তো ছুটে এসেছে।

(লক্ষ্মণ ঝোপে ঝাড়ে হাতীর বাচ্ছাটাকে খুঁজিতে লাগিল। হঠাৎ দূরে ঝোপের আড়াল হইতে সুর্পণখার বেণীর খানিকটা দোলানো অংশ দেখা গেল।)

লক্ষ্মণ

ঐ যে বাছাধন, ল্যাজ নাড়্‌ছে। পা টিপেটিপে যাই—না হলে আবার সরে' পড়বে। যা চালাক্।

(তীরধনু মাটিতে রাখিয়া লক্ষ্মণ পা টিপিয়া টিপিয়া ঝোপের কাছে গিয়া ল্যাজ্ ভাবিয়া সুর্পণখার বেণী ধরিয়া হ্যাঁচ্‌কা টান্ মারিল।)

লক্ষ্মণ

হেঁইও !!!—

সুর্পণখা

(চম্‌কাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।) কেঁরে, কেঁরে, কেঁরে—?

(লক্ষ্মণ দস্তুর মত-ঘাব্‌ড়াইয়া কয়েক হাত পিছাইয়া)

এ আবার কে রে বাবা! তাড়কার মাসশাশুড়ী নাকি? (লক্ষ্মণের রূপ দেখিয়া সুর্পণখা মজিল।)

সুর্পণখা

তুমি কে? (সাম্‌নে আগাইল।)

লক্ষ্মণ

আমি মানুষ, তুমি কে? (পিছনে হটিল)

সুর্পণখা

আমি সুর্পণখা, রাবণ রাজার আদরের বোন্—।

(সুর্পণখা লক্ষ্মণের যত কাছে আসিতে চায়—লক্ষ্মণ তত পিছাইয়া যায়—।)

সুর্পণখা

তোমার নাম কি?

লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণ।—

সুর্পণখা

আমি তোমাকে চাই—

লক্ষ্মণ

ওরে বাবা, এখুনি কচ্‌মচিয়ে ঘাড়টি ভেঙ্গে রক্ত চুষে খাবে। (লক্ষ্মণ প্রাণপণে দৌড় লাগাইল।)

তৃতীয় দৃশ্য

(ঋষিকুমারীরা কলস্ কাঁখে জল লইয়া গান গাহিতে গাহিতে বনপথে বাড়ী ফিরিতেছে।)

ঋষিকুমারীদের গান।

ঘটু ভরে' জল নিয়ে
চটু করে চল্,
বেলা হোল,—ছুটে চল
হরিণীর দল।
আমরা বনের মেয়ে
পথ চলি গান গেয়ে,
কথায় কথায় মোরা
হাসি খল্ খল্।
আমরা বালিকা দলে
ফুলের মালিকা গলে—
হেলে দুলে নেচে পথ
চলি অবিরল।

(লক্ষ্মণ হুড় মুড় করিয়া আসিয়া তাহাদের মধ্যে পড়িল। কুমারীদের কেহ ধাক্কা খাইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল, কাঁখের কলস ভাঙ্গিল ইত্যাদি। লক্ষ্মণ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল।)

কুমারীগণ

এ আপদ আবার কোত্থেকে এসে জুটল।

১ম কুমারী

দেখ্ দেখি, চান্ করে' বাড়ী ফিরছি—কোথাকার কে এসে গা ছুঁয়ে দিল। আবার অবেলায় চান করা কি গতরে সইবে ?

২য় কুমারী

তুমি কে গা ?

লক্ষ্মণ

আমি লক্ষ্মণ !

৩য় কুমারী

ওঃ তুমি বুঝি আমাদের সীতার দেবর—রামচন্দ্রের ভাই ?

৪র্থ কুমারী

এরা ভাই আমাদের পঞ্চবটী বনে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

৫ম কুমারী

তা' তুমি যেই হও—এমন হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লে কেন আমাদের মধ্যে ? দেখ্ছ না আমরা ঋষিকুমারী। কুমারীদের সঙ্গে কি এরকম ঢলাঢলি করতে আছে ? (সকলের হাস্য।)

লক্ষ্মণ

(অপ্রস্তুত হইয়া) না, ঢলাঢলি করা আমার স্বভাব নয়। রাক্ষসীর ভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে ঠোক্কর লেগে গেছে। কিছু মনে কোরো না, আমার কোন বদ্ মতলব ছিল না। বাপ্ রাক্ষসীটার যা চেহারা !

কুমারীরা

রাক্ষসী আবার কে ?

(দূরে সূর্পণখার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—।)

—লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, প্রাণ আমার !

লক্ষ্মণ

ঐরে রাক্ষসীটা এই দিকেই ধাওয়া করেছে,—আমি সটকে পড়ি,—আপনি বাঁচ্লে বাপের নাম।

(কুমারীগণ সূর্পণখাকে দেখিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া যে যেদিকে পারিল ছুট্ দিল।)

চতুর্থ দৃশ্য

(সূর্পণখা লক্ষ্মণের খোঁজে বনে বনে গান গাহিতে গাহিতে ঘুরিতেছে।)

সূর্পণখার গীত

ভুবন-ভুলানো রূপে
মজেছে পরাণ,
নিদয়, তোমার কেন
হৃদয় পাষাণ ?
প্রাণ-ভরা জ্বালা লয়ে
ফিরি পাগলিনী হয়ে
প্রেম জ্বরে প্রাণ মোর
করে আন্ চান্।

লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ,—যেদিন প্রথম তোমার ভুবন-ভোলানো রূপ দেখেছি—সেদিনই মজেছি। তোমার রূপের বিদ্যুৎ-

ছটায় আমার চোখ্ ঝল্‌সে গেছে। আমি হৃদয়ের খাঁচা খুলে বসে আছি—হে বনের পাখী, ধরা দাও, ধরা দাও।

আমি বঁড়্‌শী ফেলে বসে আছি, হে গভীর জলের চিংড়ী মাছ ধরা দাও,—ধরা দাও। আমি ফাঁদ পেতে বসে আছি, হে ধূর্ত্ত শেয়াল ধরা দাও,—ধরা দাও। কী সুন্দর তুমি, কী সুন্দর তুমি। আমার যৌবনের বাগানে গাদা গাদা গাঁদা ফুল ফুটে আছে, হে মালী এসো, এসো, এসো। (সূর্পণখা একটি ঝরণার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কে একজন উপুড় হইয়া ঝরণার জল পান করিতেছিল। তাহাকে লক্ষ্মণ মনে করিয়া সূর্পণখা ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিল।)

সূর্পণখা

এই যে আমার প্রাণের লক্ষ্মণ, এই যে প্রাণারাম। আজ আর ছাড়ছি না। হে নাথ, আমার এ বাহুবন্ধনে আজ তোমাকে ধরা দিতেই হবে।

(নিকটে আসিয়া সূর্পণখা পিছন দিক হইতে লোকটির গলা জড়াইয়া ধরিল। লোকটি চম্‌কাইয়া লাফাইয়া উঠিল। লোকটি একটি দীর্ঘ পাকাদাড়ী বিশিষ্ট মুনি। ভয় পাইয়া মুনি চীৎকার করিয়া দৌড় দিল এবং বনের মাঝে অদৃশ্য হইয়া গেল।)

সূর্পণখা

নাঃ, আর পারি না,—মরীচিকার পিছনে আর ঘুরতে পারি না। ছলে বলে কৌশলে লক্ষ্মণকে আমার পেতেই হবে। ছোঁড়া যেন টাট্টু ঘোড়া। কিছুতেই আর নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নাই; ঘুমে চোখটা ঢুলে আস্‌ছে। এই নির্জ্জন ঝরণাতলে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্। আবার লক্ষ্মণের খোঁজে যেতে হবে। (ঝরণার ধারে পাথরের উপর সূর্পণখা শুইয়া পড়িল এবং ক্রমে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হইল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়া মধ্যে মধ্যে 'লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ বলিয়া বিলাপ করিতেছিল। সূর্পণখা স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, লক্ষ্মণ তাহাকে ধরা দিয়াছে,—দুইজনে মিলিয়া ঝরণাতলায় বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছে।)

(=স্বপ্ন=)

সূর্পণখা

তুমি আমার কে?

লক্ষ্মণ

আমি তোমার প্রাণনাথ, প্রাণবল্লভ, প্রিয়তম, প্রেমিকপ্রবর।

সূর্পণখা

তুমি কার?

লক্ষ্মণ

(সূর্পণখার গলা জড়াইয়া) আমি তোমার, তোমার, তোমার—(সূর্পণখা আবেগে লক্ষ্মণকে বুকে জড়াইয়া

সূর্পণখা আর্ত্তনাদ করিয়া লাফাইয়া উঠিল

ধরিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল একটি শিম্পাঞ্জী তাহার বুকের উপর। তাহাকেই সে বুকে জড়াইতে যাইতেছে। সূর্পণখা আর্ত্তনাদ করিয়া লাফাইয়া উঠিল।)

পঞ্চম দৃশ্য

(গোদাবরীর তীরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। জলে জ্যোৎস্নার ছায়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। খর ও দূষণের প্রবেশ।)

খর

খাসা মেয়েটা কিন্তু ভাই দূষণ।

দূষণ

কোন মুনি ঋষির মেয়েটেয়ে হবে। বেশ কচি মাংস কচ্‌কচিয়ে খেতে ভারী মজা—নারে খর!

খর

আরে ছ্যাৎ'—তুই নেহাৎ হাবাতে রাক্ষস। ওদের কি খেতে হয়?

দূষণ

হ্যা, তোর যে কথা—তবে কি মাথায় তুলে ধেই ধেই করে' নাচ্‌তে হব?

খর

আরে নাবে না, ওদের সঙ্গে বেশ রসের কথা কইতে হয়, প্রেম করতে হয়। মানুষের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে ভারী মজা। রাক্ষুসীগুলির সঙ্গে কি আর প্রেম করা চলে।

দূষণ

আরে ছোঃ—

খর

বেটীরা নাদা পেট চিবিয়ে খালি হাবাতের মত গিল্‌তে জানে আর জানে ভোঁসভুঁসিয়ে ঘুমুতে। না আছে রস, না আছে কস।

দূষণ

হো হো হো—যা বলেছিস্ ভাই। মেয়েটা গেল কোথায়?

খর

সন্ধ্যেবেলা গোদাবরীতে মুখ ধুতে এসেছিল। তখন সবে চাঁদ উঠ্‌ছে। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুঝ্‌তে পারলাম না চাঁদ বেশী সুন্দর কি মেয়েটার মুখ বেশী সুন্দর।

দূষণ

তারপর?

খর

ভাব্‌লাম সন্ধ্যেবেলা কেউ নেই—মেয়েটার সঙ্গে আলাপ জমাই গিয়ে। যেই কাছে গেছি পিছন দিক থেকে দুষমণের মত দুই ব্যাটা মনিষ্যি তীর ধনু বাগিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ছুটে এলো। চাঁদের আলোয় এক ব্যাটাকে চিন্‌লাম।

দূষণ

কে সে?

খর

যার জন্যে আমাদের গুণের দিদি পাগল।

দূষণ

ওঃ এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরেছি। ওই মেয়েটা আর কেউ নয় রামের বৌ সীতা আর ওই দুটো মনিষ্যি রাম আর লক্ষ্মণ।

খর

দিদির আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—ঐ একরত্তি চ্যাংড়া ছোঁড়াটার সঙ্গে কচ্‌কেমি না করলে আর চলে না।

দূষণ

না ভাই দিদির যা অবস্থা হয়েছে তাতে প্রাণে বাঁচ্‌লে হয়। চ্যাংড়াই হোক আর ল্যাংড়াই হোক পিরিত বড় বালাই। একটা কিছু হাস্ত ন্যাস্ত না করলে আর চলছে না।

খর

এর আর বেশী কথা কি—কালই লক্ষ্মণ ছোঁড়ার চুলের মুঠি ধরে হিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে আস্‌ব। বেশী টাণ্ডাই মাণ্ডাই করে তো লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করব।

দূষণ

হ্যা, এর জন্যে আর চিন্তে কি—

যদি খর দূষণের ইচ্ছা হয়
কোনো কাজেই পিছ্‌পা নয়। (দুইজনের প্রবল হাস্য)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(পথের একদিক দিয়া লক্ষ্মণ মনের আনন্দে লাফাইয়া গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল। অপর দিক দিয়া সূর্পণখাও আসিতেছে। কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ পথের মোড়ে দুইজনের দেখা।)

লক্ষ্মণের গান

তাইরে নারে না
তাইরে নারে না,
মনের সুখে স্বাধীন ভাবে বেড়াই বনে বনে,—
মাঝে মাঝে পড়ে শুধু ঊর্ম্মিলারে মনে,
তাইতে শুধু মনটা আমার কেমন কেমন করে
বিরহটা সইতে হবে চৌদ্দ বছর ধরে'।
তাইরে নারে না
তাইরে নারে না।

(পথের মোড়ে দুইজনের দেখা। লক্ষ্মণ 'বাপ্ রে' বলিয়া প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়া ছুট্ দিল। পিছনে পিছনে সূর্পণখাও 'লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ করিয়া ছুটিল। লক্ষ্মণ ছুটিতে ছুটিতে দুই তিনবার হোঁচট খাইয়া নদীর তীরে উপস্থিত।)

লক্ষ্মণ

বাপ্ রে, রাক্ষুসীর পাল্লায় পড়ে' প্রাণটা গেল দেখ্‌ছি। উঃ কি বেহদ্দ হাড়হাবাতে। জোর করে' প্রেম করবে। দাদাকে বল্লাম, তিনি হেসে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। বাপ্, ছুটতে ছুটতে কালঘাম বেরিয়ে গেছে। একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্। তারপর বাড়ী ফেরা যাবে।

(লক্ষ্মণ নদীতীরে বসিল। পিছনে সূর্পণখা আসিয়া উপস্থিত। লক্ষ্মণ এতক্ষণ টের পায় নাই।)

সূর্পণখা

লক্ষ্মণ, প্রাণকান্ত—

লক্ষ্মণ

ওরে বাপ্ রে, ঘাড়ের উপর গোখ্‌রো সাপের ছোবল্।
(লাফ দিয়া নদীতে পড়িয়া সাঁতরাইতে লাগিল।)

সপ্তম দৃশ্য

(মুনিদের আশ্রম। ঋষিকুমারীরা কেহ গাছে জল দিতেছে, কেহ হরিণের গায়ে হাত বুলাইতেছে। কেহ বা গল্প করিতেছে।)

১ম কুমারী

শুন্‌ছিস্ ভাই, লক্ষ্মণচন্দ্র সূর্পণখার প্রেমে পড়েছে।

২য় কুমারী

দূর বোকা,—লক্ষ্মণচন্দ্র পড়বে কেন—ফাঁদে পড়েছে সুন্দরী সূর্পণখা। (সকলের হাস্য।)

৩য় কুমারী

প্রেম কাকে বলে ভাই?

৪র্থ কুমারী

ঈস্ রাখ্ তোর ন্যাকামী। শরভঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে যে ভাগবপান্না নতুন তাপস কুমারটি এসেছে তার সঙ্গে কাল যে কি আলাপ করছিলি—আমি কি শুনিনি?

৩য় কুমারী

আমর্, তোর সবতাতেই জ্যাঠামী। ওমা তার সঙ্গে আমি আবার আলাপ করলাম কখন? তার চেহারাই আমি দেখিনি।

৪র্থ কুমারী

কাল বিকেলে—কুটীরের পিছনে—তালকুঞ্জের পাশে বসে—যার চেহারাই দেখিস্‌নি তার হাতে হাত দিয়ে—ফুস্ ফুসুর্, গুজুর্ গুজুর্ কত কি?

(৪র্থ কুমারীর কথা শুনিয়া একে একে অন্যান্য বালিকারা সকৌতুকে ছুটিয়া আসিল। সকলেই এক একবার ৩য় কুমারীর চিবুকে হাত দ্যায় আর বলে 'ন্যাকা!' তাহাদের মধ্যে একটি কুমারী নাচিয়া হাসিতে হাসিতে গাহিতে লাগিল।)

ঋষি কুমারীর গান

প্রেম কারে কয় জানি না ভাই
আমরা আনাড়ী,
কাঠ-খোট্টা মুনির মেয়ে
ঋষির কুমারী।
পাকা পাকা দাড়ীর মাঝে
বুনো মেয়ের প্রেম কি সাজে?
ডুবে ডুবে জল খেতে ভাই
আমরা কি পারি?

(আশ্রমের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। দূর হইতে কোন মুনির গলা শোনা গেল।)

হোম আরম্ভ হয়েছে—তোমরা সকলে এস।
(বালিকারা ছুটিয়া চলিয়া গেল।)

অষ্টম দৃশ্য

(একপাল গরু খরকে তাড়া করিয়াছে। খর প্রাণপণে ছুটিতেছে আর চীৎকার করিতেছে।)

খর

ভাইরে দূষণ, রক্ষা কর, রক্ষা কর, গোভূতের পাল্লায় পড়ে' প্রাণটা যে যাবার যোগাড়।

(খরের চীৎকারে দূষণ ছুটিয়া আসিল এবং গরুর পাল দেখিয়া প্রাণ ভয়ে একটি গাছে উঠিয়া পড়িল।)

দূষণ

উঠে পড়্, উঠে পড়্, গাছে উঠে পড়্ যদি বাঁচ্‌তে চাস্।

খর—গো-ভূতের-পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যে যাবার যোগাড়

(খরও তাড়াতাড়ি গাছে উঠিয়া পড়িল। গরুর পাল গাছের তল দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। দুইজনে গাছের ডালে বসিয়া কথোপকথন।)

খর

বাপ্ যা ফ্যাসাদেই পড়া গেছিল—

দূষণ

কি, ব্যাপারটা কি? কার গোয়ালে সেঁধুতে গেছিলি?

খর

না রে ভাই, মুনি ঋষিরা হোম করছিল; ভাব্‌লাম গদের ভয় দেখিয়ে চরু আদায় করে খাই—

দূষণ

তারপর?

খর

তারপর আর কি,—চরু খেতে গিয়ে গরুর তাড়া খেয়ে প্রাণ যায় আর কি। কি করে' কোথা থেকে যে ফুস্ মন্তরের চোটে এতগুলি গরু তেড়ে এলো—তাতো ভেবেই পাচ্ছি না।

দূষণ

তুই একটা আস্ত গরু, না হলে গরুর ভয়ে পালাস!

খর

আর তুই বুঝি ভয় না পেয়েই তড়াক্ করে' আমার আগেই গাছে উঠে বস্‌লি?

দূষণ

আরে বোকচন্দর, তোকে বাঁচবার একটা পথ বাৎলে দিলাম আরে ছোঃ—তুই রাক্ষসকুলে কালী দিলি।

খর

নে, নে, তুই খুব সাহসী,—এখন চল গাছ থেকে নেমে পড়া যাক্।

(দূষণ খরের গালে এক চড় মারিল।)

খর

একি, মারলি কেন?

দূষণ

এ্যাত্তো বড় এক মশা—

(খর দূষণের ভুঁড়িতে এক প্রবল চাঁটি মারিয়া বলিল 'পিঁপ্ড়ে, পিঁপ্ড়ে'—। চাঁটির চোটে দূষণ গাছ হইতে পড়িয়া গেল। খর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।)

নবম দৃশ্য

(লক্ষ্মণ কুঠার হস্তে কাঠের সন্ধানে বনে বনে ঘুরিতেছে।)

লক্ষ্মণ

না, ভালো জ্বালানী কাঠ আর এদিকে নেই দেখ্‌ছি। ওই যে সামনে একটা শুক্‌নো গাছ,—ওটাকেই কাটা যাক্—

(লক্ষ্মণ গাছ কাটিতে আসিয়া দেখিল সামনে ঝোপের পাশে একটি শাদা লেজের মত জিনিষ দেখা যাইতেছে।)

লক্ষ্মণ

আরে এটা কি? কাঠবেড়ালীর ল্যাজ নাকি?

(জিনিষটা ধরিয়া টান্ দিতেই দাড়ী শুদ্ধ একটি মুনির মুখ বাহির হইয়া পড়িল। মুনি চটিয়া টং।)

মুনি

অরে রে অর্ব্বাচীন্,—আমার ধ্যান ভঙ্গ করিস? এত সাহস তোর?

লক্ষ্মণ

(হাত জোড় করিয়া) দোহাই মুনি ঠাকুর,—আমি আপনার দাড়ীকে কাঠবিড়ালীর ল্যাজ মনে করেছিলাম। দোহাই আপনার—

মুনি

প্রগল্‌ভ বালক,—যা তোকে ক্ষমা করলাম—ক্ষমাহি

"অনড্বান্—অনড্বান"

পরমো ধর্ম্ম,—তোকে চিন্‌তে পেরেছি,—তুই শ্রীরামচন্দ্রের ভাই। অন্য কেউ হলে তোকে আজ ভস্ম করতাম্। অনড্বান্, অনড্বান্,— (মুনির প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ

ওঃ, মুনির খর্পর থেকে খুব বাঁচা গেছে বাবা। দাড়ি রাখতে হয় ভালো করে' রাখ্, ওরকম বিতিকিচ্ছি দাড়ি মানুষে রাখে?

(লক্ষ্মণ আসিয়া গাছ কাটিতে লাগিল। এমন সময় দূরে সূর্পনখার গান শোনা গেল।)

সূর্পনখার গান

কেন দূরে থাক জীবন দেবতা,
শুনাব তোমারে মরমের কথা,
এস কাছে প্রিয়
ভালোবাসা দিও,
কেমনে জানিবে মোর আকুলতা।
ভালোবাসি আমি
হৃদয়ের স্বামী,
কেন দিবাযামী প্রাণে দাও ব্যথা?

লক্ষ্মণ

ঐ রে মাগী আবার ধাওয়া করেছে'। নাঃ, আর ও করে' এড়িয়ে চল্‌লে চল্‌বে না। আজই একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক্।

সূর্পণখা

(কাছে আসিয়া) লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ,

লক্ষ্মণ

কেন কি চাস্?

সূর্পণখা

তোমাকে চাই—

লক্ষ্মণ

কেন, পেটে পুরতে?

সূর্পণখা

না, বুকে রাখতে—

লক্ষ্মণ

বারে, আব্‌দার মন্দ নয়। আমি কি কচি খোকা না যে বুকে রাখ্‌বি?

সূর্পণখা

আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই,

লক্ষ্মণ

এ্যাঁ, সর্বনাশ, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার স্ত্রীর নাম উর্ম্মিলা।

সূর্পণখা

আমারও তো বিয়ে হয়েছিল—তাতে কি আসে যায়?

লক্ষ্মণ

দ্যাখ, রাক্ষসী হলেও তুই মেয়েমানুষ। মেয়ে মানুষের বাড়াবাড়ি ভালো নয়। লক্ষ্মণ কিন্তু দারুণ অলক্ষণ ঘটিয়ে ছাড়বে।

সূর্পণখা

আমি তোমায় ছাড়ব না। (তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া) এই তোমাকে ধরলাম,—দেখি কেমন করে' ছাড়িয়ে যেতে পার নাথ।

(লক্ষ্মণ উপায়ান্তর না দেখিয়া হাতের কুঠার দ্বারা সূর্পণখার নাক কাটিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।)

লক্ষ্মণ

বোঝো এখন পিরিতের জ্বালা (পলায়ন)

সূর্পণখা

(ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে) হাঁউ, মাঁউ, হাঁউ,—ওঁরে খঁর, ওঁরে দূঁষণ, দৌড়ে আঁয়, দৌড়ে আঁয়, তোঁদের আঁদুরে দিঁদির দঁশা এঁকবার দেঁখে যাঁ—দেঁখে যাঁ—

(খর ও দূষণ দৌড়িয়া আসিল। সূর্পণখার দশা দেখিয়া তাহারা মনে মনে ভয় পাইল, কিন্তু বাহিরে ভীষণ রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল।)

উভয়ে

একি হোল, একি হোল!!

সূর্পণখা

হঁবে আঁবার কিঁ? তোঁরা থাঁকতে—চেঁয়ে দ্যাখ লঁক্ষ্মণ আঁমার কিঁ দঁশা করেছে—আঁমি চঁল্লুম দাঁদার কাঁছে লঁঙ্কায়—তোঁরা পাঁরিস, তোঁ প্রঁতিশোধ নে— (প্রস্থান)

খর

এ্যাঁ—সেই চ্যাংড়া? ধরে' আন তার টুঁটি চেপে—ঝুঁটি ধরে'—

দূষণ

তুই এগো—আমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে (বসিয়া নিজের পায়ের কাঁটা দেখিতে লাগিল)। উঃ উঃ উঃ—উঃ টন্ টন্ করছে,—আমি পরে যাচ্ছি, তুই ঝট্ করে' যা—

খর

এই, ওই, এই, এই, এই—এ্যা—চোখে কি একটা উড়ে এসে পড়লো—ওঃ দ্যাখ তো, দ্যাখ তো উঃ উঃ-উঃ-উঃ কন্‌কন্ করছে (চোখ রগড়াইতে লাগিল।)—তুই আগে যা, আমি পরে যাচ্ছি।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রাত্রি নিশীথে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী উগ্রচণ্ডা ত্রিশূল হাতে অতি সতর্কতার সহিত লঙ্কাপুরী পাহারা দিতেছেন। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ,—হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন নগরের প্রাচীরের পার্শ্বে মাটিতে পড়িয়া কে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিয়া উগ্রচণ্ডা কহিলেন—)

উগ্রচণ্ডা

এত রাত্রে কার এই আর্ত্তনাদ? কে কাঁদে—কে বাছা তুমি? (উগ্রচণ্ডার কথা শুনিয়া আর্ত্তনাদ থামিয়া গেল। মূর্ত্তিটি ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল।)

মূর্ত্তি

(কাঁদিতে কাঁদিতে কানে হাত দিয়া) কে, মা উগ্রচণ্ডা! কান গেল মা, কান গেল—যাতনায় প্রাণ গেল উঃ হুঃ হুঃ—

উগ্রচণ্ডা

আরে এ যে অকম্পন? কী ব্যাপার?

অকম্পন

মা লঙ্কেশ্বরি, কান গেল মা, কান গেল। রাবণ রাজার

আদেশে আমার কান কেটে নিশাচরেরা আমাকে রাজ্যের বার করে' দিয়েছে।

উগ্রচণ্ডা

অপরাধ ?

অকম্পন

(কাঁদিতে কাঁদিতে) অপরাধ আমার কিছুই নাই,—ঐ চুলোলখোর বজ্রহনুটাই যত নষ্টের গোড়া,—ওরই কান কাটা উচিত।

উগ্রচণ্ডা

কি হয়েছে ভেঙেই বল না ছাই।

অকম্পন

আমি লুকিয়ে লুকিয়ে রাবণ রাজার নর্ত্তকীদের সঙ্গে আলাপ করছিলাম,—তা এমন আর কি দোষ করেছি—ঐ বিটুলে রাক্ষস বজ্রহনুটা হিংসা করে' রাজা দশাননের কানে কথাটা তুলে দিয়েছে, আর রাবণ রাজার হুকুমে রাক্ষসগুলো ক্যাঁচ্ ক্যাচ্ করে' আমার কাণ দুটো কেটে আমাকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে,—উঃ হুঃ হুঃ—কাণ গেল মা; কান গেল।

উগ্রচণ্ডা

(তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া) আহা ওঠো বাছা,—এমন কি আর দোষ করেছে,—তুমি ছেলেমানুষ বইতো নও—যাও ঘরে যাও।—এই আমি তোমার কানে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—সব যাতনা দূর হবে—(কানে হাত বুলাইয়া) আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমার মঙ্গল হবে।

অকম্পন

ঘরে যাব কি করে' মা। রাজা দশাননের আদেশ আমায় লঙ্কা পরিত্যাগ করে' যেতে হবে।

উগ্রচণ্ডা

আমি থাকতে তোমার কিছু ভয় নেই। রাজা দশানন যতই দুর্দ্দান্ত হোক্—আমার কথায় ওঠে বসে। আমি থাকতে তোমার কিছু ভয় নেই বাছা। কাল সকালে আমি তোমাকে নিজে রাবণ রাজার সভায় নিয়ে যাব। যাও বাছা এখন ঘরে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাবণ রাজার সভা। সকলে উপস্থিত)

রাবণ

প্রহস্ত, অকম্পনের কি স্পর্দ্ধা, লুকিয়ে আমার নর্ত্তকীদের সঙ্গে সে আলাপ করে ?

বজ্রহনু

মহারাজ, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি কাল অকম্পন আপনার সব চেয়ে রূপসী নর্ত্তকীটির হাত ধ'রে কোমর বেঁকিয়ে নাচ্ছিল—(সভাস্থ সকলে—'অসহ্য, অসহ্য।')

প্রহস্ত

তার সমুচিত শাস্তি সে পেয়েছে,—তার কান দুটি কেটে রাজ্যের বাইরে বের করে' দেওয়া হয়েছে।

বজ্রহনু

তার মুণ্ডপাতই সমুচিত দণ্ড ছিল।

(এমন সময় 'হাঁউ মাঁউ' করিতে করিতে নাক কাটা সূর্পণখার প্রবেশ। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল 'একে ? একে ?')

সূর্পণখা

দাদা, তোমার আদুরে বোন্ সূর্পণখার দশা দেখ—(রাবণ উঠিয়া দাঁড়াইল,—সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলেই দাঁড়াইল।)

রাবণ

(ক্রোধে কাঁপিয়া) একি, বিশ্বত্রাসী রক্ষকুলপতি লঙ্কেশ্বর দানব দশাননের ভগিনী সূর্পণখার এ দশা করে—কার হেন স্পর্দ্ধা !!! (বসিল।)

(সভাস্থ সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল 'কার স্পর্দ্ধা ?'—তাহারাও বসিল।)

সূর্পণখা

দেব ন'য়—দানব ন'য়—সাঁমান্য এ'ক ফচ্‌কে মাঁনুষের কীর্ত্তি দাদা—সাঁমান্য এ'ক মাঁনুষের কীর্ত্তি,—লঁক্ষ্মণ তাঁর নাঁম, তোঁমার কুলে কাঁলী দাদা—তোঁমার কুঁলে কাঁলী—(ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল)।

রাবণ

তোমার অপরাধ ?

সুর্পণখা

আমার অপরাধ কিছু নেই দাদা,—আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে সে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিল,—আমি রাজী হই নাই তাই—

রাবণ—কার হেন স্পর্দ্ধা !!

রাবণ

প্রহস্ত, অনুসন্ধান কর কে এই অসমসাহসী নর লক্ষ্মণ,—তার সমুচিত দণ্ডবিধান করতে হবে—(সভাস্থ সকলে—মুণ্ডপাত, মুণ্ডপাত' ।)

সুর্পণখা

(চীৎকার করিয়া) আমার কি গতি হবে গো—

(উগ্রচণ্ডার আগমন । রাবণ দাঁড়াইল । সভাস্থ সকলে দাঁড়াইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"জয় মা লঙ্কেশ্বরী উগ্রচণ্ডার জয় ।")

রাবণ

কে, দেবী উগ্রচণ্ডা, প্রণাম হই,—

উগ্রচণ্ডা

তোমার মঙ্গল হোক্ । (সুর্পণখাকে দেখিয়া) একি সুর্পণখার এ দশা হোল কি ক'রে ?

(সুর্পণখা উগ্রচণ্ডাকে দেখিয়া হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ।)

প্রহস্ত

দেবি, কে এক ক্ষুদ্র নর, দানবী সুর্পণখার এ দশা করেছে ।

উগ্রচণ্ডা

(হো হো করিয়া হাসিয়া) চক্রীর চক্র, চক্রীর চক্র—

রাবণ

দেবি, হাস্‌ছেন যে—

উগ্রচণ্ডা

হাসার কারণ ঘটেছে তাই হাস্‌ছি । রাজা দশানন, সুর্পণখার বিবাহের ব্যবস্থা কর ।

সুর্পণখা

ঠাট্টা করবেন না দেবি, এ অবস্থায় সুর্পণখাকে কে বিয়ে করবে ?

উগ্রচণ্ডা

করবে অকম্পন—

সুর্পণখা

মা, আমার যে নাক কাটা—

উগ্রচণ্ডা

অকম্পনেরও কান কাটা—ঠিক হবে—

রাবণ

(উগ্রচণ্ডার প্রতি) দেবী, তোমার আদেশ শিরোধার্য্য ; তোমার হুকুম অমান্য করবার সাহস লঙ্কায় কারো নেই কিন্তু অকম্পনকে যে রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তার গুরুতর অপরাধের জন্য ।

উগ্রচণ্ডা

ভয় নেই, তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি,—তোমার ভয়ে সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে,—তার অপরাধ ক্ষমা কর।

বজ্রহনু

(রাবণের প্রতি) মহারাজ, অকম্পন নিজের কান মলে ক্ষমা প্রার্থনা করুক—

প্রহস্ত

এই চুপ,—তার কান থাকলে অবশ্যই সে ব্যবস্থা করা যেত—এখন সেটা বিবেচনার বাইরে—

রাবণ

দেবীর আদেশে অকম্পনকে ক্ষমা করলাম। (কয়েকটি নিশাচরের প্রতি) যাও তাকে সসম্মানে কাঁধে করে নিয়ে এস।

(রাক্ষসগণ হল্লা করিতে করিতে বাহিরে গেল ও কিছুক্ষণ পর কাঁধে করিয়া অকম্পনকে লইয়া সভায় প্রবেশ করিল। অকম্পন কাঁপিতে লাগিল।)

রাবণ

প্রহস্ত, নগরে ঘোষণা করে দাও, দেবী উগ্রচণ্ডার আদেশে আজ রাত্রে সমুদ্রতীরে দানব অকম্পনের সহিত দানবী সূর্পণখার বিবাহ। এক সপ্তাহ কাল ধরে এই উপলক্ষ্যে নৃত্য গীত চলুক। সূর্পণখার বিবাহের পর বে-আদব লক্ষ্মণের বিচার হবে। আজকের মত সভা ভঙ্গ হোক।

সকলে

(দাঁড়াইয়া) জয় দেবী উগ্রচণ্ডার জয়
জয় রাবণ রাজার জয়,
জয় সূর্পণখার জয়,
জয় অকম্পনের জয়।—

শেষ দৃশ্য

(সূর্পণখার বিবাহ রাত্রে সমুদ্রতীরে উৎসব। সূর্পণখা ও অকম্পনকে ঘিরিয়া রাক্ষসদের গীত ও নৃত্য।)

রাক্ষসদের গান

হুকম্ হাড়াম্—হ্রাম্ হ্রাম্
ধুম্ ধাম্—হম্ হাম্
খট্ খটা খট্—
চট্ পটা পট্
নাচনা চালাও
খাস্‌না হোঁচট্—;
রঙ্গে নাচ,
ভঙ্গে নাচ,
সঙ্গে বাজাও
বাজ্‌না বিকট;
কানকাটা ও
নাক্‌কাটাতে
যোট বেঁধেছে
আজ অকপট;
খট্ খটা খট্
চট্ পটা পট্
হুকম্ হাড়াম্—হ্রাম্ হ্রাম্
ধুম্ ধাম্—হম্ হাম্।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

রবীন্দ্রাষ্টক

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

১

নন্দন-বন হ'তে কে আনিল গন্ধ
মধুবাত হিল্লোলে সুললিত ছন্দ
বাণী মন্দিরে আজ কে সাজাল দীপালী
কে রচিল বন্দনা অভিনব গীতালি ;
দিকে দিকে দেশে দেশে বাজে জয়তূর্য্য
জয়তু রবীন্দ্র হে জয় কবি-সূর্য্য।

২

কার গানে চোখে নামে মন্থর তন্দ্রা
ললাটে শোভিছে কার গৌরব চন্দ্রা,
বন্দিনী ছন্দে কে দিল আজ মুক্তি
অতলের তল হ'তে মুক্তা ও শুক্তি ;
গগনে পবনে হের বাজে জয় তূর্য্য,
জয়তু রবীন্দ্র হে জয় কবি-সূর্য্য।

৩

ধ্যানলোকে জ্ঞানলোকে প্রণবের দ্রষ্টা,
জীর্ণ জাতির বুকে তরুণের স্রষ্টা,
সত্যের সন্ধানে মধুকর-চিত্ত
কাব্য-কমল বনে গুঞ্জরে নিত্য ;
সিন্ধুর গর্জ্জনে উঠে জয় তূর্য্য,
জয়তু রবীন্দ্র হে জয় কবি-সূর্য্য।

৪

অরূপের রূপ আজ ফুটিয়াছে ছন্দে
স্বরগের পারিজাত বর্ণে ও গন্ধে,
কিন্নরী নাচে যেন ধূলিমাখা মর্ত্ত্যে,
আলোকের ঝর্ণা কে দিল মোহ গর্ত্তে ;
মেরু মরু পর্ব্বতে উঠে জয় তূর্য্য
জয়তু রবীন্দ্র হে জয় কবি-সূর্য্য।

৫

কাব্য-তটিনী স্রোতে বহে হাসি কান্না,
তটে কত ফুটে ফুল হীরা মতি পান্না ;
কে তুলিল মূর্চ্ছনা সুপ্ত সারঙ্গে
প্রাণ-করি উতরোল নির্জ্জীব বঙ্গে ;
মেঘ মল্লারে হের উঠে জয় তূর্য্য,
জয়তু রবীন্দ্র হে জয় কবি-সূর্য্য।

৬

বিশ্বপ্রেমের গান কে গাহিল বঙ্গে
মিলাইল প্রাচ্যকে প্রতীচ্য সঙ্গে,
দিকে দিকে প্রচারিয়া ভারতের কৃষ্টি
লীলায়িত ভাষা আজ কে করিল সৃষ্টি,
অর্পিল বাণী পদে ছন্দারবিন্দ,
জয়তু বিশ্বকবি জয় শ্রীরবীন্দ্র।

৭

ছন্দের হিল্লোলে ভাবে ভোর অন্তর
কে দিল জড়ের বুকে অমৃত মন্তর,
পতিতের ভগবানে কে করিছে আরতি,
সাম্য-মৈত্রী রথে কেগো ঐ সারথী,
মহর্ষি নন্দন বিশ্ব কবীন্দ্র,
জয়তু বাঙ্গালী কবি জয় শ্রীরবীন্দ্র।

৮

কবিগুরু ! তব গানে হিয়া মোর মুগ্ধ,
উন্মন চিতমন ধরাধূলি ক্ষুব্ধ,
দুখ জালা ভুলে যাই তন্ময় চিত্তে
লয়ে যায় ভাবময় স্বপনের তীর্থে ;
প্রণমি তোমারে গুরু বিশ্ব কবীন্দ্র,
জয়তু প্রেমিক কবি জয় শ্রীরবীন্দ্র।

যৎকিঞ্চিৎ

ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পি, এইচ, ডি (বার্লিন)

এ বৈঠকের আজ পর্য্যন্ত যতগুলি অধিবেশন হয়েছে তার সব গুলিতে অল্প বিস্তর (মানসিক) গুরুভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল। উপর্য্যুপরি গুরুভোজনের দুষ্পাচ্যতা-দোষ সত্ত্বেও নিমন্ত্রিতবর্গের উপস্থিতির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না সত্য, কিন্তু এ ব্যবস্থা কায়েমী হয়ে গেলে ভবিষ্যতে নিমন্ত্রণ জিনিষটাই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠ্‌তে পারে। এতদুভয় কারণে আয়োজন মধ্যে মধ্যে একটু লঘু হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'যৎকিঞ্চিৎ'-যোগে লঘু পথ্যের ব্যবস্থা আজ সেইজন্য।

কথিত আছে একদা পঞ্চালদুহিতা মাত্র শাককণা দ্বারা দুর্ব্বাসার মত উগ্রস্বভাব ঋষি ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গোবর্গকে শান্ত করেছিলেন এবং বিদুরের ভিক্ষালব্ধ খুদকণায় স্বয়ং শ্রীভগবানেরও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছিল। তাই সাহস পেলাম।

'বৃহৎ' সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ক্ষুদ্রের দিকে আমরা মনোযোগ দিতে বড় অভ্যস্ত নই। বহির্জগতে যা ক্ষুদ্র, আমাদের মনোজগতে তা সাধারণতঃ ক্ষুদ্রই থেকে যায়। কিন্তু এটা খুবই সত্য যে নাম, আয়তন বা পরিমাণ দ্বারা বস্তুবিশেষের সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা উচিত বা সম্ভব-পর হয় না। অতএব 'যৎকিঞ্চিৎ' নাম শুনেই আপনারা নাসিকা কুঞ্চন করবেন না। 'যৎকিঞ্চিৎ' বলেই যে 'অকিঞ্চিৎকর' হতে হবে এমন কি কথা আছে? বরং সময় সময় এর শক্তি ও প্রভাব যেমন বিরাট্ তেমনি দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে। বাস্তব জগতে যৎকিঞ্চিতের প্রয়োজনীয়তা বড় একটা অগ্রাহ্যের সামগ্রী নয়।

সকলেই জানেন আজকাল খাদ্যপ্রাণ (vitamin) নিয়ে খুব একটা হৈ চৈ হচ্ছে। সুরস, সুস্বাদু খাদ্য হলেই চল্‌বে না,—fat (স্নেহ জাতীয়), protein (পলীয়) ও Carbohydrate (শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয়) এই তিন উপকরণের সঠিক সংমিশ্রণ হলেও সে খাদ্যে শরীর পুষ্টি হবে না। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য, জীবনীশক্তির পূর্ণবিকাশের জন্য এমন খাদ্যসমষ্টি চাই যার মধ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণগুলি বর্ত্তমান থাকবে। অন্যথা নানা জাতীয় রোগের (deficiency disease) উৎপত্তি অনিবার্য্য। A, B, C, D, E প্রভৃতি ৮।৯ প্রকারের খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন খাদ্যে এক বা ততোধিক খাদ্যপ্রাণ বিদ্যমান, কোনটি আবার একেবারে খাদ্যপ্রাণ-হীন। এই খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ কতটুকু? অতি যৎকিঞ্চিৎ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যে নগণ্য শাক,—বিশেষতঃ পালং শাক (ইংরাজী Spinach জাতীয়) চিরকাল দুঃস্থের খাদ্য বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে আজ-কাল তা এক মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য বলে পরিচিত হচ্ছে। কারণ এর মধ্যে অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় বেশী পরিমাণে এবং বেশী প্রকারের খাদ্যপ্রাণ আছে। "সোনার দরে শাক বিক্রয় হওয়া উচিত"—এ কথা তাই মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। অতিরঞ্জনের অবশ্য সীমা নাই। এ রকম গল্পগুজবও শোনা যায় যে অদূরভবিষ্যতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমন খাদ্যপ্রাণ-সংমিশ্রণ তৈরী হবে যার দু' চার ফোঁটা মিশিয়ে একবার পান করলেই সমস্ত দিনের জন্য খাদ্যগ্রহণের বালাই চুকে যাবে। যা হোক, এ সব বৈঠকী রসিকতার মধ্যে সত্য হচ্ছে এই যে খাদ্যমধ্যস্থ 'খাদ্যপ্রাণ' জিনিষটির পরিমাণ অতি যৎকিঞ্চিৎ। এত যৎকিঞ্চিৎ যে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এতাবৎকাল অনুভূত হয় নি। অথচ এর কি আশ্চর্য্য শক্তি।

বৈজ্ঞানিকগণ 'যৎকিঞ্চিৎ'কে কখনও অগ্রাহ্য করেন না। দেখা গিয়েছে অনেকে এরই অনুসন্ধানে বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বড় বড় কারখানায় 'waste matter' নামে যে দ্রব্যগুলি পূর্ব্বে

আবর্জ্জনা হিসাবে পরিত্যক্ত হোত, ব্যবহারিক রসায়নবিদ্‌গণ এখন বিশেষ যত্নসহকারে সেগুলি পরীক্ষা করে থাকেন—এই আশায় যদি সেই স্তূপের মধ্যে কোন দুর্ম্মূল্য 'যৎকিঞ্চিৎ' লুক্কায়িত থাকে। বহু স্থলে এই অনুসন্ধানের ফলে এমন সব মূল্যবান উপজাত সামগ্রী (by-products) পাওয়া গিয়েছে যার জন্য অনেক শ্রমশিল্পের কারখানা (manufacturing industry) আধুনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে এমনও টিকে আছে।

রেডিয়ম ধাতুর নাম ও তার অদ্ভুত প্রকৃতির কথা আপনাদের অবিদিত নাই। এই ধাতুর আবিষ্কারের ইতিহাস থেকে 'যৎকিঞ্চিতের' শক্তির কিছু আভাস পাবেন। এই ধাতুটি স্বতঃবিভজ্যমান (Spontaneously disintegrating); অনুক্ষণ আপনাকে ভাঙছে এবং তার ফলে এ থেকে অবিশ্রান্তভাবে উত্তাপ, অদৃশ্য রশ্মি ও গ্যাস (emanation) বার হচ্ছে। এই শেষোক্ত গ্যাসটি আবার নিজে থেকে ভেঙ্গে-চুরে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করতে করতে পরিশেষে হিলিয়ম গ্যাস ও সীসক ধাতুতে পরিণত হচ্ছে। রেডিয়ম থেকে হিলিয়ম্ গ্যাস ও সীসক ধাতুর উৎপত্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রকৃতির রাজ্যে আপনা-আপনি এক ধাতুর অপর ধাতুতে পরিবর্ত্তন (transmutation of metals) চল্‌ছে। অতি প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণ এই 'transmutation of metals' নামক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাম্র প্রভৃতি 'নীচ' ধাতুকে স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি 'মহৎ' ধাতুতে পরিণত করা তাঁরা সম্ভবপর মনে করতেন। এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তাঁরা কয়েক শ' বৎসর ধরে 'পরশ-পাথরের' সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন—"ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর"। কিছুকাল পূর্ব্বেও এই প্রাচীন কল্পনাটিকে উপহাস করে লোকে আনন্দ পেত। কিন্তু মতবাদ-চক্র ঘুরছে। পণ্ডিত-সমাজ ধীরে ধীরে আবার পুরাতন মতবাদটির দিকে সস্নেহনয়নে তাকাচ্ছেন।

এইবার আমাদের পুরাতন প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্। রেডিয়ম থেকে নিঃসৃত যে অদৃশ্যরশ্মির কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে, ঐরূপ রশ্মিবিকীরণ-শক্তির নাম radio-activity। তখনও রেডিয়ম ধাতু আবিষ্কৃত হয়নি কিন্তু ইউরেনিয়ম্ (Uranium) ধাতু থোরিয়ম্ (Thorium) ধাতুর মধ্যে উক্তরূপ গুণ দেখা গিয়েছিল। পিচ্‌ব্লেণ্ড্ (Pitchblende) নামক একটি খনিজ পদার্থে এই ইউরেনিয়ম্ ধাতু (Oxide রূপে) বিদ্যমান থাকে। সুতরাং পিচ্‌ব্লেণ্ড্-এর মধ্যে রশ্মিবিকীরণ-শক্তি থাক্‌বার কথা—অবশ্য বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম-এর শক্তির তুলনায় কম মাত্রায়। বোহিমিয়া প্রদেশে প্রাপ্ত পিচ্‌ব্লেণ্ড্ পরীক্ষা করে দেখা গেল এর রশ্মিবিকীরণশক্তি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম্ থেকে কম হওয়া দূরে থাকুক তদপেক্ষা ২।৩ গুণ বেশী। অথচ সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এর মধ্যে ইউরেনিয়ম্ ব্যতীত উক্ত গুণসম্পন্ন অন্য কোনও পদার্থ ধরা পড়্‌ল না। তবে কোন্ অদৃশ্য পদার্থ পিচ্‌ব্লেণ্ড্-এর মধ্যে লুক্কায়িত থেকে একে এরূপ শক্তিমান্ করছে? এর পরিমাণ যে অতি যৎকিঞ্চিৎ তাতে সন্দেহ নাই—অন্যথা রাসায়নিক পরীক্ষায় তা সহজেই ধরা পড়্‌ত। অথচ এই যৎসামান্যের শক্তি অসামান্য—নিজে গুপ্ত থেকেও নিজের শক্তিকে গোপন রাখ্‌তে পারছে না। তখন কুরী-দম্পতী এই গুপ্তদ্রব্যের অনুসন্ধানে উঠে পড়ে লাগলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে একদিন তাঁরা জগৎকে শুনালেন "গুপ্ত জিনিষ ধরা পড়েছে—তার পরিমাণ মোটামুটি একশত মণ পিচ্‌ব্লেণ্ড্-এর মধ্যে এক গ্র্যাম মাত্র, এবং তার রশ্মিবিকীরণশক্তি ইউরেনিয়ম ধাতুর দশ লক্ষ গুণ।" দ্রব্যটি রেডিয়ম ধাতুর একটি যৌগিক পদার্থ—শক্তির উৎস রেডিয়ম্ নিজে। কিছু পরে ১৯১০ সনে এই পদার্থ থেকে মাদাম্ কুরী রেডিয়ম ধাতু পৃথক করেন। জগতে ধন্য ধন্য রব উঠ্‌ল।

কৃত্রিম আলোকের ইতিহাসে গ্যাস ও তড়িৎ-এর আবির্ভাব এক নবযুগ আনল। কয়লা-পোড়ান গ্যাস (coal gas) জ্বালিয়ে আলোকের প্রবর্ত্তন উইলিয়াম্ মারডক্ প্রথম ১৭৯৮ সনে করলেন। তেল বা মোমবাতির তুলনায় এই আলোকের তীক্ষ্ণতায় লোকে বিস্মিত ও মুগ্ধ হল। ১৮১২ সনে লণ্ডন এবং ১৮১৫ সনে প্যারিস

সহর গ্যাস-বাতির সাহায্যে আলোকিত হ'ল। কিছু দিন পরে কিন্তু তাও যথেষ্ট বলে মনে হোল না—আরও উজ্জ্বল আলোক চাই। দেখা গেল গ্যাসের আলোকশিখার মধ্যে জমাট বাঁধা চূণ (lime) কিংবা ঐ জাতীয় অন্য পদার্থ (যেমন oxides of magnesium and rare-earths) রাখলে সেটা উত্তপ্ত হয়ে তীক্ষ্ণ শ্বেতবর্ণের আলোক বিকীরণ করে। এই হোল lime-lightএর সৃষ্টি। আরও উন্নতি চাই—বিশেষতঃ বৈদ্যুতিক আলোকের অভ্যুদয়ে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় গ্যাস-বাতিকে বাঁচাতে হলে তার আরও উন্নতিসাধন প্রয়োজন। কি ভাবে হোল বলি। পূর্ব্বে গ্যাস-বাতির অগ্নিশিখা উন্মুক্ত ও দৃষ্টিগোচর থাকৃত। আপনারা লক্ষ্য করেছেন এখন ওটি একটি শ্বেতবর্ণ জালের টুপি—(gas-mantle) দ্বারা আবৃত থাকে। গ্যাস-বাতির অগ্নিশিখা এই টুপিকে উত্তপ্ত করে—এবং এই টুপি এমন পদার্থে নির্ম্মিত যা উত্তপ্ত অবস্থায় অতি উজ্জ্বল শ্বেত আলোক বিকীরণ করবার শক্তি ধারণ করে। এই টুপিই গ্যাস-আলোকের সমৃদ্ধির কারণ। ১৮৮৬ সনে Auer Von Welsbach এই টুপি নির্ম্মাণ করেন thorium oxide ও কিছু কিছু অন্যান্য rare-earth জাতীয় ধাতুর oxideএর সাহায্য নিয়ে। উক্ত উপায়ে আলোকের উজ্জ্বলতা বাড়্‌ল বটে, কিন্তু সন্তোষজনক হ'ল না। বিশুদ্ধ thorium oxide একাকী উজ্জ্বলতা দানে বিশেষ সাহায্য করে না। কিন্তু তার সঙ্গে অল্প পরিমাণ Cerium oxide মিশ্রিত করায় সুফল পাওয়া গেল এবং দেখা গেল Thorium oxide এর সঙ্গে শতকরা এক ভাগ মাত্র Ceria নিলে আলোকের তীক্ষ্ণতা দশ গুণ বেড়ে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই অনুপাতের (৯৯:১) হ্রাসবৃদ্ধির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হ'লে আলোকের প্রখরতা ক্ষুণ্ণ হ'বে—Ceriaর পরিমাণ বৃদ্ধিতেও আলোকের হ্রাস—এবং এই পরিমাণ বেড়ে শতকরা দশ ভাগে পৌঁছালে আলোক-বিকীরণ-শক্তি প্রায় বন্ধ হয়েই যায়। অন্য দিকে মাত্রা ১ ভাগ অপেক্ষা যত হ্রাস করবেন আলোকও সেই পরিমাণে নিস্তেজ হবে। Ceriaর সঙ্গে আলোকের তীক্ষ্ণতা জড়িত, অথচ এর পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে তীক্ষ্ণতার হ্রাস কেমন করে সম্ভব হ'ল? এ রহস্য "প্রকৃতির একটা খেয়াল" এই বলে মনকে প্রবোধ দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পন্থা। তবে সম্ভবপর যেমন করেই হোক না, আপনারা যৎকিঞ্চিৎ Ceriaর পরিচয় পেলেন।

সাধারণ বাতাস জিনিষটাকে পরীক্ষা করে আমরা কি দেখি? এর মধ্যে প্রধানতঃ অম্লজান (অক্সিজেন) ও যবক্ষারজান (নাইট্রোজেন) এই দুই বায়ু এবং তদনুপাতে যৎকিঞ্চিৎ (দশ হাজারে তিন ভাগ) অঙ্গারাম্ল বায়ু (কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস) বিদ্যমান। প্রাণী-জগতের জীবনধারণের জন্য অম্লজান একান্ত প্রয়োজনীয়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ইহা শরীরমধ্যে প্রবেশ করে এবং কার্য্যশেষে প্রশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গারাম্ল বায়ু ও জলীয় বাষ্পাকারে বার হয়ে আসে। এই অঙ্গারাম্ল বায়ু জীবজন্তুর পক্ষে সাক্ষাৎ বিষবৎ প্রাণহানিকর নয় সত্য, কিন্তু বাতাসে এর অনুপাতবৃদ্ধি ঘটলে অম্লজানের অনুপাত সেই পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং এরূপ অম্লজানস্বল্প বাতাসে প্রাণধারণ চলে না। এটা দূষিত বায়ু। বদ্ধ ঘরে বহু লোকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে এই ভাবে বায়ু দূষিত হয়ে (অন্ধকূপ-হত্যা ব্যাপারের মত) মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। তবে সাধারণ বায়ুর মধ্যে স্বল্প পরিমাণ অঙ্গারাম্ল বায়ু থাকবার প্রয়োজন কি? এর অস্তিত্ব হিত না করে কি অহিতের কারণ হয়েছে? জীবজগতের পক্ষে অম্লজানের যেরূপ প্রয়োজন, উদ্ভিদ্‌জগতের পক্ষে অঙ্গারাম্ল বায়ুর প্রয়োজন তদ্রূপ। এটা উদ্ভিদের অন্যতম খাদ্যস্বরূপ উদ্ভিদ্‌-পত্রের সবুজ রং-এর সাহায্যে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই বায়ু থেকে চিনি, শ্বেতসার ও অন্যান্য শর্করা জাতীয় এবং তৈলজাতীয় পদার্থ প্রস্তুত হয়ে উদ্ভিদ্‌-দেহে বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত হয়ে থাকে, এবং পরিশেষে প্রাণী জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে—খাদ্যরূপে ও অন্যা হিসাবে।

নরম লোহা (Wrought iron) ও ইস্পাত (Stee মুখ্যতঃ একই পদার্থ—দুইই লোহা। কিন্তু উভয়ের মা গুণাগুণের পার্থক্য কত! একটি নরম, টানলে বা চাপ পেলে বেঁকে যায়—অন্যটি কঠিন ও স্থিতিস্থাপক,

ভারবহনের শক্তি তার প্রচুর, এবং এই সব গুণাবলীর জন্ম তাকে কত প্রকারেই না ব্যবহার করা হয়ে থাকে! অস্ত্রশস্ত্র, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, লৌহবর্ত্ম, সেতুনির্ম্মাণ, ইমারৎ ইত্যাদিতে ইস্পাতেরই চাহিদা—নরম লোহা এ সব ক্ষেত্রে একেবারে অকর্ম্মণ্য। এরূপ প্রভেদের হেতু কি? পরীক্ষা করে দেখা গেছে উভয়বিধ লোহার মধ্যে স্বল্প পরিমাণ অঙ্গার বিদ্যমান থাকে। নরম লোহাতে মোটামুটি হাজারকরা এক ভাগ এবং ইস্পাতের মধ্যে দুই থেকে দশ ভাগ পর্য্যন্ত। 'যৎকিঞ্চিৎ' অঙ্গারের আনুপাতিক ইতরবিশেষ উভয়ের মধ্যে এত পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে।

রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে সচরাচর লক্ষ্য করা যায় এক কামরায় দু'জন অপরিচিত যাত্রী পাশাপাশি বসে আছেন—তাঁদের মধ্যে বাক্যবিনিময় পর্য্যন্ত চল্‌ছে না, একে অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন সময় একজন তৃতীয় ব্যক্তি এসে এঁদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন তাঁদের মধ্যে বেশ আলাপ, ভাবের আদান-প্রদান চল্‌তে লাগ্‌ল এবং যেন বেশ একটা সদ্ভাবের সৃষ্টি হ'ল। এই তৃতীয় ব্যক্তিটির মত এক শ্রেণীর পদার্থ রসায়নশাস্ত্রে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। একে Catalyst বা Catalytic agent আখ্যা দেওয়া হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় দুটি দ্রব্যের পরস্পরের প্রতি কোনও টান নাই—তাদের সংমিশ্রণে কোনরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘট্‌ছে না। কিন্তু একটুকু ঐ তৃতীয় পদার্থ (Catalyst) সেখানে উপস্থিত করামাত্রই রাসায়নিক ক্রিয়া সহজ হয়ে গেল। প্রথম পদার্থদ্বয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হ'ল—আদান-প্রদান চলতে লাগ্‌ল। Catalystটি যেন এক honorary ঘটকঠাকুর। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার শেষে এর সত্তার বা পরিমাণের কোন পরিবর্ত্তন কিন্তু লক্ষিত হয় না।

দু'-একটা দৃষ্টান্ত দিই। জলজান (হাইড্রোজেন) ও অম্লজান বায়ুর রাসায়নিক সংযোগে জলকণার উৎপত্তি। একটা বোতল দু'ভাগ জলজান ও একভাগ অম্লজান বায়ু দ্বারা পূর্ণ করে তার মুখে অগ্নিশিখা ধরলে ভীষণ গর্জ্জনের সঙ্গে বাষ্পকণার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান-শ্রেণীর ছাত্রের কাছে এ গর্জ্জন সুপরিচিত। সাধারণতঃ উক্ত বায়ু দু'টির মধ্যে জলীয় বাষ্প যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে থেকে যায়। কিন্তু যত্ন সহকারে বায়ু দু'টীকে জলীয়বাষ্পহীন করে বোতলবদ্ধ করুন এবং অগ্নিশিখা সংযোগ করুন, গর্জ্জনও শুনবেন না—জল কণার সৃষ্টিও হবে না। এই বজ্রনিনাদী রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সংঘটন কে ঘটায়? কার অভাবেই বা এটা স্থগিত রইল? ঐ যৎকিঞ্চিৎ বাষ্পকণা।

সলফিউরিক এসিড নানাবিধ শ্রমশিল্পের জন্ম একটি একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী ও আমেরিকায় প্রতি বৎসর তা কোটি কোটি মণ প্রস্তুত হয়ে থাকে। দগ্ধ গন্ধক বায়ু (সলফার ডাই-অক্‌সাইড্) ও অম্লজানের সংযোগে এর উৎপত্তি হয়। কিন্তু উক্ত বায়ু দুটী একত্র মিশ্রিত করলে, উত্তাপযোগেও কোন ফল পাওয়া যায় না কিংবা এত স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায় যে তা কোন কাজের হয় না। কিন্তু এই বায়ু-মিশ্রণকে গরম অবস্থায় যদি সামান্ত পরিমাণ প্ল্যাটিনম ধাতুর গুঁড়ার সংস্পর্শে আনা যায় তৎক্ষণাৎ দুটি সংযুক্ত হয়ে sulphuric acid-এর সৃষ্টি করে। প্রক্রিয়ার শেষে প্ল্যাটিনম-এর কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।

'নীল' (indigo blue) রঞ্জনশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম উপকরণ। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হ'ত। বিশ্বের বাজারে ভারতই ছিল প্রধানতঃ এর সরবরাহকারী এবং প্রতিবৎসর কোটী কোটী টাকার নীল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হ'ত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্ম্মেনীর লোলুপ দৃষ্টি এর উপর পড়্‌ল। Baeyer প্রমুখ রসায়নবিৎগণ কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুতের পন্থা আবিষ্কার করতে লাগলেন এবং ১৮৯৭ সনে বিখ্যাত Badische Anilin und Soda Fabrik কৃত্রিম নীল প্রথম বাজারে উপস্থিত করলেন। সেই অবধি এর দ্রুত উন্নতি হ'তে লাগ্‌ল এবং উদ্ভিজ্জাত নীল ক্রমশঃ কোণঠেসা হ'ল। ১৮৯৭ সনে ভারত থেকে প্রায় ৫ কোটী টাকা মূল্যের নীল রপ্তানি হয় এবং ষোল বৎসর পরে ১৯১৩ সনে—অর্থাৎ মহাসমরের পূর্ব্ব বৎসরে মোটে ৯ লক্ষ টাকার ভারতীয় নীল বিক্রী হয়। নীলের মূল্যও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে অর্দ্ধেক হয়ে গেল। যুদ্ধের কয়েক বৎসর জার্ম্মানী শিল্পব্যবসার দিকে মনোযোগ

দেবার অবসর না পাওয়ায় ঐ সময় ভারতের নীলের পক্ষে কতকটা সুবিধা হয় বটে—কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী মাত্র—এখন কৃত্রিম নীলেরই জয় জয়কার।

এই নীল প্রস্তুতের উপকরণাদির আদি সূত্র হচ্ছে ন্যাপ্‌থালিন। তাকে ভেঙে প্‌থ্যালিক এসিড্ করা চাই, এবং এই পরিবর্ত্তন সল্‌ফিউরিক্ এসিডের সাহায্যে সম্পাদিত হয়ে থাকে। উক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহজ ও সন্তোষজনক উপায় আবিষ্কারের জন্ম তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন temperature-এ পরীক্ষা চলতে লাগ্‌ল, কিন্তু মনোমত ফল পাওয়া গেল না। একদিন পরীক্ষাকালে দৈবক্রমে পাত্রস্থ তাপমান যন্ত্রটি ভেঙে যায়—এবং সেদিন অভীপ্সিত ফলও পাওয়া গেল। ব্যাপারটা কি? Thermometer-এর মধ্যে যে অল্প পরিমাণ পারদ থাকে তারই সংস্পর্শে কি এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল? একটু পারদ সংযোগে পূর্ব্ব পরীক্ষার পুনরাবৃত্তির ফলে দেখা গেল ঠিক তাই। একটা নিছক দৈব ঘটনার ফলে যৎকিঞ্চিৎ পারদের যাদুশক্তি ধরা পড়্‌ল এবং বৈজ্ঞানিকের শ্রম সার্থক হ'ল। এই ভাবে—লোহা, তামা, নিকেল্ প্রভৃতি ধাতু চূর্ণীকৃত অবস্থায় নানা রাসায়নিক শিল্পে Catalyst রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আর এক রকম Catalyst আছে—প্রাণহীন অজৈব পদার্থ নয়, তারা জৈব ও ঔদ্ভিদ—নিম্নতম স্তরের জীব ও উদ্ভিদ্ জাতীয়। micro-organisms—microbes, bacteria প্রভৃতি সূক্ষ্মতম জীবাণুর দল, অথবা yeast, mould বা fungus (ছত্রাক) প্রভৃতি উদ্ভিজ্জাণু-জাতীয়। জলে, স্থলে, বাতাসে এদের অবারিত প্রবেশ। অতি সূক্ষ্ম, চক্ষুর অগোচর হলেও এদের প্রচণ্ড সংশ্লেষণ এবং বিশেষতঃ বিশ্লেষণশক্তি আমরা অনুক্ষণ অনুভব করি, এবং নানা ভাবে সেই শক্তির সাহায্যও নিয়ে থাকি। প্রাণি-জগতে বাহ্যিক ধ্বংস ও সৃষ্টিলীলা নিত্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। জীবদেহের অভ্যন্তরেও অনুক্ষণ সৃষ্টি ও লয়ের কার্য্য পাশাপাশি ঘটছে—কিন্তু এত সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে যে আমরা তা অনুভব পর্য্যন্ত করি না। এই দুই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যের উপর এক দিকে যেমন জগতের স্বাস্থ্য ও ক্রমোন্নতি, অন্য দিকে তেমনি জীবের স্বাস্থ্য ও দৈহিক পরিপুষ্টি নির্ভর করে। উক্ত ধ্বংস ও সৃষ্টিলীলায় সূক্ষ্ম জীবাণু দলের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। এদের কার্য্য কখন জীবনীক্রিয়ার অনুকূল, কখন বা প্রতিকূল। বিভিন্ন শ্রেণীর যৎকিঞ্চিৎ জীবাণুই বসন্ত, প্লেগ, ওলাউঠা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির জন্মদাতা। আজকাল Laboratoryতে নানা শ্রেণীর রোগোৎপাদক জীবাণু তৈরী করা (Culture) হচ্ছে। এবং চিকিৎসাশাস্ত্র "বিষস্য বিষমৌষধম্" এই মূলমন্ত্রের উপর নির্ভর করে—রোগস্রষ্টা জীবাণুর সহায়তায় নানা রকম রোগ নিবারণে ও প্রশমনে বদ্ধপরিকর হয়েছে। অন্যদিকে রসায়ন শাস্ত্র শ্রমশিল্পের মধ্য দিয়ে জীবাণুর প্রচণ্ড ক্ষমতার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করছে না। ভিন্ন ভিন্ন জীবাণুর সাহায্যে মদ থেকে সির্কা (vinegar), শর্করা বা শর্করা-জাতীয় (carbohydrates) দ্রব্য থেকে মদ, lactic acid, citric acid, acetone প্রভৃতি, এইরূপে কত প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী কারখানায় প্রস্তুত হচ্ছে।

যৎকিঞ্চিতের শক্তির পরিচয়ের জন্ম এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট দৃষ্টান্ত হাজির করা হয়েছে। যে বস্তু যত শক্তিমান্ ব্যবহারিক জগতে তার মূল্য ও আদর সেই অনুপাতে বেশী হয় যদি তার সদ্ব্যবহারের কোন উপায় নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। এই কারণে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যৎকিঞ্চিতের পরীক্ষায় পণ্ডিতগণ বিশেষ যত্নবান্ হলেন। ক্ষুদ্র হলেও, যতক্ষণ বস্তুটি দৃষ্টিগোচর থাকে, তাকে test-tubeএর মধ্যে পরীক্ষা করা চলে। কিন্তু তার আয়তন যদি দৃষ্টিসীমানার বাইরে চলে যায় তখন বৈজ্ঞানিকের মহাবিপদ্। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা আর চলে না। কারণ রাসয়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলাফল ইন্দ্রিয়গোচর এবং মুখ্যতঃ চক্ষুগোচর হওয়া চাই। যা হোক্ বৈজ্ঞানিক সহজে দমবার পাত্র নন্। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম তিনিও নব নব পন্থা আবিষ্কার করছেন। সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব।

অত্যল্প পরিমাণ কিংবা অতি সূক্ষ্মায়তন বস্তুর পরীক্ষায় নিম্নোক্ত তিনটি যন্ত্রের সাহায্য একান্ত আবশ্যক—

(১) Spectroscope (২) Microscope (অণুবীক্ষণ যন্ত্র) ও (৩) Ultramicroscope (চরম অণুবীক্ষণ বলা যেতে পারে)।

সর্ব্ববর্ণের সংমিশ্রণে শ্বেতবর্ণ। সেজন্য শ্বেত আলোক ত্রিশির কাচখণ্ডের (prism) দ্বারা বিশ্লিষ্ট হলে রামধনুর ন্যায় এক বর্ণচিত্রের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণতঃ আমরা এই চিত্রকে লাল, সবুজ, নীল, প্রভৃতি সাত বর্ণে বিভক্ত করে থাকি। এই রকম আলোক বিশ্লেষণ ও তদনুযায়ী বর্ণচিত্র চক্ষুগোচর করবার যন্ত্র হচ্ছে spectroscope। অতি উত্তপ্ত অবস্থায় প্রত্যেক বিভিন্ন (মৌলিক) পদার্থ থেকে তার নিজস্ব বিভিন্ন বর্ণের আলোক নিঃসৃত হয় এবং spectroscope যন্ত্রের মধ্যে তদনুযায়ী বর্ণরেখা দেখতে পাওয়া যায়। Sodium ধাতুর জন্য হলদে রেখা, potassium থেকে লাল-বেগুনাভ রেখা দেখতে পাই। সুতরাং কোন অজানা পদার্থের পরীক্ষায় যদি হলদে রেখা পাই তা হলে প্রমাণ হ'ল উক্ত পদার্থের মধ্যে sodium বিদ্যমান। অতি যৎসামান্য পরিমাণ পদার্থও এই প্রণালীতে সহজে ধরা পড়ে যায়। এমন কি এক গ্রামের কোটিতম অংশ sodium ধাতুঘটিত পদার্থেরও এই যন্ত্রের কাছে গোপন থাকবার ক্ষমতা থাকে না। রুবিডিয়ম্ ও সিজিয়ম্ ধাতুদ্বয় এই প্রণালীতে আবিষ্কৃত হ'ল। Bunsen ও Kirchhoff জার্ম্মানীর এক উৎসের জল spectroscope সাহায্যে পরীক্ষা করতে গিয়ে কয়েকটি বর্ণরেখা দেখতে পেলেন যা কোন পরিচিত পদার্থের রেখা নয়। নিশ্চয়ই কোন অনাবিষ্কৃত পদার্থ এই জলের মধ্যে আছে—কিন্তু এত স্বল্প অনুপাতে যে মামুলী বিশ্লেষণ-পরীক্ষায় নজরে পড়ে না। অগত্যা বিরাট্ পরিমাণ জল নিয়ে পরীক্ষা করতে হ'ল এবং এতক্ষণে উপরিউক্ত নূতন পদার্থ দু'টির চিহ্ন পাওয়া গেল। প্রায় এক হাজার মণ জল থেকে সিকি আউন্স মাত্র সিজিয়মঘটিত জিনিষ পাওয়া গিয়েছিল।

Microscope বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাজ অন্য রকমের। এটি বৈজ্ঞানিকের তৃতীয় চক্ষু। আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যে বিশাল সূক্ষ্ম-জগৎ বর্ত্তমান—তার জটিল রহস্যের সম্যক্ সমাধান কখনও হবে কি না জানি না—তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র যে এই অন্ধকারময় পথের কিয়দংশ আলোকিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এর অভাবে বৈজ্ঞানিকের অনেক প্রচেষ্টাই অসম্পূর্ণ থেকে যেত—চিকিৎসাশাস্ত্রের ও প্রাণীতত্ত্ববিজ্ঞানের (Biology) অনেক তথ্য অনাবিষ্কৃত থাকৃত এবং জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণুতত্ত্ব বিজ্ঞানের (Bacteriology) জন্মই হ'ত না। অতি সূক্ষ্মায়তনের জন্য যে সব বস্তু আমাদের দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত এই যন্ত্রমধ্যে তাদের আয়তন বহু গুণ বর্দ্ধিত হয়ে দর্শনযোগ্য হয়। এর দ্বারা আমাদের দৃষ্টিশক্তি কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে তা শুনলে আশ্চর্য্যান্বিত হবেন। কল্পনা করুন একটি গোলাকার বস্তু যার ব্যাস এক সেন্টিমিটারের (প্রায় আধ ইঞ্চি) লক্ষতম অংশ। এর বৈজ্ঞানিক নাম micron। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মারফতে আমরা এতটুকু পদার্থ টি দেখ্তে পাই। দৃষ্টিসীমা আরও শত গুণের অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল ultramicroscope নামে এক যন্ত্রের আবিষ্কারে। এটি হ'ল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের চরম। এর সাহায্যে ১০-৭ সেন্টিমিটার ব্যাস আয়তনের পর্য্যন্ত বস্তু—যে বস্তুর ব্যাসের দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটারের কোটিতম অংশ তাও—চক্ষুগোচর হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম আয়তনের নাম submicron। যে সব অণু-পরমাণু (molecules and atoms) নিয়ে জড়পদার্থ গঠিত, যা এতদিন নিছক কল্পনার সামগ্রী ছিল, যার আয়তনের ক্ষুদ্রত্ব ধারণারও অতীত বোধ হ'ত—সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর গণনা, পরিমাণ নির্দ্দেশ করবার দুঃসাহস এখনকার পণ্ডিতদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা হিসাব করে বলছেন একটি অণুর আয়তন ২×১০-৮ সেন্টিমিটার (ব্যাস),—অর্থাৎ এটি এমন একটি গোলাকার বস্তু যার ব্যাসের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির দশ কোটিতম অংশ। একটি পরমাণুর আয়তন আরও ক্ষুদ্রতর—তার ব্যাস অণুর ব্যাসেরও অর্দ্ধেক। এক গ্রাম মাত্র ওজনের জলজান বায়ুর মধ্যে বিদ্যমান অণুর সংখ্যা নির্দ্দেশ হবে তিন-এর পিঠে ২৩টি শূন্য যোগ করে। একটা সূচের আগায় কোটি কোটি অণুর স্থান সংকুলান হবে।

Ultramicroscope এর সাহায্যে মানুষের দৃষ্টিসীমা অণু-পরমাণুর কোঠায় প্রায় এসে পড়েছে। কিরূপ

দ্রুতগতিতে পণ্ডিতেরা minus infinityর আয়তনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং অকিঞ্চিতের সীমানার কত সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন!

আমরা এত অতিসূক্ষ্মের ধারণাও করতে পারি না। অনন্ত বিরাটের উপলব্ধি এবং অসীম সূক্ষ্মের অনুভূতি—দুইই সমান কষ্টসাধ্য। পণ্ডিতেরা কিন্তু অণু-পরমাণুর অতিসূক্ষ্মত্বেও সন্তুষ্ট নন। এত দিন অবিভাজ্য বলে পরিগণিত পরমাণুর মধ্যেও তাঁরা এক বা একাধিক electron ও protonএর সন্ধান পেয়েছেন। সর্ব্বপ্রকার মৌলিক পদার্থের পরমাণুর তুলনায় জলজান বায়ুর পরমাণু লঘুতম। একটা electronএর গুরুত্ব তারও $\frac{১}{১৮০০}$ অষ্টাদশশততম অংশ। পরমাণুকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করবার প্রয়াস এখন চল্‌ছে।

আমাদের atmosphereটা বোধ হয় অত্যধিক লঘু হয়ে উঠেছে। এই rarefied atmosphereএ রেখে আর আপনাদের যন্ত্রণা দেবার ইচ্ছা করি না।*

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

* রিপন কলেজ অধ্যাপক-সঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

আগামী সংখ্যা বিচিত্রায় রিপন কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম-এ লিখিত "নব্য জড়বিজ্ঞান" প্রকাশিত হইবে।

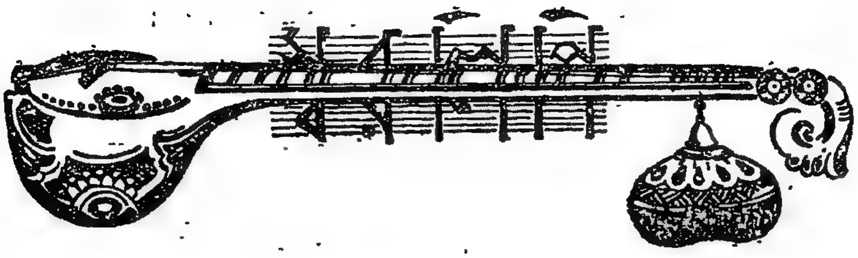

আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরৎ আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প আভায় দিগন্ত ছলোছলো।
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,
দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক, বলো বলো—
সে মোর অগম অন্তর পারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো।

দ্বিধাভরে আজো প্রবেশ করোনি ঘরে
বাহির অঙ্গনে করিলে সুরের খেলা,
জানিনা কি নিয়ে যাবো যে দেশান্তরে
হে অতিথি, আজি শেষ বিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে,
কোন খানে কিছু ইসারা কি তার পেলে
হে পথিক, বলো বলো—
সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
রক্ত আগুনে প্রাণে মোর জ্বলো জ্বলো॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

‖ রা রপা [প]মা । গা রা রা I রা -া -গা । মা -া -গরা I
আ রো কি ছু খ ন্ না ০ ০ হ ০ য়

I রা রপা [প]মা । গা রা -া I রা গা মা । পা পা পা I
ব .সি য়ো পা শে ০ আ রো য দি কি ছু

I [প]ণা ণা -া । মা মা -গরা I রা -া গা । রা -া গা I
ক থা ০ থা কে ০ তা ০ ই ব ০ ০

I রা -মা -া । -া -া -া I [গ]মা মা মা । মা মা মা I
লো ০ ০ ০ ০ ০ শ র ৎ আ কা শ

I গা গা মগা । রা সা সা I সা রা -া । -া -া -া I
হে র স্না ন হ রে আ সে • • • •

I রা -া গা । মা পা -া I পা -ধা পা । মপা -া সা I
বা স্ প আ ভা • মে • দি গ ন্ ত

I সা সা -রা । রা রা -া I রা রগা -মা । গা পমা -গরা II
ছ লো • ছ লো • ছ লো • ছ লো •

II মা পা পা । পনা না -া I না -া -া । -া -পা -না I
জা নি তু মি কি • ছু • • • • •

I না নর্সা র্সা । র্সা র্রা র্সা I না -া -া । র্সা -া -া I
চে য়ে ছি লে দে খি বা • • রে • •

I র্সা নর্রা র্রা । র্সা র্সা -ণা I ণা -া ণা । ণা ণা -ধা I
তা ই তো প্র ভা • তে • এ সে ছি •

I পা -া -ধপা । পমা -া গরা I রা -গমগা -রগা । রা -া -া I
লে • • মো • র দ্বা • • রে • •

I না র্রা র্রা । র্সা র্সণা -ধপা I পা -া -া । -া -া -া I
দি ন্ না কু রা • তে • • • • •

I সা সা সা । রা রা -রা I রা গা -রা । গা মা -া I
দে খি তে পে লে কি তা রে • হে থ •

I পা -া ধা । পা মা -গরা I গা রা -া । -া -া -া I
থি • ক্ ব লো • ব লো • • • •

I মমা মা মা । মা মা মা I মমা মা মা । মা মা মগা I
সে মো র অ ঙ্গ ন অ ন্ ত র পা রা

I রগা রা -া । -া -া -া I -রা রা গা । মা পা পা ।
বা রে • • • • • র ক্ ত ক ম ল্

I পা পা ধা । ধপা মা মগা I রগা রা -া । -া -া -র্সা I
ত র ঙ্গ গে ট লো ম লো ০ ০ ০ ০

I র্সা র্রা র্রা । র্সা র্সণা ণা I ধা পা -ধা । পা মা -গা I
দে খি তে পে লে কি তা রে ০ হে থ ০

I রা -া পা । পা মা -গরা I রগা রসা -া । -া -রা -গা II
থি ০ কৃ ব সো ০ ব লো ০ ০ ০ ০

II ন্া ন্া ন্া । ন্া ন্া -সা I সা -া -া । -া -া -া I
বি ধা ত রে আ ০ লো ০ ০ ০ ০ ০

I সা সা রা । রা রা রা I রা রা -া । -া -া -া I
প্র বে শ ক র নি ব রে ০ ০ ০ ০

I রা গা মা । মা মা -া I রগা -া গা । রা সা -া I
বা হি র অ ঙ্গ ০ নে ০ ক রি লে ০

I সা সা রা । রা -া -া I রা -া -া । -া -া -া I
সু রে র্ খে ০ ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

I মা পা পা । পা পা -া I মপ -া -ণা । -া -া -া I
জা নি না কি নি ০ যে ০ ০ ০ ০ ০

I ধা ধা ণা I ধা ণা ণা I ধা ধর্সা -ণা । ধা পা -া I
শ্যা বো বে দে শা ন্ ত রে ০ হে অ ০

I ধা পা -া । মা মা -গা I রা রা রা । পা মা গরা I
তি থি ০ আ জি ০ শে ষ বি দা য়ে র

I রগা সা -া । -া -া -রা I রা রা রা । রা রা রা I
বে লা ০ ০ ০ ০ ক রি লে সু রে র

I রা রা -া । -া -া -া II
খে লা ০ ০ ০ ০

II মা .পা পা । ^গনা না -া .I না -া -া । না -া র্সা I
প্র থ ম প্র ভা ০ তে ০ ০ স ০ ব্

I র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সর্রা র্সনা I র্সা -া -া । -া -া -া I
কা জ্ ত ব ফে ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা ^র্সর্রা র্রা । র্সা ^র্সণা -া I ণা -া -া । -ধা -পা -া I
যে গ ভী র বা ০ ণী ০ ০ ০ ০ ০

I পা ^পধা ধা । পা মা -গা I রা -া -গমা । রগা .রা -া I
শু নি বা রে কা ০ ছে ০ ০ এ লে ০

I র্সা র্সা -নর্রা । র্সা ণা -ধপা I ধা পা -া । -া -া -া I
কো ন ০ খা নে ০ কি ছু ০ ০ ০ ০

I সা . সা সা । রা রা রা I রা গা -রা । গা মা -পা I
ই সা রা কি তা র্ পে লে ০ হে প ০

I পা -া ধা । পা মা -গরা I ^রগা রা -া । -া -া -মা I
থি ০ ক্ ব লো ০ ব লো ০ ০ ০ ০

I রমা মা মা । মা মা মা I রমা মা মা । মা মা মগা I
সে বা ণী আ প ন গো প ন প্র দী প

I রগা ^গরা -া । -া -া -া । রা -া গা । মা পা পা
জ্বে লে ০ ০ ০ ০ র ০ ছ আ গু নে

I পা পধা ধপা । -া মা মগা I রগা ^গরা -া । -া -া -র্সা
প্রা ণে মো র্ ব জ্র লো জ্ব লে ০ ০ ০ ০

I র্সা ^র্সরা র্রা । র্সা ণা ধপা I পা পা -ধা । পা মা -গা
ই সা রা কি তা র পে লে ০ হে প ০

I রা -া পা । মা মা -গরা I রগা সা -া । -া -রা -গা !
থি ০ ক্ ব লো ০ ব লো ০ ০ ০ ০

রবীন্দ্রনাথের সুর

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

('বর্ষা-মঙ্গল' পালাগান)

'বর্ষা-মঙ্গল' পালাগানগুলি ভাবে, সুরে ও ছন্দে এক একটি অতুলনীয় অর্ঘ্য। এই গানগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বিশেষ দান। গানগুলির অন্তর্নিহিত ভাব-সম্পদ ও সুর-সম্ভারের তুলনা অন্যদেশের সাহিত্যে মিল্‌বে কিনা জানিনে, তবে একথা বোধ করি অসঙ্কোচে বলা চলে যে বাংলা দেশের মতো ছয়টি ঋতু, বিশেষতঃ বর্ষা ঋতু, পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে না ব'লে বর্ষা-কাব্য অন্য দেশের আধুনিক সাহিত্যে এত গভীর ভাবে বিকাশ লাভ করেনি; আর রবীন্দ্র-কাব্যে যে বর্ষার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং সে কাব্য যে বর্ষার অপরূপ লীলায় সমধিক প্রভাবান্বিত তাও কারোর অবিদিত নেই। গানগুলির রস-সম্পদ নিয়ে আলোচনা করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; প্রত্যেকটি গান কি কি ভাব ব্যক্ত করে, কথার ভাবের সঙ্গে সুরের ভাবের কি পরিমাণ মিল রয়েছে এ সকলের বিশ্লেষণই অর্থাৎ শুধু সুরের দিক থেকে গানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার জন্যেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

গানগুলিতে প্রথম-গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবাণ, প্রখর রৌদ্রতাপে ক্লান্ত কপোতের কাতর ধ্বনি ও নিদাঘের বিবরণ; তারপর বর্ষাকে আহ্বান ও তার আগমন প্রতীক্ষা; এও পরে বর্ষার আগমন ও সঙ্গে বৈশাখী ঝড় ও মেঘ, মাঠ ও মেঘের ছোঁওয়া, ঝর ঝর বরিষণ, শ্রাবণের জল ধারা এবং ক্রমে ক্রমে ভরা বর্ষা—একে একে পর এসেছে; সর্ব্বশেষে বৃষ্টির শেষের হাওয়া ও ভাদ্র দিনের স্রোতে ক্লান্ত বর্ষার বিদায়,—এই নিয়ে পালাটি রচিত হ'চ।

প্রথম গান—

দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে।
রজনী নিদ্রাহীন,
দীর্ঘ দগ্ধ-দিন
আরাম নাহি যে জানে।
শুষ্ক কানন শাখে
ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে।
ভয় নাহি, ভয় নাহি।
গগনে রয়েছি চাহি।
জানি ঝঞ্ঝার বেশে
দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে।

সুরের ভাব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই পাই যে সাতটি সুর যা নিয়ে আমাদের সঙ্গীত, এ সব সুর প্রত্যেকটিই এক একটি ভাব ব্যক্ত করে এবং কয়েকটি সুরের মিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সৃষ্টি হয়; আবার এক একটা রাগ-রাগিণী এক একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করে। শ্রীরাগে হাস্যরস, চঞ্চলতার সুর বা করুণ ভাবের আবির্ভাব হয় না; এতে শান্ত গম্ভীর রস ও ভক্তি ভাবের উদ্রেক হয়। খাম্বাজ ঠাটের গানে চঞ্চলতার সুর আসে। জয় জয়ন্তীর মগা মগা জ্ঞা রা সুরের ধ্বনিতে ক্রন্দনের ভাব আসে। এইরূপ নানা সুর-বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন রূপ-রসের সঞ্চার করে।

সারঙ্গ জাতীয় গান গ্রীষ্মকালের প্রখর-রৌদ্র-তাপ-দগ্ধ প্রাণের ও তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ে শীতল জলের অভাবের ভাব প্রকাশ করে। হিন্দু সঙ্গীতে 'বৃন্দাবনী' ও 'মধুমাত্' সারঙ্গ, অর্থাৎ

'গ' ও 'ধ' বর্জ্জিত সারঙ্গ, বা 'বড় হংস' সারঙ্গ মধ্যাহ্নে ভরা রৌদ্রে গান করবার রীতি। 'বর্ষামঙ্গল'-এর প্রথম গানে 'দারুণ অগ্নিবাণে' কবি গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন কালে রৌদ্র তাপে জর্জ্জরিত তরুলতার ও প্রাণীর কাতর প্রাণের বিবরণ লিখেছেন। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা এক পশলা বৃষ্টি পাবার আকাঙ্ক্ষাই করে থাকি; মনে মনে বলি 'ওগো এত নির্দ্দয় হয়ে সৃষ্টি লোপ করে দিওনা; একটু জল দাও, শীতল কর, শান্তি দাও।' যখন সপ্তাহব্যাপী এক-ধারা বৃষ্টি আরম্ভ হয় আমরা আবার বিরক্ত হয়ে উঠি; তখন বলি 'একটু রৌদ্র দাও'; সে সময় প্রাণ চায় রৌদ্র। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে প্রাণ চায় জল; কাজেই অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশের সুরও হয় শীতল জল পাবার সুর।

কবি যে-ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এ কবিতাটি লিখেছিলেন, ঠিক সে সময়ে গভীরতম অন্তরলোকে যে-সুর তিনি পেয়েছিলেন সে-সুরই তিনি এগানে সংযোজন করেছেন। অথচ আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ যাঁরা হিন্দু সঙ্গীতের আলোচনা করে গেছেন তাঁদের কথার হুবহু মিল পেয়ে যাই কবির গানের সুরের ভাবে। তাঁর এগানে 'বড়হংস' ও 'বৃন্দাবনী' সারঙ্গের সুরই পাই। হৃদয়ের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে সুরের ভাবের পরিবর্ত্তন হয় ও প্রত্যেকটি রাগ-রাগিণী যে এক একটা স্বতন্ত্র ভাব ব্যক্ত করে, প্রাচীন ঋষিদের এ সকল কথার অন্তর্নিহিত সত্যকে খুঁজে বের করবার ভাব-ধরে-দেয় কবির সুরের আলোচনা করলে।

হিন্দিতেও এভাবের গান আছে। এখানে একটি গান কথা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করে দেখান গেল।

দহন লাগো চৌড় কিরণ
ভ্রমত ফিরত পাথিকগণ
তরু বিটপ লতা কি ছায়
গজ মৃগ হাস করত আস।
জলত পবন জৈসো দহন
কোটর গত রহে খগগণ
অগ্নি সখি অব কর জতন
চক্র পিয়া নাহি পাস।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—চৌতাল, বিলম্বিত গতি

স্থায়ী—

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
[ঋন্‌সা ঋা। মা মবা। া সা]
ন্‌সা ঋা। মা মঋা। া সা। সন্‌া সা। সা ঋা। ঋা সা I
দ হ ন লা ০ গো চৌ ০ ড় কি র ণ

সন্‌া সন্‌া। সন্‌া সা। সা সা। মঋা া। ঋমা সা। ঋা সা I
ভ্র ম ত ফি র ত পা ০ থি ক গ ন

সা সা। ণধা ণধা। ধণা পা। মা া। পা র্সণা। র্সা র্সা I
ত রু বি ট প ল তা ০ কি ছা ০ য়

পর্সা র্সা। পণা পা। মা ঋা। ঋন্‌ সাঋা। পা মঋা। সা II
গ জ মৃ গ হা স ক র ত আ ০ স

অন্তরা—

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
পমা মা। মা পা। র্সনা না। র্সা া। না র্সা। র্সা র্সা I
জ ল ত প ব ন জৈ ০ সো দ হ ন

র্সনা র্সা। র্ঋা র্মা। র্ঋা র্সা। র্ঋা র্সা। র্সর্ঋ র্সা। পণা পা I
কো ০ ট র গ ত র হে খ গ গ ণ

পা পমা। মঋা মা। পা পা। র্সনা র্সনা। র্সা না। র্সা র্সা I
অ গ্নি স খি অ ব ক র জ ত ন

পর্সা া। পণা পমা। মঋা া। মঋা মা। পমা মঋা। া সা II
চ ০ ক্র পি য়া ০ না ০ হি পা ০ স
(১)

এ গানটিতেও গ্রীষ্মের বর্ণনা এবং সুরও শীতল জল পাবার সুর অর্থাৎ 'বৃন্দাবনী সারঙ্গ'। 'দারুণ অগ্নিবাণে এবং উপরোদ্ধৃত হিন্দিগান এ দুটিই মূলতঃ একই বিষয় নিে লেখা ও সুর করা। ভাবটুকু একই কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গ প্রত্যেকের পৃথক, কারণ তা রচয়িতাদের নিজস্ব ধারা বিভিন্নতা।

গ্রীষ্মে বৃষ্টির জল পাবার সুর কি ভাবে 'বৃন্দাবনী'

(১) বোম্বাই নিবাসী শ্রীযুক্ত ভাতচন্দ্র সুখ্‌তেন্‌কর কর্তৃক প্রকাশি 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি—ক্রমিক পুস্তক মালিকা' নামক মারহাটি থেকে এই গানটি এখানে উদ্ধৃত হল।

'বড় হংস' সারঙ্গের সুর-মালিকায় প্রকাশ পায় তা দেখাতে গিয়ে নিম্নের তালিকাটির সাহায্য নেবার দরকার হবে।

সুর	তত্ত্বের নাম	ভাব	বর্ণ
সা	পৃথিবী	সকল	রক্ত
রে	বারি (রস)	করুণ	কমলা (গোলাপী)
গা	অগ্নি (রূপ)	শান্ত	পীত
মা	বায়ু (স্পর্শ)	ভয়	সবুজ
পা	আকাশ (শব্দ)	বীর	নীল
ধা		করুণ	অতি নীল (কাল)
নি		রৌদ্র ও বীর	বেগুনী

(২)

এ তালিকাটি দিয়ে আমরা সুন্দর রূপে সুরের ভাবের যাচাই করতে পারি। 'দারুণ অগ্নিবাণে' বা 'দহন লাগ্যো' এ দুটি গানেই 'গা' সুর ব্যবহৃত হয়নি। 'গা' সুর অগ্নিরূপ ও শান্তভাব প্রকাশ করে। কাজেই এখানে 'গা' সুরের অনুপস্থিতিতে অগ্নি ও শান্ত ভাবের অভাব সূচিত হচ্ছে। দুটি গানেই 'গা' সুরকে বাদ দিয়ে 'ম রা' 'প ম রা' ও 'সা' এই সুর কয়টির প্রাধান্য। অগ্নিদগ্ধ প্রাণ আর অগ্নিসুর ব্যবহার করতে মোটেই রাজি নয়, এখন মনের বীণায় শীতল জল পাবার সুর বেজে উঠেছে, মন-প্রাণ এখন ঐ আশায় উতলা; কাজেই শান্ত ভাবের অভাব। এবং এ জন্যেই 'গা' সুর ব্যবহৃত হয়নি।

'র মা' 'প ম রা' ও 'সা' সুরের বহুল ব্যবহার হলেও তাতে 'র' সুরই প্রধান বা 'জান্' সুর। 'র' হ'ল করুণ ও বারির প্রতীক। 'র মা' 'প ম রা' 'সা' বলতে আমরা বুঝব আকাশে, বাতাসে, পৃথিবীতে একটা করুণ ও অশান্ত-অস্বস্তির ভাব আর জলের জন্য প্রাণের আক্ষেপ। যেমন—

মা । রা রা । সা । সরা । । ন্া সা রা সা ।
দা • রু ণ অ গ্ নি • বা • ণে •

সপা । । । ।
রে • • •

উপরোক্ত হিন্দি গানটির ও 'দারুণ অগ্নিবাণে'র ভাব সম-শ্রেণীর হলেও ঠিক এক নয়। হিন্দি গানটির সুর গ্রীষ্মের প্রথম ভাগের ভাব ব্যক্ত করছে; আর কবির গানটি গ্রীষ্মের শেষ সময়কার ভাবে ভরপুর—এ গানের পরই বর্ষা দেখা দিবে। হিন্দি গানটির সুর 'বৃন্দাবনী', এতে 'ধ' সুরেরও ব্যবহার হয়নি। কিন্তু কবির গানটিতে 'বড়হংস' সারঙ্গের সুর-বিন্যাস হওয়াতে 'ধ' সুরও ব্যবহৃত হয়েছে। 'ধ' সুর করুণ, তাই 'বড়হংস' সারঙ্গ সুরে করুণ ভাবের আধিক্য। 'বৃন্দাবনী' তত করুণ নয়। গ্রীষ্মের শেষে অস্থির মনের ছাপ 'বড়হংস' সারঙ্গের সুরে বিশেষ ভাবে ফুটে উঠে। কবির সুরেও তাই হয়েছে।

'দারুণ অগ্নিবাণে' গানের সঞ্চারীতে 'ভয় নাহি, ভয় নাহি। গগনে রয়েছি চাহি।' এই অংশটির ভাব করুণ নয়; কবির সুরে এখানে বীর রস বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা সুরের ভাবে পাই বীর ভাব-ব্যঞ্জক 'পা' ও 'নি' সুর, যেমন—

সা । সা । । ন্া । প্া ন্া । সা । রা । ।
ভ য় না • হি • ভ য় না • হি •

পা । মা । । রা । সা । । । । । । ।
• • ভ য় না • হি • • • • •

মা পা পা । । । । । । । পপা ধা ধপা । ।
গ গ নে • • • • • র য়ে ছি •

পা । । ধা । পমা পমা পা । । । । । । ।
• • • • চা • হি • • • • •

পর্রা সর্রা সা পা । পাঃ মা রা । । সা । ন্া । ।
চা • • • হি • ভ য় না • হি •

(২) তালিকাটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'রাগ-রাগিণীর ভাব' নামক প্রবন্ধে করা হয়েছে।

প্‌ । ন্‌ । সা । । রা । পা । । । । মা । ।
ভ য়্‌ না • হি • • • • • • ভ য়্‌

রা । সা । । । । । । ।
না • হি • • • • • •

এখানে 'পা' সুরের প্রাধান্ত বীর রস ব্যক্ত করে ও 'নি' সুর তাতে ফোড়ন দেয়; আর 'সা' সুর সকল ভাবই প্রকাশ করে বলে এই অংশটি বীর ভাবেরই উদ্রেক করে। কবি এরূপ অশান্ত ভাবের রাগ নিয়েও বীর রস ফুটিয়ে তুলেছেন অভাবনীয় রূপে। কবির গানের সঙ্গে অন্য গানের এইখানেই প্রভেদ। এই 'ভয় নাহি'র সুরে যদি অন্যভাবে 'মা' ও 'রে' সুরের প্রাধান্ত বজায় রেখে রচিত হয়, তবে অনুরূপ ভাব থাকবে না।

আকাশ থেকে এই যে দৈববাণী হল 'ভয় নাহি' তার সুর গুরু গম্ভীর ও বীর রস যুক্ত হওয়াই কি উপযুক্ত হয়নি? পরে 'জানি বন্ধার বেশে' বলে অতিষ্ঠ প্রাণ তা' স্বীকার করে নিলেও মনে তখনো তিক্তরসের সুর বজায় থাকাতে সুরও পূর্ববৎই আছে।

২

দ্বিতীয় গান—

এস এস, হে তৃষার জল,
ভেদ কর কঠিনের ক্রুর বক্ষতল
কলকল, ছলছল;—

কলকল ছলছল রবে তৃষ্ণার জলকে এই ধরাতলে আসতে আহ্বান করা হচ্ছে এ গানে। গানের সুরে আমরা পাই 'ইমন্‌-ভূপালী'র সুর-বিন্যাস। 'ইমন্‌-ভূপালী'তে 'গা' বাদী সুর অর্থাৎ প্রধান সুর, এর প্রাধান্ত না দিলে এ স্বর-বিন্যাস সুন্দর করা সম্ভবপর হয়না; যেন 'গা' ই এ গীতের প্রাণ।

সা রা] [রগা রা রপা পক্ষা । গা । । । I রগা । গা রা ।
এ স এ • স • হে • • • তৃ ষা র

রসা ধ্‌ । স্‌া রা I গা রা রপা পক্ষা । গা । । । ।
জ ল এ স এ • স • হে • • •

গা র্সা । । । র্সা । র্সা র্সা I র্সা । র্সা না ।
হে • • • ভে দ ক র ক ঠি নে র

নধা র্সা র্সনা । I । । না ধা । ধা । ধা ক্ষা I
এ • স • • • ক ল ক ল ছ ল

ধপা । মা গা । রা গা গপা পমা I গা । । । ।
ছ ল এ স এ • স • হে • • •

। । । । I সগা । গা গা । গা গা গা গা I
• • • • ভে দ ক রি ক ঠি নে র

গা । গা রা । রসা । সা রা I গা । গা রা ।
ক্রু র ব ক্ষ ত ল ক ল ক ল ছ ল

সা ধ্‌ । সা রা II
ছ ল "এ স"

এ গানের সুরের বিশেষত্ব হ'ল গা, রা, সধা, সা, রপা, ক্ষা, গা । । এ কয়টি সুরের মিলনে। 'গা' সুরকে আমরা শান্ত সুর বলি। গানটিতে এই সুরের প্রাধান্ত থাকাতে এটি শান্ত রসাত্মক গীত। তবে মধ্যে মধ্যে করুণ রস এসে পড়ে, যেমন— সা ধ্‌ ।; 'ধা' করুণ-ভাব ব্যক্ত করে। মনে প্রাণে ডাকা আশান্তভাবে বা করুণভাবেও সম্ভবপর। প্রথম গানটিতে বিরক্তির ও অস্বস্তির ভাব প্রকাশ ক'রে দ্বিতীয় গানে শান্তভাবে বর্ষাকে অহ্বান করা অতি মনোরম সুর সৃষ্টি হয়েছে। সে মৌনী তাপস বৈশাখের রুদ্রমূর্ত্তি আর নেই, এখন আর গ্রীষ্মের রৌদ্রতাপের তত জ্বালা নেই। যদিও এখন পর্য্যন্ত তৃষ্ণার জলের শুভাগমন হয়নি তবুও বাতাস উতলা হয়ে উঠাতে এবং এই অশান্ত বায়ু বর্ষার আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দেওয়াতে মন অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করেছে।

হাঁকিছে অশান্ত বায়
"আয়, আয়, আয়" সে তোমায় খুঁজে যায়।

কাজেই এখানে অশান্ত ও করুণ ভাবের সুর হয়ত ততটা সুন্দর হতো না।

উক্ত সুর-বিন্যাসে 'এস এস, হে তৃষ্ণার জল'এ দুবার ভিন্ন ভিন্ন সুরের বিন্যাস করা হয়েছে। দ্বিতীয় বারের—

গা র্সা । । | র্সা । র্সা র্সা | র্সা । র্সা র্সা
হে • • • তৃ ষ্ ণা র জ ল্ এ স্

সুরের গা র্সা মিড়ে ও চড়া সুরের বিন্যাসে এ কথাই মনে হয় যে অন্তরের সুর যেন ঊর্দ্ধ পথে চেয়ে ডাকছে—শিব যেমন গঙ্গাকে এনেছিলেন ঊর্দ্ধদিকে চেয়ে। আর এ তৃষ্ণার জলও যেন এ ডাকে চঞ্চল হয়ে ঊর্দ্ধলোক হ'তে আকাশ (পা) পথ বেয়ে নেমে আসবে এই ধরাতলকে শান্ত ও শীতল করে তুলতে।

ডাকা শান্তভাবে হলেও গানের গতি একটু চঞ্চল। এখানে এগানে যদি চৌতালের গতি বা ঢিমাতেতালার গতির ছন্দ সংযোজন করা হতো তবে আর কলকল ছলছল ছন্দের সমাবেশ হতো না।

শেষের দিকের একটি অংশে কবি পাশ্চাত্য গীতের ভঙ্গীতে সুর রচনা করেছেন, যেমন—

সা ঋা গা হ্মা | পা ধা না । | নর্সা । । ।
তো মা রে ক রে ছে ব ন্ধু ণী • • •
। । । । |
• • • •

কিন্তু এতে শ্রুতিকটু হওয়া দূরের কথা বরং মাধুর্য্যেরই সৃষ্টি হয়েছে।

৩

তৃতীয় গান—

ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্ত কেশে
আঁচলখানি দোলে।

বর্ষার প্রথম ধারা এবার এসে পড়েছে, দূরে ছায়াময় মাঠের উপর বৃষ্টি ঝরছে আর ঐ সুরে কবির দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে। সে বারিপাত এখনো নিকটে এসে পৌছায়নি, দূরে দেখা দিয়াছে মাত্র। এই বর্ষণে প্রকৃতির ক্রন্দন প্রকাশ হওয়াতে কবির হৃদয়েও বাদল দেখা দিয়েছে এবং মনের সুর ক্রন্দনের পূর্ব্বকালের আভাসে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। গানটির শেষেও কবি সে ব্যথার ইঙ্গিত দিয়েছেন—

একলা দিনের বুকের ভিতর
ব্যথার তুফান তোলে।

মনের আকাশে এখন পর্য্যন্ত ব্যথার তুফানই উঠেছে মাত্র, এখনো বর্ষণ দেখা দেয়নি। এই জন্য গানটির সুর করুণ ও সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলতায় পরিপূর্ণ।

মল্লার জাতীয় গীতে বর্ষার ভাব আসে। হিন্দু সঙ্গীতে শাস্ত্রকারগণ বলেছেন যে একদিকে চঞ্চলতা ও অন্যদিকে করুণ ভাবের সুরই অর্থাৎ মল্লার জাতীয় গীতই বর্ষাকালের উপযোগী। এ গানটির সুর ও মল্লার জাতীয় হওয়ায় হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। কবি তাঁর ভাবে অভিভূত হয়ে যে-সুরের পরিবেষণ করেছেন তাতে বর্ষার ভাবই এসে পড়েছে। এ পালাগানের এই গানটি থেকেই বর্ষা আরম্ভ হয়েছে।

খাম্বাজ ঠাটের অর্থাৎ 'নি'—কোমল ঠাটের গানে চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। এ গানটি ঐ ঠাটেরই অন্তর্গত। রা মা; রা মা, পা পা ধা পা, মা গরা এ কয়টি সুরের এরূপ বিন্যাসই এ গানের প্রাণ। 'র' ও 'ম'-এর মীড় ও এগানে একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করে। এ দুটি সুরে আমরা পাই বারি ও বায়ু। জল ও বাতাসের আকুল কল্লোল হৃদয়ে ও সুরে প্রকাশ পেয়েছে অতি সুন্দর ভাবে।

সঞ্চারীর সুরও গতানুগতিক ভাবে সংযোজিত হয়নি।

৪

চতুর্থ গান—

হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর
বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে
উদ্দাম উল্লাসে।

এই গানটির সুরে আমরা পাই বাউল সুরের প্রাধান্য। ফকির চাঁদের বাউল সুরের সাহায্যে গানটির সুর রচনা করা হয়েছে; কিন্তু এটা অনুকরণ নয়। নিজস্ব ধারায়

সুরটির সৃষ্টি হওয়াতে গানটির সৌন্দর্য্য বেশী মনোরম হয়েছে বলেই মনে হয়।

না র্সা না II নধনা র্সনা ধনা। নপা া া I
স্ব প্ন র আ • • মা • য়্

পনা া া । সা া না। ধা র্সা র্সনা। ধা -পা -া -I
ঐ • • ঐ • • ঐ • বু ঝি তো র্

পপা া া । র্সা া না I ধপা া া । ধা ধপা া I
বৈ • • শা • খী ঝ • ড়্ আ সে •

মা া া। পা া া I গা মা পা । ধা না র্সা I
আ • • সে • • আ • • • • •

ধনা া া। না র্সা না I নধনা র্সনা ধনা।
সে • • স্ব প্ন র আ • •

নপা া া II
মা • র্

সুর রচনায় 'ঐ' বা 'আসে' এ দুটি কথা দুবার বেশী ব্যবহার করাতে সুরেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অথচ বাউলে সাধারণতঃ সুরের প্রাধান্য দেওয়া হয়না, সুর নাম মাত্র। কিন্তু এখানে সাধারণের বাউল বনেদী চালে আর এক নতুনরূপ ধারণ করেছে, আর এতে আমরা নতুন রসেরই স্বাদ পেয়েছি।

কবি এ গানের কথায় কি ভাব প্রকাশ করেছেন? তাঁর মনের উল্লাস না ভয়? গানের সুরে উভয় ভাবই যুগপৎ আসে। প্রথম মনে গোপন আনন্দের আভাস পাই; পরের

'বুঝি এল তোমার সাধন-ধন
চরম সর্ব্বনাশে'

সুরে একটু ভয়ের চিহ্ন আছে, কিন্তু তার মাত্রা খুবই কম। এত সাধ্য সাধনার পর একটু জোর হাওয়া আসাতে পিপাসায় কাতর প্রাণ অনেকটা শীতল হয়েছে এবং একটু আনন্দের রেখাপাত হয়েছে প্রাণের নিভৃত কোণে। কাজেই এখানে সুরে আনন্দের ভাব উপযুক্ত। সুরটি যেন কাল-বৈশাখী সম্বন্ধে দুজনের আলাপ আলোচনা। শান্ত সহজ ভাবে আলাপ আরম্ভ; তারপর একটু আনন্দ একটু ভয়, একটু আতঙ্ক—এরূপ নানাবিধ ক্ষণিক-আসা-যাওয়া ভাবের সমাবেশে দুজনের বলাবলি করার সুর এ গানের সুরের ভাব।

যা হোক্ গানটির বিশেষত্ব বাউলের সুরে সুর রচনায়। বাউলের সুর না হ'লে আলাপ আলোচনা সুরু হতো কিনা তাও দেখা দরকার। পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের হিন্দু সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীগুলি এক একটা বিশেষ ভাব ব্যক্ত করে, দশটা রাগের মিশ্রণ হল দশটা ভাবের মিশ্রণ। কিন্তু বাউলের রাগ-রাগিণীর কাঠামো পাওয়া মুস্কিল। আর এ জন্যই তত্ত্বকথায় আলাপ-আলোচনার উপযুক্ত সুরই বাউল।

শ্রীমণিলাল সেন শর্ম্মা

ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু এম্-এ

১

ভীম—গ্রাম্য কথায় ভীমা—স্বগ্রামের কৈবর্ত্তদের সর্দ্দার ছিল। তার ছিল দীর্ঘ আকৃতি, শ্যাম বর্ণ, তীক্ষ্ণ নাসিকা এবং তার চাইতেও তীক্ষ্ণতর দুটি চক্ষু। শরীর স্থূল ছিল না, তবে প্রত্যেকটা অঙ্গ ছিল যেন লোহার গড়া। একখানা গাঁট-ওয়ালা পাকা বাঁশের লাঠি (তার মাথাটা পেতল দিয়ে মোড়া), সে সর্ব্বদা সঙ্গে নিয়ে চলত। তার গলার আওয়াজ এক মাইল দূর হ'তে শোনা যেত। গ্রামের ছেলেরা তা' শুনে আঁৎকে উঠ্‌ত; তার স্বজাতীয়েরা সে কণ্ঠধ্বনিকে বিশেষ রকম সমীহ করে চলত। তার এক কথায় সকলে উঠ্‌ত, বসত, প্রাণ দিতে নিতে প্রস্তুত হ'ত।

আমার অনেক সময়ে মনে হয়েছে, বাংলা দেশে যদি বাস্তবিকই ব্রাত্যক্ষত্রিয় কোনো জাত থেকে থাকে তবে তারা এই কৈবর্ত্তেরা। তাদের সমস্ত জীবন সংগ্রামময়। গাঁয়ে যত বড় বড় লাঠালাঠি হয়, তার মধ্যে তারা সর্ব্বদাই অগ্রগামী। তাদের ব্যবসাও সংগ্রাম-মূলক। তাদের দৈনন্দিন জীবনে কত রকম বিপদকে বরণ করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। রাতভর নদীতীরে শ্মশানে মশানে ঘুরে, কতবার মাছ তুলতে সাপ তুলে। এদের গৃহ মুক্ত নদীতীরে, বছরে বছরে সেখানে ঝড় ঝঞ্ঝা মাথায় বইতে হয়।

আর এদের নামগুলি কেমন ক্ষত্রিয়োচিত। ভীম, শঙ্কর, ভৈরব,—কখনও রমণী মোহন, গোপি-রমণ নয়। এখনো বাংলার নব বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব এদের উপর পড়েনি।

তাদের নারীরা মোটেই বৃন্দাবনের গোপীর মত নয়। দৃঢ়, বলিষ্ঠ তাদের চেহারা, আর তাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কর্ম্মময়। তারা যখন উদূখলের উপর মুষল দিয়ে ধান ভানতে থাকে, তখন আধ মাইল দূর থেকে তার দাপট শুনে লোকে বলে উঠে, "কৈবর্ত্ত পাড়া!"

ভীম সর্দ্দার এ জাতের একজন ছোটখাটো রাজা বা প্রেসিডেণ্ট ছিল। নিজ সমাজের সব রকম ক্ষুদ্র, এবং অনেক সময় গুরুতর ঝগড়া বিবাদ তার কাছে মীমাংসার জন্যে আসত। বিচারে তার বুদ্ধির ভুল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা'তে পক্ষপাতিত্ব দেখা গেছে এমন কথা তার অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না।

তার সর্দ্দারির শ্রেষ্ঠ সুযোগ মিলত দুই সময়ে। প্রথমত শীতের দিনে, যখন সমস্ত কৈবর্ত্তের দল নদী বিলে বাঁধ দিয়ে মাছ ধরতে যেত। তখন মাস দুয়েক তারা বিলের পাড়ে ছাউনি করে থাকত। ঠিক যেন লড়াইয়ের সেনা। ভীমা তখন প্রতি বিষয়ে তাদের নায়ক ও শাসক হ'ত। তার লাঠিখানা হাতে নিয়ে, বীর দর্পে, গভীর হুঙ্কারে, দুশ আড়াই-শ কৈবর্ত্তকে চালাত। সে-ই জমিদারের নায়েবের কাছ থেকে নদী বিল বন্দোবস্ত করে আনত, আর সহরের ব্যাপারীদের সঙ্গে মাছ চালানের ব্যবস্থা করত। কখন কখন দালালের সঙ্গে মতের মিল না হ'লে ভীমা নিজে ষ্টেশনে গিয়ে মাল গাড়ীতে করে মাছ চালান দিয়েছে। ষ্টেশনের বাবুদের সঙ্গে কি ভাবে কি বন্দোবস্ত করতে হয় তা' তার কিছুই অজানা ছিল না। পনর মাইল পর্য্যন্ত নদীর সমস্ত নেয়ে প্রতি বাজারের দোকানদার, আর মাঠের রাখাল সকলেই এক ডাকে ভীম সর্দ্দারকে চিনত। গাঁয়েও অবশ্য এমন লোক ছিল না যে তাকে না জানত।

ভীমার ক্ষাত্র তেজের পরিচয় পাওয়া যেত যখন তার জাতের সঙ্গে বড় রকমের ঝগড়া বাধত। সেবার বাজারে মাছ নিয়ে এক কৈবর্ত্তের সঙ্গে অপর ধর্ম্মীয় এক ব্যক্তির ঝগড়া হয়। সে লোকটী স্বধর্ম্মীয় বহু লোকসহ দল বেঁধে আসে;

তা'তে ব্যক্তিগত ঝগড়া সাম্প্রদায়িক কলহে পরিণত হয়। পরের সপ্তাহ ধরে দুই পক্ষে তুমুল আন্দোলন চলে, তার পর 'সাজ সাজ' ডাক পড়ে যায়। পরের বাজারের পূর্ব্ব-কালে দেখা গেল পণ্যদ্রব্যের আমদানি অতি কম,—চার দিক হ'তে লোকে বড় বড় তেল মাখা লাঠি নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। এক পক্ষে সমস্ত স্বধর্ম্মীরা এক জোট, অপর পক্ষে শুধু স্বজাতীয়েরা অগ্রসর, অপর স্বধর্ম্মীরা শুধু ঘন ঘন খবর নেয়, তামাসা দেখবার জন্যে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দলে বলে ভীমা সর্দ্দার "মার মার" রবে বিপক্ষের উপর লাফিয়ে পড়ল। তার পর কি তুমুল যুদ্ধ! ভীমার বজ্র হুঙ্কার দলের প্রত্যেক লোকের প্রাণে অসম সাহসের উদ্রেক করল। সন্ধ্যার পর সে সগৌরবে সদলে বাড়ী ফিরে এল।

২

ভীমা যেন একটী ব্যক্তি নয়, যেন তার সমস্ত জাতের সংহত শক্তি। কোনো কৈবর্ত্তের বিরুদ্ধে কেহ অভিযোগ করলে তার জন্যে প্রথমতঃ দায়ী হ'ত ভীমা সর্দ্দার। জমিদারের কাছারীতে এসে বলত "কর্ত্তা আমাকে বলুন।" দোষ প্রমাণ হলে সে নিজে গিয়ে দোষীর সাজা দিত। অনেক সময় অভিযোগ ছাড়াও, স্বজাতীয় কারো ত্রুটি হয়েছে জানলে, ভীমা করজোড়ে এসে বলত, "কর্ত্তা মাফ করুন। ইচ্ছে হয় আমার পিঠে পাঁচ ঘা দিন।"

উচ্চবর্ণীয় লোকদের প্রতি ভীমার বিনয় দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। হরিহর ভটচাজ পুজারী বামুন মাত্র, অথচ ভীমা,—একটা সমস্ত জাতের নেতা ভীম-সর্দ্দার— তার সামনে গড় হয়ে প্রণাম করত। বলত, "ঠাকুর আপনাদের চরণ ধুলোর জোরে বেঁচে আছি।" একদিন আগে, বাজারে, যে চোখ থেকে আগুনের ফুলকি বেরিয়েছে, তা' তখন স্নিগ্ধ, মৃদু!

হরিহর যখন সেবার কাশী চললেন, তখন ভীমাকে ডেকে বললেন, "দেখ, বিলের পাড়ে আমার যা' জমিজারাত তা' সব তোমায় দেখতে হ'বে। আর বাড়ীতে রইলেন শুধু আমার বুড়ো খুড়ীমা, বাড়ী রক্ষার ভারও তোমার উপর।" ভীম সর্দ্দার বললে, "ঠাকুর্দা, এ ধড়ে প্রাণ থাকতে আপনার জমির বা বাড়ীর একটা তৃণও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।" তারপর হরিহরের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত ছ'মাস কাল ভীমা সে বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। তার নিজের ক্ষেতে গরু ঢুকলে অনেক সময় সয়ে নিত, কিন্তু ঠাকুরের জমিতে গরু ঢুকল কি অমনি খোঁয়াড়ে! আর দিনে অন্তত একবার ভীমা কিংবা তার লোক পেতলে বাঁধানো মোটা মোটা গাঁটওয়ালা লাঠি হাতে করে এসে ঠাকুরের বাড়ীটা ঘুরে যেত বলত, "ঠাকরান, প্রণাম হই, আজকে শরীরটা কেমন আছে?"

একদিন রাত্রে সে বাড়ীর কাঁটাল চুরি গিয়েছিল। সে খবরে ভীমা চারিদিকে চর পাঠাল। এবং পরদিন দেখা গেল দুপুরের পূর্ব্বেই ভীমার লোকেরা চোর এবং কাঁটাল উভয়ই তার সম্মুখে এনে হাজির করেছে।

৩

মানুষের জীবনে চিরকাল সমান যায় না। ভীমার জীবনেও পরিবর্ত্তন এল।

সেবার অকাল বর্ষাতে তার ক্ষেত-পাথর সব ধুয়ে গেল। যা' জলে ডুবোতে পারল না, তার উপর ভাসমান কচুরি পানার বন চেপে বসে সব নষ্ট করে দিতে লাগল।

আমি ভীমাকে ঐ কচুরীর সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করতে দেখেছি। উপর হ'তে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, ওদিকে নদী থেকে শত্রু সেনার মত কচুরী পানার শ্রেণী ভেসে আসছে মোটা খাড়া ডগার উপর গাঢ় সবুজ পাতা, আর তা উপর দিয়ে থোপে থোপে উজ্জ্বল নীল ফুল ফুটে আছে ভীমা দলে বলে বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়ে পানার বনকে ঠেলে দিচ্ছে, সেগুলি পাট ক্ষেতের পাশ দিয়ে পালবাঁ নৌকার মত ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু যেই ভীমা লোকজন তীরে উঠল অমনি প্রকাণ্ড একটা কচুরীর বন এসে প গাছের ঘাড়ে চেপে বসল। সে দাঁত খিঁচিয়ে আবার সদ জলে নামল।

কয়েকদিন ধরে ভীমা এ ভাবে দিনরাত সংগ্রাম করত জিজ্ঞাসা করলে আর্দ্রমুখে, কাষ্ঠহাসি হেসে বলত, "কর্ত্ত জার্ম্মেনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছি।" লড়াইয়ের সময়ে ও দে

কচুরী পানার নামই হয়ে গিয়েছিল, 'জার্মেনী'। জার্মেনীকে রোধ করতে বিপক্ষ সৈন্যদের যে এর চাইতে বেশী ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছিল, তা' আমার মনে হয় না।

কিছুদিন পরে এক বৃষ্টিহীন প্রভাতে আমি নদীতীরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রথম দৃষ্টিতে মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। প্রায় আধ মাইল স্থান জুড়ে গুচ্ছে গুচ্ছে নীল ফুল সবুজ পাতার উপর দিয়ে ফুটে আছে, প্রভাতের মৃদু বাতাস এক একবার তাদের উপর ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হ'ল ঐ জায়গায়ই কয়েকদিন পূর্ব্বে ভীমা তার লোকজন সহ 'জার্মেনী'র সঙ্গে লড়াই কর্চ্ছিল। পাট ক্ষেত ধ্বংস করে তার উপর আজ ঐ মনোরম কুসুমাস্তরণ রচিত হয়েছে।

ভীমা বলত, "কর্ত্তা, দেবতা যদি বিরুদ্ধে গেল, তবে আর কি করা যায়?"

বর্ষান্তে মড়কে ভীমার গোষ্ঠীর অনেক লোক মারা গেল। ভীমা অতি তিক্তভাবে, একটা গালি মুখে নিয়ে বলত, "কর্ত্তা, দেবতার কাণ্ডটা দেখেছেন? তার কোপ কোনো মতেই শান্ত হ'বে না।"

সেবার শীতে মাছ অনেকই ধরা পড়ল, কিন্তু বাজার মন্দা, তা' সিকি মূল্যেও বিকাল না। মহাজনের টাকা সবই রইল, দ্রুতবেগে তার সুদ বেড়ে চলল।

ভীমা গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবে পড়ল।

৪

ব্রাহ্মণের মন যখন নৈরাশ্যে ভরে যায় তখন সে দিবারাত্র রামেশ্বরের ধ্যান অর্চ্চনা দ্বারা নিজকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ বিগ্রহের পূর্ব্বে দেবার্চ্চনা করে, কিন্তু নৈরাশ্যের সময়ে সে নিজেকে ভুলতে চায়—মৃগয়া, দিবা ও রামার সাহায্যে। বৈশ্যের পক্ষে মৃগয়া অসম্ভব, দিরা ব্যয়সাপেক্ষ; তারপর ঈশ্বরকে একেবারে ছেড়ে দিলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হ'তে পারে;—সে তার মনের শান্তির জন্য এমন এক উপাস্য দেবতা গ্রহণ করেছে, যা'তে ঈশ্বর সম্পর্কিত ভক্তিরস আছে, আবার রামা সম্পর্কিত আদি রসও আছে; এবং দরকার মত আদিরসটাকেও ভক্তিরস বলে চালিয়ে দিতে পারে, আবার ভক্তি রসটাকেও নিছক আদিরস বলে উপভোগ করতে পারে। শূদ্র উক্ত তিন পন্থার কোনোটাই অবলম্বন করতে পারেনি, তাই সে দুর্দ্দিনে আশ্রয়হীন, কাতর।

আমাদের ভীম যদি শূদ্র হ'ত তবে সেও কাতরতা অবলম্বন করত; বৈশ্য হ'লে আদি-রসাত্মক পদাবলী কীর্ত্তন করত ও শুনত; ব্রাহ্মণ হ'লে বেদমন্ত্রে আকাশ মুখরিত করত। কিন্তু সে সব করেনি, ক্ষত্রিয়ের পন্থা ধরেছে।

অবশ্য মৃগয়া এক ভাবে তার জাত ব্যবসায়। ক্ষত্রিয়েরা বনে শিকার করত, কৈবর্ত্তেরা জলে শিকার করে। এখন সে ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়ের অপর দুটি ব্যসনে আকৃষ্ট হ'তে লাগল। প্রথম ধরল মদিরা। গ্রামে তার কারবার নেই। মুসলমানরা মদ্যপান করেনা, হিন্দু নেশাখোরেরা গাঁজা এবং আফিঙেতেই সন্তুষ্ট। ভীমা সবডিভিসনের শহরে গিয়ে ধেনো মদ কিনে পান করতে লাগল,—যা' সাধারণতঃ হিন্দুস্থানীদের জন্যে তৈরী হয়। তা'ছাড়া কখন কখন ছয় সাত ক্রোশ পূবে গিয়ে তিপ্রাদের পাহাড়ী মদ খেয়ে আসত।

ভীমা তৃতীয় প্রকার ব্যসনের কবলে পড়ল নেহাৎই ঘটনা চক্রে। সেবার দেশে সকলেরই দুর্দ্দিন ছিল, সুদিন এসেছিল শুধু রাধিকা সাহার। পাশের সহরে তার কাপড়ের গদী আছে, সেবার সে সাবেকী মাল বেচে অসম্ভব রকম লাভবান হয়েছিল। তার ফলে তার বাড়ীর পুরাণো দোলমঞ্চটা নূতন করে বাঁধানো হ'ল, এবং খুব সমারোহের সহিত দোলযাত্রার উৎসব চলল।

সে উৎসবের প্রধান অঙ্গ বাইনাচ। জেলার শহর হ'তে নাচওয়ালী এল। এক চৈত্রের সন্ধ্যায় রাধিকার ঠাকুর বাড়ীর সামনের নাটমন্দিরে মস্ত আসর পড়ল। তা'তে গ্রামের গণ্যমান্য সব ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক আর বৈশ্যেরা বসলেন, চারিদিকে নীচবর্ণীয় লোকেরা ভিড় করে দাঁড়ালো। সন্ধ্যার কিছুপরে ভীমা তার লাঠিধারী কৈবর্ত্তের দলসহ এক ধার দখল করে বসল। তাকে বসবার পিঁড়ি দেওয়া হ'ল, দলের লোকেরা কেহ ছালার চটে কেহ মাটিতে আসন পাতল।

রাত্রি দশটাতে বাই আসরে নামল। ছাব্বিশ সাতাশ

বৎসর বয়স্কা একটি মেয়েমানুষ, তার গায়ের রং ময়লা। মুখে তেলের ছাপ। ঠোঁট পানের দাগে চট্‌চটে। তিন পাড় ওয়ালা চটকদার ধুতি ঘাগরার মত পরেছে। তা' ঘুরিয়ে সে গান ধরল'

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না নাথ
বেলা হ'ল মরি লাজে।

সমবেত জনতা তাকে বাহবা দিতে লাগল।

ভীমা বিশেষ একটু নেশা করে এসেছিল, তাই এক একবার তার বাহবার মাত্রাটা স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘন করে যেতে লাগল। তার উৎসাহ ও উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলল মাঝে মাঝে নাচওয়ালীর অতি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ। প্রায় মধ্যরাত্রে রাধিকার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দকিশোর আর ভীমাতে বেশ একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। দ্বিতীয় বার যখন তার পুনরাবৃত্তি হ'ল তখন হঠাৎ ভীমা দলবলে উঠে দাঁড়াল, বলল, তারা নাচ দেখবে না, এবং—বেশ সজোরে ঘোষণা করল,—কেউ নাচ দেখবে না।

ভীমা ও তার দলের লোক লাঠি হাতে করে হৈ হৈ করে আসরের উপর এসে উঠল। ব্যাপার সঙ্গীন দেখে ভদ্রদের অনেকেই সরে পড়লেন, যারা রইলেন, তাদের শুধু তামাসা দেখার লোভ ছিল। রাধিকার বাড়ীর চাকরেরা ও পাড়ার শূদ্রেরা ভীমার দলকে আক্রমণ করল। লাঠিতে লাঠিতে ভীষণ ঠকাঠকি আরম্ভ হ'ল।

মুহূর্ত্তে নাচওয়ালীর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ মিলিয়ে গিয়ে চোখ দুটি ছলছল করে উঠল, পানে রাঙা ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপতে লাগল। সে প্রাণের ভয়ে মুহ্যমান হয়ে আসরের মাঝখানে জড়সড় ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভীমা বিপক্ষকে পরাজিত করে সগর্ব্বে নাচওয়ালীর কাছে এসে বলল, 'চল'। নাচওয়ালী ভয়ে বিহ্বল হয়ে চোখ বুজে ভুঁয়েতে লুটিয়ে পড়ল। ভীমাও তার সঙ্গীরা তাকে চ্যাং দোলা করে নিয়ে চলে গেল।

রাধিকা গ্রামের চৌকিদারদিগকে ডাকাল, কিন্তু কেউ ভীমার বিরুদ্ধে যেতে রাজী হ'ল না। তখন সে দারোগাকে খবর দিতে শহরে লোক পাঠাল।

তারা নদী দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেল, জমিদার বাড়ীর বজরাখানা মধ্য জলে ভাসছে, আর তা' কানায় কানায় লোকে ঠাসা। তারই গলুইয়ের উপর নাচওয়ালী ঘুরে ঘুরে গান করছে,—কেন যামিনী না যেতে জাগালে না নাথ।

কিন্তু যামিনী অবসানের পূর্ব্বেই ভীমা সদলে দারোগার হস্তে বন্দী হ'ল এবং পরের চার মাস পর্য্যন্ত আইনের কঠিন কবলে পড়ে খুব হস্তদন্ত হ'তে লাগল।

প্রথমে সকলে জামিনে খালাস পেল। কিন্তু দিনের পর দিন ভীমা ও তার সঙ্গীদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ জলের মত উকিলের পকেটে যেতে লাগল।

শুধু তাই নয়। ভীমা পাড়াগেঁয়ে লোক। শহরের আবেষ্টনে এসে তাকে পদে পদে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হ'তে হ'ল। তার চোখে আগেকার দীপ্তি নেই, গতিতে দর্প নেই। শহরের উদ্ধত শক্তি তার সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ করে দিয়েছিল। সাধারণ পেয়াদা পিয়ন তার পানে অবজ্ঞা ভরে দৃষ্টি করত, হোটেলওয়ালা দোকানদার তাকে একটা নেহাৎই গেঁয়ো ভূত বলে মনে করত। একদিন সমস্ত অপমান চরমে উঠল মিউনিসিপ্যালিটির রিজার্ভ করা পুষ্করিণীতে স্নান করতে গিয়ে। অত্যন্ত গরম হয়ে ভীমা জলে নেমে পড়েছিল। পাহারাওয়ালা বললে, ওখানে স্নান করা নিষেধ। ভীমা তা বিশ্বাস করলে না। বোধ হয় সকালে একটু বেশি মাত্রায় পান করেছিল। ভীমা যখন স্নান করে উঠল তখন পাহারাওয়ালা এসে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে চলল। রাস্তার ছেলের দল তার পিছু নিল। ভীমা এখন গ্রেপ্তারের অর্থ বুঝে। তাই সে আর্দ্র দেহে ঠিক ভেজা বেড়ালটির মতই পুলিশের সঙ্গে চলেছিল। সেই ভীমা, যার প্রকোপে সমস্ত কাঞ্চনপুর গ্রাম প্রকম্পিত, যার কথায় একশত বাছা লাঠিয়াল প্রাণ দিতে প্রস্তুত! শহরে বীরত্বের অবকাশ নেই; এখানে পুলিশের রাজত্ব, ডেমোক্রাসি! ভীমার উকিল খবর পেয়ে তাকে ছাড়িয়ে না নিলে প্রথম নম্বর মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই তাকে দ্বিতীয় নম্বরে জড়িত হতে হ'ত!

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, এবং উক্ত উকিলেরই বুদ্ধির কৌশলে, ভীমা ও তার সঙ্গিগণ প্রথম নম্বর মামলা থেকেও মুক্তি পেল। নাচওয়ালী কামিনী সাক্ষ্য দিল, সে নিজ ইচ্ছাতেই ভীমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। ভীমা যখন সঙ্গিগণসহ গাঁয়ে ফিরে এল, তখন চারিদিকে তার জয়জয়কার পড়ে গেল।

৫

কিন্তু রাধিকার হাতে ভীমার জন্যে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছিল। রাধিকা ভীমার মহাজন। তার নিকট হতেই ভীমা বিলের টাকা ধার করেছিল। ফৌজদারী হেরে রাধিকা দেওয়ানীতে গেল। তমসুকের নালিশ করে সুদে আসলে ভীমাদের উপর বহু টাকার ডিক্রি করাল। সে ডিক্রির জোরে ভীমার সমস্ত জমাজমি বাড়ী ঘরের উপর ক্রোক দিল।

গাঁয়ের টস্টী নীলমণি ঠাকুরের পরামর্শে ভীমা আবার উকিলের শরণাপন্ন হল। কিন্তু শুধু অর্থনষ্ট ও দারিদ্র্য-বৃদ্ধি ছাড়া তার কোনো ফল হ'ল না। অবশেষে সমস্ত জাগীদারবা মিলে দাবীর টাকা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করল। ইহাতে ভীমার জমাজমি সব গেল, রইল শুধু ভিটেখানা ও তার পাশের কয়েক বিঘে জমি।

এর পর ভীম সর্দার জাতের সর্দারের পদত্যাগ করে স্বগ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

বহুকাল পর্য্যন্ত ভীমার কোনো খবর নেই। তার স্ত্রী শিশু পুত্রকে নিয়ে নিরুপায় হয়ে সে গাঁয়ের গরীব কৈবর্ত্তানী-দের সঙ্গে বিনিময়ে ফেরীর ব্যবসা করতে লাগল। ভদ্রপাড়ায় ঘুরে ঘুরে ডিম, শুঁটকী ও ছাঁচি কুমড়ার বদলে পুরাণো কাপড় আনে; সে কাপড় দিয়ে কাঁথা তৈরি করে শীতের পূর্ব্বে স্বজাতীয়দের কাছে বেচে। এইভাবে তার অন্ন সংস্থান হয়।

ভীমা নিখোঁজ হয়েই রইল। একবার শোনা গেল সে শহরে মাছের দালালি করছে। কিছুকাল তা' করেছিল সন্দেহ নেই। বোধ হয় তা' হ'তে দু পয়সা কামাইও করেছিল, কেননা সে খবর পাওয়ার কিছুকাল পরে জানা গেল যে ভীমা এক বিধবা বণিক কন্যার পানিগ্রহণে ইচ্ছুক এবং হিন্দু সমাজ সে ইচ্ছার প্রতিরোধ করাতে সে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণে উদ্যত। একথা শুনে তার ভাগ্নে গদাধর সাড়ে সাত আনার টিকিট কেটে শহরে গিয়াছিল। কিন্তু গিয়ে জানল, বণিক-তনয়া বৈষ্ণবী হয়ে নবদ্বীপ ধামে চলে গেছে, ভীমা নাকি দালালির ব্যবসা ছেড়ে শহরের এক গুণ্ডার দলে ভর্ত্তি হয়েছে। এসব খবর গদাই এসে ভীমার স্ত্রী রুদ্রাণীকে বলল। রুদ্রাণী কপালে করাঘাত করে অদৃষ্টের নিন্দা করতে লাগল।

এর চাইতেও আরো রোমাঞ্চকর খবর আনল গ্রামের টস্টী নীলমণি ঠাকুর। ভীমা নাকি গুটিকতক মুস্লিমের সঙ্গে এক অদ্ভুত নারী হরণের ব্যাপারে সংস্পৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশে অসহায় হিন্দুনারী হরণ করে থাকে মুস্লিম সমাজের দুর্ব্বৃত্তেরা, তার চেয়েও নাকি অধিক সংখ্যক হিন্দুনারী হরণ করে হিন্দু সমাজের দুর্ব্বৃত্তগণ, এবং তার চেয়েও অধিক মুস্লিম নারী নাকি মুস্লিম দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে নির্য্যাতিত হয়। কিন্তু হিন্দুর হস্তে মুস্লিম নারীর নির্য্যাতন তা' কচিৎ ঘটে থাকে। ভীমা তাতেই নাকি অভিযুক্ত হয়েছিল, এবং সে অভিযোগ শুধু নারী হরণের নয়, একটা খুনেরও তাতে সংস্রব ছিল। তবে ভীমা মুখ্য আসামী ছিল না, মুখ্য আসামীর বহু সহচরদের মধ্যে সে একজন। শেষ পর্য্যন্ত, প্রমাণের অভাবে, আইনের কবল হ'তে রক্ষা পেয়েছিল।

এ সব ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য কি না তা' নীলমণি চক্রবর্ত্তী জানে। ভীমার সঙ্গে আমার দেখা হলে যখন আমি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করি, তখন সে সম্পূর্ণ নিরুত্তর ছিল। বোধ হয় সে সব ঘটনার জন্য সে খুব লজ্জা অনুভব কর্চ্ছিল। অন্ততঃ তার মুখ দেখে আমার তাই মনে হ'ত।

৬

বৎসর আড়াই পরে ভীমা স্বগ্রামে ফিরে এসে অতি নিরিবিলিভাবে জীবনযাপন করতে লাগল। সারা-দিন মাছ ধরে, বিকালে বাজারে নিয়ে তা বিক্রি করে, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসে আফিঙের গুলি খেয়ে ঝিমোয়। তার পর খেয়ে দেয়ে দাওয়ার উপর শুয়ে পড়ে। কিন্তু

কালের যাত্রা

বিচিত্রা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

শিল্পী—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

এ আর আগেকার ভীমা নয়। তার মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে গেছে, কথায় কথায় রেগে উঠে, ভাতের থালা উঠানে ছুড়ে ফেলে দেয়, কারণে অকারণে ছেলেটাকে ধরে মারে। তার স্ত্রী প্রথম তাকে সবিনয়েই অভ্যর্থনা করে-ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে দুয়ের মনোমালিন্য কলহ, এবং বিচ্ছেদ ঘটল। রুদ্রাণী তাকে ছেড়ে তার বোনের বাড়ীতে চলে গেল, এবং ছেলে নিয়ে আগের মত স্বাধীন ভাবে বাস করতে লাগল।

স্ত্রী চলে যাবার পর ভীমা নেহাৎই কোন-ঠ্যাসা হয়ে পড়ল। বেলা দুটোতে জাল বেয়ে এসে রান্না চড়ায়। আপন মনে বিড় বিড় করে বকে আর লোককে অযথা অশ্লীল গালি গালাজ করে। এতদিন ভীমা বুঝল শুধু দেবতাই তার বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত মনুষ্য সমাজও তার ঘোর শত্রু। সে ভাবটা তার প্রতি কথায় প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল। গ্রামের লোকে তাকে যথাসম্ভব পাশ কাটিয়ে চলে। মুদিরা তার কাছে বেচতেই চায়না, ধারে বেচা তো দূরের কথা। মাছ বেচতে গিয়ে কথায় কথায় লোকের সঙ্গে খন খন করে উঠে। শুধু বোগীদেব আধ-পাগলা কেবলরাম বাউলকে সকালে সন্ধ্যায় তার দাওয়ায় বসে গাঁজা ফুঁকতে দেখা যায়।

লোকে ভাবল, এবার ভীমা না খেয়ে মরবে, না হয় বৈরাগী হবে, না হয় একটা খুন খরাপতি করে ফাঁসি যাবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তার কোনটাই হল না। যা' হ'ল তা অতি অদ্ভুত।

ভীমা হঠাৎ তার জমিজমা যা' কিছু ছিল সব বিক্রি করে ফেল্‌ল। শুধু বাড়ীখানা রইল। সেও রায়তী সত্বে। তার পর একদিন ভোরে টাকার তোড়া কোমরে বেঁধে ছাতা ও লাঠিসহ রাস্তায় নেমে পড়ল। পথের লোকে জিজ্ঞাসা করে, "ভীম সর্দ্দার কোথা যাচ্ছ?" তার সর্দ্দারি গেলেও সর্দ্দার নামটি যায়নি। ভীমা বলে "হাজিগঞ্জের বাজারে"। হাজিগঞ্জের বাজার ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ দূরে। লোকে জিজ্ঞাসা করে "সেখানে কি"? ভীমা হাসে।

তার দিন দশেক পরে একদিন ভীমা বাড়ী ফিরে এল, সঙ্গে নিয়ে এল মোটা সনের দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়। সে দেশে এত বড় এবং এরূপ অদ্ভুত চেহারার ষাঁড় কেহ কোনোদিন দেখেনি। তার ঝুঁটিটা ঘাড় থেকে প্রায় এক হাত উপরে উঠেছে, নীচে পায়ের কাছ পর্য্যন্ত গলার চামড়া লতিয়ে পড়েছে; চোখ দুটো বিশাল; সিং ছোট ছোট, কিন্তু আগাগুলি অতি তীক্ষ্ণ। এক মুহূর্ত্ত সে জানোয়ারটা স্থির থাকতে পারে না। ভীমা লোহার মত হাত দিয়ে দড়ি ধরে ছিল বলে সে পথের উপর দিয়ে চলছিল।

ভীমা আমাকে দেখে হাত তুলে প্রণাম করে বললে, "কর্ত্তা, একটা ষাঁড় কিনে আনলুম, বড্ড দাম নিয়েছে বেটারা।" বাস্তবিক ভীমার সমস্ত ঐহিক সম্পত্তি ঐ ষণ্ডটাতে রূপান্তরিত হয়ে ছিল।

সে ভিন্ন ঐ প্রচণ্ড জানোয়ারটাকে কেউ সামলাতে পারত না। সামলানো দূরের কথা, তার কাছে এগোনোই অসম্ভব ছিল।

এ ষাঁড়টিই এখন ভীমার নিঃসঙ্গ জীবন জুড়ে রইল। সে যখন বিলের উপর বিস্তৃত সবুজ মাঠের মধ্যে ষাঁড়টাকে ছেড়ে দিয়ে চুপটি করে বসে থাকত, আর ষাঁড় উদ্ভ্রান্তভাবে সারা মাঠ ছুটে বেড়াত, তখন তার প্রাণ তৃপ্তিতে ভরে উঠত।

বহুদিন পরে ভীমার মুখে হাসি দেখা দিল। তার চরিত্রে আবার অতীতদিনের সব সৌজন্য ও বিনয় ফুটে উঠ্‌তে লাগল।

কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই লোকে বুঝতে পারল, এ ষাঁড়টি আর কিছু নয় শুধু সমাজের উপর ভীম সর্দ্দারের ব্যর্থ জীবনের একটা দুরন্ত প্রতিশোধ। সে ষাঁড় যখন ছাড়া পেয়ে সারা গাঁ ঘুরে বেড়াত, তখন গ্রাম-বাসীরা ভয়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ত। ষাঁড় কারো বাগান ভাঙত, কারো খড়ের কুঁজি টেনে ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে আসত। বৌঝিরা ঘাটের পথে চীৎকার করে সরে দাঁড়াত, শিশুদের প্রাণ সংশয় হ'ত। সে ষাঁড়কে ধরে এমন সাধ্য কারো ছিল না; সকলেই ভীমার কাছে নালিশ করত। ভীমা তার শনের মোটা দড়ি গাছা নিয়ে এসে ষাঁড়কে বেঁধে নিত। তার গলা চাপড়ে বলত "সামলে' চল বেটা, সামলে চল।"

আমার এক এক সময়ে মনে হত ভীমার ষাঁড়টা যেন সত্যিকার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া। পূর্ব্বকালের ক্ষত্রিয় রাজা যখন লড়াইয়ের কোনো ওজুহাত না পেত, অথচ শান্তিতে বাস করা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়ত, তখন একটা ঘোড়াকে রাজ্যের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দিত, আর তাকে যে আটকাতে আসত তার সঙ্গেই লড়াই করত। সে ঘোড়াকে জীবন্তে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে, নিজেকে চক্রবর্ত্তী বলে ঘোষণা করত, মানে ঘোড়া যে চক্করটা দিয়ে এল তার ভিতর সেই প্রধান। মহা সমারোহে যজ্ঞ করে সে খবরটা চারিদিকে ঘোষণা করা হ'ত।

ভীমাও তার ষাঁড়টাকে গ্রামের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ঐ রকমেই যেন লোকের উপর প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা কচ্ছিল।

ষাঁড়টা যখন ভীমার পাশাপাশি ঘাড় দুলিয়ে চলত, তখন গর্ব্বে ভীমার বুক ফুলে উঠত। তার জীবনের সমস্ত নষ্ট শৌর্য্য যেন ঐ ষণ্ডটাতে মূর্ত্তিমান হয়ে তাকে পুনরায় বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করত।

তখন ভীম সর্দ্দার বললেই লোকের সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ত দুরন্ত, দুর্দ্দাম, দুর্জ্জয় একটা বৃষ। প্রাচীন কালের শক্তিশালী রাজাদের পুঙ্গব বা ঋষভ আখ্যা কেন দেওয়া হ'ত ভীমার ষাঁড়টা দেখে আমরা তা' যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতাম।

কিন্তু সে বৃষের আগমনের পর তিনমাস না যেতেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। একদিন সন্ধ্যায় ষাঁড়টা ছাড়া পেয়ে ভীমার ঘরের পেছনের বাগানে চরে বেড়াচ্ছিল। ভীমা তার পিছু পিছু গিয়ে অতি কষ্টে গলায় দড়ি লাগাল, কিন্তু ষাঁড় কোনো মতেই সেস্থান ছেড়ে আসবে না। ভীমা তাকে নানা আদরের ডাক ডাকল, শিস দিল, জিভ দিয়ে অনেক রকমের শব্দ করল, কিন্তু ষাঁড় তার দিকে ফিরেও চাইল না, সে নির্ম্মম ভাবে ভীমার ঘরের চাল হ'তে কুমড়োর লতা ছিঁড়ে নামাতে লাগল। অবশেষে ভীমার মেজাজ বিগড়ে গেল। সে ক্রুদ্ধ হয়ে অতি কঠিন ভাবে দড়িতে হেচ্‌কা টান দিল। তা'তে ষাঁড়ের ঘাড়ের চামড়া আধ হাত পর্য্যন্ত চিরে গেল। তখন ব্যাপারটা কি ভীমা তা' বুঝবার পূর্ব্বেই ষাঁড় ভীষণবেগে তার উপর এসে পড়ল, শিং জোড়া দিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য তাকে জমি হ'তে হাতখানেক উপরে তুলে রাখল, তারপর ক্যাক্ করে মাটিতে চিৎ করে ফেলে তার বুকের ভিতর শিং দুটি আমূল বিদ্ধ করে দিল। শিং ভীমার বুকের পাঁজর ভেঙে ফুস্‌ফুস্ ভেদ করে অপর দিকের পাঁজরের কাছাকাছি গিয়ে ঠেকল। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে ভীমার জীবন-লীলার অবসান হ'ল।

গাঁয়ের লোক বলাবলি করতে লাগল, ভীমা সর্ব্বস্ব বেচে হাজিগঞ্জের বাজার থেকে নিজের যম কিনে এনেছিল। আমি ভাবি, ভীমার জীবন দেবতা অপেক্ষা করেছিল একটা বিরোচিত, ক্ষত্রিয়োচিত মৃত্যুর জন্যে; এতকাল পরে সে সুযোগ মিলল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভীমা ক্ষত্রিয় ছিল; তার স্বজাতীয়েরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু

এপ্‌ষ্টাইন ও আর্ট

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এম্-এ

আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পজগতে জেকব এপ্‌ষ্টাইনের (Jacob Epstein) নাম সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—জনসমাজ কর্তৃক তাঁর প্রতিভার স্বীকার এবং অস্বীকার দুই কারণেই : অস্বীকার অতি তীব্রভাবেই হয়েছে এবং হচ্ছে; স্বীকার অস্বীকারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। ১৯১৯ সালে লণ্ডনের St. James Park এ Underground Railway Buildingএর গাত্রে ক্ষোদিত তাঁর 'দিন' ও 'রাত্রি' নামক মূর্ত্তি দুটী জনসাধারণ এবং আর্ট-সমালোচকদের মধ্যে তুমুল হৈ চৈ-এর সৃষ্টি করেছিল। গেল বছর Leicester Galleriesএ প্রদর্শিত 'উৎপত্তি' (Genesis) মূর্ত্তিটী আরো উগ্র সমালোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের অবতারণা করে। সাধারণ লোকের ক্ষোভের কারণ এই যে, গুণী ব্যক্তি যাঁরা তাঁরা এই কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তিগুলির মধ্যেও একজন প্রকৃত কলাবিদের পরিচয় পেয়েছেন; আর ভাস্কর স্বয়ং শত নিন্দাবাদ অগ্রাহ্য করে' এখনো নিজের আর্টিষ্টিক খেয়াল মত মূর্ত্তি গঠন করে' যাচ্ছেন।

এপ্‌ষ্টাইনকে নিয়ে এত গণ্ডগোলের মূল তাঁর পাথরের মূর্ত্তিগুলির অদ্ভুত বিকৃত রূপ। কিন্তু পাশ্চাত্য আর্টে আজকাল ত বিকৃতিরই বহুল প্রচলন। ফটোগ্রাফির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্টের পুরোনো আদর্শগুলির জলাঞ্জলি হয়েছে : বাস্তববাদ বা স্বভাববাদের বদলে এখন impressionism, futurism, cubism ইত্যাদি ism-এর আবির্ভাব হয়েছে, যার ফলে কেউ কেউ আদিম যুগের আর্টের পুনরাবর্ত্তনের প্রয়াস পাচ্ছেন। ফলতঃ, বাস্তবানুকরণের স্থানে বাস্তবের নানারূপ বিকৃতিই বরণীয় হয়েছে। এই নবীন পন্থীরা ছবির বিষয়ের উপর ততটা ধ্যান দেন না, যতটা দেন তার designএর উপর, ছন্দ, গতি বা বর্ণ-বৈচিত্র্য—কোন একটীর উপর।

দিন
(লণ্ডনের St. James Park এ Underground Railway Buildingএর গাত্রে উৎকীর্ণ।)

কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকায় একটী মজার ব্যাপার ঘটে। একটী চিত্র প্রতিযোগিতায় যে চিত্রটি প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল, পরে জানা যায় যে সেটী টাঙান ছিল উল্টোভাবে এবং সেই ভাবেই তার বিচার হয়েছে। ফলে বিচারকদের বেশ খানিক গালাগাল হজম করতে হয়েছিল; কিন্তু এটুকু অন্ততঃ প্রমাণ হ'ল যে তাঁরা চিত্রের বিষয়বস্তুকে সার লক্ষ্য করেননি, তার বর্ণবিন্যাস, রেখাসম্পাত ইত্যাদিকেই

প্রধান বলে' ধরেছিলেন। তবে ছবির বিষয়বস্তু কিছুই নয় একথা যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহ'লে বলতে হবে যে আবহমান কাল থেকে যত বড় বড় শিল্পী জন্মে গেছেন, তাঁরা সবাই মহামূর্খ ছিলেন, এবং আর্টের মোক্ষলাভ হয়েছে আজকালকার ফ্রান্সের অতি-আধুনিক চিত্রকারদের হাতে, যাঁরা আন্বীক্ষিক (abstract) চিত্রের চূড়ান্ত সাধনা করছেন। তা' অবশ্য কেউই স্বীকার করবেন না। এইটুকু শুধু

রাত্রি
(লণ্ডনের St. James Parkএ Underground Buildingএর গাত্রে উৎকীর্ণ)

বলতে পারা যায় যে, চারুকলার চরম বিকাশ পাই subjective এবং objective দুই রূপের সমন্বয়ে। কিন্তু যেদিক দিয়েই দেখি না কেন, কেবলমাত্র বিকৃতির জন্য কোন চিত্র বা ভাস্কর্য্যকে মন্দ বলা আমাদের নিতান্ত অনুচিত। আর্টিষ্ট না হয়েও ফ্রান্সিস্ বেকন একটী কথা বলে' গেছেন যা আর্ট সম্বন্ধে অতি সুন্দর ভাবে খাটে: There is no excellent beauty which hath not some strange proportion. (সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ যেখানে সেখানেই আকারের কোনরূপ অদ্ভুত বা অপূর্ব্ব বিষমতার সমাবেশ দেখা যায়।) একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাই আর্টে বিকৃতি শুধু আধুনিক যুগেরই ব্যাপার নয়। প্রাচীন মিশরের প্রাচীরচিত্রে মানুষের মুখের পার্শ্বদৃশ্যে (profile) সম্পূর্ণ চক্ষু সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এ ভুল মিশরীদের অজ্ঞতা প্রসূত মোটেই বলা চলে না, কারণ তাদের তৈরী অনেক মূর্ত্তিতেই শরীর তত্ত্বের জ্ঞান সুপ্রকট। ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে। স্পেননিবাসী চিত্রকার এল গ্রেকো (El Greco) চমৎকার বাস্তবানুরূপ চিত্র আঁক্‌তে পারতেন, কিন্তু তাঁর ধর্ম্মভাবাত্মক চিত্রে বিকৃতির সঞ্চার দেখা যায়। গুরু ভাবাপন্ন চিত্রই হোক্ বা ব্যঙ্গ চিত্রই হোক্, আর্টিষ্ট চান নিজের ঈপ্সিত অর্থকে ফুটিয়ে তুলতে। আর্টে বিকৃতির মূল আর্টিষ্টের স্বীয় অনুভূতির গভীরতা।

এপ্‌ষ্টাইনের অধিকাংশ সমালোচক তাঁর প্রতি বিশেষ অবিচার করেছেন। বল্‌তে গেলে শিল্প প্রতিভায় পরলোকগত ফরাসী ভাস্কর অগ্যুস্ত রদ্যাঁর (Auguste Rodin) পর এপ্‌ষ্টাইনের সমকক্ষ নেই বল্‌লে চলে। তিনি শিল্পকলার গতানুগতিক কোন মতবাদী নন। বস্তুতঃ, প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিভাশালী শিল্পীই শিল্পের সনাতন ধারাবাহিক নিয়ম কানুনের নিগড়বদ্ধ হন্‌নি; এপ্‌ষ্টাইনও নিজের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় যথেষ্ট দিয়েছেন। তাঁর মতে আর্ট জীবনের একটী সুকুমার বস্তুমাত্র নয়, জীবনের শক্তি বিশেষ। তিনি কেবল নিষ্ক্রিয় আনন্দ (passive pleasure) দিয়ে ক্ষান্ত হতে চাননা, দর্শকের ভাব বৃত্তিকে আঘাত করে' তাকে ভেঙ্গে গড়তে চান। রূপক মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে একথা ভালভাবেই খাটে। যে মূর্ত্তিগুলি এত হৈ চৈ-এর পত্তন করেছে, সব ক'টীই রূপাত্মক। Day, Night, Rima, Genesis, Christ এর ব্রহ্মমূর্ত্তি—প্রত্যেকটীতে ভাস্করের কল্পনাগত যে রূপের ছায়াপাত হয়েছে, তদ্ভিন্ন একটী বিশদ অভিপ্রায় আছে। তিনি দর্শকের মনে বিস্ময়ের ভাব জাগিয়ে সুলভ আত্মপ্রসাদের (complacency) মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। মূর্ত্তিগুলির অর্থ পরিচয় দিতে এখানে প্রয়াস করব না; কেবল একটীর (Genesis) সম্বন্ধে

শিল্পীর নিজের মত অভিব্যক্ত করলে তার অনাবশ্যকতা বুঝতে পারা যাবে। তিনি বলেন, "I cannot explain 'Genesis'. My explanation lies in the work itself. If I have failed to make it understandable, then it is a bad work, and no amount of lecturing on my part can save it. You give your own explanation of the work as it appeals to you." ('উৎপত্তি'র অর্থ

মাতৃমূর্ত্তি

বোঝাতে আমি নিজে অসমর্থ। আমার অর্থ মূর্ত্তিটীতেই দেওয়া রয়েছে। এটা যদি দুর্বোধ্য হয়ে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে নিশ্চয় এতে গলদ আছে, এবং আমি যতই তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করিনা কেন, মূর্ত্তিটী খারাপই ধরে' নিতে হবে। যাঁর মনে এটা যেমন ভাবে লাগবে, তিনি তেমনি এর অর্থ নিজেই করে' নেবেন।)

এপ্‌ষ্টাইন শিল্পে সর্ব্বপ্রথমেই চান তার দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদনের শক্তি। ললিতকলার কোন নিদর্শনের অন্তরালে যদি ভাবের সমাবেশ থাকে, তাহ'লে তা' আমাদের মনে নিশ্চয়ই একটা গভীর ছাপ এঁকে দেবে। উচুদরের আর্ট মাত্রেই মনের উপর আঘাত করে এবং আমাদের কল্পনাশক্তিকে প্রবুদ্ধ করে। প্রাণময় শিল্পের গুণই এই যে তা' দর্শকের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে' সাধারণ আত্ম-প্রসাদের গণ্ডী থেকে বার করে' আনে এবং যা আপাত-দৃষ্টিতে সুন্দর বা মুগ্ধকর তদপেক্ষা উচ্চস্তরে নিয়ে যায়।

ব্রঞ্জের মূর্ত্তি বা আলেখ্যচিত্রণে—যেখানে কোন ভাবের জাগরণ অভিপ্রেত নয়, কেবল দর্শকের কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করাই উদ্দেশ্য, সেখানে—বিস্ময় উৎপাদন অতটা প্রবল হ'বার সার্থকতা নেই। এইগুলিতে এপ্‌ষ্টাইনের প্রতিভার প্রতীতি হয় আরো সহজে। 'মাতৃমূর্ত্তি' (Madonna and the Child) তাঁর ব্রঞ্জশিল্পের একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বেকনের বাক্যের সত্যতা এখানেও তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। সেই strangeness—অপূর্ব্বতা বা বৈলক্ষণ্য—ফোটাবার জন্য তিনি তাঁর ভাস্কর্য্যকে বিকৃত করেন না; শুধু গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে সে অপূর্ব্বতা আসে। ফলে তাতে আমরা একটী বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য (excellent beauty) দেখতে পাই—নূতন ভাবে, চিরদিনের জন্য। এই অনুভূতির নূতনত্ব, এই চমৎকারিত্ব তাঁর ব্রঞ্জমূর্ত্তিগুলির স্বেচ্ছাকৃত অমসৃণতা থেকেও কতকটা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁর 'আমেরিকার যোদ্ধা' বা লর্ড রদারমিয়ারের প্রতিমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাথরে পরিষ্কার খোদাই করা কাজে অনেক সময় ব্রঞ্জের এ strangeness পাওয়া যায় না।

প্রতিমূর্ত্তি গঠনে এপ্‌ষ্টাইন মূলের অবিকল অনুকরণ করেন; যাতে অবিকৃত প্রতিচ্ছবি তুলতে পারেন সে বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল। যাঁরা বলেন যে, যদি শিল্পী কলাসম্মত কিছু দাঁড় করাতে পারেন, তাহ'লে সাদৃশ্যের তেমন প্রয়োজন নেই, এপ্‌ষ্টাইনের মতে তাঁদের কথার কোন মূল্য নেই শুধু বুজরুকি। প্রতিমূর্ত্তি গড়তে গেলে সবচেয়ে বেশী দরকার সাদৃশ্যের। লর্ড রদারমিয়ারের ব্রঞ্জ প্রতিকৃতি তাঁর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক্ষমতার একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অনেক

গুণগ্রাহী ভক্ত তাঁর গঠিত প্রতিমূর্ত্তিগুলিতে চরিত্রচিত্রণ নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন, কিন্তু এপ্‌ষ্টাইন তাঁদের কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চান। তিনি বলেন সাদৃশ্য থেকে চরিত্রের আভাস পাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু তিনি

ন্যান (Nan)
(লণ্ডনের টেট কলাশালায় রক্ষিত)

প্রত্যক্ষ বস্তুরই অনুকরণ ছাড়া আর কিছু করেন না, কাল্পনিক বা অতীন্দ্রিয় কিছু যোগ করে' দেন না। সেইজন্য লোকে তাঁকে অসাধারণ মনস্তত্ত্ববিৎ বল্লে তিনি প্রীত না হয়ে বরং কুণ্ঠিত বোধ করেন।

ফলকথা,' এপ্‌ষ্টাইনকে আর্টিষ্ট হিসাবে একজন পূর্ব্ব-সংস্কারের বিরোধী বিদ্রোহী বলে' গণ্য করলে ভুল হবে; তিনি শুধু আমাদের সুলভ আত্মপ্রসাদে ঘা দিতে চান। Leicester Galleriesএ রক্ষিত তাঁর তৈরী মূর্ত্তিগুলি প্রমাণ করে' দেয় যে সাধারণে সুন্দর বলতে যাকে বোঝে সে জ্ঞান তাঁর যথেষ্ট আছে—সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী। তাঁর মতে শিল্পীর সোনার কাঠির স্পর্শেই স্বাভাবিক কোন অসুন্দর জিনিষ সুন্দর হয়ে ওঠে না। যাঁর সেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, তাঁর কাছে সে বস্তু স্বতই সুন্দর, চিরসুন্দর। জীবনের আবর্ত্তমান ঘটনাচক্রে তার সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, কারো কাছে কখনো কখনো, কারো কাছে সদা-সর্ব্বদাই। আর্টিষ্ট যিনি তিনি স্বভাবতই জীবনের মধ্যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান এবং তাকে রূপদান করেন। আমাদের দোষ আমরা সচরাচর সৌন্দর্য্যকে একটা নির্দ্দিষ্ট জিনিষ বলে' ধরি যার মাপকাঠি সকলের কাছেই আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সৌন্দর্য্যের কোন চরম আদর্শ (standard) নেই, এবং আর্টিষ্ট সব সময় দশজনের চক্ষে যা সুন্দর সেরূপ সৌন্দর্য্যকে গড়তে চাননা। তাই এপ্‌ষ্টাইনের সকল প্রকার রূপসৃষ্টি আমাদের সহজবোধ্য না হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

এপ্‌ষ্টাইন একজন ইংলণ্ডপ্রবাসী আমেরিকান ইহুদী। আধুনিক পাশ্চাত্যজগতে দর্শন, শিল্প, নাট্য, সঙ্গীত ইত্যাদি জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় ইহুদীরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। এটা একটা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়—সুধীভির্ভাব্যম্।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয়

শ্রীগদাধর সিংহরায় এম-এ, বি-এল

পূজার ছুটিতে ও অন্য সময় অনেকেই রাঁচি গিয়ে থাকেন; কিন্তু সহরের এক নির্জ্জন প্রান্তে অথচ রাঁচি ষ্টেশন থেকে পাঁচ মিনিটের পথে এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয়ের সংবাদ অনেকেই বোধ হয় ভাল রকম রাখেন না। তাই আজ আমরা এ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলবো।

কলিকাতায় একটী সাধু-সভা আছে, তার নাম "যোগদা সৎসঙ্গ সভা"। স্বামী যোগানন্দ গিরি এর একজন প্রধান সভ্য। স্বামীজী উক্ত সভার পক্ষে একটি আদর্শ ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ইংরাজী ১৯১৭ সালে কাশীমবাজারাধিপতি স্বর্গীয় দানবীর মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থী হন। স্বর্গীয় মহারাজ সাগ্রহে স্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মত হন এবং ঐ বৎসর ইংরাজী ২২শে মার্চ্চ পুণ্যতিথিতে রাঁচিতে তাঁর নিজের বৃহৎ বাগানবাড়ীতে এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদের দেশের বালকগণকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রয়োজনীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাদান। বিদ্যার্থীগণের প্রকৃত চরিত্র গঠন ক'রে স্বাবলম্বী ও কার্য্যক্ষম ক'রে তোলাই ইহার লক্ষ্য।

ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় দানবীর
মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই

এই আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরে স্বামীজীরই চেষ্টায় কলিকাতায় "ব্রহ্মচর্য্য সঙ্ঘ" এবং পুরীতে "ব্রহ্মচর্য্যসঙ্ঘাশ্রম" নামে দুটী সমিতির যথারীতি রেজেষ্টারি করা হয়। সত্য, প্রেম, সংযম ও অভীঃ (নির্ভীকতা) এই চার মূল ধর্ম্মের সাধন ও রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের মত নানাস্থানে আরও আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই ছিল এ দুই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয় হ'ল ব্রহ্মচর্য্য-সঙ্ঘাশ্রমের একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার কতকগুলি মোটামুটি নিয়ম আমরা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করলাম। আশ্রমের আচার্য্য বা সম্পাদককে পত্র লিখলে যদি কেউ ইচ্ছা করেন সমস্ত বিষয় জানতে পারবেন।

আট থেকে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছাত্র ভর্ত্তি করা হয়। আশ্রম বার মাসই খোলা থাকে। শারদীয়া পূজার সময় প্রায় এক মাস এবং গ্রীষ্মকালে তিন সপ্তাহ কেবলমাত্র পড়া বন্ধ থাকে। এই সময় সাধারণতঃ বৎসরে এক মাস বালকগণকে বাড়ী যেতে দেওয়া হয়। আহারাদি ও কাগজ-কলম ইত্যাদির জন্য প্রতি বালকের অভিভাবককে প্রতি মাসে ১৪৲ টাকা খরচ দিতে হয়। প্রয়োজন হ'লে অভিভাবকগণ আশ্রমে গিয়ে থাকতে পারেন এবং বালকগণকে দেখে আসতে পারেন। বিদ্যার্থীগণের সুচিকিৎসারও বন্দোবস্ত আছে।

বিদ্যালয়ের দুইটী প্রধান বিভাগ—(১) পূর্ব্ববিভাগ (School Department) ও (২) উত্তর বিভাগ (College Department)। সংস্কৃত, মাতৃভাষা (হিন্দী বা বাঙ্গলা), ইংরাজী, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পূর্ব্ব বিভাগের পাঠ্য। দর্শন, অর্থনীতি, সংস্কৃত, ইংরাজী, গণিত প্রভৃতি উত্তর বিভাগের পাঠ্য। প্রত্যেক শ্রেণীতে যোগ্যতানুসারে ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রের আলোচনা করান হয় না। পূর্ব্ব বিভাগের পাঠ শেষ হলে বিদ্যার্থীগণের "ব্রহ্মচর্য্য-সঙ্ঘের" পরীক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক (Matric) পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রম থেকে অনেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেছে। উত্তর বিভাগের ছাত্রগণ "ব্রহ্মচর্য্য সঙ্ঘের" পরীক্ষা অথবা সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা দিতে পারেন। কোন বিভাগেই বিবাহিত ছাত্র লওয়া হয় না।

আশ্রমের কয়েকজন কর্ম্মী ও ছাত্র

হয়। শিশুদের শ্রেণীতে পাঠ্য স্তোত্রাদি, সপ্তম শ্রেণীতে 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ', ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছেলেদের মহাভারত', পঞ্চম শ্রেণীতে 'শ্রীশ্রীভাগবত কথামৃত', চতুর্থ শ্রেণীতে 'সুধাকর গীতা', তৃতীয় শ্রেণীতে 'শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা', এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা' ও 'রাজযোগ'। এই ভাবে বিদ্যারম্ভ থেকে বিদ্যার্থীগণকে আমাদের নীতি-ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করান হয়, যেটা সাধারণ বিদ্যালয়ে

এ সব পাঠ্য পুস্তক ছাড়া চরকা, তাঁত, আসন-তৈয়ারী, সেলাই, কৃষি, গো-সেবা ও রোগী-সেবা প্রভৃতি বিষয়ের কাজ শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। দেখলাম—আশ্রমের বালকগণ নিজেরা একটা ইন্দারা খুঁড়েছে এবং একখানা পাকা ঘরও তৈয়ারী করেছে। গো-সেবা ও কৃষিকার্য্য নিজেরা করে। লাঠিখেলা, জলে সাঁতার ও এমন কি আধুনিক ফুটবল খেলা শিখানরও ব্যবস্থা আছে। মেলায় ও

পূজা-পার্ব্বণে বালকগণ স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী গঠন করে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের অনেক সাহায্য করে থাকে। মাঝে

আশ্রমের গো-ধন।

মাঝে দূর গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে তারা গ্রামবাসিদের শিক্ষনীয় বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যায় এবং আশ্রমের সেবাসঙ্ঘ দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে ঔষধ নিয়ে দরিদ্র রোগীদের দেয়। এ সব কাজের দ্বারা বালকগণকে দেশহিতব্রতী করে তোলা হয়।

আশ্রমের গোটাকতক বিশেষ পদ্ধতি আছে। কবিবরের "শান্তি নিকেতনের" মত এখানেও এক একটি ক্লাশ হয় এক একটি গাছের তলায়—চেয়ার, টেবিল নিয়ে ঘরের

ছাত্রগণ কৃষিকাজ কচ্ছে। সম্মুখে যে ইন্দারা দেখা যাচ্ছে আর পিছনে যে ঘর দেখা যাচ্ছে এ দুটীই ছাত্রগণ নিজেরা নির্ম্মাণ করেছে।

মধ্যে নয়। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ আসন পেতে মাটির উপর বসেন। কেবল বর্ষাকালে ক্লাশ হয় ঘরের বারান্দায়। অনেকটা পাঠশালার মত। হিন্দুর ধর্ম্মনীতিশাস্ত্র শিখান হয় বলে হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি কিছু নেই। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় আহ্নিক স্তোত্র ও প্রার্থনা নিত্য হয় বটে কিন্তু বালকগণকে সকল দেশের সকল ধর্ম্মের মহৎ মূলতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা করতে শিখান হয়—ঘৃণা করতে নয়। সকল উপাসক সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীরদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া

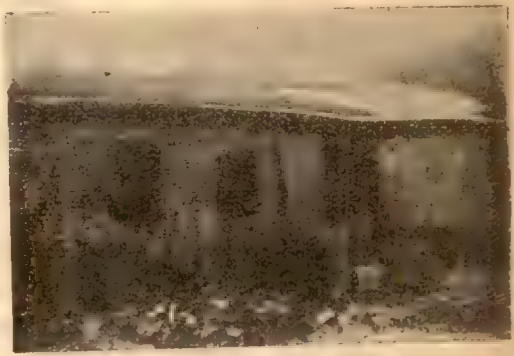

সেবা-সঙ্ঘ দাতব্য চিকিৎসালয়ের এক পাশের দৃশ্য।

হয়। যে মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্তে যে ঘটনাটী মহৎ তার স্মরণার্থে প্রতি বৎসর সেইদিনে নিয়মিত ভাবে উৎসব হয়। যেমন, মহরম, বড়দিন ইত্যাদি। বাহিরে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরে নিত্য পূজা হয়। এছাড়া ভিতরে একটী আশ্রমবাসিগণের সকলের সাধারণ উপাসনার

আশ্রমের পুকুরে ছাত্রদের সাঁতার শিখান হচ্ছে।

ঘর আছে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় এখানে সকলে মিলে উপাসনা করেন। এ ঘরে বুদ্ধ, চৈতন্য,

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ছবি ত আছেই তাছাড়া খ্রীষ্ট, জরথস্ত্রু প্রভৃতি বিদেশীয় ধর্ম্মগুরুদের ছবিও

গাছের তলায় ক্লাশ হচ্ছে। মাঝে অধ্যাপক, দুইপাশে ছাত্র

আছে। মহম্মদের ছবি ভয়ে রাখা হয়নি পাছে একটা কাণ্ড বেধে বসে। এই যে সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব এটা আমাদের কাছে ভাল বলে বোধ হল—বিশেষতঃ আজকালকার দিনে। প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য ছাড়া বিলাসের দ্রব্য কোথাও দেখলাম না। অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেরই অতি সাধারণ খদ্দরের বসন। আশ্রমের পরিচ্ছদ পীতবাস।

আশ্রমে বিদ্যালয়ের সংলগ্ন আরও কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আছে। প্রথম সেবাসঙ্ঘ দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়। এখানে বৎসরে প্রায় ৭০০০ দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়, সাধারণ পাঠাগার; এখানে প্রায় তিন হাজার ভাল ভাল বই ও প্রয়োজনীয় মাসিক পত্রাদি আছে। তৃতীয়, মধ্যইংরাজী ও উচ্চ

একদল লাঠি খেলোয়াড় ছাত্র

ংরাজী বিদ্যালয়; এখানে বাহিরের প্রায় ১২০ জন স্থানীয় লক শিক্ষা পায়। চতুর্থ, স্থানীয় আদিম জাতিগণের (যথা সাঁওতাল) অবৈতনিক দৈনিক ও নৈশ বিদ্যালয়; এখানে এই সকল নিরক্ষর জাতিগণকে সাধারণ লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুনন, লাঠি খেলা ইত্যাদিও শিখান হয়।

বর্ত্তমানে এই ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের দুইটী মাত্র শাখা আছে। একটী মানভূমে পুরুলিয়ার কাছে হুটমুড়ায়, অপরটী দেওঘরে রিখিয়াতে। ষোল বৎসরের মধ্যে এই আশ্রম থেকে অনেকে প্রকৃত মানুষ হয়ে বেরিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইউরোপে গেছেন, কতক দেশের কল্যাণকর কাজে যোগদান করেছেন, আর কতক ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ব্রহ্মচর্য্যসঙ্ঘের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইংরাজি ১৯২৮ সালে যে যতীন শূর নিরীহ কলিকাতাবাসিদের জীবনরক্ষার্থে নিজের জীবন দান করে অমর হয়েছেন তাঁরও শিক্ষা এই ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ে। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আচার্য্য স্বামী যোগানন্দ আজ দশ

আশ্রম বাড়ীর মধ্যে একখানি ঘরের একপাশের দৃশ্য

বৎসর যাবৎ আমেরিকায় যোগদা সৎসঙ্গসভার পক্ষে ধর্ম্ম ও যোগ শিক্ষার প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। স্বামী ধীরানন্দ ও ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ব্রহ্মচারী যতীন তাঁর সহকর্ম্মী। ইতিমধ্যে আমেরিকার নানাস্থানে স্বামীজী নাকি পঞ্চাশটী শিক্ষাকেন্দ্র খুলতে সমর্থ হয়েছেন। এ কম গৌরবের কথা নয়।

দেশপূজ্য অনেক মহাত্মা এই ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় পরিদর্শন করে বহু প্রশংসা করে গেছেন। বর্ত্তমানে দানবীর স্বর্গীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অভাবে ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এরূপ একটী প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের দিকে আমরা সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি ও প্রার্থনা করি শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণের সকল চেষ্টা যেন জয়মণ্ডিত হয়।

শ্রীগদাধর সিংহরায়

প্রতিক্রিয়া

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল

বত্রিশ-গড় পরগণা মুখুজ্যেদের জমিদারির মধ্যে মস্ত বড় একটা লাভের সম্পত্তি। কিন্তু এখানকার প্রজারা যেমনি অবস্থাপন্ন তেমনি অবাধ্য, জমিদারকে কোনও প্রকারে ফাঁকি দিতে পারলে তারা কোনও দিনই ছেড়ে কথা কয় না; দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা দিনের পর দিন লেগেই আছে, এবং সব-শুদ্ধ মিলিয়ে অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে লাভের কড়ি সুশাসনের বন্দোবস্তেই নিঃশেষ হয়ে গিয়ে আসলে টান পড়ে।

দুঁদে প্রজা হিসাবে মহিম চাটুয্যের নাম এ পরগণায় বিখ্যাত। জমিদারের সঙ্গে লড়তে হ'লে প্রজারা চাটুয্যে মশায়ের পরামর্শ নইলে চলেনা,—মামলা—মোকদ্দমায় চাটুয্যের তদ্বির উকীল ব্যারিষ্টারকে বিপন্ন করে। পাৎলা রোগা দেহ, বয়স ষাটের কাছাকাছি, উৎসাহ অদম্য, রং শ্যামল, গলায় মোটা পৈতা, গায়ে একটা চাদর, পায়ে চটিজুতা, হাতে প্রায়ই মোটা লাঠি, শুধু তীব্র রোদে একটা জীর্ণ ছাতা,—এই ত' লোকটি, কিন্তু তার নাম এবং প্রতাপ বত্রিশ-গড়ে যেন ভেল্কি খেলে।

সহজেই এই অবস্থা তার ওপর এই পরগণায় সম্প্রতি সরকারী সেটেলমেণ্ট কাজ সুরু হওয়ায় মালিকের দুশ্চিন্তার সীমা নেই। হয়-কে নয় করতে এবং নয়-কে হয় করতে, চাটুয্যের সমান কেউ নেই, এবং সেটেলমেণ্ট বিভাগে এই হয়-নয়ের অপরিসীম অনিশ্চয়তার কথা কারুর অবিদিত নেই।

পুরাণো অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোক নিয়ে কাজ চলা মুস্কিল, সেটেলমেণ্টে সনাতন প্রথা চলেনা, আধুনিক প্রথা এবং কায়দায়, মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করবার কৌশলে অভ্যস্ত লোকের প্রয়োজন। জমিদার ইউনিভার্সিটির উচ্চ-শিক্ষিত যুবক, এ সকল কথা তাঁর জানা ছিল,—সুতরাং এই পরগণার যে নতুন এসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে এলেন, তিনিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিত যুবক, চালাক চতুর, কথাবার্ত্তায় সুপটু, এবং এক-কালে একটা বড় কলেজে স্পোর্টস-এর ক্যাপ্টেন ছিলেন, সুতরাং স্পোর্টস-ম্যানও বটে।

হ্যাট-কোট-টাই শুদ্ধ যে দিন মিঃ সুধীরচন্দ্র ব্যানারজি, বি, এল, এসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার রূপে বত্রিশ-গড় কাছারীতে উদয় হলেন সেদিন অন্ততঃ পুরাণো কর্ম্মচারীদের বুক দুর দুর করে উঠল। মুখে এমনি একটা কাঠিন্য যে শিস্‌ যেন শোনায় রেলের বাঁশির মত কর্কশ, আধখানা করে কাটা গোঁপের মধ্য থেকে লাবণ্যর চেয়ে কঠোরতাই ঝরে বেশী, এবং হাতের ছড়ি যখন ঘোরে তখন মনে হয় তার ভেতর বিলাসের চেয়ে আঘাতই প্রচ্ছন্ন রয়েছে পুরোমাত্রায়।

কাছারীর সন্নিকটে একটি পরিচ্ছন্ন বাংলোয় এসিসট্যাণ্ট বাবুর বাসস্থান ঠিক হ'ল, চারিদিকে নানা ফল-ফুলের গাছ, এবং গেটের ওপর সতেজ হাসনা-হানা সন্ধ্যায় যখন ফুলে ফুলে ভ'রে ওঠে, তখন অদূরবর্ত্তী তার সুবাস, যেন একটা স্বপ্নের হিল্লোলের মতই অনুভূত হয়।

২

অচিরেই তাঁর নিম্নতন কর্ম্মচারীরা বুঝতে পারলে যে এঁর শাসন-দণ্ড একেবারে অবিমিশ্র লৌহময়, এবং তাদের গোড়াকার সন্দেহ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কথায় কথায় হুমকি, জরিমানা, কঠোর তিরস্কার, অথচ উপায় কি? অভিমান ভরে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবার মত সামর্থ্য কারুর নেই, এবং কাণাঘোষা এ কথাও শোনা গিয়েছে যে মালিক বোধহয় এমনি লোকই চান। এবং এ কথাও শোনা যায় যে এঁর সঙ্গে মালিকের একটা কি দুর সম্পর্কও

আছে। সুতরাং যে অটল আসনে এঁর স্থান, সেখানে মাথা খুঁড়ে মরলেও একমাত্র মাথাই পাবে আঘাত, আসন থাকবে অচল।

সন্ধ্যার সময় তশীলদার শ্যামল চক্রবর্ত্তীর ডাক পড়ল ম্যানেজার বাবুর বাংলোয়।

চক্রবর্ত্তী কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মুখের মোটা চুরুটটা নাবিয়ে এ্যাস-ট্রের ওপর রাখতে তা থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরিয়ে সমস্ত বাতাস যেন ভারী করে দিলে। চক্রবর্ত্তীর বুকের মধ্যে তোলপাড় যেন আরও বেড়ে উঠল।

সুধীর বল্লে, এই মহিম চাটুয্যে লোকটার কথা যা শুনছি তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে আমাদের পরম শত্রু; তাকে শাসন করবার আপনারা কি উপায় করেছেন?

চক্রবর্ত্তী বিনীত ভাবে বল্লে, উপায়ের অনেক চেষ্টা হয়েছে হুজুর, কিন্তু সে লোকটা এমন চতুর—

সুধীর কঠিন হাসি হেসে বল্লে, চতুর! আমাদের এত পাইক, পেয়াদা লোক, লস্কর, তবু তার চাতুর্য্যের নাগাল পেলেন না চক্রবর্ত্তী মশায়, এতদিন ধরে। আর আমি যদি পারি? বলে চুরুটটা মুখে তুলে নিয়ে সবেগে টান দিলে।

চক্রবর্ত্তী হাতযোড় করে বল্লে, পারেন যদি হুজুর ত' এই বত্রিশ-গড়ে সুশৃঙ্খলা ফিরে আসবে, এর আবার সুদিন হবে। শুনেছি বুড়ো কর্ত্তার আমলে অর্থাৎ আমাদের উপস্থিত মালিকের পিতামহের সময়ে, তার যৌবনকালে, মহিম চাটুয্যে ছিল মালিকের শুভ-কামী, সে সময় বত্রিশ-গড় ছিল সোণার রাজ্য। তারপর কি এক কারণে,—

সুধীর বল্লে, পুরাণো কাহিনী শোনবার আমার ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই। আমাদের প্রয়োজন বর্ত্তমান নিয়ে। বুঝেছেন তশীলদার বাবু!

তশীলদার চুপ করেই রইল। এবং বর্ত্তমানে প্রয়োজন ওকে শাসন করা, এমন করে পিষে দেওয়া যে সে আর মাথা তুলতে না পারে। তার জমি—জমা কত?

নিষ্কর জমি বিশ বিঘা আন্দাজ এবং জোত জমি আরও বিশ বিঘা।

সুধীর বল্লে এই নিষ্করের প্রমাণ কি? কোনও দান-পত্র আছে?

তশীলদার বল্লে দেখিনি হুজুর। তবে সে বলে তার কাছে আছে। না থাকলেও তৈরী করতে বেশী সময় লাগবেনা তার, সেটেলমেণ্টের সময়, হয়ত বা এতদিনে তৈরীও হয়ে গিয়ে থাকবে। অপর পক্ষে আমাদের তরফ থেকে কোনও দিন খাজনা আদায়ের কোন প্রমাণ নেই।

সুধীর বল্লে হুঁ। আর জোত জমির খাজনা কতদিনের বাকী?

তশীলদার বল্লে, বছর চারেকের কাছাকাছি। নালিশ না হলে সে দেয় না, এবং ডিক্রি হলেও বছর দু তিন এ-আদালত সে-আদালত ঘোরা-ফিরি করে আমাদের যা আদায় হয়, ততদিনে ওর বাবতে খরচের পরিমাণ হয় তার চেয়ে বেশী।

সুধীর হাসতে লাগল, বল্লে, বেশ বেশ! আপনাদের মত আরও গুটিকতক হিতার্থী জুটলে মনিবের আর দেখতে হবেনা—সশরীরে অচিরেই স্বর্গলাভ ঘটবে শুধু বত্রিশ-গড়ের কেন, হাজার বত্রিশ-গড় থাকলেও সবগুলোর এক—গাড়েই।

এর জবাব দেওয়া চলেনা।

সোজা হয়ে চেয়ারের উপর বসে সুধীর বল্লে, দেখুন তশীলদার বাবু, যা বলি তা শুনুন। কাল সকালে যোবে চোবে পাঁড়ে এই রকম ষণ্ডা ষণ্ডা জন চারেক পেয়াদা পাঠিয়ে দেবেন, খাজনার তাগাদায়। যদি না দেয়, আর দেবেনা বলেই মনে হয়,—তাকে যেমন করে পারে ধরে নিয়ে আসবে। আর ঐ নিষ্কর জমির বছর চারেক আগেকার গোটা চার রসিদ ঠিক করে রাখবেন, তাতে ওর আঙ্গুলের টিপ নিতে হবে। ঘোচাচ্ছি আমি ওর নিষ্কর, তার সঙ্গে সঙ্গে ওর বদ্‌মায়েসি। নিষ্কর জমির খাজনা ঠিক করে হিসাব করবেন ওর জোতের রেটে। বুঝলেন।

চক্রবর্ত্তী খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লেন হুজুরের যা হুকুম। কিন্তু—ব'লে একটা ঢোক গিলে বল্লেন—হুজুর যতটা সহজ ভেবেছেন হয়ত' অত সহজে হবে না, ও-লোকটা অত্যন্ত ধড়িবাজ ট্যাঁড়া লোক, শেষ পর্য্যন্ত একটা মামলা

মোকদ্দমা না বাধিয়ে তোলে, আর ওর লোক-বলও কম নয় হুজুর।

সুধীর উষ্মা প্রকাশ করে বল্লে, সে কথা আপনার ভাববার দরকার নেই, তশীলদার মশাই। সে ভাবনা রইল আমার। অহরহ মামলার ভয় করতে গেলে জমিদারী চলেনা, যারা করে তাদের বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে সংসার ত্যাগ করে চলে যাওয়াই শ্রেয়।

৩

দোবে চৌবে-রা তাদের কায ঠিক মতই করেছিল,—খুব সকালেই মহিম চাটুয্যেকে ধ'রে এনেছিল কাছারী বাড়ীতে। কাযটা অতি প্রত্যূষে সমাধা করাতে হাঙ্গাম বাধতে পারেনি কিছুই। এবং এমন বেশী দূরও নয়, মহিম চাটুয্যের বাড়ী কাছারী থেকে ক্রোশ খানেকের মধ্যেই।

সুধীর অত্যন্ত ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করলে, মহিম চাটুয্যে তোমারই নাম?

মহিম একটুখানি কেশে জবাব দিলে, আমার স্বর্গগত পিতা ঐ নামই রেখেছিলেন এ অধীনের, সুতরাং ঐটেই আমার নাম বলতে হবে বৈ কি।

কথার বাঁধুনীতে সুধীর প্রায় মুগ্ধ হবার মত হ'ল। কিন্তু এটাও বুঝতে দেরী হ'লনা, যে লোকটার সামান্য কথাও এমন বাঁকা, তার প্রকৃতি জলের মত সরল নয়।

মহিমই কথা কইলে আবার। বল্লে ভোর না হতেই নিয়ে এসেছে আপনার পাইক-পেয়াদারা। কোন কাজই হয়নি। আমাকে যে কাযে ডাকা হয়েছে সেটা যদি একটু চটপট সেরে নেন্—ত' ফিরে গিয়ে কাযগুলো করতে পারি।

সুধীর বল্লে, দেরী করবার ইচ্ছে আমারও নেই, চাটুয্যে মশাই, মিনিট পনরর কাজ হবে সব শুদ্ধ, শেষ করে দিলেই আপনার ছুটি। প্রথম কায হচ্ছে জোতের খাজনার বাকী টাকাটা পরিশোধ করা। ইচ্ছে থাকলে এতে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগ্‌বে না।

চাটুয্যে বল্লে অনেক দিনের পুরাণো প্রজা আমি মালিকদের, এবং বরাবর খাজনা আদায় করেই প্রজাসত্ত্ব বাহাল রেখেছি, নইলে—যে সব আইন কানুন, সাধ্য কি একমুহূর্ত্ত তিষ্ঠতে পারি। সুতরাং ও আপনাদের যেমন করে হ'ক আদায় হবেই—ওর জন্য এত সকালে পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে হাঙ্গাম করবার কি দরকার ছিল, ম্যানেজার বাবু? টাকা ত' এমন জিনিষ নয় যে চাইলেই সহসা হাতে এসে পড়বে,—তার যোগাড় চাই, ব্যবস্থা চাই, সুতরাং হঠাৎ সকালে উঠে যদি একরাশ টাকার ফরমায়েস ক'রে বসেন ত' দিই কোথা থেকে বলুন ত'? বিশেষ যে টাকাটা আপনাদের কিছুতেই মারা পড়বেনা, তার জন্যে এত চিন্তার আপনাদেরই বা কি দরকার এবং আমাকেই বা এ দুঃখ দেবার প্রয়োজন কি? ও-তো আসবে একদিন নিশ্চয়ই!

সুধীর বল্লে, কথার চেয়ে আরও বেশী কিছু পাবার জন্যেই আজ সকালে পাইক-পেয়াদার অভিযান তা যদি বুঝতে না পেরে থাক ত' তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করবনা চাটুয্যে। তোমার কথার চাতুরীতে দিনের পর দিন ভুলে থাকবার মত লোক দুনিয়ায় সবাই নয়। প্রথম কায বলেছি, খাজনার টাকা আদায় করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তোমার বাঁ আঙুলের গোটা-চারেক টিপ্ সই দেওয়া, এই হলেই তোমার ছুটি।

চাটুয্যে হাসতে লাগল, বল্লে, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ সই যে কোনও দিন দিই নি এমন কথা বলবনা, কিন্তু সে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। জমিদারের কাছারী বাড়ীতে ও জিনিষটা দেবার আজ পর্য্যন্ত সুবিধে হয়নি, বাঁড়ুয্যে মশাই, সুতরাং ও-কাযটাও আপাততঃ মুলতুবি থাকবে।

সুধীর দৃঢ়-কণ্ঠে বল্লে, মুলতুবি কোনটাই থাকবে না চাটুয্যে। সহজে না হয়, ওই পাইক-পেয়াদা আর তাদের একশো রকমের পদ্ধতি আছে—আর ঐ কাছারী-বাড়ীর হাজতখানা আছে। বুঝেছ?

চাটুয্যে বল্লে, তা আর বুঝিনি? এই বয়সে কত রকম পদ্ধতিই দেখলাম, সে সব আরও ওস্তাদি হাতের বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনার পাইক-পেয়াদাদের মত শিক্ষানবিশের নয়। আর কত হাজত ঘরই দেখেছি, কিন্তু এখনও ত' দেহে প্রাণটা টিকে আছে! তারপর যখন এই সব পদ্ধতি টদ্ধতির প্রতিক্রিয়া সুরু হয় তখন কত ম্যানেজার তশীলদারকে প্রচণ্ড রকমের হিমসিম খেতেও ত' দেখলাম্।

সুধীর বল্লে বেঁচে থাকলে মানুষের দেখার অন্ত থাকেনা, আজও না হয় দু' একটা দেখে নাও চাটুয্যে।

চাটুয্যে বল্লে, মন্দ কি ?

৪

বিকেল বেলার দিকে কাছারী বাড়ীতে হৈ হৈ কাণ্ড। জন পনর প্রজা চাটুয্যের এই সংবাদ পেয়ে, লাঠি নিয়ে উপস্থিত এবং কাছারী বাড়ীর দোরে চোবেরাও সশস্ত্র। এ সংবাদ প্রজারা পায় চাটুয্যের মেয়ে কিশোরীর কাছে,—বেলা যখন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে তখনও চাটুয্যে ফেরে না দেখে কিশোরী গিয়ে প্রতিবেশীদের সংবাদ দেয়। অত্যন্ত উৎকণ্ঠার বশে একটা গরুর গাড়ী ক'রে কিশোরীও এসেছে—ছই-এর উপর কম্বল ফেলা—তার মধ্যে এই মেয়েটি চিন্তিত সন্ত্রস্ত চিত্তে অপেক্ষা করছে। হাজত ঘরের মধ্য থেকে চাটুয্যের গর্জ্জন মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

প্রজারা এসে ম্যানেজার বাবুর কাছে চাটুয্যের মুক্তি প্রার্থনা করলে।

ম্যানেজার সুধীর বল্লে, ওর ছুটো কায করবার আছে, সেই ছুটো করে দিলেই ওর রেহাই। এ কথা ওকে সকালেই বলেছি। এখনও বলছি। নইলে ওকে আটকে রেখে আমার কোনও লাভ নেই।

হাজত-ঘর থেকে গর্জ্জন শোনা গেল, দেখি না কতদিন রাখতে পারে।

প্রজারা বল্লে সে-ছুটো কায কি জানতে পারলে আমরাই না হয় ওনার জন্তে করে দি হুজুর।

সুধীর হাসবার মত করে বল্লে, একটা কায তোমরা ইচ্ছে করলেই করতে পার, ওর চার বছরের বাকী খাজনা সুদ গুণে দেওয়া। আর একটা যে কায সে তোমাদের দ্বারা হবে না ত', খাস চাটুয্যেরই দরকার। আর হলেও লাঠি সোটা নিয়ে মালিকের কাছারীতে হামলা করার সঙ্গে এ-ও ঠিক খাপ খায় না! তোমাদের চেহারা আর ভাব দেখে তোমরা যে মালিকের কায করবার জন্তেই এখানে ছুটে এসেছ অমনটি ত' ঠিক মনে হচ্ছে না!

তারা বল্লে, আমাদের দ্বারা নাই যদি হয় তবুও আমরা চাটুয্যেকে চাই।

সুধীর বল্লে, হরকিষণ দোবে, রাম-বালক চৌবে তোমরা তোয়ের হও। চক্রবর্ত্তী আমার বন্দুকটা নিয়ে এস,—কাছারী বাড়ীতে কতকগুলো ন্যাংটা প্রজা এসে চোখ রাঙাবে বত্রিশ-গড়ের আর সেদিন নেই ওরা বুঝুক। হয়ে যাক ইস্‌পার কি উস্‌পার।

ছিদাম পরমাণিক বল্লে আমরাও জান দিতে তোয়ের—ভাইরা সব ভাঙো হাজত-ঘর।

তারপর এমনি একটা ভীষণ কলরবে কাছারী বাড়ী ভ'রে উঠল যে ব্যস্ত হয়ে চাটুয্যের মেয়ে কিশোরী গাড়ী থেকে নেমে পড়ে চীৎকার ক'রে উঠল ছিদাম-দা, ছিদাম-দা, দোহাই তোমাদের, বলে সে কেঁদে ফেললে।

ভেতর থেকে ছিদামের উন্মত্ত কণ্ঠের আওয়াজ এল, কিশোরী ফিরে যা, আজ ইস্‌পার কি উস্‌পার।

ভেতরে যখন এই তাণ্ডব তখন বাইরে ইষ্টিশনের পথ বেয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল একটা গরুর গাড়ী, এবং তার ভেতর থেকে একজন ছিপ্‌ছিপে গৌরবর্ণ সুদর্শন পুরুষ নামতেই অনন্যোপায় কিশোরী গিয়ে তার পায়ের কাছে পড়ে কেঁদে উঠল—দোহাই আপনার, রক্ষা করুন।

অতিশয় বিস্ময়ের চিহ্ন যুবকটির চোখে মুখে পরিস্ফুট, বল্লে, এ সব কি—এ কিসের হল্লা ?

মেয়েটি বল্লে বাবাকে ধরে এনেছে ওরা, তারি জন্তে এই হাঙ্গামা।

আপনার বাবা ? কে তিনি ?

মহিম চাটুয্যে।

মুহূর্ত্তের জন্ত ভেবে নিয়ে যুবকটী বল্লে, আচ্ছা ভয় নেই। কিন্তু এ সব হাঙ্গামে আপনি কেন ? গাড়ীতে গিয়ে বসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে এখন। চলতে পারছেন না—আচ্ছা আমি উঠিয়ে দিচ্ছি। বলে তার হাত ধরে তাকে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে যুবকটি কাছারী বাড়ীতে ঢুকল।

তখন সেখানে হৈ হৈ কাণ্ড। কে কাকে দেখে—! বন্দুকের গর্জ্জন শোনা যায় নি বটে কিন্তু লাঠি যে নিশ্চেষ্ট ছিল না তা সহজেই বোঝা যায়।

হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ হ'ল, থাম! দু দলের লোকেরই যার ওপর সমবেত দৃষ্টি পড়ল, সেই এই নবাগত যুবকটি। মুহূর্ত্তে যেন ভেল্কি খেলে গেল, দোবে চোবে এবং পরমাণিকের দল, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, এবং উভয় পক্ষই আভূমি প্রণাম করে নবাগতকে সম্মান প্রদর্শন করলে।

যুবক জিজ্ঞাসা করলে তোমাদের হয়েছে কি—কাছারী বাড়ীতে চড়াও করে বিকাল বেলা খামখা এ লড়ালড়ি!

কেউ কেউ চিনত এবং যারা চিনত না তারাও বুঝতে পারলে যে এই সৌম্যমূর্ত্তি যুবকটি তাদেরই বত্রিশ-গড়ের মালিক সুরেশ মুখুজ্জে।

ছিদাম প্রণাম করে বল্লে, হুজুর মহিম চাটুয্যেকে আজ সকাল থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে ওই হাজত ঘরে, কিছুতেই ছাড়া হয়নি, তাকেই ছড়াতে এসেছি আমরা।

সুরেশ বল্লে সকাল থেকে মহিম চাটুয্যে মশায়কে? কেন? চক্রবর্ত্তী মশায় এখনই মুক্ত করুন।

মুক্ত হয়ে এসে মহিম চাটুয্যে পিট দেখিয়ে বল্লে দেখছেন, এখনও দাগড়া দাগড়া দাগ, কাঁচা হাতের কায কি না! কিন্তু মহিম চাটুয্যে বসে থাকবার লোক নয়,—চল্লো থানা-পুলিশ করতে। তার-পর বে-আইনী আটক এই সমস্ত দিন ধ'রে!

সুরেশ বল্লে, থানা-পুলিশ আর কাছারীর দরজা ত' খোলা আছেই চাটুয্যে মশায়,—সে সম্প্রতি বন্ধ হচ্ছে না। অনেক বারই গিয়েছেন সে সব জায়গায় আর একবার না হয় যাবেন। কিন্তু তার আগে একটি কায না করলে ত' ছাড়ছি না, চাটুয্যে মশাই।

চাটুয্যে বল্লে, কি কায শুনি!

সুরেশ বল্লে, সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই। বাকী যে সব ব্যাপার তার জন্যে থানা পুলিশ আছে—সেইখানেই বোঝা-পড়া হবে। কিন্তু আমার তরফ থেকে আপনাকে ধরে এনে সমস্ত দিনটা উপোসী রেখে, অমনি মুখে চলে যেতে দেওয়া এ ত' চলবেনা, এ যে আমাদের একেবারে নিজস্ব ব্যাপার, থানা-পুলিশের এলাকার বাইরে!

ইতিপূর্ব্বে চাটুয্যে তাদের যুবক জমিদারকে কোনও দিন চাক্ষুষ দেখেনি, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিল তার সঙ্গে ত একটুও খাপ খায় না। সুরসিক, সৌম্যদর্শন যুবক, চাটুয্যের মত কঠিন লোকেরও মন ভেজে! চাটুয্যে বল্লে, কিন্তু সমস্ত দিনটা ধরে যে বে-ইজ্জতি গেল এই দেহটার ওপর, তার সঙ্গে এই কাছারী বাড়ীতে বসে আপনার নেমন্তন্ন খাওয়া, এ কি ঠিক মিল খাবে মনে হয়?

সুরেশ হাসলে, বল্লে, মিল খাওয়া না খাওয়ার কোনও হদিস্ই আজ পর্য্যন্ত পেলাম না চাটুয্যে মশায়। ও খাওয়ালেই খায়, আর কিছুতেই খাওয়াব না প্রতিজ্ঞা করে বসলে খাবে কি করে বলুন? অথচ মিলেতেই লাভ, লড়ালড়ি করে না আছে স্বস্তি না আছে সুখ। আমার বয়স যদিচ ঢের নয়, তবুও এই অভিজ্ঞতাটাকেই আমি সত্য অভিজ্ঞতা বলে মনে করি। আমি আপনার লড়বার পথ বন্ধ করছি না, শুধুমাত্র অনুরোধ কিছু খেয়ে যাবার, আর আপনার উপযোগী খাবার যথেষ্ট সঙ্গে আছে,—কলকাতার ভাল সন্দেশ রসগোল্লা এবং ফলমূল। ব্যবস্থা থাকবে চক্রবর্ত্তীর হাতে, যাঁর নিষ্ঠা সম্বন্ধে বোধ করি আপনারও কোনও সন্দেহ নেই।

চাটুয্যে ঘাড় নেড়ে বল্লে, তা ত' নেই। সুরেশ চক্রবর্ত্তীর দিকে ফিরে বল্লে, গাড়ীতেই সব-গুলো রয়ে গেছে, যা এখানে মল্ল-যুদ্ধ বাধিয়ে ছিলেন আপনারা ভুলেই গিয়েছিলাম ও-গুলোর কথা। ও-গুলো আনিয়ে নিন্। আর চাটুয্যে মশাইকে খাওয়ানর ভার আপনার ওপর। চাটুয্যে মশায়ের মেয়েও আছেন এইখানে গাড়ীর ভিতরে, সমস্ত দিন উৎকণ্ঠায় তাঁরও খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই, আপনার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁকেও খাইয়ে দিন। আর ছিদাম্—

ছিদাম হাত-যোড় করে বল্লে হুজুর! সুরেশ বল্লে, অনেক-ক্ষণ ধরে লড়ালড়ির আয়োজনে আর কস্তাকস্তিতে তোমাদেরও খিদে পাবার কথা। খুব ভাল আলো চিঁড়ে আছে, যা তোমরা এদিকে দেখতে পাওনা। দই আর চিনি দিয়ে চলবে না, কলকাতার দু' একটা সন্দেশ রসগোল্লার সঙ্গে?

স্মিত হাস্যে ছিদাম বল্লে, খুব চলবে হুজুর! সুরেশ বল্লে কিন্তু আমার দোবে চোবেরাও সমস্ত দিন খাটা-খুটি করেছে, তারাও লড়েনি কম। তোমাদের ঐ আলো চিঁড়ের ভোজে

তাদেরও সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু। মনের কোন-খানটায় যে ধাক্কা লাগল বলা যায় না, ছিদাম এই কথায় একেবারে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

চাটুয্যে বল্লে—কিন্তু,—

সুরেশ হাসলে, বল্লে, দোহাই চাটুয্যে মশায় আর কিন্তু নয়। লড়বেন বলছেন? তা লড়ুননা, সে পথ ত খোলাই রয়েছে, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যা করে এসেছেন তার পথ আমার দুটো কলকাতার সন্দেশ বন্ধ করতে পারবে এ দুরাশা আমিও রাখিনা, আপনিও বা সে আশঙ্কা করবেন কেন? এ সব মেনে নিয়েও একটা সত্য থেকে যায় যাকে অস্বীকার কেউই করতে পারবে না। আমার আপনার মধ্যে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ। বাংলার চিরদিনের মধুর সম্বন্ধ। আমরা লড়েই আসছি এবং হয়ত ভবিষ্যতেও লড়ব, কিন্তু এই সনাতন সম্বন্ধটা অন্ততঃ একঘণ্টার জন্যেও আজ সত্য হতে দিন!

চাটুয্যে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, তার শুষ্ক মন বাঙলার ঐতিহ্যের কি একটা মধুর রসে যেন আর্দ্র হয়ে উঠল, বল্লে, বেশ।

যেখানে মাত্র কিছুক্ষণ আগে ভৈরব রণ-কোলাহল জেগে উঠেছিল, সেখানে অর্দ্ধঘন্টার মধ্যেই পরিতৃপ্ত ভোজনের সম্মিলিত শব্দ এ যেন সত্যই ভেল্কী!

খাওয়া শেষে বিদ্রোহী প্রজার দল গড় করে সুরেশকে প্রণাম করে ফিরল। ব্যাপারটার এমনি প্রীতিকর পরিণামে চাটুয্যে ছাড়া সবারই মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন পরিস্ফুট। চাটুয্যেকে খানিকটা এগিয়ে দিতে গিয়ে কিশোরীর গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে সুরেশ বল্লে, অন্ততঃ আজকের এই ব্যাপার থেকে আপনার বাবাকে উদ্ধার করে এনেছি, এর আনন্দ আমি গোপন করব না।

ছই-এর ওপর কম্বল খানিকটা ওঠান—সেইখানে বসে কিশোরী দেখছিল এই আশ্চর্য্য ব্যাপার। অস্তমান সূর্য্যের তামাটে কিরণ তার গৌরবর্ণ মুখে প'ড়ে তাকে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দিয়েছিল। নিটোল সুন্দর দেহ, ভাসা-ভাসা চোখ, কোঁকড়া চুলের দু' একটা গুচ্ছ হাওয়ায় উড়ে পড়েছিল তার কপালে। দৃষ্টি মধুর, গভীর,—অবাধ আকাশের দিকে, পৃথিবীর ধুলামাটির বহু উর্দ্ধে, যেন কোন স্বপ্ন-রাজ্যে! মুখে স্নিগ্ধ স্মিত-হাস্য।

সুরেশের কথায় তার দৃষ্টি নেমে এল স্বপ্ন-লোক থেকে, কিন্তু তখনও স্বপ্ন-লোকের মাধুর্য্যে ভরা। পদ্মের মত টলটল করছে, সুষমায় পূর্ণ। সুরেশের মনে হ'ল এমন চোখ সে আজ পর্য্যন্ত দেখেনি,—এমনি শান্ত, স্নিগ্ধ, সুগভীর! মনে হ'ল তাদের অদৃশ্য স্পর্শ যেন তার শরীরকে জুড়িয়ে দিলে।

কিশোরী কিছুই বল্লেনা, শুধু একটু হেসে দুই হাত জোড় করে সুরেশকে প্রণাম করলে। কৃতজ্ঞতার প্রসন্ন হাসি!

গাড়ী যখন পশ্চাতে দীর্ঘ ছায়া ফেলে অনেক দূর চলে গেছে তখনও সুরেশ দাঁড়িয়ে। যখন বাঁকের পথে আর দেখা গেল না, তখন সহসা তার মনে পড়ল যে সে প্রয়োজনের ঢের বেশীই দাঁড়িয়ে আছে।

* * * *

সুধীর জীবনে এত বড় আঘাত এবং অপমান কোনও দিনই পায়নি—তারই জ্বালা আজ বিকাল থেকে যেন তাকে দগ্ধ করছিল। বহু চিন্তা এবং গবেষণা করে সে আজ যে আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল, এক-মুহূর্ত্তে সুরেশের ইন্দ্রজাল তাকে যে শুধু নিবিয়ে দিলে তা নয়, দুই যুদ্ধমান দলের মধ্যে অপূর্ব্ব সখ্য স্থাপন করলে। কি আশ্চর্য্য কুশলী এই লোকটি,—তার কাছে নিজেকে অত্যন্ত কদর্য্য অশোভন মনে হতে লাগল। এই একদল আমলার সামনে।

সন্ধ্যার পর দেখা। আম্‌তা আমতা করে সুধীর বল্লে, আশ্চর্য্য পলিসি আপনার কিন্তু।

সুরেশ বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাইলে, বল্লে, পলিসি! পলিসি বলছ কাকে?

জবাব দেওয়া আরও শক্ত। বল্লে এই যে ভাবে মিটিয়ে দিলেন।

সুরেশ বল্লে, সুধীর পলিসি আমি একটিমাত্রই জানি, সে অনেষ্টি, সোজা সরল পথে চলা। তুমি যে, পলিসির কথা বলছ সে হয়ত তা নয়। আমি সে পেঁচাল পলিসির মর্ম্ম বুঝিনা। আমি এসেই বুঝতে পারলাম, যে অন্যায় হয়েছে ষোল আনা আমাদের। একটা লোককে ধরে এনে

ঘরে বন্ধ করে রাখবার আমাদের অধিকার নেই। তার-পর খাজনা আদায়? তার জন্তে দাবী করতে পার, চাইতে পার, তারপর ত' আদালত খোলা। জানি যে সে সোজা পথ নয়, কিন্তু ওর চেয়ে সোজা পথ আবিষ্কার করতে গেলে দেখা যায় যে সে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়েছে বহু-দীর্ঘ আর বহু বিপদ-সঙ্কুল। আর নিষ্কর জমিকে সকর প্রমাণ করবার তোমার যে চেষ্টা ওর মধ্যে আমার একটুও সায় নেই। হ'তে পারে চাটুয্যে ভয়ানক পাজী লোক, কিন্তু তাকে জব্দ করবার ত ও উপায় নয়, ওতে জব্দ হব সবচেয়ে বেশী আমরাই, প্রথমতঃ সত্যকে ছেড়ে মিথ্যাবাদী হয়ে, এবং দ্বিতীয়তঃ সঙ্গে সঙ্গে থানা-পুলিশ এবং ফৌজদারীর বিপুল পাকে পড়ে, অর্থে, অনর্থে, এবং সম্মান ও সুনামে মস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে।

সুধীর বল্লে, কিন্তু জমিদারী চালাতে গেলে ত' এ-সবের দরকার।

সুরেশ বল্লে জমিদারী আমি ঢের দিন চালাই নি, সুতরাং তার সম্বন্ধে এমন চূড়ান্ত কথা হয়ত বলতে পারব না, যা দশজনে নির্ব্বিবাদে মেনে নেবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে জমিদারী একটা সৃষ্টি ছাড়া কারখানা নয়, দুনিয়ায় এমনি যদি নিয়ম হয় যে সোজা সরল পথই উৎকৃষ্ট ত' জমিদারী সম্বন্ধেও তাকে খাটতেই হবে, সুধীর। কোনও ক্ষেত্রে যদি না খাটে মনে হয়, ত' সে বিশেষ ক্ষেত্রে বরং জমিদারী অচল হওয়া ঢের ভাল, কিন্তু জমিদারীর দোহাই দিয়ে নিজেদের অচল হওয়া কোন কাযের কথাই নয়।

সুধীর বল্লে, কিন্তু কড়া শাসন নইলে চলে কি করে?

সুরেশ হাসলে, বল্লে, এই অতি-কূট-নীতি সম্বন্ধেও আমার বিদ্যে যে অগাধ নয়, তা আমি মুক্তকণ্ঠে বলব। কিন্তু আমার চারিদিকে চোখের ওপর যে আশ্চর্য্য শাসনের পরিচয় প্রতিনিয়তই পাচ্ছি সে ত' নিছক কড়া নয় সুধীর। দুর্দ্দান্ত গ্রীষ্ম আসে বছরে মাত্র একবার, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় সত্যি, কিন্তু তারপর তার চেয়ে ঢের বেশী ক'রে এলো বাকী ঋতুরা,—বর্ষা এলো তার অগাধ স্নিগ্ধ সিঞ্চন নিয়ে, শরৎ এলো তার সুষমা-সম্ভার নিয়ে, শীত এলো তার শীতলতা নিয়ে, হেমন্ত এলো তার মাধুর্য্য নিয়ে এবং বসন্ত এলো তার ফল-ফুলগানের অপূর্ব্ব বিভব নিয়ে! একবার প্রচণ্ড আসে বলে তার প্রতিষেধের এত বিস্ময়কর আয়োজন! যে নিছক কড়া কোনও দিনই সত্যি হয়ে উঠল না কোটি-যুগ-ব্যাপী বিধাতৃ বিধানে, তাকে কেমন করে স্বীকার করে নেবো বল? মিঠে এবং কড়া দুই পাশাপাশি, কিন্তু কড়ার চেয়ে মিঠের পরিমাণ ঢের বেশী, তবেই ত' শাসনের চাকা চলে নির্ব্বিঘ্নে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই।

সুধীর কি বলবে খুঁজে পেলেনা, অথচ কিছু একটা বলা চাই। তাই খানিকটা ভেবে বল্লে, শেষের দিকটা মিঠের পরিবেশন যে-রকম সুপ্রচুর হ'ল, যায় কলকাতার সন্দেশ রসগোল্লা, তাতে মনে হচ্ছে ও-লোকটা বিশেষ রকম মুগ্ধ হয়ে গেছে।

সুরেশ বল্লে, সুধীর, ও লোকটাকে ভাল করে চিনতে পারাও শক্ত। ওর পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস দুটো রসগোল্লা বদলে দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস নেই, থানা-পুলিশ ফৌজদারী যদি ও না করে ত' তার কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে, এবং যদি করে ত' কিছুমাত্র বিস্মিত হয়োনা,—এমন কি আমাদের বোধ করি তার জন্তে প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভাল।

সুধীর শুকনো মুখে সুরেশের দিকে চাইলে।

৫

সুরেশের অনুমান যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ পেতে বেশী দেরী হলনা। ফৌজদারী থেকে সমন এলো মহিম চাটুয্যে বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে সুধীর থেকে সুরু করে দোবে, চোবে কেউ বাদ পড়েনি, এমন কি কৌশল করে তার ভিতরে সুরেশকেও জড়ান হয়েছে। অপরাধের ফর্দে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অত্যন্ত সঙ্গীন ধারাগুলো মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে।

সংবাদ পেয়ে সুরেশ কলকাতা থেকে এসে পৌঁছল বিকালের ঠিক সেই সময়টিতে।

এসে দেখলে সুধীরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

সুরেশ হাসলে, বল্লে ভয় পেয়ে কোন লাভ নেই সুধীর। বিষ-বৃক্ষের ফল ধরেছে; আর সে বৃক্ষ তোমার স্বহস্তে

পোঁতা। এত সহজে ও-সব কঠিন লোককে আয়ত্ত করতে পারা যায় না, বিশেষ এমন পদ্ধতিতে যাতে আমাদেরই গলদ রয়ে গেল এক শো। ওদের জব্দ করবার প্রথা বিভিন্ন,—ক্ষিপ্র এবং গোপন, হাঁক ডাক করে পঞ্চাশটা পাইক পেয়াদা পাঠিয়ে সোর গোল ক'রে নয়। যদি ও-পথের আশ্রয় নিতে হয়, তা হলে শঠে শাঠ্যং। দেখছ, রসগোল্লা সন্দেশ ও বেশ নির্ব্বিবাদে হজম করেছে। ওগুলো হয়ত' তোমার আমার গলায় বাধে কিন্তু ও শ্রেণীর লোকের নয়। যা হক এইবার পূর্ণ উদ্যমে নেমে পড়া যাক রণক্ষেত্রে,—এ কথা ঠিক যে উকীল কৌঁসিলিতে ও আমাদের সঙ্গে পারবে না; এবং সন্দেশ খেতে যে একদিন দেরী ক'রে ফেলেছে, মাত্র সেইটুকুই আমাদের কলকাতার মিষ্টান্নের বাহাদুরী।

তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বল্লে, বাঃ কথায় কথায় ভুলেই যাচ্ছিলাম,—দোবে রতনকে বলো ত' কালো ঘোড়াটা চট্ করে সাজিয়ে নিয়ে আসুক আর দেও ত' আমার বন্দুকটা ততক্ষণে সাফ্ করে নি। বিকালের দিকে এ সময় বত্রিশ-গড়ের জঙ্গলের ওধারে চরে যে রকম পাখীর মেলা, তা কয়েকবার দেখে এসেছি; কলকাতা থেকে মনে করে আসছি আজ শীকারে বেরোতে হবে কিন্তু কথায় কথায় ভুলে যাচ্ছিলাম। নেও চট্-পট করো।

বলে অবিলম্বে বেরিয়ে পড়ল সুরেশ।

সুগ্রীব গোমড়া মুখ করে নিজের ঘরে গিয়ে বসল, চাটুয্যের আচরণে মন অবসন্ন। অথচ এই সুরেশ লোকটি নির্ব্বিকার, কিছুই গায়ে মাখতে চায়না, সে যত বড় বিপদই হ'ক না। ফৌজদারীর খবর পেয়ে সে কলকাতা থেকে এল বটে, কিন্তু সাজ সরঞ্জাম ক'রে বেরোলো শীকার করতে! আশ্চর্য্য মানুষ!

সন্ধ্যামুখে হঠাৎ দিক-চক্র পাঁশুটে বর্ণ ধারণ করলে, পাখীরা চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করে তীরের মত উড়তে লাগল এবং দেখতে দেখতে ধুলা-বালি-খড়-কুটি উড়িয়ে এক প্রচণ্ড ব্যাত্যা আচ্ছন্ন করলে দিগ্বিদিক।

চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত চিন্তিত হ'ল মালিকের জন্য। এই ঝড়ের মুখে চর এবং জঙ্গলে একাকী তিনি, সঙ্গে একটি লোকও নেননি। অথচ এই ঝড়ে বেরোনোও ত' অসম্ভব। অগত্যা আকাশের দিকে চেয়ে দুর্গা-নাম করতে লাগল এবং দোবে-চোবেদের বলে রাখলে যে ঝড় একটু কমলেই বেরোতে হবে মালিকের সন্ধানে।

* * *

বাইরে ঝড় কমেছে বটে, কিন্তু বিপুল বৃষ্টি এবং মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মেঘ-গর্জ্জন। ঘরের ভেতর একটা স্তিমিত প্রদীপ জ্বলছে, তার কাছে বসে কিশোরী। চাটুয্যে আজ মামলার তদ্বিরে সমস্ত দিন ঘুরে কতকটা ক্লান্ত।

কিশোরী বল্লে, বাবা, শেষ পর্য্যন্ত তুমি ও-দের নামে নালিশ করলে? এত করে খাওয়ালেন ওতে বুঝতে পারলে না যে ওঁরা প্রকারান্তরে ত্রুটি স্বীকার করলেন, তবু তোমার রাগ গেল না?

চাটুয্যে বল্লে, তুই শুনলি কোথা থেকে? কিশোরী বল্লে, এ খবর কি চাপা থাকে, ছিদাম-দার কাছে শুনলাম। নালিশই যদি করবে ত' খেলে কেন? বল্লে না কেন যে আমি তোমাদের সঙ্গে লড়াই করব, তোমাদের এখানে খাব না।

চাটুয্যে টেনে টেনে হাসতে লাগল, বল্লে, বেশ ত' দুই কাযই হ'ল, কলকাতার টাটকা সন্দেশ রসগোল্লা ফলমূল-ও খাওয়া হ'ল, আবার নালিশও চল্লো! এখন তুলোরাম খেলারাম! বাবাজী ভেবেছিলেন দুটো রসগোল্লা খাইয়ে আমাকে ভেড়া বানিয়ে দেবে! বোকা যদি হতাম ত' ও-গুলো ছেড়ে মামলাই লড়তাম, কিন্তু তাতে লাভ? এও হ'ল ও'ও হ'ল—মন্দ কি?

বাপের কথায় কিশোরীর মুখ লাল হয়ে গেল, বল্লে, তোমার কথা ছেড়ে দেও বাবা আমরা বোকা সোকা মানুষ, আমাদের লজ্জা করে!

কথাটার শ্লেষ অনুভব করা শক্ত নয়, চাটুয্যে খানিকটা চুপ্ করে রইল। বল্লে, ছেলেমানুষ তোরা তোদের এ সব কথায় না থাকাই ভাল। থাকত' যদি তোর মা—

সোজা হয়ে বসে কিশোরী বল্লে মা-র কথা বলছ?

থাকতেন যদি তিনি ত' তোমার সাধ্যি কি ছিল বাবা—

এমন সময় বাইরে প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী বস্তু পতনের আওয়াজ এবং তারপর আর্ত্তকণ্ঠের করুণ স্বর, বাবা গো—

চমকে উঠে কিশোরী বল্লে, কি হ'ল? বলে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ছুটলো সেই দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে চল্লো চাটুয্যে।

বাইরে যেন প্রলয় বেধেছে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে, অন্ধকারে দৃষ্টি এক হাতের বেশী চলে না।

সদর দরজার সামনেই যেন মনে হ'ল কে পড়ে রয়েছে। মুখের কাছে লণ্ঠন নিয়ে দেখে, কিশোরী মুহূর্ত্তে চীৎকার করে উঠল, বাবা সুরেশবাবু, জমিদার বাবু।

চাটুয্যে আস্তে আস্তে উঁকি মেরে দেখে বল্লে তাই ত'। তা বেশ ত' হয়েছে—থাক না, মামলা নয় মকদ্দমা নয়, যদি বিনা খরচায় রাস্তায় ওর শেষ হয় তা মন্দ কি?

কিশোরী বল্লে বাবা বল কি? অজ্ঞান হয়ে আছেন, ধর বাবা নইলে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

চাটুয্যে দাঁড়িয়ে রৈল। বল্লে, শত্রুকে আদর করে ঘরে ঢোকাতে পারব না।

কিশোরী বাপের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে, বাবা এ সব কি কথা বলছ তুমি? এত বড় বিপদ,—এ সব কি মানুষের কথা? ধর নিয়ে চল।

চাটুয্যে তীব্র কণ্ঠে বল্লে, না আমি নিয়ে যাব না। ওকে ঘরে আনা চলবে না কিশোরী, আর যদি তুমি আনতে চাও ত' তোমারও আসা চলবে না। আমার ঘর মনে রেখো। আমার হুকুম মনে রেখো।

কিশোরী বল্লে, নাই চলুক। বলে সুরেশের সিক্ত মাথা আপনার কোলের ওপর তুলে নিয়ে ডাকতে লাগল—ছিদাম-দা, ছিদাম-দা।

ছিদাম বেরিয়ে এসে বল্লে এ কিরে কিশোরী? এত ঝড়ে বৃষ্টিতে রাস্তায়, এ্যাঁ ওকে?

কিশোরী বল্লে জমিদার সুরেশবাবু, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

ছিদাম বল্লে, আর চাটুয্যে মশায় দাঁড়িয়ে দেখছে। মানুষটা যে মরে।

কিশোরী কান্নার স্বরে বল্লে, ছিদাম-দা নিয়ে চলো তোমার ঘরে। বাবা ওঁকেও নিয়ে যেতে দেবেন না, আমাকেও ঢুকতে দেবেন না।

একবার অগ্নি-দৃষ্টিতে চাটুয্যের দিকে দেখে ছিদাম চেঁচিয়ে উঠল, ভ্যালা রে মরদের পো। তারপর সুরেশের দেহ আপনার সবল স্কন্ধে তুলে নিয়ে এক-হাতে কিশোরীর হস্ত দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরে বল্লে, আয় আমার ঘরকে।

৬

চেতনা যখন ফিরে এল তখন রাত দশটা বেজে গেছে। দুর্ঘটনা ঘটেছিল এই রূপে। হাওয়ার বেগ কাটিয়ে চর এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সুরেশ নিরাপদে ঢুকেছিল গ্রামে কিন্তু সহসা মহিম চাটুয্যের বাড়ীর সামনে প্রবল বজ্রপাতের শব্দে এবং তীব্র বিদ্যুতের আলোয় ঘোড়া ভড়কে গিয়ে আরোহীকে ফেলে দিয়ে দৌড়ায়। আঘাত তেমন গুরুতর নয়, কিন্তু পড়ার 'শকে' চেতনা বিলুপ্ত হয়।

চেতনা হ'তেই সে চোখ চেয়ে দেখলে কিশোরী তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, মুখে নিরতিশয় উৎকণ্ঠা, ডান হাতে পাখা করছে।

দুই চোখে জল আসবার মত হ'ল এই ভেবে যে সে-দিন সূর্য্য-কিরণের ঝলমলে আলোর মাঝখানে যাকে লেগেছিল ভাল, আজ বিপদের দিনে কেমন করে সেই এলো তার সেবার ভার নিয়ে।

সুরেশ চোখ বুজে ভাবলে। তারপর আবার চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করলে ঘোড়া থেকে পড়েছিলাম সেই অবধি মনে আছে। এ কোথায় আমি?

কিশোরী বল্লে ছিদাম-দার বাড়ীতে।

ছিদাম হাত-যোড় করে এগিয়ে এল। বল্লে বড় ভাবনা হয়েছিল রাজা। কেমন বোধ করছেন এখন?

সুরেশ বল্লে, মন্দ না, কিন্তু গায়ে ভারী ব্যথা। ও-যাবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সে-দিন যে ছিদাম লাঠি নিয়ে মারবার জন্যে তৈরী হয়েছিল সবার আগে, আর যে বোধ করি

সব চেয়ে বড় সাক্ষী হবে আমাদের বিপক্ষে, ভগবান এনে ফেল্লেন তারই বাড়ীতে।

ছিদাম হাত যোড় করে বল্লে, ছিদামের ভাগ্য। ও সাক্ষী টাক্ষীর কথা এখন থাক হুজুর।

খবর পেয়ে সুধীর, চক্রবর্ত্তী এবং পাইক-পেয়াদারা পাল্কী নিয়ে এসেছিল। সেখানকার এক ডাক্তারকেও এনেছিল।

সুধীর বল্লে, ডাক্তার বাবু একবার পরীক্ষা করে দেখতে চান।

সুরেশ বল্লে, করুন। বিশেষ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না, তবে সামান্য ক্ষত টত হয়ে থাকবে।

ডাক্তার বাবু বল্লেন, হাঁ সেগুলো আমি ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছি ইতিপূর্ব্বে। আর একবার ভাল করে দেখতে চাই।

দেখে তিনিও মত দিলেন যে আঘাত গুরু নয়, হপ্তা খানেকের মধ্যে সম্পূর্ণ সেরে উঠবার সম্ভাবনা।

সুধীর বল্লে, আমরা পাল্কী নিয়ে এসেছি ডাক্তার বাবু যদি মত দেন ত কাছারী বাড়ীতে নিয়ে যাই।

সুরেশ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বল্লে, থাক্ না আজ রাতটা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, একটু কমলে দেখা যাবে। ডাক্তার বাবু সায় দিয়ে বল্লেন না আজ রাত্রে ত' নয়ই।

৭

লাগছে মন্দ নয়—জীবনের একটা নূতন অভিজ্ঞতা। এই অপ্রচুর আলো বাতাসের খড়ের ঘর, দেহে আঘাতের ব্যথা, তবু যেন মন্দ নয়। যে কমনীয় কোমল হস্তের সেবা পাচ্ছে সে প্রতিনিয়ত এই বিদেশে দরিদ্রের ঘরে, তার মূল্য নেই, সেই শুধু যে সহনীয় করেছে দেহের বেদনাকে, তা নয়, যেন একটা নেশার মত কিসের ঘোরে আচ্ছন্ন করেছে। সে যে দিন সেরে উঠবে সে-দিনও যেন এই সেবার প্রতীক্ষা শেষ হবে না—জীবনের পথে যত দূর দেখা চলে তার অন্ধি সন্ধি রন্ধ্র-পথ ভ'রে উঠেছে যেন এই সেবার কনক-দীপ্তিতে, নবোদিত সূর্য্যের কমনীয় কিরণের মত!

তিন-দিনের দিন সকালে বাইরে ক্রুদ্ধ চটি-জুতার চটাপট আওয়াজ শোনা গেল, এবং তারপরেই রুষ্ট কণ্ঠের আওয়াজ, কিশোরী, কিশোরী, শীগগির আয় বলছি।

ছিদাম বেরিয়ে এসে জবাব দিলে, বল্লে, কিশোরী যাবে না; মনে নেই তাকে মানা করেছ ঘরে ঢুকতে, নিজের মুখে।

এত বড় জবাব চাটুয্যে বোধ করি ছিদামের কাছে প্রত্যাশা করেনি, তাই সহসা উত্তর খুঁজে না পেয়ে বল্লে, তবে! তবে কি হবে শুনি?

ছিদাম বল্লে, শোনবার দরকার নেই। কিশোরী থাকবে আমার বাড়ীতে, তাকে মাথায় করে রাখব আমার ঘরে যতদিন আমার ভাগ্যে থাকবে। যাকে পেলে রাজার ঘরও আলো হয়, তার কদর বুঝলে না চাটুয্যে, তাকে দিলে তাড়িয়ে?

চাটুয্যে বল্লে সে আমার কথার অবাধ্য হয়েছিল কেন সেই রাগেই ত!

ছিদাম খল খল করে হেসে উঠল, বল্লে, চাটুয্যে তুমি যে মানুষের মতন কথা কওনি, বাঘের মত কথা কয়েছিলে! তাই ত' খুব করেছিল শোনেনি তোমার কথা! একটা মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে তোমার বাড়ীর সামনে, আর যে-সে লোক নয়, আমাদের রাজা, তাকে ঘরে আনতে দেবে না! মানুষের মধ্যে এমন কথা কি কেউ কখনো শুনেছে? তুমি না বামুন, চাটুয্যে? ঘেন্না ধরে গেছে বামুনের ওপর। মানুষ ত' নয় শয়তান। কিশোরী ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তাই রাগে তাকেও দিলে তাড়িয়ে! আবার এখন ফিরে এসেছ,—কিশোরী, কিশোরী,—কেন যাবে কিশোরী তোমার বাড়ী?

চাটুয্যে থ' হয়ে শুনছিল। বল্লে, ছিদাম, এরও উপায় আছে—চল্লাম থানায়।

ছিদাম মুখ বিকৃত করে বল্লে, যাও যাও ঢের দেখেছি থানা-পুলিশ আর তোমার কেরদানি চাটুয্যে। ওই নিয়েই কাটল সারা জীবনটা তোমার, আর মানবের যে গুণ দয়া, ভালবাসা, সব একে একে হারালে। ছিদামকে আর পাবেনা চাটুয্যে! এমন শয়তানের সঙ্গ আর নয়। অনেক পাপ করেছি, কিন্তু সেই দিন কান মলেছি—যে দিন

সেই বিপদের রাত্রে চাটুয্যে হ'ল বাঘ। আর নয় ঠাকুর সরে পড়। তুমি যে থানা-পুলিশ করেছ, তাতেও আর ছিদামকে পাবেনা। এক-পেট কলকেতার সেরা সেরা সন্দেশ রসগোল্লা খেলে যে মনিবের ঘরে বসে পেট ঠেসে তার নামে জোচ্চুরি! ছিদাম গিয়ে বলবে যে চাটুয্যে রসগোল্লা খেয়ে এসে মিথ্যে নালিশ করেছে, আমাদেরও ছিল নেমন্তন্ন, আমরাও পেট ভরে খেয়েছি। দিও না সাক্ষী ছিদামকে, দেখো না সে কি বলে!

শুনে চাটুয্যের কপালে বিন বিন ক'রে ঘাম বেরোতে লাগল, সে উঁচু পৈঠেটায় বসে পড়ে বল্লে, বলিস কি ছিদাম। তুই যে আসল সাক্ষী।

ছিদাম বল্লে, আসল নকল বুঝি না। ছিদামের এক কথা ঠাকুর! ছিদামকে কেন, আর কাউকেই পাবে না। সবাই জানতে পেরেছে যে চাটুয্যে মানুষ নয়, নেকড়ে বাঘ।

চাটুয্যে কথার জবাব দিলে না—হাতের ওপর মাথা রেখে চুপ করে বসে ভাবতে লাগল অনেকক্ষণ। ছিদাম বড় বড় পা ফেলে দুম্ দুম্ করে চলে গেল নিজের কাযে।

মাথা যখন তুললে তখন মুখ হয়ে গেছে পাঁশুটে, কপালের শিরা উঠেছে ফুলে। আজ একে একে সবাইকে হারালে সে। ভাঙা ভারী গলায় ডাকলে, কিশোরী কিশোরী!

কিশোরী বেরিয়ে এসে বল্লে, কি বাবা।

চাটুয্যে বল্লে, যাবিনে বাড়ী?

কিশোরী বল্লে, যাব।

তবে চল।

কিশোরী বল্লে, এখন ত' যেতে পারবনা বাবা। উনি এখনও পুরো সারেন নি, ঠিক মত সেবা করবার লোক ও আর নেই, আমি গেলে হয়ত বেড়ে যাবে। সেরে উঠুন তারপর যাব।

চাটুয্যে কিশোরীর মুখের দিকে চেয়ে রইল অবাক্ হয়ে। তারপর হঠাৎ উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, বল্লে ও হ'ল তোর আমার চেয়ে আপনার লোক, নিমকহারাম মেয়ে!

কিশোরী রাগ করলে না, ভয়ও পেলে না, ব্যস্তও হ'ল না। আস্তে আস্তে মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলে, উনি যে অসুস্থ বাবা।

মুখে বিড়বিড় করে বক্‌তে বক্‌তে চটির চটাপট শব্দ করে তীরের মত দ্রুত চলে গেল চাটুয্যে।

৮

তার পরদিন সকালে আবার চাটুয্যের গলার আওয়াজ, ছিদাম ছিদাম।

ছিদাম বেরিয়ে এসে চমকে উঠল। বল্লে কি হয়েছে তোমার ঠাকুর, চেহারা এমন শুকনো?

চাটুয্যের কণ্ঠস্বরে সে উগ্রতা নেই। বল্লে কেমন আছেন রে বাবু, একবার দেখা হয় না?

ছিদাম বল্লে দেখা হবে না কেন, যেমন রাজা লোক তেমনি রাজার মতন মন, দেশ শুদ্ধ লোক দেখা করছে আর তোমার সঙ্গে হবেনা? কিন্তু তুমি দেখা করবে কোন মুখে চাটুয্যে?

চাটুয্যে শুকনো মুখে চাইলে ছিদামের পানে। বল্লে, ছিদাম, জানিস, কাল গিয়ে মামলা তুলে নিয়েছি।

ছিদাম ভারী আশ্চর্য্য হল, বল্লে বেশ করেছ, কিন্তু সত্যি কি?

চাটুয্যে ছিদামের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রৈল। বিড় বিড় করে বলতে লাগল, কেউ আর বিশ্বাস করেনা সহজে, এমনি হয়েছে। উত্তরে বল্লে, হাঁ সত্যি।

ছিদাম খুসী হয়ে বল্লে এই ত মানুষের মত কায। হাঁ দেখা হবে বৈ কি। এস।

চাটুয্যেকে সঙ্গে করে নিয়ে ছিদাম পৌছল সুরেশ যেখানে শুয়ে। একগাল হেসে বল্লে, রাজা, চাটুয্যে কাল মামলা তুলে এসেছে!

সুরেশ ভারি বিস্মিত হয়ে চাইলে চাটুয্যের পানে। বল্লে, দিন চলবে কি করে চাটুয্যে মশাই?

বল্লে চলত না, কিন্তু এবার চলবে। এদেশে থেকে হয়ত চলা শক্ত হবে তাই ঠিক করছি অন্য কোথাও চলে যাব।

সবাই চুপ করে রইল।

চাটুয্যে বল্লে, পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি এই কায করে

এসেছি, কিন্তু কিছুই ত' লাভ করতে পারলাম না, না অর্থে না মনে।

অর্থ এমনি যে দুবেলা আহার জোটেনা। মন এমনি যে দোর গোড়ায় অচেতন মুমূর্ষুকে ঘরে স্থান দিতে চাইনি; বর্ষা-ঝড়ের বিপদের দিনে।

এ-সব ধরা পড়ল কাল। আমি যাকে পরম বন্ধু ভাবতাম; আমার দক্ষিণ হস্ত মনে করতাম, সেই ছিদাম আমাকে বল্লে শয়তান, নেকড়ে বাঘ।

হাঁ দেখুন জিজ্ঞাসা করতে ভুলেই গিয়েছি, কেমন আছেন আপনি?

সুরেশ বল্লে, অনেকটা ভাল।

চুপ করে বসে রইল চাটুয্যে। চোখ আকাশের দিকে, মনে হচ্ছে একেবারে শুকনো নয়।

তারপর বল্লে, রামায়ণের সেই বাল্মিকীর দশা। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। ছিদামও নেকড়ে বাঘ বলে তাড়িয়ে দিলে।

একে একে সকলকে হারিয়েছি। স্ত্রী অনেকদিন গেছে, তারপর যাদের যাদের বন্ধু করেছি সবাই ছেড়েছে একদিন। কাল ছাড়ল ছিদাম, যে মনে করেছিলাম কোনও দিনই ছাড়বে না।

চুপ করে খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগল। তারপরে বল্লে, কিন্তু সব চেয়ে বড় হারানো হারিয়েছি—সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গেছে সেই ঝড়ের দিনে। আপনার চোট আমার কাছে ঢের ছোট সুরেশবাবু, আমার বুকের হাড়-কটা সে-দিন খান খান হয়ে গেছে।

সেদিন আমি হারিয়েছি আমার একটি মাত্র আঁধার ঘরের মাণিক কিশোরীকে। স্বকৃত, একেবারে স্বকৃত।

বলে দুই হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

কিশোরী ঘরেই ছিল। এসে বাবার হাত ধ'রে বল্লে, ও কথা কেন ভাবছ বাবা; আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি।

চোখের জল মুছে মেয়ের হাত শক্ত করে ধরে চাটুয্যে বল্লে, মিথ্যে কথা কিশোরী। কিন্তু তোকে হারিয়ে আরও যেন বড় করে পেয়েছি। বাবা কাল বুঝতে পারলাম। ও-দিকটায় যে একেবারে অন্ধ ছিলাম!

আমি যার মৃত্যুকামনা করেছি সে-ই ঝড়—জল—বজ্রপাতে তাকে সেবা করে বাঁচালে। তাকে হারালাম আমি, কিন্তু সে পেলে নবীন জীবনের আশ্চর্য্য সার্থকতা।

দস্যু রত্নাকরের ঘরে বুঝতে পারলাম ছিল লুকিয়ে জানকী।

বলে আস্তে আস্তে দুলতে লাগল মোড়ায় বসে।

হঠাৎ খপ্ করে কিশোরীর হাত ধরে সুরেশের ডান হাতে চেপে ধরে বল্লে, বাবা জীবনে কোনও দিন যে প্রসন্ন মনে দিতে পারেনি, আজ তার এই প্রথম ষোল আনা মন-খোলা দান, আমি যেমনই হই, এই দানের গৌরব তোমার কাছে অটুট থাকবে জানি।

সুরেশ দুই হাত জড়ো করে নমস্কার করতেই তার মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে কি সব ব'লে, চোখের জল মুছতে মুছতে চাটুয্যে হাওয়ার মত বেরিয়ে গেল,—এবং সেই অবাক নিস্তব্ধতার মধ্যে তার রাস্তায় দ্রুত-চলা চটির একঘেয়ে আওয়াজ অনেকক্ষণ শোনা যেতে লাগল।

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

চণ্ডীদাসের পঞ্চপঞ্চাশৎ প্রকাশিত পদ

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম্‌-এ

একখানি বার পাতার কাগজের পুঁথিতে কেবলমাত্র চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পঞ্চ-পঞ্চাশৎটি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। লিপিকর পঞ্চপঞ্চাশৎ সংখ্যক পদের খানিকটা লিখিয়াই লেখনীত্যাগ করিয়াছেন, আর লেখেন নাই। অক্ষর দৃষ্টে মনে হয়, পুঁথিখানির বয়স সওয়া শত কি দেড়শত বৎসর হইবে।

পদগুলি নূতন নয়, কারণ স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' খুঁজিয়া সবগুলিই পাইতেছি। কিন্তু তবু পুঁথিখানি ধরিয়া কতগুলি কথা বলিবার আছে।

(১) পদগুলি সবই একই চণ্ডীদাসের, এবং তিনি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'। পুঁথিতে তথাকথিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—রচয়িতা বড়ু-চণ্ডীদাসেরও পদ নাই, এবং দীন-চণ্ডীদাস ভণিতা-যুক্ত পদও নাই।

(২) স্বর্গীয় নীলরতন বাবু তাঁহার সম্পাদিত 'পদাবলী'র ভূমিকায় (পৃঃ ৫) পদ-পর্য্যায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "পদের শ্রেণী-বিভাগ ও ক্রম-নির্দ্দেশ করিবার সময় আমি একটি বিষয় ছাড়া আর সকল বিষয়েই প্রাচীন পদ-সংগ্রাহকগণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছি। কেবল শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ অগ্রে না দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রথমেই দিয়াছি।" ইহাতে বুঝিতেছি, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদগুলি প্রথমে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁহার নিজের,—ওরূপ পুঁথিতে ছিল না। কিন্তু আমার পুঁথির আরম্ভই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের নয়টি পদ লইয়া।

(৩) আমার পুঁথির ও নীলরতন বাবুর 'পদাবলী'র পদের পারম্পর্য্যে মিল নাই; যথা পুঁথির ১ নং পদ (স্থির বিজুরি বিষম গৌরি পেখলু ঘাটের কূলে) পদাবলীর ১২ নং পদ, কিন্তু পুঁথির ২ নং পদ (কনক চরণ কিবা দরপন...) পদাবলীর ১৫ নং পদ, আবার পুঁথির ৩ নং পদ (বেলি অবসান কালে দেখিলু ভালে...) পদাবলীর ৭ নং পদ,—এইরূপ।

(৪) পুঁথির পদের পাঠে ও পদাবলীর পদের পাঠে বহু অসঙ্গতি। পদাবলীর ২৬৫ নং পদের (কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী) ৫ হইতে ১০ লাইন পর্য্যন্ত পুঁথিতে (নং ৩১) অভাব। পদাবলীর ৩১৮ নং পদের (দৈব যুগতি অশেষ গতি) ১৬ লাইন হইতে বাকীটা পুঁথিতে (নং ৪০) নাই। পদাবলীর ২৮০ নং পদের (ওই ভয় উঠে মনে ওই ভয় উঠে) ৫ হইতে ৬ লাইন পুঁথিতে (নং ৪১) নাই। পদাবলীর ৩৪৩ নং পদের (কানুর পীরিতি মনের সহিতি) ১৬ হইতে ১৯ লাইন পুঁথিতে (নং ৫০) নাই। পদাবলীর ২৭৭ নং পদের (পাশরিতে চাহি তারে) ৩-৪, ৯-১০, ও ১২ লাইন পুঁথিতে (নং ৫৩) নাই।

আবার, পুঁথির কোন-কোনও একটি পদের পাঠ পদাবলীর দুই বা ততোধিক পদ মিলাইলে, তবে উদ্ধার করা যায়। যথা, পুঁথির ১৪ নং পদ পদাবলীর ২৯৭ নং পদের খানিকাংশ ও ৩৫৩ নং পদের খানিকাংশ। পুঁথির ৪৫ নং পদ পদাবলীর ৩৩৯ নং পদের প্রথম হইতে ৭ লাইন ও ৩১৯ নং পদের ১০ লাইন হইতে শেষ। পুঁথির ৪৬ নং পদ পদাবলীর ৩১৫ নং পদের প্রথম ৪ লাইন ও ৩৩৯ নং পদের ১২ লাইন হইতে শেষ। পুঁথির ৪৭ নং পদ পদাবলীর ৩১৯ নং পদের ১৪ লাইন হইতে শেষ।

পুনশ্চ, "সেই মরম কহিয়ু তোরে" পদাবলীর এই ৩০৫ নম্বরের পদটি পুঁথির ৩৬ নম্বরের পদ, কিন্তু পুঁথিতে এই প্রথম লাইনটি ছাড়া পদের অবশিষ্ট অংশ পদাবলীর ৩৩৬ নং পদের নয় লাইন হইতে বাকীটা।

প্রশ্ন এই, (দ্বিজ) চণ্ডীদাস এই সকল পদগুলি কোন্‌

ভাবে রচনা করিয়াছিলেন? অর্থাৎ পুঁথি ঠিক না পদাবলী ঠিক?

(৫) পদাবলীর ও পুঁথির ভণিতাগুলিতে সর্ব্বত্র মিল নাই। যথা, পুঁথির ১১ নং পদ পদাবলীর ৬৫ নং পদ, কিন্তু পদাবলীর পদের ভণিতায় "দ্বিজ চণ্ডীদাস" আছে; পুঁথিতে 'দ্বিজ' শব্দ নাই, এবং ৺রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণেও (দ্বিতীয় সং, পৃঃ, ১০২) এই পদের ভণিতায় 'দ্বিজ' নাই। পুঁথির ১৬ নং পদ পদাবলীর ২৯১ নং পদ,—পুঁথির ভণিতায় "বিস খাইলে দেহ যাবে রব রবে দেষে। বাসুলি আদেশ কবি কহে চণ্ডীদাসে।", পদাবলীর ভণিতাও প্রায় এইরূপ, কিন্তু রমণী বাবুর সংস্করণে (পৃঃ ২৪৬) ভণিতায়—'কবি' স্থানে 'দ্বিজ' পাই। পক্ষান্তরে, পুঁথির ২০ নং পদ পদাবলীর ২৯০ নং পদ, কিন্তু পুঁথির ভণিতায়—"বাসুলি রাদেস কবি কহে—চণ্ডীদাসে" এবং পদাবলীর ও রমণীবাবুর সংস্করণের (পৃঃ ২৪৫) উভয় পদেই 'কবি' স্থানে 'দ্বিজ' আছে। আরও দেখিতেছি, পুঁথির ২৮ নং পদ পদাবলীর ৩৫৫ নং পদ, কিন্তু পদাবলীর পদের ভণিতায় আছে 'চণ্ডীদাস কবি', অথচ উহারও পাঠান্তরের ভণিতায় 'কবি' নাই, এবং পুঁথিতেও নাই, রমণীবাবুর পুস্তকেও নাই।

এই সকল হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, পুঁথি লেখকরা যাঁহাকে স্থানে স্থানে 'কবি চণ্ডীদাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'।

পুঁথির ৩৯ নং পদের (পদাবলী ৩৫৮ নং) ভণিতায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' নাই,—আছে "চণ্ডীদাস কহে যেই জারে জেই ভায়"। রমণীবাবুর সংস্করণেও 'বড়ু চণ্ডীদাস' আছে।

পুঁথির ৪০, ৪৮ ও ৪৯ নং পদের (পদাবলী ৩১৮, ২৯৩ ও ৩৪১ নং পদ) ভণিতায় 'বাশুলি' বা 'বাসুলি' নাই।

পুঁথির ৪২ নং পদের (পদাবলীর ৩৪২ নং) ভণিতায় আছে, "নানুরের মাঠে গ্রামের নিকটে বাশুলি আছয়ে যথা"। কিছুদিন এই গ্রামের নামের বানান লইয়া অযথা তর্কাতর্কি চলিয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন লিপিকরের হাতে নামের বানান বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে, এই খেয়ালটা কাহারও হয় নাই।

পুঁথির ৪৮ নং পদের (পদাবলীর ২৯৩ নং রমণীবাবুর সংস্করণের পৃঃ ২৪৭-২৪৮) এবং ৫০ নং পদের (পদাবলীর ২৪৩ নং, রমণীবাবুর সংস্করণে এই পদটি নাই) ভণিতায় 'ধোবিরু জন' বা 'রজকী নারী'র উল্লেখ নাই। ইহা একটা গুরুতর কথা। রাগাত্মিক পদগুলির আলোচনা এখন থাক্, কিন্তু অন্যান্য সকল পদে রামী-রজকিনীর যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা কি চণ্ডীদাস নিজে করিয়াছিলেন? কবির কি কোনও কাণ্ডজ্ঞানই ছিল না?

পুঁথির ৩০ নং পদের ভণিতায় আছে "পরস পাসরে ঠেকিয়া রহিলে বড়ু দ্বিজ চণ্ডীদাস"। পদাবলীর ৩৫১ নং পদের ভণিতায় শুধু আছে "কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস"। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চণ্ডীদাসীয় একখানি পুঁথির পরিচয়-প্রসঙ্গে এই পদটির ভণিতা লিখিয়াছিলেন, "পরশ পাথরে ঠেকিয়া রহিলা বড়ু দ্বিজ চণ্ডীদাস।" (পৃঃ ১৫৫)। তাহা হইলে, আমারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উভয় পুঁথিতেই ভণিতায় 'বড়ু দ্বিজ চণ্ডীদাস'। কিন্তু ভট্টশালী মহাশয়ের মতে, 'দ্বিজ' শব্দ 'বড়ু' শব্দের সমানার্থক, (কাজেই) পুঁথির লেখক বড়ু ও দ্বিজ একত্র ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আমার মতে, দ্বিজ বলিতে যাহা বুঝায়, বড়ুর অর্থ তাহা নয়, হইলে লেখক সমানার্থক দুইটি শব্দ পাশাপাশি বসাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন।

পুঁথিখানি ব্যতীত একখানি পাতড়া পাইয়াছি, যাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের একটা সহজিয়া পদ আছে। পদটি নীলরতন বাবুর পদাবলীতে পাইলাম না, সেই হেতু এটিকে নূতন বলিয়া মনে করিতেছি, এবং নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

অথ চণ্ডিদাসের পদ

সোনহে রসিক ভকত ভাই।
সহজ কথার উত্তর চাই॥
কি হেতু গমন হইল তথা।
কেনোবা আইব জাইবে কোথা॥
কেনোবা ধর্য্যাছ মানব দেহ।
কী হবে কি পাবে বুঝ্যাছ ইহ॥
রোধিকার দেহে সবহ দেশে।
দেহের সভাব জাইবে কিসে॥
দেহের স্বভাব ছাড়িয়া ভজে।
তবে ত পাইবা ব্রজেন্দ্ররাজে॥
চণ্ডীদাসে বলে উলট বেদ।
খুজিবে পাইবে ঘুচিবে খেদ॥

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

মুক্তির ডাক

কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

মা !—"মা !—"

প্রৌঢ়, ক্ষীণকায় রামতারণের দেহ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। গভীর ক্লান্তি ভরে তিনি তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্তে মাথা টিপিয়া ধরিলেন।

পাশের ঘর হইতে গৃহিণী বিন্দুবাসিনী স্বামীর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাহিরে রাত্রির জমাট অন্ধকার। বিন্দুবাসিনী দেখিলেন, স্বামীর ললাটে বাহিরের ঘনায়িত অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। স্বামীর এমন বিষণ্ণ মূর্ত্তি, বিচলিত ভাব তাঁহার বিবাহিত জীবনের প্রায় ৩৫ বৎসরের মধ্যে কখনও দেখেন নাই।

বিন্দুবাসিনী উদ্বিগ্ন ভাবে কাছে আসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে ? অমন করছ কেন ?"

রামতারণ তেমনই ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। লণ্ঠনের মৃদু আলোকে তাঁহার নতমুখের সম্পূর্ণ অংশ দেখা না গেলেও একটা ক্লিষ্ট বেদনা তাঁহার বিবর্ণ, শীর্ণ মুখমণ্ডলে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বিন্দুবাসিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইল না।

স্বামীর স্কন্ধ দেশে হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কি হয়েছে বলবে না ?"

সে স্বরে সহানুভূতির যে স্নিগ্ধ ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল, তাহা বোধ হয় রামতারণের ক্লিষ্ট অন্তরে পৌঁছিল। তিনি মুখ তুলিয়া নিবিষ্ট দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিলেন। তারপর গাঢ়স্বরে বলিলেন, "দাসত্বের পরিণামই এই রকম। কি আর শুনবে ! সেই চিরকালের এক ঘেঁয়ে সুর !"

পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "ছুটী দিলে না ?"

"কেন দেবে ?"

রামতারণের বড় বড় চোখ দুইটি সহসা অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলিয়া উঠিল।

গায়ের জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ সোজা হইয়া বসিলেন। তারপর দাঁতেদাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণের ছেলে, চাকরী করতে গিয়েছি। চাকর কুকুর দুই সমান। ত্রিশ বছর চাকরী করছি। কখনো এক সঙ্গে একমাস ছুটী চাইনি। শরীর খারাপ বলে একমাসের ছুটী চাইলাম। বড় বাবু বললেন, সাহেবকে বল। সাহেব মিষ্টি হেসে বললেন, বড় কাজের চাপ ; এখন মাস ছয়েকের মধ্যে ছুটী দেওয়া চলবে না। অথচ বড়বাবু দশবছরের মধ্যে ছ' মাস ছুটী পেয়েছেন, সাহেব চার বার বিলেত ঘুরে এসেছে।"

বিন্দুবাসিনী বাতাস করিতে করিতে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্বামীর পক্ষে এখন কিছুদিন বিশ্রামের কিরূপ প্রয়োজন তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। হরিডাক্তার ব্যবস্থা দিয়াছেন ; অন্ততঃ তিন মাস বিশ্রাম করা দরকার, কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া বদলাইয়া আসিতে পারিলে ভালই হয়। অভাব পক্ষে, কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম—কোন রকম মস্তিষ্ক চালনার কাজ করিলে চলিবে না।

দরিদ্রের সংসার। রামতারণ কোন সদাগরী আপিসে ৫০টি টাকা বেতন পান। ২০ টাকায় কাজ আরম্ভ করিয়া ৩০ বৎসরে ৫০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। প্রতিপাল্যের সংখ্যা বেশী নহে বলিয়া এই সামান্য বেতনে কোন রকমে সংসার প্রতিপালন করা চলিতেছে। বাড়ী ভাড়া লাগে না—সহরের উপকণ্ঠে দশ কাঠা জমির উপর পৈতৃক বাড়ীটা ছিল, তাই রক্ষা। মরিয়া হাজিয়া এখন একটি মাত্র পুত্র সন্তান

ভগবানের আশীর্ব্বাদে টিকিয়া আছে। তাহার কলেজের পড়া এবং একমাত্র অসহায়া বিধবা সহোদরাকে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য করিয়া যাহা বাঁচে তাহাতেই অতিকষ্টে সংসার চলে। স্বামীর দুঃখ বিন্দুবাসিনী বুঝিতেন, তাই তিনি হাসি মুখে সকল কষ্ট সহ্য করিয়া নিপুণ ভাবে সংসার চালাইতেন। এখন স্বামীর শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে, দীর্ঘকালের কঠোর প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর অন্ততঃ একমাস বিশ্রাম পাইলে, আবার হয়ত স্বামী হাসিমুখে সংসারের যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারেন। তারপর সুধীর বি-এ পাশ করিলে—

রামতারণ বলিয়া উঠিলেন, "ছুটী দিলে না। না দিক, ভগবান এর বিচার করবেন। ভাঙা শরীর নিয়েই দেখি কতদিন চলে।"

বিন্দুবাসিনী আশ্বাস ও সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, আর বেশীদিন ত নয়। সুধীর এবার পরীক্ষা দেবে। তারপর তার একটা ভাল চাকরী—"

গর্জ্জন করিয়া রামতারণ বলিয়া উঠিলেন, "চাকরী!—সুধীরকে আমি চাকরী করতে দেব? কখখনো না। চাকর কুকুরেরও অধম!"

স্বামীর শান্ত, সুন্দর প্রকৃতি কতখানি বিক্ষুব্ধ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে—উপরওয়ালার নির্ম্মম প্রত্যাখ্যানে হৃদয় কিরূপ আহত হইয়াছে, বুদ্ধিমতী বিন্দুবাসিনী তাহা বুঝিতে পারিলেন।

কক্ষমধ্যে কিয়ৎকাল পাদচারণার পর রামতারণ পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আজকে আমার ব্যাভারে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছ। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, আমি কি যন্ত্রণা পাচ্ছি। ত্রিশ বছর এই কোম্পানীতে কাজ করছি। মুখফুটে কোন দিন মাইনে বাড়াবার কথা বলিনি, অথচ আমার হাত দিয়ে বছর বছর লাখ লাখ টাকার কারবার হয়ে গেছে। জিনিষ পত্রের দর দামের হের ফেরের ফাঁকে ফেলে কোম্পানীর ঘাড় ভেঙে অনেক টাকা রোজগার করতে পার্ত্তুম। তা করিনি। আমার হাতে বিশ্বাস করে সঁপে দিয়েছে। আমি ছাড়া ভিতরের কৌশল আজ পর্য্যন্ত আর কেউ জানেনা। বড়বাবুর চারশ টাকা মাইনে বেড়েছে। আমার মোটে পঞ্চাশ। চাইতে পারিনি বলে আমার ভাগ্যে ঐ পর্য্যন্ত!"

রামতারণের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িতে লাগিল। তাঁহার দীপ্ত চক্ষু হইতে অনল শিখা বাহির হইতেছিল।

বিন্দুবাসিনী তাঁহার হাত ধরিয়া তক্তপোষের উপর বসাইয়া বলিলেন, "তুমি শান্ত হও। ও সব কথা আর ভেবনা।"

প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "এতদিন তোমাদের কারো কাছে কিছু বলিনি। আজ বলতে দাও। ভেবেছিলুম, ব্রাহ্মণের ছেলে হযে দাসত্ব করছি, এর চেয়ে মহাপাতক নেই। আবার প্রার্থনা করে পূর্ব্ব পুরুষদের নরকস্থ করব? তাই কখনো কারও কাছে হাত পাতিনি। কিন্তু জীবনে এই প্রথম একদিন হাত পাতলাম—ছুটী চাইলাম। মঞ্জুর হলো না। দাসত্বের মত মহাপাতক আছে, গিন্নি? তাই সুধীরকে জীবনে আমি কোন রকম চাকরী করতে দেবনা।

বিন্দুবাসিনী চাহিয়া দেখিলেন, দ্বার প্রান্তে তাঁহাদের আঁধার ঘরের মাণিক, প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র অবলম্বন সুধীর চন্দ্রের দীর্ঘ, উন্নত সুন্দর দেহ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া। সম্ভবতঃ পিতার শেষ কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

২

মাতার চরণ ধুলি গ্রহণ করিয়া সুধীর আনন্দ বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "মা, ফল বেরিয়েছে, আমি পাশ হয়েছি। বাবা এখনো আসেন নি?"

বিন্দুবাসিনী পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। আজ তাঁহার আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা একে একে তাঁহার অন্ধকার ঘরকে উজ্জ্বল করিয়াছিল বটে, কিন্তু দুই তিন বৎসরের অধিক কাল কাহাকেও তিনি ধরিয়া রাখিতে পারেন। সর্ব্বশেষে আসিল এই সুধীর। গৃহবিগ্রহ রাধামাধবের আশীর্ব্বাদে বড় হইয়া আজ সে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়াছে! দীর্ঘ, সুগঠিত, সুন্দর দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তির কি চমৎকার পরিচয়! মাতৃ-হৃদয় পুত্রগর্ব্বে আনন্দে বিমূঢ় হইয়া পড়িল।

পুত্রের হাত ধরিয়া মা বলিলেন, "এদিকে আয় বাবা। উনি এখনো আপিস থেকে ফেরেননি। রাধামাধবকে প্রণাম করবি আয়।"

রামতারণ স্বহস্তে প্রত্যহ গৃহে দেবতার পূজা করিতেন, বিন্দুবাসিনী উপকরণাদি গুছাইয়া দিয়া স্বামীর দেবপূজার সকল রকমে সাহায্য করিতেন। রামতারণের পিতামহ এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন।

ধূপধূনার গন্ধে মন্দির কক্ষ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। রামতারণ আসিয়া সন্ধ্যারতি করিবেন। সুধীরচন্দ্র ভক্তি উদ্বেল চিত্তে দেবতার সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। দেবতা! তুমি সহায় হও। সে যেন পিতার দুঃখ দূর করিতে পারে।

মাতা ও পুত্র বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন।

বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "সেই সকাল বেলা খেয়ে বেরিয়েছিস্। সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরেনে। আজ গজা ভেজেছি, খাবি চল।"

সুধীর গজা বড় ভাল বাসিত।

হাত পা মুখ ধুইয়া সন্ধ্যাহ্নিক শেষে সুধীর মার কাছে আসিয়া বসিল। বিন্দুবাসিনী ঘরে-ভাজা গজা ও চন্দ্রপুলি থালা ভরিয়া পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন।

"বড় চমৎকার হয়েছে, মা! তোমার হাত এত মিষ্টি! যা রাঁধ তাই যেন অমৃত।" পুত্রের প্রতিভা প্রদীপ্ত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া মাতার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন সন্তান! ভগবান ইহাকে দীর্ঘজীবী কর, সুখী কর। এবার একটি টুকটুকে দেখিয়া বৌ ঘরে আনিতে হইবে।

বিন্দুবাসিনী হাসিমুখে বলিলেন, "আমি আর কতদিন। এখন একটি বৌ এলে তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।"

সুধীরের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এত তাড়াতাড়ি নয়, মা। আগে টাকা রোজগার করে বাবার দুঃখ দূর করি, তারপর। আমি বাবাকে আর কখ্খনো চাকরি করতে দেব না।"

হাসিতে হাসিতে বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "আগে একটা ভাল দেখে চাকরী যোগাড় করে নিতে হবে ত!"

সুধীর সহসা মাথা তুলিয়া বলিল, "চাকরী? না, মা, চাকরী আমি করবো না।"

কয়েক মাস পূর্ব্বে স্বামীর উচ্চারিত কথাটা বিন্দুবাসিনীর মনে অকস্মাৎ উদিত হইল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তবে টাকা রোজগার করবি কি করে?"

পুত্র হাসিয়া বলিল, "কেন মা? চাকরী যারা করে না, তারা কি টাকা রোজগার করে না, না সংসার প্রতিপালন কর্ত্তে পারে না?"

"তবে তুই কি করবি?"

রহস্যস্মিতমুখে সুধীর বলিল, "সে দেখতে পাবে, আমি কি করি। তুমি কি ভেবেছ, আমি এতদিন শুধু পড়া নিয়েই ছিলুম মা? পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য জিনিষও আমার মাথায় আসত। আজ চার বছর ধরে তাই শিখে আসছি।"

এমন সময় বাহিরে পদশব্দ হইল।

সুধীর বলিয়া উঠিল, "ঐ বাবা আসছেন। যাই তাঁকে খবরটা শুনিয়ে আসি।"

একলম্ফে সুধীর আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

৩

বিন্দুবাসিনী শঙ্কিত কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু কাজটা কি ঠিক হলো?"

স্বামীর কোনও কথা বা কাজে বিন্দুবাসিনী এতকালের মধ্যে একদিনও প্রতিবাদ করেন নাই। আজ সহসা তাঁহার কণ্ঠ হইতে প্রতিবাদের ধ্বনি শুনিয়া রামতারণ স্থির দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিলেন। তারপর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এ ছাড়া টাকা কোথা হতে আসবে? বাড়ী কার জন্য বল— ওইত আমাদের সর্ব্বস্ব।"

"তা সত্যি। কিন্তু এতটাকা সুদ সমেত সুধীর কি শোধ করে উঠতে পারবে? কারবারে লাভ হয় লোকসানও হয়। যদি লোকসানই হয়, তখন?"

রামতারণ হাসিমুখে বলিলেন, "গাছ তলাত কেউ কেড়ে নেয়নি; গিন্নি ওর সাধ ব্যবসা করবে। ছেলেবেলা থেকেই আমি ওর কানে ব্যবসার মন্ত্র ঢেলে দিয়েছি। চাকরী করতে ওকে দেব না। বাঙ্গালী জাতটা চাকরী করে করেই উচ্ছন্ন

গেল। দেখুকনা কেন, যদি চেষ্টা করে অবস্থা ফেরাতে পারে। বাপ হয়ে আমি ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিনে।"

বিন্দুবাসিনী ভাবিতে লাগলেন। তারপর মৃদুস্বরে বলিলেন, "কত টাকায় বন্ধক দিলে ?"

প্রশান্ত ভাবে রামতারণ বলিলেন, "আট হাজার। তার মাসে মাসে আশী টাকা সুদ। তিন মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি। তা খোকা বলেছে, সুদ সে জমতে দেবে না।"

অপরিণত বুদ্ধি যুবক ব্যবসায়ের টাল যদি সামলাইতে না পারে ? মাতার মনে সে দুর্ভাবনা জাগিয়া উঠিল। সম্ভবতঃ রামতারণ পত্নীর মনের উদ্বেগ অনুমান করিয়া লইলেন। তিনি পত্নীর একখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, "দুঃখ কিসের গিন্নি ? বাড়ী আমাদের সঙ্গে যাবে না। ভগবান যদি মুখতুলে চান, খোকা জীবনে আমার মত লাঞ্ছনা ভোগ করবে না। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, ও যেন কারবারে জয়লাভ করতে পারে।"

কোন্ জননী পুত্রের জয় কামনা করেন না ? বিন্দুবাসিনী হৃদয়ের সমস্ত বাসনা উজাড় করিয়া রাধামাধবের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়া পুত্রের আশীষ দিনরাত্রি প্রার্থনা করিতেছেন। সুধীর টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলে, স্বামী কর্ম্মভোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। এইবার সে নিদারুণ পরিশ্রমের বিনিময়ে যে সামান্য অর্থ ঘরে আসে; তাহাতে দুই মুখ এক করিতে কি বেগ পাইতে হয়, বিন্দুবাসিনী কি তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন না। তবু। তবু।

যদি কারবার ভাল না চলে, যদি মাসে মাসে সুদ দিবার সামর্থ্য না ঘটে, তাহা হইলে ঋণ বাড়িয়া যাইবে। তারপর বাড়ীখানি দেনার দায়ে বিকাইয়া গেলে তাঁহাদের একমাত্র বংশধর দাঁড়াইবে কোথায় ? নারীর মন, মাতার হৃদয় সেই দুশ্চিন্তাতেই ত অধীর হইয়া উঠিতেছে।

এমন সময় "মা !" বলিয়া সুধীর উপস্থিত হইল। তাহার স্বাস্থ্য সবল আননে আনন্দ দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

পিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিয়া উঠিল, "টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এলুম, বাবা।" মাতার দিকে ফিরিয়া সহাস্য মুখে বলিল, "বাড়ীর জন্য তোমার মন খারাপ হয়েছে, মা ? কিছু ভেবোনা। পাঁচ বছরের মধ্যে আমি সব টাকা শোধ করে দেব। শুধু তোমরা আমায় প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করো।"

রামতারণ বলিলেন, "আপিস কোথায় খুলবে, ঠিক করেছ ?"

বড় বাজারে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি। আপিস দেখে আসবেন বাবা। আমি হিসেব করেই চলব। চার বছর ধরে ব্যবসার অনেক কল কৌশল দেখে আসছি। রোজ বিকেল বেলা চার ঘণ্টা করে আমি একটা বড় কারবারের কাজ কর্ম্ম হাতে কলমে করেছি, মা। তুমি ভয় পেয়ো না। তোমার ছেলে বেঁচে থাকতে বাড়ী নষ্ট হবে না। তবে যদি হঠাৎ মরে"—

বিন্দুবাসিনী তাড়াতাড়ি সন্তানের মুখে হাত চাপা দিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে বলিলেন, "ওকি অলক্ষুণে কথা, সুধীর ?

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি মরছিনে, মা। কথার কথা বলছিলাম।"

"আবার ঐ কথা। ফের যদি অমন কথা বলবি, আমি মাথা মুণ্ড খুঁড়ে মরব।"

বারাণ্ডা হইতে রামতারণ ডাকিলেন, "এদিকে এস ত।"

বিন্দুবাসিনী স্বামীর কাছে যাইতেই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আজ আর হবে না। কাল রাধামাধবের ভোগ ভাল করে দিতে হবে। সুধীরের ব্যবসা উপলক্ষে, তার ষোড়শোপচারে পূজো না দিলে, আমাদের অপরাধ হবে না, গিন্নি ?

নিশ্চয়ই ! দেবতার পদতল ব্যতীত মানুষের আশ্রয় কোথায় ? তাঁহার চরণতলে অঞ্জলি নিবেদন করিয়া তাঁহারই নির্ম্মাল্য সুধীরের গলদেশে বিলম্বিত করিয়া দিতে হইবে। সায়াহ্নে সুধীরই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। ঠাকুর ! সুধীরকে সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে দীর্ঘজীবী কর। বিন্দুবাসিনী ঐশ্বর্য্যের কাঙালিনী নহেন। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া পুত্রের হস্তের গঙ্গোদক পান করিয়া তিনি যেন অন্তিমে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারেন। ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কামনা তাঁহার নাই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। আষাঢ়ের

আকাশে মেঘের সঞ্চার হইতেছিল। বিন্দুবাসিনী সে দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

রামতারণ কলিকাটি হুঁকার উপর বসাইয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন।

সুধীর ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া তাঁহাকে নীচ দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে কি? রাধামাধব! কবে তুমি মুখ তুলিয়া চাহিবে? ব্রাহ্মণ সন্তানকে কবে তুমি বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে?

ধূমপানের অবকাশে একটা দীর্ঘশ্বাস রামতারণের বক্ষ পঞ্জর মথিত করিয়া নানা পথে নির্গত হইল।

৪

মানুষের কল্পনা অনুসারে যদি জগৎ চলিত!

মানুষ কল্পনার সাহায্যে যাহা গড়িতে যায়, অদৃশ্য হস্তের আঘাতে তাহা চূর্ণ হইয়া পড়ে। সৃষ্টি লীলার এই বিচিত্রতার মর্ম্ম মনুষ্য শক্তি আজিও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। শক্তির অহঙ্কারে, জ্ঞানের গরিমায়, বুদ্ধিবৃত্তির দম্ভে মানুষ এমনই করিয়া আপনার মহিমা ঘোষণা করিতে চাহে, আধিপত্য বিস্তার করিবার দুঃস্বপ্ন দেখে; কিন্তু তাহার সকল শক্তির অহঙ্কার নিমেষ মধ্যে চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে তাহা কখনও ভাবে না।

আবার যে অহঙ্কারী নহে, শক্তির গর্ব্ব বা বুদ্ধিমত্তার দম্ভও প্রকাশ করে না, ঘটনাচক্রে তাহারও কল্পনার সৌধ অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে চূর্ণ হইয়া যায়। কেন যায়, তাহা চিরদিনই রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে—থাকিবে।

প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রাণপাত চেষ্টা সত্ত্বেও সুধীরচন্দ্র চঞ্চলা, ব্যবসায় লক্ষ্মীকে বাঁধিতে পারে নাই। চঞ্চলা ইন্দিরা প্রতি মুহূর্ত্তেই আশীর্ব্বাদের ঝাঁপি লইয়া তাহার সম্মুখ দিয়া দ্রুতপদে চলাফেরা করিতে থাকিলেও, ঝাঁপির মুখ তাহার শিরে আশীষ ধারা বর্ষণের জন্য উদ্যত হয় নাই।

উপর্য্যুপরি কয়বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা দেশের নানাস্থানে প্রবল বন্যার উৎপাতে ব্যবসায়ি মহলে ক্ষতি দেখা দিয়াছিল। পৃথিবীব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতা বাঙ্গালী দেশের দরিদ্র জন সাধারণকে অত্যন্ত বিমূঢ় ও নিরুপায় করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য স্তব্ধ প্রায়, ব্যবসায়িমহল স্তম্ভিত, নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। অনেককেই ইতিমধ্যে কারবার গুটাইয়া লইতে হইয়াছিল। কিন্তু অসমসাহসী সুধীরচন্দ্র পাঁচ বৎসরের ভীষণ ঝটিকার আঘাত সহ্য করিয়াও তখনও সংগ্রামে নিরুৎসাহ হয় নাই। সে তাহার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তখনও যুঝিতেছিল। সে বিশ্বাস করিত—"যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে।" তাই সে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াও তাহার ব্যবসায়কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল।

রামতারণ ও বিন্দুবাসিনী সবই জানিতেন। বিন্দুবাসিনী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই দুর্দ্দিনের নির্ম্মম পদক্ষেপের শব্দ শুনিতে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি নারী মুখে একটিবারও আশঙ্কার বাণী আর উচ্চারণ করেন নাই।

রামতারণের সদাপ্রসন্ন চিত্ত দুর্দ্দিনের প্রতীক্ষায় আরও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচ বৎসরে তাঁহার দেহ শীর্ণতর হইলেও, ব্রাহ্মণ হৃদয়ে নৈরাশ্যের তীব্রতম আঘাত সহ্য করিবার জন্য যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শরতের সুন্দর অপরাহ্নে শারদলক্ষ্মীর শুভাগমনের পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছিল। রামতারণ সন্ধ্যার বহুপূর্ব্বেই গৃহে ফিরিলেন। এত সকালে, ৩৫ বৎসরের কার্য্যকালের মধ্যে, বিন্দুবাসিনী কখনও তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে দেখেন নাই।

তাড়াতাড়ি স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই ব্রাহ্মণ অট্টহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "গিন্নি, রাধামাধবকে ভাল করে পুজো দেবার যোগাড় কর। আজ আমার মুক্তি—মুক্তি!"

বিন্দুবাসিনী স্বামীর বিকৃত কণ্ঠস্বরে, বিচিত্র ব্যবহারে চমকিয়া উঠিলেন।

"অমন করে চেয়ে দেখ্‌ছ কি? নতুন সাহেব আজ আমাকে জবাব দিয়েছে। কাল থেকে আপিস যেতে হবে না। গাড়ী টেনে টেনে ঘোড়া বুড়ো হয়ে গেছে, তাকে

বিশ্রাম দেওয়া ত উচিত। দয়াময় সাহেব, তাই আমায় রেহাই দিয়েছেন।"

বিন্দুবাসিনী ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। পঞ্চাশটি টাকা মাসে আসিত, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাহাও বন্ধ হইল! রাধা মাধব! রাধা মাধব!

তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া দরদর ধারে অশ্রু নামিয়া আসিল।

রামতারণ বলিয়া উঠিলেন, "কাঁদছ! এতেই এত অধীর! বুড়ো বয়সে আমি রেহাই পেলাম, কোথায় তাতে আনন্দ করবে—"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গায়ের চাদরখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন। তারপর কাতরকণ্ঠে বলিলেন, কেঁদনা তুমি! তোমার চোখের জল আমি সহ্য করতে পারিনে।

বিন্দুবাসিনী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অনেকক্ষণ পরে আপনাকে সংযত করিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "এখন সংসার চলবে কি করে? সুধীর ত একটা পয়সাও দিতে পারে না। রাধামাধবের পূজো কি হবে?"

রামতারণ বলিলেন, "মাস দুই চলে যাবে। এ মাসের মাইনের সঙ্গে আর এক মাসের মাইনে, সাহেব দয়া করে দিয়েছেন। আপিসের কাজ কর্ম্ম অচল, কাজেই আগে বুড়োদের সরিয়ে দিতে হল। বুঝেছ গিন্নি? অন্য অপিসে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আছে, আমাদের তাও ছিল না।"

প্রাণপাত সেবার ইহাই পুরস্কার! দাসত্বের ইহাই চরম শিক্ষা!

রাত্রিতে সুধীর বাড়ীতে ফিরিয়া পিতার কর্ম্মচ্যুতির সুসংবাদ জানিতে পারিল। মাতা দেখিলেন, এ সংবাদে বিচলিত হইল না। সে বলিল, "যা হয়, ভালর জন্য। বাবা আপনি ভাববেন না। আমি আছি, ভাগ্যকে ফেরাবই।"

তাহার কর্ম্মক্লান্ত আননে উৎসাহের আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

তাই কর, রাধামাধব!—উদ্দেশ্যে বিন্দুবাসিনী দেবতার চরণতলে কাতর নিবেদন-অঞ্জলি দিলেন।

সুধীর বলিল, "বাবা, আমাকে একবার পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে যেতে হবে। অনেক টাকা পাওনা আছে। কালই যাব।"

৫

কয়দিন ধরিয়া ঝড় ও প্রবল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পূজার পূর্ব্বে বহুদিন এমন দীর্ঘকালব্যাপী ঝড়বৃষ্টি দেখা যায় নাই। সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, সমগ্র বাঙ্গালা দেশেই ঝড়বৃষ্টি এমন ভাবে হইয়াছে যে, বহুস্থান জলমগ্ন, ঝটিকায় বহু অট্টালিকা পর্য্যন্ত ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে।

পূজার তখনও এক সপ্তাহ বাকী। সেদিনও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছিল। মেঘপুঞ্জ যেন সাত সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে তাহা ঢালিয়া দিতেছিল।

রামতারণ বাহিরের ঘরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। দুই সপ্তাহ হইল সুধীরচন্দ্র গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছে। প্রত্যহই তাহার একখানি করিয়া পত্র আসিয়াছে। আজ চার দিন তাহার কোনও সংবাদ নাই। আসাম অঞ্চল হইতে সে যাত্রা করিয়া ঢাকা হইয়া অন্যত্র যাইবে। তারপর আর কোনও সংবাদ নাই। একমাত্র পুত্রের জন্য তাঁহার প্রাণটা যে অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা পত্নীর নিকট হইতে গোপন করিবার জন্যই তিনি বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিয়াছিলেন।

"চাটুয্যে মশাই আছেন?"

রামতারণ চমকিয়া উঠিলেন। এ স্বর সুপরিচিত।

বিনোদচন্দ্র আঢ্য যথারীতি প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রামতারণের বুকের মধ্যে তখন সমুদ্র মন্থন চলিতেছিল।

আঢ্য বলিলেন, "আর ফেলে রাখা যায় না, চাটুয্যে মশাই। সুদে আসলে কত হল তা জানেন?"

মৃদুস্বরে রামতারণ বলিলেন, "তা অনেক হয়েছে বৈ কি।"

সহাস্যে আঢ্য বলিলেন, "কত হয়েছে আপনার অনুমান বলুন ত? আসল আট হাজার, তার সুদ, তস্য সুদ ধরে পনের হাজার ছাড়িয়ে গেল যে। আর রাখতে পারব না জেনে রাখুন।"

রামতারণ বলিলেন, "সুধীর বাইরে গেছে। অনেক টাকা বাকি বকেয়া পড়েছে। সে নিশ্চয় মোটা টাকা নিয়ে আসবে।"

মাথা নাড়িয়া আঢ্য বলিলেন, "সুধীরবাবু ত গোড়া থেকেই আমায় খুব সুদ দিয়ে আসছেন। তাঁর ওপর ভরসা করে বসে থাকলে আমার টাকা উশুল হবে, এ আশা আমার নেই, চাটুয্যে মশাই। তারপর দেখুন, আপনার এ জমী বাড়ীর দাম কি এখন পনের হাজার হবে? কখনো নয়। আপনি-যা হোক্ একটা বিহিত করুন। কোর্টে যেতে গেলে আবার আরও ত টাকা চাপ্‌বে। বুঝে দেখুন আপনি।"

রামতারণ ভাল করিয়াই বুঝিয়া দেখিয়াছেন। সুদে আসলে যে অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে, বাড়ী বিক্রয় করিলে তাহা এ সময়ে উঠিবে কি না, তাহাতে ঘোর সন্দেহ আছে। তবে একমাত্র ভরসা, সুধীর পাওনা টাকার একাংশ লইয়াও যদি ফিরে, তাহা হইলে ঋণের অনেকটা শোধ করা যাইতে পারিবে।

ব্রাহ্মণ স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন, "আড্ডি মশাই, আর কটা দিন দেরী করুন। যদি টাকা দিতে না পারি, বাড়ীটা আপনাকে লেখাপড়া করে বিক্রী করে দেব। ভগবান গাছতলা হতে অবশ্য বঞ্চিত করিবেন না।"

বিনোদ আঢ্য গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ব্রাহ্মণের বাড়ী নেবার ইচ্ছে আমার নেই, চাটুজ্জে মশাই। কিন্তু এত গুলো টাকা—"

"না, না, সেকি কথা। আপনার প্রাপ্য আপনি নেবেন, এতে আপনি হকদার, আড্ডি মশাই। তবে আর কটা দিন সবুর করুন।"

"বেশ, আমি পূজো পর্য্যন্ত চুপ করে থাকব। তারপর আদালত খুল্‌লে—"

কথাটা সমাপ্ত না করিয়াই প্রমাণান্তে চলিয়া গেলেন।

রামতারণ স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। হ্যাঁ, এত দিন পরে তিন পুরুষের ভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সস্ত্রীক গাছতলাই সার করিতে হইবে। তা হউক। তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। পুত্রের কল্যাণ কামনায় বাড়ী বন্ধক দিয়াছেন। অন্যায় রূপে, অসঙ্গত পথে অর্থ অপব্যয়িত হয় নাই। ইহাই কি সান্ত্বনা নহে।

কে?—হরকরা? পত্র আছে, দাও দাও।

ব্যগ্রভাবে রামতারণ অপরিচিত হস্তের লিখিত পোষ্ট-কার্ড গ্রহণ করিলেন।

হরকরা চলিয়া গেল। বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল।

"কার চিঠি?"

শূন্য দৃষ্টিতে রামতারণ পত্নীর দিকে চাহিলেন। স্বামীর নিষ্প্রভ চক্ষু এবং বিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া বিন্দুবাসিনী ছুটিয়া আসিলেন।

স্বামীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পোষ্টকার্ড ভূমিতলে লুটাইতেছিল। তিনি উহা তুলিয়া লইলেন।

না, তাঁহার পুত্রের হস্তাক্ষর নহে ত! কে লিখিয়াছে? কি লিখিয়াছে?—

মা! মা! নাই, সে নাই! পদ্মায় ডুবিয়া মরিয়াছে!—

বৃন্তচ্যুত ফলের মত বিন্দুবাসিনীর সংজ্ঞাহীন দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

রামতারণের বিকট হাস্যে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নৃত্য ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিলেন, "সে আমাদের মুক্তি দিয়ে গেছে। পদ্মায় ঝড়ে সে ডুবেছিল। মড়া তারা পেয়েছে। সৎকার করেছে। হরেন দাস চিঠি লিখেছে। চেনা লোক ভুল হবার যো কি! রাধামাধবের পূজোর যোগাড় কর গিন্নি যোগাড় কর। এবার ষোড়শোপচারে।"

পুত্রহারা মাতার আর্ত্ত চীৎকার বর্ষণ বিষণ্ণ শরতের আকাশকে বিদীর্ণ করিয়া দিল।

রামতারণ তখন বৃষ্টিধারা মাথায় করিয়া বাহিরের উঠানে নামিয়া বিকটস্বরে ডাকিতে ছিলেন "বিনোদ আড্ডি—আড্ডি মশাই! নিয়ে যাও তোমার টাকা"।

কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

বিতর্কিকা

১। বাঙ্গালী মেয়েদের শালীনতাবোধ

শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক

যতই দিন যাচ্ছে 'বিচিত্রা'র এই 'বিতর্কিকা' বিভাগটী অধিকতর জনপ্রিয় হচ্ছে। 'বিচিত্রা'র দিগন্ত রেখায় একটী নতুন প্রভাত একটু নতুন খ্যাতি নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। আলোচনা ও তর্কের ভিতর দিয়ে দেশের প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিচিত্রা সম্পাদক এই যে আভিজাত রাজপথ খুলে দিয়েছেন এজন্য তিনি আন্তরিকতম ধন্যবাদের পাত্র।

আজ আমার আলোচনার বিষয় হবে 'বাঙ্গালী মেয়েদের শালীনতা বোধ।' তর্কের খুব কিছু নেই কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের দণ্ডনীয় উদাসীনতা সম্বন্ধে সকলে সচেতন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্‌বেন, এই আশা নিয়েই কলম ধরেছি। আভিজাত বংশীয় নয়, বাংলার যে বৃহৎ নারীসমাজ তার গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ছড়িয়ে আছে তারাই প্রধানতঃ আমার আলোচনার বিষয়ীভূত হবে।

লজ্জায় বাঙ্গালী মেয়েরা যে একেবারে লজ্জাবতীলতা এই মধুর ধারণাটী আজও সকলের মনে অটুট আছে, এই উগ্র নারী প্রগতির আবহাওয়াতেও। কিন্তু এই লজ্জার মর্ম্ম বুঝে ওঠা আমার পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য ঠেকছে। লজ্জা যদি দেহের লজ্জা হয় তবে ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙ্গালী মেয়েরাই এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশী উদাসীন। আর সকল প্রদেশেই দেখা যায় সুউচ্চ প্রাসাদবাসিনী থেকে রাস্তার ভিখারিণীটারও পর্য্যন্ত গায়ে একটা জামা আছে। কিন্তু এবিষয়ে সেদিনও আমাদের বাংলাদেশ সাম্যবাদের একেবারে লীলাভূমি হয়ে বিরাজ করছিল। অবশ্য বলা যেতে পারে যে জামা ছাড়া শুধু শাড়ীতেও সমস্ত দেহের লজ্জা রক্ষা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথও একদিন বলেছিলেন যে, আমাদের মেয়েরা গায়ে যথেষ্ট কাপড় রাখে না বটে, কিন্তু পর্য্যাপ্ত পোষাকে নির্লজ্জতার ইঙ্গিত করে না। কিন্তু শুধু শাড়ীতে বাঙ্গালী মেয়েরা যে চমৎকার লজ্জা রক্ষা করে চলেন, তার নমুনা পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই আমরা দেখতে পাই। একটা জামার সাহায্য ছাড়া এ উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারেনা, কোন মতেই।

পাশ্চাত্য নারীদের চালচলন এবং পোষাকের নির্লজ্জতার সম্বন্ধে উত্তাল মুখর হয়ে স্ফূর্ত্তিতে আমরা বেশী করে চা খাই আর মজাসে কাগজে কাগজে প্রবন্ধে লিখি। কিন্তু ঘরের দিকে চোখ ফিরালে চায়ের বাটী আমাদের উল্টে যাওয়া উচিত, উচিত কলমদানীতে কলম তুলে রাখা।

সাঁতারের পোষাক পরে পুরুষদের সহযোগে ওদেশের মেয়েরা সমুদ্র স্নান আরম্ভ করলে। আর অমনি আমাদের দেশের কতগুলি জিহ্বা কী সলীল হয়ে উঠল! কৌতুক, আক্রমণ ও আর নিন্দার সে এক বীভৎস উল্লম্ফন!

তবু ত শিথিল, প্রতিমুহূর্ত্তে খসে খসে যাওয়া শাড়ীর বদলে ওদের মেয়েদের গায়ে একটা আঁটসাট পোষাক থাকে, পোষাক বদলাবার জন্য থাকে একটা তাঁবু।

আমাদের দেশে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, তীর্থে, স্নানযাত্রা উপলক্ষে এই লজ্জাহীনতার কতটুকু ফাঁক থাকে? ফাঁকত নেইই, লজ্জাহীনতাটা আরও নিবেট হয়ে ওঠে উন্মুক্ত দিবালোকে, সহস্র পুরুষের চোখের সামনে, তার গা ঘেঁষে গা মাথা মুছে বস্ত্র পরিবর্ত্তনে। উদ্দেশ্য পুণ্যলাভ, জলটা গঙ্গা এবং তার পাড়ে কতগুলি মন্দির থাকলেই নির্লজ্জতাটা চোখে কম ঠেকে নাকি? সমাবেশ মাহাত্ম্যে

পুরুষের মন একমুহূর্ত্তে সন্ন্যাসীমনের মত ইন্দ্রিয়-সিদ্ধ হয়ে ওঠে নাকি? তাহলে ভারতবর্ষের মত তীর্থস্থানগুলিই পাপ ও ব্যভিচারেব আস্তাকুড়, আর গাগাব মাঠ হয়ে উঠত না।

অনেকে বলেন পাশ্চাত্য মেয়েদের চাল-চলন পোষাক-পরিচ্ছদের নির্লজ্জতাটা সজ্ঞান এবং তাতে একটা প্রচারের ভাব থাকে। আমাদের দেশের মেয়েদের এ দোষটা নাকি একেবারে সর্ব্বপ্রকাবে শিশুর মত। কিন্তু একটা উলঙ্গ পাগল, একটা উলঙ্গ ভাল মানুষ—দৃশ্যটা উভয়ক্ষেত্রেই সমান লজ্জাকর ও পীড়াদায়ক। কাশীতে মেয়েদের একটা আলাদা পাকা ঘাট আছে, কোলকাতার গঙ্গার অনেক ঘাটে কাপড় ছাড়বার ঘর আছে কিন্তু অনেক মেয়েরই সেই সুযোগ গ্রহণ কববার শালীনতা বোধটুকু নেই।

পর্য্যাপ্ত কাপড় চোপড় পরে বিকেলে বেড়াতে বের হয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপ করবার জন্য মেয়েদের বেড়া-ঘেরা আলাদা পার্কের দরকার, কর্পোরেশনে এঁরা দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু পুরুষদের চোখের উপর গা মাথা মুছে কাপড় ছাড়তে এঁদের অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ নেই। বেড়া-দেওয়া আলাদা স্নানেব ঘাটের দাবী এঁদের কাছ থেকে ত আসছে না!

বাইরে বেরতে ব্যবহার কবলেও বাড়ীতে অনেক মেয়েই সেমিজ বা জামা ব্যবহার কবেন না। একান্ত ঘরের জনেব মধ্যেই চলাফেরা বলে অনেকেরই নাকি এতে আপত্তি নেই। কিন্তু দেহের লজ্জাটা আপেক্ষিক বলে আমার মনে হয়না। তারপর অন্তঃপুরও যে সব সময়েই একেবারে অপরিচিত লোকের চোখের আড়ালে থাকে এমনও নয়। ক্ষিপ্র কাজকর্ম্মে উঠা নামায় শিথিল শাড়ীব সহায়তায় গাযে একটা জামা থাকা শালীনতার দিক থেকে প্রয়োজনই।

রামানন্দবাবু প্রবাসীর সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে একবার লিখেছিলেন যে পল্লীগ্রামের মেয়েদের দেহের বিশেষঅঙ্গেব লজ্জা রক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা নারী হবণের অন্যতম প্রধান কারণ।

খাঁটি সত্য বলে একে স্বীকার না করে উপায় নেই।

ঘরে যেমনই হউক বাইরে বাঙ্গালী মেয়েরা চালচলন এবং পোষাক পরিচ্ছদে একান্ত লজ্জাশীল এবং ভব্য, এমন মনে হতে পারে। কিন্তু একেবারে উল্টা!

ঘরে নিয়ত গুরুজনের চাপে লজ্জাশীল এই মেয়েরা বাড়ীর বাইরে পা দিলেই একেবারে চরম নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। ক্ষতিটা ষোল আনা পুষিয়ে নেয়। হেমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালীর মেয়ে' নামে কবিতায় লিখেছিলেন।

হাটবাজারে লজ্জাহীন ঘরে কুঁড়ি ফুল।

মনে হয় লজ্জা পালনের গুরু ও বিশ্রী দায়িত্বটা শুধু শ্বশুর শাশুড়ী, ননদ ভাসুর এবং আত্মীয় স্বজনেব জন্যই সংরক্ষিত।

ট্রেনে ষ্টীমারে এঁদের দেখতে পাবেন প্রায় সমস্ত বক্ষ উম্মুক্ত করে ছেলেদের এঁরা স্তন্যপান করাচ্ছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষেব পাশ ঘেঁষে বিস্রস্ত কাপড় চোপড় ও বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী কবে (অজ্ঞানতঃই) গভীর নিদ্রা যাচ্ছে। পিষিয়ে-মথিত করে দেওয়া ভিড়েও দেবতার দর্শনেব জন্য মন্দিরে ঢুকছে।

যশোবের এক নদীতে একটী স্ত্রীলোককে কুমীরে ধবেছিল। কুমীরের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির পর অনেক কষ্টে যখন সে পাড়ে উঠল তখন সে ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন। এমন সময় দূবের নদীর পাড় থেকে কতগুলি লোক স্ত্রীলোকটির সামনে এসে পড়ল। বুদ্ধি করে একটা কাপড় ছুঁড়ে দেওয়া বা দূবে সরে যাওয়াব কোনটাই তারা করল না। তখন স্ত্রীলোকটী ফের নদীর জলে লাফিয়ে পড়ল এবং মুহূর্ত্তেই কুমীরটা তাকে নিয়ে অদৃশ্য হলো। লজ্জার খাতিবে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে সে ইতস্ততঃ করলে না।

দৃষ্টান্তগুলি একান্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বলে মনে হবে।

কিন্তু হিন্দু সমাজেব অনেক প্রথাই আশ্চর্য্যরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ।

নারীর সতীত্বকে জগতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে যে দেশ, সে দেশের মেয়েরাই একরাত্রে অতিথি-দেবতার শয্যায় হেলায় তা বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে। সীতা সাবিত্রী যে দেশের মেয়েদের আদর্শ তারাই নাকি ভোৰে উঠে অহল্যা কুন্তীকে স্মরণ করবে, এমনি বিধান!

ভাসুর এবং একটু দূব সম্পর্কের গুরুজনদের সঙ্গে আমাদের মেয়েরা প্রায়শঃ কথা বলে না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর

পুরুষ ও ফেরীওয়ালাদের সঙ্গে কী তাদের সহজ ও স্বচ্ছন্দ আলাপ।

শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে আশঙ্কার কারণটা আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকেই বেশী কিনা!

আর অদ্ভুত তাদের লজ্জা!

পরিধানে একখানা ছোট শাড়ী থাকলে হঠাৎ অপরিচিতের সামনে পড়ে বুকের চেয়ে মুখ ঢাকবার দিকেই তাদের মনোযোগ বেশী।

বাংলা দেশটা গরম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই জন্যই নাকি কষ্ট করে গায়ে একটা জামা রাখবার এমন কী দরকার! কিন্তু গরমের দিনে পরিধানে একটা কাপড় রাখতেও কম কষ্ট নয়! সুতরাং আরাম এবং দেহে বাতাস লাগাবার জন্য জামা বর্জ্জনের কথাটা তা হলে এসে পড়ে।

বাংলা দেশটাই পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণতম দেশ নয়। ভারতবর্ষেরই লু-উড়া রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশের কাছে বাংলা দেশের গরম ত নিরীহ!

বাঙ্গালী মেয়েরা সাধারণতঃ যে ঢিলেঢালা ধরণে শাড়ী পরে তাতে একমাত্র সোজা দাঁড়িয়ে থাকলেই লজ্জা রক্ষা হয়।

বক্ষে আর সে আকর্ষণময় সৌন্দর্য্য নেই বলে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা গায়ে কাপড় রাখবার দিকে প্রায় ছোট মেয়েদের মতই উদাসীন। এটার পিছনে খুব শালীন ভাব নিহিত নেই।

একটা অস্বাভাবিক, একটা বিশ্রী, বিজাতীয় আনন্দ লাভ করবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী মেয়েদের শালীনতা বোধকে আমি আক্রমণ করছি না। এ বিষয়ে এঁদের উদাসীনতা চোখকে পীড়িত কোরে হৃদয়কে আহত করে। মনে হয় সভ্য জাতির নারীদিগের পক্ষে এই শৈথিল্য ফৌজদারী অপরাধের প্রায় সমতুল্য অপরাধ! পথেঘাটে এ রকম বিস্রস্ত স্খলিত দৃশ্য দেখে বিদেশীরা আমাদের মেয়েদের সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করে? প্রশংসমান উচ্চ ধারণা নিশ্চয়ই নয়। আমাদেরকে অসভ্য বলে তাদের মনে যে একটা সহজাত ধারণা আছে এ সমস্ত থেকে সেটা দৃঢ়তরই হয়ে থাকে।

মাসিক পত্রে আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়ার অনেক অসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য জাতির সচিত্র বিবরণ পড়েছি। তাতে নগ্নবক্ষা স্ত্রীলোকদের ছবির বিস্তর দর্শন মিলেছে। এমন ছবি আমাদের দেশের পথেঘাটেও প্রচুর সংগ্রহ করা যায় এবং তাই নিয়ে বিদেশে কোন বিদেশী যদি বাংলা দেশ সম্বন্ধে এক ভ্রমণকাহিনী লেখে, পড়ে আফ্রিকা-অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের পাশে অনায়াসে তারা আমাদের দাঁড় করিয়ে দেবে!

তখন বেদ বেদান্তের দোহাই দিলে চলে কি? তার খবর ওদের দেশের ক'জন লোকে রাখে?

শুধু বিদেশী নয়, ভিন্ন প্রদেশবাসীরাও আমাদের মেয়েদের শালীনতা বোধকে নীচু চোখে দেখে। হাওড়ার দিকে গঙ্গার উপর স্নানের একটা ঘাট ছিল। স্নান সেরে ভিজে কাপড় কলসী কাঁখে যখন তারা গ্রামে ফিরত তখন পথের পাশে আশে-পাশের মিলের কুলীরা দাঁড়িয়ে থেকে বাঙ্গালী মেয়েদের নির্লজ্জতা নিয়ে বিশ্রী হাসি ঠাট্টা করত! ব্যাপারটা কাগজ পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল।

গ্রামে পুকুর ছিল নিশ্চয়ই! কিন্তু গঙ্গায় নিত্য স্নান করে পুণ্য অর্জ্জনের এমনি দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা যে তার কাছে অশ্লীল হাসি ঠাট্টা শোনা তাঁরা গায়েই মাখেন নি।

অশিক্ষিতা নারীসাধারণের এই ধরণের লজ্জাহীনতা যদিও অগ্রাহ্য করা যায় কিন্তু শিক্ষিতা মেয়েদের সজ্ঞান এবং সযত্ন নির্লজ্জতা কিছুতেই মাপ করা যায় না।

না বলে পারছি না, তাঁদের বুকের কাপড় দু'দিক থেকে সরে ক্রমশঃ মধ্যস্থলে এসে সঙ্কুচিত হচ্ছে। ব্লাউজের 'V' টা আয়তনে বাড়ছে এবং তার কোণ দ্রুতগতিতে নীচের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। খেলাধুলায় আজকাল মেয়েদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে খুব। অবশ্যি দৈনিক গৃহকর্ম্মের 'ড্রাজারী' থেকে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজেদের মুক্ত রাখলে শরীরটাকে 'বলিষ্ঠ' রাখবার জন্য এক আধটু খেলাধুলার প্রয়োজন আছে বৈকি! কিন্তু এর প্রকাশ্য পরিচয়টা কিশোরীদের পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকলেই বোধ হয় ভাল হয়। হাফ প্যান্ট পরে তরুণীরা বেড়াবাজী দৌড়াচ্ছে, দিচ্ছে লম্বা লাফ, উঁচু লাফ, কষ্টিউম পরে প্রকাশ্যে সাঁতরাচ্ছে, আমাদের চোখে কতটা সহনীয় হবে বলা যায় না।

লেখাপড়া শিখে আজকালকার মেয়েদের চালচলন আচার ব্যবহার যে আশ্চর্য্য উন্নত, মার্জ্জিত ও সুন্দর হয়েছে এ কথা কে না স্বীকার করবে? এতদিন পরে মেয়েরা যেন তাদের নিজেদের সত্তা খুঁজে পেয়েছে। সুষ্ঠু শাড়ী পরা সপ্রতিভ সচেতন মুখ, নির্ভয় সহজ গতি, মেয়েদের পথে দেখলে শ্রদ্ধা না হয়ে পারেনা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারে তারা এমন অভদ্রতার পরিচয় দেয় যে ক্ষণেকের তরেও সমস্ত ভুলে একটী নম্র নতমুখী গ্রাম্য তরুণীর দিকেই মন ফিরে যায়।

মনে হয় নতুন অনভ্যস্ত স্বাধীনতায় এদের অনেকেরই মাথার নেই ঠিক।

একটা পরিপূর্ণ 'বাসে' কোন যুবক নবাগতা একটী তরুণীকে নিজের আসনে এসে বসতে আহ্বান করলে তরুণী উত্তর দিলে, আপনিই বসুন না, আমাদের এত অসহায় ভাবেন কেন?

সহজ ভদ্রতার কী চমৎকার অভদ্র উত্তর!

কিন্তু আমরা জানি মেয়েদের হষ্টেলের জন্য মাসীমারা ছেলেদের মেস বা হষ্টেলের কাছাকাছি বাড়ীগুলিই পছন্দ করেন, রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ অধ্যুষিত এই কলকাতাতেও।

শিক্ষিত মেয়েদের এমনি অভদ্র রুক্ষ ব্যবহারের বহু পরিচয় আমি জানি। এ কি দারচিনির ঝাল?

কিন্তু আশঙ্কা হয় মিষ্টির চেয়ে দিন দিন ঝালটাই না বেশী হয়ে ওঠে।

২। মেয়েদের শিক্ষা

শ্রীমতী সরলা দেবী

আমাদের দেশে যে নারী জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে এবং নারীদের পর্দ্দাপ্রথা উঠিয়া যাইতেছে ইহা খুবই মঙ্গলের বিষয়, কিন্তু এই জাগরণ যে এক এক বিষয়ে সীমা ছাড়াইয়া অনিদ্রা রোগে দাঁড়াইতেছে, আমি সেই বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে চাই।

জাগরণের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে বিদ্যাশিক্ষা ও পুরুষের সমকক্ষ হইয়া চলা,—তাহার পর আর সব।

কিন্তু এই উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া মেয়েদের মানুষ করিতে গিয়া মেয়েদের জননীরা বা অভিভাবক অভিভাবিকারা অনেক বিষয়ে গলদ পাকাইয়া বসেন।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রঘরের মেয়েদের ১২।১৩ বছর বয়স হইতে না হইতেই বিবাহ হইয়া যাইত। কাজেই অবিবাহিত মেয়েদের কোন রূপ পর্দ্দাপ্রথা ছিল না। কিন্তু এখন যখন ঘর ঘর ১৫।১৬ বা তাহার চাইতেও বেশী বয়সের মেয়েরা অবিবাহিত থাকে (বিদ্যাশিক্ষার জন্যই হউক বা অর্থাভাব বশতই হউক) তখন তাহাদের নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তা ও মাধুর্য্য রক্ষার দিকে বড়দের কড়া নজর রাখা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি দেখিয়াছি অনেক স্থলেই তাহা রক্ষিত হয়না।

আমি যখন রেঙ্গুনে ছিলাম তখন এক সময় আমাদের পাশের বাসায় একঘর মাদ্রাজী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের চাল চলন লক্ষ্য করিবার আমার সুযোগ ছিল।

সেই গৃহস্থের একটী কুমারী কন্যা লছমী অবাধে বাহিরে চলা-ফিরা কথাবার্ত্তা ইত্যাদি করিত—কিন্তু যৌবন-সঞ্চারের পর লছমীকে গৃহকোণে বন্দী করা হইল, পিতা ও সহোদর ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতে দেওয়া হইত না। উহাদের দেশে এইরূপ নিয়ম। সকল মেয়েকেই 'বড়' হইবার পর অন্তঃপুরে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু বিবাহের পরই মেয়েরা পুনরায় স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করে, আর কোন বাধা থাকে না।

বিবাহ হইলেও মাদ্রাজী রমণীরা ঘোমটা দেয় না। সকল পুরুষের সম্মুখে বাহির হয় কিন্তু অপরিচিতের সহিত বাক্যালাপ করেনা, স্বল্প পরিচিতের সহিত অপ্রয়োজনীয়

কথা বলেনা। পুরুষের চক্ষুর সহিত চক্ষু মিলিত করে না, মুখ খোলা থাকে কিন্তু দৃষ্টি থাকে নত।

মাদ্রাজী রমণীদের এই স্বভাবটি আমার বড়ই মধুর লাগে। আমাদের দেশে সকল স্থানে ঠিক এইরূপটি হয় না। বেশীর ভাগ নারীরা (বিবাহিতা অবিবাহিতা দুই) হয় একেবারে অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকেন, আর নয় এমন ভাবে পুরুষদের সাথে মিশিতে থাকেন যে তাঁহারাও যেন পুরুষ হইয়াই জন্মিয়াছেন, পুরুষের নিকট হইতে তাঁহাদের দেহের বা মনের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিবার যেন কোনই প্রয়োজন নাই।

পুঁথি গত বিদ্যা এবং শিল্প শিখিলেই যে নারীর শিক্ষা চরমে উঠে না, শালীনতা ও লজ্জা যে সর্ব্ব প্রথমে দরকার আজকাল অনেকেই তাহা ভুলিতে বসিয়াছেন।

জ্ঞানীদের নিকট আমার প্রার্থনা তাঁহারা যেন এই বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করিয়া জাতির কল্যাণ সাধন করেন।

৩। বাঙ্গালী জাতির পোষাক

শ্রীসুশীলকুমার দেব

বাঙালী পুরুষের পোষাক :

মাপা-জোখা রকমারি পরিচ্ছদ (কোট্ টুপি ট্রাউজার ইত্যাদি) পৃথিবীতে সর্ব্বাগ্রে বোধ হয় চীনেরাই প্রবর্ত্তন করেন; এম্নি সভ্যতার আরো নানান উপকরণ সর্ব্বপ্রথম চীনাদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন কাঁটা দিয়ে তুলে আশ্চর্য্যজনক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভাত-তরকারী টেবিল চেয়ারে বসে আহার।

তদানীন্তন ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে সাধারন পোষাক ছিলো ধুতি ও চাদর। এই ধুতি-চাদর রোমক ও গ্রীকেরাও পরিধান কর্‌তেন—ধুতি লম্বা-চৌড়া, চাদর তার চাইতে ছোটো। চাদরখানাই রোমকদের কাছে টোগায় পরিণত হয়েছে, যার থেকে আমরা করে নিয়েছি চোগা-চাপকানের চোগা।

ইরান্ জয় করে আলেকজান্দার বনেদি ধুতি-চাদর ত্যাগ করে ট্রাউজার পর্‌তে সুরু করেন। সেই থেকেই কোট্-ট্রাউজারের ফ্যাসান্ চল্‌তি হয়ে দাঁড়ালো। গ্রীসের সভ্যতা গ্রহণ কর্‌লে য়ুরোপ; য়ুরোপ থেকে ঐ পোষাক ছড়িয়ে পড়্‌ল মার্কিন দেশে এবং আশ্চর্য্য যে পাশ্চাত্য শ্বেত জাতি যেখানে পদার্পণ করেছে সেখানেই ঐ অভূতপূর্ব্ব পোষাকের প্রবর্ত্তন করে ছেড়েছে। (অবশ্য ভারতবর্ষেও প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধের পোষাক রূপে লম্বা কোর্ত্তা ও ট্রাউজার ধারণ কর্‌তেন।) তাতে পৃথিবীর নানাস্থানে পরিচ্ছদের ঐক্য স্থাপিত হবার পক্ষে সুবিধে—ব্রাদারহুড্ অব্ নেসন্সের তাতে জয়জয়কার হবে বটে!

কিন্তু আধুনিক ভারতের পক্ষে টাল সাম্‌লানো দায়। ভারত ঐক্যের দেশ নয়, বৈচিত্র্যের সমন্বয়ের দেশ; প্রয়োজন-ঘটিত যন্ত্র-সাধিত সাধারণ তন্ত্রের দেশ নয়, ধর্ম্ম ও ললিত-কলা-পরিশীলনোপযোগী বহুমুখী শিল্প-সংরক্ষণের দেশ। এ-দেশে য়ুটিলিটির চেয়ে আর্টের মূল্য বেশী। য়ুটিলিটির বাহন জড়যন্ত্র—ঐক্য সাধনে এর সাফল্য; আর্টের বাহন জীবন্ত ব্যক্তিত্ব—বৈচিত্র্যময় আত্ম-প্রকাশে এর পরিপূর্ত্তি। য়ুটিলিটির ক্ষেত্র সমষ্টি: ঐক্যের সাফল্যের মধ্যে তাই ডেমোক্রেসীর বহর। আর্টের ক্ষেত্র ব্যষ্টি, বৈচিত্র্যের সঙ্গমে তাতে বর্ণাশ্রম বিভাগের উৎপত্তি।

সুতরাং অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় পোষাকেও যে আমাদের বৈচিত্র্য থাক্‌বে, তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হবার নেই। বাঙালীর কাছে পরিচ্ছদ ললিত-কলায় আত্ম-প্রকাশের একটি উপায়। প্রত্যেক বাঙালী যেদিন স্ব-স্ব পরিচ্ছদে অলঙ্করণোচিত স্বাধীন রুচির পরিচয় দেবে, সেদিনই বুঝ্‌তে হবে পরিচ্ছদ-শিল্পে বাঙালী আত্ম-প্রকাশ করেছে।

য়ুরোপের দৃষ্টি ধার করে যাঁরা আমাদের সংস্কার করতে চান তাঁরাই এই বৈচিত্র্য রক্ষার বিরোধী। পোষাককে আমরা দেখি শিল্পীর দৃষ্টিতে তাই বাঙালীর পোষাক শুধু একরকম নয়। কেউ মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরেন, কেউবা সাড়ে তিন হাত কোঁচা দোলান্ সামনের দিকে; কেউ দেন্ পাঞ্জাবীর 'পরে চাদর, কেউবা সার্টের 'পরে; কেউ আবার সার্ট গায়ে দিয়ে কোট্ পরেন—সার্টের কলারটি কোটের ওপর তুলে দিয়ে, কেউবা সার্টের কলারকে অমন করে তুলে দেন্ না; কারুর বা গলা-বন্ধ কোট্ কারুর বা 'অপ্‌ন্ ব্রেষ্ট্'; আবার কেউ পায়জামার পক্ষপাতী, কেউবা সলোয়ার্ পরতে ইচ্ছুক। সামাজিক নিয়মকে যাঁরা ব্যক্তির খেয়াল কল্পনা ও রুচির চেয়ে বড়ো করে দেখেন তাঁরা আমার কথায় আপত্তি তুলবেন, বোলবেন—এম্‌নি ধারা বিশৃঙ্খলায় সমাজের ডিসিপ্লিন্ বজায় থাকে' না। আমি বোল্‌ব, ডিসিপ্লিন্ প্রয়োজনের নোকর—সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানে তার চাকৃরি; কিন্তু ব্যক্তি যেখানে পোষাকের দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করতে চেষ্টিত সেখানে অবিসংবাদিত অধিকার তো ললিতকলার; সমাজের ডিসিপ্লিনে বাধা যদি না জন্মায় তাহলে পরিচ্ছদীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকুক না; তাতে সমাজের ক্ষতি তো নেই বরং তাতে ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের বিকাশ সম্ভব। তাই আমি বাঙালীর পরিচ্ছদ-সাম্যের বিরোধী এবং বৈচিত্র্য-চর্চ্চার পক্ষপাতী।

তাছাড়া বাঙালীর বিচিত্র পরিচ্ছদের উন্নতিরও যথেষ্ট অবকাশ আছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মধ্যে ইরাণী কোট্-ট্রাউজার, বোমকও গ্রীকোচিত সার্ট, পাঞ্জাবীদের পাঞ্জাবী, আর্য্যদের অনুকরণে ধুতি-চাদর যা-আছে তার মধ্যে সৌষ্ঠব সম্পাদিত করাই পোষাক বিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য। য়ুরোপে যেমন প্যারিস্ থেকে মেয়েদের এবং লণ্ডন থেকে পুরুষের পোষাক নিত্যই নব নব সংস্কারে সংস্কৃত হয়ে বেরুচ্ছে তেম্‌নি বরং আমাদের কোনো কোনো মিল্-ওয়ালা, মার্চ্চেন্ট্ বা পরিচ্ছদ-শিল্পী নর-নারীর পোষাকের সংস্কার-কেন্দ্র স্থাপন করুন।

তবে যাঁরা গরীব তাঁদের সর্ব্বাঙ্গীন আভিজাত্য-বিধায়ক সংস্কারের উপক্রমণিকা-রূপে আর্থিক সংস্কারই প্রথমতম কর্ত্তব্য। তাঁদের পরিচ্ছদ যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় তাহলেই পরিচ্ছদ-কলার প্রাথমিক উন্নতি হলো। অধিকতর কল-কারখানার ফলে বাঙালীর মধ্যে শ্রমিক সংখ্যার বাড়্‌তির সঙ্গে পরিচ্ছদ-পরিচ্ছন্নতার আবশ্যকতাও বাড়্‌বে। এই প্রসঙ্গে একটা য়ুটিলিটি-সঙ্গত প্রস্তাব করা যাক্। মজুরদের পক্ষে ধুতি ও কোট্ বা পুরো হাতার সার্ট অনুপযোগী। অতএব আজানু পেণ্ট্ ও আ-কনুই-লম্বিত হাতার সার্ট কলের কর্ম্মী তথা ক্ষেতের চাষীর পক্ষেও উত্তম পরিচ্ছদ বলে গণ্য হতে পারে। টেকসই হেতু খরচও বেশী নয়। এরূপ জাঙ্গিয়া ও ফতুয়ার সঙ্গে একজোড়া জুতো হলে মধ্যবিত্ত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা মার্চ্চেন্ট্‌কেও বেমানান্ হবে না। কর্ম্মী মধ্যবিত্তের পক্ষে আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী জাঙ্গিয়া-ও-ফতুয়ার সঙ্গে উপ্‌রি পুলোভার ও কোর্ত্তা 'অধিকন্তু' স্থলে 'ন দোষায়' হবে।

যাঁরা অর্থশালী ও তুলনায় বেশী অবসর-ভোগী তাঁদের পক্ষেই পোষাকে রুচির চর্চ্চা সমধিক সম্ভবে: বিলিতি দামী প্যাটার্নের দামী হ্যাট্-কোট্ পেণ্ট্-টাই অথবা দামী দিশী চটকদার পোষাক যথা-অভিরুচি পরতে পারেন। সুতরাং এঁদের পক্ষে তো সার্ব্বজনীন পোষাক একেবারেই অসম্ভব।

পরিচ্ছদ-প্রসাধনের বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রগতিসূচক একটি বিশেষ আইন করা উচিত মনে করি: সকলেরই পোষাক যাতে 'স্মার্ট' হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। Smartness পরিচ্ছদ-শিল্পের একটি বিশেষ গুণ। ভারতে তথা বাঙ্‌লা দেশে পার্শী মহিলা ছাড়া এ বিষয়ে আর কাউকে বড়ো একটা মনোযোগ দিতে দেখা যায় না। অবশ্য বাঙালীদের স্মার্ট হবার পক্ষে গুরুতর বাধা আকৃতির খর্ব্বতা ও কলেবরের বিপুলতা। ডন-কুস্তি দ্বারা সুসমঞ্জস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের অভাব এবং অতিমাত্রায় শর্করাজাতীয় খাদ্য আহার এর কারণ। দেহালঙ্করণ শিল্পে আঙ্গিক সুসঙ্গতি যে সুন্দর পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি করে তা প্রতীচ্য দেশ থেকে আমাদের শেখা উচিত।

৪। নামের পদবী

শ্রীস্বরূপ গুপ্ত

গত ফাল্গুন সংখ্যার 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত মণি গঙ্গোপাধ্যায় নামের পদবী সম্বন্ধে যে প্রশ্নটি তুলেচেন সেটা সত্যিই প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার। মণিবাবু বলেচেন যে, পুরুষদের বেলায় আমরা সুরেনবাবু বা উপেনবাবু ব'লতে পারি কিন্তু মেয়েদের তেমন কিছু ব'লতে পারিনে। এখন আমরা মেয়েদের রুবিদেবী বা ইলাদেবী ব'লে থাকি, আর বেশী ঘনিষ্ঠ হ'লে অনেক সময় রুবি বা ইলা। সেইটাই চালাতে দোষ কি? এটা মণিবাবুর কাছে 'কেমন কেমন ঠেকে' কেন বুঝতে পারলেম না। সুরেনবাবু ব'লতে কোন মেয়ের যদি সঙ্কোচ না হয় তো পুরুষের ইলা দেবী ব'লতে কেন অসুবিধা হ'বে? এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা ব'লব। অপরিচিত পুরুষকে আমরা 'মশায়' ব'লে সম্বোধন করি, কিন্তু মেয়েদের ডাকবার কিছু নেই (ওদেশে যেমন Madam বা madamoiselle) মেয়েদের সম্বোধন ক'রতে 'ভদ্রে' কথাটি ব্যবহার ক'রলে কেমন হয়।

কথা যখন উঠেইচে তখন আরেকটি বিষয় উত্থাপন ক'রলে বিশেষ ক্ষতি নেই। ইংরাজীতে Miss ও Mrs. ব'লে কথা আছে, ওর কোন বাংলা প্রতিশব্দ নেই। Miss-এর পরিবর্ত্তে আমরা কখন কখন কুমারী শব্দটি ব্যবহার করি, কিন্তু Mrs. এর পরিবর্ত্তে আমাদের ভাষায় ব'লবার কিছু নেই। আমরা যদি শ্রীমতী ও শ্রীযুক্তা এই কথা দু'টি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি তাহ'লে কি হয়, যেমন, Miss Sen না ব'লে শ্রীমতী সেন এবং Mrs. Bose না ব'লে শ্রীযুক্তা বোস।

এ সম্বন্ধে আলোচনা একান্ত প্রার্থনীয়।

৪ক। নামের পদবী

শ্রীবিনয়কুমার মিত্র এম্-এ, এল্-এল্-বি

ফাল্গুন, ১৩৪০-এর "বিচিত্রায়" শ্রীযুক্ত মণি গঙ্গোপাধ্যায় "নামের পদবী" নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। পরিচিতা মহিলাদের—মণি বাবুর ভাষায় "নারী-বন্ধুদের"—ডাকতে হলে আমরা কি বলব, এই হচ্ছে সমস্যা।

মণিবাবু বলেছেন যে "মিস্ বা মিসেস শব্দটা কানে বড় বিশ্রী বাজে।" পৃথিবীতে শ্রুতিকটু ও শ্রুতি-মধুর দুরকমই কথা আছে, আর যতদূর সম্ভব আমাদের কথাবার্ত্তা শ্রুতি-মধুর হওয়া উচিত। তবে আমার বোধ হয় যে আমাদের পক্ষে 'মিস' বা 'মিসেস্' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা উচিত নয়, এই জন্য নয় যে তা ব্যক্তিবিশেষের কানে বাজে, কিন্তু এই জন্য যে ঐ শব্দ দুটি ব্যবহার করতে হলে আমাদেরকে অনাবশ্যক ভাবে ইংরাজদের অনুকরণ করতে হবে, আর সকলেই স্বীকার করবেন যে অনাবশ্যক অনুকরণ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

বাংলার 'মিস্' বা 'মিসেস্' শব্দের প্রয়োগ অনাবশ্যক কেন, এখন এই হচ্ছে কথা। 'মিস্' শব্দের অনুরূপ যদি কোন শব্দ আমাদেরকে বলতেই হয় তা হলে আমরা 'কুমারী' শব্দের শরণাপন্ন হতে পারি। তা ছাড়া 'মিস্' ও 'মিসেস্' শব্দদ্বয়ের পরিবর্ত্তে আমরা 'দেবী' বা 'শ্রীমতী' শব্দের প্রয়োগ করতে পারি। বিবাহিতার সম্বন্ধে কোন কোন পদবীর সঙ্গে 'জায়া' শব্দ যোগ করিলে চলতে পারে বটে, যেমন 'ঘোষ জায়া' 'মিত্র জায়া' 'দত্ত জায়া' ইত্যাদি, কিন্তু সব পদবীর পরে 'জায়া' শব্দ যোগ করা সম্ভব হলেও তা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ এই রকম করতে হলে আমাদেরকে অনবশ্যক ভাবে শ্রুতিকটু শব্দের প্রয়োগ করতে হবে।

তা হলে আমাদের দুটি শব্দ রইল—একটি 'দেবী', অপরটি 'শ্রীমতী'। আজকাল 'দেবী' শব্দ মহিলা সমাজের মধ্যে অনেকটা চলে গেছে। তবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে 'দেবী' শব্দের তত পক্ষপাতী নই, কারণ পুরুষ যেমন দেব নন নারীও তেমনি দেবী নন। "শ্রীমতী" শব্দের প্রয়োগের দ্বারা নারীর যথেষ্ট সম্মান হতে পারে, আর এই শব্দের প্রয়োগ করে আমরা কোন পরিচিতা মহিলাকে অনায়াসে আহ্বান করতে পারি।

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৭

মনের মধ্যে একটা লঘু সুখের হিল্লোল বহন ক'রে প্রত্যূষে সন্ধ্যার ঘুম ভাঙ্‌ল। নিদ্রায় দেখা সুখস্বপ্নের অস্পষ্ট স্মৃতির চেয়ে খুব যে এমন কিছু বেশি তার মূল্য, তা নয়; কিন্তু তবু যেন জমাট দুঃখের কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে ঝির্‌-ঝিরে একটু হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে,—যেন ঈষদুন্মুক্ত কারাদ্বারের ফাঁক দিয়ে বাহিরের লতাপুষ্পময়ী প্রকৃতির সামান্য একটু অংশ দেখা গিয়েছে। তালা খুলে আমিনা যখন আহবান করলে, 'বেরিয়ে এসো সন্ধ্যা', তখন সে লঘু-পদে আমিনার নিকট উপস্থিত হয়ে উচ্ছ্বসিত পুলকে তাকে জড়িয়ে ধরলে; বললে, "রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল আমিনা?" অর্থাৎ যে প্রশ্নটা আমিনারই তাকে করবার কথা, মনের প্রসন্নতায় সে প্রশ্ন সে নিজেই আমিনাকে ক'রে বস্‌ল।

আমিনা স্মিতমুখে বললে, "কোথায় হয়েছিল? তোমার ভাবনায় সমস্ত রাত ঠায় জেগে ব'সে ছিলাম।"

কথাটা সে রসিকতা তা অনুমান ক'রে সন্ধ্যা মৃদু হেসে বললে, "রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল,—না?"

"সে ছিল তোমার ঘরে, বাইরে ত বিষম গুমোট ছিল।"

এটাও যে রসিকতাই হ'তে পারে অতখানি ভাববার সাহস না পেয়ে সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, "সে রকমও হয় না কি?"

সন্ধ্যার হৃদয়ের এই অকুণ্ঠিত সরলতায় মুগ্ধ হ'য়ে আমিনার চক্ষু সজল হয়ে এল; বললে, "সব হয়। এখন এসো, তোমার কাজ কর্ম্ম সেরে দিয়ে এক রাশ বাসন নিয়ে আমাকে আবার পুকুরে যেতে হবে। কাল রাত থেকে দবিরের জ্বর হয়েছে, কাজে আসে নি।"

আগ্রহান্বিত স্বরে সন্ধ্যা বললে, "আমাকেও নিয়ে চল না আমিনা, আমরা দুজনে মিলে বাসনগুলো মেজে ফেলি।"

একটু কৌতুক করবার উদ্দেশ্যে আমিনা ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বিস্ময়ের সুরে বললে, "শোন কথা! হিঁদু ঘরের মেয়ে হ'য়ে তুমি মোসোলমানের এঁটো বাসন মাজবে কি গো?"

আমিনার ধমকে অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে না হয় শুধু আমার আর তোমার বাসনগুলো আমাকে দিয়ো—আমি সেই গুলোই মাজ্‌ব।"

এবার আমিনা সজোরে হেসে উঠ্‌ল; বললে; "এ কিন্তু বেশ কথা বলেছ সন্ধ্যা! তুমি আমি এক জাত, সেই জন্যে আমাদের দুজনের বাসন তুমি মাজ্‌বে,—আর মহবুব, গফুর এরা সব অন্য জাত, তাই তাদের বাসন আমি মাজ্‌ব,—না?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা ক্ষণকাল নিঃশব্দ স্মিত মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বললে, "তুমি বিশ্বাস করবে কি না বলতে পারিনে আমিনা, তোমার বাসন মাজ্‌তে আমার মনে কিন্তু একটুও খারাপ লাগ্‌বে না।"

আমিনা বললে, "আচ্ছা, তা হয়ত লাগ্‌বে না, কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে আমি বাসন মাজ্‌তে দেবো কেন। ও কি তোমার কাজ? তুমি বড় লোকের মেয়ে, বড় লোকের বউ,—তুমি কি ও কাজ কখনো করেছ? তার চেয়ে চল, পুকুরঘাটে ব'সে তুমি আমার সঙ্গে গল্প করবে, আর আমি তোমার গল্প শুনতে শুনতে বাসনগুলো মেজে ফেল্‌ব। বল ত আমি গফুর ভাইয়ের মত নিয়ে আসি।"

অগত্যা সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, তাই তা হ'লে চল।"

"কিন্তু কেউ তোমাকে পুকুরঘাটে দেখে ফেললে তুমি আমার কে হও বলবে, বল ত?"

সলজ্জ হাস্যের সহিত সন্ধ্যা মৃদু স্বরে বললে, "ননদ?"

"ননদ কেন? ননদ ত পর হয়ে অন্য বাড়ি চ'লে যায়।

তার চেয়ে জা' বোলো। তবু পাতানো সম্পর্কে মনে-মনেও এক সঙ্গে থাকা যাবে।"

ক্ষণকাল একটু কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু জা ত' বিয়ে না হ'লে কিছুতেই হয় না,—ননদ আইবড়োও হ'তে পারে।"

জা কথাটা সন্ধ্যার মনে কোন্‌খানে বাধ্‌ছে বুঝ্‌তে পেরে আমিনা বললে, "কিন্তু তোমার স্বামীকে আমার স্বামীর ছোট ভাই ব'লে ধরলেও ত কোনো ক্ষতি হয় না সন্ধ্যা।"

আমিনার কথায় সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; মৃদু স্বরে বললে, "না, ক্ষতি হয় না।"

হাসিমুখে আমিনা বললে, "বেশ, তা হ'লে কারো সাম্‌নে প'ড়ে গেলে দুজনেই দুজনের জা হব,—কেমন?" তারপর সন্ধ্যার সীমন্তের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সে বললে, "ননদ হ'লেও ত তুমি আইবড়ো ননদ হ'তে পারতে না সন্ধ্যা? সিঁতের সিঁদুর রয়েছে যে।"

অপহৃত হবার পর থেকে কোন দিনই সন্ধ্যা নূতন ক'রে সীমন্তে সিঁদুর দিতে পারে নি, কিন্তু যেটুকু সিঁদুর তার মাথায় ছিল সেটুকুকে সে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে। ধুয়ে যাবার আশঙ্কায় স্নান করবার সময়ে মাথার সম্মুখ দিক জলে ভিজ্‌তে দেয় নি, ঝ'রে যাবার ভয়ে চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াবার কথা মনেও ভাবে নি, তা ছাড়া কেশগুচ্ছের মধ্যে সর্ব্বদা তাকে প্রচ্ছন্ন রেখে সর্ব্বপ্রকার বাহিরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। এই সিঁদুরের বিন্দুটি তার বিবাহিত জীবনের পরিচিতি,—তার দাম্পত্য-দলীল পত্রের শীলমোহর, তার আয়তির সঙ্কেত।

আমিনার কথা শুনে নিরুদ্ধ কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "এখনো দেখা যায়?"

সন্ধ্যার সীমন্তে পুনরায় দৃষ্টিপাত ক'রে আমিনা বললে, "ঠাওর ক'রে দেখ্‌লে বোঝা যায়। কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। সিঁদুর পরবে সন্ধ্যা? জোগাড় ক'রে দোবো?"

শুনে সন্ধ্যার চোখে জল দেখা দিলে; বললে, "যদি কোনো দিন এখান থেকে মুক্তির জোগাড় ক'রে দিতে পার সেদিন সিঁদুরও জোগাড় ক'রে দিয়ো ভাই, এখন থাক।"

গফুরের অনুমতি পেতে বিলম্ব হ'ল না, বাসন-পত্র নিয়ে আমিনা ও সন্ধ্যা পুকুর ঘাটে গিয়ে বস্‌ল। সন্ধ্যার নির্ব্বন্ধ সত্ত্বেও আমিনা কিছুতেই তাকে বাসন স্পর্শ করতে দিলেনা;—বললে, "বেশি যদি দুষ্টুমী করো, ঘরে তালা বন্ধ ক'রে রেখে আস্‌ব। আমার পাশে ব'সে লক্ষ্মী হ'য়ে গল্প কর।"

বাসন মাজার কাজে অংশীদার হবার কোনো আশা নেই দেখে অগত্যা সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে তুমিই গল্প কর আমিনা।"

"কিসের গল্প করব বল?"

"তোমার স্বামীর গল্প।"

বিস্ময়ের সুর টেনে আমিনা বললে, "স্বামীর গল্প? স্বামী বাঘ না ভালুক, ভূত না প্রেত যে স্বামীর গল্প করব? তার চেয়ে একটা ভূতের গল্প বলি।"

সন্ধ্যা বললে, "ভূতের গল্প রাত্রে বোলো, ভাল লাগ্‌বে।"

"তা হ'লে রাজকুমারীর গল্প বলি শোন।" বলে সন্ধ্যার মতামতের জন্য অপেক্ষা না ক'রে বলতে লাগ্‌ল, "এক ছিল পরমা সুন্দরী রাজকন্যা, তার বিয়ে হ'ল এক দেশের এক রাজকুমারের সঙ্গে। অল্প সময়ের মধ্যে দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল। রাজকুমারীকে নিয়ে রাজকুমার তার বাড়ি ফিরে চলেছে, এমন সময়ে পথে ডাকাতের দল প'ড়ে রাজকুমারীকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরের দেশে। সেখানে ডাকাতদের বাড়ি বাস ক'রে দুঃখে কষ্টে রাজকুমারী একদিন প্রাণ দিতে তৈরি হয়েছে, এমন সময়ে সে বাড়িতে অন্য গ্রাম থেকে একটি মেয়ে এসে হাজির।—"

আমিনাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "সে মেয়েটির নাম আমিনা। আর সেই হরণ ক'রে আনা হতভাগিনী রাজকন্যার নাম সন্ধ্যা। প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার জন্য সন্ধ্যা একেবারে দৃঢ় সঙ্কল্প, এমন সময় যাদুকরী আমিনা তার কানে এমন সব মন্ত্র ঝাড়লে যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা পোড়ারমুখীর মুখে বড় একবাটি দুধ একেবারে শেষ হয়ে গেল। তারপর এক নিশীথ রাত্রে কি রকম অদ্ভুত উপায়ে ডাকাতদের বাড়ি থেকে উদ্ধার

ক'রে আমিনা সন্ধ্যাকে তার শ্বশুরবাড়ী পাঠালে সে গল্প শুনবে ভাই ?"

সকৌতুকে আমিনা বললে, "বেশ ত' বল, শুনব।"

বলা কিন্তু হ'য়ে উঠ্‌ল না, পদশব্দে উভয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখ্‌লে মহবুব আসছে। মহবুবকে দেখে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি দেহের বস্ত্র সংযত ক'রে নিয়ে পুষ্করিণীর জলের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে রইল। নিমেষের মধ্যে স্বপ্ন-রাজ্যের আলো গেল মিলিয়ে—চোখে মুখে ফুটে উঠ্‌ল অকরুণ কাঠিন্য।

নিকটে এসে মহবুব বললে, "হামিদাকে এখানে এনেছিস যে আমিনা ?"

আমিনা স্মিতমুখে বললে, "তা হামিদা চিরকালই তালাচাবির মধ্যে বন্ধ থাকবে না কি ?"

আমিনার কথায় আশ্বাস পেয়ে খুসী হয়ে মহবুব বললে, "না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।" তারপর একটু কেশে আমিনার মনোযোগ আকৃষ্ট করে মুখ চক্ষুর বিশেষ ভঙ্গী এবং মস্তকের বিশেষ সঞ্চালনের দ্বারা আমিনাকে যে নিঃশব্দ প্রশ্ন করলে, তার অর্থ, পোষ মেনে এল ?

উত্তরে আমিনা তার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর একটুখানি অগ্রভাগ দেখিয়ে যে কথা ব্যক্ত করলে, তার অর্থ, একটু একটু।

তর্জ্জনীর অতটুকু অংশ দেখে মহবুবের পিত্ত উঠ্‌ল জ্বলে! মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল মুখের প্রসন্ন কোমল ভাব। দক্ষিণ পদ সজোরে মাটিতে ঠুকে কঠোরস্বরে গর্জ্জন করে উঠ্‌ল, "তোর বদমাসী আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, তুই আসল শয়তান !"

আমিনার চক্ষু-কণিকা জ্বলে উঠ্‌ল। হাতের বাসনটা একটু ঠেলে দিয়ে পিছন ফিরে ব'সে বললে, "তোমার যখন বোন, তখন ও কথা তুমি বলতে পার, কিন্তু মনে রেখো মহবুব ভাই, আমি আমার শ্বশুরের পুত্রবধূ !"

মহবুব ব্যঙ্গস্বরে বললে, "ওঃ ভারী শ্বশুর! একেবারে দবীপুরের নবাব !"

"না, দবীপুরের নবাব নয়, কিন্তু দবীপুরের ডাকাতও নয়,—ভদ্রলোক !"

"খানদানি বংশ !"

আমিনা কঠোরস্বরে উত্তর করলে, "খানদানি বংশ ত' বটেই, তা ছাড়া তাঁর ইজ্জতের জ্ঞান এত বেশী যে, আমাকে শয়তান বলেছ শুনলে তাঁর বাড়িতে তোমার তলব পড়বে !"

আমিনার অগ্নিমূর্ত্তি দেখে মহবুব তার সঙ্গে আর কোনও কথা না ব'লে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠ্‌ল "হামিদা !"

সন্ধ্যা বিবর্ণমুখে ফিরে দেখ্‌লে।

মহবুব বললে, "আজ রাতে আমি দারু পিয়ে বাড়ি ফিরব। তুমি তৈয়ার হয়ে থাকবে। সেদিনের মত আজ আমি তোমার ঘরে শোব। দরজা খুলতে গোল করলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দোবো। বুঝলে ?"

উত্তর দিলে আমিনা। দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "বুঝলাম !" তারপর সন্ধ্যার দিকে ফিরে বললে, "তুমি খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়ো হামিদা, আমি সারারাত তোমার দরজায় পাহারা দোবো। দেখি কে কি করে !"

মহবুব গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল, "আচ্ছা আমিও দেখ্‌ব তুই কত বড়—" সেই শয়তান কথাটাই পুনরায় মুখে আস্‌ছিল—কিন্তু ও কথাটা উচ্চারণ করলে আমিনার শ্বশুরবাড়িতে তলব পড়বার কথা উঠেছে—সুতরাং ওটা মুখেই আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এমন কোনো কথাও মনে এলনা যাতে উষ্মা প্রকাশ হয় অথচ আমিনার শ্বশুরবাড়ি তলব পড়বার কথা ওঠে না। অগত্যা আমিনার প্রতি তীব্র দৃষ্টির একটা অগ্নিবর্ষণ ক'রে বিড় বিড় ক'রে বক্‌তে বক্‌তে মহবুব প্রস্থান করলে।

আমিনা আবার পূর্ব্বস্থানে উপবেশন ক'রে বাসন হাতে নিয়ে সহজ কণ্ঠে বললে, "নাও সন্ধ্যা, এবার তোমার মুক্তির গল্প আরম্ভ কর।"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখে একটা বিশীর্ণ হাসি ফুটে উঠ্‌ল। আমিনা বুঝ্‌তে পারলে যে-স্বপ্ন নিষ্ঠুর আঘাতে বিলুপ্ত হয়েচে সে আর শীঘ্র ফিরে আসবে না।

৮

দ্বিপ্রহর। মহবুব সকাল সকাল খেয়ে কাজে বেরিয়েছে, আমিনাও তার কোন্ এক বাল্য সঙ্গিনীর বাড়ি বেড়াতে

গেছে ; যাবার সময়ে সন্ধ্যাকে ব'লে গেছে, ফিরতে বিলম্ব হবে না, ফিরে এসে তাকে নিয়ে পুকুর ঘাটে গিয়ে বসবে।

সন্ধ্যার ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শিকল টানা। ঘরের ভিতর ভূমির উপর শুয়ে সে নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করছিল। সৎ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে, কলিকাতার কমলা গার্লস্ স্কুলের ছাত্রী, ধনী ও বনেদী বংশের বধূ—এ কী তার দুর্দ্দশা! চিরদিন আদরে যত্নে পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে সে মানুষ,—পিতামাতার আদরিণী কন্যা, স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর প্রিয়তমা ছাত্রী, শ্বশুর গৃহে সকলের আদরের বউ,—সহসা কোন্ মহাপাপে সে বন্দিনী হ'ল ডাকাতের ঘরে ?—সেখানে তার সদ্যবিকসিত নারীত্ব কি ঘৃণিতভাবে অপমানিত হ'ল, বিমর্দ্দিত হ'ল! কিন্তু, কেন? কোন্ অপরাধে? যে প্রায়শ্চিত্ত এত প্রকট হ'য়ে উঠ্ল তার পাপ চোখে দেখা যায় না কেন? সহসা অন্তরের সমস্ত দুঃখ বেদনাকে অতিক্রম ক'রে একটা তীব্র ক্রোধ জাগ্‌ল, অভিমানে সমস্ত শরীরটা যেন বিষিয়ে উঠ্‌ল। চোখ ফেটে জল বেরোবার উপক্রম হ'ল।

আচ্ছা, মৃত্যু হয় না কেন? প্রাণটা কি এতই কঠিন বস্তু যে, কিছুতেই দেহ ছেড়ে যাব হবে না? এত দুঃখ অপমান বেদনাতেও না? একজন সন্ধ্যা মরে গেলে পৃথিবীর কি এমন্ ক্ষতি হবে?—কিছুই না। কিন্তু সে নিজে একেবারে বেঁচে যাবে! দুঃখ লাঞ্ছনার এই কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে জীবনটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার কি কোন অর্থ আছে? কিছু না। একবার ত' সে জীবনটাকে শেষ করবার পথে যাত্রা করেছিল, কিন্তু আমিনা তার মধ্যে এসে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল। সে যদি না আসত তা হ'লে এতদিনে হয়ত সন্ধ্যা এই অপবিত্র কারাগার হ'তে চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করতে পারত। আমিনা বলে বটে সে সন্ধ্যাকে হয়ত একদিন মুক্ত করবে, কিন্তু সে তার মনের সদিচ্ছা মাত্র। হরিণী হয়ে বাঘের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেবার শক্তি তার কোথায়? এ বাড়িতে এসে পর্য্যন্ত সে তাকে অনেকখানি আশ্রয় দিয়েছে বটে, কিন্তু যেদিন আমিনার প্রতি সম্ভ্রম ছিন্ন করে মহবুবের পাশব বৃত্তি উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌বে সেইদিনই সন্ধ্যার আশ্রয় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। সুতরাং যে আশ্রয় পাকা, যে আশ্রয় কোনো অবস্থাতে ভেঙে পড়বার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই, সেই আশ্রয়ের শরণ নিতে হবে। সে মৃত্যু।

আচ্ছা, দুঃখ বেদনার পীড়ন সহ্য করতে না পেরে যারা আত্মহত্যা করে তাদের দুঃখ কি সন্ধ্যার দুঃখের চেয়েও বেশি? কখনই নয়। এর চেয়ে বেশি দুঃখ আর কি হ'তে পারে। এই ঘরের মধ্যেই এমন কোনো উপায় আছে কিনা, যার সাহায্যে জীবনটাকে শেষ ক'রে ফেলা যেতে পারে তা দেখবার জন্যে উঠে ব'সে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতেই সন্ধ্যা দেখলে বাহিরের বারান্দায় জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গফুর।

গফুর বল্‌লে, "এ সময়ে একটু ঘুমিয়ে নিলে না কেন হামিদা? রাত্রে ত নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমতে পার না। তাড়াতাড়ি উঠে বসলে কেন? শরীর ভাল আছে ত?"

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "আছে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এই বেলা একটু ঘুমিয়ে নাও।" ব'লে গফুর পিছন ফিরতেই শুন্‌তে পেলে সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর, "গফুর মিঞা!"

ফিরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার প্রতি সকৌতুক দৃষ্টিপাত ক'রে গফুর বল্‌লে, "গফুর মিঞা! এ ডাক তোমাকে কে শেখালে? আমিনা?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর না দিয়ে আরক্তমুখে দৃষ্টি নত করে রইল।

গফুর বল্‌লে, "আচ্ছা, কি বলবে বল?"

সন্ধ্যা গফুরের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "একবার ভিতরে এস।"

"ভিতরে?"

"হ্যাঁ।"

মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও গফুরের কৌতূহলও কম হ'ল না। ভিতরে কেন? সে কথা ত' জানলা দিয়েও অনায়াসে হ'তে পারত। শিকল খুলে ভিতরে গিয়ে সন্ধ্যার নিকট দাঁড়াতেই চক্ষের নিমেষে যে ব্যাপারটা ঘট্‌ল তাতে গফুরের মত শক্ত লোকেরও বিস্ময়ে মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুরণ হ'ল না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রী ঠিক

যেমন ক'রে দ্রুতবেগে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে, তেমনি ভাবে সন্ধ্যা গফুরের উপর লাফিয়ে প'ড়ে দুই বাহু দিয়ে সজোরে তার দুই পা এমন জড়িয়ে ধরলে যে সাধ্য কি তার সেই সুদৃঢ় বাহুবন্ধন থেকে সহজে পা মুক্ত ক'রে নেয়। তারপর গফুরের পদদ্বয়ের উপর বিস্রস্তকেশ মাথা আকুলভাবে ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমাকে বাঁচাও গফুর মিঞা!—আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দাও। আমি জানি তোমার মনের মধ্যে দয়া আছে, আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমি এমন ক'রে বেশিদিন বাঁচব না,—গফুর মিঞা, আমাকে ছেড়ে দাও।"

জীবনে গফুর অনেককে বিপন্ন করেছে কিন্তু এমন বিপন্ন নিজে কখনো হয়নি। পা টেনে নিতে গিয়ে দেখ্‌লে বজ্রের মত দৃঢ়। বল্‌লে, "ছি হামিদা, পা ছাড়, ছেলেমানুষী কোরো না!"

গফুরের পায়ের উপর মাথাটা আর একটু জোরে ঘ'ষে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তুমি আগে বল আমাকে ছেড়ে দেবে?"

"সে কথা আমি কি ক'রে বল্‌ব হামিদা? আমার ত' সে এখ্‌তিয়ার নেই।"

"আছে, আছে, গফুর মিঞা, তোমার সব আছে! তোমার দয়া আছে, মায়া আছে! আমি তোমার মেয়ের মতন, বাঁচাও আমাকে!" ব'লে আরো দৃঢ়ভাবে সন্ধ্যা গফুরের পা আঁকড়ে ধরলে। যে শক্তি সে প্রয়োগ করলে তা স্বাভাবিক শক্তি নয়, উত্তেজিত স্নায়ুর শক্তি।

"আরে টেনো না, টেনো না! ফেলে দেবে না-কি?" বলে গফুর পেছিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল, কিন্তু দেখ্‌লে এমন দৃঢ়ভাবে সন্ধ্যা তার পদদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন যে, পেছিয়ে গেলে সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়েই পেছিয়ে যেতে হয়। তখন অগত্যা ভূমির উপর ব'সে প'ড়ে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার দুই হাত বলপূর্ব্বক ছাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, "ভালো ফ্যাসাদ দেখ্‌তে পাই! এমন জান্‌লে কোন্ আহাম্মক তোমার ঘরে ঢুকত!"

ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদতে লাগ্‌ল। "তা হ'লে আমাকে মেরে ফেল গফুর মিঞা, বিষ খাইয়ে হোক, ছোরা মেরে হোক, যেমন ক'রে পার মেরে ফেল। তাতেও তোমার পুণ্য হবে। মেরে ফেল্‌তে ত তোমার কোনো বাধা নেই গফুর মিঞা?"

গফুর বল্‌লে, "তুমি অবুঝ হ'য়ে যদি খালি গফুর মিঞা গফুর মিয়াই করতে থাক তা হ'লে আমি তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাই বল? আমার কথা শোন হামিদা, তোমাকে মেরে ফেলবার এখ্‌তিয়ারও আমার নেই। তুমি আমার কাছে গচ্ছিত আছ। রঘু তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেচে। তুমি তার জিনিস, সে ইচ্ছে করলে তোমাকে ছেড়েও দিতে পারে, মেরেও ফেল্‌তে পারে। আমি পারিনে, আমি শুধু পারি যতদিন আমার বাড়িতে তুমি আছ সাধ্যমত তোমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখ্‌তে, জুলুম জবরদস্তির হাত থেকে তোমাকে রক্ষে করতে।"

উঠে ব'সে সন্ধ্যা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "রঘু কে?"

"তোমার উপর যে ডাকাতি হয়েচে, রঘু সে ডাকাতির সর্দ্দার। চুক্তিমত তুমি তার হিস্‌সায় পড়েছ।"

মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হ'লে আমাকে রঘুর কাছেই নিয়ে চল না?"

"রঘুর কাছে তোমাকে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে, তাই রঘুকেই আমি খবর পাঠিয়েছি; সে দু তিন দিনের মধ্যেই এসে পড়বে। তোমার হাঙ্গামা আমি জল্‌দি জল্‌দি চুকিয়ে ফেল্‌তে চাই। রঘু আসা পর্য্যন্ত আমিনা শ্বশুরবাড়ি যাবে না সে কথা আমাদের হয়েচে; কিন্তু সেও বেশি দিন এখানে থাক্‌তে পারবে না, তার শ্বশুরের কাছে দিন আষ্টেকের কথা ব'লে এসেছে। আমিনা থাক্‌তে থাক্‌তে আমি তোমার যা-হয় কিছু ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌তে চাই।"

গফুরের কথা শুনে সন্ধ্যা উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ব্যবস্থা করবে গফুর মিঞা? তুমি যে ব্যবস্থাই করবে তা'তে আমার ভাল হবে তা আমি জানি।"

শুনে গফুর হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "এ বেশ কথা! এই দেখ না, তোমাকে ডাকাতি ক'রে নিয়ে এসে বন্দী ক'রে রেখেচি, তাতে তোমার কত ভাল হচ্চে!"

"সে তুমি দলে প'ড়ে করেছ। আমার জন্যে একা তুমি যা করবে তা'তে আমার কখনই মন্দ হবে না।"

"এ বিশ্বাস তোমার কি ক'রে হল হামিদা ?"

"তা বলতে পারিনে, কিন্তু এ আমার বিশ্বাস। এখন তুমি বল গফুর মিঞা, রঘু এলে তুমি কি উপায় করবে।"

পুনরায় গফুরের মুখে হাসি দেখা দিলে; বললে, "সে কথাও তোমাকে বলতে হবে নাকি ?—এই ধর, তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে রঘুকে খুব বেশি রকম পীড়াপীড়ি করব।"

চিন্তিতমুখে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু সে যদি না ছাড়ে ?"

"তখন কিছু টাকা দিয়ে তোমাকে কিনে নেবার চেষ্টা দেখ্‌ব।"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "যদি না বেচে,—তখন ?"

"তখন আর কি ? তখন তোমার তক্‌দির,—অদৃষ্ট !" ব'লে গফুর তার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী নিজের কপালে ঠেকালে।

সন্ধ্যার মুখে উৎকট বিহ্বলতার গ্লানি ফুটে উঠ্‌ল। বললে, "অদৃষ্ট ? অদৃষ্ট আমার ভাল নয় গফুর মিঞা ! তার চেয়ে তুমি আমাকে রঘু আস্‌বার আগে ছেড়ে দাও ! আমাকে দয়া কর ! আমি তোমার মেয়ের মতন।"

অসম্মতি প্রকাশ স্বরূপ গফুর একবার মাথা নাড়লে, তারপর ঈষৎ দৃঢ়স্বরে বললে, "বুঝলাম তুমি আমার মেয়ের মতন; কিন্তু তুমি যদি সত্যি সত্যি আমার মেয়েই হ'তে তা হ'লেও তোমাকে ছাড়তে পারতাম না। এ যে আমাদের পেশার ইমান হামিদা ! আমার শরিকদার তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেচে, আর আমি তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছেড়ে দোবো ! এটা কি বেইমানি হবে না ? যে কাজ এতটা বয়সে একদিনের জন্যেও করিনি সে কাজ আজ করব ? যা হবার নয় হামিদা, তার জন্যে অনুরোধ করোনা।"

"বুঝেচি, তা হ'লে মরণ ভিন্ন আমারও আর উপায় নেই।" ব'লে সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল।

অপরূপ শোভা ! বর্ষাধারায় সিক্ত অবনমিত শ্বেতকমল কখনো দেখেছ ? কিম্বা ঝঞ্ঝাবাতে ভেঙে-পড়া করবীগুচ্ছ ? তা হ'লে সন্ধ্যার এ সময়কার কমনীয় সৌন্দর্য্য কতকটা উপলব্ধি করতে পারবে। সুন্দরী স্ত্রীলোক যখন হাসে তখন তা'তে বসন্তের শোভা, যখন কাঁদে তখন বর্ষার মাধুরী।

মুগ্ধ-নির্নিমেষ নেত্রে গফুর ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর নিকটে উপস্থিত হ'য়ে সন্ধ্যার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে সদয়কণ্ঠে বললে, "অত অস্থির হয়োনা হামিদা। দেখনা রঘু এলে কি দাঁড়ায়। সে আমার অনেকদিনের দোস্ত, আমার কথা সহজে টাল্‌তে পারবে না। এখন তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখ, আমি চল্‌লাম।" তারপর দু পা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললে, "তুমি আমার মেয়ে হ'লে যা করতাম হামিদা, রঘুর কাছে তোমার জন্যে ঠিক তাই-ই করব।"

সন্ধ্যার মুখ কৃতজ্ঞতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, সে নিঃশব্দে যুক্তকরে গফুরকে নমস্কার জানালে।

বাইরে গিয়ে দরজার শিকল টেনে দিয়ে জান্‌লার সম্মুখে এসে গফুর বললে, "আমার কথা শোনো, এখন একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করো।"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা।"

সকালে মহবুব যে কথা শাসিয়ে গিয়েছিল আমিনার মুখে গফুর তা শুনেছিল। নেশায় উন্মত্ত মহবুবের উপদ্রবে রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হ'তে পারে সেই আশঙ্কায় সে সন্ধ্যাকে ঘুমিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করছিল। রাত্রি কিন্তু নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। মহবুব ফিরল নেশা করেই বটে, কিন্তু এত বেশি রাত্রে এবং নেশায় এত বেশি বিবশ হ'য়ে যে গফুর এবং আমিনাকে দুচারটে গালিগালাজ ক'রেই সেই যে শয্যাগ্রহণ করল ঘুম ভাঙ্‌ল একেবারে সূর্য্যোদয়ের পরে।

কিন্তু ঘুম ভাঙার পরই তৎক্ষণাৎ সে ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। দ্রুতপদে গফুরের নিকট উপস্থিত হয়ে চিৎকার ক'রে ডাকলে, "গফুর !"

শান্তভাবে মহবুবের দিকে তাকিয়ে গফুর বললে, "কি ?"

"রঘুকে আস্‌বার জন্যে তুই খবর পাঠিয়েছিস ?"

"পাঠিয়েছি।"

"কেন ?"

"আমি কিছুদিন বেনোডিতে গিয়ে থাকব। তার আগে রঘুর সঙ্গে দেনা-পাওনা মিটিয়ে নিতে চাই।" বেনোডিতে গফুরের প্রথম পক্ষের শ্বশুর বাড়ি।

মহবুব হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, "তুই বেনোডিতেই যাস্ আর জাহন্নমেই যাস, কিন্তু আমাকে না ব'লে রঘুর কাছে লোক পাঠিয়েছিস্ কেন তার জবাব দে।"

"আমার খুসি।"

"খুসি? দেখাচ্ছি খুসি! যত সব শয়তান আর শয়তানী মিলে সল্লা চলেছে। দিচ্ছি সব এক সঙ্গে শেষ ক'রে।"

গফুর ধীরে ধীরে তার শয্যার উপর উঠে বসল; তারপর মহবুবের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে গভীর অনুত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লে, "আচ্ছা দিস্ শেষ ক'রে, কিন্তু তার আগে একটা কথা শোন্। কয়েকগাছা চুলে পাক ধরেছে ব'লে মনে করেছিস্ বুঝি, হাতের তাকৎ কিছু কমেছে? একবার তাকতের পরখটা হ'য়ে যাবে নাকি?" তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "ভুলে গেছিস যে, সব রকম কসরৎ আমার কাছেই শিখেছিলি। একবার হাতভাঙা কসরৎটা মনে পাড়িয়ে দেবো নাকি?—চিরদিনের জন্যে ডান হাতটা অথম ক'রে দিয়ে? বাঁদর কোথাকার, তুই আমাকে শয়তান বল্‌তে সাহস পাস?—বেরো আমার সামনে থেকে!—"

মহবুবের মুখে এতক্ষণ চলেছিল পট্‌পটির আওয়াজ, তার কাছে এ যেন বোমা! তবুত এখনো ফাটে নি, ফাট্‌বার উপক্রম করেছে মাত্র। গফুরের জ্বলনোন্মত ক্রোধের ভূমিকা দেখে তাকে আর অপমান করতে মহবুবের সাহস হল না; বল্‌লে, "আজ রাতে একটা ভারি কাজ প'ড়ে ফেলেচি, তাই আজ আর কিছু হ'ল না,—কাল সকালে এসে হামিদাকে কল্‌মা পড়িয়ে সাদি করব। সঙ্গে থাক্‌বে বৈজু মাঝির আটজন তীরন্দাজ; কেউ বাধা দিতে এলে, লুঠ্ ক'রে নিয়ে যাব হামিদাকে।"

গফুর হাঁক দিলে, "আমিনা!" স্বর কি গভীর! যেন শ্রাবণ মাসের আকাশের মেঘ গর্জ্জন!

আমিনা নিকটে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সামনে এসে বল্‌লে, "ভাইজান?"

"আমার ঘর থেকে ইস্পাতের তার জড়ানো লাঠিখানা এনে দে ত'।"

"কেন?—কি করবে?" আমিনার মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া।

গফুরের মুখে হাসি দেখা দিলে; বল্‌লে, "ভয় নেই তোর। লাঠি আজকে ব্যবহারের জন্যে নয়। কাল তীর ধনুক নিয়ে আটজন অতিথ্ আস্‌বে, তাদের খাতিরের জন্যে লাঠিটা একটু ঘুরিয়ে ঘারিয়ে রাখ্‌তে হবে ত।"

মহবুব বল্‌লে, "কিন্তু হুঁসিয়ার গফুর! সাদা তীর নয়,—তা'তে জহর মেশানো থাক্‌বে।"

গফুর বল্‌লে, "তা হলে ত আরো জবর! আমিনা একটু খাট্টা টাট্টা কিছু যোগাড় ক'রে দে, লাঠির তারগুলো চকচকে ক'রে ফেল্‌তে হবে।"

গফুরের এই বেপরোয়া লঘু ব্যবহারে অপমানিত বোধ ক'রে মহবুব বিরক্ত হ'য়ে সেস্থান পরিত্যাগ করলে। যাবার সময়ে আরক্ত নয়নে ফিরে তাকিয়ে ব'লে গেল, "এর জবাব কাল সকালে দোবো।"

দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়ার পর আমিনার নিকট উপস্থিত হ'য়ে গফুর বল্‌লে, "আমি একটু বেরোচ্ছি আমিনা, ফিরতে হয়ত দেরী হ'তেও পারে। তুই একটু হামিদার উপর নজর রাখিস।"

এ সময়টা সাধারণত গফুর বাড়িতে থেকেই বিশ্রাম করে, বাইরে যায় না। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে সে প্রায় সর্ব্বদাই বাড়িতে থাকচে। তাই একটু কৌতূহলী হয়ে আমিনা জিজ্ঞাসা করলে, "এমন সময়ে কোথায় যাচ্ছ ভাইজান?"

গফুর মৃদু হেসে বল্‌লে, "শুন্‌লি ত কাল সকালে মহবুব লোকজন নিয়ে আস্‌চে। আমিও একটু ব্যবস্থা ক'রে রাখি। একা একা আটজনের সঙ্গে হয়ত এখনও আমি পারি, কিন্তু এক সঙ্গে আট জনের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। তাই দু'চার জনকে ব'লে আস্‌চি,—কাছে কাছে থাক্‌বে, দরকার হ'লে আস্‌বে।"

চিন্তিত মুখে আমিনা বল্‌লে, "কাল তোমরা দুভায়ে সত্যি-সত্যিই একটা খুনোখুনি কাণ্ড করবে নাকি ভাইজান?"

"তা কি করব বল্? সে যে আমার সামনে হামিদার উপর জুলুম করবে, কিম্বা তাকে লুঠ ক'রে নিয়ে যাবে, এ'ত আমি হ'তে দিতে পারিনে! এ জুলুম ত' শুধু হামিদার উপরই জুলুম নয়,—এ আমার উপরও জুলুম।"

"আর কোনো উপায়ই কি এর নেই?"

মাথা নেড়ে গফুর বল্লে, "আর কোনো উপায়ই নেই।"

এ 'আর-কোনো-উপায়ের' অর্থ যে কি তা মনে মনে উভয়েই বুঝ্লে, এবং এ বিষয়ে বাদানুবাদ নিরর্থক হবে তা-ও বুঝ্তে পেরে উভয়েই সে আলোচনায় নিরস্ত হ'ল।

গফুর প্রস্থান করলে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'য়ে আমিনা বল্লে, "সন্ধ্যা, কি করছ?"

সন্ধ্যা বল্লে, "তোমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছি।"

উদ্বেগে কণ্ঠস্বর কম্পিত নয়, দুশ্চিন্তায় মুখ বিরস নয়। লক্ষ্য ক'রে আমিনা বিস্মিত হয়ে গেল। বললে, "সকালে বাড়িতে যে-সব কথা হয়ে গেল শুনেছ সন্ধ্যা?"

"শুনেছি।"

"তবে?"

"তবে কি বল?"

সন্ধ্যার এ প্রতি-প্রশ্নে আমিনা মনে মনে অপ্রতিভ হ'ল। সত্যিই ত' 'তবে' বল্‌বার কথা ত আমিনারই, সন্ধ্যার নয়। যে বন্দিনী, যে সম্পূর্ণভাবে অসহায় সে 'তবে'র কি জানে? বিস্ময়ের অসংযত অবস্থায় আমিনা বেফাঁস প্রশ্ন করেছে। কথাটা ঘুরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বল্লে, "কাল সকালে বাড়িতে একটা খুনোখুনি ব্যাপার হবে, কি ক'রে যে সাম্‌লাব, তা ভেবে কাঠ হয়ে গেছি।"

শান্ত স্বরে সন্ধ্যা বললে, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো ভাই, এই সামান্য একটা মেয়েমানুষের জন্যে তোমাদের বাড়িতে খুনোখুনি হবে, তা আমি কিছুতেই হ'তে দোবো না। কালকের ব্যাপার আমি সাম্‌লে নোবো।"

সবিস্ময়ে আমিনা বল্লে, "তুমি সামলে নেবে? কি ক'রে সন্ধ্যা?"

"যদি অন্য কোন উপায় না করতে পারি, কাল সকালে মহবুব এলে তার হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করব। বাবার মুখে প্রায়ই শুনতাম, যে-অবস্থাকে কিছুতেই আটকান যায় না তাকে জীবনের মধ্যে সহজভাবে গ্রহণ করতে হয়। আমিও ঠিক করেছি অদৃষ্টের সঙ্গে আর যুদ্ধ করব না।"

চকিতে একবার ঘরের চারিদিক দেখে নিয়ে আমিনা মনে মনে শিউরে উঠ্‌ল। জানালায় উঠে একটা নীচু বাঁশের আড়ায় শাড়ী বেঁধে ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়লেই উদ্বন্ধনের আর কোন আটক নেই। উদ্বিগ্ন মুখে বল্লে, "অন্য কোনো উপায়ের কথা কি বল্‌ছিলে সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বল্লে, "ও কথার কথা। বন্দী ক'রে যাকে একেবারে নিরুপায় ক'রে রেখেছ সে অন্য উপায় আর কি করবে ভাই। আচ্ছা আমিনা, আমাকে বাঁচাবার ত' অনেক চেষ্টা করলে, পারলে না; এখন মরবার জন্যে একটু সাহায্য করতে পার না? এমন একটু বিষ এনে দিতে পার না, যা খেলে তখনি মৃত্যু? তেমন উগ্র বিষ ত' কোল ভীলরা সঞ্চয় ক'রে রাখে শুনেচি।"

আমিনা একটু বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বল্লে, "যা-তা কথা বোলো না সন্ধ্যা।"

নির্ব্বন্ধসহকারে সন্ধ্যা বল্লে, "যা-তা কথা কেন ভাই? একজন পুরুষমানুষকে একথা বল্লে সে যা-তা কথা বল্‌তে পারত,—কিন্তু, আমিনা, তুমি মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের দুঃখ বুঝ্‌বে না ভাই? জীবন কি এতই মূল্যবান জিনিস যে, যে-কোনো অবস্থাতেই তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে? তবে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এত লোক আত্মহত্যা করেছে কেন?"

আমিনা অন্যমনস্ক হ'য়ে মনে মনে কি ভাবছিল, হয়ত সন্ধ্যার সমস্ত কথাটা শুনতেই পায় নি, হঠাৎ তন্দ্রামুক্ত হয়ে বল্লে, "শোন সন্ধ্যা, আজ রাত্রে তোমাকে আমি এখান থেকে উদ্ধার করব মনে করেছি। শুধু মনে করেছি কেন, সে বিষয়ে অনেকটা ব্যবস্থাও করেছি, কিন্তু তার আগে এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটা সর্ত্ত আছে।"

হায়রে জীবন-মরীচিকার মোহময় দীপ্তি! কোথায় গেল নিজের দুরবস্থার প্রতি দুর্জ্জয় অভিমান, কোথায় গেল দৃঢ়নিবদ্ধ সঙ্কল্পের অবিচল স্থৈর্য্য! অধীরভাবে আমিনার দুই হাত দৃঢ়ভাবে ধ'রে সন্ধ্যা বল্লে, "আমি রাজি ভাই,

তোমার সর্ত্তে রাজি। আমি জানি তোমার সর্ত্ত আমার পক্ষে অমঙ্গলের হবে না। এখন বল, আমার উদ্ধারের কি উপায় করেছ।"

আমিনা বল্‌লে, "উদ্ধারের উপায় জেনে তোমার বিশেষ কোনো লাভ নেই, আমি তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দোবোই। কিন্তু সর্ত্তটা তোমার জানা উচিত।"

"কি সর্ত্ত বল ?"

"তোমার স্বামী, বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ী, তোমাকে ফিরিয়ে নিলে আমি যে কত খুসী হব তা তোমাকে বলবার দরকার নেই সন্ধ্যা,—কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ যদি তোমাকে ফিরিয়ে না নেন, বাড়িতে স্থান না দেন, তা হ'লে তোমাকে আমার কাছে আমার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসতে হবে। পিঁজরেপোলে যেতে পারবে না।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার হাসি পেলে। এই সর্ত্ত! সে ফিরে গেলে যারা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যে ছাড়তে চাইবে না, তাদের সম্বন্ধে এই সর্ত্ত! সন্ধ্যা আনন্দের সঙ্গে বল্‌লে, "আমি তোমার সর্ত্তে রাজি আমিনা, কিন্তু পিঁজরেপোল বলছ কাকে ?"

আমিনা বল্‌লে, "গরু, মোষ, ঘোড়া—এই সব গৃহপালিত প্রাণীরা বুড়ো হয়ে অচল হ'য়ে গেলে তাদের পিঁজরেপোলে দেওয়া হয় তা' ত জান ?"

"হ্যাঁ, তা জানি।"

"সেখানে তারা যতদিন বেঁচে থাকে জীবন-ধারণের মত দানা-পানি পায়। আমার শ্বশুর বলেন, তোমাদের হিঁদুদের মাতৃমন্দির অবলা-আশ্রম নামে যে-সব ব্যাপার আছে সবই ঐ-সব হিন্দু মেয়েদের পক্ষে পিঁজরেপোলের মতন, যারা কোনো-না-কোনো কারণে সমাজের মধ্যে আশ্রয় পায় না। যত দিন বেঁচে থাকে সেখানে তারা ভাত-কাপড় পায়, হয়ত কিছু লেখাপড়া শেখে, হয়ত কিছু কাজ-কর্ম্মও করে, কিন্তু তা ছাড়া তাদের ও-জীবন মরণেরই সমান। মেয়েমানুষ যদি ছেলেপিলের মা হয়ে সংসার না করলে—তা হ'লে কি করলে বল ত ?"

অন্যমনস্ক হয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা সত্যি।"

আমিনা বল্‌লে, "আমার সর্ত্তের কথা আর একবার তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সন্ধ্যা। ফিরে গিয়ে তোমার শ্বশুর বাড়িতে কিম্বা বাপের বাড়িতে যদি তুমি স্থান না পাও তা হ'লে তোমাকে আমার শ্বশুর বাড়িতে ফিরে আসতে হবে। আমার শ্বশুরকে তুমি জান-না, অমন উদার লোক আমি আর একটি দেখিনি। তুমি সেখানে একেবারে পুরোপুরি নিজের ইচ্ছামত থাকতে পারবে। যদি সে-বাড়িতে একটা পাকাপাকি ঠাঁই ক'রে নিতে ইচ্ছা কর, আমি আমার দেওর নাসীরের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিইয়ে তাও করে দিতে পারব। ভারী ভাল ছেলে, কল্‌কাতায় কলেজে পড়ে, একটি রত্ন। কিন্তু এ-সবই তোমার ইচ্ছে মত হবে। এখন বল তুমি রাজি কি-না।"

সন্ধ্যার মন তখন মুক্তির স্বপ্নে তন্দ্রিত; বল্‌লে "রাজি।"

"তা হ'লে তোমার উদ্ধারের জন্যে আমি যে ব্যবস্থা করেছি তা শোন। মহবুবের কথা শুনে তখনি আমি একটি বিশ্বাসী লোককে আমার শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছি। রাত্রে গরুর গাড়ি নিয়ে আমার স্বামী আসবেন। কোনো রকমে গফুরের চোখ এড়িয়ে তোমাকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দোবো, আপাতত আমার শ্বশুরবাড়ি। তারপর সেখান থেকে ব্যবস্থা ক'রে তোমাকে তোমার শ্বশুরবাড়ি পাঠাব।"

ব্যগ্রকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আর তুমি সঙ্গে যাবে না আমিনা ?"

আমিনা হেসে বল্‌লে, "আমি কাল সকালে দুই ভায়ের লড়াই দেখে সন্ধ্যার সময়ে যাব। মহবুব এসে যখন দেখ্‌বে চিড়িয়া পালিয়েছে তখন আমি না থাকলে গফুরকে মহবুবের রাগ থেকে বাঁচাবে কে ?"

"আর তোমাকে কে বাঁচাবে ?"

"আমাকে যে বাঁচাবে সে সন্ধ্যেবেলা তোমার কাছে পৌঁছে তোমাকে দুই ভাইয়ের লড়ায়ের গল্প শোনাবে।" ব'লে আমিনা হাসতে লাগ্‌ল।

রাত্রি তখন দশটা, পঞ্চা মাঝি এসে আমিনাকে জানালে যে, ইয়াসিন গাড়ি নিয়ে এসে ধুরিয়ার মোড়ে, অর্থাৎ আমিনাদের বাড়ি থেকে আধ মাইলটাক দূরে অপেক্ষা করছে। আমিনা দেখ্‌লে গফুর আহার ক'রে তার খাটিয়ায় শুয়ে আছে। একটু কাছে গিয়ে লক্ষ্য ক'রে মনে হ'ল

নিদ্রিত। তখন গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ত্বরিত পদে সে ইয়াসিনের নিকট উপস্থিত হ'ল।

ইয়াসিন্ বল্‌লে, "কি হুকুম আমিনা বিবি ?"

আমিনা মৃদু হেসে বল্‌লে, "হুকুম, আমাদের বাড়ি হামিদা নামে যে মেয়েটি আছে আপাতত তাকে নিয়ে বাড়ি যাও।"

"তা'ত আন্দাজে বুঝেছি, কিন্তু তোমার দাদাদের লাঠি মাথায় পড়বে না ত ?"

"লাঠির ভয় করতে গেলে বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করা যায় না।"

"তা যেন হল, তুমি ?"

"আমি ? আমার জন্যে কাল গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো। আমি ঠিক বেলা এগারোটার সময়ে রওনা হবো।"

"তোমার নিজের মাথার কথা মনে আছে ?"

আমিনা স্মিতমুখে বল্‌লে, "আছে। সে-বিষয়ে কোনো ভয় নেই, কাল সন্ধ্যাবেলা আস্ত মাথাই পাবে। আমি চল্‌লাম, এখনি হামিদাকে নিয়ে আস্‌ছি।"

আধঘন্টাটাক পরে সন্ধ্যাকে নিয়ে ফিরে এসে আমিনা বল্‌লে, "হামিদা ইনি আমার স্বামী। এঁর সঙ্গে নির্ভয়ে যাও, কোনো অসুবিধা হবে না।"

সন্ধ্যা যুক্তকরে ইয়াসিন্‌কে নমস্কার করলে।

ইয়াসিন প্রতি-নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি আমাদের বাড়ি যাচ্ছেন।"

আমিনা বল্‌লে, "ও-সব আদব-কায়দা তোমরা গাড়িতে উঠে কোরো। আমি এখন ফিরে চল্‌লাম। গফুরভাই জেগে ওঠ্‌বার আগে তোমাদের খুব খানিকটা এগিয়ে যাওয়া দরকার।" ব'লে প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই এমন একটা অচিন্তনীয় কাণ্ড ঘটল যে, যে যেখানে ছিল বিস্ময়ে এবং ত্রাসে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাশের বনের ঘন অন্ধকারের ভিতর থেকে মনুষ্য কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল, "গফুরভাই জেগেই আছে।" এবং পর মুহূর্ত্তেই এক দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্ত্তি বেরিয়ে এসে আমিনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "কিরে আমিনা, এ যে চুরির উপর বাটপাড়ি দেখ্‌তে পাই!" কণ্ঠস্বরে এবং আকৃতিতে সকলেই গফুরকে চিন্‌তে পারলে।

প্রথমে আমিনার গলা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তারপর কতকটা সাহস সঞ্চিত ক'রে সে বল্‌লে, "আমাকে মাপ কর গফুর ভাই!"

গফুর একটু হাসলে তারপর মৃদুস্বরে বল্‌লে, "মাফ আর কি করব। যা করেছিস এক রকম ভালই করেছিস, অনেকগুলো ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিলি। কিন্তু তুই যে এদের সঙ্গে যাচ্ছিস্‌নে, ফিরে চলেছিস্ ?"

আমিনা বল্‌লে, "কাল সকালে মহবুব যখন আসবে তখন আমি তোমার কাছে থাকতে চাই ভাইজান।"

"কেন ? আমার হেফাজতে নাকি ?"

আমিনা কোনো কথা না বলে চুপ ক'রে রইল।

এক ধমক দিয়ে গফুর বল্‌লে, "ভারি জ্যাঠা হয়েছিস দেখ্‌তে পাই! শীগ্‌গির ওঠ গাড়িতে! এতটা কাল লাঠি ছোরা চালিয়ে এসে এখন ছোট ভাইয়েব ভয়ে বোনের আঁচলের আড়ালে লুকোতে হবে!" তারপর ইয়াসিন্‌কে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, "তুমিও ত আচ্ছা লোক ইয়াসিন্ ভাই, নিজের মাথাটি বাঁচিয়ে স্ত্রীকে পিছনে ফেলে পালাচ্ছ!"

ইয়াসিন্ হাসতে হাসতে বল্‌লে, "কি করি বলুন, বাগ মানে কি ? আপনাদের বাড়িরই মেয়ে ত!"

আমিনার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে গফুর বল্‌লে, "আমার জন্যে কোনো ভয় নেই। যা, গাড়িতে গিয়ে ওঠ।" তারপর সন্ধ্যার দিকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, "অনেক কষ্ট পেয়েছ হামিদা, সে-সব ভুলে যেয়ো, কিন্তু গফুর মিঞাকে একেবারে ভুলোনা।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একেবারে নত হ'য়ে গফুরের পদধূলি গ্রহণ করলে। কেউ তাকে আটকাতে পারলে না, গফুরও নয়, আমিনাও নয়। তারপর সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে, "তোমার দয়ার কথা জীবনে কখনো ভুলবনা গফুর মিঞা!"

গফুর সন্ধ্যার মাথাটা নেড়ে দিয়ে বল্‌লে, "দয়া নয়, দয়া নয় বেটি! খোদা তোমার ভাল করবে। এখন যাও, গাড়িতে গিয়ে ওঠ।"

আরও দু'চারটা কথা হওয়ার পর ইয়াসিন, আমিনা ও সন্ধ্যা গরুর গাড়িতে উঠে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গ্রাম্য মেঠো পথ ভেঙে দবীপুরের দিকে অগ্রসর হ'ল। গাড়ী অদৃশ্য হ'য়ে গেল, কিন্তু চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ বহুক্ষণ ধ'রে শোনা যেতে লাগল। অবশেষে তাও যখন মিলিয়ে এল, তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গফুর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করল। অনেকগুলো দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পেলে বটে, কিন্তু বাড়ি পৌঁছে তার মনে হ'ল বাড়িটা যেন কোনো একটা সম্পদ থেকে সহসা রিক্ত হয়েছে। গফুর মনে মনে ভাবলে, জীবনে সে এই প্রথম দুর্ব্বলতার বশীভূত হ'ল। হয়ত বা এ কোনো নবতর নূতন পথেরই সূচনা। (ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভারতবর্ষ বিপজ্জনক অবস্থার দিকে যাইতেছে কি না

লণ্ডন হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে মেজর জেনারেল Sir John Megaw ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে ভারতের জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ভারতকে যে বিশেষ বিপজ্জনক অবস্থার দিকে লইয়া যাইতেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন।

সার জন ভারতবর্ষের জনসমস্যা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবাসীদের স্বাস্থ্য, খাদ্য, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আমাদের উপকারে লাগিবে। সত্য অপ্রিয় হইলে, তাহা জানিবার প্রয়োজন ও মূল্য বেশী হয়।

ভারতের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, সে বৃদ্ধি যদি ভারতবর্ষের পোষণ ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা হইলে, দেশের লোকের ভরণপোষণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে। ১৯২১-৩১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর ৫০ লক্ষ করিয়া লোক বৃদ্ধি পাইতেছে এরূপ অনুমান করা হইতেছে। এই বৃদ্ধি কোন প্রকারে রুদ্ধ না হইলে, ৪১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটি হইবে। সার জনের মতে ভারতবর্ষ এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, যখন খাদ্যোৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যার বৃদ্ধি অধিকতর দ্রুতগতিতে হইতেছে।

প্রাচুর্য্যের মধ্যেই সভ্যতার জন্ম। আমাদের জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজনকে মিটাইয়া যাহা বাড়্তি থাকে, তাহা হইতেই সভ্য জীবনের বর্দ্ধিত প্রয়োজনের দাবী মিটিয়া থাকে। কাজেই, আমাদের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বাড়িতে থাকিলে, বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই আমাদের সভ্যতা বিপন্ন হইবে।

অবশ্য ভারতের জনসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য, আমাদের কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি হইলে, উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, ব্যবসা বাণিজ্যাদি সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের হাতে আসিলে, বাহিরের শোষণ বন্ধ হইলে, আরও অধিক সংখ্যক লোক ভাল ভাবে প্রতিপালিত হইতে পারে কিনা তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জাতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, বিরলবসতি স্থান সমূহে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। এই প্রকার বিস্তৃতির জন্য বর্ত্তমানে ইংরাজীভাষীর সংখ্যা গ্রেট ব্রিটেনের জনসংখ্যার পাঁচগুণেরও অধিক হইয়াছে এবং এই ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি জগতে তাঁহাদের শক্তি ও মর্য্যাদা অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য জাতির পক্ষেও এই কথা অল্পাধিক পরিমাণে সত্য। জাপানও ঔপনিবেশিক বিস্তৃতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

ভারতবর্ষ অবশ্য অপরকে পীড়ন করিয়া, শোষণ করিয়া বা ধ্বংস করিয়া বড় হইতে চায় না। কিন্তু, এরূপ না করিয়াও ভারতবাসীরা কোন কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিতেন এবং প্রবেশ পথ রুদ্ধ না থাকিলে, বহু সংখ্যায় বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেন। কিন্তু, ক্ষোভ প্রকাশ করা ব্যতীত, বর্ত্তমান অবস্থায় ফলোদায়ক কোন পন্থা অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা আমাদের নাই।

অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও মুসলমান তরুণ দল

জাতীয় স্বার্থের বিরোধী যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ, তাহা কখনও সমগ্র দেশের কল্যাণ বিধান করিতে পারে না। সব সম্প্রদায়েরই ভবিষ্যৎ উন্নতি সমগ্র দেশের অবস্থার উপর নির্ভর করে বলিয়া, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা পরিণামে কোন সম্প্রদায়ই লাভবান হইতে পারেন না।

আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও সঙ্ঘবদ্ধতা সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহাদের এই সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি তখনই মাত্র দেশের প্রকৃত সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবে যখন সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া এবং দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া সমগ্র দেশের কল্যাণ মূর্ত্তিখানি তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে সমগ্র দেশে নিদারুণ অন্ধতা বিরাজ করিতেছে সত্য কিন্তু, অন্ধকারের মধ্য হইতেই আলোক জন্মগ্রহণ করে। বাংলার মুসলমান তরুণদের মধ্যে, সংখ্যায় অল্প হইলেও একটি শক্তিশালী দল নিজ সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার যুক্তিবিরুদ্ধ সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন ও সমাজের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও উদার মনোভাব সৃষ্টির জন্য প্রাণপণ করিতেছেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে, সংস্কারপন্থী হিন্দু তরুণ দলের সহিত ইঁহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা নূতন ভাব চিন্তা ও প্রেরণা পাইয়া থাকি। কাজেই, সাহিত্য সেবাকে কেন্দ্র করিয়াই যে প্রধানতঃ এই দলটি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা স্বাভাবিকই হইয়াছে।

খুলনার মোস্লেম ক্লাব ও লাইব্রেরীটি এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। ইঁহাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান, মাসিক সাহিত্যিক অধিবেশন নানা প্রয়োজনীয় ও গুরু বিষয় সম্বন্ধে বিতর্কাদির ব্যবস্থা ইহার উদ্যোক্তাদের আগ্রহ কর্ম্মশক্তি ও প্রাণের পরিচয় প্রদান করে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতিষ্ঠানটি মুসলমান যুবকদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিলেও, ইহা খুলনার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন্ সেতুর কাজ করিতেছে। ইহার বহুসংখ্যক হিন্দু সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক আছেন। দেশের প্রয়োজনের অথবা কোন ব্যাপক আকস্মিক বিপদপাতের সময়ও ইঁহারা সময়োপযোগী সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন।

সাহিত্য ও সমাজসেবার মধ্য দিয়া ইঁহারা স্বাধীন চিন্তা বিস্তারের ও নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা করিতেছেন, আশা করি তাহা জয়যুক্ত হইবে।

প্রতিষ্ঠানটির গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ইহার কর্ত্তৃপক্ষ একখণ্ড জমির সন্ধান করিতেছেন। খুলনার মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ বা সমাজ হিতৈষী কোন বদান্য ভদ্রলোক ইঁহাদের এই অভাব মোচন করিবেন, এরূপ আশা করা অন্যায় নহে।

দাঙ্গাকারী বলিয়া অভিযুক্তদের সম্মান

সংবাদপত্রে প্রকাশ মণীন্দ্র নগর (বেলডাঙ্গা) দাঙ্গা সম্পর্কে অভিযুক্ত মুসলমান আসামীরা যেমন আদালতের বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পাইবার পর চার পাঁচ শত লোকের জনতা, তাহাদিগকে বিপুল জয়ধ্বনি শোভাযাত্রা সহকারে, প্রধান হিন্দু বাড়ীগুলির পাশ দিয়া লইয়া গিয়াছে।

হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের পক্ষে গভীর কলঙ্কের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা প্রথম আক্রমণ করে অথবা উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাহারা কোন সম্প্রদায়েরই উপকার করে না। দাঙ্গায় অথবা মোকর্দ্দমায় যাহারাই জয়লাভ করুক তাহাতে প্রকৃতপক্ষে কাহারও উল্লসিত হইবার কারণ নাই; যদি সাময়িক উত্তেজনা বা ভুল-ধারণার ফলে, হাঙ্গামার সময় কাহারও এই কথা মনে রাখিবার মত শান্ত মানসিক অবস্থা থাকে না। কিন্তু, উত্তেজনার মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইবার পরও যাঁহারা এইভাব জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, কোন পক্ষকে উত্তেজিত করিবার, অপমানিত অথবা ক্ষুব্ধ করিবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের ব্যবহারের মধ্যে চ্যালেঞ্জের ভাব প্রদর্শন করেন তবে, তাহা উভয় সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহাতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এই প্রকার মনোভাব লোপ পায় তাহার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

কতকগুলি নির্দ্দোষ লোক অভিযুক্ত হইয়াছিল, এবং তাহারা মুক্তি পাওয়ায় অনেকে আনন্দিত হইয়াছিল এবং তাহারই

১৮৭৪ ১৯৩৪

ওরিয়েণ্টাল

গভর্মেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

পরিচালক সংসদ

স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস
কেটি, সি-আই-ই, এম-বি-ই, জে-পি (চেয়ারম্যান)
স্যর জোসেফ্ কে কেটি, জে-পি
মেয়ার নিসিম স্কোয়ার এম-এ, জে-পি
স্যর কাওয়াসজি জেহাঙ্গির (কনিষ্ঠ)
কে-সি-আই-ই, ও-বি-ই, এম্-এল-এ, জে-পি

ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ স্কোয়ার
দিনশা ডি রোমার স্কোয়ার জে-পি
স্যর কিকাভাই প্রেমচাঁদ কেটি
রস্তম্ পেস্তোনজি মাসানি স্কোয়ার এম-এ, জে-পি
রহিমতুল্লা এম চিনয় স্কোয়ার
এম-এল-এ জে-পি

ভারতবর্ষের বৃহত্তম এবং সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বীমা কোম্পানী

৫ই মে ১৯৩৪ সালে **হীরক জুবিলি** অনুষ্ঠিত করিল

—ঃ ছয় দশকের প্রগতি ঃ—

তহবিল		মোট চলতি বীমা	মোট দাবী যা দেওয়া হয়েছে	বাৎসরিক আয়
১৮৮৪...	১৪,৪১,৪২০৲	১,৫৯,২৫,২০০৲	৩,০৭,৪৪৮৲	৬,৭৭,৫৫৩৲
১৮৯৪...	৯১,৬১,০১৪৲	৫,২৬,০৮,৮৫০৲	৪২,১০,১৫০৲	২৫,৪৯,৬০৭৲
১৯০৪..	২,৩৭,৫৮,৩৭৭৲	৮,৮৮,০২,২২৩	১,৭৭,৪৬,৩৮৬৲	৪৩,৬৪,৮০৮৲
১৯১৪...	৪,৭২,৮৮,৮৪০৲	১২,৩৭,১০,৯১০৲	৪,৩৩,১৬,৮৫১	৭২,৪৬,০৪৪৲
১৯২৪...	৬,১২,২৩,৯২২৲	১৭ ৭০,৫৩,২৪৬	৮,০৭,৫৩,৮৬৪৲	১,১২,৬২,৬২২৲
১৯৩৪...	১৪,৩০,০৪,৫৩৬৲	৪৭,৯৩,৩১,০৭৪৲	১৫,২৭,৩৮,৮৬০৲	৩,৪৩,২১,৫২২৲

১৯৩৩ সালে "ওরিয়েণ্টাল" সাতকোটি টাকারও অধিক মূল্যের সর্ব্ব-সমেত ৩৮,১৯১টি নূতন বীমাপত্র নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।

এই কোম্পানির পূর্ণ বিবরণ ও ইহার নানাবিধ চিত্তাকর্ষক বীমা-ব্যবস্থা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলেই সানন্দে প্রেরিত হইবে :—

শাখা-কর্ম্ম-সচিব,—ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্
২ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

অথবা

উপশাখা কর্ম্মসচিব, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
কাচারি রোড, রাঁচি

পরিদর্শক, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস
জলপাইগুড়ি

অথবা

অস্থায়ী পরিদর্শক ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস—নলিনাক্ষ বসু রোড, বর্দ্ধমান

কিংবা কোম্পানীর নিম্নলিখিত কার্য্যালয়গুলির যে কোনোটিতে—

আগ্রা	আম্বালা	ভূপাল	দিল্লী	কুয়ালা লামপুর	মণ্ডালে	পাটনা	রাঁচি	মুদ্ধুর
আজমীঢ়	বাঙ্গালোর	কলিকাতা	গৌহাটি	লাহোর	মার্কারা	পুনা	রেঙ্গুন	ত্রিচোনো পেলি
আমেদাবাদ	বেরিলি	কলম্বো	জালগাওন	লক্ষ্ণৌ	মোম্বাসা	রাইপুর	রাওয়ালপিণ্ডি	ত্রিভান্দ্রাম
এলাহাবাদ	বেজওয়াদা	ঢাকা	করাচি	মান্দ্রাজ	নাগপুর	রাজসাহি	সিঙ্গাপুর	ভিজিগাপাটম

এচ্ এড উইন্ জোন্স্ এফ্-এফ্-এ, এ-আই-এ
অধ্যক্ষ, ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস, বোম্বে।

ফলে এই জনতা ও উল্লাস, ইহা বলিয়াও এই কার্য্যকে সমর্থন করা যায় না। কারণ যেখানে উভয় সম্প্রদায়েরই সাম্প্রদায়িক অভিমান জড়িত আছে, সেখানে উভয় পক্ষের ব্যবহারেই সংযম ও শোভনতা আবশ্যক। তাহা ছাড়াও এইরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপারে উপযুক্ত সাক্ষ্যাদির দ্বারা, অভিযুক্তেরা প্রকৃতপক্ষে দোষী হইলেও, তাহাদের দোষ প্রমাণ করা সব সময়ে সম্ভব হয়না। কাজেই, বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পাইলেও প্রকৃতপক্ষে সত্যের জয় হইল বলিয়াও এরূপ ক্ষেত্রে কাহাকেও অভিনন্দিত করা যায় না।

বর্ণের বাধা

অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রথম ভারতীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত ডি-এফ্-কারকা কিছুদিন পূর্ব্বে একাই বক্তৃতায়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রকেই, সাধারণ ইংরেজ ছাত্র অপেক্ষা অনেক অধিক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়।

এসেম্ব্লিতে প্রশ্নকালে, আর্ম্মি সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত জি-আর-এফ টটেনহাম মিঃ এস-জি-জগকে জানান্ যে, বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অফিসাবস্ ট্রেণিং কোরে ভারতীয় ছাত্রদের ভর্ত্তি করা হয় না; ইহা শুধু বিশুদ্ধ ইউরোপীয় রক্তজাত ব্রিটীশ প্রজাদের জন্ত রক্ষিত। এই বাধা দূর করিবার জন্ত ভারত সরকারের চেষ্টা ব্রিটীস বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনিচ্ছার জন্ত সফল হয় নাই।

মানুষের জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ প্রভৃতি বৈষ্যমের অন্তরালে যে ঐক্যের ধারা আছে, সভ্যতা শিক্ষা, ও চিন্তার বিকাশ তাহাকে উদ্ঘাটিত করে। বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষিত ভারতবাসী, জাপানী, তুর্কী, আমেরিকান অথবা ইউরোপীয়ের মধ্যে অধিক পার্থক্য নাই। যে সকল ভারতীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিবার জন্ত ব্রিটীস বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যান, তাঁহারা মনের গঠনে ইংরাজ ছাত্রদের হইতে খুব বেশী পৃথক নহেন। ইঁহাদের সহিত সমস্থানীয়ের ন্যায় ব্যবহার করা, ইঁহাদিগকে বন্ধু মনে করা বা উপযুক্ত সম্মান দান করা ইংরেজ ছাত্রদের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা হইয়াও থাকে। কিন্ত, শ্বেতাঙ্গজাতিদের বর্ত্তমান বর্ণ বিদ্বেষ এই প্রকাব ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রসূত নহে।*

বর্ত্তমানে পৃথিবীর শ্বেতাঙ্গ জাতি সমূহ প্রধানতঃ এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষদের বর্ণবিশিষ্ট মানুষ বলিয়া থাকেন, যদিও প্রকৃত পক্ষে বর্ণের বৈষম্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। এই সকল লোকদের শোষণ করিয়া, শাসন করিয়া, তাহাদের দেশের নানাবিধ সম্পদ, তাহাদের শ্রমশক্তি, কর্ম্মশক্তি, ও ক্রয়ক্ষমতাকে নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া, ঐশ্বর্য্য ও ভোগের বর্ত্তমান আয়োজন শ্বেতাঙ্গজাতিদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীদের মনে ইউরোপের শিক্ষার আওতায় আসিয়া আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হইলে, তাহারা শিক্ষায়, নানাবিধ বিশেষ বিদ্যায় পারিদর্শিতায় এবং অন্ত প্রকারের যোগ্যতায় শ্বেতজাতিদের সমকক্ষতা লাভ করিলে, পরিণামে শ্বেতজাতিদের স্বার্থহানি ঘটিতে পারে, এই ধারণা, শ্বেতজাতিদের মনে অশ্বেত জাতিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবুদ্ধিকে নানাপ্রকার অসদুপায়ে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই স্বার্থান্ধ সমষ্টিগত মনোবৃত্তি ব্যক্তিগত শুভ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও পরাভূত করে। যেখানে স্বার্থের সম্পর্ক যত অধিক, এই বৈষম্য ও বিদ্বেষ ও সেখানে তত প্রবল।

তাই বিলাতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তান্ত অংশে, ইংরেজের হাতে ভারতবাসীদের যে লাঞ্ছনা ঘটে, অন্তত্র বা অন্ত জাতির হাতে ততটা ঘটেনা এবং ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অপেক্ষা ইউরোপের অন্তান্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের সম্মান, শিক্ষার এবং এই সকল দেশের সামাজিক জীবনে স্থান পাইবার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেক অধিক।

একটি মেয়ের সৎসাহস

গুজরাটের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, বৈশাখী মেলা উপলক্ষে একটি অবিবাহিতা হিন্দু বালিকা, চন্দ্রভাগা নদীতে স্নানান্তে, অসমাপ্তস্নান তাঁহার মহিলাসঙ্গীদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় মুসলমান বলিয়া অনুমিত একদল গুণ্ডা বালিকাটির পাশ দিয়া চলিয়া যায় এবং তাহাদের

মধ্যে একজন অশ্লীল পরিহাস করিয়া বালিকাটির হাত চাপিয়া দেয়। বালিকাটি গুণ্ডাকে তৎক্ষণাৎ ধরিবার চেষ্টা করে এবং সে পলাইতে থাকিলে দ্রুত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। লোকটি দৌড়িবার সময় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যায় এবং বালিকাটি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ভাল রকম জুতা পেটা করিয়া দেয়। মেয়েটির সাহস শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষদেরও অনুকরণীয়। মেয়েরা এবং পুরুষেরা বিপদের সময় এইরূপ সাহসের পরিচয় দিতে পারিলে, অনেক নির্য্যাতন এবং গুণ্ডামির হাত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিতাম।

বাংলাদেশেও দুই একটি মেয়ে বিপদে পড়িয়া এইরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। যদিও পরে অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ ও নির্লজ্জ গুণ্ডামির হাতে অনেক ক্ষেত্রে ইঁহাদিগকে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তবুও তাহা কম প্রশংসার কথা নহে।

একটু অবান্তর হইলেও, এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশে মেলা, পর্ব্বাদি উপলক্ষে এবং সাধারণ সময়েও মেয়েদের প্রকাশ্য স্থানে স্নানের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা শীলতাবোধ ও সুরুচির পরিচয় নহে। যাহাতে কিছুমাত্র দোষ আসিতে পারেনা, মেয়েদের এমন গতিবিধির স্বাধীনতা দিতে আমরা অনেকে অনিচ্ছুক অথচ এই প্রকার ব্যাপার আমাদের রুচিকে আঘাত করে না।

বড়লাট মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কেন অস্বীকার করিলেন

অমৃত বাজার পত্রিকার এলাহাবাদস্থ বিশেষ সংবাদ দাতার ২৫শে এপ্রিল তারিখে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত একটি স্থানীয় কাগজে, বড়লাট মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে কেন অনিচ্ছুক, সে সম্বন্ধে একটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনটি কারণের জন্য বড়লাট নাকি মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে চান না। তাহার দুইটি হইতেছে যে, (১) শান্তি এবং মিটমাট সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় তিনি বিশেষ দক্ষ এবং পাকা লোক এবং (২) মুখোমুখি যে কোন কথাবার্ত্তায় তিনি সর্ব্বদা জয়লাভ করিয়া থাকেন।

যে সকল লাট এবং বড়লাট মহাত্মার প্রভাবে পড়িয়া এইরূপ ভুল করিয়াছেন, লর্ড উইলিংডন নাকি তাঁহাদের তালিকাভুক্ত হইতে চান না বলিয়া মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত নহেন।

ইহা সত্য কি না জানিনা। সত্য হইলে বলিতে হইবে, মহাত্মাজীর যে শক্তি এবং ব্যক্তিতে তাঁহার ভক্ত ও সহচরেরা বিশেষ আস্থাবান, তাঁহার সেই প্রভাব অপরপক্ষের অতিপ্রধান ব্যক্তিরাও অনুভব করিয়া থাকেন।

মহাত্মার যোগ্যতা সম্বন্ধে, তাঁহার দেশের লোকের মনে কোন সন্দেহ নাই এবং পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকদের নিকট হইতে তিনি সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আলোচ্য কথাটি সত্য হইলে, তাঁহার যোগ্যতা ও শক্তির ইহাপেক্ষা বড় প্রশংসা আর কিছু হইবে না।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আক্রমণ

বক্সারে ও যোশিদীতে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সনাতনীদের বর্ব্বরোচিত আক্রমণ সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মুখে হিন্দুধর্ম্মের মাথা নীচু করিয়া দিয়াছে এবং বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীকে হীন ও কলঙ্কিত করিয়াছে।

যে সকল ব্যাপারের নিন্দনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও মনে সংশয় থাকিতে পারে অথবা যে ক্ষতির পূর্ণ পরিমাণ সম্বন্ধে সকলের সঠিক ধারণা না হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহার বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

সকলেই সাধারণ ভাবে সনাতনীদের এজন্য দোষ দিতেছেন, কিন্তু সব সনাতনীর বা অধিকাংশ সনাতনীর এই প্রকার ব্যাপারের সহিত যোগ থাকিতে পারে, বা ইহাতে সমর্থন থাকিতে পারে, আমরা এমন কথা মনে করি না।

যদিও আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি, তাহা হইলেও মনে করি যে, সনাতনীদের নিজমত পোষণ করিবার, তাহা প্রচার করিবার এবং প্রয়োজন মনে করিলে শান্তভাবে অসন্তোষ

প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। কিন্তু, আমরা আশা করি, সনাতনীদের মধ্যে যে সকল ভাল লোক আছেন, তাঁহারা এই প্রকার কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিবেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই ধরণের ব্যাপার আর না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন, মহাত্মা প্রাণভয়ে তাঁহার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবেন, অথবা তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত হইবেন, অথবা এই প্রকারে তাঁহার মৃত্যু হইলে, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলন মন্দীভূত হইবে, তাহা হইলে মহাত্মার চরিত্র সম্বন্ধে অথবা ঘটনার গতি নিরূপণ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান বিশেষ অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে।

আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার

মহাত্মাজী স্বরাজলাভের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলন কংগ্রেসের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইলেও মহাত্মাজীই ইহার প্রবর্ত্তক এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই ইহার একমাত্র পরিচালক ছিলেন। কাজেই, আইনতঃ না হইলেও ন্যায়তঃ ইহা প্রত্যাহার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার আছে এবং আইনতঃ না হইলেও কার্য্যতঃ তিনি তাহা করিয়াছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে এবং ইহাতে তাঁহার সকল জিনিস তলাইয়া বুঝিবার এবং অকুণ্ঠিতভাবে সত্যকে স্বীকার করিবার শক্তি আর একবার প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বরাজলাভের জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রচেষ্টার ভার শুধুমাত্র তাঁহার উপর ন্যস্ত রাখিবার পরামর্শ দিয়া এবং তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অপর কোন ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত একমাত্র তাঁহার নির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়াই অপর সকলকে এই আন্দোলনে যোগ দিবার অধিকার দিতে চাহিয়াছেন।

এই আন্দোলন মহাত্মার ধর্ম্মবুদ্ধি ও সত্যোপলব্ধি হইতে প্রসূত; কাজেই, এই উক্তি তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইয়াছে।

কিন্তু, মহাত্মাজী, ব্যাপকভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া আমরা একথা মনে করি না যে, তাঁহার অনুমতি ও নির্দ্দেশ না লইয়া কেহ স্বরাজ লাভের জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, অস্ত্র স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। খুব নিপুণভাবে কোন কাজ সম্পন্ন না করিতে পারিবার আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া, কেহ প্রয়োজন মনে করিলে সেই কাজ করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না, ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। মহাত্মাজীর মত ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস না করিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী পন্থা বলিয়া নিরুপদ্রব প্রতিরোধের পথ কেহ অবলম্বন করিতে পারেন। মানবজাতিকে সত্যপথ দেখাইবার অধিকার সকল লোকেরই আছে; কিন্তু, সেই সত্য প্রয়োগের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করিবার অধিকার কাহারও নাই; সত্য আবিষ্কারকেরও নাই।

অবশ্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেস, মহাত্মাজীর সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

মহাত্মার বাংলায় আগমন

মহাত্মাজী শীঘ্রই বাংলায় আসিবেন। তাঁহার আগমনে দেশের মধ্যে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইলে, কর্ম্মীরা অধিকতর শক্তিও উদ্দীপনা লাভ করিলে, বাংলাদেশে যে আকারেই অস্পৃশ্যতা থাকুক তাহা দূর করিবার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইলে, তাঁহার কষ্ট স্বীকার সার্থক হইবে।

আমাদের সকল দলের এবং সকল মতের লোকের মনে রাখা দরকার যে, মহাত্মাজী জগৎবরেণ্য মহাপুরুষ, ভারতবর্ষের গৌরবকে তিনি বাহিরের লোকের নিকট বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং ভারতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য, তাঁহার ন্যায় এত অধিক ত্যাগস্বীকার এত সদা জাগ্রত চেষ্টা এবং এত অধিক প্রভাব বিস্তার আর কেহ করেন নাই। এই সর্ব্বপূজ্য অতিথির সম্মান রক্ষার দায়িত্ব বাঙ্গালী মাত্রেরই আছে। তাঁহার বিন্দুমাত্র অমর্য্যাদায় বিশ্বসভায় বাঙ্গালীর মাথা হেঁট হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

কবিকুঞ্জ

চিত্রলেখা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

লীলার ছলে বুলায়ে তুলি
আখর আঁক আবির ফুলি
রঙের ডালি আড়ালে খুলি'
যতনে।
ঊষায় তব চরণধ্বনি,
নূপুর ওঠে নিরবে রণি'
পুলকে ধরা কুসুম-মণি
রতনে।
সূর্য্যঢলা শীতল সাঁঝে
আঁধার-আলো-আভাস মাঝে
যূথিকা বেলা গন্ধরাজে
ভুলালে।
আঁকিছ যাহা অলখে কবি
পরশে তব শোভন সবি'
পরাণ ভরি' কি ছায়াছবি
বুলালে।
দেখেছি তব রঙের রেখা
গোপন লিপি, চিত্রলেখা
খুঁজেছি বৃথা, পাইনি দেখা
নয়নে।
কল্পলোক-সঞ্চারিণী
চপলগতি হে মায়াবিনী,
কী খেলা খেল রজনীদিনি
স্বপনে।

শিশুর চোখে কি আলোখানি
যতন ভবে দিয়েছ আনি,
কোমল মুখে কী কলবাণী
মাখালে;
নবীন-ননী-কোমল দেহে
চেতনা রস ঢালিলে স্নেহে,
কী উৎসব জননী গেহে
জাগালে।
কিশোর চিতে, যুবার বুকে
তুফান তোলো দুঃখে সুখে,
হরষে দেখ তা'দের মুখে
চাহিয়া।
নীরব পায়ে হে অপ্সরী
গোপনে ফির ভুবন ভরি'
স্বপনে তব কনকতরী
বাহিয়া।
স্বরগ সনে ধরারে গাঁথি'
দুখের বুকে বিলাসে মাতি
আসন তব নিলে কি পাতি
ধূলিতে?
সুধার আশে তৃষিত আঁখি
ধূলার ধরা বাঁধিল নাকি?
স্বরগে তবু এখনো বাকি
ভুলিতে।

ফাগুনে তাই ক্ষণে ক্ষণে
চমকি জাগ কুসুম বনে
প্রলাপ কহ হাওয়ার সনে
আদরে।
বিষাদ-ঘন বেদন খানি
গগনে কভু হারায়ে বাণী
দু'চোখে আনে অশ্রু টানি
ভাদরে।
ভুলিতে তাহা, নদীর চরে
জোছনা রাতে সোহাগ ভরে
স্বরগ পুরী ধূলির পরে
রচনা।
দু' হাত ভরি' কি বৈভব
লুটায়ে দিলে যা ছিল তব,
পুলক রাশি সুখোৎসব
কতনা!

নয়ন ভরি সলিল রাশি
ব্যথার বেগে জমিছে আসি,
সে ধারা জলে গিয়েছে ভাসি
আপনা;
তাহারি মাঝে গোপন আশা
খুঁজে কি পেলো হারানো ভাষা?
কেন এ নিশা সর্ব্বনাশা
যাপনা।
জীবন মহাসাগর তীরে
বিপুল আশা রয়েছে ঘিরে,
স্বপনপুরী খুলিয়া ধীরে
প্রভাতে,
সফল করি সকল দুখে
কামনা-শতদলের বুকে
কমলারূপা জাগিবে সুখে
শোভাতে॥

চাতুরী

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সংসারে সে কিছুই জানে নাকো
দেখায় যেন এমনি ভাবখানা,
মনেরও তার নাই কোনো নিশানা॥
আর কিছু যে রয়েছে আশেপাশে
না থাকে যদি কী-ই-বা যায় আসে,
কেহ যে আজি তারেই ভালোবাসে
তা-ও নাহি তার জানা॥

হাত দুখানি লতায় কোলে প'ড়ে,
দেয়ালে হেলি' আলসে অযতনে
ছবির মতো বসেছে সখীসনে।

সকলে সেথা কত না কথা কয়,
কত যে হয় ভাবের বিনিময়,
ওই কেবলি নীরবে চেয়ে রয়
নিরর্থ একটানা।
অধীরা হয়ে রসিকা এক সখী
সবারে ছেড়ে তাহারি পাশে ঘেঁষে
ঈষৎ হেসে শুধালো বাঁকা হেসে,—
"বুঝেছি সখী বুঝেছি তোর দশা
ও এক ঢংয়ের ভঙ্গী ক'রে বসা,
চোখ দুটি তোর ও কোন্ রসে রসা,
আমরা কি সব কানা?

ভিতরে কাবে 'বিলাতে আপনাকে
সবার কাছে বাহিরে এত ছল,
কাহারে তুই খুঁজিস, খুলে বল্‌।
ও তনু কার অলখ ফুলশরে
বিবশ হয়ে বিকল কলা করে,
ওকী! ও ঠোঁটে হাসিটি কেন মরে,
বলিতে কি লো মানা?"

দরদে ভরা পরিহাসের ঘায়ে
কোথা যে গেল উদাস অবসাদ,
কুয়াসা কেটে আকাশে উঠে চাঁদ।

বলে সে হয়ে সরমে জড়সড়,—
"তোদের সখী সবি কেমনতর,
পরের কথা ভাবিতে দায় বড়ো,—
নিজের কথাই মানা!"
কথার আড়ে লুকাতে নাহি পারে
চতুরা পাশে চতুরা পড়ে ধরা,
কী করা যায় করিতে মহাত্বরা!
ঘরে কৃপণ রেখেছে পুঁতে পুঁজি,
অপরে যেন পেয়েছে তাই খুঁজি,
তবু সে কাঁদে নূতন ছলা বুঝি,—
হেসে দেখি হয়রাণা।

পদ্মাপারের মাঝির গান

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

ভাসাইয়া নিলরে গাঁও, ভাইঙ্গ্যা নিল দেশ,
জনমের মত ছাড়তে হইল বাড়ী
এমন ডাকাইত্যা নদী যেই দেশের থাকে
তার সাথে ভাই দিয়ো আগেই আড়ি।
ওরে ইলিশ মাছের বেপারী যাইওনারে পদ্মানদীর পাড়
ওসে, কত গাঁয়ের চোখের জল যে বুকে জমা তার,
উদাসী মন যে ঘোরে, বাপের ভিটা আস্‌তে নাবে ছাড়ি।
এ পারে গাঁও কাঁনছে চেয়ে ওই পারেরি শোকে,
দুইটা বোন যে ছিল কাছে পার করিল কে,—
ওরে আকাশ তারি মাঝে বইস্যা বিছায় নীলশাড়ী।
শাওনে তার জলের ডাকে গাঙের কাঁপে বুক,
মমিনপুরের চরে বইস্যা ভাবে অতীত সুখ,
পড়ল 'বাও' যেই গাজীর নামে ধরল গাঙে পাড়ি।

নানা কথা

ওরিয়েন্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই জীবন বীমা কোম্পানি ভারতবর্ষের জীবন বীমা কোম্পানিগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। বিগত ৫ই মে ১৯৩৪ সালে ভারতের সর্ব্বত্র ইহার হীরকজুবিলি অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। কলিকাতায় টাউন হলে এই জুবিলির অনুষ্ঠান হ'য়েছিল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

স্থানান্তরে প্রকাশিত এই কোম্পানির একটি বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায় এই কোম্পানি কেমন দৃঢ় পদক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্চে। আর্থিক জীবনে ইহা দেশবাসীর যে কতখানি আশ্রয়স্থল, তা সহজেই অনুমেয়। সুদক্ষ পরিচালনার জন্য এই প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জ্জন্ করতে সক্ষম হ'য়েছে।

বড়ই আনন্দের বিষয় যে এই পরিচালনার ভার কোম্পানির প্রথম পত্তন থেকেই ভারতীয়দের উপর ন্যস্ত ছিল এবং এখনো আছে। বর্ত্তমানে ইহার পরিচালক সংসদের সভাপতি,—সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস। এবং তাঁর অন্যান্য সহকারীরা সকলেই ভারতবর্ষের ব্যবসায় জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। প্রথম পত্তন থেকে আজ পর্য্যন্ত বরাবরই ইহার পরিচালনার ভার ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের উপরই ন্যস্ত আছে।

১৯২৪ সালে এই কোম্পানির স্বর্ণ জুবিলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে এই দশবৎসরের মধ্যে ইহার যতখানি প্রসার হ'য়েছে, পূর্ব্বে কোনো দশকের মধ্যে ততখানি প্রসার হয়নি। ১৯২৩ সালে এই কোম্পানীর ছিল ১৪টি শাখা ও ৫টি চিফ্ এজেন্সি। গত দশ বৎসরের মধ্যে আরও ৫টি নূতন শাখা খোলা হ'য়েছে,—ঢাকায় ১৯২৬ সালে; ত্রিচোনোপালী, ভিজিগাপাটম ও মোম্ভাসায় ১৯২৯ সালে এবং পাটনায় ১৯৩১ সালে। এই নূতন শাখাগুলির প্রত্যেকটি থেকেই গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিস্তর নূতন কাজ এসেছে, তবে ঢাকায় শ্রীযুক্ত বি-ডি-দাশগুপ্তের কর্ম্মকুশলতায় পূর্ব্ব ভারত থেকে যে পরিমাণ কাজ এসেছে, তা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। একথা থেকে কেউ যেন না মনে করেন, যে এই নূতন শাখাগুলিই বিগত দশকের সন্তোষজনক প্রগতির একমাত্র কারণ,—বিগত দশকের প্রারম্ভের আগে থেকেই যে সমস্ত শাখাগুলি বর্ত্তমান ছিল, সেগুলি থেকেও কর্ম্মস্রোত খরগতিতেই প্রবাহিত হ'য়েছে,—এবং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কর্ম্মের আয়তন বিপুল থেকে বিপুলতরই হ'য়েছে। এই কর্ম্ম-প্রবাহের আয়তন সম্বন্ধে সাধারণের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বোধ হয় সম্ভব নয়, তবে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি থেকে কতকটা আন্দাজ করা যেতে পারবে। বোম্বের প্রধান কার্য্যালয়ে দৈনিক দেশীয় ডাকযোগের কাগজপত্র মোটামুটি ৮০০০। সম্প্রতি একদিন দেশীয় ডাকযোগে যে কাগজপত্র এসেছিল, তার সংখ্যা ১০,০২৭। তন্মধ্যে ৪,০৭৬ খানি ছিল চিঠি। গত বৎসর বীমার প্রস্তাব এসেছিল ৫৫,২৮০ খানি। তন্মধ্যে বীমা প্রস্তুত ও নিষ্পন্ন হ'য়েছিল—৩৮,১৯১ খানি। যে সকল বীমাকারীদের গত বৎসর ঋণ দেওয়া হ'য়েছিল, তাঁদের সংখ্যা ১১,৮৯১। দাবীর সংখ্যা মেটানো হ'য়েছিল ৩,৭২৮ খানি।

এইখানে একটা কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না,—গত দশ বৎসরের মধ্যে মৃত বীমাকারীদের উত্তরাধিকারীদের দেওয়া হ'য়েছিল তিন কোটী সাতান্ন লক্ষ টাকা। এবং মেয়াদান্তে জীবিত বীমাকারীদের দেওয়া হয়েছিল তিন কোটী তেষট্টি লক্ষ টাকা। বৃদ্ধবয়সে কর্ম্মাবসরে যখন উপার্জ্জন বন্ধ হ'য়েছিল তখন এই অর্থ যে কতলোকের উপকার সাধন করেছে, তা' সহজেই অনুমেয়।

১৯২২ থেকে ১৯৩০সাল পর্য্যন্ত তিনটি ত্রৈবার্ষিক হিসাব নিকাশের পর কোম্পানির লাভের অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ২ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকা বীমাকারীদের দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বোনাসের হার অনেক বৃদ্ধি করা হ'য়েছিল। ১৯২২ সালে মেয়াদী বীমায় ও সারা-জীবন বীমার প্রতি হাজার করা ৮৲ ও ১০৲ টাকা হারে বোনাস দেওয়া হ'য়েছিল,—১৯৩১ সালে দেওয়া হ'য়েছিল ২০৲ ও ২৫৲ টাকা হারে।

১৯২৩ সালে কোম্পানিতে সবশুদ্ধ চল্‌তি বীমা ছিল ৮৮,১৪৭টি। ১৯৩৩ সালে চল্‌তি বীমা ছিল তার প্রায় তিন গুণ, অর্থাৎ ২,৩২,০২৯টি। বীমার পরিমাণ ছিল ১৯২৩ সালে ১৭ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা, ১৯৩৩ সালে ৪৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। বৎসরের নূতন কাজের দিক্ থেকে দেখলেও এই কোম্পানির প্রগতি অতীব সন্তোষজনক। ১৯২৩ সালে নূতন বীমা নিষ্পন্ন হ'য়েছিল ৭,৭৯০টি, পরিমাণ ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। ১৯৩৩ সালে নূতন বীমা নিষ্পন্ন হ'য়েছিল ৩৮১৯১ টি, পরিমাণ ৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। বৎসরের নূতন কাজের দিক দিয়ে বিচার করলে ১৯৩৩ সালে অরিয়েণ্টাল দেশী ও বিদেশী সমস্ত বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছিল। ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

পরলোকে সার শঙ্করণ্ নেয়ার

সার শঙ্করণ্ নেয়ারের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন কৃতী নেতা হারালো। অবশ্য তাঁর বয়স হ'য়েছিল প্রায় সাতাত্তর কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বর্ত্তমান যুগে তাঁর মত একজন প্রতিভাবান কর্ম্মীর নেতৃত্ব হারানো কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়। প্রাগ্-গান্ধী যুগের কংগ্রেসের তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সভ্য; এবং সেই যুগের কংগ্রেসের সভাপতির আসন লাভের গৌরবের তিনি অধিকারী হ'য়েছিলেন। যদি চ অন্যান্য কয়েকজন নেতার সঙ্গে তিনিও শেষ জীবনে তাঁর জনপ্রিয়তা কথঞ্চিৎ হারিয়েছিলেন, তথাপি তাঁর স্বদেশ-প্রাণতা, ঐকান্তিক দেশসেবা এবং অসাধারণ প্রতিভার কথা দেশবাসী ভোলেনি এবং কোনদিন ভুল্‌বে না। পাঞ্জাবে সামরিক আইন প্রবর্ত্তনের প্রসঙ্গেই বড়লাটের মন্ত্রণা সংসদের সভ্য পদত্যাগের কথা দেশবাসী চিরদিন মনে রাখবে। সাইমন কমিশনের সংগঠন ও সম্ভাব্যতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কিছুমাত্র ছিল না, তথাপি তিনি সেই প্রসঙ্গে ভারতীয় ষ্ট্যুটারি কমিশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বার্থ-বিরুদ্ধ কোন কিছু ঘটায় যতটা সম্ভব বাধাপ্রদান করা। শুধুই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়,—শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও শঙ্করণ নেয়ার অনেক কিছু করেছিলেন। আইনজ্ঞ ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবেও তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হ'য়েছিলেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি-কামনা করি।

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন হিসাবে পঁচিশে বৈশাখ তারিখটি বাঙালীর দিন-পঞ্জিকায় চিরস্মরণীয় হ'য়ে রইল। এবার কবি ৭৩ বৎসর সম্পূর্ণ করে ৭৪ বৎসরে পদার্পণ করলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করে আমরা তাঁর চরণে প্রণাম করি।

কবি এখন সিংহলের অতিথি। সিংহল দ্বীপটিকে সভ্যতা ও কৃষ্টির দিক দিয়ে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলেই ধরা যেতে পারে। আমরা আশা করি এবার কবির জন্মদিনে তাঁকে কাছে পেয়ে সিংহলবাসীর মনে ভারতবর্ষ ও সিংহলের গভীর ঐক্যের নিবিড় উপলব্ধি ঘটবার সুযোগ হ'ল।

বান্ধবের "আইস্ ক্রীম সন্দেশ" খাইলে
প্রাণে স্ফূর্ত্তি আনে ও শরীরের অবসন্নতা দূর করে।
বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—১১৮ বি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা (পোষ্ট অফিসের সম্মুখে)

পোলা নেগ্রি ও উদয়শঙ্কর

নিউ ইয়র্কের ইণ্টারন্যাশনাল লিটারারি এক্সচেঞ্জ থেকে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি পেয়েছি,—বিচিত্রার পাঠক-বর্গের জন্ম তা' বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া গেল।

"স্বর্গীয়া এনা পাভ্লোভার পোলা নেগ্রি একজন পরম ভক্ত। ১৯২৩ সালে যখন পাভ্লোভার ভারত-নৃত্য গুলিতে উদয়শঙ্কর ছিলেন তাঁর নৃত্য-সহচর, তখনই শ্রীমতী নেগ্রির সঙ্গে উদয়শঙ্করের প্রথম সাক্ষাৎ কালিফোর্নিয়াতে।"

পোলা নেগ্রি ও উদয়শঙ্কর

সম্প্রতি চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে হলিউড যাওয়ার পথে য়ুরোপ থেকে নিউ ইয়র্কে ফিরে শ্রীমতী নেগ্রি শুনলেন—সেণ্ট জেম্‌স থিয়েটারে উদয়শঙ্করের নৃত্যাভিনয় হচ্ছে। একখানি নিজের জন্ম ও কয়েকটি বন্ধুর জন্ম একখানি বক্স নিয়ে ফেললেন।

প্রথম বিরতির সময়েই শ্রীমতী নেগ্রি রঙ্গমঞ্চের পিছনে গিয়ে উদয়শঙ্করকে ঐকান্তিক অভিবাদন করে বললেন,—

"এমন একটা পুলক আমার বহু বৎসরের শিল্প অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেকদিন পাইনি, সত্য বলতে কি আনা পাভ্লোভার মৃত্যুর পর থেকেই আর এমন পুলক অনুভব করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। মৃত্যুর পূর্ব্বে পাভ্লোভার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি বলে আমি বড়ই দুঃখিত। আপনি জানেন আমি তাঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করতাম।"

উদয়শঙ্কর আবেগ ভরে বললেন, "হ্যাঁ আমি তা জানি, এবং আপনি জানেন আমিও কতখানি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। আমার ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে আমি একদিনও তাঁকে নাচ দেখাতে পারিনি সে জন্ম আমিও একান্ত দুঃখিত।"

"আমি যাব ভারতবর্ষে, এবং আশা করি সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

"ভারতবর্ষে আপনাকে অভিবাদন করবার সৌভাগ্য হলে আমি বড়ই সুখী হবো, এবং আমাদের শিল্পের অতুলনীয় গৌরবরাজি আপনাকে দেখাতে পেরে বিশেষ আনন্দিত হবো।"

শ্রীমতী নেগ্রি অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন; এবং শেষ পালা তাণ্ডব নৃত্য যখন শেষ হোলো তখন উঠে দাঁড়িয়ে বারে বারে পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে প্রাণ ভরে শঙ্করকে অভিনন্দিত করতে লাগলেন এবং শঙ্করও দণ্ডায়মানা তাঁকে বারে বারে নমস্কার করতে লাগলেন। তারপর যখন শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার রায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাণ্ডব নৃত্য কেমন লাগল, তখন তিনি দ্বিধাহীন সুরে জোরের সঙ্গেই বললেন:

"চমৎকার! সত্য কথা বল্‌তে কি তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গচালনা চমৎকার, চমৎকার! শঙ্কর একেবারে দেবোপম, জ্যোতিষ্মান্। এর বেশি কিছু বল্‌তে পারি না। এর কমও কিছু বল্‌তে পারি না। শঙ্কর দেবোপম, জ্যোতিষ্মান্।"

কুমারী সাবিত্রীরাণী খণ্ডেলওয়ালা

আট বৎসর বয়সের বালিকা কুমারী সাবিত্রী খণ্ডেলওয়ালা গত ২৯শে এপ্রিল ১৯৩৪ হেদুয়া পুষ্করিণীতে ১৫

সাবিত্রী খান্দেল্‌ওয়ালা

ঘণ্টা ব্যাপী সহন সন্তরণ দিয়ে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর বয়সের কোন প্রতিযোগী এ পর্য্যন্ত এরূপ দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হননি। ৬টা ৪৫ মিঃ প্রাতঃকালে সাবিত্রী জলে অবতরণ করেন এবং রাত্রি ৯টা ৪৬ মিনিটে জল থেকে উত্থিত হন। তাঁর শিক্ষাগুরু বিশ্বজয়ী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষের সহিত সাবিত্রী গত বৎসর রেঙ্গুন গিয়ে হাত পা দুই-ই আবদ্ধ করে কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী সাঁতার কেটে রেঙ্গুনের মেয়রের নিকট হতে একটি স্বুবর্ণ পদক লাভ করেছিলেন। এই বয়সেই এত অসামান্য দক্ষতা দেখে মনে হয় যথাকালে সাবিত্রী একজন বিরাট সাঁতারু রূপে পরিণত হবেন।

আমরা কুমারী সাবিত্রী খণ্ডেলওয়ালাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকিশোর দত্ত রায়

জার্ম্মানীর টেক্‌নিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে Fuel technologyতে উচ্চ গবেষণার কর্য্য ক'রে শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকিশোর দত্ত রায় ডক্‌টর অফ্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং (Dr. Ing.) ডিগ্রি লাভ করেছেন। ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্‌ এস্‌ সি ডিগ্রি লাভ করে ঐ বৎসরই রুক্মিণীকিশোর টাটা আয়রণ ওয়ার্ক্সে রিসার্চ কেমিষ্ট নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি Low temperature carbonisation of coals, Recovery of by-products এবং Stock coal প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করেন। তৎপরে ১৯৩১ সালে অক্টোবর মাসে জার্ম্মানীর Deutsche Akademie হ'তে বৃত্তি লাভ ক'রে তিনি Fuel technology বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য জার্ম্মানী যাত্রা করেন। তথায় হেনোফার

শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকিশোর দত্ত রায়

B. B. 1737

পলস্‌ ডেয়ারীতে | ঘি | ১৩৪।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্‌

টেক্‌নিক্যাল ইউনিভার্সিটির সুবিখ্যাত প্রফেসার এবং টেক্‌নোলজিকাল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টার কেপলারের অধীনে ভারতীয় কয়লা সম্বন্ধে গবেষণামূলক কার্য্য ক'রে উক্ত দেশীয় সর্ব্বোচ্চ ষ্টেট ডিগ্রি Dr. Ing লাভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে ডক্টার দত্তরায়ই সর্ব্ব প্রথম এ ডিগ্রি লাভ করলেন। প্রফেসর কেপলার ইঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ইঁহাকে আপন Assistant রূপে কাজ করবার অনুমতি দেন।

ডাক্তার দত্তরায় জার্ম্মানীর আধুনিক উন্নততর বহু Coke-ovens (কোক চুল্লী) ও Gas works এর কার্য্যাবলী সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। ইনি ময়মনসিংহ জিলার অধিবাসী। সম্প্রতি দেশে প্রত্যাগমন ক'রে পুনরায় টাটার লৌহ কারখানায় যোগদান করেছেন।

আমরা এই উন্নতিশীল যুবকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

লিলুয়া ই-আই রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট

বিগত ২৯শে এপ্রিল ১৯৩৪ লিলুয়া ই-আই রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে একটি সান্ধ্য সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কণ্ঠ-সঙ্গীত যন্ত্র-সঙ্গীত, রসাভিনয় প্রভৃতি বহুবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। "সঙ্গীতে বাক্য ও কাব্যের পরিমাণ" বিষয়ে বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক একটি স-গীত প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল। কলিকাতা হতে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ইনষ্টিটিউট সংলগ্ন পাঠাগারটি দেখে আমরা অতিশয় সুখী হয়েছিলাম। প্রয়োজন হিসাবে পাঠাগারে পাঁচটি বিভিন্ন ভাষার বই রক্ষিত হয়েছে। পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও পুস্তক নির্ব্বাচন ও রক্ষণ প্রণালীর সুখ্যাতি করতেই হয়। ইনিষ্টিটিউট ভবনটি সুদৃশ্য, পরিচ্ছন্ন, যত্ন-রক্ষিত। পিছন দিকে নাট্যমঞ্চটি বিস্তৃত, সুপরিসর। ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্তের এবং অপরাপর কর্ত্তৃপক্ষের আদর আপ্যায়ন যত্ন সমাগত অতিথি-গণকে বিমুগ্ধ করেছিল।

আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তার প্রতি আক্রমণ

জগদীশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে বাংলার গভর্ণর বাহাদুর দার্জ্জিলিঙের লেবঙ ঘোড় দৌড়ের মাঠে বিপ্লববাদীর গুলি থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি, এবং প্রার্থনা করি যেন তিনি দীর্ঘজীবি হোন্।

বিপ্লববাদীদের পন্থা যে ভ্রান্ত, নিষ্ফল, কাপুরুষোচিত, ঘৃণ্য, তা ইতিপূর্ব্বে আমরা তাদের দুষ্কার্য্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দেশ-নেতারা এবং সাময়িক পত্র সমূহ সকলেই একবাক্যে বিপ্লব পন্থার তীব্র প্রতিবাদ করে আসছেন। সরকারের তরফ থেকে বিপ্লব দমনের জন্য আইনেরও ত অন্ত নেই। তথাপি এই দুর্নীতি ভারতবর্ষের মত দেশ থেকেও অপসারিত হচ্চে না, এ পরম পরিতাপের বিষয়। যে বালকেরা ঐ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল তারা ত অপূর্ণ বয়স্ক; তাদের চেয়েও তাদের ঐ কর্ম্মে প্ররোচিত করেছে যারা তাদের প্রতি অসীম ঘৃণা জ্ঞাপন ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারি না। বাক্যজাল বুনে আর কোন লাভ নেই।

মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোং'র ক্যালেণ্ডার

ভবানীপুর কলিকাতার সুবিখ্যাত জুয়েলার্স এবং ব্যাঙ্কার্স মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানীর একটি সুদৃশ্য ওয়াল ক্যালেণ্ডার পেয়ে আমরা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works
259 Upper Chitpore Road. and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

প্রতীক্ষা

বিচিত্রা
আষাঢ়, ১৩৪১

শিল্পী—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্রা

সপ্তম বর্ষ, ২য় খণ্ড	আষাঢ়, ১৩৪১	৬ষ্ঠ সংখ্যা

THE BIRD OF FIRE

SRI AUROBINDO

Gold-white wings a throb in the vastness, the bird of flame went glimmering over a sunfire curve to the haze of the west,
Skimming, a messenger sail, the sapphire-summer waste of a soundless wayless burning sea.
Now in the eve of the waning world the colour and splendour returning drift through a blue-flicker air back to my breast,
Flame and shimmer staining the rapture-white foam-vest of the waters of Eternity.

Gold-white wings of the miraculous bird of fire, late and slow have you come from the Timeless. Angel, here unto me
Bringest thou for travailing earth a spirit silent and free or His crimson passion of love divine,—
White-ray-jar of the spuming rose-red wine drawn from the vats brimming with light-blaze, the vats of ecstasy,
Pressed by the sudden and violent feet of the Dancer in Time from his sun-grape fruit of a deathless vine ?

White-rose-alter the eternal Silence built, make now my nature wide, an intimate guest of His solitude.

But golden above it the body of One in Her diamond sphere with her halo of star-bloom and passion-ray !

Rich and red is thy breast, O bird, like blood of a soul climbing the hard crag-teeth world, wounded and nude,

O Flame who art Time's last boon of the sacrifice, offering-flower held by the finite's gods to the Infinite,

O marvel bird with the burning wings of light and the unbarred lids that look beyond all space,

One strange leap of thy mystic stress breaking the barriers of mind and life, arrives at its luminous term thy flight ;

Invading the secret clasp of the Silence and crimson Fire thou frontest eyes in a timeless Face.

17-10-33 SRI AUROBINDO

বিহঙ্গ-বহ্নি

[The Bird of Fire ইংরাজি কবিতার অনুবাদ]

স্বর্ণ-শুভ্র পর্ণ-যুগল বৃহতের বুকে স্পন্দন-রেখা—ও যে বিহঙ্গ-বহ্নি সৌর-অগ্নির কক্ষা ধরে জ্বলতে জ্বলতে চলে গেল অস্তের কুহেলি মধ্যে,

বাণীবহ পালখানি সে গেল চলে শব্দহীন পথহীন সাগরের ইন্দ্রনীল-নিদাঘ-প্রতিম মরুবিস্তার বেয়ে বেয়ে।

ক্ষীয়মান জগতের এই সন্ধ্যায় ফিরেছে বর্ণসম্ভার, ফিরেছে ঐশ্বর্য্য—তারা বাতাসের নীলছটা অতিক্রম করে ভেসে এসেছে আমার বক্ষ অবধি—

আগুনের শিখায়, আলোর বিচ্ছুরণে শাশ্বতের অম্বুরাশি 'পরে আনন্দ-শুভ্রায়িত ফেনচ্ছদ রঙীন হয়ে উঠেছে।

স্বর্ণ-শুভ্র-পর্ণ-সুন্দর, হে অপরূপ বিহঙ্গ-বহ্নি, বেলাশেষে ধীরে তুমি এসেছ কালাতীতের পার হতে। হে দেবদূত! এই হেথায় আমার কাছে,

তপোনিরত পৃথিবীর তরে এনেছ কি মুক্ত সমাহিত অতীন্দ্রিয় আত্মাকে, না, এনেছ ভগবানের ভাগবত প্রেমের আরক্ত আবেগ ?

ফেনোচ্ছল কমলরক্তিম মদিরার শুভ্রকিরণ কলস তুমি—জ্যোতির তপ্ততেজে আকণ্ঠপূর্ণ কুণ্ড হতে, পরম আনন্দেরই আপন কুণ্ড হতে যে মদিরা আহরিত,
যে মদিরা অভিষুত কালারূঢ় নটরাজের আচম্বিত তাণ্ডব পদক্ষেপে, মৃত্যুঞ্জয়ী কোন্ লতায় ফলিত তাঁরই তপন-সার দ্রাক্ষা হতে।

হে শ্বেত-কমল বেদি! সনাতন নৈঃশব্দ্য গড়েছে তোমায়—বিস্তীর্ণ করে ধর তবে আমার প্রকৃতি, কর আমাকে তাঁর নিঃসঙ্গতার অন্তরঙ্গ অতিথি—
কিন্তু আরও ঊর্দ্ধে রয়েছে রহস্যময়ী কার তনু, তাঁর হীরক-দীপ্র লোকে—নক্ষত্রের আভায়, তীব্র আবেগের রশ্মিজালে গড়ে দিয়েছে তাঁর প্রভামণ্ডল।
হে বিহঙ্গ! কঠোর জগতের দংষ্ট্রান্বিত শৃঙ্গে উঠে চলেছে যে অনাবৃত ক্ষতাক্ত হৃদয়, তারই শোণিতের মত তোমার বক্ষ সান্দ্র শোণ;
চন্দ্রমা-প্রান্তক রাত্রি আর উদীয়মান দিবসের সঙ্গমে যে রজত-রুক্ম বেদি-ভৃঙ্গার, তারই অন্তরে তুমি অগ্নিশিখাপল্লবে প্রস্ফুটিত প্রেমের পদ্মরাগমণি।

হে শিখা! কালপুরুষের যজ্ঞ হতে সর্ব্বশেষে উদ্ভব তোমার—সান্তের দেববৃন্দ অনন্তের উদ্দেশ্যে তোমাকেই অর্ঘ্যপুষ্পরূপে ধরে রয়েছে।
হে অনুপম বিহঙ্গ! তোমার পক্ষ আলোকে প্রজ্বলিত, তোমার অর্গলমুক্ত দৃষ্টি পড়েছে গিয়ে বিশ্বব্যোমের ওপারে;
তোমার অনির্ব্বচনীয় আবেগের অপূর্ব্ব একটি মাত্র টানে, মনের প্রাণের জাঙ্গাল সব ভেঙ্গে দিয়ে, তোমায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে তার জ্যোতিষ্মান লক্ষ্যে—
তুমি প্রবেশ করেছ গিয়ে স্তব্ধ সমাহিতির, রক্তোজ্জ্বল বহ্নিদেবের নিবিড় আশ্লেষের মধ্যে—কালের অতীত একখানি মুখের সাক্ষাৎ সম্মুখী হয়েছ তুমি।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

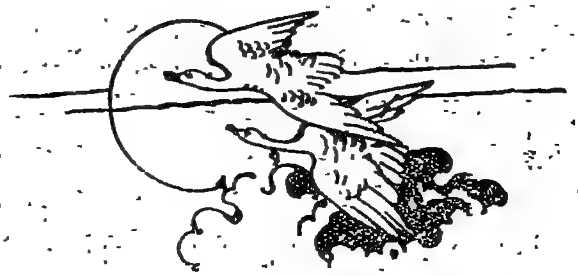

গীতিকবি অতুলপ্রসাদ

শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ

হিন্দুস্থানী সুরের প্লাবনে যে শাব্দিক কবিত্বের কচুরীপানার দুর্ব্বার ব্যাপকতায় আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যক্ষেত্র আজ আক্রান্ত, অতুলপ্রসাদের গীতাবলী তাহার সগোত্র নয়।

গোত্রের এই ভিন্নতাটুকু একদিকে যেমন কৌলীন্যজ্ঞাপক বাংলা গীতিকাব্যের পক্ষেও তেম্‌নি তাহা কল্যাণকর। মাত্র গুটীকয় গান বা গীতাংশ কাব্যরসজ্ঞ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলেই, এ সত্য স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কারণ সৌন্দর্য্যানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে, সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া চিনিয়া লইবার জন্য ঐ দর্শনটুকুই যথেষ্ট। অপর পক্ষে, বিভিন্ন মতবাদের কচ্‌কচিতে কাব্যের সহজ মাধুর্য্য ও অর্থকে আচ্ছন্ন ও দুর্ব্বোধ্য করিয়া তোলা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু রসতৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা আলোচনায় মধ্যে নাই। আলোচনা আস্বাদিত রসের কতকটা ইঙ্গিত-মাত্র করিতে পারে, এতদধিক কিছুই নহে। বস্তুতঃ যুক্তি দ্বারা সৌন্দর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা কতকটা যেন প্রকৃতি-অভিশপ্ত সুরতালহীনকে অঙ্কের সাহায্যে সঙ্গীত-রসিক করিয়া তোলার জবরদস্তির মতই।

গীতিকাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। গীতিকবিতার ভাষা সাধারণ কবিতার ভাষার মত সর্ব্বাংশে আভিধানিক নয়। প্রয়োজন মত সুর-গত ভাষার সাহায্য লইয়া তবে গীতিবাণীকে বাক্যাতীত করিতে হয়। ভাষা ও সুরের এই প্রয়োজনানুসারিণী সংমিশ্রণ-নৈপুণ্যই গীতিকবির বৈশিষ্ট্য; এবং এই মিশ্রণ ব্যাপারে কোন্‌টা হইতে কে কী অনুপাতে গ্রহণ করিবেন, তাহা কবি বিশেষের অভিরুচির উপর নির্ভর করে। কবি-গুরুর সুরের অভিনবত্বটুকু মানিয়া লইলেও, রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে কাব্যপ্রধান না বলার কোনো হেতু নাই। ব্যঞ্জনার অনন্য-সাধারণত্বই বোধকরি তাহার কারণ, এবং সে জন্যই তাঁহার গানগুলি পড়িতে পড়িতে পাঠকচিত্তে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়তা আন্দোলিত হইয়া ওঠে। কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানে সুরাংশের অবদানই সমধিক। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় সঙ্গীতকেন্দ্রে বাস করার প্রভাব। এই প্রভাব-প্রাবল্যে তিনি কখনো কখনো কাব্যরীতি সজ্ঞানে লঙ্ঘন করিয়াছেন, সে দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

'কাকলি'তে আমরা অতুলপ্রসাদের কাব্যধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম প্রত্যক্ষ করি। দেবতা, প্রেম ও প্রকৃতি। কবি স্বয়ং এই তিনটি বিভিন্নধারার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু এই ধারাত্রয়ের যত বিভিন্নতাই থাকুক না কেন, কবির গভীরতম বাস্তবচেতনা ও সৃষ্টিমুখী হৃদ্‌স্পন্দনই ইহাদের উৎ-পত্তি স্থান কিনা, এবং ত্রিধারা সৌন্দর্য্যমহাসিন্ধুপ্রবাহিনী কিনা, মাত্র ততটুকুই আমাদের বিচার্য্য।

অতুলপ্রসাদের দুইশতাধিক প্রচলিত গানের মধ্যে কোনটী মরমিয়াতত্ত্বাশ্রিত, কোন্‌টীতে বা বৈষ্ণবভাব উঁকি মারিতেছে, কোন্‌টী বাউলধর্ম্মী, কোন্‌টাতে বা একটু নাড়া পড়িলেই সুফিমতবাদ ধরা পড়িতে পারে,—সে সব জটিলতত্ত্বমীমাংসা সুধীজনের অপেক্ষা রাখে, এবং সে ইচ্ছা বা সামর্থ্যও বর্ত্তমান লেখকের নাই। আমরা মোটামুটি এ সহজ কথাটাই বুঝি যে, বেলা, চম্পক, বকুল, গোলাপ, শেফালি, যুঁথি, মল্লিকা প্রভৃতি জাতিতে যত বিভিন্নই হোক, সকলগুলিই এক পুষ্পশ্রেণীভুক্ত; এবং পৃথিবীর এক অজ্ঞেয় শক্তিই এই বৈচিত্র্যময় লাবণ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; এবং কবির মধ্যেও এমনি একটি সংজ্ঞাতীত শক্তি রহিয়াছে, যাহা নব নব সৌন্দর্য্যে সতত বিকচোন্মুখী। সে-শক্তি যে কোনও ভাব বা তত্ত্বকে আশ্রয় করিতে পারে। আমরা বরং দূরে দাঁড়াইয়া নাম-না-জানা ফুলের গন্ধে বর্ণে মুগ্ধ হইব, আবিষ্ট বিস্ময়ে এক অজ্ঞাতবিকাশিনীশক্তির অস্পষ্ট ধারণা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিব,

কিন্তু সে ফুলটিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া উদ্ভিদতত্ত্ব-নিরূপণে লাগিয়া যাইতে রাজী নই।

এখানে বহুমর্ম্মের ভাষাবাহিনী একটী গানের উল্লেখ করিব।

'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে?
উজল নয়নে কে গো হাসিলে?
মোহন সুরে
ধীরে মধুরে
পরাণ-বীণায় কে গো বাজিলে?
হেম-যমুনায়,
প্রেম-তরী বায়,
ডাকে আমায়—আয় গো আয়।
প্রভাত বেলায়
সোণার ভেলায়
কেমনে চলে যাবে হায়!
তব সে-কূলে
যাবে কি ভুলে
যে-ভালবাসা বাসিলে?'

জ্যোৎস্না রাতের বেদনাবহ এ গানখানি বাংলা গীতি-কাব্যে সত্যই অপূর্ব্ব। রচনাগত সুরটির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, আগাগোড়াই তাহা সুন্দর, পতনহীন। কিন্তু চতুর্থচরণে, সুনিপুণশিল্পীসুলভ একটী 'স্পর্শ'-সংযোজনায় সে সৌন্দর্য্য যেন বহুগুণিত হইয়া গেল। সে সুষমা এমনি, কোমল, কমনীয় যে, তাহাকে ভাষা দ্বারা বুঝাইতে যাওয়া আর শেফালির দললগ্ন শিশির কণাকে অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করার চেষ্টা একই বস্তু। অল্প কথায় শব্দচিত্রঅঙ্কন, সার্থক শব্দচয়ন ও সর্ব্বোপরি ভাবের সহজ সুন্দর প্রকাশ প্রভৃতি দুর্লভ সুকাব্যলক্ষণগুলি উল্লিখিত গানটিতে বিদ্যমান।

আজ এমন মধুর রাতে আসিয়া নিমেষমধ্যে যে-জন হৃদয় হরণ করিয়া লইল, কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই যে সোনার ভেলায় চলিয়া যাইবে, সেই অজ্ঞাত কূলে পৌঁছানোর পরেও কি গত রজনীর স্মৃতি সুখ-বেদনার মত তাহার অন্তরে ঝঙ্কৃত হইতে থাকিবে? অথবা প্রভাতে বিস্মৃত সুখ-স্বপ্নের মতই তাহা অতল বিস্মৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে? কে জানে?

এই যে কাব্যময়ী, কবি যাহার নিশ্চিত আসন্ন বিরহে বিধুর হইয়াছেন, সে কল্পনাছবিমাত্র হইলেও কবির perfection of experienceএর ফলে সে যথার্থই "The very image of life expressed in its eternal truth." তাই সে স্পর্শনীয় ও প্রাণময়ী। তাই সে জীবনরসের রসিক অ-কবিজনের চিত্তেও দোলা জাগাইয়া 'মোহনসুরে ধীরে মধুরে পরাণ-বীণায়' বাজিয়া উঠিল।

যে কবি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া একটী চিরন্তন সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, যাহাতে বিশ্ব-মানবের মর্ম্মকথা আপনি বাজিয়া ওঠে, অলঙ্কার শাস্ত্র তাঁহার নাম দিয়াছে 'লিরিক কবি'। উল্লিখিত গানখানি রচয়িতাকে সে-গৌরব অবশ্যই দান করিয়াছে।

কাব্য রূপাশ্রিত রসসৃষ্টি। সুতরাং Aestheticsকে উপেক্ষা করিয়া কেবল মাত্র idea ধরিয়া কাব্য বিচার করা চলে না। অপর পক্ষে, এই সৌন্দর্য্যজ্ঞানই (Aesthetic sense) পশ্চাতে থাকিয়া, ধ্বনি, ভাব ও চিত্রের বিচিত্রসঙ্গতি দ্বারা কাব্য সৃষ্টি করে। 'গীতিগুঞ্জের' কয়েকটী রচনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আমার ক্ষমা করিও যদি তোমারে জাগাযে থাকি;
দু'দিন গাহিয়া গান চলিয়া যাইবে পাখী।
তোমার নিকুঞ্জ-শাখা,
বসন্ত পবন-মাখা;
প্রাণের কোকিলে, বল, কেমনে ভুলায়ে রাখি?

* * * *

আমার করুণ গানে
যদি দুখস্মৃতি আনে,
ফুরাইয়া গেলে গান মুছিয়া ফেলিও আঁখি।

শুধু আন্তরিকতাই নয়, এ গানখানি হৃদয়স্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষ ভাবে প্রকাশ সঙ্গতির গুণেই।

অন্যত্র·······প্রেম-অধীরা,
কণ্ঠ মদিরা,
পরাণ-পাত্রে এ মধু রাত্রে ঢাল গো?
নয়নে, চরণে, বসনে, ভূষণে গাহ গো,
মোহন রাগ-রাগিনী?
ওগো নব-অনুরাগিনী?

কথাগুলি বসন্ত রাতের নর্ম্মসঙ্গিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলা, এবং নিরতিশয় সাধারণ। কিন্তু তাহা অসাধারণ অথবা কবিতা হইয়া উঠিয়াছে কবিসুলভ রূপায়িত অভিব্যক্তির জন্যই। পৃথিবীর জল যেমন প্রকৃতির সৃষ্টি কৌশলে আকাশের বর্ণলোক হইয়া ওঠে, ঠিক তেমনি।

সামান্যকে অসামান্য করিয়া তোলার কবির মধ্যে এই দিব্যশক্তিটি তাহা পরশমনিরই তুল্য। তাহারই স্পর্শে হৃদয়ের গভীরতম ক্রন্দনও হইয়া ওঠে মধুরতম সঙ্গীত, এবং যা-কিছু দুঃসহ তাহাই হয় উপভোগ্য। নহিলে 'Our sweetest songs are those that tell of the saddest thoughts'—হইত না; দুঃখ স্বভাবতঃই কঠোর ও নির্ম্মম। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি তাহারই সমর্থক।

"...তোমার সকলই সুন্দর হে—
অতি সুন্দর।
...তব গমন সুন্দর, থমক সুন্দর,
সুন্দর তব আলস;
তব গরব সুন্দর, অশ্রু সুন্দর,
সুন্দর হাসি-বিকাশ;
তব রচন সুন্দর, বচন সুন্দর,
সুন্দর তব গীতি;
তব মরম সুন্দর, সরম সুন্দর
সুন্দর তব ভীতি।

* * * *

তুমি সোহাগে মধুর, কলহে মধুর, মধুর যবে অভিমান;
তুমি মিলনে মধুর, বিরহে মধুর, মধুর যবে ভাঙা প্রাণ।

তুমি মধুর হে যবে আমায় ভালবাস, মধুর যবে বাস অন্তে,
তুমি মধুর যবে বস কনক আসনে, আমার কাটে দিন দৈন্তে।"

উপেক্ষার সে কালো মেঘ কখন কবির অন্তরাকাশে ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, কবিত্বের জ্যোৎস্নাধারাস্পর্শে তাহা হইতে কী অনুপম সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে।

অপর এক স্থানে—

সখা, দিওনা, দিওনা মোরে, এত ভালবাসা।
জগতে তা হ'লে মোর রবে না কিছুরই আশা।
তুমি দিলে সারা মন,
কি করিব আরাধন?
আসিয়া তোমার দ্বারে পাব কি শুধু নিরাশা?
প্রতিদিন ফুল তুলে
যাইব তোমার কূলে;
সে দিনের মত শুধু মিটাবো প্রেম-পিয়াসা।
লয়ে কোটী কোটী কান,
যাব শুনিবারে গান;
মরমে কহিও মোরে একটি মরম ভাষা।
আমার জীবন-নদী,
এত প্রেম পায় যদি,
ভাসিয়া ভাসিয়া যাবে মোর স্বপনের বাসা।

কবিতাটি উৎকর্ষ-মূলক রসসৃষ্টিক্ষমতার (Shaping power) উজ্জ্বল প্রমাণ।

বাংলা ভাষা ভাব প্রকাশের পক্ষে কিরূপ অনুকূল, এবং তাহার সম্পন্নতা আজ বিশ্বসাহিত্যিকের নিকট কিরূপ আকর্ষণের বস্তু, মাতৃভাষার বন্দনাচ্ছলে—সে কথাটি বলার মধ্যে কবি চমৎকার রসসঞ্চার করিয়াছেন।

মোদের গরব, মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা।

* * *

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনল মালা জগত জিনে।
তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগত করে যাওয়া আসা।

এরূপ চিত্তাকর্ষক কবিকর্ম্ম 'গীতিগুঞ্জে'র বহুসংখ্যক রচনাকে উৎকৃষ্ট কাব্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যবোধ সকল সময়ে কবির মধ্যে জাগ্রত দেখিতে পাই না। প্রকৃতির একটি গান উল্লেখ করা যাক্।

'প্রকৃতির ঘোম্‌টাখানি খোল্ লো বধু!
ঘোম্‌টাখানি খোল্।
আছি আজ পরাণ মেলি', দেখ্‌ব বলি'
তোর নয়ন সুনিটোল লো বধু!
নয়ন সুনিটোল।
কত আর নীরব রবি,
কবে তুই ফিরে চাবি,
মোরে বরি ল'বি বধু।
কবে জীবন-বাসর বাটে
বাজ্‌বে শঙ্খ ঢোল লো বধু
বাজ্‌বে শঙ্খ ঢোল?
আজি নিখিল কুঞ্জবনে,
মিলব পরম বধুর সনে,
বড় সাধ মনে বধু?
এ মোহন রাতে, আমার সাথে
বিশ্ব দোলায় দোল্ লো বধু!
বিশ্ব দোলায় দোল্।

উপরি উদ্ধৃত কবিতাটিতে কোন্ তত্ত্ববিশেষ নিহত আছে, সে সূক্ষ্ম বিচারে আমাদের প্রয়োজন হইবে না। অতি মাত্রায় তত্ত্বপ্রধান কাব্যালোচনা দর্শনালোচনারই নামান্তর।

প্রকৃতি-অবগুণ্ঠীতা কে একজন রহিয়াছে, কবি কল্পনা-চক্ষে তাহাকেই দেখিতেছেন। এখানে কবিশক্তি (poetic faculty) সে অলক্ষিতার সঙ্গে কোন মধুরতম সম্বন্ধ-সূত্রে বিকশিত হইতে চাহিতেছে, সেটুকু বুঝিলেই হইল, এবং তাহা খুবই স্পষ্ট।

'সুনিটোল' নয়নদর্শনে কাহারো কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু গুণ্ঠনমুক্তার নয়নের ব্যাকুল প্রতীক্ষা দৃষ্টিটি উপলব্ধি করিতে সকলেই বাঞ্ছা করিবেন। অমারাও, করি। তার পর 'এ মোহন রাতে' নিখিল কুঞ্জবনে সেই 'পরম বধুর সনে' বিশ্ব দোলায় দুলিবার যে সাধ, তাহাও কবিজনসুলভ। কবি নিজেই প্রতীক্ষায় আছেন যে, এক দিন সে তাঁহার পানে ফিরিয়া চাহিবে; মঙ্গল উৎসবের মধ্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইবে। সেদিন জীবন বাসর ঘাটে বাজবে শঙ্খ ঢোল।

মাঝখানে ঐ যন্ত্রটির ধ্বনি হঠাৎ যেন মিলন উৎসবকে আহত করে। 'ঢোল' না বাজাইয়া, বাঁশীর (সানাই) বন্দোবস্ত করিতে পারিলে শুভ কর্ম্মের অঙ্গচ্ছেদ করিতে হইত না, পরন্তু— বাঁশীর কোমল কারুণ্যটুকু কি উৎসবের সর্ব্বাঙ্গময় এক অকথিত সুষমা পরিব্যাপ্ত করিতে পারিত না?

অন্য একস্থানে আছে;—

আমি অলকে পরিতে প'ড়ে গেল মালা
তার পায়, ওগো, তার পায়।
আমি খেলিতে খেলিতে ভুলে গেনু খেলা;
একি দায়, ওগো, একি দায়।

এবং তারপরেই আছে,—

আমি পুকুর ভাবিয়া দেছিনু সাঁতার;
বুঝি নাই, ওগো, বুঝি নাই
শেষে দেখি এ যে অকূল পাথার
যত যাই, ওগো, যত যাই।

এখানে 'পুকুর' কথাটির স্থানে 'সরসী' হইলে, ছন্দ পতন ঘটিত না, অপর পক্ষে, কল্পনাগত ছন্দটিও রক্ষা পাইত। কারণ কাব্যের অনুকূল কল্পচিত্র জাগাইবার শক্তি 'পুকুর' শব্দটির মধ্যে নাই, তাই গা'নে তাহা অচল।

সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সাময়িক দুর্ব্বলতা আলোচ্যকবির রচনায় কখনও কখনও চোখে পড়ে; কিন্তু তাহা পার্থিব ত্রুটিবিচ্যুতি মাত্র। কাব্য যে নিবিড়তম উপলব্ধির সুন্দরতম প্রতিরূপ, সেটুকুর অভাব ঘটিলেই কবির পক্ষে তাহা হয় কলঙ্কের কারণ। কারণ, তাহা মিথ্যাচার, এবং সেই মিথ্যারূপী কুৎসিতের অঙ্গে যতই অলঙ্কার চাপান হয়, ততই তাহার অকিঞ্চিৎকরত্ব হয় পরিস্ফুট। রূপ-রসিকের চক্ষু তাহাতে প্রতারিত হয়না। অন্যদিকে গভীর উপলব্ধিজাত কাব্য বসনে ভূষণে অতিমাত্রায় সাবধানী না হইয়াও, তাহা হৃদয়দ্বারা সহজেই আদৃত। সে নিরাভরণতাকে আবেষ্টন করিয়া এক নগ্ন সৌন্দর্য্যলোক আপনি গড়িয়া ওঠে। নিম্নের বর্ষার গানটি সেই শ্রেণীর কাব্য।

বঁধু, এমন বাদলে তুমি কোথা?
আজ পড়িছে মনে মম কত কথা!
গিয়াছে রবিশশী গগন ছাড়ি;
ঝরবে বরষা বিরহ-বারি;

আজিকে মন চায়, জানাতে তোমায়
হৃদয়ে হৃদয়ে শত ব্যথা।
দমকে দামিনী বিকট হাসে;
গরজে ঘন ঘন, মরি যে ত্রাসে;
এমন দিনে, হায়, ভয় নিবারি,
কাহার বাহু পরে রাখি মাথা?

কবির অনুভূতি এখানে এত প্রবল যে, তাহাকে সংক্রামক বলা যাইতে পারে।

এর পাশাপাশি অতি আধুনিক তরুণ কবিদের একটা রচনা উদ্ধৃত করিতে পারিলে—Contrastটা ভালরূপে পরিস্ফুট হইত। কিন্তু, নাগরা, চাদর, লম্বাচুল, ঢিলেপাঞ্জাবী, চশমা প্রভৃতি কবির অবশ্য বাহ্যচিহ্নগুলি বহন করিয়া সগৌরবে যাহারা বিচরণ করেন, তাহাদের সংখ্যা ত কম নয়। সুতরাং তাহাদেরই দু'একজনের রচনা উদ্ধৃত না করিয়া সম্প্রদায় হিসাবে বলাই সমীচীন।

ইহাদের রচনা দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয়, কবি হইতে হইলে প্রকৃতিদত্তদান ও স্বকীয় সাধনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল গোটা দুই প্রচলিত গজলের বই, 'বুলবুল্', 'সাকী', 'সরাব', 'পেয়ালা' প্রভৃতির সঙ্গে আরও শ'দুই অভিধান-মথিত 'স'বহুল শব্দ তূণস্থ করিতে পারিলেই, কাব্যজগতে অর্জ্জুন হওয়া সম্ভব। ফলে, যে অনুভূতি-গঙ্গা মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে অবহিত শত শব্দ-শরনিক্ষেপেও তাহার বহিরাবরণ বিদ্ধ হয়না। কী করিয়াই বা হইবে? এ যে অসম্ভব চেষ্টা। নিজের মধ্যেই যাহার ভাবের বিদ্যুৎ সঞ্চার হয় নাই; অপরের অন্তরে সে তাহা প্রবাহিত করাইবে কোথা হইতে? শব্দও তাহার বাহন মাত্র। এই শ্রেণীর কবিদের লক্ষ্য করিয়াই গেটে বলিয়াছেন:—

"If feeling does not prompt, in vain you strive;
If from the soul the language does not come,
By its own impulse to impel the hearts
Of hearts, with communicated power,
In vain you strive, in vain you study earnestly."

কিন্তু অতুল প্রসাদের কাব্যের উৎস-সন্ধান তাঁহার নিজের উক্তিতেই মেলে:—

যখন তুমি গাওয়াও গান
তখন আমি গাই
গানটি যখন হয় সমাপন
তোমার পানে চাই।

যাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়া থাকুক, কবি যে অনুপ্রেরণার কতখানি মুখাপেক্ষী, কথাগুলি তাহারি দ্যোতক।

অতুলপ্রসাদের কাব্যে এমন একটি সর্ব্বতোমুখী স্বকীয়তা দেখিতে পাই, যাহা কবির পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। কোনো কারণেই সে বৈশিষ্ট্য তাঁহার চাপা পড়িয়া যায় নাই।

জল বলে চল্, মোর সাথে চল্
তোর আঁখিজল হবে না বিফল।
চেয়ে দেখ্ মোর নীল জলে,
শত চাঁদ করে টলমল্।
মোরা বাহিরে চঞ্চল,
মোরা অন্তরে অতল,
সে অতলে সদা জলে রতন উজল!
নহে তীরে, এই নীরে হবিরে শীতল।

রচনার মধ্যেই কবি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিয়া আছেন,—নাম জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য মাত্র। তাহা ছাড়া, উক্ত রচনার মধ্যে জলের তরলতা ও জলধির গম্ভীর সৌন্দর্য্য কিরূপ বিচিত্রভাবে ছন্দিত হইয়াছে, তাহাও লক্ষনীয়। রচনাটি বাস্তবিকই "বাহিরে চঞ্চল", কিন্তু "অন্তরে অতল"।

অতুলপ্রসাদের কাব্যে স্পষ্টতা আছে বলিয়া তাহাকে গতানুগতিক মনে করিবার কোনো কারণ নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিই:—বহুজ্ঞাত মতবাদ ও 'ঝুলন', 'হোলি' প্রভৃতি কতকগুলি প্রচলিত ধর্ম্মোৎসবকে আশ্রয় করিয়া, এ পর্য্যন্ত বহু বিভিন্নধর্ম্মী রচয়িতার কবিত্বশক্তি আত্মপ্রকাশ খুঁজিয়াছে। সাধারণত উষার অরুণরাগকে ফাগ কল্পনা করিয়া 'হোলি'র গান রচনাব 'রেওয়াজ' আছে। কাহারো কাহারো কল্পনার বা একটু ইতরবিশেষ আছে। কিন্তু অতুলপ্রসাদের হোলির গান একটু ভিন্ন ধরণের। তাঁহার 'কালো'র

(কৃষ্ণ) রূপ ও ফাগের বর্ণ দুই'ই মৌলিকতাজ্ঞাপক। যা-কিছু মনুষ্যদৃষ্টি অভেদ্য, রহস্যময়, তাঁহার 'কালো'র পরিকল্পনা তাহাই, এবং নিজের বহুপ্রকাশ জীবনের বর্ণে সেই 'কালো'র সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করাই তাঁহার অভিলাষ। তাঁহার 'কালো'র যে অলক্ষিত বাঁশীটি দৃশ্য ও অনুভূতির জগতে নিয়ত ভাসমান, রহস্যাবৃত বলিয়াই তাহা তাঁহার নিকট এত মধুর।

তাই তিনি বলেন—

"হে মোর কালো

*　*　*

হে মোর নিয়তি,

শ্যাম মুরতি,

তোমার বাঁশী যে—

"আঁধারে বাজে ভাল।"

এক্ষণে ছন্দ ও মিলের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব। অবশ্য শ্রুতিমাধুর্য্য ও ছন্দের চুলচেরা হিসাবটি বজায় থাকা সত্ত্বেও রচনা-বিশেষ আবর্জ্জনা-কুণ্ডে স্থান পাইবার যোগ্য হইতে পারে। তথাপি ছন্দকে একেবারে নাকচ করিয়া দেওয়া চলে না। শ্রুতি-সুখকরতার চেয়েও বড় প্রয়োজন ছন্দের রহিয়াছে। সঙ্গীতে সুর তালের অনুবর্ত্তী হইলে গীতিমাধুর্য্য বৃদ্ধিই পায়; তেমনি ছন্দানুগত্য বাক্যের অর্থকে আড়ষ্ট করে না, প্রত্যুত সুদূর-গামী করে।' ছন্দের মধ্যে বাক্য কতকটা অনির্ব্বচনীয়তা লাভ করে। ছন্দের অস্বচ্ছন্দ প্রবাহে কাব্যের সৌরভ পরিপূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়গত হয় না। অতুলপ্রসাদের গান গুলিতে সুরের হিল্লোল আছে, কিন্তু ছন্দের প্রবাহ অতি ক্ষীণ। এই কারণেই সে গুলির কাব্য সঙ্কলন অপেক্ষা গীতি সঙ্কলন বহুগুণ অধিক সমাদর দাবী করিতে সক্ষম। কাকলির ভূমিকায় যে দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্বরলিপি প্রকাশের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মূলেও বোধ করি ঐ ছন্দের প্রশ্ন।

সানাই-এর 'পোঁ' ধরা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধন পথে সুরটি যখন ক্ষণিকের অবকাশ গ্রহণ করে, তখন ঐ পোঁটিই সুরের হৃদয়াবেগ জাগাইয়া রাখে। কাব্যক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে গানে 'মিল'ও ছন্দের অনুরূপ সহায়ক। কিন্তু আলোচ্য কবির কাব্যে ছন্দের মত 'মিল'ও সকল সময়ে যথাযথভাবে আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেছে না। তাহাতে কাব্যানুরাগী পাঠকের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, অতুলপ্রসাদের রূপ-রস-শিল্পী মন যথেষ্ট অবহিত, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় প্রায়শঃই অন্যমনস্ক।

অতুলপ্রসাদের কাব্য ব্যক্তিগত অনুভূতিতে যতটুকু ধরা দিয়াছে, মোটামুটি ভাবে তাহাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। চূড়ান্ত সমালোচনার দাবী তাহাতে রাখি না। পরন্তু, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতুলপ্রসাদের কাব্য প্রকৃতির এতটুকু আভাস ফুটিয়া থাকিলেও যথেষ্ট মনে করিব।

অতুল প্রসাদের গানগুলি সম্বন্ধে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, অতি অধুনিক নিষ্প্রাণ মিথ্যাচারের ভারে পীড়িত রিমুখ হৃদয়ের নিকট এগুলির প্রচুর প্রাণশক্তির মূল্য অত্যন্ত বেশি। তাঁহার গানগুলি যে নিখুঁত, আদর্শস্থানীয় এমন কথা কোথাও বলি নাই। ভ্রম-প্রমাদ তাহাতে আছে, এবং প্রয়োজন বোধে সে সত্যটুকু প্রকাশও করিয়াছি। তথাপি, যে সুরটি মানুষের চিত্তকে আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ করে, সমস্ত অপূর্ণতাকে ছাপাইয়া তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্রই তাহা ধ্বনিত হইয়েছে। সযত্ন-রচিত কুসুমস্তবকের নিপুণ আনন্দ হয়ত তাহাতে মিলিবে না, কিন্তু ঝরা শেফালির স্মিত আমন্ত্রণ হৃদয়ের নিকট কখনও ব্যর্থ হইবে না।

শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ

অবসাদ

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

চৌদিকে মোর প্রাচীর দিলে যে ঘেরি',
তোমার কুটীর-প্রাঙ্গণ ছাড়া কিছু আর নাহি হেরি।
কোথা সে উদার পথ মাঠ ঘাট,
সবুজে ধূসরে বুনানি জমাট,
ছায়া তরু বীথি কই ?
নীলের টুকরা আকাশের পানে বিস্ময়ে চেয়ে রই,
—কোথা গেল তার দিগ্বলয়ের রেখা ?
বিশাল বিপুল নীল গম্বুজ আর ত যায় না দেখা।

কোথা নদী তট আঁকা বাঁকা পথ শেষে ?
ঝলমল জলে আজিও কি চলে ভরা পালে তরী ভেসে ?
ঊষা সন্ধ্যার কিরণের ঝারি
দেয় কি রাঙায়ে প্রবাহিনী বারি ?
জানিতে পারি না আর,
—সে উছল জলে এখনো কি গলে মধু হাসি জোছনার ?
হৃদয় আমার অধীর হয়েছে আজি,
কোথা সে তটিনী সাগর-গামিনী শ্যামঘন বনরাজি।

অঙ্গন মাঝে খনন করেছি কূপ,
গাগরি ভরিয়া তুমি তোল জল, অঙ্গে উছলে রূপ।
সে মাধুরী আমি হেরি অনিমিখে
কুহক পরিখা মোর চৌদিকে
যেন রচিয়াছে কারা,
এই আঙিনায় পথ নাহি পায় বড় কাছে ছিল যারা।

আজিকে তাহারা স্মরণে আসিছে মোর,
ও ভুজ-বলয় কেন মনে হয় নিরদয় মায়া-ডোর?

গৃহদীপখানি জ্বা'ল যবে নিজ হাতে,
মনে হয় যেন নিভে যায় চাঁদ মধুপূর্ণিমা রাতে।
বাতায়ন পথে দখিণা বাতাস
ভেসে আসে যবে জাগে হাহুতাশ
এ নিথর বুক ভরি,'
নিদ্রাশিথিল মিলন গ্রন্থি ধীরে বিমোচিত করি'
কেমনে পলা'ব খুলি' এ কারার দ্বার,
সেই ভাবনায় রজনী পোহায়, মুক্তি নাহিক আর।

তুমি এলে যবে আমি ভেবেছিনু মনে,
—আমার নিখিল দিল বুঝি ধরা অভিসারিণীর সনে।
ওই নদীতট অরণ্যভূমি
নিজ মাধুরীতে ভরি দিতে তুমি,
নীলিমা ঘনা'ত নভে,
কাননে কুসুম উঠিত ফুটিয়া গাঢ়তর সৌরভে।
সবাকার মুখে পড়িত তোমার আলো,
মনে হ'ত তাই পর কেহ নাই, সবারে বেসেছি ভালো।

তোমার লাগিয়া বাঁধিনু কুটীরখানি,
গৌরবে সেথা পাতিনু আমার নিখিলের রাজধানী।
রাণীর মতন কেশরী আসনে
বসিলে যখন, ভাবি মনে মনে

আমি বিশ্বেশ্বর,
ভুবনমোহিনী ঘরণী যাহার তার পদে চরাচর।
তোমারে লভিয়া আপনারে গেনু ভুলি,
আমার বলিতে যাহা কিছু ছিল তোমারে দিলাম তুলি।

আজি মনে হয় হয়েছি সর্ব্বহারা,
বাঁধনের মাঝে কভু বাঁচেনাত গিরিনির্ঝর ধারা।
রবি শশি তারা নভোনীলিমায়
কভু বাঁধে না ত অচল কুলায়,
হারায় না কভু গতি,
চিরচলিষ্ণু চঞ্চল হিয়া হ'ল অনন্যমতি,
কমল-কবরে অলি সম হ'ল লীন,
বনে বনান্তে উদ্‌ভ্রান্তের পক্ষে বাজে না বীণ।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

ভূদেব

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

অমোঘ পশ্চিম মেঘে ঘেরিয়াছে আকাশ-অঙ্গন,
উড়ে যায় ঝড়ো বায়ে গৃহস্থের যা-কিছু সম্বল,
তরণী থাকে না স্থির—মানেনাক হালের বন্ধন—
ঘাট ছাড়ি ভেসে চলে ; যাত্রীদল বিপন্ন চঞ্চল !
আপনার যাহা কিছু—ভার বলি' টানি দুই হাতে
জলে ফেলি' দিয়া ভাবে—কি ক'রে বাঁচিবে শুধু প্রাণ,
সমাজ সংসার ভুলি' সে সঙ্কটে ভাবে আশঙ্কাতে
যায় যাক্ চিরাভ্যস্ত নীতি ধর্ম্ম, যায় যাক্ মান।

কে তুমি ব্রাহ্মণ দৃপ্ত—সর্ব্বনাশা সে আসন্ন কালে
নিপুণ কাণ্ডারীসম দৃঢ় হস্তে ধরি' হাল তার,
ঘুরায়ে তরণীমুখ, কাটাইয়া সে দুর্য্যোগজালে
বাঁচাইতে চাহ সবে নিঃসঙ্গ বহিয়া সর্ব্বভার ?
স্বাধীন সংযত বুদ্ধি তোমাসম কে ধরেছে কবে ?
হে দেব, ভূদেবই তুমি বাঙ্গালীর চিন্তার গৌরবে।

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ চুঁচুড়ায় ভূদেব স্মৃতি-সভায় পঠিত

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে সকাতর ক্যাঁচ ক্যাঁচ ধ্বনি কানে প্রবেশ করতেই সন্ধ্যার মনে পড়্‌ল গরুর গাড়ি ক'রে সে আমিনার শ্বশুরবাড়ি চলেছে এবং সুদীর্ঘ পথের এখনও শেষ হয়নি। গাড়ি ছাড়ার পর চাকার শব্দের এবং গাড়ির ঝাঁকানির তাড়নায় কথাবার্তা বেশি কিছু আর হ'তে পারে নি, তারপর আদি-অন্তহীন চিন্তার মধ্যে মগ্ন থাক্‌তে থাক্‌তে কখন্ অতর্কিতে নিদ্রাকে আশ্রয় ক'রে অচেতন দেহ শয্যার উপর লুটিয়ে পড়েছে সে কথা মনেও পড়ে না। বিচালি, তোষক এবং চাদর দিয়ে রচিত শয্যা নরমই ছিল এবং বায়ুও ছিল সুশীতল। সুতরাং ঘুমটা এমনই প্রগাঢ় হয়েছিল যে, এর আগে আর একবারও ভেঙ্গেছিল কিনা তাও মনে পড়ে না। আকাশে প্রত্যুষের স্তিমিত আলোক, প্রভাতের সুশীতল জোলো বায়ু ঝির ঝির ক'রে বইছে। ছইএর জন্যে গাড়ীর দুপাশ দিয়ে দৃশ্য দেখা যায় না, কিন্তু সম্মুখের ফাঁক দিয়ে পথপার্শ্বের গাছ-পালা বন-জঙ্গল পাহাড়-প্রান্তর সবই কিছু-কিছু দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গাছে গাছে যেন দুচারটে পাখীর কাকলীও শোনা যাচ্ছে।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! সন্ধ্যা সহসা ধড়মড় ক'রে উঠে বস্‌ল। রাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যে মুক্তির যে পরিপূর্ণ মূর্ত্তি সে দেখ্‌তে পায় নি, প্রত্যুষের আলোকে গাছ-পালা পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্য দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে তাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলে। এ-ই ত' মুক্তি! একেই ত বলে মুক্তি! এ ত' মহবুবের শিকললাগানো কারাকক্ষ নয়, এ যে বিশ্বপ্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণ! এখানে পশুপক্ষীর সঙ্গে তার মিতালী, তরুপল্লবের সঙ্গে আত্মীয়তা! ইচ্ছা করলেই সে যে-কোনো গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, যে-কোনো লতা থেকে ফুল তুল্‌তে পারে, যে-কোনো পাখীর গান শুন্‌তে পারে! ঐ যে দূরে বন্ধুর প্রান্তরের একটু খানি অংশ দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছে করলে ওখানে গিয়ে সে কাঁটাগাছে দু'পা ক্ষতবিক্ষত করতে পারে। এমন কি কাছাকাছি যদি কোনো বন্যা-উদ্বেল পার্ব্বত্য নদী থাকে, তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতেও পারে! এ-ই ত মুক্তি! একেই ত বলে মুক্তি! মুক্তি যে এত মধুর আগে কে তা জান্‌ত!

কি আশ্চর্য্য! সে গতি লাভ করেছে! অবিরাম চলেছে সে,—বাধা নেই, আটক নেই! এ চলার শেষ হবে কলকাতায়, যেখানে তার বাপ মা আছে, স্বামী আছে। সন্ধ্যার ইচ্ছা হল লাফ দিয়ে পথের উপর প'ড়ে একটা ছুট দেয়। এমনই মন্থর গতি এই গরুর গাড়ীর, যেন চলতেই চায় না।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে আমিনা তখনো শুয়ে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু ইয়াসিন গাড়ীর ভিতরে নেই। আমিনার গায়ে-হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে সন্ধ্যা ডাকলে, "আমিনা! আমিনা!"

নিদ্রালস চক্ষু উন্মীলিত করে আমিনা বল্‌লে, "কি?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "এবার ওঠ! সকাল হয়েচে।"

আমিনা চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে সহাস্য মুখে বল্‌লে, "তা'ত হয়েচে, কিন্তু তোমার সকাল কখন হয়েছে শুনি? একটু আগেওত তোমাকে ঘুমন্ত দেখেচি।"

অপ্রতিভ হয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সত্যি ভাই, এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে, এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে গেছে। কিন্তু ইনি কোথায়?"

"কিনি?"

সন্ধ্যা ইয়াসিনের নাম ভুলে গিয়েছিল, স্মিতমুখে বল্‌লে, "কেন বুঝতে পারছ না কি?"

"না।"

"তোমার—তোমার স্বামী ?" বলেই সন্ধ্যার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল।

নিষ্প্রভ আলোকেও আমিনা তা লক্ষ্য করে বল্‌লে, "আমার স্বামী, তা তোমার এত লজ্জা কেন ? রাত্রে গাড়ীতে উঠে ইয়াসিন গাড়ীর পিছন দিকে পা ঝুলিয়ে বিপরীত দিকে মুখ ক'রে ব'সে ছিল। সে দিকে দৃষ্টিপাত করে আমিনা বলে উঠল, "ওমা তাই ত! আমার স্বামী কোথায় গেল ? ডাকাতে হরণ করে নিয়ে গেল না ত!"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল; বল্‌লে, "সবাই কি হতভাগিনী সন্ধ্যা যে ডাকাতে হরণ করে নিয়ে যাবে।" তারপর সাগ্রহে আমিনার হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "না ভাই, সত্যি করে বল, কোথায় গেলেন তিনি।"

আমিনা স্মিতমুখে বল্‌লে, "তিনি? তিনি লাফ দিয়ে রাস্তায় গেলেন।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, কাল রাত্রে ঢুলতে ঢুলতে তুমি যাই শুয়ে পড়লে, উনিও ওদিকে একটি পরিষ্কার লাফ মেরে রাস্তায় প'ড়ে গাড়ির পিছনে পিছনে পথ চলতে আরম্ভ করলেন।"

সবিস্ময়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ?"

"তা হ'লে তোমার শোবার জায়গার আর একটু সুবিধা হয়,—বোধহয় সেই ভেবে। তা ছাড়া—

ঔৎসুক্যের সহিত সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা ছাড়া কি ?"

"তা ছাড়া, তুমি ঘুমিয়ে থাক্‌লে একগাড়িতে ওঁর জেগে ব'সে থাকা উচিৎ হয় না, সে কথাও ভেবে।"

কুণ্ঠিত কণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা'তে কি হয়েছিল ? না, না, এ ভারী অন্যায়! আচ্ছা, তাই যদি, তুমি আমাকে তুলে দিলেনা কেন আমিনা ?"

হাস্‌তে হাস্‌তে আমিনা বল্‌লে, "তা বটে, সেইটেই ভুল হয়ে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা, এখন ত' ওঁকে উঠে আসতে বল।"

"কেন, তুমি নিজে বল না?—ভদ্রতা তো তুমিই করতে চাচ্ছ।"

"ভদ্রতা নয় আমিনা,—করুণা। আহা, দেখ দিকিনি সমস্ত রাতটা মুখ বুজে পথ হাঁটছেন।" তারপর আমিনার হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে, "নাও, গাড়ি থামাও।"

আমিনার আদেশে গাড়ি স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। ইয়াসিন গাড়ির পাশে পাশেই চল্‌ছিল, গাড়ি থাম্‌তে পিছন দিকে এসে দেখ্‌লে গাড়ির ভিতর আমিনা এবং সন্ধ্যা দুজনেই জেগে ব'সে রয়েছে। সন্ধ্যাকে সেলাম ক'রে হাসিমুখে বল্‌লে, "উঠে পড়েছেন? রাত্তিরে ঘুম বোধহয় একটুও হয়নি ?"

সন্ধ্যা প্রতি-নমস্কার ক'রে লজ্জিত মুখে বল্‌লে, "আপনি সমস্ত রাত হেঁটে এসেছেন, আর আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসেছি! ছি ছি, কি লজ্জার কথা! আপনি উঠে আসুন।"

সন্ধ্যার অপ্রতিভ ভাব দেখে ব্যস্ত হ'য়ে ইয়াসিন্ বল্‌লে, "না, না, তার জন্যে আপনি একটুও লজ্জিত হবেন না। এ-সব রাস্তা ত' আমরা হেঁটেই শেষ করি। শুধু আপনাদের জন্যেই গাড়ি আনা।"

"আচ্ছা, এখন উঠে আসুন।"

স্মিতমুখে ইয়াসিন বল্‌লে, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, কিছু প্রয়োজন নেই। আর ত' সবে পোন্ ক্রোশ টাক পথ বাকি। একেবারে কাছে এসে পড়েছি; ঐ যে দবীপুরের গাছপালা মালুম দিচ্ছে।"

আমিনা বল্‌লে, "মালুম দিলেই কি কাছে হ'তে হয়? এই ত' আমিও এখান থেকে মালুম দিচ্ছি, তাই ব'লে কি তোমার খুব কাছে আছি বল্‌তে চাও?"

আমিনার পরিহাসে ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ইয়াসিন্ দেখলে নিঃশব্দ হাস্যে তার মুখ উচ্ছলিত। বল্‌লে, "একটু না হয় শুয়ে পড়ুন, এখনো খানিকটা ঘুমতে পারবেন।"

মৃদুস্মিত মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, আর ঘুমোবার দরকার নেই।"

"ঘুম একটু হয়েছিল কি ?"

"বেশ ভালই হয়েছিল।"

"আচ্ছা, আমি পাশেই রইলাম। আপনারা ততক্ষণ

কথাবর্ত্তা করুন।" ব'লে ইয়াসিন গাড়ির পাশে গিয়ে গাড়ি চালাবার আদেশ দিলে।

গাড়ি চল্‌তে আরম্ভ করতেই সন্ধ্যা আমিনাকে দুই বাহুর দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ ক'রে ধরলে, তারপর মিনতি-করুণ স্বরে বল্‌লে, "ভাই আমিনা, আজই আমাকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো।—কেমন, করবে ত?"

আমিনা সন্ধ্যার ব্যাকুলতা দেখে মনে মনে দুঃখিত হ'লেও হাসিমুখে বল্‌লে, "কেন, সবুর সইছে না না-কি?"

কাতরস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সয় কি? তুমিই ভেবে দেখ আমিনা! বন্দী যখন ছিলাম তখন একরকম ছিলাম, এখন তোমার দয়ায় মুক্তি পেয়ে সত্যিই সবুর সইছে না। মনে হচ্ছে কি জানো, গাড়ি থেকে নেবে প'ড়ে ছুট দিই। আজই আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো ভাই।—কেমন? লক্ষ্মীটি!"

আমিনা বল্‌লে, "আমি কি তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পারছিনে সন্ধ্যা? খুবই বুঝ্‌তে পারছি। আজকেই তোমাকে পাঠাবার বিশেষ চেষ্টা করব; তবে আমার শ্বশুর সব দিক বিবেচনা ক'রে যেমন করবেন তাই হবে ত ভাই। তোমাকে পাঠাবার মধ্যে ভাববার অনেক কথা আছে, শুধু তোমার দিক দিয়েই নয়, আমাদের দিক দিয়েও।"

আগ্রহ সহকারে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের দিক দিয়ে কি?"

"আমাদের দিক দিয়ে পুলিস। তোমার শ্বশুর বড় মানুষ, পুলিসের পাহারা চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। যে তোমাকে নিয়ে যাবে সে যদি ধরা পড়ে তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত গফুর মহবুবরাও ধরা পড়বে। জান ত' ভাই, কান টান্‌লে মাথাও আসে।"

"কিন্তু এ বিশ্বাস ত' আছে আমিনা, যে, আমার দ্বারা তোমাদের কখনো কোনো বিপদ হবে না? আমার মুখ দিয়ে কেউ কখনো কিছু বলিয়ে নিতে পারবে না—এ বিশ্বাস ত' করো?"

সন্ধ্যার কথা শুনে আমিনা হেসে ফেললে; বল্‌লে, "এ বিশ্বাস না করলে তোমাকে কি ঘরে এনে ঢোকাতাম সন্ধ্যা? তোমার কোনো ভাবনা নেই, যত শীঘ্র তোমাকে কলকাতা পাঠানো সম্ভব তার চেয়ে এক মিনিটও দেরী হবে না। আমার শ্বশুর অত্যন্ত দয়ালু লোক।"

"তা'ত তাঁর ছেলেকে দিয়েই বুঝ্‌তে পারছি ভাই! তোমার শাশুড়ি আছেন আমিনা?"

"না।"

"বাড়িতে আর কে কে মেয়েমানুষ আছেন?"

আমিনা হেসে বল্‌লে, "আর কেউ না। আমিই একমাত্র।"

সন্ধ্যা হেসে উত্তর দিলে, "তাই এত আদরের বউ!"

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি একটা বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। আমিনা বল্‌লে, "এইটে আমাদের বাড়ি, আর ঐ দেখ বারান্দায় আমার শ্বশুর ব'সে রয়েছেন।"

সন্ধ্যা আগ্রহভরে তাকিয়ে দেখ্‌লে একটি দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ বৃদ্ধলোক লুঙ্গি প'রে অনাবৃত দেহে মোড়ায় ব'সে তামাক খাচ্ছেন। মূর্ত্তি সৌম্য—প্রশান্ত।

গাড়ি নিকটে উপস্থিত হ'তে আমিনার শ্বশুর মহীউদ্দীন গাত্রোত্থান ক'রে নেমে এসে বল্‌লেন, "কি, বউমা এলে না-কি?"

গাড়ী থেকে নেমে পড়ে অবনত হয়ে শ্বশুরকে সেলাম করে হাসিমুখে আমিনা বল্‌লে, "হঁা আব্বা, এলুম।"

আমিনার পিছনে পিছনে সন্ধ্যাও নেমে এসে আমিনার মত মহীউদ্দিনকে সেলাম করে নতমুখে দাঁড়াল।

সন্ধ্যাকে দেখে মহীউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "এ মেয়েটি কে বউমা?"

"এটি আমার একটি বন্ধু আব্বা। বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছে।"

"তোমার বন্ধুর যখন বিপদ তখন তোমারো বিপদ বউমা। আর তোমার যখন বিপদ তখন আমারো বিপদ।" বলে মহীউদ্দিন হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন, "এস, মা, এস। বউমার যখন সুপারিশ, তখন তোমার এ বুড়ো চাচার দ্বারা যা কিছু হবার সবই হবে। পরে সব কথা শুনব, এখন বাড়ীর ভিতর গিয়ে প্রথমে একটু ঠাণ্ডা হও। লজ্জা করো না, এ তোমার আপন বাড়ি।"

এবার হিন্দু প্রথায় যুক্তকরে মহীউদ্দিনকে নমস্কার ক'রে সন্ধ্যা আমিনার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করল। (ক্রমশ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দুই দিক

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য এম্-এ

নিজের মনটাকে নিয়ে লতিকা ভারি বিপদে পড়েছে। আব্দারে ছেলের মতো তার মনটা কদিন কেবলই খুঁত খুঁত করছে, অথচ কী যে চায় তা'ও স্পষ্ট করে বলছে না। ছুটির পর কলকাতা তার অসহ্য বোধ হচ্ছিল, তাই বাবা মা'কে রাজী করে সে "মন্দার হিল্স্" এ নিয়ে এসেছে। ইট কাঠের স্তূপ বা ট্রাম-বাসের ঘড়ঘড়ানি কিছুই এখানে নেই; আকাশ এখানে ধূমমলিন নয়—নির্ম্মল নীল। তাইতে সাদা মেঘের টুকরো অলস-মন্থর গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে সবুজের প্রাচুর্য্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। তার ওপর, সময় কাটাবার জন্যে সে বাংলা আর ইংরাজী উপন্যাস এক ঝুড়ি নিয়ে এসেছে। কাজেই নালিশ করবার তার কিছু নেই। তবু—

যে সব বইয়ের ভেতর সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হ'য়ে ডুবে থাকতো, আজকাল দু'পাতা পড়তে না পড়তে তাইতে তার বিতৃষ্ণা ধরে যায়। আজ ঠিক তাই হয়েছিল। "ব্যারণেস্ অর্ক্‌জি"'র "স্কারলেট পিম্পারনেল্" বইখানা তার কোলের ওপর খোলা পড়েছিল, অথচ তার মনটা যে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল, তা সে নিজেও বলতে পারতো না। যখন খেয়াল হোল, দেখলে আধ ঘণ্টার ওপর সে বই নিয়ে বসেছে অথচ পড়া তার সেই ১৩৫ পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। বিরক্ত হয়ে সে বইখানা ছুঁড়ে ফেলে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। বাগানে অজস্র ফুল ফুটেছে। চামেলি, গোলাপ, জবা, সীজ্‌ন্ ফ্লাওয়ার কিছুরই অভাব নেই। হঠাৎ পাশের বাড়ীটার দিকে চোখ পড়তেই সে কৌতূহলী হয়ে উঠলো। বাড়ীটার সব দরজা জানালা খোলা; লোকের সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি বাড়ীটায় নূতন লোক এলো? কারা? তার বয়সী মেয়ে টেয়ে আছে কিনা কে জানে। গভীর আগ্রহে লতিকা বাড়ীটার দিকে দেখছে, এমন সময় তার চোখে পড়লো একটী ২৪।২৫ বছরের ছেলে বারান্দায় রেলিংএর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে তাকে লক্ষ্য করছে। তার রং খুব ফরসা আর নাকটা বেশ টিকলো। এইটুকু দেখেই লতিকা ফিরে দাঁড়ালো। তারপর যেন কিছুই দেখতে পায়নি, এম্নিভাবে বারান্দার অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাগান দেখলে। তারপর ফিরে এসে একটা গানের কলি গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে বাড়ীর ভেতর চলে গেল। তবে চকিত দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে গেল যে ছেলেটী সেই একভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সে পরিত্যক্ত বইখানা তুলে নিয়ে আর একবার মন বসাতে চেষ্টা করছিল, আর ভাবছিল পাশের বাড়ীতে কারা এলো কি করে খোঁজ পাওয়া যায়। এমন সময় পেছন থেকে কে তার চোখ দুটো টিপে ধরলে। হাতে চুড়ি দেখে সে বুঝলে—মেয়ে ছেলে। কিন্তু এই নির্জ্জন প্রবাসে তার চোখ টিপে ধরবার মত বান্ধবী কে আছে সে কিছুতেই ভেবে পেলে না। অবশেষে, সে বল্লে, "হার মানছি ভাই, ছেড়ে দাও।"

চোখ থেকে হাত অপসারিত হলো। ফিরে চেয়েই লতিকা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, "ও-মা, কম্‌লি! তুই! আমি কি স্বপ্ন দেখছি?"

২

এম্, এ পাশের খবর পেয়েই অজয় ফন্দী আঁটছিল নতুন কেনা মোটরটা করে রাঁচি পাড়ি দেবে। সেখান থেকে হাজারিবাগ, গিরিডি ইত্যাদি শেষ করে পাটনায় মামার কাছে দিন কতক থেকে আসবে। সঙ্গীও তার

মেলাই জুটে গিয়েছিল, এখন শুধু মায়ের অনুমতিটা আদায় করতে পারলেই হয়। তবে কাজটা খুব সোজা হবে এমন আশা তার ছিল না, কারণ বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ সন্তোষ মিত্রের স্ত্রী হয়েও তার মা একটু সেকেলে ধরণের ছিলেন। বিশেষতঃ অজয় যে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এ কথাটা তিনি যেন ধারণার মধ্যে আনতে পারতেন না।

কিন্তু অজয়ের প্ল্যানটা ভেস্তে গেল অন্য কারণে। সেদিন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তার মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অজয় যাই তার মোটর ভ্রমণের কথা বলেছে, অমি তার মাস্‌তুতো বোন কমলা গালে হাত দিয়ে বলে উঠলো "ওমা, সে কি ছোড়দা? তুমি যে আমাদের সঙ্গে "মন্দার হিল্‌স্‌" যাবে!" তারপর একপালা ঝগড়া, চেঁচামেচি সুরু হোলো। কিন্তু যখন কমলার নাকের ডগাটা লাল হয়ে উঠলো, চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগলো, ঠোঁট ফুলিয়ে সে বল্লে, "বেশ গো বেশ। তোমায় যেতে হবে না।" তখন অজয় বেচারা বেজায় অসহায় বোধ করতে লাগলো। তার নিজের ভাই বোন নেই, তাই কমলাকে সে অত্যন্ত ভালবাসে। পরাজয় স্বীকার করে সে কথার মোড় ফেরাবার জন্যে বল্লে "তা, এত জায়গা থাকতে "মন্দার হিল্‌স্‌" কেন? না হয় মামার কাছে পাটনাতেই চল্‌ না?" মেঘ কেটে গিয়ে রোদ দেখা দিলে। ফিক করে হেসে কমলা বল্লে, "তা তো যাবোই। তার আগে লতি পোড়ারমুখিকে একটু অবাক করে দিতে হবে যে! ওরা উমেশবাবুদের বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীটাই নিয়েছে, আমি বাবাকে বলেছি মাস খানেকের জন্যে মন্দার হিল্‌স্‌এ উমেশবাবুদের বাড়ীটা নিতে—ওঁরা এবার সেখানে যাবেন না কি-না। লতিকে কিচ্ছু জানাই নি।"

"তা যেন হোলো। কিন্তু লতি পোড়ারমুখিটি কে?"

"ও-মা, তাও জানো না? লতি গো—লতিকা রায়। যে আমাদের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে মেয়েদের মধ্যে ফার্ষ্ট হয়েছিল, আমাদের সঙ্গে ডায়োসেশনে আই, এ পড়ছে। কন্‌সালটিং ইন্‌জিনিয়ার সুরেন রায়ের মেয়ে। আমার ভীষণ বন্ধু।"

"তা বেশ। কিন্তু তাকে যেন আমার পরিচয় দিস্‌ নি। শেষটা "এস্কিমো" বানান করতে বলে' বসবে, কিম্বা হয়তো জিজ্ঞেসা করবে 'ওয়ার-শ' কোথায়। আমি কোনটাই বলতে পারবো না। তার চেয়ে বরং বলিস্‌, 'একটা ভ্যাগাবণ্ড। খায় দায়—আর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।' মিথ্যেও বলা হবে না, আমিও রেহাই পেয়ে যাবো।"

"আচ্ছা বেশ, তাই বলবো।" তার পরের ঘটনাটা আগের পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে।

৩

সেদিন কমলাদের বাড়ীতে কথায় কথায় লতিকা জিজ্ঞেস করলে "তোর ছোড়দা কী করেন, ভাই কম্‌লি?"

অজয়ের শেখানো মত কমলা বল্লে, "কী আবার করবে? খায় দায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।"

"পড়া শুনো?"

"যৎসামান্য।" এটা অবিশ্যি কমলা নিজের বুদ্ধি খরচ করে বল্লে। লতিকা হঠাৎ বলে ফেল্লে "মাকাল ফল বল্‌ তাহলে?"

একটু দুষ্টু হাসি হেসে কমলা বল্লে, "কী জানি ভাই, রূপের বিচার নিজের বোনেদের চেয়ে পরের বোনেরাই ভালো করতে পারে। তোর চোখে ছোড়দাকে যদি রাঙা মনে হয়ে থাকে—তবে তাই।"

বিব্রত হয়ে লতিকা কমলার মুখ চেপে ধরে বল্লে, "চুপ, মুখপুড়ি। তুই যে যা-নয়-তাই বলতে সুরু করলি।"

"নয়? তা আমি কেমন করে জানবো? তুইই-তো এখুনি বল্‌লি মাকাল ফল; মানে, দেখতে সুন্দর।"

তার সঙ্গে পেরে উঠবে না জেনে লতিকা চুপ করে রইল। এমন সময়, "কম্‌লি" বলে ডেকে অজয় ঘরে এসে ঢুকলো। তারপরই "ওঃ, লতিকাদি রয়েছেন।" বলে সসম্ভ্রমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা কমলার দৃষ্টি এড়ালো না। সে খিলখিল করে হেসে উঠলো। আরো বিব্রত হয়ে কমলার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে লতিকা বল্লে, "কী সঙের মতো হাসিস্‌ শুধু শুধু?"

হাসতে হাসতে কমলা বল্লে, "তোর ভাগ্যি ভালো, তুই ছোড়দারও "লতিকাদি" হয়ে গেলি। ছোড়দা কী বলে জানিস? বলে, 'কলেজে পড়া মেয়েতে আর পাঠশালার গুরুমশায়ে কোনো তফাৎ নেই।' তাই ঐ দুটোকেই ও সমীহ করে এড়িয়ে চলে। বলে, "বাপ রে! বলে বসলেই হোলো, 'বানান করো তো 'ম্যানুভার'।' তাহলেই তো গেছি!' ছাখ্ তো, ভাই, লোকে শুধু শুধু ওকে বানান করতেই বা বলবে কেন?"

"তুই বুঝি আর কলেজে পড়া মেয়ে নোস্?"

"সে জন্যে আমার ওপর রাগ কি কম? কথায় কথায় মাকে বলে, "সেইকালেই মাসীমাকে বলেছিলুম, মেয়েকে কলেজে দিয়ো না। এখন বোঝো!'—সে যাক্, আজ বিকেলে কোথায় যাবি বল্। চল্ না, আজকে ঐ পাহাড়টায় ওঠা যাক্?"

"কিন্তু ভাই, বাবার আজকে সর্দ্দির মত হয়েছে, তিনি তো বেরুবেন না। কে নিয়ে যাবে?"

"কেন, ছোড়দা?"

"তিনি 'গুরুমহাশয়দের' নিয়ে যেতে রাজী হবেন কি?" মুখ টিপে হেসে লতিকা বল্লে।

"নাঃ, হবে না! দেখছি হয় কি-না।" বলে কমলা অজয়ের খোঁজে গেল। অজয় তখন টেবিলের কাছে বসে একখানা কাগজে একটা circle এঁকে তাইতে পাশাপাশি দুটো চেরাপটল, তার মাঝখানে লম্বাকরে একটা বাঁশি আর তারই নীচে গোল গোল দুটো বিম্বফল এঁকে, সেই কিম্ভূত-কিমাকার মূর্ত্তিটার নীচে লিখে দিয়েছিল—"কমলি।" চুলের বদলে সে খানিকটা মেঘের মত এঁকে দিয়েছিল। সেইটের পাশে সে গভীর মনোযোগে আর একটা কী আঁকবার উপক্রম করছে, এমন সময় কমলা এসে কাগজটা কেড়ে নিলে। ছবিখানা দেখে একটু হেসে সে পেন্সিলটা তুলে নিয়ে "কমলি" কেটে "লতিকা" লিখে দিলে। তারপর অজয়ের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে, "ঢের চিত্রকলা চর্চ্চা হয়েছে। এখন ওঠো। আমাদের আজ ঐ সামের পাহাড়টায় নিয়ে যাবে।"

"এই সেরেছে!" বলে অজয় লাফিয়ে উঠলো। "ঐ-টী আমার দ্বারা হবে না।" বলে ঘাড় নেড়ে সে তার দৃঢ় অসম্মতি জানালে।

"কেন হবে না, শুনি।"

"তোমাদের চলা তো? 'চল্লেও হয়, না চল্লেও হয়'—গোছ। পাহাড়টায় রাত্রিবাসের কোনরকম ব্যবস্থা আছে বলে তো শুনিনি। তাছাড়া আমার 'মোটর-ট্রিপ'-টা এখনো দেওয়া হয়নি, কাজেই বাঘ বা সাপের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করবার আগ্রহ আমার একটুও নেই।"

"দ্যাখো ছোড়দা, আমায় রাগিও না বলছি। যা বল্লুম মনে থাকে যেন।" বলে কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তবে যাবার সময় সেই অপরূপ ছবিটী নিয়ে যেতে ভুললো না।

৪

ঘণ্টাখানেক পরে গৃহিণী দু'জন আর মেয়েদের নিয়ে অজয় পাহাড়ের দিকে রওনা হোলো। অসুস্থ মিঃ রায়ের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে অজয়ের মেসোমশায় থেকে গেলেন। পাহাড়ের তলায় পৌঁছেই অজয়ের মাসিমা একটা বড়ো পাথরের ওপর আসন গ্রহণ করলেন, এবং ঘোষণা করলেন যে তিনি আর এক পা'ও এগুতে রাজী নন্। মিসেস্ রায়ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। মেয়েরা কিন্তু নাছোড়-বান্দা, কাজেই অজয়, কমলা আর লতিকা আরোহণ সুরু করলে।

পাহাড়টা খুব উঁচু নয়। তারা চূড়ায় পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তবর্ণ সূর্য্য অস্ত একটী পাহাড়ের আড়ালে ডুবে গেল; কিন্তু সারা পশ্চিম আকাশে তখন যেন আগুন ধরে গেছে। সেই রক্তিম আকাশের বুকে কালো পাহাড়ের শ্রেণী যেন কোনো সুনিপুণ শিল্পীর আঁকা অপরূপ ছবিটীর মতো দেখাচ্ছিল। সুদূর বিস্তৃত অসমতল প্রান্তর, মাঝে মাঝে সবুজ ধানের ক্ষেত, তারি মাঝে এক একটী ছোটো ছোটো কুটীর, আর সমস্ত দৃশ্যপটটীর ওপর পড়েছে গোধূলির নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ আলো। অজয়ের মুখ দিয়ে আপনা হতেই বেরিয়ে গেল, "বাঃ!" তরুণী দুটীর মুগ্ধ দৃষ্টিও তখন সেই দিকে নিবদ্ধ।

কিছুক্ষণ বসে শ্রান্তিদূর করে অজয় বল্লে, "কম্লি, একটা গান গা না ভাই।"

কমলা বলে উঠ্লো, "ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো, ছোড়দা। লতি বেশ ভালো গাইতে পারে। আমার গান তো রোজই শুনছো। গা-না ভাই, লতি, একটা গান।" কিন্তু অনেক সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও লতিকা কিছুতেই গাইলে না। তখন অগত্যা কমলাই গাইলে, "দিন-শেষের রাঙা মুকুল জাগলো চিতে।" আসন্ন সন্ধ্যায় সেই করুণ পূরবী সুর তিনজনের মনই কেমন যেন উদাস বিধুর করে তুল্লে।

বাড়ী ফেরবার জন্যে উঠেই কিন্তু তাদের সে উদাস গাম্ভীর্য্য কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। কারণ, দেখা গেল ওঠাটা যত নির্ব্বিঘ্নে হয়েছে, নামাটা ঠিক তত সহজে সম্পন্ন হবে না। পাহাড়টা বেশী উঁচু না হলেও, ভীষণ খাড়াই আর ছোটো ছোটো নুড়ি পাথরে ভর্ত্তি। নামবার সময় কেবলই পা হড়কে যায় আর কমলার তীক্ষ্ণ হাসি ও চীৎকার চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। লতিকা ভারি বিপদে-পড়েছিল। একটা পাথরের উপর সে দাঁড়িয়েছিল; সেখান থেকে নামবার জন্যে যতবার সে পা বাড়ায়, প্রত্যেক বারই পা পিছলে- যায়। অজয় কমলার একটা হাত শক্ত করে ধরে লতিকাকে বল্লে, "এখান থেকে গড়িয়ে পড়ার চেয়ে আমার সাহায্য নেওয়াটা বোধ হয় বেশী বুদ্ধিমানের কাজ।" একটু স্বর নামিয়ে বল্লে, "যদিও বানান ভুল শোধরাবার আমার কোনোই আশা নেই।" এই বলে সে লতিকার দিকে আর একটা হাত বাড়িয়ে দিল। লতিকা কোনো ওজর আপত্তি না করে তার হাতটা ধরে আস্তে আস্তে নামতে সুরু করলে।

নীচে এসে তারা গৃহিণীদের কাছে খুব একচোট বকুনি খেলে দেরীর করার জন্যে। তারপরও ফেরবার পথে যতবারই রাস্তার ধারে সন্দেহজনক "সর সর" শব্দ শোনা গেল, ততবারই অজয়ের মাসীমা তাদের কাণ্ডজ্ঞান-হীনতা স্মরণ করে খেদোক্তি করলেন। অবশেষে তারা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার বেশ একটু পরেই বাড়ী এসে পৌঁছল।

৫

দিন আষ্টেক পরের কথা। অজয়ের পড়াশুনোর খবরটা লতিকা পেয়ে গেছে। সেদিন যখন পিওন চিঠি দিয়ে যায় লতিকা তখন কমলাদের বাড়ীতে বসে ছিল। একটা চিঠির শিরোনামায় হঠাৎ তার চোখ পড়ে গেল "অজয়কুমার মিত্র এস্কোয়ার, এম্, এ।" অজয়ের কোনো বন্ধু তার নবলব্ধ ডিগ্রী-গৌরবে অজয়কে ভূষিত করে মহিমান্বিত করবার প্রয়াস পেয়েছিল। মৃদু হেসে লতিকা বল্লে, "তবে যে তুই বল্লি তোর ছোড়দা লেখাপড়া জানেন না।"

কমলা মুখ বেঁকিয়ে বল্লে, "ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির এম্, এ আবার লেখাপড়া! দাঁড়া বিলেতটা ঘুরে আসুক, তারপর না হয় একটু খাতির করা যাবে।"

"বিলেতে যাবেন বুঝি এইবার? কী পড়বেন?"

"আসচেবার ল' ফাইনেল দিয়ে ব্যারিষ্টার হতে যাবে। ভালো কথা, জানিস্, আমরা পরশু যাচ্ছি?"

"কোথায়?"

"আমি আর ছোড়দা যাবো পাটনায় মামার বাড়ী। মা আর বাবা কলকাতায় যাবেন। বাবার হঠাৎ কী কাজ পড়েছে। তোরা আর কদিন থাকবি?"

"বোধ হয় আরো দিন পনেরো। বাবার তো জায়গাটা বেশ ভালই লেগেছে। তোরা ছিলি বেশ মজা করে কাটান যাচ্ছিল। তোরা চলে গেলে ভারি ফাঁকা ঠেকবে।"

অজয় এসে বল্লে, "কম্লি, কাল সেই পাহাড়ী ঝরণাটার পাশে পিকনিক করা যাক্ চল্।" তারপর লতিকার দিকে ফিরে বল্লে, "যাবেন লতিকাদেবী?"

"বেশ তো। মাকে বলি।" কমলা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। "চল্ আমিও যাই। তুই ঠিক করে বল্তে পার্বি না। আমি রাজী করিয়ে তবে ছাড়বো, দেখিস্।"

পরদিন পিক্‌নিক্ সসমারোহে অথচ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হোলো। সঙ্গে অভিজ্ঞ প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার দল ছিলেন, কাজেই খিচুড়ি পুড়ে যাওয়া বা চাটনি ধরে যাওয়া রূপ অঘটন ঘটতে পায় নি। চাকর, বাবুর্চ্চির হাতে রান্নার ভার ছেড়ে দিয়ে সকলে বেড়াতে বেরুলেন। অজয়, কমলা আর লতিকা বুনো ফুল তুলে আর বেরি সংগ্রহ করে বেড়াতে

লাগলো। কতকগুলো ফুল একত্র করে কমলা একটা তোড়া বাঁধছিল; বাঁধা শেষ হলে সে অজয়কে দেখতে পেলে না। লতিকাকে জিজ্ঞাসা করতে, সে বল্লে, "এইমাত্র তো ছিলেন। মা'দের ওখানে গেছেন, বোধহয়।"

একটু এগিয়ে তারা দেখলে একটা পেয়ারা গাছের তলায় বসে অজয় পরম নির্ব্বিকার ভাবে পেয়ারা চর্ব্বণ করছে। কমলা ছুটে গিয়ে বল্লে, "আমায় দু'টো দাও ভাই, ছোড়দা।" কে যেন কাকে বলছে এম্নিভাবে অজয় চোখ বুজে চিবিয়েই চল্লে। কথায় কাজ হবে না জেনে কমলা সটান্ অজয়ের পকেটে হাত পুরে দিলে। এইবার অজয়ের ধ্যান ভঙ্গ হোলো। "এই, সবগুলো নিস্‌নে।" বলে সে কমলার হাত চেপে ধরে পেয়ারাগুলো বার করে কমলাকে আর লতিকাকে ভাগ করে দিলে। তারপর সকলে হাসি গল্প করতে করতে আগের জায়গায় ফিরে এলো। একটা পরিষ্কার জায়গায় তখন কমলার বাবা মা আর লতিকার বাবা মা বসে গল্প করছিলেন। সামনে একটা গ্রামোফোন বাজছিল। তারাও এসে সেখানে বসে পড়লো।

যে কারণেই হোক আজ আর লতিকা গান গাইতে আপত্তি করলে না। একটী একটী করে তার অনেকগুলো গান হোলো। হাসি, গল্পে, গানে সেই দিনটী ভারি আনন্দে কেটে গেল।

পরদিন। বেলা ১১টার সময় কমলারা রওনা হবে। তাই সকাল বেলাই লতিকা এ বাড়ীতে এসেছে। কমলা তখন স্নান করতে গেছে, অজয়ও কোথায় যেন বেরিয়েছে। কর্ত্তা গৃহিণী মোট-ঘাট বাঁধাতে ব্যস্ত। লতিকা টেবিলের উপরের বই খাতা গুলো নাড়াচাড়া করতে করতে দেখলে খোলা লেটার-প্যাডটায় কবিতার আকারে কী সব যেন লেখা রয়েছে। কৌতুহলী হয়ে সে পড়লে—

"স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে
জাগার বেলা হোলো,—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।
ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো—
বেদনা হবে পরম রমণীয়,
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায় ক্ষণে ক্ষণেক তরে যদি
সজল আঁখি তোলো।"

লতিকার বুক দ্রুততালে স্পন্দিত হতে লাগলো। কাকে উদ্দেশ করে এ কবিতা লেখা? কার লেখা এটা? সে চেয়ারে ব'সে প'ড়ে আবার কবিতাটা পড়তে লাগলো। হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে সে চমকে দাঁড়িয়ে উঠে লেটার প্যাডটা টেবিলের ওপর রেখে দিলে।

অজয় ঘরে ঢুকে লতিকাকে দেখে একটু ম্লান হেসে বল্লে, "এই যে আপনি এসেছেন। আজ যাচ্ছি। আপনাকে অনেক জ্বালাতন করেছি, কিছু মনে করবেন না।"

লতিকা হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে বল্লে, "আপনি কবিতা লিখতে পারেন, তা তো কই জানতাম না।" এই বলে সে লেটার প্যাডটা আবার তুলে নিলে।

সেটার দিকে একবার চেয়েই অজয় বল্লে, "না, ওটা কবিগুরুর লেখা।" তার পর গভীর আগ্রহে লতিকার দিকে চেয়ে বল্লে, "না বলতে পারার বেদনায় আমাদের সারাপ্রাণ যখন টনটন করতে থাকে তখন তিনি তাঁর অপরিমেয় ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য্য দিয়ে আমাদের সহায়তা করেন। আমি যা বলতে চাই তা এর চেয়ে পরিষ্কার করে আমি কিছুতেই বলতে পারতাম না। লতিকা, আমি চলে গেলে আমার কথা তোমার মনে থাকবে?"

লতিকা মাথা নীচু করে ছিল। শুধু বল্লে, "কলকাতা গিয়ে দেখা করবেন।" তার গলাটা একটু কেঁপে উঠলো। এরা চলে গেলে "মন্দার হিল্‌স্" আবার কি ভীষণ ফাঁকা হয়ে যাবে মনে করে তার চোখে জল এলো। "আপনাদের জন্যে তারি মন কেমন করবে।" বলে সে তার ঘন-পক্ষ্ম ঘেরা ডাগর দুটি চোখ মুহূর্ত্তের জন্যে অজয়ের মুখের দিকে তুলে ধরলে। আসন্ন বিদায়ের করুণ বিষাদ তার দৃষ্টিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

ছোটো দুটি কথা। অপরিসীম কোনো সম্ভাবনা ইঙ্গিত এর পেছনে নেই। তবু অজয়ের সারা ২

উদ্বেল হয়ে উঠলো। সে আবেগ ভরা কণ্ঠে বল্লে, "হঁা, আবার দেখা হবে। নিশ্চয়ই দেখা হবে। আমি অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণবো।"

...সেই দিন সন্ধ্যা বেলা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার জানালার কাছে বসে অজয় পশ্চিম দিগন্তের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়েছে। যাত্রীর কোলাহল, ফেরীওয়ালার চীৎকার, মুটেদের অসন্তুষ্ট অনুযোগ—শত সহস্র তুচ্ছ খুঁটিনাটির মধ্যে একটি মূল্যবান মুহূর্ত্ত হারিয়ে গিয়েছিল। অস্তাকাশের ব্যথা-রক্তিম-রাগের মধ্যে অজয় তাকে খুঁজে পেয়েছে। বিদায়ের শেষ-চাউনি তার যাত্রাপথকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে তুলেছে। ভুলে যাওয়া একটা গানের কলি অকারণে তার কানের কাছে গুঞ্জন করতে লাগলো—

"তার বিদায় বেলার মালাখানি আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে পলে পলে রে॥"

তোমার অস্তিত্ব মাঝে

[প্রাচীন আসামীর অনুবাদ]

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

তোমার অস্তিত্ব মাঝে রহস্য-বধির
জ্ঞানের গোপন দ্বার মোর কাছে সখি,
রাখিয়োনা রুদ্ধ করি ; যত হেরি তোমা
তত বেড়ে যাও তুমি লঙ্ঘিয়া উপমা
ভাঙ্গি কল্পনার সীমা ; তোমার মদির
অাঁখির আলোকপাতে সহসা ঝলকি
ওঠে দু'একটি গান, দু'একটি ব্যথা,
তবু থেকে যায় বাকি লক্ষ লক্ষ কথা॥

জনমে জনমে সখি নব নব বেশে
মরিয়াছি অস্ত খুঁজে তব অস্তিত্বের।
ললিতা ধানশ্রী যেথা ব্রহ্মপুত্রে মেশে
এবার সেথায় তোমা লভিলাম ফের।
আধখানি ইন্দ্রধনু নীলিমার দেশে
আর অর্দ্ধ, দেখ সখি, ছায়াতে জলের॥

একদিন দিয়েছিনু

[প্রাচীন আসামীর অনুবাদ]

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

একদিন দিয়েছিনু বিদায়ের ক্ষণে
করবীর গুচ্ছ এক ; তুমি তারে সখি,
কি জানি কি ভেবে মনে কবরীর সনে
গেঁথেছিলে, কালো চুলে উঠিল ঝলকি
বাসনা-বিদ্যুৎলতা ; তারপরে কবে—
সন্ধ্যার কেশের মাঝে ফুল সূর্য্যমুখী
যেমন ঝরিয়া যায়—তেমনি নীরবে
ঝরে গেছে পুষ্প মোর—সব গেছে চুকি॥

সেই হ'তে পুষ্পদল রক্ত করবীর
লভিয়াছে গুণ সখি, স্পর্শমাণিকের।
যেখানেতে ছোঁয় সেথা ওঠে ঝলকিয়া
বেদনা-কনক-বহ্নি। বুভুক্ষু স্মৃতির
অসংখ্য নাগিনী দল ভেদি পাতালের
বাসনার তপ্ত গুহা ওঠে চমকিয়া॥

মুক্ত-ছন্দ * (Vers Libre)

শ্রীঅনিলবরণ রায়

পদ্য ছন্দের এই নূতন ও বন্ধনমুক্ত রূপের বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হইতেছে ইংরাজ ও আমেরিকান কবি কার্পেন্টার এবং হুইট্‌ম্যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকবিতার যে-সকল ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, সেইগুলিও এই রীতিকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে সেইগুলি মূলতঃ প্রাসঙ্গিক নহে। কারণ, এই অনুবাদগুলি সুন্দর ছন্দান্বিত গদ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর এই ধরণের রচনা, ছন্দান্বিত গদ্য-কবিতা খুব প্রচলিত হইলেও, ইহা ছন্দে কবিতা রচনা করিবার সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না, বা করিবার চেষ্টাও করে না। ইহা এক প্রকার বিলাস (indulgence), একটা সামান্য রকমের ব্যতিক্রম ও বৈচিত্র্য; ইহারও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে এবং ইহার দ্বারা এমন কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, যাহা অন্য ভাবে যথাযথ সম্পাদিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহার সম্পাদনে বোধ হয় এইটিই একমাত্র পন্থা—কবিতার কবিত্বময় গদ্যানুবাদ, যাহাতে মূলের সঠিক ভাব ও অধ্যাত্ম লক্ষ্যটি বজায় থাকে। কারণ অন্য এক ভাষার বাঁধাধরা ছন্দে অনুবাদ করিতে যাইলে মূল ধারাটির জন্য কেবল যে এক নূতন অবয়ব তৈয়ারী করা হয় তাহাই নহে, পরন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তনে ভিতরের আত্মাটিও প্রায় বিভিন্ন হইয়া পড়ে, কাব্যের ছন্দ এমনই শক্তিশালী, এমনই বিশিষ্ট ও সৃজনশীল জিনিষ। কিন্তু কবিত্বময় গদ্যের বন্ধন অনেকটা শিথিল, তাহার দাবী পূরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহা মূল ভাবটিকে ধরিয়া এইরূপ সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয় না; এমন কি একটা সুদূর, ক্ষীণ ছায়া, প্রতিধ্বনি আভাসও দিতে পারে, যদি তাহার পিছনে অনুরূপ ভাব-প্রেরণা থাকে। ইহাতে কখনও সেই একই শক্তি থাকিতে পারে না, তবে অনুরূপ ব্যঞ্জনার কতকটা প্রতিধ্বনি থাকিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন ইংরাজীতে লিখিলেন,

That I should make much of myself and turn it on all sides, thus casting coloured shadows on thy radiance—such is thy *maya*.

Thou settest a barrier in thine own being and then callest thy severed self in myriad notes. This thy self-separation has taken body in me.

The great pageant of thee and me has overspread the sky. With the tune of thee and me all the air is vibrant, and all ages pass with the hiding and seeking of thee and me

আমি আমায় করব বড়, এইত আমার মায়া ;
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে, ফেলব রঙিন ছায়া।
তুমি তোমায় রাখবে দূরে, ডাকবে তারে নানা সুরে
আপনারি বিরহ তোমার আমায় নিল কায়া॥
বিরহ গান উঠলো বেজে বিশ্বগগনময়।
কত রঙের কান্নাহাসি কতই আশা ভয়।
কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে, কত স্বপন ভাঙ্গে গড়ে,
আমার মাঝে রচিলে যে আপন পরাজয়॥
আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরণে, বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
তোমার আমার যাওয়া আসায় কাটে সকল বেলা॥

আমরা পাইলাম এক অতি সুন্দর সুললিত কবিত্বময় গদ্য, কিন্তু তাহার অধিক আর কিছুই নহে। মুক্ত ছন্দের

* শ্রীঅরবিন্দের Future Poetry হইতে সঙ্কলিত

(vers libre) কয়েকজন ফরাসী লেখক যাহা, এবং হুইটম্যান ও কার্পেণ্টার যাহা নহেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাই,—তিনি একজন সুকুমার ও সূক্ষ্ম শিল্পী, এবং তিনি তাঁহার কার্য্য অনবদ্য কমনীয়তা এবং আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতাব সহিতই সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু যে কাজটি হাতে লওয়া হইয়াছে তাহার বেশী আর কিছু কবিবার প্রয়াস এখানে নাই, পদ্যের যে পুরাতন রীতিতে তিনি স্বীয় ভাষায় এমন সব আশ্চর্য্যময় জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার স্থলে কাব্যরচনার কোন নূতন নীতি প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্য নাই। যদি এরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। এই ইংরাজী গদ্যটী যদিও সুন্দর, ইহার সহিত মূল কবিতাটি তুলনা কবিলেই বুঝা যায় যে, এই পরিবর্ত্তনের ফলে কতখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কৃতিত্বের সহিত একটা পবিবর্ত্তিত জিনিষ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজী পাঠক তৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কবির নিজ স্বভাবসিদ্ধ সুরের ইন্দ্রজাল একবার আস্বাদন করিয়াছে তাহার শ্রবণ মন ইহাতে কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। আর ইহা এইরূপই, যদিও বুদ্ধিগম্য সারার্থটি, সঠিক ও সুনির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারাটি অনুবাদে অনেক সময় আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, কারণ মূলে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়বস্তুটিকে চিন্তার সীমানাগুলিকে পুনঃ পুনঃ অতিক্রম করিয়া চলা হয়, সুর মাধুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে যে ব্যঞ্জনার তরঙ্গ উদ্ভূত হয় তাহাব মধ্যে কখনও সে সব একেবারে ডুবিয়া যায়; যাহা বলা হইল, তাহা অপেক্ষা এত বেশী শুনা যায় যে অন্তরাত্মা শুনিতে শুনিতে সেই অনন্ততার মধ্যে ভাসিয়া যায় এবং বুদ্ধির সুস্পষ্ট অবদানটুকুর মূল্য অতি অল্প বলিয়াই গণনা করে। ঠিক এইখানেই কাব্যছন্দের মহত্তম শক্তি, ইহারই দ্বারা নবযুগেব শ্রেষ্ঠতম কার্য্য সম্পাদিত হইতে পাবিবে, এবং কাব্যের প্রাচীন রূপকে একেবারে ভাঙ্গিয়া না দিয়া কাব্য-রীতির নূতন নূতন প্রয়োগের দ্বারাই যে ইহা সম্ভব হইবে, রবীন্দ্রনাথের মাতৃ-ভাষায় রচিত গীতি-কবিতাগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

নব জাগরণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজি বাজ্‌ল বংশী প্রাণকুঞ্জে—
ধ্বনি' ধূসর দিগন্তব মন্থব অন্তর
সেই আলো বসন্তে মুঞ্জে!
ব্রত ধর্ম্মে—
শত কর্ম্মে—
এ কী রাঙ্‌ল শ্রান্তিহর লগ্ন!
এ কী জাগ্‌ল তরঙ্গিত স্বপ্ন:
যেন শ্রবণ শুন্‌ল তার চন্দ্রমা-ঝঙ্কার
নয়ন দেখ্‌ল রবিরশ্মি!
সেই রূপালি সোনালি করপুঞ্জে
কোটি অমৃতভৃঙ্গ বুকে গুঞ্জে:
ধ্বনি' ধূসর দিগন্তর মন্থর অন্তর
সেই আলো বসন্তে মুঞ্জে।

এ কী দীপ্‌ল বংশী প্রেমছন্দ!
যত পুঞ্জ বিষণ্ণতা ছুট্‌ল,—শুভ্রব্রতা
দুরাশা টুটল অমাবন্ধ।
বাধা ঘুচায়ে—
লোর মুছায়ে—
এ কী তুল্‌ল অগুণ্ঠা প্রদীপ্তি!
তাহে ঘুচ্‌লো যে তৃষ্ণা-অতৃপ্তি:
যেন ঝরালো অভয়ঝারি পলকে মলয়বারি
ফুলে প্রতিদান দিল পৃথ্বী।
পেয়ে সে নব-মিলন-মধু-গন্ধ
হ'ল মলিন মরন্ত—জীবন্ত:
যত পুঞ্জ বিষণ্ণতা ছুট্‌ল,—শুভ্রব্রতা
দুরাশা টুটল অমাবন্ধ।

বর্ষারাত্রি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

অন্ধকার গ্রামপথ, বরিষে আষাঢ়
সুষুপ্ত গহন রাত্রি, স্তব্ধ চারিধার।
একাকী নির্জ্জন গৃহে শুনিতেছি বসি'
অশ্রান্ত বর্ষণ-গান, বায়ু যায় শ্বসি'।
গম্ভীর গরজে মেঘ, চমকে বিজলী,
হেন রাত্রে আঁখি কার উঠে ছলছলি' ?

কে যেন চলিছে বনে, বাজিছে মঞ্জীর,
তিমিরে কাঁপিছে তার হৃদয় অধীর ;
বারিধারা সিক্ত তার সুনীল বসন
সম্বরি' চলিছে ধীরে চাপিয়া চরণ ,
চলিয়াছে অন্তহীন যুগ যুগ ধরি'
কণ্টকিত কাননের পথ অনুসরি'।

গাগরীর বারি ঢালি' করিয়া পিছল
কণ্টক গাড়িয়া পথে, সামালি' আঁচল,
বরষার অভিসার শিখিয়া গোপনে
কে চলিত পাগলিনী প্রেমের স্বপনে ?
তিমির-কাননে তারি কম্পিত চরণ
বুঝিবা মিলায় ধীরে ছায়ার মতন।

তারি সাথে আজি মোর বিরহী পরাণ
নীরব বরষা রাত্রে করিছে প্রয়াণ।
ভাসিতেছে কানে কোন্ স্বপ্নময় সুর
চিরন্তন বেদনার—আকুল, মধুর।
অন্ধকার টানিয়াছে গাঢ় অন্তরাল,
আমারে ঘিরিয়া আছে অন্তহীন কাল।

কোন্ সে মন্দির চির-নিরুদ্ধ-দুয়ার ?
চিরন্তনী বিরহিনী করে অভিসার ?
ভুজগে পূরিত পথ,—সংসার সুদূরে,—
আমি আজি চলিয়াছি সেই কল্পপুরে।
স্বপ্নাকুল দুই নেত্র, হৃদয় অধীর
রণিয়া রণিয়া ওঠে সুদূর মঞ্জীর।

চিত্রে ভাব-সৌন্দর্য্য

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

শবরী

কবি ও শিল্পী উভয়েই ভাবরাজ্যের অধিবাসী। কবি যেমন ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়া ভাবের প্রকাশ করেন, শিল্পীও তেমনি রেখা ও বর্ণসম্পাতে ভাবসৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ভাবহীন কবিতা যেমন নিরস এবং পাঠের অযোগ্য মনে হয়, ভাবসৌন্দর্য্যবিহীন চিত্রও তেমনি চিত্রানুরাগীর নিকট সমাদরের যোগ্য বিবেচিত হয় না। ভাবই চিত্রের প্রাণ। ভাবহীন চিত্র শিল্পীর অক্ষমতাই প্রকাশ করে।

চিত্রের অঙ্কন পদ্ধতি বা বর্ণবিন্যাস যথাযথ হইয়াছে কি না, তাহা কেবল চিত্রশিল্পী বা অভিজ্ঞ শিল্প-সমালোচকেরাই বলিতে পারেন; আমাদের মত সাধারণ শিল্পানুরাগী দর্শকের সে বিষয়ে কোন কথা বলার অধিকার নাই। কিন্তু কোন চিত্রের ভাবসৌন্দর্য্য দর্শনে আনন্দলাভ করিলে, সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলিলে বোধ হয় কাহারও পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কিউরেটর, শিল্পী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের অঙ্কিত যে কয়েকখানি চিত্র আমাদের আনন্দ দান করিয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাদের সামান্য পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

শিল্পীর অধিকাংশ চিত্রই রূপক। তিনি রূপকের মধ্য দিয়াই নিজের কৃতিত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন। "শবরী" চিত্রে যৌবন-পরিপুষ্টা তরুণী ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মানা, নয়নে তীব্র দৃষ্টি। চিরকুমারকে লক্ষ্য করিয়া তরুণী যেন বলিতেছেন—যৌবন-ধনু ও রূপ-শর দিয়া তোমায় বশ করিব। যদি তাহাতে অপারগ হই, আমার তূণে যে পঞ্চশর রহিয়াছে, সেগুলি একে একে নিক্ষেপ করিলে তোমাকে জয় করা কিছুতেই অসম্ভব হইবে না। নারী যে জগতের নরচিত্ত জয় করিয়া আসিতেছে, চিরকাল জয়

"নতভ্রূ" চিত্রে, স্নানান্তে কলসী ভরিয়া জল আনিবার সময় তরুণী নারী পথমাঝে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ কানের দুলটী খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ায়, তাহা কুড়াইতে গিয়া গায়ের আবরণ ও কলসীর জল উভয়ই স্থানচ্যুত হইয়া যাইতেছে। তরুণীর অসহায় বিব্রত ভাবটী অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

"পল্লীশ্রী" প্রকৃতই পল্লীশ্রী। "প্রকৃতি" চিত্রের ভাবও সুন্দর।

নতভ্রূ

নিশীথ রাত্রি

করিবে এবং নিজ শক্তি সম্বন্ধে তাহার আত্মপ্রত্যয় সর্ব্বদা জাগরূক, শিল্পী ইঙ্গিতে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

মাতা ধরিত্রী ভূগোলক রচনা একরূপ শেষ করিয়া, সর্ব্বশেষ তুলিকা পরিচালনার সময় যেন চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িয়াছেন। "বসুমতী" চিত্রে এই ভাবই প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রসাধন যেন কিছুতেই মনঃপূত হইতেছে না। এত করিয়াও হয়ত পৃথিবীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিলাম না—এই ভাবনা।

"বেসুরা" নৈরাশ্যের প্রতিমূর্ত্তি। পর্দ্দার অন্তরাল হইতে তরুণী নিজ প্রণয়ীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সসঙ্কোচে বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু নয়ন মন যাহাকে চায় তাহাকে পাইতেছে না। নিরাশা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

"নিশীথ রাত্রি" চিত্রখানি ভাবসৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। নিশীথ রাত্রের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাকিরণে পৃথিবীর নগ্ন সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্ধকারের আবরণে পৃথিবীর যে সৌন্দর্য্য এতক্ষণ লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, তাহা যেন সুন্দরী তরুণীরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত। এই রূপ অতি স্নিগ্ধ ও পবিত্র। ইহাতে রৌদ্র কিরণদীপ্তির তীব্রতা নাই। ইহা অন্তরে কোন কামনার উদ্রেক করে না, স্নিগ্ধতাই প্রদান করিয়া থাকে।

কয়েকখানি প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রও চিত্রানুরাগীর আনন্দদায়ক। "সাগরিকা" চিত্রে অনন্ত সমুদ্রের কূলে মাতা শিশুসন্তানসহ ঝিনুক সংগ্রহ করিতেছেন। অনন্তের কাছে আমরা সকলেই শিশু—অতি ক্ষুদ্র। সেখানে মাতা ও শিশুর ব্যবধান কিছুই নাই।

"কাঞ্চনজঙ্ঘা" তুষারমণ্ডিত হিমালয় শিখরের চিরসুন্দর অতুলনীয় দৃশ্য।

"কর্ণফুলী"—নদীর বাঁকের মুখের কতকাংশের দৃশ্য। নদীবক্ষে কয়েকখানি 'সামপান' নৌকা ও দুই তীরের মনোরম দৃশ্যে চট্টলভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

শিল্পীর তুলিকা সেখানেই সার্থক, যেখানে চিত্রানুরাগী তাহার জয়গান করে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

একলব্য

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

পরাজয় নহে গুরু, এ আমার জয়,—
বরেণ্য বিজয়—দীপ্ত-রক্তরাগময়!
মুখে হাসি, তবু—তবু অশ্রুবাষ্প চোখে?
উদ্ভাসিত দিবা মোর ত্যাগের আলোকে;—
জয়ের আনন্দ মোর আজি যে অসহ!
হে গুরু, দক্ষিণ করে দক্ষিণা এ লহ।

শিষ্যশ্রেষ্ঠ অভিজাত অর্জ্জুন তোমার,
কেন তার অধোমুখ?—বিন্দুও আমার
নাহি ক্ষোভ, অনুযোগ। আমি শুধু ভাবি,
অখ্যাত, অজ্ঞাত—তার নিভৃত সাধনা
গৌরবী গর্ব্বীরে দিল কিসের বেদনা?
গুণ—তারো 'পরে হায় বর্ণ রাখে দাবী?

সে তোমার প্রিয়—তুমি দিলে তারে প্রেয়;
আমি দীন,—দয়া তব—লভিয়াছি শ্রেয়॥

নব্য জড়বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক এরিষ্টটল্ (Aristotle) প্রণীত Deductive Logic বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করিলেও বেকন্ (Bacon) প্রবর্ত্তিত Inductive method হইতেই প্রধানতঃ আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। নিউটন্ (Newton) গ্যালিলিও (Galileo) প্রভৃতি মনীষিগণের অক্লান্ত বারি-সেচনে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া এক্ষণে মহামহীরূহে পরিণত হইয়াছে। নিউটন্ জড়জগৎকে যে দিক্ হইতে দেখিয়াছিলেন তাঁহার অসামান্য প্রতিভাচ্ছটায় উদ্ভাসিত পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে নব্য বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বপন্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য একদিক্ হইতে বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কিয়দংশ পূর্ব্ব হইতে পরিজ্ঞাত থাকিলেও স্থূলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ফরাসী পণ্ডিত লাবুসিয়ার (Lavoisier) কর্ত্তৃক নব্য রসায়ন-বিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের মতে জগতে লক্ষাধিক বিভিন্ন প্রকার পদার্থের সমাবেশ দৃষ্ট হইলেও কিঞ্চিন্যূন একশত মূল পদার্থের (elements) সংযোগে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রাচীন গ্রীস্ দেশীয় পণ্ডিত ডিমক্রিটস্ (Democritus) লেউসিপাস (Leucippus) এবং লিউক্রেটিয়াস (Lucretius) এর পরমাণুবাদ অনুসরণ করিয়া সকল ভূত পদার্থ (elements) অতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণাসমষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—এই মতের পোষকতায় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ড্যালটন (Dalton) তাঁহার নব পরমাণুবাদ প্রবর্ত্তিত করেন। অস্মদ্দেশে মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক-দর্শনেও ঐ মতের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। দার্শনিকপ্রবর হারবার্ট স্পেনসর (Herbert Spencer) এবং যতিশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য উভয়েই প্রায় এক প্রকার যুক্তির দ্বারা পরমাণুবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরমাণু যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহার দক্ষিণ ও বাম দিক্ আছে; অতএব তাহাকে কোন প্রকারে বিভক্ত করিতে পারা যায় না—ইহা কল্পনাবিরুদ্ধ। যাহা হউক উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ড্যালটনের পরমাণুবাদ বিজ্ঞান-জগতে আদৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ তিনটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত জাগতিক প্রক্রিয়ার রহস্য উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। প্রথম—জড়ের আকারগত নানা প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইলেও তাহার বস্তু-পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না (conservation of mass)। দ্বিতীয়—শক্তি (energy) উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও তন্মধ্যে একের কিয়দংশের বিনিময়ে অন্যের নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং সমগ্র শক্তির পরিমাণের ইতরবিশেষ হয় না (conservation of energy)। তৃতীয়—কার্য্যকারণবাদ (causation) নির্দ্দিষ্ট কারণ উপস্থিত হইলে তদনুরূপ কার্য্য অবশ্যই সাধিত হইবে। প্রকৃতি সুগঠিত রাজ্যতন্ত্রের ন্যায় আপনার নিয়মজালে আপনি বদ্ধা। তাহার পক্ষপাতিত্ব দোষ, স্বৈরাচার ব কোনরূপ খামখেয়ালী ভাব নাই।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ক্রুক্স্ (Crookes) নামে এক বিশি বৈজ্ঞানিক কাচের নলের ভিতর হইতে বায়ু নিষ্কাষণ করি তন্মধ্যে তড়িৎ সঞ্চালিত করিয়া এক প্রকার অতি বেে ধাবমান উজ্জ্বল সূক্ষ্ম কণাশ্রেণী আবিষ্কার করেন। এ কণাগুলির গুণ কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের গুণে বিসদৃশ বলিয়া তিনি ইহাদিগকে জড়ের "চতুর্থ বিকৃতি

(fourth state of matter) এই আখ্যা দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ নানা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে ইহা স্থূল জড়পদার্থ নহে, কেবল ইলেক্ট্রন (electron) নামে এক প্রকার তড়িৎকণা। এই ইলেক্ট্রনের আকার ও গুণাবলী অনেক পরিমাণে নির্ণীত হইয়াছে। ইহাদিগকে এতাবৎ কেহ ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ বা বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই। পরবর্ত্তী কালে প্রোটন (proton) নামে আর এক প্রকার বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তড়িৎকণা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইলেক্ট্রন অপেক্ষা প্রোটনের গুরুত্ব প্রায় ১৮৫০ গুণ অধিক।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এম্, বেকারেল (M. Becquerel) ইউরেনিয়ম নাইট্রেট্ (uranium nitrate) নামক পদার্থ-বিশেষ হইতে উদ্ভূত এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মি দ্বারা অন্ধকার গৃহেও ফটোগ্রাফ ছবি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে রদারফোর্ড (Rotherford) ও অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক এইরূপ গুণবিশিষ্ট আরও কয়েকটি পদার্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মাদাম কারি (Mme. Curie) নাম্নী এক ফরাসী বিদুষী পিচ্‌ব্লেণ্ড (Pitch Blende) নামক এক প্রকার খনিজ পদার্থ হইতে বহু আয়াসসাধ্য পরীক্ষা দ্বারা রেডিয়াম (Radium) নামক এক প্রকার ধাতু প্রাপ্ত হন; তাহা হইতে ঐরূপ রশ্মি বহুল পরিমাণে উদ্ভূত হয়। এই প্রকার পদার্থকে রেডিও-একটিভ্ (Radio-active) পদার্থ বলে। রেডিয়াম্ জাতীয় পদার্থ হইতে ক্রমাগত উত্তাপ ও তিন প্রকার রশ্মি বিকীরিত হয়; তন্মধ্যে দুই প্রকার রশ্মি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী তড়িৎকণা হইতে উদ্ভূত এবং চুম্বকসান্নিধ্যে বিপরীত দিকে বক্রভাবাপন্ন হয়, কিন্তু তৃতীয় রশ্মির কোন পরিবর্ত্তন হয় না এবং তাহা রন্‌জেন্‌রশ্মির ন্যায় কাষ্ঠাদির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে রেডিয়াম্ হইতে অবিশ্রান্তভাবে ভূরি ভূরি ইলেক্ট্রন উদ্গত হইতেছে। এই রেডিয়াম বর্ত্তমানকালে ক্যান্সার (cancer) রোগচিকিৎসায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে রেডিয়াম ধাতুতে এত অধিক পরিমাণ শক্তির সমাবেশ কি প্রকারে সম্ভব হয়? শক্তির অক্ষুণ্ণতা (conservation of energy)র নীতি হইতে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিলেন যে রেডিয়াম-এর পরমাণুগুলির মধ্যে ইলেক্ট্রনগুলি অবস্থিত ছিল এবং পরমাণুগুলি স্বতঃই ভগ্ন হওয়াতে তন্মধ্য হইতে ইলেক্ট্রন্ বিকীরিত হইতেছে। এইরূপে নানা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে পরমাণুগুলি অবিভাজ্য নহে। প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রভূত শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; পরমাণুগুলি ভগ্ন হইলে সেই শক্তির বিকাশ হয়। দশ মণ অঙ্গার দগ্ধ করিলে যত শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় এক গ্রেণের শতাংশ পরিমাণ হাইড্রোজেন বায়ুর পরমাণুগুলি চূর্ণ হইলে ততোধিক শক্তির উদ্ভব হয়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে জগতে প্রতিদিন অগ্নি-উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণে খনিজ অঙ্গার ব্যবহৃত হইতেছে, সেইরূপ ব্যবহৃত হইলে সহস্র বৎসর পরে ভূগর্ভে আর অঙ্গার প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ হইবে, এবং অঙ্গারই সমস্ত সভ্যতার মূল বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে কয়েক শতাব্দী পরে বর্ত্তমান সভ্যতার গতি প্রতিরুদ্ধ হইবে, পরমাণুর অন্তর্নিহিত প্রভূত শক্তির আবিষ্কার হেতু তাঁহারা বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হইবেন। এবং "সমস্ত জাগতিক শক্তি ক্রমশঃ উত্তাপে পরিণত হইয়া অকার্য্যকরী হইতেছে এবং কোটী কোটী বৎসর পরে জগতের প্রলয় সম্ভবপর"—লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) অশীতি বৎসর পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া বিজ্ঞান-জগতে যে চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় কথঞ্চিৎ উপশমিত হইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রত্যেক পরমাণু ইলেক্ট্রন ও প্রোটন দ্বারা নির্ম্মিত। সৌরজগতে সূর্য্যের ন্যায় প্রোটন একাকী অথবা ইলেক্ট্রন ও অন্যান্য প্রোটনের সমভিব্যাহারে পরমাণুর কেন্দ্র স্থলে উপবিষ্ট এবং ইলেক্ট্রনগুলি গ্রহাদির ন্যায় তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুর্ণায়মান। মূল পদার্থের (element) পরমাণুর গুরুত্ব ও গুণাবলী ঘুর্ণায়মান ইলেক্ট্রনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। এইরূপে সর্ব্বাপেক্ষা লঘু হাইড্রোজেন (Hydrogen) পরমাণুতে একটি প্রোটনের চতুর্দ্দিকে একটি মাত্র ইলেক্ট্রন ঘুরিতেছে এবং গরিষ্ঠ ইউরেনিয়ম ধাতু পরমাণুতে অনেক সংখ্যক ইলেকট্রন ঘুর্ণায়মান। বিশেষ বিশেষ কারণে

এক পরমাণুর দুই একটি ইলেকট্রন স্ব স্ব কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পরমাণুর প্রোটনের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করে। সুতরাং পরমাণুদ্বয়ের গুণাবলীর তারতম্য লক্ষিত হয়। প্রকৃষ্ট উত্তাপ ও অন্যান্য কারণে ইলেকট্রনগুলির নৃত্যভঙ্গীও বৃত্তাকার হইতে বৃত্তাভাসাকারে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রোটনগুলি কেবল-মাত্র সম্রাটের ন্যায় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সানন্দে ইলেকট্রনদিগের উদ্দাম নৃত্য দর্শন করে। এই নৃত্যের অবসান হইলে পরমাণুর অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। সুতরাং ড্যালটনের পরমাণুবাদ কিয়ৎ পরিমাণে ভিত্তিহীন হইল। জগতে কেবল মাত্র ইলেকট্রন ও প্রোটন রাজত্ব করিতেছে। তাহারা ক্রীড়াচ্ছলে পরমাণু গঠন করিতেছে ও ভগ্ন করিতেছে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে রেডিয়াম হইতে বিকীরিত রশ্মি হইতে হেলিয়ম (Helium) নামক এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ ও সীসক (Lead) উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং স্পর্শমণির (Philosopher's stone) সাহায্যে তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করা আর কবি-কল্পনা বা রূপকথা মাত্র নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অধ্যাপক জে, জে, টমসন্ (J. J. Thomson) গণিতসম্বন্ধীয় গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে তড়িৎ-সংযুক্ত বস্তু (electrified body) গতিশীল হইলে তাহার বস্তু পরিমাণ (mass) বর্দ্ধিত হয়, এবং তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ এই মতবাদের অনুকূলে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি একটি মাত্র তড়িৎকণার (ইলেকট্রনের) বেগ বর্দ্ধিত হইলে তাহারও বস্তুপরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। যদি কোন ইলেকট্রনের বেগ আলোকের গতির সহিত সমান হয় অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০০ মাইল হয় তাহা হইলে তাহার জড় পরিমাণ অসীম (infinite) হইবে এবং তাহা একই সময়ে পৃথিবী ও সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী নক্ষত্র স্পর্শ করিবে। এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে ইলেকট্রনের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১০০০০০ মাইল পর্য্যন্ত হইতে পারে। এবং যেহেতু প্রত্যেক জড়পদার্থ ইলেকট্রন দ্বারা নির্ম্মিত, অতএব প্রত্যেক জড়পদার্থ গতিশীল হইলে তাহারও বস্তু-পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে এবং প্রতি সেকেণ্ডে তাহার বেগ ১৮৬০০০০ মাইল হইলে তাহারও বস্তুপরিমাণ অসীম হইবে। অতএব কোন জড় পদার্থের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০০ মাইলের অধিক হইতে পারে না। ইহাই জড়ের বেগের শেষ সীমা। সুতরাং প্রত্যেক পরমাণুর দুই প্রকার বস্তু-পরিমাণ আছে—স্থিতিজ বা গতিজ। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি পরিবর্ত্তনশীল। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত—যে জড়ের বস্তুপরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না (mass of a body remains constant)—তাহা এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। আধুনিক মতে জড়ের বস্তুপরিমাণ তাহার গতিসাপেক্ষ (mass of a body is a function of its velocity)।

বৈজ্ঞানিকগণের মতে উত্তাপ নামে কোন বস্তুবিশেষ নাই। কোন জড় পদার্থের পরমাণুগুলি কম্পান্বিত হইলে তাহাতে উত্তাপ বোধ হয়। এবং কম্পনের পরিমাণের তারতম্যে তাহার উত্তপ্তভাবেরও (temperature) হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় পদার্থের পরমাণুগুলি একেবারে নিশ্চল হইলে তাহার যে শৈত্যভাব উৎপন্ন হইবে তদপেক্ষা অধিকতর শৈত্যভাব (low temperature) আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সেন্টিগ্রেড্ তাপমান যন্ত্রের (thermometer) তুষারবিন্দু (freezing point) হইতে ২৭৩ ডিগ্রি নিম্নে এইরূপ অবস্থার উৎপন্ন হয়। অতএব কোন পদার্থের শীতলতা উক্ত শৈত্যভাব অপেক্ষা নিম্নতর হইতে পারে না। এইরূপে বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গতিশীলতাই জীবনের পরিচায়ক।

এ স্থলে পূর্ব্ব পক্ষ হয়ত আপত্তি করিতে পারেন যে পরিশ্রমকাতর, সদাবিশ্রামশীল ধনীগণের উদরের বহির্ভাগের পরিধি ও আয়তন গতিবিহীন হইয়াও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। তদুত্তরে বৈজ্ঞানিক বলিবেন যে ধনী ব্যক্তিগণ কিঞ্চিন্মাত্র গতিশীল হইলে তাঁহাদের উদরের অনাবশ্যকীয় মাংস ও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেহকে শক্তিশালী করিত।

বৈজ্ঞানিকগণ ইথর (Ether) নামে একপ্রকার সর্ব্বব্যাপী রূপরসাদি-গুণবিহীন অতীন্দ্রিয় পদার্থের কল্পনা করেন।

জড়ের অণু-পরমাণুমধ্যেও এই ইথর বর্ত্তমান থাকিলেও জড়ের গুণ ইহাতে লক্ষিত হয় না। অনেকগুলি ইথরের সুরম্য মূর্ত্তি যথাবিহিত পূজান্তে যথাক্রমে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। এক্ষণে কেবলমাত্র আলোকবাহী ইথর (luminiferous ether) বিজ্ঞান-মন্দিরে পূজিত হইতেছে। এই ইথরগুলি লৌহ অপেক্ষা অধিকতর স্থিতিস্থাপক (elastic) ও কঠোর এবং বায়ু অপেক্ষাও তরল ও মৃদু (subtle),—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি"। সুতরাং ইথরের প্রকৃত স্বরূপ সাধারণ মানবের অগোচর হইলেও সাধনতৎপর বৈজ্ঞানিক যোগিগণের ধ্যাননেত্রে দৃষ্ট হয়। ইহার একমাত্র গুণ কম্পনশীলতা। ইহার কোন অংশ আন্দোলিত হইলে সেই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। লর্ড সল্‌স্‌বারী (Lord Salisbury) তাঁহার এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে ইথর কিরূপ তাহা হইলে আমি বলিব যে ইহা আন্দোলন-ক্রিয়ার কর্ত্তা (nominative case to the verb "to undulate"। ইথরের এই আন্দোলন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া জড়মধ্যস্থ ইথর-কণাগুলিকে স্পন্দিত করিলে তাহা হইতে আলোক উৎপন্ন হয়। এইরূপে আলোক স্বয়ং অদৃশ্য হইয়াও অন্যকে আলোকিত করিতে পারে। এই জড়মধ্যস্থ ইথর-কণাগুলির স্পন্দন সংকীর্ত্তনে নৃত্যের ন্যায় সংক্রামক, এবং তজ্জন্য জড়কণাগুলিও স্পন্দিত হইলে তাহা হইতে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এইরূপে ইথর-কণাগুলির স্পন্দনের তারতম্যে উত্তাপ ও আলোকের উদ্ভব হয় এবং তাহার আতিশয্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যে সমস্ত অদৃশ্য রশ্মি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহায়তা করে তাহাদিগকে আল্‌ট্রা ভাওলেট্ (ultra-violet) রশ্মি বলে।

তড়িৎসংযুক্ত বস্তু (electrified body) এবং চুম্বক ও গতিশীল তড়িতের চতুর্দ্দিকে যে প্রভাব দৃষ্ট হয় তাহাদের হ্রাস বৃদ্ধিবশতঃ ইথরে ঘাত-প্রতিঘাতজনিত (the stress and the strain) যে বিক্ষোভের উৎপত্তি হয় ম্যাক্‌সোয়েল (Maxwell)-এর মতে তাহাই আলোকের উৎপাদক। এবং বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় তড়িৎসঞ্চালনজনিত (electric oscillation) ইথরে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহাও আলোকের গতিতে প্রবাহিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ অধ্যাপক হার্ট্‌স্ (Hertz) পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ ইথর তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রথমে প্রমাণিত করেন। পরে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও মারকণি (Marconi) এই বিষয়ে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু স্যার জগদীশচন্দ্রের "বাঙ্গালী মস্তিষ্ক" ক্রমশঃ তড়িৎ বিজ্ঞান হইতে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইয়া অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে, এবং মার্‌কণির ইউরোপীয় "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি" বেতার টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। মহাসমরের সময় হইতে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক মারকণির পন্থানুসরণ করিয়া বেতার টেলিফোন যন্ত্র উদ্ভাবন করিলে এক্ষণে রেডিও কোম্পানির সৌজন্যে বহু দূরে গীত সুমধুর সঙ্গীত কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে প্রত্যেক পল্লীতে এবং এমন কি প্রত্যেক গৃহে গৃহে শ্রুত হইয়া জনসাধারণের কৌতূহল ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

এই সমস্ত ব্যাপার সাধনের জন্য কেবল ইথরই ধন্যবাদার্হ। ইথর সর্ব্বশক্তির আধার। কোন জড় পদার্থ উত্তোলন করিলে তজ্জন্য যে শক্তির আবশ্যক হয় সেই পদার্থ সন্নিহিত ইথরকে তাহা উপঢৌকন প্রদান করে; এবং তাহার পতন-কালে ইথর দয়াপরবশ হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে সেই শক্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করে। সুতরাং ইথর কেবলমাত্র শক্তির ভাণ্ডার নহে, অপিচ শক্তি-বণ্টনকারী। জড়জগতে ইথরই সর্ব্বময় কর্ত্তা, সুতরাং ইথরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিকের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও ম্যাকসোয়েল, কেলভিন প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত এক সুরে বলিয়াছিলেন যে ইথরের অস্তিত্বের প্রমাণ জড়ের অস্তিত্বের প্রমাণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। মোহনবাগানের ফুটবল ম্যাচ, এম্-সি-সির ক্রিকেট ম্যাচ, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিশ প্রহরীগণের মৃদু লাঠি-চালনা সত্ত্বেও যে সকল হতভাগ্যের অদৃষ্টে দৃষ্ট হইল না, তাহাদের যেরূপ জন্ম বিফল হয়, তাহারা "কৃপণ" এবং ক্রীড়ামোদী সুধী-গণের কৃপার পাত্র হয়, সেইরূপ ইথরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই বৈজ্ঞানিকগণের অধিকতর কৃপার পাত্র

হইয়াছিল। এক্ষণে জগৎ কেবল ইথর, ইলেকট্রন ও প্রোটনের লীলাভূমি। প্রোটন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইলেকট্রনকে ইথরের বিকৃতিবিশেষ বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অনুমান করিয়াছিলেন যে ইথর এক রস (homogeneous uniform) নহে। তাহার মধ্যে মধ্যে অবকাশ বা ফাঁক আছে। এই ফাঁকগুলিই ইলেকট্রন্ এবং ইহাদের দৌড়াদৌড়িতে জড়ের পরমাণু উৎপন্ন হয়। সুতরাং যে পদার্থের পরমাণুতে অধিক সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন্ আছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে সেই অনুপাতে লঘু। ইলেকট্রন্ ইথরের ফাঁক হইলে জড়জগৎও ফাঁকি বা অসৎ হইয়া গেল। যাহা হউক অন্যান্য বৈজ্ঞানিক এই মতবাদ অনুমোদন করেন না। বিজ্ঞান বেদান্তের তোরণ-দ্বারে উপনীত হইয়াও তন্মধ্যে প্রবেশ-লাভ করিতে পারিল না।

সমপাঠিগণের বিদ্রূপবাক্য, শিক্ষক মহাশয়ের বেত্রাঘাত ও পরীক্ষকের ভ্রূকুটির ভয়ে ভূগোলপাঠার্থী অনেক বালক, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হইলেও সূর্য্যকে গতিশীল বলিতে সাহসী হয় না। কিন্তু মেকানিক্‌স্ (mechanics) পাঠার্থী বালক মাত্রেই জানে যে গতি ও স্থিতি অন্যোন্যসাপেক্ষ (Relative) নিরপেক্ষ বা ঐকান্তিক (absolute) নহে। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে কোন একটিকে কেন্দ্র মনে করিলে, অপরটি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া মনে করা যায়। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণের মতে আকাশস্থ কোটি কোটি নক্ষত্র, পরস্পরের নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থিত থাকিয়া, প্রতি সেকেণ্ডে বহু সহস্র মাইল বেগে অবিশ্রান্তভাবে দৌড়িতেছে। আমাদের সূর্য্যও এইরূপ একটি নক্ষত্র এবং ইহাও ঘূর্ণায়মান গ্রহ-উপগ্রহাদি পারিষদ্‌বর্গ সমভিব্যাহারে ক্রমাগত ধাবিত হইতেছে। গম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন সমস্ত 'জগৎ' সর্ব্বদাই গতিশীল। দৃশ্যমান নক্ষত্ররাজ্য হইতে কোটী কোটী মাইল দূরে কোন পদার্থ নিরপেক্ষ স্থিতিসুখ (absolute rest) উপভোগ করিতেছে কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই।

আলোকের গতি অত্যন্ত অধিক হইলেও পূর্ব্ব পশ্চিমে ধাবমানা পৃথিবীর গতির সহিত তুলনায় তাহার আপেক্ষিক গতির উত্তর দক্ষিণ অপেক্ষা পূর্ব্ব পশ্চিমে কিঞ্চিৎ হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মাইকেলসন (Michelson) এবং মর্লে'র (Morley) পরীক্ষা দ্বারা ঐরূপ কিছুমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষিত হইল না। বৈজ্ঞানিকগণ আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত না হওয়ায় স্তব্ধ হইলেন। অনেকের ললাটে ইথরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের রেখা দৃষ্ট হইলেও তাহারা "চিত্রার্পিতারম্ভের" ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন— (as a painted ship upon a painted ocean)। ইথর-সাম্রাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী আর অধিক দিন শান্তি সুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না, কারণ কমলা সতত চঞ্চলা। অবশেষে ফিট্‌জিরাল্ড্ (Fitzerald) এবং লোরেঞ্জ (Lorenz) ইথরের পক্ষ হইতে ওকালতনামা গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান-আদালতে সওয়াল জবাব করিতে আরম্ভ করিলেন। লোরেঞ্জ বলিলেন "তোমাদের গোড়ায় গলদ হইয়াছে, কোন একটি মাপকাঠি উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত থাকিলে তাহার যে দৈর্ঘ্য থাকে পূর্ব্ব পশ্চিমে থাকিলে তাহার দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয়।" লোরেঞ্জের এই উক্তিতে প্রতিবাদিগণ তাঁহাকে উপহাস করিবেন ও বিকৃতমস্তিষ্ক বলিবেন, ব্যবসায়িগণ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন, কবিরাজ মহাশয় তাঁহার বায়ু প্রশমনের জন্য মধ্যমনারায়ণ তৈলের ব্যবস্থা করিবেন, মনস্তত্ত্ববিৎ চিকিৎসক তাঁহাকে রাঁচি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবেন, এবং নবীন প্রত্নতাত্ত্বিক বাগবাজারে তাঁহার পৈত্রিক আবাসের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের জন্য সুগভীর গবেষণা করিবেন। সে যাহা হউক এইরূপ বহু বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি দ্বারা জগতে অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। কলম্বসের ভূপ্রদক্ষিণ-পরিকল্পনা তাৎকালিক অনেক পণ্ডিতের নেত্রে উন্মাদের লক্ষণ স্বরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল। গৌতম-বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাতুলাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল বাতুলের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইতে তাঁহারা মহাপুরুষাখ্যা প্রাপ্ত হন, এবং তদ্বিপর্য্যয়ে উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। লোরেঞ্জের শিষ্যগণ বলেন যে তাঁহার উক্তি অযৌক্তিক নহে। দ্রুতগামী বাষ্পীয়পোতের আরোহীগণ মনে করেন যে তাঁহারা স্থির আছেন, কেবল বায়ু তন্মধ্য দিয়া অতি প্রবল বেগে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং বায়ুর চাপে পোতের দৈর্ঘ্য কিঞ্চিন্মাত্র

হ্রাস হইয়া যায়। এইরূপে বৈজ্ঞানিকগণ গণিতের সাহায্যে নির্ণয় করিয়াছেন যে পৃথিবী ঠিক গোলাকার হইলে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২০ মাইল বেগবশতঃ তাহার পূর্ব্বপশ্চিমের ব্যাস ৬০০ ফুট ক্ষুদ্রতর হইয়া যাইত। অতএব পূর্ব্বপশ্চিমে অবস্থিত প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্যের ন্যূনতা হওয়া অসম্ভব নহে। লোরেঞ্জ আকাশ (space) সম্বন্ধে আর একটি নূতন কথা বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কোন জড় পদার্থের বেগ আলোকের বেগ অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। অতএব দুইটি জড়কণা বিপরীত দিকে আলোকের গতিতে ধাবিত হইলে তাহাদের আপেক্ষিক বেগ আলোকের বেগের দ্বিগুণ হইয়া যায়। কিন্তু, যে হেতু তাহা অসম্ভব, অতএব তন্মধ্য আকাশ স্বতঃই ক্ষুদ্রতর হইয়া যাইবে। যাহা হউক লোরেঞ্জের এই যুক্তিযুক্ত উক্তিতে নবীন বৈজ্ঞানিকদল (extremist) আশ্বস্ত হইলেন না। তাঁহারা ইথরের অধীনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্ত্তে পূর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতী। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যপদেশে সূক্ষ্মদর্শী রাজপুরুষগণ সি, আই, ডি-রূপ অনুবীক্ষণে বঙ্গদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্রোহের রেখাচ্ছায়া দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময়ে জার্ম্মেণীর এক প্রান্তদেশে নাজী (বা নাট্‌সী) বিধ্বস্ত ইহুদী-জাতীয় আইনষ্টাইন্ (Einstein) নামে এক বীণাবাদক "হরিজন" ইথর-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশিত ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন যে কোন বস্তুর নিরপেক্ষগতি নির্ণয় করা অসম্ভব। "Nature is such that it is impossible to determine absolute motion by any experiment whatever।" ইহাই তাঁহার আপেক্ষিকবাদের Relativity) মূল সূত্র। দ্বিতীয় জড়কণা ব্যতিরেকে কেবল্ ইথরের সহিত তুলনায় কোন বস্তুর গতিকে তাহার ঐকান্তিক বা নিরপেক্ষগতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইথরের এরূপ কোন লক্ষণ নাই যদ্দ্বারা ঐ প্রকার বেগ নির্ণয় করিতে পারা যায়। অতএব প্রমাণাভাব হেতু ইথরের অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইয়া যায়। দেশ ও কালের (space এবং time) মধ্যে এক নূতন সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আইনষ্টাইন্ ইথরের অধীনতা স্বীকারে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। দেশ ও কালের মধ্যে প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। ইংলণ্ডের প্রাচীন দার্শনিক লকের (Locke) মতে আমাদের মনে বিভিন্ন ভাবোদয়ের পারম্পর্য্যের উপর সময়ের জ্ঞান নির্ভর করে। ডেকার্টের (Descartes) মতে বিভিন্ন জড় পদার্থের অবস্থিতি বশতঃ তন্মধ্যস্থ আকাশের প্রতীতি জন্মে। ম্যাক্সোয়েলের মতে আকাশ সম্পূর্ণ গতিহীন ভাবে নিশ্চল ("immovably fixed") এবং সময় সমবেগে প্রবহমান (uniformly flowing)। হার্বার্ট স্পেনসরের মতে দেশ ও কাল সান্ত কি অনন্ত তাহার কোনটিই আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যাহা হউক এই সকল দার্শনিকদিগের মতে দেশ ও কাল সম্পূর্ণ পৃথক্ তত্ত্ব। প্রত্যেক বস্তুর যেমন দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ আছে, আকাশেরও সেইরূপ তিনটি দিক্ (dimension) আছে। তদতিরিক্ত দিক আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আইনষ্টাইন্ বলিলেন যে সময়ই আকাশের চতুর্থ দিক্ (Time is the fourth dimension of space) কোন সামতলিক ক্ষেত্রে একটি জড়কণার গতি নির্দ্দেশ করিতে হইলে, ঐ ক্ষেত্রের একটি বিন্দু হইতে দুইটি সরলরেখা পরস্পর লম্বভাবে অঙ্কিত করিতে হয়—একটি সময়ের এবং অন্যটি দূরত্বজ্ঞাপক; এবং তন্মধ্যস্থ একটি রেখা দ্বারা ঐ জড়কণা কোন্ সময়ে কতদূর গমন করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা যায়। পূর্ব্বোক্ত রেখাদ্বয় ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতিজ্ঞাপক নহে; তাহারা আকাশের একদিক (dimension of space) এবং সময়ের সমন্বয়। এইরূপে আকাশে কোন এক জড়কণার অবস্থিতি নিরূপণ করিতে হইলে কোন এক বিন্দু হইতে তিনটি সরল রেখা পরস্পর লম্বভাবে অঙ্কিত করিতে হয় এবং রেখাত্রয় হইতে ঐ জড়কণার দূরত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তাহার অবস্থান (position) নির্ণীত হয়। কিন্তু ঐ জড়কণা গতিশীল হইলে তাহার গমনরেখানির্দ্দেশক আকাশে কালের একটি দিক্ অনুমান করা আবশ্যক। সুতরাং দেশ ও কাল অন্যোন্যসাপেক্ষ। এই দেশকাল-সমন্বয়কে আইনষ্টাইন্ Time-space continuum আখ্যা দিয়াছেন। এক সময়ে এক ব্যক্তিকে গৃহের ছাদ হইতে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া আইনষ্টাইন্ তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট যাইয়া তিনি আহত হইয়াছেন কিনা তদ্বিষয়ে প্রশ্ন না

করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যখন পড়িয়া যাইতেছিলে তখন দেশকাল সম্বন্ধে তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল?" নব্য তরঙ্গবাদ (Wave mechanics) গতিশীল ইলেকট্রনকে তরঙ্গের ন্যায় কল্পনা করে। একটিমাত্র ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান হইলে আকাশ সম্বন্ধে তাহার তিন দিক্ (dimensions) এবং সময় সম্বন্ধে এক দিক্ (dimension)। এইরূপ দুইটি ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান হইলে আকাশ সম্বন্ধে প্রত্যেকের তিন দিক্ কিন্তু কাল সম্বন্ধে এক দিক্; সুতরাং একত্র যোগে আকাশের সাত দিক্। এইরূপ তিনটি ইলেকট্রন গতিশীল হইলে, আকাশ সম্বন্ধে তাহাদের নয় দিক্ এবং কাল সম্বন্ধে এক দিক্; একত্র যোগে আকাশের দশ দিক্। এইরূপে আকাশের নানাদিক্ অনুমিত হইলেও সময়ের কেবলমাত্র একটি দিক্ আছে ভূত ভবিষ্যৎ নাই; আছে কেবল বর্ত্তমান। "সূত্রে মণিগণের" ন্যায় সমস্ত জাগতিক ঘটনা কেবল কালেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, আমরা তাহাদের পর পর দেখি মাত্র। কাল "অখণ্ড একরস," দেশ ও কাল "বাক্য ও অর্থের ন্যায় সম্পৃক্ত"। ব্যোমরূপী প্রকৃতি লোহিত, শুক্ল কৃষ্ণ ইতি ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও মহাকালরূপ পুরুষ গুণহীন, অথবা কেবল "সৎ"-গুণ-সম্পন্ন। ব্যোমরূপী প্রকৃতির মহদাদি আকারে নানা অভিব্যক্তি হইলেও মহাকালরূপ পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নিরবদ্য, নিরঞ্জন। ব্যোমরূপী প্রকৃতি দশদিক্-বর্ত্তিনী দশমহাবিদ্যারূপিণী দশপ্রহরণধারিণী হইলেও মহাকালরূপ পুরুষ কেবল "ঈশান" দিগ্‌বর্ত্তী, অবিদ্যাদি দোষবিমুক্ত, এবং এক প্রহরণধারী—শূলপাণি। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন যে আকাশের বহু দিক্ কল্পনা "অধ্যাসমূলক" "অতস্তস্মিন্‌তৎবুদ্ধিমাত্র"। তৎ-প্রত্যুত্তরে বৈজ্ঞানিক বলিবেন, যে গণিত তাহার আর্ষ দৃষ্টিতে, যে মুক্তি ধ্যানে, উপলব্ধি করিয়াছে সেই অপেক্ষানুভূতির পরিকল্প বহির্জগতে লক্ষিত না হইলেও গণিতের সিদ্ধান্তের ইতরবিশেষ হয় না।

এইরূপে নব্য বৈজ্ঞানিকদল ইথরের সাহায্য না লইয়া সমান্তর দ্বিতীয় শাসনকার্য্যের (Government on parallel lines) পক্ষপাতী। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মানীর অপর এক প্রান্ত হইতে পরিমাণবাদের (Quantum theory) প্রবর্ত্তক Max Planck ইথরের (flank attack) পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিতেছিলেন। ইথর তরঙ্গবাদের সাহায্যে আলোকের সরল রেখানুগমন (Rectilinear Propagation of light) প্রমাণ করিতে অক্ষম হইয়া নিউটন আলোকের পরমাণুবাদ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জলের উপর আলোকরশ্মি পতিত হইলে তাহার কিয়দংশ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অপরাংশ প্রতিফলিত হইয়া যায়—ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি প্রকারান্তরে বলিয়াছিলেন যে ধনী লোকের গৃহে সমারোহ উপলক্ষে দ্বারবান্ তাহার স্বেচ্ছাক্রমে ব্যক্তিবিশেষকে তন্মধ্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করে এবং অপরকে বিতাড়িত করিয়া দেয়, প্রকৃতিও সেইরূপ খাম-খেয়ালবশে আলোককে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে আজ্ঞাদান করে, এবং পরক্ষণে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। নিউটনের এই উক্তি উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকদল আলোকের পরমাণুবাদ স্বীকার করিতেছেন।

ধাতু পাত্রে আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মি পতিত হইলে তাহাতে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া ইলেকট্রন বিকীরিত হয়। ফটোগ্রাফ-প্লেটে আলোক পতিত হইলে তাহার গুরুত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং আলোকের গুরুত্ব আছে। একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের সংযোগে একটি আলোককণা (light quanta বা photon) উৎপন্ন হয়। এই আলোককণাগুলি অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। কাহারও কাহারও মতে তাহারা সরলভাবে গমন না করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হয় তজ্জন্য তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, আলোকবাহী ইথরের আর বিশেষ কোন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট রহিল না (Ether's occupation is gone). নবীন দলের কোন কোন অত্যুৎসাহী সভ্য মনে করিয়াছিলেন যে দুইশতবর্ষবয়স্ক পলিতকেশ ইথর বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন- অথবা বৃত্তিভোগী তালিকাভুক্ত হইবেন। এবং স্মার্ত্ত বিজ্ঞানাচার্য্যগণ আশা করিয়াছিলেন যে অচিরে ইথরের শ্রাদ্ধবাসরে অধ্যাপকবিদায়ের বন্দোবস্ত হইতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে অধ্যাপক-মণ্ডলীর উল্লসিত হইবার বিশেষ কারণ দেখা যাইতেছে না, কারণ প্রবীণ রক্ষণশীল দল (conservative) প্রাচীনের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃ তাঁহাদের যত্নপালিত ইথবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সহায়তা করিতে অক্ষম, কারণ "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।" অপিচ দার্শনিকপ্রবর হিউম (Hume) এর ন্যায় নবীন বৈজ্ঞানিকদলও পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত কার্য্যকারণবাদে আর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। প্রকৃতি কেন রেডিয়ামের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি ইলেকট্রনকে পরমাণুরূপ কারাগার হইতে মুক্তি দান করে এবং অপরগুলিকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখে তাহার কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং প্রকৃতির কার্য্যকলাপে যথেষ্ট পরিমাণ পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্যদোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। নৈতিক জগতেও "সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশ" সর্ব্বথা দৃষ্ট হয় না। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা বশতঃ উত্তর বিহারে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে লক্ষ লক্ষ নরনারী কোন্ অপরাধে পাইকারী দণ্ড প্রাপ্ত হইল, তাহা কতিপয় বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ মানবের দুর্জ্ঞেয়।

এই রূপে দেখা যাইতেছে যে উনবিংশ শতাব্দীর অনেকগুলি মতবাদ একণে রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। ইথরের পরিবর্ত্তে দেশকাল সমন্বয়ের প্রাধান্য স্বীকার করাতে পূর্ব্বপক্ষ বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিবেন যে উদারনৈতিক দল তাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে প্রমাণ করিয়াছেন যে গৃহ অগ্নিদগ্ধ না করিয়াও শূকরের মাংসের কাবাব প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার প্রত্যুত্তরে নব্যদল বলিবেন যে "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়, সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ হেতু যেমন এক হইতে বহুর উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ বহুত্বকে একত্বে পরিণত করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য; কারণ "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"। Science arises out of identity amongest diversity.

আইনষ্টাইনের আর একটি সিদ্ধান্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সূর্য্যগ্রহণকালীন আলোকরশ্মি কিরূপে আকৃষ্ট হয়, তৎকালীন গৃহীত ফটোগ্রাফ ছবি দেখিয়া বৈজ্ঞানিকপ্রবর সার জে, জে, টমসন্ বলিয়াছিলেন যে নেপচুন্ গ্রহের আবিষ্কারের পর হইতে গণিতের গবেষণার ফল এরূপ আশ্চর্য্যরূপে আর কখনও প্রমাণিত হয় নাই। এক ধূমকেতু নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে পৃথিবীর সন্নিহিত হইলে এক বিশিষ্ট জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত গবেষণার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছিলেন যে কোন অনাবিষ্কৃত গ্রহের আকর্ষণ বশতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে। তিনি সেই গ্রহের অবস্থিতি, দুরত্ব, গুরুত্ব ও বেগ গণিতের সাহায্যে নির্ণয় করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে নেপচুন গ্রহ আবিষ্কৃত হইলে তাঁহার গবেষণার ফল সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। এইরূপ স্বনামধন্য রাসায়নিক মেণ্ডেলিফ (Mendelieff) মৌলিক পদার্থগুলিকে তাহাদের পরমাণুর গুরুত্ব অনুসারে নূতনভাবে সাজাইয়া কতকগুলি অনাবিষ্কৃত ভূত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তৎতৎগুণবিশিষ্ট অনেকগুলি ভূত পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জলবুদ্বুদের ন্যায় আকাশের বক্রভাবাপত্তি (Curvature of space) এবং তন্মধ্যস্থ জড় পদার্থের গতিবৃদ্ধিবশতঃ আকাশের প্রসারণ—আইনষ্টাইনের এই তৃতীয় সিদ্ধান্ত একণে বিচারাধীন (Sub-judice)। ডি সিটার (De Sittar) নামক এক প্রকৃষ্ট গণিতজ্ঞ আকাশের বক্রভাব স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহার মতে আকাশ ক্রমাগত কুঞ্চিত হইতে চেষ্টা করে।

বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে একণে তিনটি মাত্র নট—দেশকাল-সমন্বয়, ইলেকট্রন্ ও প্রোটন—নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বহুরূপে অভিনয় করিতেছে। তাহারা কি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, বা অন্যোন্যসাপেক্ষ, বা "সদসত্ত্যামনির্বচনীয়ং যৎকিঞ্চিদ্ভাবরূপং" কোন এক অব্যক্ত পদার্থের বিকৃতি—তাহা একণে নির্ণীত হয় নাই।

কয়েক মাস পূর্ব্বে বিজ্ঞানজগতে দুইটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—নিউট্রন এবং পজিট্রন। এই দুই নবজাত শিশুর মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রোটনের সগোত্র এবং গুরুত্বে ইলেকট্রনের সদৃশ, এবং দ্বিতীয়টি ইলেকট্রন ও প্রোটনের সম্মেলনে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। জ্যোতিবিগণ ইহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোষ্ঠী বিচারে বিশেষ ব্যস্ত, ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বর্ত্তমান কালে আইনষ্টাইনের Relativity বা আপেক্ষিকভাব, প্ল্যাঙ্কের Quantum theory বা পরিমাণবাদ, হাইজেনবার্গ (Heisenberg) বর্ন্ (Born) এবং জর্ড্যানের (Jordan) Wave mechanics বা পরিমাণনির্ণয়বাদ এবং ডি ব্রগ্‌লী (de Broglie), শ্রোডিঙ্গার (Schrodinger) এবং ডিরাকের (Dirac) New wave mechanics বা নব তরঙ্গবাদ বিজ্ঞান জগৎকে আলোড়িত ও উদ্ভাসিত করিতেছে। জড়জগতের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ এক্ষণে বিজ্ঞানের অধিকার হইতে বিশুদ্ধ গণিতের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে। কিন্তু গণিতের ভাষা ক্রমশঃ এত দুর্ব্বোধ্য হইতেছে যে তন্মধ্যে পূর্ণ প্রবেশপত্র লাভ মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভবপর।

বিজ্ঞান জগতের সমস্যার সরলতাসম্পাদন করিলেও তাহার পূরণ বা পূর্ণ মীমাংসা করিতে সমর্থ হয় নাই। The equation though simplified has not been solved। বিজ্ঞান জগতে জীবের আবির্ভাবের কোন সন্তোষজনক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই।

দার্শনিকগণ দুই প্রকার জগতের বিষয় উল্লেখ করেন—ব্যাবহারিক ও বাস্তব; তন্মধ্যে প্রথমটি ইন্দ্রিয়জ্ঞানসাপেক্ষ ও সর্ব্বজনবিদিত, এবং দ্বিতীয়টি অনুমানগম্য হইলেও তাহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রমাণ করা সুকঠিন। বিজ্ঞান এক নূতন জগতের অবতারণা করিতেছে, এবং এই জগতে জীব ও জীবেতর পদার্থের মধ্যে এক সম্বন্ধের অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধ কোথায়? বাহিরে না অন্তরে?*

শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়

* রিপন কলেজ অধ্যাপক-সঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

সাগর দোলায় ঢেউ

শ্রীনবগোপাল দাস আই-সি-এস

* * *

পরের দিনও অভ্যাসমত মোহিত সেকেণ্ডক্লাশের ডেকের নির্দ্দিষ্ট কোণটিতে বসেছিল—সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে। লোহিত সাগরে এসে অবধি সূর্য্যোদয়ের দিক্ গিয়েছিল বদ্‌লে, ফার্ষ্ট ক্লাশের যাত্রীরা তাই বড় একটা সেকেণ্ডক্লাশে আস্‌ত না। গরমের জন্য মোহিত সেদিন ডেকের উপরই শুয়েছিল। ঘুম যখন ভাঙ্‌ল তখনও আঁধার অনেকখানি রয়েছে—দূর থেকে প্রভাতী তারার আলো তখনও ভেসে আস্‌ছিল বাতাসে।

চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাক্‌তে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না। উঠে গিয়ে তাই সে রেলিংটার পাশে বস্‌লে। আধ-আলোর ছায়ায় সাগরের জল মথিত ক'রে চল্‌ছিল বিশাল জাহাজ···মালার মত জাহাজের আলোগুলো জলছিল, যেন মানুষের ইতিহাসের প্রতীক ধারাবাহিক একটা সমাবেশ।

হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে অদূরে ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের উপর বসে রেলিং ধরে একটি নারীমূর্ত্তি এক দৃষ্টিতে সাগরের জলে তাকিয়ে আছে—যেন ঢেউ গুণ্‌ছে।

মুহূর্ত্তের জন্যে মোহিতের বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠ্‌ল। একটু ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে মোহিত দেখ্‌লে মেয়েটি আর কেউ নয়···শীলা রজার্স···

মোহিতের একবার খেয়াল হ'ল শীলাকে ডাকে। নিস্তব্ধ জলরেখা, তার মাঝে এঞ্জিনের অস্ফুট শব্দ আর বিদার্য্যমান সাগরের চাপা কান্নার সুর···একটুখানি সাহস করে ডাক্‌লেই হয়ত উত্তর দিবে।

শীলা কিন্তু মোহিতকে দেখেনি'। সে আপন মনে স্তব্ধনেত্রে জলের ফেণার রাশির উচ্ছ্বাস এবং বিকাশ লক্ষ্য করছিল।···মিস্ হিল আগের দিন রাত্রিতে তাকে তাঁদের তরফের চরম-বাণী শুনিয়ে দিয়েছিলেন এবং খুবই গম্ভীর ভাবে শাসিয়ে বলেছিলেন, যদি সে তার স্বভাব না শোধ্‌রায় তাহ'লে যে শুধু তার বিপদ হ'বে' তাই নয়, যাদের নিয়ে এই বিপ্লব তাদেরই লাঞ্ছনা হবে সবচেয়ে বেশী এবং সকলের আগে।

এই শেষের কথাটিতেই তার মন এত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। যোশীর সহজ কথাবার্ত্তা তার অপছন্দ হয়না, আর মোহিতের সলজ্জ অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গী তার কাছে বেশ মধুর বলেই ঠেকে, কিন্তু তার এই ভালো লাগার জন্যে যদি তাদের বিপদ বা লাঞ্ছনার সুরু হয় তাহ'লে সে কি নিজের তুচ্ছ একটা আনন্দকে বড় করে দেখ্‌তে পারে? ··· তার চোখের দু' কোণ ছাপিয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়্‌ছিল, কিন্তু সে তা' মনের দৃঢ়তা দিয়ে রোধ করবার চেষ্টা কর্‌ছিল।

অন্যমনস্ক ভাবে শীলা একবার সেকেণ্ডক্লাশ ডেকের দিকে তাকালে। তার চোখ কিন্তু মোহিতের দিকে গেল না। মোহিতকেও অতিক্রম ক'রে সে দেখ্‌ছিল শাদা ঢেউগুলো, যা' চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে তাদের জাহাজ চল্‌ছিল মিশরের পথে···খেইহারা সমুদ্র যেন উদয়রশ্মি উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপনার মুখ তুলে ধরেছে।

ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে শীলা রজার্স সেখানে থেকে উঠে গেল।

দুপুর বেলা মোহিত ভাব্‌লে, দূর হোক্‌গে ছাই, এমন ক'রে চুপচাপ বসে থাকা কি আমার শোভা পায়?···খুব গম্ভীর ভাবে সে Sherlock Holmes এর চমকপ্রদ কাহিনীর মধ্যে মনোনিবেশ করবার প্রয়াস কর্‌লে।

ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাসের রসের মধ্যে তার মন ডুবে

আস্‌ছিল এবং তার অন্তর্নিহিত বুদ্ধি চলেছিল Sherlock Holmesএর সাথে মৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে, এমন সময় যোশী এসে বল্‌লে, চল মোহিত, আজ জাহাজটার টপোগ্রাফী একবার ভালো ক'রে দেখে নেওয়া যাক্।

জাহাজের খুঁটিনাটি দেখা এবং তার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা যোশীর একটা বাতিক। বিলেতে সে অনেক বড় বড় জাহাজের অভ্যন্তর সুদক্ষ expert এর মত পর্য্যবেক্ষণ করে এসেছে, উচিত-অনুচিত মত প্রকাশ করতে একটুও কার্পণ্য করেনি' সে; আজ ছোট্ট এবং সাধারণ এই জাহাজখানার টপোগ্রাফী জান্‌বার জন্যে তার হঠাৎ এমন আগ্রহ কেন মোহিত বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

কিন্তু সে আপত্তি করলে না। চুপচাপ বসে থেকে থেকে এবং একই বিষয় নিয়ে চিন্তা ক'রে তার বিরক্তি ধরে গিয়েছিল; এখন এই অলস কর্ম্মহীনতা থেকে খানিকক্ষণের জন্যেও মুক্তি পাবার সুযোগ পেয়ে সে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌লে। Sherlock Holmesটা হাতেই রেখে সে উঠে বল্‌লে, চল…

প্রথমে তারা ঢুক্‌লে এঞ্জিন-রুমে। যোশী অনেক রকমের এঞ্জিন দেখেছে, এর খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও সে অনেক কিছু জানে। বেশ অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে সে এঞ্জিনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করছিল আর তার প্রশ্নে সেখানকার লোকদের বিব্রত ক'রে তুল্‌ছিল। মোহিতের কাছে এসব দুর্ব্বোধ্য; এঞ্জিনরুমের শব্দে এবং কলকব্জাগুলোর বিশালতায় তার মনে হচ্ছিল আরব্যোপন্যাসের সেই দৈত্যের কথা যে প্রদীপাধিকারীর একটি মাত্র আদেশে সব মূল পদার্থকে বাঁধতে পারত…দূর দুরান্তর থেকে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যাকে এনে দিত আলাদিনের সম্মুখে, আবার নিমেষের মধ্যে তাকে গিরি-পর্ব্বতের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে যেত!

ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে ইটালিয়ান্ এঞ্জিনিয়ারটি যোশীকে জানালে যে তাদের লাইনে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে নতুন এঞ্জিন; এর গতি বেশী এই এর একমাত্র গুণ নয়, এর প্রতিবন্ধও সাধারণ এঞ্জিনের চেয়ে ভালো।

যোশী খুব গম্ভীরভাবে মন্তব্য প্রকাশ কর্‌লে,–কিন্তু ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক লাইনে আপনাদের এবং জার্ম্মান কোম্পানীর যে সব ষ্টীমার আছে সে গুলোর তুলনায় এ এঞ্জিন খেলার কল বই আর কিছুই নয়!

ইটালিয়ান্ যুবকটি খুবই সম্ভ্রমভরা সুরে স্বীকার করলে যে যোশীর কথা সত্যি।

এঞ্জিনরুম থেকে তারা খালাসীদের থাক্‌বার জায়গা, তাদের রান্নাঘর, জাহাজের সার্জ্জারী প্রভৃতি দেখে ফার্ষ্ট ক্লাশ corridor দিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশ lounge এ ঢুক্‌লে। সেখানে বসেছিলেন কর্ণেল গ্রীণ, মিস্ ছিল এবং আরও অনেকে। কর্ণেল যোশীকে দেখে একটু স্মিতহাসি হাস্‌লেন, যোশীও মাথাটি হেলিয়ে তাকে অভিবাদন জানালে।

মোহিত জিজ্ঞেস্ করলে, ভদ্রলোকটি কে?

—সেই কর্ণেল, যার কথা তোমায় বলেছিলাম।

মোহিত একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কর্ণেল গ্রীণের দিকে তাকালে। মুখখানা বেশ শান্ত আর হাসিভরা। মোহিত ভেবেছিল তাকে দেখেই তার মনে বিজাতীয় একটা ঘৃণাব উদ্রেক হবে, কিন্তু আসলে কর্ণেলের স্মিতহাসিটি তার কাছে বেশ ভালোই লাগ্‌ল।

হঠাৎ যোশী বল্‌লে, ওই যাঃ—আসল জায়গাটাই যে দেখা হল না!

—সে আবার কী?

—নীচে, এঞ্জিনরুমের পাশ দিয়ে যেতে হয়, যেখানে ডেক্‌প্যাসেঞ্জাররা থাকে।

এই জাহাজে যে ডেক্‌প্যাসেঞ্জার বলে এক শ্রেণীর যাত্রী আছে তা' মোহিত জান্‌ত না। সে বল্‌লে, এখানে আবার ডেক্‌প্যাসেঞ্জার আস্‌বে কোত্থেকে?

যোশী বল্‌লে, আছে হে, মোহিত; আছে…। সবাই ত আমাদের মত পয়সাওয়ালা এবং catholic নয়, ডেক্‌কে আশ্রয় করেই তাদের গতি!

চকিতের মত মোহিতের মনে ভেসে উঠ্‌ল শরৎবাবুর বর্ণিত রেঙ্গুনষ্টীমারে ডেক্ প্যাসেঞ্জারদের কোলাহলের

ছবি...। মনে হ'তেই তার proletarian মনও একটুখানি শিউরে উঠ্‌ল। বললে, কী আর হবে ওসব দেখে, তার চেয়ে আমাদের নিজেদের ডেকে ফিরে যাই।

যোশী বললে, সে কি হয়?...ওখানে অনেক কিছু interesting জিনিষ মিলতে পারে! চাই কি, কিছু দিশী হালুয়া আর পুরীও পেতে পার।

হালুয়া বা পুরীর প্রতি মোহিতের বিশেষ লোভ ছিল না। তবু, বন্ধুর অনুরোধে এবং ডেক্‌যাত্রীদের অবস্থাটা নিজের চোখে পরখ ক'রে নেবার কৌতূহলে সে যোশীর অনুগমন করলে।

অতি অপ্রসর সিঁড়ি বেয়ে তারা সোজা নীচে নেমে চলে গেল। লোটাকম্বল নিয়ে একজন বিশালকায় সিন্ধুদেশীয় ভদ্রলোক হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন, যোশী আর মোহিতকে আসতে দেখে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলেন।

যোশী হাসিমুখে প্রশ্ন করলে, এখানে আপনার কেমন লাগ্‌ছে, জী?

সিন্ধুদেশীয় ভদ্রলোকটি, নাম তাঁর কৃপালানি, বললেন, আপনাদের মত আলোবাতাস পাইনে বটে, বাবুজী, কিন্তু কোন অসুবিধা বোধ হচ্ছেনা—সমুদ্র শান্ত আছে ব'লে। তা' ছাড়া ষ্টুয়ার্ডের সাথে ভাব করে নিয়েছি, মাঝে মাঝে ডিম আর আলুসেদ্ধ দিয়ে যায়, তাতে মন্দ থাওয়া হয়না।

মোহিত বললে, ঝড় উঠ্‌লে আপনার ভয়ানক কষ্ট হবে কিন্তু!

হেসে কৃপালানি বললেন, ওরকম কষ্ট আমাদের সওয়া আছে, বাবুজী!...তবুও দিব্যি আরামে পা' ছাড়িয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের দেশে যারা করাচী থেকে বম্বে বা বসরা যায় তাদের অবস্থা কি দেখেছেন কখনও?

মোহিতের অভিজ্ঞতা খুবই অল্প। সে ঘাড় নেড়ে জানালে সে দেখে নাই। কিন্তু তার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল সেই রেঙ্গুনগামী জাহাজের ছবি···সেই মুরগীগুলোর ক্যাঁক্‌ক্যাঁক্‌ শব্দ, টগরের কলহ, জাহাজের আবদ্ধ খোলের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ হ'তে আগত যাত্রীদের মহা-সঙ্গীতের সমবেত অনুশীলন···

যোশী কৃপালানির সাথে বেশ জমিয়ে নিলে। তার লোটা-বাসন সম্বন্ধে গোটাকয়েক প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করে সে তার কম্বলটার উপর দিব্যি আঁটসাঁট হয়ে বসলে।

কৃপালানি যাচ্ছে দক্ষিণ ফ্রান্সে, সেখানে তার আত্মভাই কয়েকজন আছে তারা মুক্তোর ব্যবসা করে। সেখানে সে তার ভাগ্যপরীক্ষা করবে। ইংরেজী ভাষার উপর দখল তার সামান্য, ফরাসীর বিন্দুবিসর্গও সে জানেনা, তবু সে চলেছিল অনিশ্চিতের ডাকে, কারণ তার কাছে নিশ্চয়তাও অনিশ্চয়তার মতই দুর্বোধ্য এবং চঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মোহিত চুপটি ক'রে আগ্রহভরা চোখে কৃপালানির কথাগুলো শুনছিল। কিছুকালের জন্য তার সমস্ত মনটি গিয়েছিল তার কাহিনীতে আচ্ছন্ন হয়ে···ভাবছিল, তার নিজের দেশেও অনাগতের আহ্বানে উত্তর দেয় এমন লোকের অভাব নেই! শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে তার চিত্ত ভরপুর হয়ে উঠ্‌ছিল।

কৃপালানি ডেকের অপর প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন, ওই যে ওদিকে দুটো লোক শুয়ে আছে, বাবুজী, ওরা আসছে বিহার থেকে। ওরা এসেছিল খুবই উৎসাহ নিয়ে, কিন্তু জাহাজের দোলানি খেয়ে ওদের মন গিয়েছে ভেঙে। ওরা যাচ্ছিল জার্ম্মাণিতে, হাম্‌বুর্গ না কোথায়··· কিন্তু এখন বলছে পোর্ট সেডে পৌঁছেই ওরা দেশে ফিরে যাবে···এসব কষ্ট নাকি ওদের সহ্য হয় না!

যোশী একটুখানি কৃপাপূর্ণ চক্ষে লোকদুটোর দিকে তাকালে। কম্বলমুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে তারা আচ্ছন্নের মত পড়ে রয়েছিল।

কৃপালানি বলতে লাগলেন, আরে দেশ থেকে যখন বেরিয়েছি তখন এরকম সৌখীন হ'লে কি চলে? সাধে কি আর আমাদের দেশের নাম খারাপ?···কিছু মনে করবেন না, বাবুজী, এক পঞ্জাব আর সিন্ধু ছাড়া কোথাও মরদ্‌কা-বাচ্চা ত দেখ্‌লুম না!

কথাটা হয়ত সত্যি নয়, কিন্তু এমনই আগ্রহ এবং বিশ্বাসের সুরে কৃপালানি কথাটি বললেন যে মোহিত বা যোশী কেউই প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত মনে আনতে পারলে না।

কৃপালানি বল্লেন, বাবুজী, তোমরা এসেছ, আমি ভারী খুসী হয়েছি কিন্তু।...তোমাদের কী দিয়ে যে অভ্যর্থনা করব বুঝ্‌তে পার্‌ছি না; আমার সাথে আমার বন্ধু'র দেওয়া কিছু মেওয়া আছে, কিন্তু সে ত তোমাদের ভালো লাগ্‌বে না! তবে, কিছু মশ্‌লা আছে, খাবে কি?

যোগী এবং মোহিত আগ্রহভরা সুরে বল্লে, মশ্‌লা খানিকটা পেলেত বেঁচে যাই, কৃপালানিজী!...এখানকার বিলিতি খাবার খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, একটুখানি মুখশুদ্ধি হওয়া ত' দরকার!

কৃপালানি বল্লেন, ঐ ত তোমাদের দোষ, বাবুজী; তোমরা বড্ড impulsive, যেই আমি মশ্‌লার নাম উল্লেখ কর্‌লুম অম্‌নি এমন ক'রে তোমরা তার স্তুতিগান আরম্ভ করে দিলে যে কেউ শুন্‌লে মনে করবে এর অভাবে তোমাদের সারারাত ঘুম হচ্ছিল না!...অথচ, আমি জানি, এই মশ্‌লার কথা থাক্‌, দেশের কথাটি একটিবারও তোমাদের মনে হয়নি'!

যোগী কী যেন বল্‌তে যাচ্ছিল, কৃপালানি বাধা দিয়ে বল্লেন, আমি তোমাদের মন্দ বলছি না, বাবুজী, এ হচ্ছে এই সমুদ্রের গুণ। কী যে আছে এর মাঝে বলা শক্ত, কিন্তু এর হাতে পড়ে আমরা যেন হয়ে যাই এর খেলনার মত, আমাদের মন, আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের সমস্ত সত্ত্বাকে নিয়ে সমুদ্র ছিনিমিনি খেলে...অনুভূতির গভীরতা কমে যায়, তার প্রসারতা বেড়ে ওঠে...

মোহিত কৃপালানির কথাগুলোর মধ্যে তার নিজের মনের সুরের ছন্দ দেখ্‌তে পাচ্ছিল। এই নিরক্ষর ব্যবসায়ীর বিচারক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি দেখে সে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে উঠ্‌ছিল।

যোগী বল্লে, কৃপালানিজী, আমি দেশবিদেশ একটু আধটু ঘুরেছি, নানাদেশের লোকের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে...আমি দেখেছি আমাদের দেশের লোক যদি অবসর পায় তবে যেমন ভাব্‌তে পারে অনেক দেশের লোকই তেমন ভাব্‌তে পারেনা।

কৃপালানি হেসে বল্লেন, ঐখানেই ত আমাদের মস্ত দোষ, বাবুজী। ভাব্‌তে আমরা জানি বেশ, ভাবুক ব'লে আমাদের খ্যাতিও আছে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের শক্তির অবসান হয় ঐখানেই! ভাব্‌তে আমরা এতখানি পারি বলেই কাজ করবার সময় যখন আসে তখন একেবারে গুলিয়ে যায় সব, কাজের বিশালতা আর জটিলতা দেখে আমাদের মন হয়ে যায় বিকল!

বল্‌তে বল্‌তে কৃপালানি তাঁর পুটলী খুলে একটা শিশি বার ক'রে তার থেকে খানিকটা মশ্‌লা মোহিত আর যোগীর হাতে দিলেন। অভ্যাসমত মোহিত আর যোগী তাঁকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিল, কৃপালানি বাধা দিয়ে বল্লেন, বিলিতী সুরে ঐকথাটি বলে আমার এই তুচ্ছ জিনিষটুকুর মর্য্যাদার হানি ক'রোনা, বাবুজী!...সত্যি কথা বলতে কি, বাবুজী, এদের অনেক কিছুই আমার ভালো লাগে, কেবল এই ছলে-অছিলায় ধন্যবাদ দেবার বাড়াবাড়িটা ছাড়া!

এই কথা যদি কৃপালানির মুখ থেকে না বেরিয়ে ডাঃ বর্ম্মণ বা চিদম্বরম্‌এর মুখ দিয়ে বেরুত তাহ'লে যোগীর সাথে তাদের একপ্রস্থ খণ্ডযুদ্ধের অভিনয় হয়ে যেত, কিন্তু কী জানি কেন কৃপালানির গভীরতা এবং সরলতার সাম্‌নে যোগীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

মোহিত বল্লে, ধন্যবাদ দেওয়াটা আমিও পছন্দ কর্‌তুম না, কৃপালানিজী, কিন্তু এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি জিনিষটা আগে যতটা শ্রুতিকটু ঠেক্‌ত আজকাল যেন আর তা' মনে হয়না। এর পেছনে যে সৌজন্যটুকু প্রচ্ছন্ন আছে তা' আমাদের মনকে একটু স্পর্শ করে বৈ কি!

কৃপালানি সায় দিয়ে বল্লেন, সে কি আমি বুঝিনা, বাবুজী?...তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমাদের মধ্যে ওটার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে গেছে।...মুখের ভাষাতে আমাদের মধ্যে মনের আদানপ্রদান হয়না, তার চেয়ে বড়ো আমাদের চোখের ভাষা, আমাদের অঙ্গভঙ্গীর গতিটুকুর তাৎপর্য্য...

এম্‌নিধারা কথাবার্ত্তায় কখন যে লাঞ্চের সময় হয়ে এল তা' দু'জনের কারোরই খেয়াল ছিলনা। হঠাৎ উপরে সতর্ককারী ঘণ্টার শব্দে তারা একটু আত্মস্থ হয়ে উঠ্‌ল। কৃপালানি বল্লেন, আপনাদের সময় হ'লো, বাবুজী...ঘড়ি বল্‌ছে, খিদের সময় হয়েছে, খেতে এসো...

যোশী আর মোহিত উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্‌লে, আপনাকে মাঝে মাঝে এরকম বিরক্ত কর্‌তে আস্‌ব হয়ত, আপনি কিছু মনে করবেন না যেন।

অভিবাদন ক'রে কৃপালানি বল্‌লেন, বলো কি বাবুজী? তোমরা এরকম মাঝে মাঝে আস্‌লে যে কী আনন্দ পাই তা কী ক'রে বোঝাব?···তোমাদের তরুণ সরল মনের সংস্পর্শে এলে বুঝ্‌তে পাই যে জরা আমায় এখনও এসে ধরেনি'।

ডাইনিংরুমে যেতে যেতে যোশী জিজ্ঞেস্‌ করলে, কৃপালানিকে কেমন লাগ্‌ল, মোহিত?

উচ্ছ্বসিত স্বরে মোহিত বল্‌লে, ভারী চমৎকার লোক, যোশী। আমাদের দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত লোকদের মাঝেও যে এমন সুষ্ঠু অথচ সরলমনা লোক আছে তা' আমি জানতুম না।·· দেশটাকে আজ নতুন ক'রে ভালোবাস্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে কৃপালানির মত লোককে জন্ম দিয়েছে বলে!

যোশী বল্‌লে, আমি ত এই পথে এবার নিয়ে চারবার আনাগোনা করছি; প্রত্যেকবারই এই ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করি, আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রত্যেকবারই এদের মধ্যে এমন লোকের সাথে আলাপ হয় যে আমার মনে গভীর একটা দাগ রেখে যায়।

মোহিত সায় দিয়ে বল্‌লে, তোমার কথা একটুও অবিশ্বাস হচ্ছেনা, যোশী·· কৃপালানিকে যে ভাবে আবিষ্কার কর্‌লুম্‌ আমরা, তাতে আমার মনে হয় আমাদের আশেপাশে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত অনেক কৃপালানি পড়ে আছে যাদের আমরা কোন খবরই রাখিনা বা খোঁজ নেই না!

যোশী বল্‌লে, তাহ'লে ডেক্‌যাত্রীদের আস্তানাটা দেখ্‌তে যাওয়া নেহাৎ ব্যর্থ হয়নি'?

গভীর স্বরে মোহিত জবাব দিলে, পাগল!···

লাঞ্চের পর Sherlock Holmes টা খুলে মোহিত ঈজি-চেয়ারে শুয়ে ঝিমুচ্ছিল। সকালবেলাতেও যে অবসাদ তার তরুণ মনকে পীড়া দিচ্ছিল ত।' আস্তে আস্তে যেন কেটে যাচ্ছিল। বেদনার বিরাট পুঞ্জীভূত একটা ইতিহাস যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তা' বাইবের নানা জিনিষেব সংঘাতে আস্তে আস্তে হাল্‌কা হয়ে আস্‌ছিল—অল্প কয়েকদিনের অতীতকে সরিয়ে দিয়ে অন্তরকমের একটা নিবিড় বর্ত্তমান তার মধ্যে উকিঝুঁকি মার্‌ছিল।... বন্ধুবর যোশী পাশেই বসে ছিল, সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোহিতের মনের লীলা বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল।

যোশী বল্‌লে, ফার্ষ্টক্লাশের দু'একটা জিনিষ কিন্তু আজ সকালে দেখা হ'ল না।

—কী?

—সেখানকাব জিম্‌ন্যাসিয়াম আর সুইমিং বাথ··

জিম্‌ন্যাসিয়ামেব সম্বন্ধে মোহিতের ধারণা খানিকটা ছিল, কল্‌কাতায় কলেজে সে জিম্‌ন্যাসিয়ামে মাঝে মাঝে ডন-বৈঠকও করেছে। ধরে নিলে যে জাহাজের জিম্‌ন্যাসিয়াম্‌ও সেই গোছের একটা জিনিষেরই ছোটখাট সংস্করণ হ'বে।...সুইমিং বাথের সম্বন্ধে কিন্তু তার ধারণার চেয়ে কল্পনাই ছিল বেশী, আমেবিক্যান ফিল্‌ম্‌এর কল্যাণে। কল্পনা যা ছিল তাতে সে খুব উৎসাহিত বোধ করলে না, বল্‌লে, কী হবে আর ঐসব ছাইভস্ম দেখে?···তার চেয়ে না হয় কৃপালানির সাথে একটু গল্প করিগে···বেচাবী একলাটি পড়ে আছে!

যোশী বল্‌লে, সেখানে ত যাবই, তার আগে একটা অছিলায় ফার্ষ্টক্লাশের এই দুটো জিনিষ দেখে নিতে পার্‌লে মন্দ হত না!

মোহিত জানত, সম্মতি আদায় কর্‌তে যোশী সিদ্ধহস্ত। কাজেই সে আর কোন প্রতিবাদ কর্‌লেনা।

চা'এর পর যাবে স্থির হল। মোহিত আবার Sherlock Holmes এ মনোনিবেশ কর্‌লে।

চা'এর ঘণ্টা যখন পড়্‌ল তখন মোহিতের বই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এক নিঃশ্বাসে গল্পগুলো শেষ ক'রে তার মনে ভারী আনন্দ হচ্ছিল—যোশীকে দু'একটা জায়গা সে পড়িয়ে শোনাচ্ছিল। মোহিতের মনের অবস্থা সাধারণ গতিতে ফিরে এসেছে দেখে যোশীও একটু আশ্বস্ত বোধ কর্‌ছিল, এবং ফার্ষ্টক্লাশ ডেকে একবার লীলা রজাস এর

মুখোমুখি হয়ে সে মোহিতের মনের এই প্রকৃতিস্থতাটা দৃঢ় ক'বে তুলবে কিনা ভাবছিল।

চা'এব পর দুপুরবেলাব প্রোগ্রাম মত তারা গেল ফার্ষ্টক্লাশ জিম্‌ন্যাসিয়াম আর সুইমিং বাথ দেখতে। জিম্‌ন্যাসিয়াম ছিল তখন খালি, মোহিত আর যোশী মহা উৎসাহে সেখানকার সাজসরঞ্জাম নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলে।...কলের ঘোড়া দেখে মোহিতের যা' হাসি! বললে, সমুদ্রের বুকে বুঝি এমনি ক'রে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়?

তারপব সুইমিং বাথএর পালা। যোশী বললে, এবাব হয়ত কিছু রঙীন্ জিনিষ চোখে পড়বে।...মোহিত একটু বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করলে।

আসলে কিন্তু সেরকম রঙীন্ কিছুই চোখে পড়ল না। স্নানের পালা আরম্ভ হয় সন্ধ্যার ঠিক আগে, তাই এখনও স্নানার্থী-স্নানার্থিনী বড় কেউ ছিল না। মোহিত আব যোশী কাছেই একটি রেলিংএর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালে।

মোহিত বললে, চল, এবার কৃপালানির কাছে যাই।

যোশী বাধা দিয়ে বললে, আর একটু অপেক্ষা কর... বেশ সুন্দব বাতাস বইছে এখানে...

খানিকক্ষণ পর তারা যখন নীচেব ডেকের দিকে রওনা দিবে এমন সময় পথে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যাব জন্য পরে যোশীর মনস্তাপের অবধিমাত্র ছিলনা।

সুইমিং ডেকের সিঁড়ি দিয়ে দু'জনে নাবছিল, মোহিত আগে আর যোশী পেছনে। এমন সময় তারা দেখলে সিঁড়ির পায়েব কাছে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে—দু'জনেই সুইমিং কষ্টিউম্ পরা। মেয়েটি আব কেউ নয়—শীলা রজার্স। সুইমিং কষ্টিউম্এব উপব একটা বাথ্-গাউন জড়ানো—নিতান্ত বেপরোয়া ভাবে।...কষ্টিউম্এর আঁটসাঁট বাঁধুনীতে তার দেহের প্রত্যেক রেখা যেন ফুটে উঠেছিল অগ্নিশিখার মত...আর তাব হাঁটবার লীলায়িত ভঙ্গীটি মোহিতের মনে তাণ্ডবনৃত্য সুরু করে দিয়েছিল।

সঙ্গের লোকটিকে মোহিত চিনতে পারেনি', কিন্তু যোশী দেখেই চিনেছিল—সে হচ্ছে কর্ণেল গ্রীণ। খুব হাসতে হাসতে কর্ণেল গ্রীণ শীলার পাশাপাশি আসছিলেন।

শীলা আব কর্ণেল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় লক্ষ্য করলে দুটি ছেলে সিঁড়ির আগায় দাঁড়িয়ে আছে—নামবার প্রতীক্ষায়।

মোহিত পলকের জন্য থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যোশী তার বাহুটি ধরে তাকে সিঁড়ির এপাশে টেনে আনলে, আগন্তুক এবং তার সহচরীকে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে।

শীলা মোহিত এবং যোশীকে দেখে মুহূর্ত্তেব জন্য রাঙা হয়ে উঠেছিল...হয়ত বা তাব একবার ইচ্ছা হয়েছিল সাহস-ভরে সত্যকে সম্পূর্ণ ক'রে স্বীকার করে নেয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠবাব আগে তাই সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কর্ণেল গ্রীণ শীলার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা লক্ষ্য করছিলেন। অবস্থাটা যে একটু অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকব হয়ে উঠছে সেটা তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ এড়ায়নি'। ব্যাপাবটাকে সহজ ক'রে নেবার জন্যে তিনি বললেন, দেরী হয়ে যাচ্ছে, মিস্ রজার্স, চট্‌পট্ উঠে পড়ো...

কর্ণেলের কথায় শীলার চেতনা যেন ফিরে এল। দমকা একটা হাওয়ার মত সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে সুইমিং বাথের দিকে ছুটে পালালে।...যোশী বা মোহিতকে একটা সম্ভাষণ করবার সাহস পর্য্যন্ত তার হ'লনা; অশান্ত মন নিয়ে সত্যোজাত ঝরণাব গতিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কর্ণেল গ্রীণ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন। যোশীকে দেখে সান্ধ্য-সম্ভাষণ জানালেন। যোশী অস্ফুটস্বরে তার প্রতি-উত্তর করলে।

মোহিত এতক্ষণ যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কর্ণেল গ্রীণ দৃষ্টির বহির্ভূত হতেই সে দাঁতে দাঁত চেপে শীলাব উদ্দেশে উচ্চারণ করলে, স্বৈরিণি!...

ডেকপ্যাসেঞ্জারদের আস্তানায় যাবাব সিঁড়ির সম্মুখে আসতেই মোহিত হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললে, তুমি একা যাও এখন, যোশী, আমি একটু পরে আসছি।

যোশী বুঝলে মোহিত খানিকক্ষণের জন্যে নিজের মধ্যে আশ্রয় নিতে চায়। সে আর কোন আপত্তি না ক'রে নীচে চলে গেল।

কৃপালানি তাঁর আগের জায়গাটিতে ছিলেন না। তাঁর লোটাকম্বল পুরাণো জায়গায়ই প'ড়ে ছিল, কিন্তু তিনি গিয়েছিলেন জাহাজের সম্মুখভাগে। যোশী তাঁকে অতি সহজেই খুঁজে নিলে।

যোশীকে আস্‌তে দেখে কৃপালানির মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। একটা লোহার নঙ্গরের উপর চাদর ছড়িয়ে বসেছিলেন, যোশীকে দেখে অভ্যর্থনা করে বললেন, আইয়ে বাবুজী···

যোশী বল্‌লে, বেশ জায়গাটি খুঁজে বার ক'রে নিয়েছেন কিন্তু!

হেসে কৃপালানি বল্‌লেন, আমাদের ত সৌখীন আরাম কেদারা আর অর্কেষ্ট্রার গান জুটবেনা, বাবুজী, আমাদের কোন রকমে টি'কে থাক্‌লেই হ'ল! তবে ভগবানের দয়ার কণা থেকে আমরাও বঞ্চিত হইনে···সমুদ্রের জল, ফুরফুরে হাওয়া আর আকাশের গায়ে হোরিখেলার ছবি কারোরই এক চেটে নয় বলে এই জায়গায় বসেও তার আস্বাদ আমরা মাঝে মাঝে পাই।

জায়গাটা মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, এদিক ওদিকে নঙ্গর, লোহার শিকল, দড়িদড়া, অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি প্রভৃতি ছড়ানো...কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেখানে, সেখান্‌কার গভীর নীরবতা ভাঙ্‌তে কোন লোকেরই সমাগম ছিল না। দূরে উপরে ফার্ষ্টক্লাশ ডেক থেকে হাসির লহরী ভেসে আসছিল বাতাসের সাথে।

কৃপালানি একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে বল্‌লেন, ওরা চোখের উপর দূরবীণ লাগিয়ে মেঘ আর জলের বিশ্লেষণ করছে, বাবুজী, আর আমি আমার শাদা চোখ দিয়ে দেখছি ঝাপ্‌সা একটা রেখা। ওদের মনে কৌতূহল আছে প্রচুর, সময়ের দামও ওদের বেশী—আর আমি আমার নিরবচ্ছিন্ন অবসর নিয়ে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটিয়ে চলেছি একটি আকাশ-কুসুমের দিকে তাকিয়ে, বিশ্লেষণ করবার উত্তেজনা আমার মনের ত্রিসীমানায়ও ঠাঁই পাচ্ছেনা।

যোশী চুপ করে শুনছিল···কৃপালানির কথার স্রোতে বাধা দিতে তার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না।

কৃপালানি প্রশ্ন করলেন, তোমার সেই বন্ধুটী কোথায় গেল, বাবুজী?

—ও আমার সাথেই আস্‌ছিল, হঠাৎ কী মনে হওয়ায় থমকে দাঁড়াল, বল্‌লে, একটুখানি পরে আস্‌বে।

একটুখানি চিন্তিতসুরে কৃপালানি বল্‌লেন, ছেলেমানুষী ভাবটা তোমার বন্ধুর মন থেকে এখনও যায়নি বাবুজী!··· ওর সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা উচ্ছ্বাস—এতদিন ছিল তা' রুদ্ধ হয়ে, জাহাজে উঠে বোধ হয় সাগরের বাতাস লেগে তা' উঠেছে ফেনিল হয়ে।···মনের উপর যে কৃত্রিম একটা যবনিকা ছিল সেটা গেছে সরে, তার ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে তার কল্পপ্রবণতা, নয় কি বাবুজী?

যোশী কৃপালানির চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল, বল্‌লে, আপনি কী ভীষণ প্রাজ্ঞ, কৃপালানিজী!

হেসে কৃপালানি বল্‌লেন, পাগল!···আমি কতটুকুই বা দেখিছি বা পড়েছি!...তোমাদের জ্ঞান আমাদের চেয়ে কত বেশী!

গম্ভীরসুরে যোশী বল্‌লে, অমন কথা বল্‌বেন না, কৃপালানিজী!···আমার দুঃখ হচ্ছে শুধু এই ভেবে যে কেন এতদিন আপনাকে খুঁজে বার করিনি'...ক'টা দিন শুধু শুধু নষ্ট হয়ে গেছে!

যোশীর হাতের উপর একটা চাপড় মেরে কৃপালানি বল্‌লেন, তুমিও ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে, বাবুজী!...নতুনের মাধুর্য্য বড় ভয়ানক—সেটা তোমায় পেয়ে বসেছে এখন।

কথাটা আংশিকভাবে হয়ত সত্যি, তবু যোশী প্রতিবাদ করে বল্‌লে, কিন্তু এমন অনেক নতুনত্ব আছে যা' কখনও পুরাণো হয়না!

হেসে কৃপালানি বল্‌লেন, সেটা বিচার করবার সময় এখনও আসেনি', বাবুজী···পুরাণো হবার মুহূর্ত্ত যখন আস্‌বে তখন সেটা পরখ ক'রে দেখো!

কী একটা কথা মনে হওয়ায় যোশী প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, আপনার বয়স কত, কৃপালানিজী?

—আন্দাজ কর; দেখি…

—পঞ্চাশ?

—আমাকে কি ততখানি বুড়ো দেখায়, বাবুজী?

একটুখানি লজ্জিত হয়ে যোশী বললে, না, ঠিক নয়… আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে বোধ হয়, নয় কি?

হেসে কৃপালানি বললেন, হ'লনা, বাবুজী…আমার একটি ধমকেই তুমি কক্ষভ্রষ্ট হয়ে গেলে!…আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি ছাড়িয়ে গেছে…দেশে আমার বড় ছেলে আছে, দোকান করছে, তার বয়সই ত প্রায় পঁয়তাল্লিশ হতে চল্‌ল!

সম্ভ্রম এবং বিস্ময়ভরা চোখে যোশী বললে, আপনি আমায় কক্ষভ্রষ্ট করেছেন বলে আমার একটুও লজ্জা হচ্ছে না, কৃপালানিজী…আমার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ লোককেও আপনি কক্ষচ্যুত করতে পারেন।

এমন সময় হাসিমুখে মোহিত এসে হাজির হল। কৃপালানির দিকে তাকিয়ে বললে, মনটা একটু বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল, কৃপালানিজী, তাই খোলা বাতাসে সেটাকে সুস্থ ক'রে আনলুম…

কৃপালানি সস্নেহদৃষ্টিতে মোহিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার জন্য কেন যেন আমার ভয়ানক ভয় হয়, বাবুজী! তোমাকে দেখলে আমার নাতিটার কথা মনে পড়ে, সে তোমারই বয়সী হবে; কিংবা হয়ত তোমার চেয়ে বছরখানেকের ছোট…তোমার মত অন্যমনস্ক কল্পনাপ্রবণ মন তারও…

মোহিত বললে, জানইত, কৃপালানিজী, এ হচ্ছে বাতাসের দোষ…বাতাস যদি মনকে চঞ্চল ক'রে দেয় তবে আমি আর কী করতে পারি?

তিরস্কারভরা কণ্ঠে কৃপালানি বললেন, এ আমি কখখনই মানতে রাজী নই, বাবুজী…বাতাসত বইবেই, সমুদ্রের দোলা গায়ে এসে ত লাগবেই, তাই বলে কি তাতে মন এলিয়ে দিয়ে থাকাটা খুব সমীচীন?

মোহিতের তর্কের স্পৃহা চেপে উঠেছিল। কৃপালানির মনের স্বচ্ছতা তাকে স্পর্শ করেছিল এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে তর্ক যদি সে করে তবুও কৃপালানির মনের ছড়িয়ে-পড়া আলো তাতে একটুও কমবেনা। বললে, তুমি আগে থেকেই ধরে নিচ্ছ, কৃপালানিজী, যে বাতাস এবং সমুদ্রের এই চঞ্চল-করিয়ে-দেওয়া স্বভাবটা খারাপ, অন্ততঃ কৃত্রিম তাই তুমি উপদেশ দিচ্ছ, সাবধানে চলো!.., আমি যদি সেটা না মানি?

কৃপালানি বললেন, তোমার ইঙ্গিত আমি বুঝতে পারছি, বাবুজী, তোমার কথা যে একেবারে ভুল সেও আমি বলতে পারিনে, কারণ যা' স্বভাবজ তার সাথে আমার ঝগড়া কোনদিনই নেই।…তবু আমার মনে হয় তুমি যখন আকাশ-বাতাসের এই প্রকৃতি থেকে নিজকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছ তখন এই চেষ্টাটাই তোমার স্বভাব, চঞ্চল-হয়ে-যাওয়াটা তোমার স্বভাবের বাইরে!

হেসে মোহিত বললে, কিন্তু এমনও ত' হতে পারে যে আমার স্বভাব হচ্ছে দুটো এবং তাতে সংঘাত লেগেছে আজ!…তাদের সামঞ্জস্য করতে পারছি না বলেই নিজের খেয়াল-মত একটাকে বড় ক'রে আর একটাকে নির্ম্মূল করবার চেষ্টা করছি!

সন্ধ্যার ছায়ায় মোহিত এবং যোশী যখন উপরে নিজেদের ডেকে ফিরে এল তখন মোহিতের মন অনেকখানি প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। সারাটা পথ সে যোশীর সাথে কৃপালানির কথা আলোচনা করছিল…কৃপালানির সাথে পরিচয় তার মর্ম্মের একটা অধ্যায় খুলে দিয়েছিল।…প্রকৃত সাহিত্যিকের অনুভূতি নিয়ে এই অভিজ্ঞতাটুকু সে নানা রংএ রাঙিয়ে দেখছিল…মনে এক অভূতপূর্ব্ব অনুবেদনার সঞ্চার সে উপলব্ধি করতে পাচ্ছিল…

* * * *

সোমবার জাহাজ সুয়েজে যখন পৌঁছল তখন ভোর হয়ে গেছে। এর আগের সোমবারটিতে মোহিত দেশের মাটির কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল—এবার তার বিদায় নিতে হবে শুধু দেশ থেকে নয়, সমস্ত প্রাচ্যভূমির স্নেহ-আলিঙ্গনের বন্ধন থেকে।…অজানা দেশে সে চলেছে,

কতদিনের জন্য কে জানে?…জলে ভাসা অবধি জাহাজের দোলানি থামেনি', উত্থানপতনের বেগ মাঝে মাঝে মন্দীভূত হয়ে এসেছে, কিন্তু স্তব্ধ হয়নি'।

শীলার সাথে এ কয়দিন তার দেখা হয়নি'। সেই যে সেদিন সুইমিংবাথের সিঁড়ির কাছে একটা খণ্ডদৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেল তার পর সে যেন একেবারে চিরদিনের জন্য নেপথ্যে সরে গেল—ভুলেও সে সেকেণ্ডক্লাশের সীমানায় আর পা' দিল না।

যোশীর একএকবার তীব্র ইচ্ছা হচ্ছিল শীলা রজার্স-এর সাথে গিয়ে আলাপ করে, মোহিতের প্রতি তার ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের বেগ কোথায় গেল প্রশ্ন করে। কিন্তু সে যে সেদিন তাদের না চিন্‌বার ভাণ করে সম্ভাষণটুকু পর্য্যন্ত করেনি' তার অপমানবেদনা তার মনে ভীষণভাবে বেজেছিল। তারপর যখন সে দেখ্‌লে মোহিতের বিক্ষুব্ধ মনও শান্ত হয়ে এসেছে তখন সে ভাব্‌লে, যা হয়ে গেছে তা' নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কী লাভ? ক্ষতকে নেড়ে চেড়ে তা' নতুন করে দেওয়ায় ত কোন সার্থকতা নেই!

বিক্ষুব্ধ চিত্ত যদি সত্যি সত্যিই শান্ত হয়ে গিয়ে থাক্‌ত তাহ'লে কোন কথাই ছিলনা, কিন্তু মোহিত নিজেই বুঝ্‌তে পারছিল না তার মন শান্ত হয়ে গেছে কি না। বাইরের সমতাতে ত আর অন্তরের সমতার পরীক্ষা হয়না, আর অন্তরের সমতা বিচার করবার মত শক্তিও যেন সে হারিয়ে ফেলেছিল।…সাগর দোলায় যে ঢেউ ওঠে তা কি শুধু জলের উপরেই খেলে, না তার অভ্যন্তরেও দোলানি লেগে একটা ফল্গুস্রোত বয়?

তবু সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলে যে তার মনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই। তাই যোশী যখন কৃপালানির কাছে প্রস্তাব করলে যে তিনজনে একটা ট্যাক্সিভাড়া ক'রে মিশরের পিরামিড আর Sphynx দেখে না আসাটা ভয়ানক একটা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হবে তখন সে গভীর উৎসাহে তাতে সম্মতি দিলে।

কৃপালানি বল্‌লেন, বাবুজী, আমি মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ তোমাদের বিদ্যা নিয়ে ত' ওসব জিনিষ আমি দেখ্‌ব না, আমি দেখ্‌ব আমার সহজ বুদ্ধি নিয়ে। আমার সাধারণ চোখ দিয়ে দেখ্‌ব একটা সভ্যতার বিকাশ যার আলো বহু শতাব্দী আগে আমাদের দেশের মত অনেক দেশে ফুটে উঠেছিল।…আর তোমাদের সংসর্গ এই বুড়ো বয়সে ভালো লাগে দেখতেই পাচ্ছ…লোভ সামলানো দায়!

সুয়েজ থেকে পোর্ট সেড্ পর্য্যন্ত জাহাজ যেতে ঠিক্ আঠারো ঘণ্টা লাগে। ঠিক হ'লো, যোশী, মোহিত আর কৃপালানি তিনজনে ট্যাক্সি করে যাবে মরুভূমির ভিতর দিয়ে। প্রথম কায়রো সহরটা দেখে সেখানে কোন একটা রেস্তঁরায় লাঞ্চ খেয়ে বিকালের দিকে যাবে পিরামিড্ আর Sphynx দেখ্‌তে…কায়রোর উপকণ্ঠে। সেখান থেকে ট্রেনে করে তারা আস্‌বে পোর্ট সেডে, জাহাজ ধর্‌বে সেখানে।

সুয়েজে জাহাজ ভিড়্‌বার আগেই যোশী ষ্টুয়ার্ডকে গিয়ে তাদের প্রোগ্রাম জানালে। ষ্টুয়ার্ড বল্‌লে, ট্যাক্সি পেতে তাদের কোন অসুবিধা হবেনা, তারা যদি বড় একটা পার্টি করে তাহ'লে মোটরবাস্‌এরও বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

মোহিত প্রশ্ন কর্‌লে, পথে যদি কোন ব্রেক্‌ডাউন্ হয় তাহ'লে কী উপায় হবে? ষ্টুয়ার্ড একটু হাস্‌লে; বল্‌লে, তার উপায় করবে ড্রাইভার…আমাদের জাহাজ নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে পোর্ট সেড্ ছাড়্‌বেই।

মোহিত ক্ষণেকের জন্য একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, ষ্টুয়ার্ড হেসে তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে, ব্রেক্‌ডাউন খুব কচিৎই হয়, আর যদিও বা হয় তার জন্যে কারোর পোর্ট সেডে জাহাজ ধরাটা আটকে থাকেনা।

কৃপালানি কথোপকথনের মর্ম্ম শুনে বল্‌লেন, ব্রেক্‌ডাউন হ'লে কোনই ভয় নেই, বাবুজী…আমি কলকব্জার বিষয় একটুআধটু জানি…আর যদি কপালে মিশরের ভাত লিখে থাকে তাহ'লে না হয় তার স্বাদটুকু নেওয়া যাবে …কী বল?

ট্যাক্সি ক'রে তারা রওনা হ'ল মরুভূমির মধ্য দিয়ে। কৃপালানির কাছে মরুভূমি নতুন জিনিষ কিছুই নয়, রাজপুতানা আর সিন্ধ্‌এ এর খানিকটা আভাষ সে দেখেছে। যোশী আর মোহিত কিন্তু দেখে ভয়ানক পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল।

একটা ছোটখাট ওয়েসিস্‌এর পাশ দিয়ে তারা যখন যাচ্ছে তখন যোশী হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লে, আজ অনেকগুলো দল কিন্তু এপথ দিয়ে যাবে, মোহিত...আমাদের শীলা রজার্স্‌এর সাথে যদি হঠাৎ দেখা হয় তাহ'লে চম্‌কে উঠো না কিন্তু...

তাচ্ছিল্যভরা সুরে মোহিত জবাব দিলে, তুমিও যেমন!... যেন শীলা রজার্স্‌এর ভাবনায় আমার ঘুম হয়না!

কৃপালানি এদের কথোপকথন শুন্‌ছিলেন, একটু ঔৎসুক্যভরা সুরে প্রশ্ন কর্‌লেন, শীলা রজার্স্‌টী কে?

যোশী কিছু বল্‌বার আগেই মোহিত বল্‌লে, একটি মেয়ে, পশ্চিম দেশের type বল্‌লেও চলে... বিদ্যুৎ আছে যথেষ্ট, তার গুণগুলো তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান্‌...

কৃপালানি ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে প্রশ্ন কর্‌লেন, তার মানে?

—মানে আর কিছুই নয়—তিনি বিদ্যুতের মত একটুখানি চমক দেখান মাঝে মাঝে, ভাবেন তাঁর ঝলকে সবাই উদ্ভাসিত হয়ে যাবে!...কিন্তু তাঁর ক্ষণিক ঝলকের ফল হয় এই যে মুহূর্ত্তের আলোর পর সবই হয়ে আসে অন্ধকার। যাঁরা উদ্ভাসিত হন তাঁদের চোখে তাঁর ছবি কতক্ষণ থাকে জানা যায়নি', তবে অনেকের মধ্যে তা' স্থায়ী হয়না একথা আমি শুনেছি!

মোহিতের কথার ঝাঁঝ দেখে যোশী একটু হাসলে। কৃপালানি গম্ভীর ভাবে চুপ করে রইলেন।

কায়রোর দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখে তারা ট্যাক্সিওয়ালাকে বল্‌লে, একটা মিশরীয় কোন রেস্তোঁরায় নিয়ে যেতে। প্রস্তাবটা এল কৃপালানির কাছ থেকে। বল্‌লেন, যে দেশের এত সব প্রাসাদ, দুর্গ আর মস্‌জিদ দেখলুম সেখানকার আহার আর পানীয় কেমন দেখা যাক্‌।

কায়রোর্‌ বাজারের বিসর্পগতি গলিগুলোর মধ্য দিয়া এঁকেবেঁকে typical একটা মিশরীয়-রেস্তোঁরায় গিয়ে তারা উপস্থিত হ'ল। যোশী একটুআধটু ফরাসী জান্‌ত, সে menu বাছ্‌বার ভার নিলে।

বিচিত্র মিশরীয় পোষাকপরিহিত ওয়েটার এসে জানালে যে খাবার তৈরী হ'তে প্রায় আধঘণ্টা দেরী হবে।

যোশী ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, এরাও কি আমাদের দেশেরই মত? সামান্য খাবার তৈরী হতে লাগ্‌বে একযুগ?

কৃপালানি সান্ত্বনার সুরে বল্‌লেন, রাগ করোনা, বাবুজী, পূর্ব-দেশের আব্‌হাওয়ার শেষ ত এখানেই, সেটুকু না হয় প্রসন্ন মনে মেনে নাও!,, তারপর যখন উদ্দাম গতির ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়্‌বে তখন এই আলস্যভরা গতিহীনতার অভাব অনুভব ক'রে হয়ত মনে দুঃখও পাবে!

মোহিত বাইরে জনপ্রবাহ এবং তার কোলাহল লক্ষ্য করছিল। খাবার তৈরী হ'তে দেরী হ'বে শুনে সে প্রস্তাব কর্‌লে যে ইতিমধ্যে মিশরের বাজারের মধ্যে একবার ঘুরে আসা যেতে পারে।...তারপর একটুখানি আরক্ত মুখে সে বল্‌লে, তাছাড়া এদের মেয়েদের বিচিত্র অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কালো চোখের যা' চাউনী দেখ্‌ছি তাতে আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে সেটা আমি অসঙ্কোচে স্বীকার করছি।

যোশী আর কৃপালানি কিন্তু তখনই সেখান থেকে উঠ্‌তে রাজী হ'লনা। বল্‌লে, মিশরসুন্দরীদের কটাক্ষ আর মিশরসুন্দরদের বাজার ত এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে না; ফেরবার পথে সে সব ভালো করে দেখা যাবে!

মোহিতের চুপ করে বসে থাক্‌তে ইচ্ছা করছিল না। সে কিছুক্ষণ পরে উঠে বল্‌লে, আমি একটু ঘুরে আসি যোশী...আধঘণ্টা শেষ হবার আগেই ফিরে আস্‌ব অবশ্যি!

যোশী এবং কৃপালানি বল্‌লে, দেখো, পথ হারিয়ে যেয়োনা কিন্তু...এখানকার সুন্দরীদের ছেলে ভুলাবার সুনাম আছে, মোহিত...

মোহিত হেসে বল্‌লে, যদি পথ হারিয়েই যাই তাহ'লে পিরামিডের মরুর সম্মুখে দেখা হবে অবশ্যই!

কথাটা সে বলেছিল উপহাসের সুরেই...সেটা যে সত্যি সত্যি ঘটবে তা' সে ভাবেনি'।

রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে মোহিত সোজা বাঁ-দিকে চলে গেল। খানিক দূরে গিয়েই প্রকাণ্ড বাজার, তার গোলক-

ধাঁধার মধ্যে সোজা ঢুকে পড়লে সে, কোন রকম অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই !

একটা দোকানের সো' কেস্এর বাইরে সে মিশরের গৃহশিল্পের অর্ঘ্যসম্ভার মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করছিল এমন সময় ভেতর হতে একজন লোক এসে পরিষ্কার ইংরেজীতে তাকে বললে, দয়া করে একবার ভেতরে আসবেন কি?... আপনার ভালো-লাগ্‌তে-পারে এমন দু' একটা জিনিষ আপনাকে দেখাতে পারি···

প্রথমে মোহিত ভাব্‌লে যে দোকানের ভেতর ঢুকলেই অসম্ভব রকম দেরী হ'য়ে যাবে, ওদিকে রেস্তঁরায় হয়ত খাবার সম্মুখে নিয়ে যোশী আর কৃপালানি বসে থাক্‌বে। কিন্তু কতকটা নিজের কৌতূহলে, কতকটা দোকানদারের আগ্রহে সে ভেতরে ঢুকে গেল।

দোকানিত ছোটখাট নানা জিনিষ তার সম্মুখে খুলে ধর্‌লে। মোহিত প্রশংসমান চোখে সে সব পরীক্ষা করছিল এবং মনে মনে ভাব্‌ছিল স্যুভেনিয়র্ স্বরূপ ছোট একটা কিছু কিনে নিয়ে যাবে কিনা, এমন সময় সে ভয়ানক ভাবে চম্‌কে উঠ্‌লে তার বাঁ-পাশে একটি মেয়ে কণ্ঠে অভিনন্দন শুনে···কেমন আছ, মোহিত?

পাশ ফিরে দেখ্‌লে, শীলা রজার্স···একা···

মুহূর্ত্তের মধ্যে মোহিতের মনের এতদিনকার রুদ্ধ আবেগ হাল্‌কা হয়ে গেল—আর-সমস্ত কিছু সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্ত্তমান ওর মর্ম্মের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার ফুটিয়ে তুললে। একটা অস্বাভাবিক এবং অসাময়িক ঘুম থেকে যেন সে জেগে উঠ্‌লে···নিজের মনের মুখোমুখি হয়ে সে দাঁড়ালো।

কী যে বল্‌বে মোহিত প্রথমে ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌লে না। শীলা বোধ হয় তার মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই প্রথম প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা আর না করে সে আবার প্রশ্ন করলে, স্যুভেনিয়রের খোঁজে আছ বুঝি?

এবার মোহিত কথা বল্‌বার মত ভাষা খুঁজে পেলে, অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ···এতগুলো জিনিষ সম্মুখে ফেলে দিয়েছে, এর কোন্‌টা যে নেব ঠিক করতে পার্‌ছিনা···

শীলা ডানদিকে একটু ঝুঁকে জিনিষগুলো গভীর উৎসাহের সহিত পরীক্ষা কর্‌তে আরম্ভ করলে।·· সিগারেটের নল, সিগারেটের কেস্, কলম, ছুরী, প্রবালের এবং কাচের মালা, পাউডার-বক্স, আয়না, মেয়েদের ভ্যানিটি-ব্যাগ, রং-বেরং এর পাথরের cube, টাই, মোজা—অসংখ্য এবং অগুণ্তি, সবগুলোর মধ্যেই মিশরের কোন বিশেষ ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক ছাপ··

শীলা হেসে বললে, আমার পছন্দ কি তোমার মনে ধর্‌বে?

—কেন ধর্‌বে না?

—তাহ'লে এইটি নাও।··ব'লে সে ফ্রেমে বাঁধানো ছোট্ট একটি পিরামিড আর sphynxএর ছবি তুলে ধর্‌লে।···মিশরীয় এক আর্টিষ্ট্‌এর আঁকা, মরুভূমির আকাশ হয়ে এসেছে কালো, বাতাসে ধরেছে গুমোট্··যেন প্রলয়ের আবাহন· আর তারি মাঝখানে sphynxএর ভ্রূকুটি-কুটিল মূর্ত্তি পথ আগ্‌লে বসে আছে বিশ্বস্ত প্রতিহারীর মত··· মিশর-সম্রাটদের সমাধিগুলো আগ্‌লে!

ছবিটি মোহিতের খুবই পছন্দ হ'ল। সে দাম জিজ্ঞেস্ কর্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় শীলা তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, এবার তোমার পালা, মোহিত···তুমি আমার জন্যে একটা স্যুভেনিয়র্ বেছে দেও দেখি···

মোহিত ভয়ানক মুস্কিলে পড়্‌লে, বল্‌লে, কিন্তু তোমার কোন্‌টা পছন্দ-অপছন্দ হ'বে তা' যে আমি জানিনে···

যেন ভয়ানক ছেলেমানুষের মত মোহিত প্রতিবাদটা করেছে এম্‌নি একটা ভাব দেখিয়ে শীলা বললে, বাঃ রে!··· আমি তোমার স্যুভেনিয়র্ পছন্দ করলুম কী ক'রে?

সত্যিই ত! এর জবাব দিবার কিছু মোহিতের ছিল না। সে নতশিরে জিনিষগুলো নাড়াচাড়া করে একটু-খানি ইতস্ততঃ ক'রে ছোট্ট একটা পাউডার-বক্স এগিয়ে ধর্‌লে। তার ঢাক্‌নার উপর প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছবি-ওয়ালা ভাষায় লেখা ছুটো লাইন, আর নাইল্ নদের ছবি—সবটা এনামেলের কাজ করা।

শীলা প্রস্তাব কর্‌লে যে মোহিতের ছবিটির দাম দিবে সে, আর মোহিত দেবে তার পাউডার-বক্সটির দাম। মোহিত তার প্রস্তাবে অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলে, কেন?

—একটুখানি খুসীর কাছে আত্মসমর্পণ-এ…

মোহিত আর কোন আপত্তি করলে না।

দাম চুকিয়ে দিয়ে দু'জনে দোকান থেকে বেরিয়ে যখন এল তখন মোহিতের মনে পড়ল যোশী আর কৃপালানি তার অপেক্ষায় হয়ত রেস্তঁরায় বসে আছে। তাড়াতাড়ি ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলে দোকানের হাওয়ায় এবং শীলার সংসর্গে কখন যে একটি ঘণ্টা কেটে গেছে সে টেরও পায়নি'।

শশব্যস্তে সে বললে, আমায় এখখুনি যেতে হবে, শীলা, যোশী আর আর একটি বন্ধু আমার জন্যে এক রেস্তঁরায় বসে আছে…

শীলা বললে, রেস্তঁরায়? কোথায় সেটা?

—এই বাজারের বাইরেই—একটা মিশরীয় রেস্তঁরা…

—বাজারের বাইরেই ত? একটা জুয়েলারের দোকানের পাশে? আমার ট্যাক্সিও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, চল…

—তুমিও কি সেখানেই যাচ্ছ, শীলা?

—হ্যাঁ, তোমার আপত্তি নেই ত?

মোহিত একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, না, না, আপত্তির কথা বলছিনা…তোমার সঙ্গীসাথীরা সব কোথায়?

ভারী চমৎকার একটি হাসি হেসে শীলা জবাব দিলে, আজ আমি সঙ্গীসাথীর বন্ধন এড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছি, মোহিত …মরুভূমির মাঝ থেকে একটি সহচর খুঁজে নিতে, বেদুইন বা fellahin যেই হোক্ সে…

বাজারের গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে শীলা রজার্স যখন তাকে জুয়েলারের দোকানের পাশে এক মিশরীয় রেস্তঁরার সামনে এনে হাজির করলে তখন মোহিত দেখলে যোশী আর কৃপালানি যেখানে ছিল এ সে নয়।…কায়রোর বাজারের সামনে জুয়েলারের দোকানের পাশে যে এত মিশরীয় রেস্তঁরা রয়েছে তা' কে জানত?

সে শীলাকে জানালে যে সে ভুল জায়গায় এসেছে।

—তাই ত, এখন কী করা যায়?

ট্যাক্সিওয়ালাকে মোহিত প্রশ্ন করলে। ট্যাক্সিওয়ালা বললে বাজারের আশেপাশে এরকম অন্ততঃ পঞ্চাশটা রেস্তঁরা আছে, রাস্তার নাম না জানলে খুঁজে বার করা মুস্কিল।

মোহিত রাস্তার নাম মুখস্থ করে রাখেনি', সে অসহায় ভাবে শীলা রজার্সের দিকে তাকালে। শীলা চিন্তিতস্বরে বললে, আমারই অন্যায় হয়ে গেল, মোহিত…তোমার বন্ধুরা ভাববেন কী?

মোহিত বললে, এস, একটু খোঁজা যাক্, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে তাহ'লে দেখা মিলেও যেতে পারে ত!

ট্যাক্সিওয়ালা তাদের নির্দ্দেশমত এদিক ওদিক প্রায় আধঘণ্টাখানেক ঘুরলে, কিন্তু মোহিতের পরিচিত রেস্তঁরার সন্ধান আর মিলল না। ঘুণাক্ষরেও মোহিতের মনেই হ'লনা যে তারা খুঁজছে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে, যোশী আর কৃপালানি বসে আছে বাজারের অপর সীমান্তে।

শীলা বললে, তাহ'লে কী করবে, মোহিত?

মোহিত বর্ত্তমানের স্রোতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ক'রে বললে, কী আর করব?…ওরা ত পিরামিড্ দেখতে যাচ্ছেই…আমিও একটা ট্যাক্সি নিয়ে সেখানে চলে যাই—দেখা সেখানে নিশ্চয় মিলবে…

শীলা একটুখানি সঙ্কোচের সহিত বললে, আমার সাথে আসতে তোমার আপত্তি আছে, মোহিত? আমিও ত সেখানে যাব…

একটুখানি ভেবে মোহিত বললে, আপত্তি থাকলেও আপত্তি করবনা, শীলা। যার উপর হাত নেই সেই ভবিতব্য বলে পদার্থটা যখন আমায় এমন ঘোরাচ্ছে তখন তার সাথে সন্ধি করাই ভালো…

শীলা প্রস্তাব করলে, তাহ'লে কোথাও খেয়ে নেই, কী বল?…তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়…

—খিদে ত বেশ পেয়েছে, শীলা, তবে খুব বেশী দেরী করা উচিত হবেনা, ওদের সাথে দেখা হওয়া চাইই কিন্তু …নইলে বিষম একটা গোলমাল হয়ে যাবে!

—বেশী দেরী হবেনা, মোহিত। আর, তোমার বন্ধুরা কি রোদটা একটু না পড়লে সেই মরুভূমির মাঝখানে—

যাবেন ?···শুনেছি সেখানে আশে পাশে এক বিন্দুও জল নাকি নেই, সব ওয়েসিস্ শুকিয়ে গেছে বালুর ঝড়ে...

কথাটা সঙ্গত। পোর্ট সেড়ে পৌঁছ্‌বার ট্রেন ত' ছাড়্‌বে সন্ধ্যায়...এত শীগ্‌গীর ক'রে তারা নিশ্চয়ই পিরামিড্ দেখ্‌তে যাবেনা···হয়ত বা বাজারের মধ্যে তার জন্যে একটু ঘোরাফেরাও করবে।

রেস্তঁরায় বসে মোহিত অবাক্ হয়ে ভাবছিল কী ক'রে এমন আচম্‌কা দেখার পরও তার আর শীলার কথাবার্ত্তা এত সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে এল। যেন কিছুই হয়নি'... দুজন বন্ধু যেন অপরিচিত কোলাহলের মাঝখানে পরস্পরের সুর চিন্‌তে পেরে নিজেদের নিগূঢ় বন্ধনটি নিবিড় করে নিয়েছে।

হঠাৎ শীলা রজার্স প্রশ্ন করলে, তুমি আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছিলে মোহিত, নয় কি ?

স্বপ্নোত্থিতের মত তন্দ্রাজড়িতসুরে মোহিত বল্‌লে, ভয়ানক করেছিলুম কি না বল্‌তে পারিনা, শীলা, তবে একটু করেছিলুম···এবং সেটা বোধ হয় রাগ নয়—বেদনা-মেশানো অভিমান···

খুবই খোলাখুলিভাবে মোহিত নিজের মনটি শীলার সম্মুখে তুলে ধরলে। এরকম ক'রে তুলে ধরতে আর কেউই বোধ হয় পারতনা, অন্ততঃ সাহস হতনা অনেকেরই।···শীলা গভীরসুরে বল্‌লে, অভিমান কখন হয়, জানো ?

—জানি···

ছোট্ট একটি উত্তর। এর মধ্যে না আছে উচ্ছ্বাস, না আছে দীপ্তি। কিন্তু অনুভূতির গভীরতার রঙীন্ আলোয় ছোট্ট কথাটি ঠিক্‌রে যেন স্নেহ ঝরে পড়্‌ছিল।

শীলা তার সদ্য-কেনা পাউডার-বক্সটি নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে, তোমার এই উপহারটি আমার কাছে চির-অমূল্য হয়ে থাকবে, মোহিত...

মোহিত কোন জবাব দিলে না।

শীলা বল্‌তে লাগ্‌লে, জানি তুমি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভেবেছ। সেসব প্রতিবাদ কর্‌বার মত শক্তি বা সাহস আমার নেই।···তবে একটি অনুরোধ, সেসব আজকের কয়েকটি ঘণ্টার মত ভুলে যাও...হঠাৎ-পাওয়া এমন অবসরটুকু নির্ম্মল এবং ক্লেদহীন করে তোলো।

মোহিত বল্‌লে, তোমার উপর খানিকটা শ্রদ্ধা এবং প্রীতি যদি অটুট না থাক্‌ত, শীলা, তবে অভিমানের রেখাটুকু পর্য্যন্ত আমার মনে স্থান পেতনা, এটা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

শীলার মুখ দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল।

লাঞ্চের পর ট্যাক্সি করে তারা পিরামিড্ অভিমুখে রওনা হ'ল। ট্যাক্সিওয়ালা তাদের নির্দ্দেশমত নাইলের পাশ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেল। নয়নাভিরাম ঘনসবুজ গাছের শ্রেণী দুধারে, পাশে নাইলের স্রোত বয়ে চলেছে।

শীলা মুগ্ধভাবে বল্‌লে, কী সুন্দর !

মোহিত বল্‌লে, এদেশের লোকে নাইল্‌কে দেবতার মত পূজো করে—এর জল হচ্ছে চাষীদের প্রাণ, এর গভীরতা হচ্ছে বাণিজ্যের সম্ভাব···

ট্যাক্সি নাইলের উপর বিশাল ব্রিজ্ অতিক্রম করে চল্‌ল পিরামিডের দিকে—মরুভূমির পথে। মোহিত বল্‌লে, বেজায় গরম লাগ্‌ছে, না ?

—হ্যাঁ ··এদেশে যদি এই নাইল না থাক্‌ত তাহ'লে এদের কী অবস্থা হত !

মরুভূমির মধ্য দিয়ে ট্যাক্সি চলেছে। হটাৎ ট্যাক্সিওয়ালা বলে উঠ্‌লে, ঐ দেখুন, বাঁ-দিকে একটা জলের রেখা বলে মনে হচ্ছে, ওখানে আসলে কিন্তু বালু···ও হচ্ছে mirage !

Mirage !...মরীচিকা !—ছেলেবেলায় ভূগোলে এর সংজ্ঞা পড়েছে, কল্পনার চোখে তখন কত কী ছবিই না এঁকেছে !···এই সেই !

শীলা প্রশ্ন করলে, সত্যিই ওখানে জল নেই, মোহিত ?··· আমি যে দিব্যি দেখ্‌তে পাচ্ছি জলের উপর ঢেউএর রেখা !

মোহিত হেসে বল্‌লে, তোমার দিব্যচক্ষুও যে নির্ভুল নয় তার প্রমাণ হচ্ছে এখানেই...

—তুমি আমায় খোঁচা দিতে পার্‌লে খুব খুসী হও, না মোহিত?...শীলা মোহিতের দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্নটি কর্‌লে।

মোহিত একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বল্‌লে, এই দেখত—আবার অভিমান হ'ল!...যাই বল, শীলা, তোমাদের মনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভার।

মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত ক'রে তার হাতের পকেট গাইড-বুকটা মোহিতের কোলের উপর ফেলে দিয়ে শীলা বল্‌লে, এখনও বল্‌বে অভিমান করেছি?

ট্যাক্সি যখন পিরামিডের সম্মুখে রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন একপাল গাইড্ শীলা আর মোহিতকে ছেঁকে ধর্‌লে। শীলা আর মোহিত গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে তাদের এড়িয়ে এগিয়ে চল্‌লে—যেন তাদের ভাষা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছেনা! একটা গাইড কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইট্যালীয়ান, ডাচ্, স্প্যানিশ্, অ্যারেবিক্ সব ক'টা ভাষায় প্রশ্ন করেও যখন কোন জবাব পেলেনা তখন তার শেষ অস্ত্র ছাড়্‌লে মুখ এবং হাতের ভঙ্গী দিয়ে ভাবপ্রকাশ।...মোহিত ভয়ানকভাবে খুসী হয়ে লোকটাকে বক্‌শিস্ দিয়ে বিদায় কর্‌লে, বল্‌লে, এর পরও যদি আমরা বলি যে ওর ভাষা বুঝ্‌তে পারিনি' তাহ'লে ভয়ানক ভণ্ডামি করা হবে!

রোদ যদিও তখন পড়ে এসেছে তবু মরুভূমির বালু একেবারে তেতে রয়েছে কিন্তু পিরামিড্ দেখ্‌বার উৎসাহ দু'জনেরই এত প্রবল যে সব অগ্রাহ্য করে তারা এগিয়ে গেল।

Sphynxএর সম্মুখে এসে শীলা মুগ্ধনেত্রে দাঁড়িয়ে রইলে।

মোহিত বল্‌লে, এই যে Sphynx দেখ্‌ছ এ হচ্ছে এখানকার প্রহরী...শান্তিসুপ্ত আত্মাদের বিশ্রামে যাতে কেউ বিঘ্ন না ঘটায় তারই জন্ম এর স্থাপনা...

শীলা প্রশ্ন কর্‌লে, তুমি এসব বিশ্বাস কর, মোহিত?

—আমি যে দেশের মানুষ, শীলা, সেদেশে লোকে এরকম অনেক জিনিষই বিশ্বাস করে...

—আমি লোকের কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিনা, মোহিত, তোমার কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি...

—বিশ্বাস করি কি না জানিনে, তবে যারা সত্যি বিশ্বাস করে তাদের অন্তরের গভীরতার কাছে আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে আমি একটুও ইতস্ততঃ করিনে'।

বড় পিরামিডের সম্মুখে এসে মোহিত প্রস্তাব কর্‌লে যে সে ভেতরে ঢুকবে—তার অভ্যন্তরে রাজা এবং রাণীর ঘরগুলো দেখে আস্‌বে...

—উঠ্‌বার পথ আছে, মোহিত?

—গাইড্‌বুক ত বল্‌ছে, আছে...তবে একটুখানি কষ্ট হবে তোমার...

—তুমি যাচ্ছ ত?

—হ্যাঁ...

—তাহ'লে আমিও যাব! তুমি কি মনে কর আমার সাহস তোমার চেয়ে কম? তা'ছাড়া দরকার হ'লে তুমি সাহায্য কর্‌তে পার্‌বে ত?

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির উপর দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি কাট্‌তে কাট্‌তে উভয়ে রাজা এবং রাণীর ঘর দুটিতে প্রবেশ কর্‌লে। মোহিত শীলার হাত ধরে তাকে প্রায় টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে উঠ্‌লে। ঘরে এসে শীলা নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, মাগো! কী যে সখ তোমার!

স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে ভরা ঘর।... কবে কত সহস্র বর্ষ আগে মানুষ তৈরী করে রেখে গিয়েছে—দেয়ালের গায়ে তার রেখা এখনও বর্ত্তমান!...মোহিত বল্‌লে, জানো, এই ঘর যখন প্রথম আবিষ্কার হ'ল তখন এর মেঝেতে লোকে ছয় হাজার বছর আগেকার পায়ের দাগ দেখ্‌তে পেয়েছিল—আর তা' দেখে প্রথম আবিষ্কারক আনন্দে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন!

—সত্যি?...শীলা বল্‌লে।

তার মন কিন্তু তখন মোহিতের কথার দিকে ছিলনা। মনের দুঃসহ আবেগ ফেটে বেরিয়ে পড়্‌তে চাচ্ছিল সহস্র-ধারায়...আজ সমস্ত পৃথিবীর বাইরে এই অর্দ্ধআলোকিত

কক্ষাভ্যন্তরে যেন সে দেখ্‌তে পাচ্ছিল নিজের আসল ছবিটি। তার সমস্ত সত্তা লুপ্ত হয়ে যেন একটি অনুবেদনার শিখায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, এ যেন এক নতুন আবস্ত, এর শেষ যে কোনদিন আস্‌বে তা' তার চিন্তার গণ্ডীরেখার মধ্যে আস্‌ছিল না।

শীলা বল্‌লে, আজ যদি তোমার সাথে এমন আচম্‌কা দেখা না হ'ত, মোহিত, তাহ'লে তুমি আমার সম্বন্ধে কত বিশ্রী ধারণাই না পোষণ করতে!

সহানুভূতিভরা কণ্ঠে মোহিত জবাব দিলে, আমার তা' মনে হয়না, শীলা···তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু খারাপ ভাব্‌বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেসব ধারণা মরীচিকার মতই গেছে মিলিয়ে।...কী জানি কেন, পেছনের অন্ধকারের উপর আলোর ছবিটাই জ্বলে উঠেছে তীব্রভাবে ··

খুব মৃদুকণ্ঠে শীলা বল্‌লে, সে তোমার মহানুভবতা, মোহিত···

একটুখানি ইতস্ততঃ ক'রে গভীর স্নেহভরে শীলার হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তাতে একটুখানি চাপ দিয়ে মোহিত বল্‌লে, আমার মহানুভবতা নয়, শীলা··· তোমার প্রাণের তরঙ্গধ্বনি এর জন্যে দায়ী ··এর উত্থান-পতনের মধ্যে কী রহস্য লুকানো রয়েছে তা' আমি জানিনা, তবে তার যে ছন্দটুকু কানে শুনতে পাই মাঝে মাঝে—···

বাধাদিয়ে হঠাৎ শীলা প্রশ্ন করলে, আমরা ত এখন সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে নই, মোহিত, নয় কি?

—না···

তুমি কি মনে কর যে আমাদের মনের এই জানাজানিটুকু সম্ভব হয়েছে এই সাগরদোলায় শুধু, মোহিত?···না, এছাড়াও বড় সত্য এর পেছনে আছে?

একটুখানি চিন্তিতসুরে মোহিত বল্‌লে, ভেবে দেখিনি', শীলা···এর জবাব দেব পরে...

শীলা আর কিছু বল্‌লেনা, ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলে।

বাইরে এসে মোহিত বল্‌লে, তাইত, যোশীদের দেখা যে পেলাম না! কী করি বলত, শীলা!

—ওরা কি তাহ'লে পিরামিড্‌ দেখ্‌তে আসেনি'?

—আসাত' উচিত ছিল। এত শীগ্‌গীরই দেখে চলে গেল, না আমারই খোঁজে কোথাও গিয়েছে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা যে!

পিরামিডের নিকটেই ছোট্ট একটি কফেতে বসে তারা লেবুর রস খাচ্ছিল এমন সময় মোহিত প্রশ্ন করলে, আজ তুমি হঠাৎ একা চলে এলে কেন, শীলা?

একটুখানি দুষ্টামিভরা হাসি হেসে শীলা বল্‌লে, তোমার খোঁজে···

—না, সত্যি, ঠাট্টা নয়...বলনা···

—সত্যি বল্‌ব?

—বল···

—কেন যেন আজ সকাল থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে একটু মুক্তির হাওয়া আমার পক্ষে ভয়ানকভাবে দরকার। মিস্‌ হিল আর কর্ণেল গ্রীণএর সংসর্গে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, মোহিত।···ওরা যেন ঘন অন্ধকারের প্রতীক, আমার মনের নানারংএর পাপ্‌ড়ীগুলো ওদের ছায়ায় বদ্ধ হয়ে আস্‌ছিল এবং রুদ্ধ আবেগে সেগুলো যেন গুমরে গুমরে উঠ্‌ছিল।···তুমি আমার অবস্থাটা বিবেচনা করে আমায় ক্ষমা করো, মোহিত···

আর্দ্রকণ্ঠে মোহিত বল্‌লে, তোমাকে ত' আগেই বলেছি, শীলা, তোমার উপর হয়েছিল আমার অভিমান। সেটা কেন হয়েছিল তুমি জানো এবং তা' হতে পার্‌তনা যদি তোমার সম্বন্ধে আমার মনের কোণে একটু ছাপ না থাক্‌ত।···সে অভিমান অনেকক্ষণ কেটে গেছে—মনের সব ফাঁক এখন সুগভীর এক আনন্দে ভরে উঠ্‌ছে।

শীলা প্রশ্ন করলে, সেদিন যখন তোমায় না চিন্‌বার ভাণ করে চলে গিয়েছিলুম তখন তুমি খুব রাগ করেছিলে, না?

—রাগ বিশেষ হয়নি, শীলা, হয়েছিল একটু ব্যথা।··· একটা মূর্ত্তিকে যদি বহু অনুষ্ঠান দিয়ে গড়ে তোল্‌বার পর হঠাৎ টের পাওয়া যায় যে সেটা শুধু পাথরের, তার মধ্যে প্রাণ নেই, তখন মনে লাগে বিষম একটা ধাক্কা···শিল্পীর চোখ দিয়েও দু'এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

—তুমি চোখের জলও ফেলেছিলে, মোহিত?

—একটুখানি···

স্তব্ধবিস্ময়ে শীলা চুপ করে রইলে। সে ভাব্‌তেও পারেনি' যে তার কল্পনার অন্তরালে মোহিত তাকে এতখানি ভালোবেসেছে। অথচ, মোহিতের স্বভাবই এই যে সহজে সে তার মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করে বলে না—নিজেকে নিয়ে নিজের সাথেই খেলা করতে ভালোবাসে বেশী···

মোহিত বল্‌লে, এবার আমাদের উঠ্‌তে হবে, শীলা, নইলে ট্রেন ফেল করব কিন্তু···

কায়রো ষ্টেশনে গিয়ে দু'জনে একটা সেকেণ্ডক্লাশ কামরায় উঠ্‌তে যাবে এমন সময় সাম্‌নের এক গাড়ী থেকে যোশী তাদের ডাক্‌লে। মোহিত এগিয়ে যেতেই যোশী হেসে বল্‌লে, বেশ যা' হোক্‌!···মিস্‌ রজার্স'এর মোহিনীশক্তি আছে তা' না হয় মান্‌লুম, কিন্তু তাই বলে কি ক্ষুধিত বন্ধুদের অমন করে রেস্তোঁরায় ফেলে পালিয়ে যেতে হয়?

ভয়ানক ভাবে লজ্জিত হয়ে মোহিত বল্‌লে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, যোশী···কিন্তু মিস্‌ রজার্স'এর সাথে আমার আচম্‌কা দেখা হয়ে যাওয়াতেই এই গোলমাল হয়েছে।

শীলা মোহিতের কথায় সায় দিয়ে বল্‌লে, ওর কোনই দোষ নেই, যোশী, সুভেনিয়র্‌ কিন্‌তে গিয়ে আমিই ওকে আটকে রাখি, তারপর পথ ভুলে যাওয়ায় তোমাদের খুঁজে বার করতে আমরা পারিনি'।

ব'লে সে সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ বল্‌লে।

যোশী বল্‌লে, এবারকার মত তোমাদের মাপ করছি, মিস্‌ রজার্স আর মোহিত, কিন্তু ভবিষ্যতে এত সহজে ক্ষমা মিল্‌বেনা তা' বলে রাখ্‌ছি।

মোহিত এবার প্রশ্ন করলে, আমায় খুব খুঁজেছিলে কি, যোশী?

—আমাদের সৌভাগ্য যে বেশী খুঁজতে হয়নি'। জানতুম বাজারে গিয়েছ—সেখানে একটা দোকানের বাইরে উঁকিঝুঁকি মারছি এমন সময় একটি ছোক্‌রা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলে আমরা কিছু কিন্‌তে চাই কিনা।···আমরা বল্‌লুম আমরা এক বন্ধুর খোঁজ করছি।···রংটা ত দেখ্‌ছ, ভুল করবার জো নেই···ছোকরাটি বলে উঠ্‌ল, ওঃ, আপনার বন্ধু? তিনিত খানিকক্ষণ আগে এখান থেকে জিনিষ নিয়ে গেছেন, তিনি থাক্‌তে থাক্‌তেই আরেকজন মহিলা এলেন, তাঁর সাথে বেরিয়ে গেলেন।···আমরা তখন আঁচ করে নিলুম ব্যাপারটা কী। তোমার সন্ধানে ঘোরা তখন আলেয়ার পেছনে ছোটার চেয়েও বেশী অনিশ্চিত মনে করে সোজা চলে গেলুম পিরামিড্‌ আর sphynx দেখ্‌তে।

—ওঃ, তাই আমরা তোমাদের দেখা পাইনি সেখানে!··· আমরা গিয়েছিলুম চারটের ওপরে···

কৃপালানি এতক্ষণ গাড়ীর কামরার ভেতরে বসে এদের কথোপকথন শুন্‌ছিলেন। এবার মুখটা জানালার কাছে এনে বল্‌লেন, বাবুজী, অনাদিকালের এই সব রহস্যভরা লুকোচুরির সাথে আমাদেরও কিছু পরিচয় আছে···তাই আমরা নিশ্চিন্ত মনে এখানে বসে আছি আপনাদের প্রতীক্ষায়···

শীলা আরক্তমুখে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। মোহিত তাকে ডেকে কৃপালানির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে। বল্‌লে, এর মুখের কথাগুলো হ'ল পাহারওয়ালার চোরধরা বুষ-চক্ষু লণ্ঠনের মত—ঘাব্‌ড়ে যেয়োনা কিন্তু...

শীলা হাসিমুখে কৃপালানিকে অভিবাদন করলে। কৃপালানি তার প্রতি-অভিবাদন করে তাঁর ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বল্‌লেন, বাবুজীর কথায় বিশ্বাস করবেন না আপনি; আমি বুড়োসুড়ো মানুষ, অহিংস্র এবং নিতান্ত নির্জ্জীব চেহারা আমার···

শীলা একটু হাস্‌লে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবগোপাল দাস

স্ত্রীরত্নং

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

সেশনস্ কোর্ট হইতে বাহির হইয়া ব্যারিষ্টার হিমাংশু সেন একটা সিগার ধরাইলেন।

অনেকক্ষণ মৌতাত বন্ধ।

সস্তেবোটা মোহবের প্রলোভন কম না হইতে পারে তবু এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া একাদিক্রমে জেরার পরিশ্রম, তার উপর চুরোট না ধরাইতে পারা—ইহার চিন্তাও কষ্টকর।

তাঁহার পিছনেই সার্জেণ্ট প্রকাণ্ড দরজাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

ওভার-ব্রীজ পার হইয়া উকিলদের কামরা পার হইয়া, রেজিষ্ট্রারের কোর্ট পার হইয়া, হাইকোর্টের লম্বা করিডোর ধরিয়া তিনি চলিলেন, জুতার মাপকরা খটাখট্ শব্দ, হাওয়ায় উড়িয়া যাওয়া গাউনের প্রান্ত, মোটা বর্ম্মা সিগারের ধূমের অন্তরালে তাঁহার চশমা-শোভিত Clean-shaved মুখমণ্ডল—পশারওয়ালা এড্‌ভোকেটের সমস্ত মর্য্যাদা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল।

এখানে ওখানে মক্কেলদল পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

বার লাইব্রেরীর সামনে যাহারা চা বানাইতেছিল তাহারাও একটু সরিয়া দাঁড়াইল—এইচ্ সি সেনকে কে না চেনে ?

ওরিজিন্যাল সাইডের একটা কোর্টে তাঁহার কেস আছে।

কোর্টরুমে ঢুকিয়া দেখিলেন সামনের দুইসার চেয়ার সমস্ত ভর্ত্তি, তিনি আগাইয়া যাইতেই একজন জুনিয়ার জায়গা ছাড়িয়া দিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

সেদিনের রোজগার, প্রায় হাজার টাকার নোট, প্যাণ্টের পকেটে গুঁজিয়া এড্‌ভোকেট এইচ সি সেন বারান্দার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এটর্নী উকিল ও মক্কেলের দল চারিপাশে ঘিরিয়া ফেলিল। সকলকে চেম্বারে দেখা করিতে বলিয়া তিনি রৌদ্রচ্ছায়াচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ বাগানের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া দিলেন।

অতি বৃহৎ প্রাসাদোপম বাড়ীটার একতলা, দুতলা, তিনতলার অসংখ্য ঘরে অসংখ্য রকমের কাজ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে, এখান হইতে সকলদিকের কাজের বিপুলতার আভাষ পাইতে দেরী হয়না।

নীচে কলে জল আসিয়াছে, সেখানে লোকের ভিড়। রাঙা রাস্তা দিয়া মালী জলের ঝারি লইয়া চলিয়াছে, আরেকটা ওধারে সিজন্ ফ্লাওয়ারের বিচিত্র বেড্ তৈরী করিতেছে।

মাঝখানের ফোয়ারায় জল ছিটকাইয়া পড়িতেছে, তারই নীচে গোল বাঁধানো চৌবাচ্চায় লালমাছ রাখা আছে, সমস্তটা এখান হইতে নজরে পড়েনা, তবু হিমাংশুর—বিখ্যাত আইনজ্ঞ হিমাংশু সেনের ইচ্ছা করে ঐখানে গিয়া বসিয়া অন্ততঃ খানিকক্ষণ খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লয়।

কিন্তু সে হইবার নয়। তাঁহার মত লোককে ঐ ময়লা জলের বিশ্রী জলাশয়ের পাশে দেখা অনেকের পক্ষেই boring হইবে।

হয়ত আগামীকালের কাগজে সে সম্বন্ধে প্যারা বাহির হইতে পারে।

তবু ভালো লাগে ছাতিমগাছটার অন্তরালে কোকিলের ডাক। নীরস আইনব্যবসায়ের তিক্ত আবহাওয়ার মধ্যে সার্জেণ্ট পাহারা পেয়াদার কুশ্রী ভীতিপ্রদ আনাগোনার অবকাশে নির্ভীক কুহুধ্বনি দূর বনানীর এক পাগলকরা পাখীর।

হিমাংশুর মন কল্পনার বসে উধাও হইয়া ছুটিতে চায় কোন্ মহাপারাবারের শেষ রেখারও শেষে।

'বাবু' আসিয়া সবিনয়ে বলে, বিস্তর ক্লায়েন্ট অপেক্ষা করিতেছে।

চেম্বারের কাজ মিটিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। মরিস্ অক্সফোর্ড কার্খানা যখন সদররাস্তায় পড়ে, তখন সিগার ধূমের কুয়াসা ভেদ করিয়া হিমাংশুর নজর চলিয়া যায় কলিকাতা হাইকোর্টের চূড়ার মাথায়। সূর্য্যের শেষ রশ্মি আর সেখানে লাগিয়া নাই, লম্বালম্বা বারান্দাগুলা জনহীন। এই তাঁর স্বপ্নমন্দির, মাসে মাসে চল্লিশ হাজার মুদ্রা এখান হইতে অবলীলাক্রমে তিনি লুটিয়া লইয়া যান।

বাবুঘাটের ধার দিয়া ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়া গঙ্গার তীর ধরিয়া কোর্টকে প্রদক্ষিণ করিয়া মোটর ছুটিয়া চলে। একদিকে জাহাজে জাহাজে আলো দিয়াছে, আর একদিকে ধূম্রালোক স্বপ্নলোক ময়দান।

প্রিন্সেপস্ ঘাটে গাড়ী থামাইয়া পাথরের বৃহৎ সিংহটার পিঠের উপর একটু ক্ষণের জন্য চড়িয়া বসিয়া সন্ধ্যার গঙ্গার স্নিগ্ধ বাতাসটুকু আরামে উপভোগ করিবারও গোপন বাসনা জাগে।

তাও হইবার নয়। বাড়ীতে বৈঠকখানায় হয়ত লোক বসিয়া আছে।

সত্যই বসিয়া আছে। কাপড়জামা বদ্লাইবার অবসর হয়না, নথীপত্র লইয়া বসিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে চা বিস্কুট আর পোরিজ জলযোগ করিয়া লইতে হয়।

অধিকাংশই মাড়োয়ারি, আটলাখ দশলাখ ছাড়া কথা নাই।

তবুও এগারোটার আগে কথা শেষ হয়না।

তারপর শোবার ঘরে ঢুকিয়া কাচের একগ্লাসে জল লইয়া মুখ ধুইয়া টেবিলে রাখা খানকয়েক লুচি আর মাংসের কোর্ম্মা নয়ত কারী আর আদার চাটনী। তারপর একটা সিগার ধরাইয়া রাত্রি ২টা অবধি আইনের বই পাঠ, মাঝে মাঝে দুই এক চুমুক বিয়ার।

আড়াইটায় নিদ্রা এবং ছয়টায় ওঠা, তারপর চা ওমলেট আর খবরের কাগজের সঙ্গে মামলার কাগজ আসিয়া হাজির হয়।

বয়স হইয়া গেছে চল্লিশ, এদিকে ঘরে মাতা নাই পত্নী নাই, সেবা করিবার ভর্ৎসনা করিবার কেহ নাই। তার উপরে এত পরিশ্রম!

নিউ পার্ক এক্স্টেন্‌শনের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বাবুর্চ্চি খানসামা মালী প্রভৃতি কয়েকটা লোকজন, আর বিপুল ব্যাঙ্ক ব্যালান্স,—ইহাতে কি মনের ক্লান্তি মেটে?

লোকে বিশ্বাস করিবেনা কিন্তু হিমাংশু সেনের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন একটা ইম্পর্ট্যান্ট কেস চালাইয়া হিমাংশু আর চেম্বারে ঢুকিলেন না। একরকম সকলকে ফাঁকি দিয়াই টাউনহলের দিকে গাড়ী চলাইতে বলিলেন, আজ সেখানে একটা মিটিংএ রবীন্দ্রনাথের আসিবার কথা।

রবীন্দ্রনাথকে তিনি অনেকদিন দেখেন নাই, আজ আকাশে মেঘ করিয়াছে, এমনি অন্ধকার দিনেই বর্ষার কবিকে তিনি দেখিবেন।

টাউনহলের সুরকিঢালা রাস্তায় হর্ণ দিয়া মোড় ঘুরিতেই একটু দু-এক পশলা বৃষ্টি ঝরিল।

গাড়ীবারান্দার নীচে অনেকেই কবির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, হিমাংশু তাহাদেরই মাঝে দাঁড়াইলেন।

হঠাৎ একটী মেয়ে—বয়স কত আন্দাজ করা শক্ত, পঁচিশও হইতে পারে, পঁয়ত্রিশ হওয়াও অসম্ভব নয়—মুখের লালিত্য দেখিয়া তারুণ্য জাগিয়া আছে মনে হয়—হিমাংশুর অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চোখ পড়িতেই হিমাংশু দেখেন সাহায্য প্রার্থনায় দক্ষিণ কর সে মিলিয়া দিয়াছে।

লম্বা একহারা চেহারা; কৃশ বলা যায়—মাথার আবরণের কাছে শাড়ীর পাড় খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, গায়ে সেমিজ একটা থাকিলেও তত পরিষ্কার নয় অথচ সমস্ত চেহারাটা দেখিলে খানিকটা সম্ভ্রান্ত-ভাব মনে হয়। হিমাংশু প্যান্টের পকেট হইতে ব্যাগটা টানিয়া বাহির করিলেন কিছু দিবার জন্য। খুলিয়া দেখিলেন সমস্তই নোট তিন হাজার টাকার।

খুচরা কিছু নাই। কাজেই ব্যাগটা আবার পকেটে পুরিতে হইল। 'মাপ করো' কথাটা মুখে যোগাইল না, এদিক হইতে নিঃশব্দে হিমাংশু ওদিকে সরিয়া গেলেন, যেখানে শাঁখ হাতে করিয়া পুরনারীরা দাঁড়াইয়া আছেন, এবং লাল শালুর দুইপাশে ক্ষুদে পাম্ দুলিতেছে।

হঠাৎ একসঙ্গে শাঁখ বাজিয়া উঠিল এবং সমবেত নরনারীরা এধারে ওধারে সরিয়া সচকিত হইয়া উঠিল—কবি আসিতেছেন!

কবি আসিবার মুখে ভিড়ও কিছু বাড়িয়া উঠিল, দৃষ্টিও সকলের কবি ও কবির মোটরের দিকে ছুটিল, এই অবসরে হিমাংশু অনুভব করিলেন তাঁহার প্যাণ্টের পকেটের কাছে কাহার করস্পর্শ। ফিরিয়া দেখিতে না দেখিতে সেই মেয়েটি সরিয়া গেল তাঁহার পাশ হইতে যে কিছুক্ষণ আগে সাহায্যের আশায় আসিয়াছিল, এবং হিমাংশু দেখিলেন মনিব্যাগ অন্তর্হিত।

ঘটনাটা কাকতালীয়বৎ, মেয়েটি পাশ হইতে বিদ্যুৎগতিতে সরিয়া গেল, এবং মনিব্যাগও সেই মুহূর্ত্তে লোপাট। হয়ত সে না লইতে পারে কিন্তু অধিকতর সন্দেহজনক কাহাকেও ধারে কাছে পাওয়া যাইতেছে না। অতএব—

অতএব হিমাংশু তাহাকেই অনুসরণ করিলেন।

দেখা গেল মেয়েটির পা অত্যন্ত জোরে চলে।

টাউনহলের ফটক পার হইয়া হাইকোর্টের দিকে সে চলিল, খানিকটা অগ্রসর হইয়া বেঙ্গল কাউন্সিলহাউসের সামনেই একটা ট্যাক্সি আসিতে দেখিয়া সে অঙ্গুলিসঙ্কেতে থামাইল। গাড়ীতে উঠিতেই গাড়ী ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটে ঢুকিল।

হিমাংশু নিজের গাড়ী ভিতরে বাগানে ফেলিয়া আসিয়াছেন, সোফারকে জানাইয়া আসেন নাই, এখন ডাকিবারও সময় নাই, আর একখানা ট্যাক্সি গভর্ণর্‌স্ হাউসের দিক হইতে আসিতে দেখিয়া তিনি সেটাকে ধরিলেন এবং বলিলেন ঐ কার্‌খানাকে ফলো করো।

বাঙালী ড্রাইভার, মুচকি হাসিয়া স্পীড্ বাড়াইয়া দিল।

ডালহাউসি স্কোয়ার ওয়েষ্ট, নর্থ, লালবাজার ষ্ট্রীট রাধাবাজার ষ্ট্রীট—একটা বড় গহনার দোকানের সামনে মেয়েটির ট্যাক্সি থামিল।

হিমাংশুর ট্যাক্সিও পিছনে দাঁড়াইল। মেয়েটি কোনদিকে না চাহিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

দোকানের গ্লাসকেসে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়া দিয়াছে।

হিমাংশু ঢুকিয়া দেখিলেন, মেয়েটি চুড়ী, হার, কানের দুলের কয়েক রকম ডিজাইন দেখাইতে বলিল এবং পাছে মাথার পিছনদিকের ছেঁড়াটা নজরে পড়ে এইজন্যই হয়ত এলোখোঁপাটা আগে হইতেই বাহির করিয়া রাখিয়াছে।

হিমাংশু সেন একটা ঘড়ির ক্যাটালগ চাহিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন, মেয়েটির অলক্ষ্যেই।

দোকানের খোলা দরজার দিকে চাহিয়া হিমাংশু দেখিলেন, মেয়েটি অনেক কিছুই কিনিল এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহারও যে নাড়ীস্পন্দন দ্রুততর হইতে লাগিল সে কথা না বলিলেও চলে।

মেয়েটি গাড়ীতে উঠিতেই গাড়ী সোয়ালো লেন দিয়া বাহির হইয়া রাধাবাজার মুর্গীহাটার মাঝ দিয়া চলিল কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকানে গাড়ী থামিতে অনুসরণকারী গাড়ী হইতে হিমাংশু নামিয়া পড়িলেন।

গাড়ীভাড়া চুকাইতে গিয়া দেখিলেন পকেট খালি। তার ট্যাক্সিভাড়া চুকাইয়া দিয়া তখন মেয়েটি দোকানে ঢুকিয়া গেছে।

হিমাংশু তাঁহার ড্রাইভারকে বলিয়া দিলেন গাড়ীটা আগাইয়া রাখিতে এবং নিজে ফুটপাথে পায়চারী করিতে লাগিলেন। দুঃসাহসিকা মেয়েটির কার্য্যকলাপ তাঁহাকে অবাক করিয়া তুলিয়াছিল।

খুব বেশীক্ষণ লাগিল না, একটা পিজবোর্ডের বড় বাক্স হাতে করিয়া মেয়েটি বাহির হইয়া আসিল, গয়নার বাক্সগুলা তাহারই সহিত লালফিতা দিয়া বাঁধা ছিল।

সামনের ট্যাক্সিখানাকে দেখিয়াই হাঁক দিল এই খোল্ দেও।

হিমাংশুর ইসারায় ড্রাইভার দরজা খুলিয়া দিতেই মেয়েটি চট করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং সে বসিতে না বসিতে হিমাংশু সেনও উঠিয়া তাহার পাশেই বসিয়া বলিলেন—চিন্‌তে পারেন ?

আতঙ্কের ভাব মেয়েটির মুখে ফুটিয়া উঠিল, জোর করিয়া সে বলিল, কে আপনি ?

হিমাংশু জবাব দিলেন, কে আমি ? যার মনিব্যাগ তোমার কাছে রয়েছে। সেটা যে আমার, তার প্রমাণ সোনার জলে ওর ওপরে আমার নামলেখা আছে, আর সমস্ত নোটগুলোর নম্বরও টোকা আছে। পুলিশে ইতিমধ্যে খবরও চলে গেছে। এখন বুঝেছ কে আমি ? এখন, সব চেয়ে কাছে যে থানা আছে সেইখানেই সোজা চল, গয়না কাপড়গুলো পরবার আর সুযোগ হলনা, কি করব বলো ? টাকাটাও ত নিতান্ত কম নয় ?

মেয়েটি নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া ব্যাগটা বাহির করিয়া গ্যাসের আলোয় দেখিল, ছোট করিয়া লেখা রহিয়াছে H. C. Sen, Advocate, High Court, Calcutta.

বলিল, দেখুন, আমি পেশাদার চোর নই, তবে কেন এ কাজ করলুম আপনাকে কি-ই বা অনুরোধ করব, হঠাৎ কিছু বলতে পারছি না, দোহাই আপনার খানিকটা ময়দানের দিকে গাড়ীটা নিয়ে যেতে বলুন, খোলা হাওয়ায় মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিই, তারপর একে একে সব বলব।

হিমাংশু ময়দানের দিকেই ড্রাইভারকে চালাইতে বলিলেন।

অ্যালফ্রেড থিয়েটার পার হইয়া হিমাংশু বলিলেন, প্লে করতে পারো চমৎকার ! শ্রীঘর বাস করবার বাসনা কেন হল ?

মেয়েটি বলিল,—জানি আপনি বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস না করুন অন্ততঃ তিনঘণ্টা—এখন কটা বেজেছে ?

ঘড়ি দেখিয়া হিমাংশু জবাব দিলেন—সাড়ে সাতটা।

উত্তেজিত কণ্ঠে মেয়েটি বলিল—অন্ততঃ সাড়ে দশটা অবধি আমাকে সময় দিন, সাড়ে দশটার পর আমাকে থানায় দিতে হয় হাজতে রাখতে হয়—যা খুসি আপনি করবেন—যা আপনার মন চায় আমার কিছু বলবার থাকবে না—

শ্লেষপূর্ণ স্বরে হিমাংশু বলিলেন, কেন ইতিমধ্যে কোথায় অভিসারে যাত্রা হবে ?

অভিসার নয়—ব্যাপারটা আপনাকে সব খুলে বলি—গাড়ী ততক্ষণে বৌবাজার থানার কাছে আসিয়াছে।

হয়েছে কি—সংক্ষেপেই বলি—কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার পূর্ণেন্দু গুহকে চেনেন ?

খুব চিনি। অবশ্য আমার সঙ্গে মৌখিক আলাপ নেই, নাম শোনা আছে।

অবিচলিত কণ্ঠে মেয়েটি বলিল—তাঁরই স্ত্রী আমি।

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া হিমাংশু বলিলেন তাঁরই স্ত্রী আপনি, যিনি বছরে দশহাজার টাকা ইন্‌কমট্যাক্স দেন—তাঁরই স্ত্রী আপনি পথে পথে পকেট কেটে বেড়ান লোকের ?

বাধা দিয়া মেয়েটি বলিল—শুনুন সব কথা—বিয়ের বছরখানেক বাদে জানতে পারলাম চরিত্র তাঁর খারাপ—তখন আমার কতই বা বয়েস, সতেরো কি আঠারো, একলেডি ডাক্তারের বাড়ীতে চ'লে যান। সমস্ত রাত একলা আমি—আমার ভাশুর জানেন ত প্রসিদ্ধ এটর্ণী, নাম আর করব না—দরজায় ধাক্কা মারেন। এরকম অবস্থায় শশুরবাড়ীতে থাকা আমার পোষালনা, একদিন স্পষ্টই বলে দিলুম ভায়ের কীর্ত্তি কথা। শুনে তাঁর ওপর রাগ করা দূরে থাক, আমার ওপরেই গেলেন চটে—জানিয়ে দিলেন আমি অসতী, আমাকে তিনি ত্যাগ করবেন। প্রথম সন্তান হল মেয়ে, স্বামী বললেন তার জন্মে তিনি সন্দেহ পোষণ করেন। আমি অত্যন্ত আহত হলুম তর্কও করলুম খুব,—অবশ্য তাঁরও চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট শুনিয়ে দিলুম। তাতে লাভ হল এই, একবস্ত্রে তিনি আমায় বাড়ী থেকে তাড়ালেন, মেয়েকে আটকে রেখে। শুধু তাড়ালেন নয়, আমাদের যাতে যথেষ্ট কষ্ট হয় সংসার অচল হয় তার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগ্‌লেন। আমার নাবালক ভাই আর বুড়ো মা, তাদের নিয়ে যেন অকূল পাথারে ভাসলুম। মা মারা গেছেন, ভাইটি আছে, সেই সামান্য কিছু রোজগার করে, দুই ভাইবোনে একপাশে প'ড়ে থাকি।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়া ট্রামের সঙ্গে রেস

দিয়া গাড়ী তখন হুহু করিয়া চলিয়াছে। হিমাংশু বলিলেন, বেশ জমে উঠেছে। তারপর?

আজ আঠারো বছর আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সকল অপমানের মাঝখানেও আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা চেয়েছি আমার মেয়েকে—নাম রেখেছিলাম শঙ্খ—সে শাঁখের মত সাদা হয়েছিল—একটিবার দেখব। শুধু একটিবার চোখের দেখা—তাও তিনি দেখতে দেননি। ধাই রেখে মেয়েকে মানুষ করেছেন, বলেছেন তাকে জানিয়েছি তার মা নেই। তাতে আমি বলেছি মাতৃপরিচয় দোবনা, শুধু দূর থেকে একবার দেখে নিঃশব্দে আমি চ'লে আসব। তিনি অনুমতি দেননি, চুরি ক'রে বাড়ী ঢুকতে গিয়ে ঝি-চাকর তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ—

এইখানে মেয়েটি—মিসেস্ গুহ—থামিল।

হিমাংশু জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ—কি হয়েছে?

আজ দুপুরবেলা তাঁর চিঠি পেয়েছি, তুমি দেখা করতে পারো ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময়, আর তুমি যে তার মা একথাও জানাতে পারো। আজ তাই আনন্দ রাখবার আমার জায়গা নেই, আজ সঙ্গতি ছিলনা মা সাজবার—তাই চুরি করতেই বেরিয়েছিলাম। অন্ততঃ একখানা পরিষ্কার কাপড় আর দুটো গিল্টির গয়না আমার দরকার ছিল। আজ দুঃখিনীর বেশে ত আমি যেতে পারব না, যদি সে বিশ্বাস না করে, সে আঘাত যে বড্ড লাগ্‌বে। আপনার ব্যাগ থেকে পেলাম আশার অতিরিক্ত, তাই কাপড়ে গয়নায় কার্পণ্য আমি করলুম না। যাক্ চুরিই করেছি আপনার টাকা। দশটা থেকে দশটা দশ অবধি সময়—তারপর আপনি আমাকে পুলিশে দিন, জেল খাটতে হয়, কোনো আক্ষেপ আমার থাকবে না, কিন্তু পায়ে পড়ি আপনার তার আগে কিছু করবেন না—তাহলে আঠারো বছরের স্বপ্ন আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে।

হিমাংশু সেন মন দিয়াই সব শুনিতেছিলেন…বলিলেন, তাই হবে—তিনঘণ্টা খুব বেশী সময় নয়, কিন্তু একদণ্ড আমি তোমাকে চোখের আড়াল হতে দোবনা, এমন কি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার সময়ও আমাকে সঙ্গে রাখ্‌তে হবে—

অসঙ্কোচে মেয়েটি বলিল—বেশ।

হিমাংশু সেন বলিলেন—এখন চলো আমার বাড়ী, কাপড় গয়নাগুলো প'রে নেবে, তারপর দশটার কিছু আগে বেরোনো যাবে—

চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল—মেয়েটি কহিল—আপনাদের বাড়ীর কাউকে আমার পরিচয় দেবেন না—

কেউ নেই সেখানে—

কেউ না? আপনার স্ত্রী?

এখনো সে অনাগতা। কিন্তু তুমি বেশ অভিনয় করতে পারো। কোন্ থিয়েটারে ছিলে বলো দেখি?

মেয়েটি জবাব দিল না।

কি নামে ডাক্‌ব তোমায়, মিসেস্ গুহ?

না, ও নামে নয়—বল্‌বেন শঙ্খর মা—কিম্বা—কিম্বা উর্ম্মিলাও বল্‌তে পারেন।

উর্ম্মিলাই বল্‌ব। মিস্ উর্ম্মিলা কোনো থিয়েটারের প্ল্যাকার্ডে মনে পড়ছেনা। হিমাংশু সিগারের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে দেখিলেন রেস্ কোর্সের মাঠ শেষ হইয়া গেছে, বলিয়া দিলেন, বাড়ী চলো।

হিমাংশু সেন ড্রয়িংরুমে বসিয়া ছবির বই দেখিতে লাগিলেন, আজ তিনি কোন কাজ করিবেন না।

ইতিমধ্যে বাবুর্চ্চি খাবার দিয়া গেল দুজনকার।

প্রসাধন ও সজ্জা শেষ করিয়া উর্ম্মিলা যখন এঘরে প্রবেশ করিল তখন বিজলীর তীব্র আলোকে তাহাকে আর চেনা যায় না। এতই সুন্দর দেখাইতেছে!

খাবার সময় বিশেষ কিছুই কথা হইল না, অজ্ঞাত সংশয় ও আশঙ্কার একটা দীর্ঘপর্দ্দা যেন ঘর জুড়িয়া বিলম্বিত রহিয়াছে।

এতক্ষণে নিজের গাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।

দশটা বাজিতে পনেরো মিনিট দেখিয়া হিমাংশু গাড়ী বাহির করিতে বলিলেন।

লাউডন ষ্ট্রীটের দিকে গাড়ী ছুটিল।

ডাক্তার পূর্ণেন্দু গুহর সদরদরজার মাথায় তখনো আলো জলিতেছিল। গাড়ী গিয়া থামিতেই বেহারা বৈঠকখানা ঘর খুলিয়া দিয়া সাহেবকে খবর দিতে গেল।

ডাক্তার সাহেব পর্দ্দা তুলিয়া ঢুকিয়া উর্ম্মিলার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—একলা আস্‌বার কথা ছিল যে? উনি কে?

উর্ম্মিলা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—উনি—উনি আমার একজন বিশেষ বন্ধু—

বন্ধু! বলিয়া ডাক্তার একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন।

রাগে হিমাংশুর গা জলিয়া গেল, নিজের পরিচয়টা দিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। পরুষ কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ আমি ওর বন্ধু, আজ যদি উনি মেয়ের সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে কোনো কারণ বশতঃ আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

ডাক্তার বলিলেন—কোন কারণ বশতঃ। যাক্‌গে, কারণটা আমি জান্‌তে চাইনা আপনাদের নিজেদের মধ্যেই যখন এমন বন্দোবস্ত হয়েছে তখন আমার কিছু বলবার নেই। তারপর হাতের রিষ্ট্‌ ওয়াচটার দিকে চাহিয়া ডাক্তার গুহ বলিলেন—Just ten. Ten minute's time—এই পথে সোজা ওপরে, সামনের ঘরে সে আছে।

জানে জানে উর্ম্মিলা—সাম্‌নের সে ঘর। ও ঘর তাহার মধুচন্দ্রমা যাপনের দিনে কি মধুরই না হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন, প্রথমে গিয়া সে কি বলিবে! বলিবে না কিছু, শুধু বুকে চাপিয়া ধরিবে কিছুক্ষণ, তারপর আসিবার সময় শুধু বলিয়া আসিবে—আমি তোর মা। চলিতে চলিতে পা কাঁপিতে লাগিল, উত্তেজনায়, না আনন্দে, না ভয়ে?

ভয় কিসের? কিছুই না। নিজের মেয়েকে সে দেখিতে চলিয়াছে। মেয়ে যদি না চিনিতে পারে তাহাতেও দুঃখ নাই, মেয়েত তাহারই। তাহার আঠারো বছরের মেয়ে, তাহার শখ—

সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই নজরে পড়িল—বিছানায় কাত হইয়া শুইয়া—মেয়েত' নয়, ও কি? রূপকথায় ওর নাম নাই, ভাষায়ও কিছু নাই, স্বর্গ ছাড়িয়া অমৃত, জ্যোস্নার সুধা এমনি ধরণের একটা কিছু—

মাগো, বলিয়া উর্ম্মিলা সজোরে ঘুমন্ত মেয়েকে জড়াইয়া ধরিল, চুমায় চুমায় তাহার নমিত আঁখিপল্লব সিক্ত করিয়া দিল, কয়েকট মুহূর্ত্ত—তারপরই তাহার চমক ভাঙিল—একি! এ যে বরফের মত ঠাণ্ডা!

তবে কি?

না-না তাকি হইতে পারে? ফিরিয়া দেখে ডাক্তার ক্রূর হাসি হাসিতেছে, হিমাংশুর দৃষ্টিতে আকুল উৎকণ্ঠা—

হিমাংশু ও উর্ম্মিলা দুইজনে খানিকটা নাড়াচাড়া করিতেই বোঝা গেল সন্দেহ মিথ্যা নয়, অনেকক্ষণ প্রাণ বাহির হইয়া গেছে।

নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে!

মাথা ঘুরিয়া গিয়া উর্ম্মিলা ঢলিয়া পড়িতেই হিমাংশু দুই বাহু বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিল।

ঘড়ি দেখিয়া ডাক্তার গুহ বলিল—দশ মিনিট হয়ে গেছে, আর সময় দিতে পারিনা।

সময় চাইও না, বলিয়া তিক্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হিমাংশু সেন উর্ম্মিলাকে সাবধানে ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

উর্ম্মিলার মনের অবস্থা তখন শোক দুঃখ রাগ অনুরাগের অতীত প্রায়। সে যেন স্তম্ভিত, যেন বজ্রাহত।

গাড়ীতে তুলিয়া দিতে উর্ম্মিলা প্রশ্ন করিল—এখন আমার কোথায় নিয়ে যাবেন?

অকম্পিতকণ্ঠে হিমাংশু সেন বলিলেন—, আমার বাড়ীতে।

—হাজতে নয়?

—না।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

নবযুগের সাধনা*

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, এম্, এল্. সি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আমল হইতে আমাদের কলিকাতা করপোরেশান প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কল্পে, এবং সাধারণ পুস্তকাগারের সাহায্য জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন তাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে শ্লাঘনীয়। এটা বাংলার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। তাই শুনিয়া ব্যথিত হইলাম—ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে কলিকাতা করপোরেশান সাধারণ পুস্তকাগারে দানের বহর কমাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। নাগরিকদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করিবার জন্য লাইব্রেরী অপেক্ষা সহজ উপায় দ্বিতীয় নাই। সেই জ্ঞানের পথ সঙ্কোচের ব্যবস্থা শুনিলে বস্তুতঃই ক্ষুব্ধ হইতে হয়।

অর্থনৈতিক অবসন্নতা কেবল বাংলা বা ভারতে সীমাবদ্ধ নয়, জগতের সর্ব্বত্রই এরূপ অবসন্নতা ঘটিয়াছে। সে সব

ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক ম্যাঞ্চেষ্টার সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন

দেশে অন্য বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইতেছে বটে কিন্তু শিক্ষোন্নতি-কল্পে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকা যুক্তরাজ্যের উল্লেখ করিতেছি। সেখানে Public Works, Civil Works এবং Relief Administrationএর তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরীর গৃহ নির্ম্মাণ এবং উন্নতি কল্পে ব্যয়ের বরাদ্দ অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় একদিকে বেকার সমস্যার সমাধান এবং অপরদিকে জ্ঞানবিস্তারের এই অভিনব যন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হইতেছে। কিভাবে কাজ চলিতেছে তাহার একটু আভাস দিতেছি। Public Works Administration এর অধীন লাইব্রেরী গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, এই গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় জন্য এই বিভাগ হইতে শতকরা

* খিদিরপুর হেমচন্দ্র লাইব্রেরীতে কলিকাতার মেয়র শ্রীসন্তোষকুমার বসুর সভাপতিত্বে প্রদত্ত বক্তৃতা

ত্রিশ টাকা লাইব্রেরীকে দান স্বরূপ দেওয়া হইতেছে এবং বাকী শতকরা সত্তর টাকা দীর্ঘকালের জন্য অতি সহজ কিস্তিতে লাইব্রেরীকে হাওলাৎ স্বরূপ দেওয়া হইতেছে। Civil Works Administration ৪০ লক্ষ নরনারীকে অন্যূন তিনমাসের জন্য কাজ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রবেশ পথ হইতে ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী

এইজন্য চল্লিশ ক্রোড় ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে। বেকারদের মধ্যে অর্দ্ধেক এবং সরকার হইতে আহার্য্য সাহায্য বা dole যাহারা পাইতেছে তাহাদের মধ্য হইতে অর্দ্ধেক লোককে এই সব কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বেকারদের যুক্তরাজ্যের কর্ম্ম নিয়োগ (United States Employment) আপিসে নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিতে হয়। তাহাদের মধ্য হইতেই লোক লওয়া হয়। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে কিছু নির্ম্মাণ কার্য্য থাকিলে তাহাই Civil Works Administration দ্বারা পরিচালিত হয়। গৃহ সংস্কার, গৃহ চিত্রণ, বৈদ্যুতিক আলোর সংযোগ, কাগজের কাজ, ছাদ সংস্কার, আসবাবপত্র মেরামত আর আধুনিক প্রণালীতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের আঞ্জাম Civil Worksএর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। লাইব্রেরী বোর্ডকে তাহাদের যে যে কার্য্যের আবশ্যক তাহার একটা ফর্দ্দ (project) Civil Works এর কর্ত্তাদের দিতে হয়।

আবার Federal Emergency Relief Administrationএর হাত দিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত আরও নানারূপ কাজ করাইয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। আশু শিক্ষা সংক্রান্ত ফর্দ্দের মধ্যে ১। পল্লীর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন বা উন্নতি সাধন ২। বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য ক্লাস স্থাপন ৩। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে কার্য্যকরী বা vocational শিক্ষার ব্যবস্থা ৪। শ্রমশিল্পের পুনঃ সংস্থান ৫। বয়স্কদের জন্য সাধারণ ভাবে শিক্ষার বন্দোবস্ত ৬। শিশুদের খেলাধূলার সঙ্গে শিক্ষা দিবার বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি ঐ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হইলেও যুক্তরাজ্যের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রধান পরিচালক (Commissioner of Education) এসব কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন।

সাধারণে এই রকম সব কাজের জন্য ঘণ্টা বা দৈনিক হিসাবে সচরাচর যে মজুরী দিয়া থাকেন সেইরূপ জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী (living wage) এই সব কাজের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে।

লাইব্রেরীর দাখিলি ফর্দ্দের (project) জন্য যে বিষয়ে ব্যয় মঞ্জুর করা হয় তাহার তালিকার উল্লেখ করিতেছি :—

১। সমাজের শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ এবং সুবিধার পরিমাণ বা survey,

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরী—প্রধান প্রবেশ পথ
উপরে গ্রন্থাগারিকের কক্ষের জানালা দেখা যাইতেছে

২। সকল বয়স্ক লোকের শিক্ষাকল্পে পুস্তক সরবরাহ।

৩। স্থানীয় লাইব্রেরীতে পাঠককে উপদেশ দিবার লোক নিয়োগ।

৪। লোক ধরিয়া ধরিয়া লাইব্রেরীতে পাঠের সুযোগ এবং সুবিধা বুঝাইয়া তাহাদিগকে লাইব্রেরীতে পুস্তক ব্যবহার শিখাইবার উপদেষ্টা নিয়োগ।

৫। পাঠচক্র বা study circle স্থাপন।

৬। জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচারের জন্য অতিরিক্ত কর্মীর ব্যবস্থা।

৭। বিশেষভাবে বয়স্ক এবং বেকারদের নিয়া আনিয়া পুস্তকের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক জড়াইবার ব্যবস্থার জন্য লোক নিয়োগ। বেকার যাহারা অল্প স্বল্প কাজ করিয়া কোনও রকমে জীবিকার্জ্জন করে তাহাদের পাঠের সুবিধার জন্য দীর্ঘকাল লাইব্রেরী খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

লাইব্রেরী সংক্রান্ত আরও অনেক কাজ পূর্ব্বোক্ত বিভাগ হইতে করাইয়া লওয়া হইতেছে যেমন গ্রন্থপঞ্জী (bibliography) নির্ঘণ্ট বা কতকগুলি লাইব্রেরীর পুস্তক লইয়া যুক্ত তালিকা প্রস্তুত এবং অন্যান্য গবেষণামূলক কার্য্য, পুস্তক বাঁধাই, মানচিত্র, সংবাদপত্র এবং মুদ্রিত দ্রব্য সংরক্ষণ, নব প্রণালীতে পুস্তক তালিকা প্রণয়ন, পুরাতন কার্ড পাল্টাইয়া নূতন কার্ড স্থাপন, টাইপের, ফাইলের আসবাবপত্রের তালিকা, সংগৃহীত পুস্তক নূতন করিয়া সাজাইয়া রাখা, গল্প কথন, ছবি বাঁধাই, তালিকা সংগ্রহ প্রভৃতি। এই সব কাজের প্রস্তাব স্থানীয় সাহায্য সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের নিকট পেশ করিতে হয়—প্রস্তাবকালে লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন কাজ দোকর না হয় এবং নিত্যনৈমিত্তিক লাইব্রেরীর কাজের যেন ক্ষতি না হয়। এই সব কাজে যে সব লোক নিযুক্ত করা হয় তাহাদের কাজ দিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেবল স্থানীয় সাহায্য সমিতির একজন সভ্যের সুপারিশ পত্র দাখিল করিতে হয়। মেয়েদের জন্যও নানারূপ কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। লাইব্রেরীয়ানের কাজ শিখাইবার জন্য যুক্তরাজ্যের অনেক বিদ্যালয় তো আছেই, তাছাড়া প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় বা বড় কলেজ মাত্রেই লাইব্রেরীয়ানের কার্য্যে বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত করার আবশ্যকতা আছে। সেজন্য লাইব্রেরী অপেক্ষা সেদেশে লাইব্রেরীয়ানের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। এই সব নূতন ব্যবস্থায় কোনও

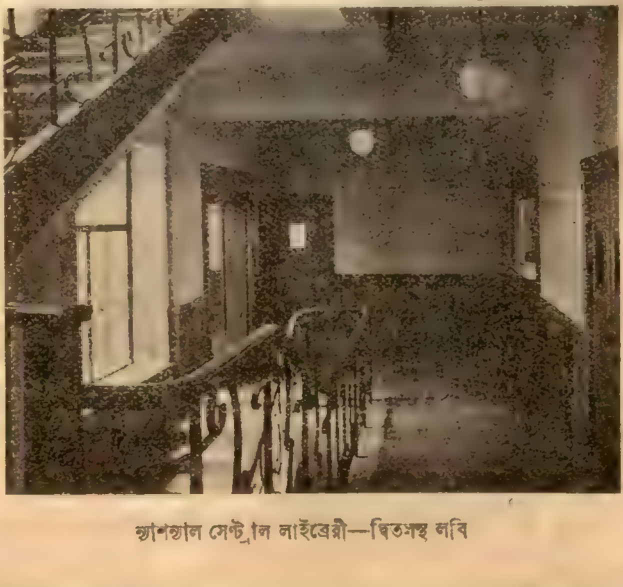

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরী—দ্বিতলস্থ লবি

লাইব্রেরীয়ানই এখন আর বেকার অবস্থায় নাই—লাইব্রেরীর কোনও না কোনও বিভাগে কাজ জুটিয়া গিয়াছে। এই বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার ফলে বহু জ্ঞানবান শিল্পী প্রস্তুত হইতেছে। জগতে অর্থ নৈতিক অবসন্নতা কিছু চিরস্থায়ী হইবে না, যখন ব্যবসা বাণিজ্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তখন এই সব বিশেষজ্ঞগণ শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা এবং নব নব আবিষ্কার দ্বারা স্বীয় দেশকে গরীয়ান করিয়া তুলিবে। যুক্তরাজ্যের লাইব্রেরীগুলির পাঠক সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইতেছে যে লাইব্রেরীতে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না,—লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষের পক্ষে চাহিদামত পুস্তক সরবরাহ কঠিন হইয়া পড়িতেছে। অর্থ নৈতিক অস্থিরতা মানসিক অশান্তি উৎপাদন করে, তাহার প্রতিকার কল্পে নরনারী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। আবার অবসর ও অর্থাভাব চিত্ত-বিনোদনের অন্যতোপায় স্বরূপ

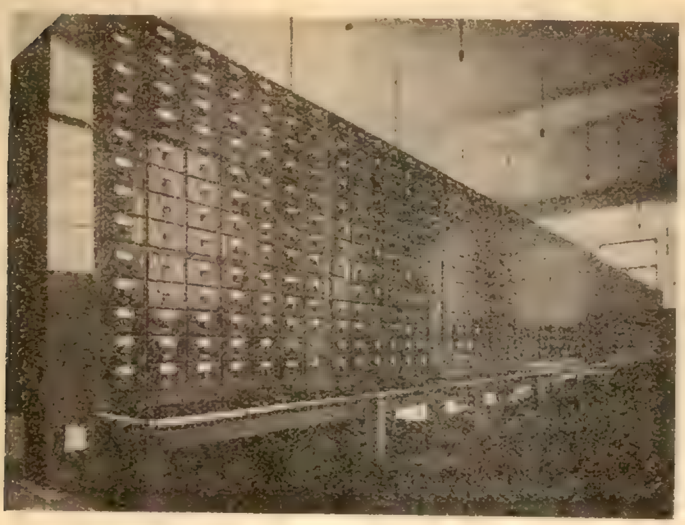

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরী—ইউনিয়ন ক্যাটালগের একটি অংশ

দারুণ অর্থকৃচ্ছতার দিনে সকল দিকদিয়া লাইব্রেরীর পরিপুষ্টি সাধিত হইতেছে, লাইব্রেরীর প্রসার এবং কার্য্যকরিতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। সেজন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। সদাকর্ম্মনিরত লোক পুস্তকের সদ্ব্যবহার করিবার বেশী সাবকাশ পান না। এখন কাজ কর্ম্ম কমিয়া যাওয়ায় লোকের অবকাশ কাল বাড়িয়া গিয়াছে। এই সুযোগে জনশিক্ষার এবং দেশের লোকেদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করিবার বিরাট আয়োজন চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক নব নব তথ্য শ্রমশিল্পের ও হাতে কলমে কাজ শিক্ষা করিবার নূতন নূতন প্রণালী সংক্রান্ত পুস্তক প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হইতেছে, আর তাহার চাহিদাও

ডেন্‌ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরি রীড্‌ লাইব্রেরী

পুস্তকের দিকে লোককে আকৃষ্ট করে। যাহার চাকু যায় সে ভাবে কিসে অন্য কাজ শিখিয়া জীবিকার্জ্জ-

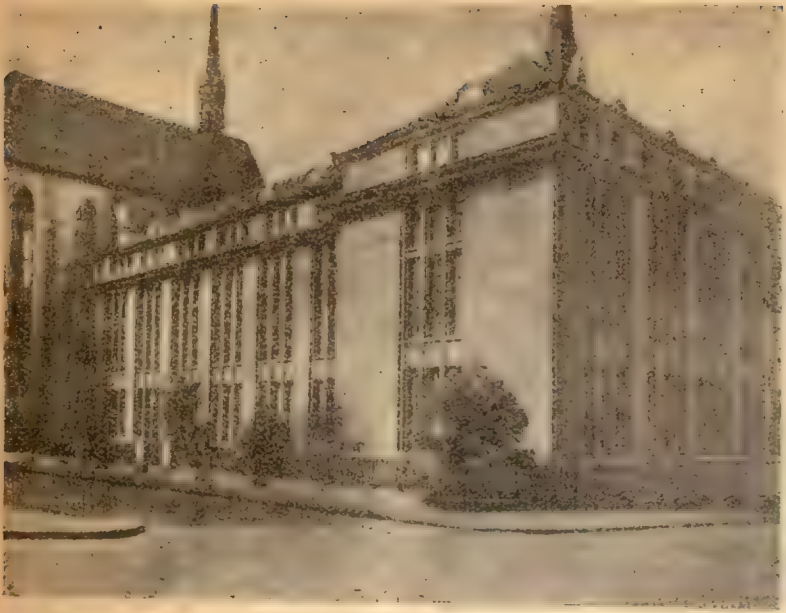

রি ইন্‌ফোর্স্‌ড কন্‌ক্রিট নির্ম্মিত সাধারণ পাঠাগার—জ্যুরিক

পুস্তকের অভাব দূরীকরণের সুব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দানবীর কার্ণেগী ট্রাষ্টের সাহায্যে National Central Libraryর গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। আমাদের সম্রাট সম্রাজ্ঞী সমভিব্যাহারে সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। এই Naticnl Central Library বিলাতের বহু লাইব্রেরীকে একসূত্রে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে।

সমর্থ হইতে পারে, যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে, সেজন্য লাইব্রেরীতে পুস্তকের আশ্রয় লয়। সাধারণের নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রমশিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং চিন্তাধারার উন্নত করিবার জন্য পুস্তকাগারের উন্নতকল্পে অকাতরে দানের সার্থকতা সে দেশের লোক ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। জ্ঞান প্রচারের এই সহজ প্রতিষ্ঠান-গুলির তাই এত সমাদর—সেগুলি সৌষ্ঠবশালী এবং সমৃদ্ধ করিবার তাই এত প্রবল প্রচেষ্টা চলিয়াছে। এখন আমেরিকা যুক্ত-রাজ্য ছাড়িয়া বিলাতের কথা বলি।

স্মিথ্‌ হিল শাখা লাইব্রেরী

এই অর্থ নৈতিক দুর্দ্দিনে বিলাতে লোকের জ্ঞানস্পৃহা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা মূল্যবান জগতে নানাবিষয়ে পুস্তকের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে কোনও লাইব্রেরীর পক্ষে তাহার সামান্য ভগ্নাংশ সংগ্রহ

একটি আদর্শ পাঠাগার প্রতিষ্ঠান

লাইব্রেরীগুলির মধ্যে যদি মূল্যবান পুস্তকের লেন দেন চলে তাহা হইলে সব রকমের পাঠকের চাহিদার পূরণ কতকটা সম্ভবপর হয়। একমাত্র সহযোগিতার দ্বারা সব অভাব পূরণ হইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংলণ্ডে পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা পুস্তক লেন দেনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। National Central Libraryকে কেন্দ্র করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান পুস্তকের সংখ্যা তিন কোটী বিশ লক্ষ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। British Museum জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় লাইব্রেরী; তাহারই পুস্তক সংখ্যা ৪০ লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ প্রতি ৮ খানি পুস্তকের মধ্যে কেবল ১ খানি মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্ণিংহাম, গ্লাসগো প্রভৃতি সহরে খুব বড় বড় লাইব্রেরী আছে বটে, কিন্তু British Museum-এর পুস্তকের তুলনায় ইহাদের পুস্তক সংগ্রহ অকিঞ্চিৎকর। আর ছোটখাট লাইব্রেরীর পুস্তক সংগ্রহ কমবেশী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ তো থাকিবেই। পাঠকের পুরা চাহিদা পূরণ করা সব লাইব্রেরীর পক্ষে সম্ভবপরও নয়। তাছাড়া যে সব নূতন পুস্তক প্রতিবর্ষে বাহির হইতেছে তাহার সংখ্যাও এত বেশী যে তাহার সামান্য ভগ্নাংশের স্থান কয়টা লাইব্রেরীতে দিতে পারে?

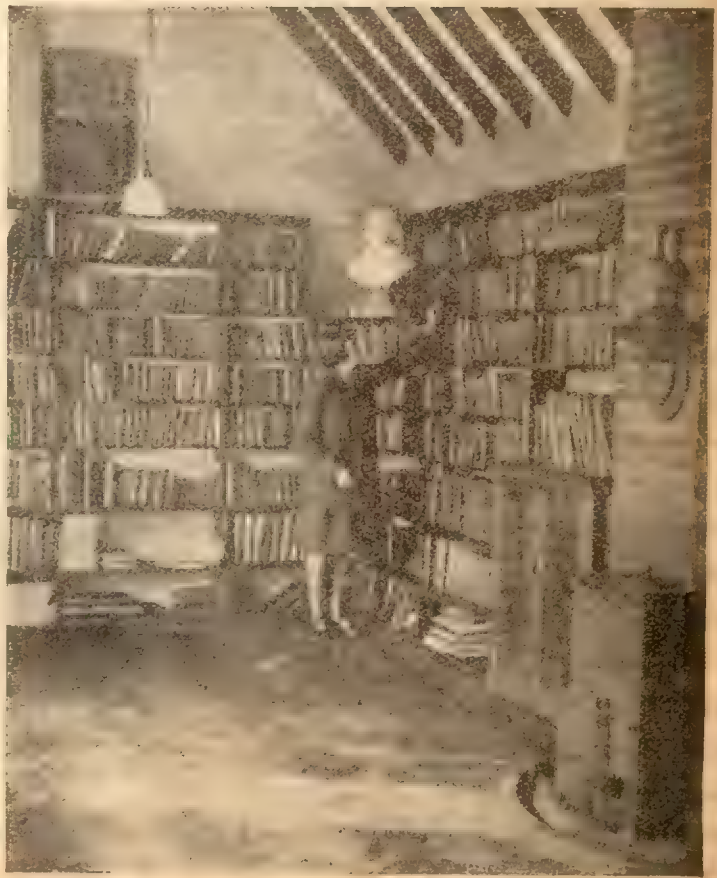

সেণ্ট হেলেন্‌স্ স্কুলের লাইব্রেরী—নর্থউড, মিড্‌লসেক্স, ইংলণ্ড

করিয়া সুষ্ঠুভাবে এই লেন দেন কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। এই National Central Libraryতে এক লক্ষাধিক

তিনটি ক্ষুদ্র ক্লাসরুমের যোগে প্রস্তুত একটি আদর্শ পাঠাগার

পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে গ্রন্থপঞ্জী বা bibliography সংক্রান্ত সংবাদ বিভাগ আছে। আর সব লাইব্রেরীর সংগৃহীত পুস্তকের যুক্ত (union list) তালিকা প্রস্তুত করা আছে। তাহার পুস্তকের সংখ্যা দশ লক্ষ। বিলাতে যে সকল লাইব্রেরী আছে তাহাদের মধ্যে যাহারা পুস্তক লেন দেন ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয় তাহারা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সহিত সংযুক্ত বা affiliated হয়। যুক্ত তালিকায় এই সব লাইব্রেরীর সংগৃহীত পুস্তক স্থান পাইয়াছে। এই সব লাইব্রেরী outliers আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ১৩০, আর পুস্তক সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ।

জোসেফ্ হেন্‌রী ক্লাব পাঠাগারে ছেলেমেয়েরা বই হইতে শিল্পসমস্যা সমাধান করিতেছে

National Central Libraryর হাত দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ক (Special) লাইব্রেরীর যত কিছু মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ আছে পাঠকদের তাহা সহজলভ্য করা হইয়াছে।

বিলাতে ৩২টী কৌন্টিতে (County) যে সব লাইব্রেরী আছে সেগুলি পাঁচটী কেন্দ্রভুক্ত করা হইয়াছে। উত্তরে কর্ণওয়াল (Cornwall), পশ্চিমে মিড্‌ল্যাণ্ডস্ (Midlands) দক্ষিণে ওয়েল্‌স্ সমেত পূর্ব্বদিকের কাউন্টিগুলিতে যে ২২২টী লাইব্রেরী আছে সেগুলিকে লইয়াই কেন্দ্রগুলি গঠিত হইয়াছে। পাঁচটী কেন্দ্রের আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—Regional Library System—আবার এই পাঁচটী National Central Libraryর সহিত সংযুক্ত আছে।

ইংলণ্ড ও ওয়েলসে যত লোক আছে তাহাদের মধ্যে শতকরা তিন জন লাইব্রেরী এলাকার বাহিরে বাস করে। তাহাদের নিকটস্থ যে লাইব্রেরী আছে, তাহা মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীই হউক, কৌণ্টি লাইব্রেরীই হউক, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ক লাইব্রেরীই (Special Library) হউক, সেইখানে লিখিলেই বই যোগান হইয়া হইয়া থাকে। যদি ঐসব লাইব্রেরীতে কোনও বই না পাওয়া যায় তাহা যত দুষ্প্রাপ্য বই-ই হউক না কেন,

একটি বালক লাইব্রেরী পুস্তকের অন্তর্গত নির্দ্দেশ দেখিয়া পালওয়ালা জাহাজ প্রস্তুত করিতেছে

National Central Library যেখানে সেই বই আছে তাহা আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। National Central Libraryতে প্রত্যহ এইভাবে বাহির হইতে ২০০ হইতে ৪০০ পুস্তক যোগাইবার চাহিদা আসিয়া থাকে। গত বর্ষে ৬১, ৬৩০ খানি পুস্তক এই লেনদেনের সাহায্যে আনাইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া ১৩টী বিভিন্ন দেশের ২৯টী লাইব্রেরীর সহিত পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

National Central Library বাহির হইতে পুস্তকের চাহিদা পাইলে প্রথমে দেখেন তাঁহাদের লাইব্রেরীতে সেই বই আছে কি না; যদি না থাকে যুক্ত পুস্তক তালিকা দেখিয়া আর কোনও লাইব্রেরীতে সেই বই আছে কি না দেখা হয়; যদি তালিকায় না থাকে কোথায় সে বই পাওয়া যাইতে পারে তখন তাহার খোঁজ খবর লওয়া হয়।

বিশেষ বিশেষ বিষয়ক বই আবশ্যক হইলে তৎ তৎ বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে এমন Outlier লাইব্রেরীতে চাহিদা পাঠান হয়। এইরূপ ৮০টীর উপর বিশেষ বিষয়ক Special Outlierএর সহিত National Central Library যুক্ত আছে এবং তাহাদের সংগৃহীত পুস্তকের নির্ঘণ্টও পৃথক ভাবে রাখা হইয়া থাকে।

বিশেষ বিষয়ক (Special) Outlierএ সাধারণ বিষয়ক Outlierএ সপ্তাহে দুইবার চাহিদা পাঠান হইয়া থাকে।

আবার Outlierএর পুস্তক তালিকায় সে পুস্তক না থাকিলে ৫টী regional bureauxএ সপ্তাহে দুইবার চাহিদা পাঠান হয়। Regional এলাকার ভিতর যে ২২২টী লাইব্রেরী আছে তাহাদের লইয়া একটী যুক্তপুস্তক তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। তাহার একখণ্ড National Central Libraryতে রাখা হইবে, তাহাতে কাজের আরও সুবিধা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের চাহিদা আসিলে সেগুলি সপ্তাহে দুইবার ৩৪টী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ লাইব্রেরীতে পাঠান হইয়া থাকে।

বিদেশীয় পুস্তক যাহা বিলাতে পাওয়া যায় না তাহার চাহিদা আসিলে যে দেশ হইতে সেই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে সেই দেশের লাইব্রেরী কেন্দ্রকে সেই বই পাঠাইবার জন্য লেখা হয়। আবার সে সব দেশের চাহিদা আসিলে National Central তাহা যোগাইয়া থাকে।

গুরুতর বিষয়ের পুস্তকের চাহিদা সম্বন্ধেই এই সব ব্যবস্থা আছে। সস্তা বই বা নাটক নভেল এভাবে যোগান হয়না।

স্কটল্যাণ্ড (Scotland) এবং আইরিশ ফ্রী ষ্টেটে

(Irish Free State) regional scheme প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব চলিতেছে। তবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য এখন Scottish Central Library এবং Irish Central Libray অন্যস্থান হইতে দুষ্প্রাপ্য বা মূল্যবান বই আনাইয়া দিয়া থাকে। এই দুইটী দেশের Central Library বিলাতের regional bureaux-র মত National Central Libraryর সহিত সংযোগ রাখিয়াছে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে বেসরকারী ভাবে regional

দুইটি বালিকা কাগজের পুতুল এবং সজ্জা প্রস্তুত করিয়া সাধারণ লাইব্রেরীর প্রদর্শনীতে দিয়াছে

system প্রচলিত আছে। বেলফাষ্ট্ সাধারণ পাঠাগারের হাত দিয়া National Central Libraryর সহিত পুস্তক লেন দেন চলিয়া থাকে।

এই সব পুস্তক যোগানর জন্য বা খবরাখবরের জন্য কোনও খরচা লাগে না, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে পুস্তকগ্রহীতাকে পুস্তক পাঠান এবং ফেরৎ আনার ডাক খরচা দিতে হয়। বিশেষ National Central Library সম্বন্ধে এতটা বিশদভাবে বলার উদ্দেশ্য হইতেছে—কলিকাতায় ঐ ভাবের কোনও ব্যবস্থা হইতে পারে কি না তাহার আলোচনা করা। কলিকাতা করপোরেশান যদি একটী সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং কলিকাতার সব লাইব্রেরী তাহাতে সংযুক্ত হয় এবং পরস্পর পুস্তক লেন দেনের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মূল্যবান পুস্তক ক্রয়ের অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়। সে টাকায় অন্য বিষয়ে লাইব্রেরীর উন্নতির ব্যবস্থা হইতে পারে।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইন এখন বিলাতে বোর্ড অফ্ এডুকেশনের সভাপতি। তিনি বিলাতের লাইব্রেরী এসোসিয়েশানের নবগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে বলেন যে, সে দেশে অন্যান্য সকল বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে বটে কিন্তু কেবল পাঠাগারগুলির বরাদ্দ না কমাইয়া বরং স্থানে স্থানে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতে বরোদা রাজ্যে লাইব্রেরীর জন্য বরাদ্দ বাড়িয়াই চলিয়াছে। কলিকাতা করপোরেশানকে আমরা ভারতের আদর্শস্থানীয় দেখিতে পাই। এখানে আদর্শ পাঠাগার যাহাতে পরিচালিত হয় তাহার জন্য বরাদ্দ না কমাইয়া বরং বাড়ানই আবশ্যক। কলিকাতায় যত পাঠাগার আছে সব সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিৎ। পরস্পরের মধ্যে পুস্তক বিনিময় প্রচলন অত্যাবশ্যক হইয়াছে সে কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লাইব্রেরীগুলি কেবল বরাদ্দের টাকা—কতকগুলি বই কিনিয়া তাহার খরচ দেখাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; এই দুর্দ্দিনে তাহারা কিরূপে করদাতাদের কাজে আসিতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। আর অপেক্ষাকৃত বড় লাইব্রেরীতে বিশেষজ্ঞ লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ আবশ্যক। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট জানিতে চান, তাঁহারা লাইব্রেরী বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ করিবার জন্য ক্লাস খুলিতে প্রস্তুত আছেন কি না। সিণ্ডিকেট একটী কমিটীর উপর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের ভার দেন। কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের ক্লাস খুলিবার পরামর্শ দেন। সিণ্ডিকেট সেই পরামর্শ মত

গবর্ণমেণ্টকে লাইব্রেরীয়ান শিক্ষা ক্লাস খুলিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। খুব সম্ভব গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন। তাহা হইলে বড় বড় লাইব্রেরীতে বিশেষজ্ঞ লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ সম্ভবপর হইবে।

কানেকটিকাটের একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা বেতারের বার্ত্তা প্রেরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে

পরিশেষে আর এক কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। আজকাল সাহিত্যের নানা আবর্জ্জনা আসিয়া বাণীমন্দির কলুষিত করিতেছে। লঘু সাহিত্যের বা light literture এর দোহাই দিয়া trash literature বা আবর্জ্জনা যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, বাণীমন্দিরের পবিত্রতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য সকলে অবহিত হউন। কেহ কেহ বলেন চাহিদা বুঝিয়া মাল না যোগাইলে লাইব্রেরী টিকিবে কি করিয়া? তাহার উত্তরে আমি বলিতে চাই—সাধারণের রুচি উন্নত করিবার গুরুভার প্রত্যেক লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষকে লইতে হইবে—কর্ম্মক্লিষ্টের চিত্ত-বিনোদনের উপযোগী চিত্তোৎকর্ষসাধক সাহিত্যের (recreative literature) অভাব নাই তাহার দিকে লোকের চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয় তাহা করিতেই হইবে। যাহাতে নৈতিক অবনতি ঘটে এরূপ পুস্তকের স্থান লাইব্রেরী নহে। কলিকাতা করপোরেশানের বর্ত্তমান প্রধান কর্ম্মকারক (Executive Officer) কিছুদিন পূর্ব্বে অভিযোগ করিতেছিলেন যে কলিকাতার বেশীর ভাগ লাইব্রেরীর পুস্তক দাদনের বহি (Issue Register) দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন যে, গুরুতর বিষয়ক পুস্তকের (Serious reading) পাঠক দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, অপরদিকে নাটক নভেলের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। আমার বোধ হয় গুরুতর বিষয়ের পাঠক বাড়াইবার জন্য নাটক নভেল ছাড়া আর সব বই বিনা চাঁদায় পাঠককে দেওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমরা এবিষয়ে ২।১টী লাইব্রেরীতে পরীক্ষা করিয়াছি, তাহার ফল মোটের উপর সন্তোষজনক দাঁড়াইয়াছে।

সর্ব্বজাতির আধার—ক্যালিফর্ণিয়া

আমাদের দেশে উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব বোধ করায় শ্রীপ্রমিলচন্দ্র বসু নামক জনৈক উৎসাহী যুবককে আমরা বরোদা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করিয়াছি। তিনি এপ্রেল মাসেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আমরা যাহাতে তাঁহাকে কাজে লাগাইতে পারি ও তাঁহার সাহচর্য্যে কতকগুলি কর্ম্মী তৈয়ারী করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সকল লাইব্রেরীই সকাল ও বৈকাল তো খোলা থাকা চাই-ই, তাছাড়া দুপুরবেলা যাহাতে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মধ্যে সেখানে লইয়া যান এবং গ্রন্থাগারিক তাহাদের পাঠাগারের ব্যবহার শিখান তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পাঠাগারগুলিকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যায়াম প্রভৃতি পল্লীর সকল সদনুষ্ঠানের এবং নাগরিকের কর্ত্তব্য শিক্ষার কেন্দ্র করিতে হইবে। আর প্রত্যেক লাইব্রেরীর সহিত যাহাতে শিশুদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকে তাহার ব্যবস্থা করাও অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

হাওয়াই শিশু লাইব্রেরীতে শিক্ষিতা গ্রন্থাগারিক মিস্ স্যাডি হফ্‌ম্যান শিশুদিগকে গল্প শুনাইতেছেন

শৈশব হইতে পাঠানুরাগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে—তবেই পাঠানুরক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। পুস্তকের মত সৎসঙ্গ আর কোথায় মিলিবে? জগতের যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু চিত্তরঞ্জক, যা কিছু স্পৃহনীয়—সবই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ আছে,—গ্রন্থাগারের ন্যায় বিশুদ্ধ আনন্দের স্থান জগতে আর আছে কি? যুগে যুগে কত মহাপুরুষের উদ্ভব এবং বিলয় ঘটিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার ধারা এখানে আটক পড়িয়া গিয়াছে। স্কুল কলেজ নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের শিক্ষার স্থান—সে শিক্ষা পাইতে হয় কড়া শাসন এবং নিয়ম কানুনের ভিতর দিয়া। আর গ্রন্থাগারের শিক্ষার কালাকাল নাই,—ইহা আজীবন শিক্ষার স্থান,—স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান সঞ্চয়। প্রত্যেক গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট পাঠচক্র থাকিলে জ্ঞানার্জ্জনের উৎকর্ষ সাধিত হয়। শিশু বিভাগে তেমনি গল্পের ক্লাস বড় লোভনীয় বস্তুতে দাঁড়াইয়া যায়। শিশু হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের এমন সহজ উপায় আর নাই। গল্পের আশ্রয় লইয়া ইতিহাস, জীবন চরিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি জটিল বিষয়ও হৃদয়গ্রাহী করা যাইতে পারে। খেলাধুলার মধ্যে দিয়াও কত শিক্ষনীয় বস্তু সহজে বোধগম্য করা যাইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম যদি জাতিকে বড় করিতে হয়—মানুষের মত মানুষ তৈয়ার করিতে হইবে। গোড়ার পত্তন ভাল করিতে হইবে—গোড়ায় গলদ থাকিয়া গেলে আর উপায় থাকে না, সেজন্য শিশুদের বাদ দিলে চলেবে না,—তাহাদের জন্যও প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়

স্বপ্নাতুর

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

রান্না প্রায় সবই হইয়া গিয়াছে, বাকী খালি কুম্‌ড়া আর পটোল ভাজা। কুমড়ারখণ্ড আর পটোলগুলিতে হলুদ আর নুন মাখাইয়া উনানের উপর কড়াতে চাপাইতে গিয়া দেখে ভাঁড়ে আর একবিন্দু তেল নাই। যে দু'এক ফোঁটা আছে, ইহা দিয়া ওগুলি ভাজা তো হইবেই না, মাঝখান হইতে সবই পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। সকালবেলাই তেল আনা উচিৎ ছিলো, কিন্তু ভাবিয়াছিল, এ বেলার মতো ইহাতেই কুলাইয়া যাইবে। তা' প্রায় কুলাইয়া গিয়াছিলও, ভাজায় আসিয়া ঠেকিয়া পড়ে।

কড়াটা ফের উনান হইতে নীচে নামাইয়া রাখিয়া ভাঁড় হাতে করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রূপসী ডাকিল, দাদা!

ঘরের ভিতর হইতে সাড়া আসে, ডাক্‌ছিস্ নাকি রূপু?

—হ্যাঁ। শাগ্‌গীর গিয়ে দোকান থেকে তেল এনে দাও। রান্না আমার উনুনের ওপর, ভাঁড়ে একফোঁটাও তেল নাই। ওঠো তাড়াতাড়ি—

শোনা যায়: আধঘণ্টাখানেক পরে গেলে হয়না রে রূপু? হাতের কাজটুকু—

রূপসী চটিয়া উঠে। কি যে তোমার আক্কেল দাদা, রান্না আমার ওদিকে নষ্ট হ'য়ে যায়, আর তুমি আধঘণ্টা পরে যাবে? ও ঘোড়াড্ডিম ফেলে রেখে এখন বেরিয়ে এসো, এক মুহূর্ত্ত আমার ব'সে থাক্‌বার জো নেই।

অগত্যা সুকুমার কাছাটা গুঁজিতে গুঁজিতে বাহির হইয়া আসে, দে তোর তেলের ভাঁড়। কতোটুকু আন্‌তে হবে?

—এখনকার মতো পোয়াটাকখানেক তো নিয়ে এসো। আর দেরি করোনা কিন্তু মোটেই, এই গেলে আর চোপের পলকে ফিরে আস্‌বে।···হ্যাঁ, আর পয়সা চারেকের সোডা নিয়ে এসোতো, লেপের ওয়াড়, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর কতোগুলো ময়লা হ'য়ে র'য়েছে, পারিতো আজ্‌কেই সব কেচে ফেল্‌বো। শোয়া যায় না আর। কি নোংরা হ'য়েছে—রাম্।

—তেলের ভাঁড়টাকে হাতে লইতে লইতে সুকুমার বলে, সোডাতো আন্‌বো, কিন্তু পয়সাই যে—

রূপসী ঝঙ্কার দিয়া উঠে। তা' হবেও না কোনোদিন তোমার পয়সা। অদৃষ্টে তোমার অনেক কষ্ট আছে।—

হাসিয়া সুকুমার বাহির হইয়া যায় কৈলাস বৈরাগীর দোকানের দিকে।

সুকুমারকে লইয়া রূপসী সত্যই বড়ো ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কি যে তাহার খেয়াল, লেখাপড়া শিখিয়াছে—অথচ কোনো কাজ করিবে না কাম করিবে না—হইবে নাকি মস্ত বড় একজন সাহিত্যিক! ঘরের কোণে বসিয়া দিবারাত্রি কি যে সব ছাইমাটি মাথামুণ্ডু লিখিতেছে—মানা করিলেও শুনিবে না, বুঝাইয়া বলিলেও বুঝিবে না। এই অভাবের সংসার—অথচ সে সব দিকে উপযুক্ত হইয়া উপার্জ্জনের কোনো চেষ্টা করিবে না। হ্যাঁ, টাকা পয়সা যদি আসিত, তবে সে গল্প লিখুক, পদ্য লিখুক, আকাশের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া হাই তুলুক—যাহা খুসি তাহা করুক, কাহারো তাহাতে আপত্তি করিবার কোনো কারণ ছিলোনা। কিন্তু এ তাহার কি কাণ্ড! এতোকাল ধরিয়া লিখিতেছে—ছাপা হইয়াছে মাত্র গোটা পাঁচ সাত; আর টাকা তো পাইয়াছে মোটে একটি কাগজ হইতে—অন্য কোনোটা হইতেই কিছু দেয় নাই। দশটি টাকা পাইয়াই তাহার ফূর্ত্তি দেখে কে—একদিন নাকি সে মাসে পাঁচশো টাকা রোজগার করিতে পারিবে। হায়রে, আকাশ-কুসুম, মাথা খারাপ আর কাহাকে বলে!

ইতিমধ্যে সাড়া পাওয়া যায়—আছেন নাকি কেউ ?

রূপসী আগাইয়া আসে, কে, পিওন নাকি ?

—হ্যাঁ, এই লেন্ আপনাদের চিঠি। সুকুমার বাবুর।

চিঠি নয়, একটি বুক পোষ্টের প্যাকেট। মাঝে মাঝে এরূপ প্যাকেট রূপসী আসিতে দেখে সুকুমারের নামে, তবে কি আসে তাহা জানিবার জন্য তাহার বিশেষ কোনো কৌতূহল নাই। তাহার লেখা সংক্রান্তই হয়তো বা কিছু। সুকুমারের এই সাহিত্য-চর্চ্চার কথা মনে হইতেই রূপসী মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠে। সে প্যাকেটটি হাতে করিয়া সুকুমারের অপেক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—

তেল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রূপসীর হাত হইতে প্যাকেটটি লইতে লইতে সুকুমারের মুখখানা একটু শুকাইয়া উঠে।

ঘরে আসিয়া খুলিয়া দেখে, প্রায় মাস কয়েক আগে সে একটি গল্প পাঠাইয়াছিল, তাহাই ফেরৎ আসিয়াছে।

সম্পাদক লিখিয়াছেন :

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আপনার গল্পটি আমাদের পত্রিকার জন্য মনোনীত করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। উহা আপনাকে ফেরৎ পাঠাইলাম। ইতি—

ভবদীয়,
ইত্যাদি ইত্যাদি।...

সম্পাদকগণের এইরূপ অশেষ দুঃখের বোঝা বহন করিয়া কতো গল্পই যে ফেরৎ আসিল! তা' আসুক, ইহাতে সুকুমারের মনে ক্ষোভ নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেকটি ফেরৎ আসিত, আজকাল দু'একটি ছাপা হয়, আর দুদিন পরে অধিকাংশ ছাপা হইবে এবং শেষে যাহা সে পাঠাইবে তাহাই ছাপা হইবে। এমন অবস্থাই হয়তো হইবে যে সম্পাদক আর লেখাটা সম্পূর্ণ করিয়া পড়িবেন ও না—শুধু তাহার নামটা দেখিলেই যথেষ্ট।

এমন খ্যাতি তাহার হয়তো ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে সম্পাদকের চিঠির জ্বালায় সে একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িতেছে—একটি লেখা, অনুগ্রহ করিয়া একটি লেখা......

স্নানের অবকাশ নাই, আহারের অবকাশ নাই, এমন কি রাত্রে ঘুমাইবারো তাহার অবকাশ নাই! ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে লিখিয়া চলিয়াছে—এক একদিনে এক একটি গল্প শেষ, সাতদিনে এক একখানা উপন্যাস শেষ। কবিতা তো দৈনিক পাঁচটা করিয়া!

মাসিকে তাহার লেখার সমালোচনা, সাপ্তাহিকে তাহার লেখার সমালোচনা, দৈনিকে তাহার লেখার সমালোচনা। একদল হয়তো তাহার লেখাগুলিকে বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে, আরেক দল স্তুতির চীৎকারে আকাশ ফাটাইয়া দিয়াছে! তাহার গল্প, উপন্যাসের কথা ছেলেদের মুখে পথে, ঘাটে, মাঠে, লাইব্রেরীতে, ডিবেটিং সোসাইটিতে, প্রতি সাহিত্য সভায়···প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের সাহিত্য আলোচনা!

অসংখ্য মেয়ে হয়তো তাহার কবিতা আওড়ায়, হয়তো বন্ধুবান্ধবের ভিতরে তাহাকে লইয়া আলোচনা করে, কবিতা পড়িবার সাথে সাথে তাহার চেহারার একটি অস্পষ্ট ছায়া হয়তো তাহাদের মনের চোখে ভাসিয়া উঠে···এমন কি কেহ হয়তো মনে মনে তাহাকে ভালোই বাসে, তাহার সহিত আলাপ হইলে হয়তো সে অত্যন্ত সুখীই হইবে!

সুকুমারের সারাদেহে একটি শিহরণ জাগিয়া উঠে।...

আর শুধু বাংলা দেশেই কি? এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন তাহার প্রতিভার সৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীকে উন্মুখ করিয়া তুলিবে। বাংলাভাষার সীমানা পার হইয়া তাহার লেখা যাইবে ইংরাজীতে, ইংরাজী হইতে ফরাসীতে, ফরাসী হইতে জার্ম্মাণীতে! সমস্ত সভ্য-জগত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিবে তাহার দিকে—তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজেরা নিজেদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিবে, এবং তাহার অপূর্ব্বদান তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়া তুলিবে অত্যন্ত একান্ত ভাবে! আর টাকা? সুকুমারের হাসি পায়। আজিকার দারিদ্র্য, আর সেদিনের বিত্তের কথা কল্পনা করিয়া সুকুমার ভাবে—রূপীটা কি ছেলেমানুষ! এমন কি···এমন কি···যদি একদিন সে নোবেল প্রাইজই পায়!

অসম্ভব? কেন অসম্ভব? নোবেল প্রাইজ মানুষে পায় নাই? তাহার পক্ষেও সে পুরস্কার পাওয়া কি ভয়ানক রকমই অসম্ভব? কঠিন হইতে পারে, ভয়ানক কঠিন হইতে পারে, কিন্তু—অসম্ভব? নিশ্চয়ই নয়। যদি···যদি ···একদিন সত্যই সে নোবেল প্রাইজ পায়! রূপীটা যে কি পাগল, এসমস্ত কথা কিছু সে বুঝিবে না। এ যে কি জীবন—এই যশ, এই সম্মান, এর মূল্য কিছুই সে বুঝেনা। আর অর্থেরই বা কিসের চিন্তা? রূপু কি বোঝে যে এমন সময় তাহার আসিতে পারে যখন লোকে তাহার প্রত্যেকটি লাইনের জন্তে টাকা গণিয়া দিবে?··· লক্ষ্মী বোন্ রূপু—আর কিছুটা দিন চুপ্ ক'রে থাকো, ছাখো, আচ্ছা ছাখোই!

সুকুমার সন্ত ফেরৎ প্রাপ্ত গল্পটির দিকে তাকায়। সবই তো ভবিষ্যতের কথা; কিন্তু আপাততঃ তো ভারি মুস্কিলের ব্যাপারই হইয়া উঠিল! সুকুমার বুঝিতেই পারে না যে কেন, কি কারণে এই গল্পটি অমনোনীত হইল। অত্যন্ত চিন্তা করিয়া অত্যন্ত যত্ন করিয়া এটি সে লিখিয়াছে। ইহার ভিতর অশ্লীলতা কিছু নাই, সিডিসাস্ কিছু নাই এমন কি লিখিবার ধরণটাও নিতান্ত খারাপ হয় নাই এবং গল্পের প্লটটিতেও নূতনত্ব আছে!

সুকুমার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গল্পটি আবার পড়ে, কিন্তু উহার ত্রুটি কোথায় ভাবিয়া পায়না।

যাক্, এক পত্রিকায় অমনোনীত হইলেই বা কি, অন্য পত্রিকায় পাঠানো যাইবে। এরূপভাবে তাহার আরো দুইটি লেখা ছাপা হইয়াছে। এক কাগজের রুচির সহিত মিলেনা, কিন্তু অপর কাগজের সহিত মিলিয়া যায়।

সুকুমার গল্পটি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিয়া পুনরায় পূর্ব্বের কার্য্যে হাত দিল।

এটিও আরেকটি গল্প এবং এটিও গত সপ্তাহে ফেরৎ আসিয়াছে।

এ গল্পটি সত্যই ভালো হয় নাই। ঝোঁকের মাথায় লিখিয়া চট্ করিয়াই পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু ফেরৎ আসিবার পরে সুকুমার দেখিল যে প্রকৃতই বিশ্রী হইয়াছে। তাহার যেন লজ্জা বোধ হয়—যে এত্তোবড় একজন সাহিত্যিক হইতে চাহে, এরূপ যাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এরূপ লিখিলে তো তাহার চলিবে না!

অথচ গল্পের বিষয় বস্তুটি ভালো—লিখিতে পারিলে একটি সুন্দর রচনায় দাঁড় করানো যাইতে পারে। সুকুমারের ইচ্ছা হয়না যে লেখাটি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে।

পুনরায় সে সেটিকে লিখিতে সুরু করিয়াছে—কতোক্ষণই বা লাগিবে। শেষ করিয়াই আবার নূতন আরেকটি গল্প সুরু করা যাইবে। সিকিটাক খানেক লেখা প্রায় হইয়াও গিয়াছে, রূপীটা তেল আনিতে না পাঠাইলে আরো খানিকটা ইহার মধ্যে হইয়া যাইত। এবারে এমন চমৎকার করিয়া এটিকে শেষ করিতে হইবে যে ফেরৎ দেওয়া তো দূরের কথা, পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্ত্তী সংখ্যায় ছাপিতে দিয়াও সম্পাদকের তৃপ্তি হইবে না।

অত্যন্ত মনঃসংযোগের সাথে সুকুমার গল্পটি লিখিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল।

দুপুরবেলা খাইতে বসিলে রূপসী সুকুমারের পাতে ডাল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিতে থাকে, দাদা, ব'ল্লে তো তুমি শুন্‌বেও না, ব'ল্‌তে আর ইচ্ছেও করেনা। আগেও ব'লেছি, তবুও আরেকবার একটা কথা ব'ল্‌তে চাই।

ভাত দিয়া ডালটা মাখিতে মাখিতে সুকুমার বলে, আচ্ছা ব'লেই ফ্যাল্ না।

—ব'ল্লে রাখ্‌বে তুমি কথাটা?

—আচ্ছা শুনে তো নিই।

—ছাখো এরকম ক'রে তো আর সংসার চলে না। তোমার মতলব কি বলো দেখি? আমার এক এক সময়ে ইচ্ছে হয় যে তোমার ওই সব কাগজ, খাতাগুলোকে উনোনের ভেতর দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে দি। তুমি বুদ্ধিমান্ ছেলে, অথচ তুমি নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে পারোনা—এ তো ভারি আশ্চর্য্যি।

সুকুমার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, এই কথা আমায় ব'ল্‌তে চাইছিলি?

—না, খালি এ কথা নয়, ব'ল্‌তে চাইছিলুম যে তুমি

একটা চাক্‌রীর চেষ্টা দ্যাখো। আর বে'থা-ও তো কর্‌বে—না কি? আমি বাপু তোমার সংসার এভাবে আর চালাতে পার্‌বো না।

সুকুমার হাসিতে থাকে। রূপু, চাক্‌রীর যে কি বাজার, তুই তো জানিস্ নে! হাজার হাজার ছেলে চাক্‌রীর অভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা'রা চাকরী কর্‌তো, তা'দের হাজার হাজারের চাক্‌রী খতম্ হ'য়ে হ'য়ে যাচ্ছে। দেশের যে কি ভয়ানক অবস্থা জানিস্ নে তো! এই তো সেদিন এক ব্যারিষ্টারের কথা শুন্‌লুম, বাজার-খরচ চালাতে পার্‌ছেনা! বিলেতের এক সহরে এক ডাক্তারের কথা খবরের কাগজে পড়্‌লুম, দেয়ালে বিজ্ঞাপন এঁটে দৈনিক যা' সংস্থান হয়, তাই দিয়ে পেট্ চালাচ্ছে। দুনিয়ার সব্বার অবস্থাই এক রকম হ'য়ে উঠেছে, কেউই বড়ো সুখে নেই।...আর বে'র কথা বল্‌ছিস্...হাসিয়া সুকুমার বলে, ক'র্‌বো বৈ কি, বে নিশ্চয়ই ক'র্‌বো। তবে আর কয়েকটা দিন সবুর কর রূপু। এর মাঝে বউকে এনে খেতে দেয়া তো চাই! ভাখ্ না, এখন তুই ঘাব্‌ড়ে যাচ্ছিস্; কিন্তু আমার যে একটা ভবিষ্যৎ—

—চুলোয় যাক্ তোমার ভবিষ্যৎ। রূপসী মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলে, দুনিয়ার খবর রাখিনে বটে, কিন্তু অন্ততঃ গাঁয়ের খবর তো রাখ্‌ছি! সবারই যতো খারাপই হোক্ অবস্থা আগের চাইতে, ওরি ভেতরে সব্বাই একরকম ক'রে চালিয়েও তো নিচ্ছে। তোমার মতো কেউই নয়। দেশের অবস্থা যা-ই হোক্‌না কেন, তাই ব'লে চুপ ক'রে ব'সে নেই। কাজ-কর্ম্মও থেমে নেই। সবই চ'ল্‌ছে। আর তোমার মতো সব দিক দিয়ে এমন লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে কেউ আছে এ আমার বিশ্বাস হয়না দাদা।

স্মিতমুখে সুকুমার জিজ্ঞাসা করে, এই সব কথাই ব'ল্‌তে চেয়েছিলি তো?

—না, খালি এই সব কথাও নয়। আরো একটি কথা।

—বল্।

—ভাখো দাদা, তুমি একটা দোকান করোনা কেন! নাই বা ক'র্‌লে চাক্‌রী। চাক্‌রীর চেষ্টা ক'র্‌তে বল্‌লেই তুমি এতোদিনও নানারকম অজুহাত দেখিয়ে এসেছো, আজো যে ওই ধরণেরই কথা ব'ল্‌বে, সে আমি আগেই জানতুম। আমি বলি কি, ব্যবসার কাজে অসম্মানেরো কিছু নেই, অথচ দু'চার পয়সা যে না হবে—

সুকুমার যেন একটু বিরক্ত হয়। তুই কিচ্ছুই খবর রাখিস্‌নে রূপী, তাই এসব কাজে কথা ব'ল্‌ছিস্। ব্যবসার কি সেই দিন আছে নাকি? লাখ লাখ টাকার যার কারবার, এমন সব লোকেরা লালবাতি জেলে গণেশ উল্‌টিয়ে বসাচ্ছে। আর খালি কি আমাদের দেশে? দুনিয়ার—

—ভাখো দাদা, কথায় কথায় দুনিয়া দুনিয়া ক'রো না, আমার ভারি রাগ ধরে। তোমার ওই সব লম্বা চওড়া কথা তো আমি শুনতে আসিনি, যা' ভাব্‌বে একটু ছোট খাটোর ওপর দিয়েই প্রথমটা ভাব্‌তে চেষ্টা করো। এই তো ভাখো, আমাদের এতোবড় গ্রামটায় একখানা ভালো দোকান নেই। একটি জিনিষের দরকার পড়্‌লে ছুট্‌তে হবে কৈলেশ বোরেগীর দোকানে; কিন্তু সে কি একটা দোকান? না, ছাই? কিচ্ছুই তো থাকেনা— তবুও তো এক দোকান! গাঁয়ের লোক অহরহ ওর দোকানে যাচ্ছে, ও বেশ নিজেরটা নিজে চালিয়ে নিচ্ছে। আমি বল্‌ছি কি, তুমি একখানা দোকান বাড়ীর ওপর দাও। একটু ভালো ক'রে যদি চালাতে পারো, খালি যে-সংসার খরচ চ'ল্‌বে তা-ই নয়, তোমার হাতে দু'চার পয়সা জমবেও। কি বলো?

সুকুমার বিব্রত হইয়া বাঁ হাত দিয়া মাথা চুল্‌কাইতে থাকে।

—ব'লে ফ্যালো, যা' ব'ল্‌তে চাও। আর বলা-বলিও বুঝি ফুরিনে, এটা তোমার কর্‌তেই হবে।

—ওসব আমার দ্বারা হবে টবেনা।

বিস্মিত হইয়া রূপসী জিজ্ঞাসা করে, হবে টবেনা কি রকম?

—তার মানে দোকান পত্তর করা আমার চল্‌বে না। ওসব আমি বুঝিই নে মোটে!

রূপসীকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই

সুকুমার উঠিয়া পড়ে ; রূপসী রাগে সাতটা উনোনের আগুনে জ্বলিতে থাকে বসিয়া বসিয়া।

কিন্তু রূপসী একেবারে ছাড়িবার পাত্র নয়। আরেক সময়ে গিয়া দাদার কাছে বসে।

—লক্ষ্মী দাদা, কথাটা ভেবে ছাখো। চাকরি-বাকরির ওপর আমারো সত্যিই ছেদ্দা নেই। ক'রতে হ'লে তো সেই পঁচিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি—রাম। তুমি এই দিকই ধরো। চিরদিনই কি আর বাড়ীর ওপর এতটুকুন্ এই দোকান নিয়েই ব'সে থাকবে—পুঁজিপাটা বাড়্‌বার সাথে সাথে তোমারো মস্ত বড় ক'রে চালাতে হবে ব্যবসা। গরীব হ'য়ে থাকাটা খুব বড়ো কথা তো নয় দাদা, অবস্থার উন্নতি যে ক'রে হোক্ ক'রতেই হবে। এ সব খামখেয়ালী ক'রে কেন নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারবে? তোমার রাজার সংসার হোক্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—

বোনের গলার সুরে একটি শ্রান্ত বেদনার আভাষ। সুকুমার আজ আর বিরক্ত হইয়া উঠিতে পারেনা। আস্তে আস্তে বলে, সবই তো বুঝ্‌তে পারি ; কিন্তু তুই বুঝ্‌তে পারছিস্ না রূপু, আমার হাতে নেই ব'লতে কিছুই নেই। দোকান দেবার কথা ব'লছিস্, কিন্তু তা'তেও তো প্রথমে টাকার দরকার। তাইবা কোত্থেকে যোগাড় করি। এর মধ্যেই দু' এক জনের কাছে দিব্যি দেনা ক'রে ফেলেছি।

—তা' তুমি ভেবোনা দাদা, যা' সামান্য দু' একখানা জিনিষ আমার র'য়েছে তা থেকে রুলী দুটো কারু কাছে বন্ধক রেখে টাকা সংগ্রহ করো। আর প্রথমেই তো তুমি এমন একটা জহরলাল-পান্নালাল দিয়ে ব'স্‌ছোনা—এখন অল্প থেকেই সুরু করতে হবে।

সুকুমারের মনটা ব্যথিত হইয়া উঠে। রূপসী তাহার আরো দু' একখানি অলঙ্কার পূর্ব্বেই বাঁধা দিয়াছে—নইলে সংসার চলেনা। সুকুমারের তো কোনোই উপার্জ্জন নাই। ভায়ের একটি সংস্থান যাহাতে হয়, ভায়ের যাহাতে কল্যাণ হয় সেই চিন্তা যেন রূপসীর আর সমস্ত কিছুই ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

সুকুমার লজ্জিত হইয়া বলে, না, রূপু, সে আমি পারবো না। তোর জিনিষে আর আমি হাত দোবোনা। যা' আগেই বাঁধা পড়েছে—তা-ই ফিরিয়ে আন্‌তে পারছি না। আর ব্যবসা-বুদ্ধি সত্যিই আমার নেই, এসবে মাথা আমার মোটেই ঘুরবে না। শেষে টাকাগুলো সবই একেবারে জলে যাবে।

রূপসী কিন্তু আবার রাগিয়া উঠে। মাথা না ঘুরলে চলবেনা—ঘোরাতেই হবে। এই রকম নিত্য ভাবনায় থাকতে থাকতে তুমি একেবারে কুঁড়ের বাদশা হ'য়ে উঠেছো। আরো কিছুদিন গেলে দোকান কেন, কোনো কাজেই তুমি লাগ্‌বে না। সত্যি, তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার মুখে ওই রকম কথা শুনলে আমার ভারি রাগ ধরে। উঠে প'ড়ে লাগো, নিশ্চয়ই পারবে। আগে থেকেই পিছিয়ে যাচ্ছো কেন? আর গয়নার ভাব্‌না আমি করিনে। ঘরে ফেলে রেখে ওগুলোতে মরচে ধরিয়েও তো কোনো লাভ নেই। গয়নাটা বিপদ আপদের সম্পত্তি—কি বড়লোক কি গরীব লোক—সবারই। ও সব কিছু ভেবোনা। ছাখোনা, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গয়না তুমি খালাস করে আন্‌তে পারবে—মা লক্ষ্মী যদি মুখ তুলে চান্।

রূপসী সুকুমারকে বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিয়া যায়, কিন্তু সুকুমারের মনের ভিতর খচ্ খচ্ করিতে থাকে। রূপী বলিয়া গেল—যদি মা লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চান্। যদি!! যদি চান্, তাহা হইলে তো ভালোই হইল ; কিন্তু যদি না চান্ মুখ তুলিয়া? তাহা হইলে?

রূপসী মাঝে মাঝে খোঁচাইতে থাকেই। সুকুমার অবশেষে এক এক সময় কথাটা ভাবিয়াই দেখে।

মন্দ হয় কি একটা দোকান দিয়া বসিলে? সেদিন রূপসী একটা 'যদি' বলিয়াছিল বটে, কিন্তু লিখিয়া অবস্থ ফিরাইবার চাইতে দোকান করিয়া আপাততঃ সংসারে মোটামুটি স্বচ্ছলতা আনাটা ওই 'যদি' সত্ত্বেও অধিক সহজ এবং সম্ভব বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে—স্বচ্ছলতাটা নিতান্ত প্রয়োজনও। তা' ছাড়া দোকান দিলেই বা কি ; তাহার যে সাহিত্য-চর্চ্চা ছাড়িয়াই দিতে হইবে, এমন তে

কোনোই কথা নাই। ফাঁকে ফাঁকে সে লিখিয়াও চলিতে থাকিবে, এমন কি দোকানে বসিয়া বসিয়াই লিখিবে। আর প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ সাহিত্যিকই, অন্ততঃ এই পোড়া দেশের, শুধু লেখার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজও করিতেছে। ভবিষ্যতের কথা নিতান্তই ভবিষ্যতে। আপাততঃ আর্থিক অবস্থা কিছু ফিরাইতে না পারিলে খাওয়া পরাই যে বন্ধ হইবার জোগাড়! এ পর্য্যন্ত সে যতো লেখা পাঠাইয়াছে তাহার কয়টাই বা ছাপা হইল, কতোগুলির তো উদ্দেশই নাই। ছাপা হইল কিনা, অথবা আদৌ হইবে কি-না—কিছুই জানিতে পারে নাই; চিঠি লিখিলেও জবাব পাওয়া যায় না। কি বিশ্রী সত্যি! একটি লেখায় মাত্র কিছু পাইয়াছে তাহাতে বোধ হয় এতোদিনকার ষ্ট্যাম্পের খরচও উঠিয়া আসে নাই! অথচ হাজার বিরক্ত হইয়াও কোনো লাভ নাই, এই রূপই অবস্থা।

রূপী মন্দও বলেনা যাই হোক্। আর চাকুরীর আশা এ বাজারে ছাড়িতে হইবেই; এটা কাজও স্বাধীন, কিছু হইবারো সম্ভাবনা আছে। তাইতো, এভাবে রূপী আর কতোদিন চালাইবে!

রূপীও উস্কাইয়া দিয়াই চলিয়াছে, কি ঠিক করলে দাদা?...

আরেকদিন খাইতে বসিয়া সুকুমার মত করিয়াই ফেলে। বলিল, বেশ, তোর কথাই শুনলুম রূপু, করাই যাক্ একখানা দোকান।

রূপসী খুসি হইয়া বলে, এতোদিনে বুদ্ধির গোড়ায় জল গেল।

রাত্রে দু'জনে মিলিয়া পরামর্শ আঁটিতে থাকে। কি কি জিনিষ দোকানে রাখা যাইবে, কোন্ কোন্‌টা ভালো চলিবে, কিসের দর কি রকম। রূপসী এমন চমৎকার করিয়া গুছাইয়া সব বলিতে থাকে, সুকুমার অবাক হইয়া যায়। নিজের যতোই অজ্ঞতা থাকুক; রূপসীর উপর নির্ভর করিয়া সে ভরসা এবং সাহস গড়িয়া তুলিল। রূপসী বলিল, ষ্টেশনারী জিনিষ পত্র থেকে সুরু ক'রে মুদি দোকানে যা' যা' থাকে, সবই রাখ্‌তে হবে অল্প বিস্তর! তুমি কিচ্ছু ভাব্‌না ক'রোনা দাদা। সুরু ক'রে দিলেই কাজ দেখ্‌বে সহজ হ'য়ে আস্‌বে ক্রমে ক্রমে।

রাত্রেই সমস্ত সিদ্ধান্ত দু' ভাই বোনে স্থির করিয়া ফেলিল।

পরদিন অলঙ্কার বাক্স হইতে বাহির করিতে গিয়া রূপসী কিছুতেই চোখের জল রাখিতে পারে না। হারছড়া, এক জোড়া দুল, দুটি রুলী এবং কয়েকগাছা চুড়ি রহিয়াছে। দরিদ্র পিতা বিশেষ কিছু দিতে পারিয়াছিলেন না। ইহা তাহার স্বামীর দেওয়া এবং ইহাই তাঁহার শেষদান। মাতৃহীনা কন্যাকে পিতা দেবতার মতো সুন্দর স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। পিতা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন, তাহার পরে স্বামী। ক'টি দিন? হয়তো তিনটি বৎসরও পূর্ণ হইয়াছিল না। সেই তিনটি বৎসরের মধুর, করুণ স্মৃতি রূপসীর বুকের ভিতরে চাপা আগুনের মতো ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বুকের সবটুকু যেন নিঃশেষে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

পাছে সুকুমার কিছু টের পায়, নীরবে চোখের জল মুছিয়া দেবতার দেওয়া শেষ চিহ্নগুলি হইতে রুলী দুটি তুলিয়া বাহিরে আসিয়া সহজ, শান্ত, হাসিমুখে সুকুমারের হাতে তুলিয়া দেয়। রূপসী বহুকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করে; কিন্তু বুকের পূজা-বেদীর সম্মুখে স্পষ্টতম, সুন্দরতম, জাগ্রত-তম আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া ভায়ের কল্যাণ কামনায় তাহার অন্তর সহসা যেন অত্যন্ত উদার মহান হইয়া উঠে। তাহার আজিকার প্রিয়তম সামগ্রী দিয়া সে দাদাকে সাহায্য করিবে। দাদা উন্নতি করুক্, দেবতার শেষ আশীর্ব্বাদ তাহার নিকটে আবার শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া ফিরিয়া আসিবে।...

চার মাইল দূরে নদীরধারে খুব বড়ো না হইলেও আলমগঞ্জ বন্দর নিতান্ত ছোট নয়। সেখান হইতেই জিনিষপত্র সব আনিতে হইবে।

যেদিন সুকুমার রওনা হয়, রূপসী বার বার করিয়া ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিল, টাকা পয়সা খুব হুঁসিয়ার। আর মালপত্রও দেখিয়া শুনিয়া বুদ্ধি খরচ করিয়া কিনিতে

হইবে, হিসাবটিসাবও সর্ব্বদা মিলাইয়া রাখিতে হইবে; কিছু যেন গোলমাল না হয়। রূপসীর উপদেশগুলি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুকুমার রওনা হইল অবশেষে আলমগঞ্জে।

বাজারের ভিতরে জন চারেক কুলী লইয়া সুকুমার এ-দোকান হইতে ও-দোকানে ঘুরিতে থাকে। কেরোসিন তেল, নারিকেলের তেল, খেজুরে গুড়, সরিষার তেল ইত্যাদিতে কয়েক টিন হইল। কয়েক রকমের ডাল, লবণ, চিনি, মিছরি, তেজপাতা—বস্তা বোঝাই আলাদা গেল। ষ্টেশনারী জিনিষপত্রও কম হইল না—কাগজ, পেন্সিল, নিব, দোয়াত, সাবান, চা, ছুঁচ, সূতা······ইত্যাদি ইত্যাদি। গোটা পাঁচ সাত খালি কেরোসিন কাঠের বাক্সও সুকুমার কিনিল, ইহার ভিতরেই জিনিষগুলি গুছাইয়া রাখিতে হইবে।

সুকুমার আলমগঞ্জে পৌছিয়া প্রথমেই গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। কুলীরা সেই গাড়ী বোঝাই করিয়া সমস্ত মাল সাজাইতে সুরু করিল।

এক রকম প্রায় সমস্তই কেনা হইয়াছে, এইবারে গাড়ী বোঝাই সারা হইয়া গেলেই রওনা হওয়া যায়।

সকালে দশটার সময়ে খাইয়া বাহির হইয়াছে, এতোটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে, তাহার পর এতোক্ষণ ছুটোছুটি করিয়া পরিশ্রম কম হয় নাই। বিকালবেলা সুকুমার যে বাড়ীতে কিছু খায় তাহা নহে, কিন্তু আজ যেন ক্ষুধা লাগে। জল-তেষ্টাও পাইয়াছে দারুণ। সুকুমার গায়ের একটি মিঠাইএর দোকানে আসিয়া দাঁড়াইল।

দোকানী বলে, এই মাত্তর সন্দেশটা নামালাম বাবু, খান্ ব'সে। আপনাকে আর বাসী খাবার দেবনা, খেয়ে দেখুন এই টাট্‌কা জিনিষটা—দাম ইচ্ছে হয় দেবেন্ ইচ্ছে হয় দেবেন না। তবে আর কারো তৈরি সন্দেশ খাওয়ার সময়ে এই গদাই ময়রার নামটা না নিয়ে পার্‌বেন্ বলে তো বোধ হয় না। এ কথা বল্‌তেই হবে যে হ্যাঁ খেয়েছিলাম বটে।

বাস্তবিকই তাই। গদাই খাসা সন্দেশই বানাইয়াছে। সুকুমার বসিয়া বসিয়া পোয়া দেড়েক খাইয়া ফেলে। শেষে জল খাইবার সময়ে মনে পড়িয়া যায় রূপসীর কথা। কিছু লইয়া গেলে মন্দ হয় না। এমন চমৎকার সন্দেশ সে একলা খাইয়া গেল; আর রূপু খাইবে না?

সুকুমার বলে, একটা পুঁটুলী ক'রে সের দেড়েক ওজন ক'রে দাও দেখি গদাই, বাড়ী নিয়ে যাই। বেশ বানিয়েছো।

হাসিয়া গদাই বলে, কাছাকাছি দশটা গঞ্জের ভিতরেও এই গদায়ের দোকানের খাবারের মতো খাবার আর পাবেন্ না, একথা গদাই বড়াই ক'রেই বল্‌ছে বাবু। বিনোদপুরের রায় সায়েব মশার নাতনীর বিয়েতে ক্ষীরমোন্ দিয়ে মেডেলও এই গদাই পেয়েছিলো।

সুকুমার সন্দেশের দামটা গদাইএর হাতে দিয়া পুঁটুলীটি হাতে করিয়া আসিয়া দেখে গাড়ী তৈরি। গাড়োয়ান বলিল, আর দেরী কর্‌বেন না বাবু, এক্ষুণি বেলা প'ড়ে আসবে। আপনার মাল পৌছে দিয়ে ফের আমায় রওনা হ'য়ে আসতে হবে। বেশী রাত্ হ'য়ে গেলে বড়ো মুস্কিলে পড়্‌বো।

সুকুমারও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। গাড়োয়ান গরু দুটির লেজ মুচ্‌ড়াইয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলো।

মেঠো রাস্তার উপর দিয়া চলিতে চলিতে সুকুমার আন্‌মনা ভাবে দূর আকাশের গায়ে আসন্ন সন্ধ্যার আভাষের দিকে তাকাইয়া থাকে। আকাশের দূর-সীমানায় মেঘের উপরে বিচিত্র বর্ণে ছড়াইয়া পড়া ওই অস্তসূর্য্যের রশ্মিগুলির গায়ে এমন মুহূর্ত্তে কি অসীম রহস্য জাগিয়া উঠে, রূপু তাহা বুঝেনা। ওই যে বিলের কচুড়ি পানার ভিতর হইতে ডাহুক্ পাখীগুলি শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দ এমন উদাস অপরাহ্নে তাহার মনকে কিরূপ তোলপাড় করিয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহাও রূপু জানেনা। রূপু জেদ ধরিয়াছে তাহাকে দোকান করিতে হইবে। তাহাই অবশ্য সে করিবে, সেইজন্যই এতো আয়োজন। কিন্তু অর্থের চিন্তা না থাকিলে এমন সময় এই স্থানে আসিয়া সে বসিয়া বসিয়া কবিতা লিখিত। রূপু চায় সংসারের স্বচ্ছলতা। দোকানের ডানায় ভর করিয়া তাহা উড়িয়া আসিবে।···

হয়তো ইহা সত্য যে আগাছার মতো লেখক গজাইতেছে

সহস্র সহস্র, আনাচে কানাচে। হয়তো ইহাও সত্য যে সম্পাদককে ত্রস্ত করিয়া বন্যার স্রোতের মতো মাসিক পত্রিকার আপিসে লেখা ঢুকিতে থাকে। কিন্তু তাহার এই একান্ত সাধনা কি ব্যর্থই যাইবে? মানুষেই নাকি ভগবানকেও লাভ করিয়া থাকে—আর তাহার সিদ্ধিই কি কেবল সম্পূর্ণ অসম্ভবের দুর্লভ্য-শিখরে বসিয়া তাহাকে উপহাস করিতে থাকিবে?

আকাশের গায়ে আর খানিকক্ষণ পরেই যে তারাটি টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে, সেই তারাটি হইতে সুরু করিয়া এই পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ধূলিকণা পর্য্যন্ত কবিতা! ওই যে তাহার বনে-ঘেরা গ্রামটির উপর ছায়া নামিয়া আসিয়াছে, এই যে পথটি মাঠের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই যে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে ঝাঁকানির তালে তালে এই গরুর গাড়ীখানার একটানা গতি—ইহার প্রত্যেকটি এক একটি কবিতা! বাহিরের আলো, আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, বন—সমস্ত কিছু তাহার প্রাণের স্পর্শের ভিতর দিয়া কবিতায় রূপায়িত হইয়া উঠিতে পারে! সে করিবে সৃষ্টি, তাহারি ভিতর দিয়া সকলে তাহাকে বুঝিবে, তাহার যোগ্যতার সন্ধান লাভ করিবে! তাহার সাথে সাথে সেই কবিতায় বিশ্বের সমস্ত গূঢ়-রহস্যের সহিত পরিচিত হইবার আনন্দ প্রত্যেক মানুষে বাটিয়া লইবে, তাহাদের জীবন-যাত্রার প্রত্যেকটি অঙ্গ সুন্দরতর হইয়া উঠিবে! থাক্। রূপু থাক্, দোকান থাক্, এই পারিপার্শ্বিকের ভিতরেই তাহার এই মধুর ধ্যান অন্তরের এক নিভৃত কোণে জন্মভর বাঁচিয়া রহিবে।—

বাড়ী পৌঁছিয়াই সুকুমার প্রথমে সন্দেশের পুঁটুলীটি হাতে করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া রূপসীর সন্ধান করে।

শুনিয়া এবং দেখিয়া রূপসী কিন্তু তেমন খুসি হয় বলিয়া মনে হয়না। বলে, এ আবার কেন নিয়ে এসেছো দাদা আমার জন্যে, গোড়াতেই বেহিসেবী হ'লে কি চলে? তোমার দোকান ভালো ক'রে চলুক্, এর পরে তখন সন্দেশ এনে দিয়ো।

একটু অপ্রস্তুত হইয়া সুকুমার বলে, নে রূপু, ভারি তো ওস্তে গিয়েছে, অতো হিসেব আমার দ্বারা হবে টবেনা। কাল্কে তোর একাদশীর দিন, খাস্। তুলে রেখে দে।

সে যে দোকান করিতেছে এ খবর পূর্ব্বেই পাড়ার উপরে নিজেই রটাইয়া দিয়াছিল। পরদিন দু'চারজনে দেখিতে আসেন। সকলেই সুকুমারকে উৎসাহ দেন, বলেন, এবার থেকে তাহ'লে সুকুমারের কাছ থেকেই জিনিষ নিতে হবে।

পাশের বাড়ীর বটু আসিয়া বলে, তোমার ওপর কৈলেশ বোবেগী যা' খাপ্পা হ'য়েছে সুকুদা!

সুকুমার একটু আঁচ করিতে পারে, জিজ্ঞাসা করে, কেনরে?

—তুমি তা'র দোকান মাটি ক'রে দিলে, সে চটবে না? এখন কি আর কৈলেশের দোকানে কেউ যাবে? তবে কৈলেশ বল্ছিল সে নাকি বাজারের ওপর গিয়ে দোকান দেবে—আরো বড় ক'রে।

হাসিয়া সুকুমার বলে, বেশ, তাই দিক।

বাহিরের ঘরখানার চেহারা একদিনেই বদলাইয়া গেল। সুকুমারের বাবা বাঁচিয়া থাকিতে এই ঘরটিতে গাঁয়ের বৃদ্ধদের প্রাত্যহিক তাশ পাশার আড্ডা বসিত। তা' ছাড়া বাহিরের যে কেউ আসিলে এইটাই ছিলো বসিবার ঘর, এবং থাকার মধ্যে থাকিত কতোগুলি হুঁকা, কয়েক ডিবা তামাক, একটি ভাঙা টিন বোঝাই টিকা এবং একটি গাড়ু।

তিনি মারা যাইবার পরে ঘরটা এক রকম পড়িয়াই ছিল। রূপসী উহার ভিতর টানিয়া আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল কতোগুলি বাজে জিনিষ পত্র।

সেগুলি সরাইয়া ফেলিয়া ঘরটাকে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সুকুমার দিব্য দোকান সাজাইয়া ফেলিল।

দোকান চলিতে থাকে। কেহ যখন জিনিষ কিনিতে আসে, তাহাকে তাহা দিয়া সুকুমার বসিয়া বসিয়া গল্পের প্লট ভাবিতে থাকে। এখন তাহার লিখিয়া চলিতে হইবে অবিশ্রান্ত ভাবে—বহুদিকে মন দিয়া অপব্যবহার করিবার মতো সময় এবং শক্তি তাহার নাই এখন। হাতে আর একটাও গল্প নাই, শীঘ্রই দু'চারিটা লিখিয়া ফেলিবা প্রয়োজন। কয়েকটি কবিতা আছে, সেগুলি কয়েক

কাগজে পাঠানো চলিবে, কিন্তু আপাততঃ টাকার জন্ত কয়েকটি গল্প শীঘ্র যাহাতে বাহির হয় তাহার ব্যবস্থা না করিলে হইবে না। যশ চাই—অর্থ চাই! ছ'মাস এক বছর পরে একটি লেখা ছাপা হইলে কেহ তাহাকে জানা দূরে থাক্, নামটাও মনে করিয়া রাখিবে না। প্রত্যেক মাসে তাহার লেখা ছাপা হওয়া চাই—প্রত্যেক কাগজে তাহার নাম লোকের নজরে পড়া চাই। যশ, অর্থ আপনি আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে!

গিরি ঠাকুরাণী আসেন। বলেন, শুকু বাবা, তোমার দোকানে তামাকের পাতা আছে বাবা? ভালো পাতা?

সুকুমার বলে, হ্যাঁ পিসি, রেখেছি সের দু'তিন। তা' তোমার কতোটুকু দরকার?

—তা' বাবা গোটা তিনেক পাতা যদি আমাকে দিতে! ওবাড়ীর সরোজিনীর কাছ থেকে সেদিন আধখানা পাতা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, পুড়িয়ে গুঁড়ো ক'রে যেটুকু হ'ল; তা' দু'দিনেই ফুরিয়ে গেল। কাল থেকে এ অবধি একটু গুঁড়ো মুখে দিতে পারিনি; মুখ যেন একেবারে তেতো হ'য়ে উঠেছে।

সুকুমার একটি বাক্সের ভিতর হইতে তিনটা পাতা তুলিয়া লইয়া বলিল, এই নাও পিসি, ধরো।

—তা' বাবা দামটাম কিন্তু আমি দিতে পারবো না—

—দাম তোমায় দিতে হবেনা, অম্নিই তুমি নিয়ে যাও।

—আহা, বাঁচালি বাবা। ওই যে সরোজিনী, বুঝ্লিনে, ও একেবারে কেপ্পনের হাঁড়ি। আচ্ছা, তুই-ই বল্ বাবা, সংসারে ওদের কিসের অভাব? পাঁচ পাঁচটি ছেলে—সকলে রোজগেরে। জমি-জাতিও বড়ো নিতান্ত কম নয়। অথচ এমন ছোট স্বভাব যে তা' আর তোকে কি বলি বাবা। সেদিন্ আমি সের দুই চাল চাইলাম, সরোজিনী পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিলো। হাত দিয়ে একটু বিন্দু জিনিষ গলাতে চায়নারে বাবা!

গিরি ঠাকুরাণী চলিয়া গেলে সুকুমার এই স্ত্রীলোকটির জীবনের কথা ভাবিতে থাকে। মানুষের জীবনের কি ভয়ানক মূর্ত্ত ট্র্যাজেডী! বর্ম্মা মুলুকে স্বামী এক সাহেবের কাছে ভালো চাকরী করিতেন। যেমন উপার্জ্জন করিতেন, উড়াইয়াছেনও দুই হাতে। গিরি ঠাকুরাণীর গায়ে তখন গহনা ধরে নাই, মাটিতে পা ফেলিতে পর্য্যন্ত চাহিতেন না। এক একবার দেশে আসিতেন, ঝি, চাকর, বামুনে বাড়ী একেবারে সরগরম। পাড়ার সকল মেয়ে বউ দেখা করিতে গিয়াছে, তিনি যাহার বাড়ীর উপরে বেড়াইতে আসিয়া আপ্যায়িত করিয়া গিয়াছেন, সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। গিরি ঠাকুরাণী ছিলেন গ্রামের প্রত্যেকের ঈর্ষার বস্তু; ছেলে নাই, পেলে নাই, এক বিন্দু ঝঞ্ঝাট নাই। রাণীর হালে বারো মাস ত্রিশ দিন পায়ের উপর পা দিয়া শুইয়া বসিয়া কাটাইয়াছেন।

সেই গিরি ঠাকুরাণীর আজ এই অবস্থা। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত একটি বাড়ীতে দু'বেলা রান্না করিয়া দিতেন। তার বদলে খাওয়া, থাকা এবং দু একখান কাপড় পাইতেন। তাহারা জবাব দিয়া দিয়াছে—এখন দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা বৃত্তি হইয়াছে সম্বল। এমন কি কখনো কখনো এমনও শুনা গিয়াছে, কাহারো কাহারো বাড়ী হইতে সুবিধা পাইয়া হাতের কাছের দুটি একটি জিনিষ চুরিও করিয়াছেন; কিন্তু ইহা লইয়া কেহ আর কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই।

মন হইয়া উঠিয়াছে অত্যন্ত নীচ আর কুৎসিত। যাহাদের কাছে হাত পাতিয়া সাহায্য পাইতেছেন—তা সে যাহাই হউক্ না কেন—তাহাদেরই নিন্দা প্রত্যেকের নিকটে অতিরঞ্জিত ভাবে না করিয়া জলস্পর্শ করেন না। মানুষের নিকট হইতে যাহা পান তাহার জন্ত কৃতজ্ঞতার লেশ নাই। যাহা পান না তাহাই লইয়া তাঁহার অশ্রান্ত অভিযোগ। পূর্ব্বের মনোভাব এখনো নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই; এখনো চাহেন যে তাঁহাকে সকলে একটু খাতির করে। কিন্তু খাতির চাহিয়া যাহা লাভ করেন—তাহা সকলের ঘৃণা এবং অসীম উপেক্ষা। দিনের পর দিন গিরি ঠাকুরাণী রুদ্ধ আক্রোশে হিংস্র হইতে হিংস্রতর হইয়া উঠেন।

সমস্ত গিয়াছে, অথচ উহারই মধ্যে বিলাসিতা। দাঁতে তামাকের গুঁড়া না ঘসিলে মুখটা ভালো থাকে না। চাহিয়া বিনা মূল্যে—যে তামাকের পাতা লইতে আসিয়াছেন, তাহা ভালো হইবে কি মন্দ হইবে সেই সম্বন্ধে প্রথমেই সন্ধান লইবার নির্ল্লজ্জতার অভাব ঘটে না। রান্নায় একটু মিষ্টি

না দিলে মুখে রুচে না। পাতে একটু ঘি না হইলে ভাত গলাধঃকরণ করিতে পারেন না। ভিক্ষা করিয়া গালিমন্দ শুনিয়াও এ সব সংগ্রহ করেন। অন্তগত অতীতের ক্রুর পরিহাস।

অথচ তাঁহাদের জীবনের এমন ঘটনাটা ঘটিল অত্যন্তই সহসা। স্বামী নাকি সাহেবের আফিসের ক্যাশ হইতে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা ভাঙ্গিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন সাহেবের হইল সন্দেহ এবং একটি বীভৎস মুহূর্ত্তে দুজনের ভিতরে বচসা। শুধু যে পুলিশে দিবেন; কেবল সেই ভয়ই দেখানো নয়, আফিসের বহু লোকের ভিতরে সাহেব যখন তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন—সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বোধ হয় ইহার সমস্তটুকু পরিশোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রহিলেন।

পরের দিন দেখা গেল কুঠীর বারেন্দায় সাহেব রক্তাক্ত কলেবরে মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। বুক ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলি চলিয়া গিয়াছে। বাবু উধাও।...

তার পরে প্রায় চোদ্দ-পনের বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাঁহার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কোথায় গেলেন, কোথায় আছেন—কেহই জানে না।

একখানি চিঠি নাকি গিরি ঠাকুরাণীকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—তিনি দূরদেশে গা ঢাকা দিলেন, আবার ফিরিয়া আসিবেন; সে যেন অস্থির না হইয়া পড়ে।—

গিরি ঠাকুরাণী এখনো স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছেন। এখনো তাঁহার কপালে সিঁদুরের উজ্জ্বল, প্রকাণ্ড ফোঁটা। পড়নে চওড়া লাল পেড়ে কাপড়। একটু মাছ নিজে জেলে পাড়া পর্য্যন্ত গিয়ে প্রত্যহ চাহিয়া লইয়া আসেন। স্বামী বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়া গিয়াছেন—কিছুই জানা নাই। কিন্তু তবুও গিরি ঠাকুরাণী আশা ছাড়েন নাই। মানুষের সহস্র গঞ্জনা সহ্য করিয়াও কলসী গলায় বাঁধিয়া জলে ঝাঁপ দেন নাই।

প্রথম প্রথম হাতে যাহা কিছু ছিল, কিছুদিন চালাইয়াছিলেন। তাহার পরেই আসিল অভাব। ক্রমে দেনা—তাহার পর ভদ্রভাবে অপরের সহানুভূতি এবং প্রকৃত বেদনা মিশ্রিত সাহায্য গ্রহণ—অবশেষে রাঁধুনী বৃত্তি। এখন তো সম্পূর্ণ ভিক্ষা বৃত্তি। গ্রামের লোকে গিরি ঠাকুরাণীকে লইয়া তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাড়ীর উপরে আসিলে তাড়াইয়া দিতে পারিলে বাঁচে।

কিন্তু সুকুমারের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। গিরি ঠাকুরাণীর কোনো কথায়, কোন কুৎসিত আচরণে সে ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে না—মানুষের জীবনের এমন নিদারুণ অবস্থা বিপর্য্যয়গুলির কথা ভাবিয়া তাহার মন পাষাণের মত ভারি হইয়া উঠে।

চট্ করিয়া সুকুমারের মাথার ভিতরে খেলিয়া যায়—এই গিরি ঠাকুরাণীর জীবন লইয়াই একটি গল্প লিখিয়া ফেলা যায় না?

যে দিন কমল আসিয়া ক্লিপ আছে কি না জিজ্ঞাসা করে, সেই দিনই সুকুমার গেল বিপদে পড়িয়া। নাই শুনিয়া ভুরু, চোখ, মুখ কুঁচকাইয়া ছোট মেয়েটি গভীর বিস্ময়ের সুরে বলে, কিলিপ নেই এ তোমার কেমন দোকান সুকুদা? এতো সব এনেছো, কিলিপ আনতে তোমার কি হয়েছিলো?

সুকুমার উত্তর দেয়; আন্‌তে একদম ভুলে গিয়েছিলাম রে কম্‌লি। আচ্ছা দাঁড়া, সাম্নের বারে ক্লিপ নিয়ে আস্‌বো তোর জন্যে।

কমল সুকুমারের দোকানের এটা ওটা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে থাকে।

সুকুমার চুপ করিয়াই বসিয়া আছে, একটুক্ষণ পরে বলে, আমার পিঠটা একটু টীপে দিবি কম্‌লি? তোকে বিস্কুট দেবোখন্।

—পীঠটা? টিপে? আচ্ছা দিচ্ছি।...কমল লাগিয়া গেল।

—ক'খানা বিস্কুট দেবে সুকুদা?

আরামটুকু উপভোগ করিতে করিতে সুকুমার উত্তর করে—ক'খানা? যদি পনর মিনিট দিস্ তবে পাবি আট্ খানা। আর যদি আধ ঘণ্টা দিস্ তবে পাবি কুড়ি খানা। যদি এক ঘণ্টা দিস্ তবে পাবি পঞ্চাশ খানা।

—আচ্ছা, তা হলে তোমায় এক ঘণ্টাই দেব সুকুদা। খালি টিপেই দেবো নাকি? সুড় সুড়ি দেই? কিলিয়ে দেই?

সন্ধ্যাবন্দনা

বিচিত্রা
আষাঢ় ১৩৪১

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

হাসিয়া সুকুমার বলে—কর্ যা খুসী।

এক ঘণ্টা অবশ্য কমলকে আর পরিশ্রম করিতে হয় না; মিনিট পনের পরেই সুকুমার তাহাকে ছুটি দেয়। তবে বিস্কুট আর গনিয়া কিছু দেয় না—একটা টিনের কিছুটা খালি হইয়াছিল; সেই টিনটা ধরিয়াই কমলির হাতে দেয়। বেশ লাগে মেয়েটিকে—যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি বাধ্য। উহারাও সুকুদার সাথে মহা ভাব।

সুকুমার বলে, সব গুলোই তোকে দিচ্ছি না। খান কতো তুলে নেবো। আমি বসে বসে খাবো।

কমলি যাহা পাইয়াছে ইহা তাহার আশাতিরিক্ত। বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বলে, তা নাও তুলে যে কখানা ইচ্ছে।

কমল বিস্কুটের টিন বগলে করিয়া মহা খুসী হইয়া চলিয়া যায়, সুকুমার বসিয়া বসিয়া যে কখানা বিস্কুট কমলিকে দিবার পূর্ব্বে টীনের ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহা মুড়্ মুড়্ করিয়া খাইতে থাকে।

পথে কমলিকে হঠাৎ রূপসী দেখিয়া ফেলে। জিজ্ঞাসা করিল, এ কী নিয়ে যাচ্ছিস্‌রে কমলি?

কমলির সারা মুখে চোখে খুসীর আভাষ। হাসিয়া হাসিয়া বিস্তারিত খুলিয়া বলে।

সুকুমার নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া বিস্কুট খাইতেছিল। সহসা রূপসী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করে, কি চাসরে রূপু? একখানা বিস্কুট খাবি? এই নে, খেয়ে দ্যাখ্। এমন চমৎকার কড়্‌মড়ে—

আচ্ছা দাদা, তোমাকে কি বলি আমি, তাই বলতো?

উৎসুক হইয়া সুকুমার জিজ্ঞাসা করে, কেন রে রূপু?

—রূপু রূপু আর তুমি করো না আমাকে।

—আঃ হাঃ কি হয়েছে, তা বলবিনা আমাকে?

—তুমি এই রকম করে দোকান কর্‌বে—না কি? একটা টিন বিস্কুট তুমি কমলিকে দিয়ে দিলে, আবার বসে বসে নিজেও দিব্যি মুখ নাড়ছো! তুমি এখন কি কচি খোকাটি? কি আক্কেল তোমার তাই ভাবি।

সুকুমার চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া হাসিতে থাকে।

—আর হেসোনা, হেসোনা।...দাঁড়াও আজ আমি তোমার দোকানের সমস্ত হিসেব নেবো। এতোদিন দোকান আরম্ভ করেছো কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। রোজ কতো করে বিক্রী হচ্ছে, কে ধারে কি জিনিষ নিচ্ছে, নগদেই বা কি নিচ্ছে এসব খাতায় মিলিয়ে টিলিয়ে রাখছো তো?

মাথা চুলকাইয়া সুকুমার বলে, খাতা-টাতা নেই বটে, কিন্তু মিলিয়ে রাখছি বৈ কি? সবই আমার মনে আছে।

রূপসী যেন আকাশ হইতে পড়ে। খাতা পত্র নেই, সে কি কথা? রোজ দোকান থেকে এতো লোকে এসে এক পয়সা দুই পয়সা থেকে সুরু করে আট দশ আনা এক টাকার জিনিষ নিয়ে যাচ্ছে—এ সমস্তই তোমার মনে রয়েছে? দোকানের আদ্দেক জিনিষ তো প্রায় ফুরিয়ে আসবার যোগাড় হ'ল। আচ্ছা এ কথাও তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি তাই বলতো?

—ত্যাখ্ রূপু, ওসব হিসেব-টিসেব আমি লিখ্‌তে পারিটারিনে। যে বাকী নিচ্ছে, সকলেই তো দামটা দিয়েই যাবে, না হয় দু'দিন পরেই দেবে। আর নগদ যা' বিক্রী হ'চ্ছে সে পয়সা তো হাতে ক'রেই নিচ্ছি—তার আবার মেলানোর কি আছে? তা' ছাড়া আমার সকলেই প্রায় বাঁধা কাষ্টমার হ'য়ে উঠেছে, গোলমাল হ'তে দিচ্ছি না। এই ধর না—

—দাদা, ছোট ভাই হ'লে এখন তোমায় পিটিয়ে আমি ঠিক ক'র্‌তাম। তা' যখন পার্‌ছি না, ব'লে যাচ্ছি ভালোয় ভালোয় আজ্‌কেই খাতা তৈরি ক'রে সমস্ত লিখে ফেলো, আর দান খয়রাতি বন্ধ ক'রে দাও।...

আর একটি কথাও বলিবার বা শুনিবার চেষ্টা না করিয়া ক্রুদ্ধা রূপসী দুড়্‌দাড়্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দোকানের কাজের ফাঁকে ফাঁকেই সুকুমার গল্প লিখিয়া চলে। নুন মাপিয়া দিতে দিতে কবিতার লাইন স্মরণ করিতে থাকে।

সকালেই লোকজনের উপদ্রব বেশী। দুপুর বেলাটা প্রায় অবসর। আগেও যেমন বসিত, এখনও সুকুমার ঠিক তেমনিই খাতা পেন্সিল লইয়া নিজের নিরালা ঘরের কোণটিতে আসিয়া বসে। বিপুল একাগ্রতায় মনের অলিগলির সন্ধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সমস্ত ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, লুকানো চিন্তাগুলিকে একত্র জড়ো করিয়া একটি বিশিষ্ট রূপে, বিশিষ্ট রসে প্রাণবন্ত করিয়া বাহিরে ফুটাইয়া তুলিতে যত্নবান্ হয়।...সুকুমারের চোখের সাম্‌নে যেন ভাসিয়া উঠে—তাহার সম্মুখে যেন্ দাঁড়াইয়া আছেন শ্বেত-শতদলের উপর শুভ্র-দেহা, শুভ্র-বসনা বীণাপাণি—দুটি আরক্ত অধরে স্নিগ্ধ হাসি, কোমল বক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া স্নেহের সহস্র-ধার উৎস, করুণা-সুন্দর প্রশান্ত দুটি চোখে অনন্ত আশীর্ব্বাদের নীরব বাণী!...

গ্রামের কেদার চাটুয্যে মশায় সহসা বড়ো বিপন্ন হইয়া পড়েন।

সুকুমারকে আসিয়া বলেন, বাবাজী, কোনোমতে মেয়েটার একটা গতি করবার তো সমস্ত ঠিক ক'রে আন্‌লাম। এই তো আস্‌ছে মাসেই বিয়ে। কিন্তু বাবাজী খরচ পত্র যে কেমন ক'রে সঙ্কুলান করি, কিছুই তো ভেবে পাচ্ছিনে। জামাইকে বিশেষ কিছু দিতে না হ'লেও মেয়েটাকে তো একেবারে ন্যাংটা ক'রে দিতে পারিনে, যাই হোক্ ওরি মধ্যে কিছু খরচ ক'র্‌তেই হবে। জন কতো মানুষ-জনও খাবে। কি ভাবে কি করি বলতো বাবাজী?

সুকুমার বলিল, কি বা আপনাকে বল্‌ব জ্যাঠাবাবু, তবে আমার দ্বারা যেটুকু সাহায্য আপনার হওয়া সম্ভব তা' আমি নিশ্চয়ই করবো।

চাটুয্যে মশায়কে একেবারে নিরাশ হইয়া আর ফিরিতে হয় না। কেদারের মেয়ের বিবাহের দিনে সুকুমার নিজের দোকান হইতে তেল, নুন, ময়দা সমস্তই পাঠাইয়া দেয়।

চাটুয্যে মহাশয় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলেন, বাবাজী দাম-টামগুলো চট ক'রে কিন্তু শোধ ক'রে উঠ্‌তে পারবো না। বুঝ্‌তেই তো পার্‌ছো—

সুকুমার ব্যস্ত হইয়া উঠে। না, না জ্যাঠাবাবু, দামের জন্যে আপনার মোটেই ভাবনা করতে হবে না। আপনার দায়টা ঈশ্বরের ইচ্ছেয় ভালোয় ভালোয় উদ্ধার হ'য়ে যাক্। টাকা আপনি পাঁচ বছর ফেলে রাখুন না।

কেদার নিশ্চিন্ত হইয়া অপর কাজে মন দেন।

কিন্তু রূপসী আসিয়া তম্বী করিয়া বলে, আচ্ছা দাদা, এই ভাবে কেমন ক'রে দোকান চল্‌বে তাই তোমায় জিজ্ঞেস করি? একদিক থেকে তুমি বাকি দেয়া সুরু ক'রে দিয়েছো—আর ওই তো তোমার দোকান। এ দু'দিনে উঠে যাবে না? তোমায় নিয়ে বাস্তবিক আর আমি পারি না ব'কে ব'কে। জ্যাঠাবাবুকে যে তুমি কি ব'লে অতোগুলো জিনিষ বাকি দিলে, ভেবে অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি। ওঁর মতো অমন ধূর্ত্ত লোক আর গাঁয়ে আছে নাকি? টাকার ওঁর বুঝি অভাব? কিছু জানো না তো! এসব টাকা আর তুমি কস্মিন্ কালেও আদায় করতে পারবে ভেবেছো নাকি? আর আরেকদিক দিয়ে তো তোমার দান-সাগরও চলেছে। ছেলেমানুষের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের দোকানের জিনিষ নিজেও খাচ্ছো। তা' ছাড়া আজকাল দোকানের সমস্ত হিসেব-নিকেশগুলো খাতায় সব ঠিকভাবে রাখ্‌ছো তো, না কি? আর লাভ-টাভ দস্তুর মতো নিচ্ছো তো?

—রাখ্‌ছি বাপু রাখ্‌ছি। না হয় দেখে আয়গে, যা। আর লাভ নিচ্ছি না, তবে নিচ্ছি কি?

—দেখ্‌বোই তো, দেখ্‌বোনা ভাব্‌ছো? তুমি যা খুশী তাই করবে দোকানটা নিয়ে, আমি বুঝি এম্নি এম্নিই সইবো? কালকেই আমি সব দেখ্‌বো। লাভ যা' তুমি ক'র্‌ছো সব জানি; তোমার মতো গোবর গণেশের কম্মো নাকি?

রূপসী চলিয়া যায়, কিন্তু ঠিক এক মিনিট পরেই পুনরায় ঝড়ের বেগে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া রাগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার মতো হইয়া বলে, আচ্ছা দাদা, তোমার কি আক্কেল-বলতো? ঘরের দরজা খুলে রেখে দোকান ফেলে এসেছো, আর স্যাখোগে তো একটা গরু ঢুকে কি কাণ্ড ক'রেছে! ডালগুলো খেয়ে গেছে, আরো সব জিনিষ পত্র মেজেয় ছড়িয়ে একাকার ক'রে গেছে! আমি শুন্‌তে চাই যে তোমার এই—

রাগে আর কান্নার আবেগে রূপসীর গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসে।

সুকুমার বলে, আমাকে দিয়ে ওসব দোকান-টোকান সত্যিই হ'ল না রূপু। আমার ধাতে মোটে পোষায়ই না। বল্‌লুম তা শুন্‌লিনে—যা' হবার হয়েছে, এখনো যে জিনিষগুলো আছে—ওসব কৈলেশ বৈরেগীর কাছে বিক্রী ক'রে ফেলে দিই। মিছিমিছি তোর রুলী জোড়া বাঁধা দিলুম। যাক্, একরকম ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বোই—না হয় দু'দিন দেরী হবে। আর স্যাখ্ রূপু, কাল্‌কে আমি চিঠি পেলাম, আমার দুটো গল্প শীগ্‌গীরই ছাপা হ'চ্ছে, ওদের নাকি খুব ভালো লেগেছে। বে'র হ'লেই তো বিশ পঁচিশ টাকা পেয়ে যাবো। আর স্যাখ্ না, নাম আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়্‌ছে, লেখার আদর হ'চ্ছে, আমারও মাথা আর হাত দুইই যাচ্ছে খুলে! কিছুটা দিন কষ্ট ক'রে থাক্ রূপু, শেষে দেখ্‌বি দাদার কথা ভাব্‌তে তোরই গর্ব্ব হবে। ওসব বেণেতী ক'রে আমার এমন জীবনটা নষ্ট হয়, তাই কি তুই চাস্?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া চোক মুখ লাল করিয়া রূপসী ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, সুকুমারের কানে তাহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে—মরো তুমি!

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

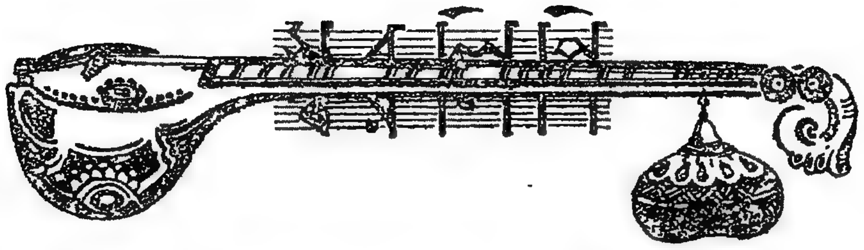

আমার আঁধার ভালো।
আলোর মাঝে বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে।
(আঁধার ভালো)

আলোরে যে লোপ ক'রে খায়
সেই কুয়াশা সর্ব্বনেশে।
(আঁধার ভালো)

অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে
সহজ মনে বিহার করে,
অভিমানী জ্ঞানী তোমার
বাহির দ্বারে ঠেকে এসে।
(আঁধার ভালো)

তোমার পথ আপনায় আপনি দেখায়
তাই বেয়ে, মা, চলব সোজা,
যারা পথ দেখাবার ভিড় করে গো
তারা কেবল বাড়ায় বোঝা।

ওরা ডাকে আমায় পূজা-ছলে,
এসে দেখি দেউল তলে
আপন মনের বিকারটারে
সাজিয়ে রাখে ছদ্ম বেশে।
(আঁধার ভালো) ॥

"বিসর্জ্জন"এর গান

কথা ও সুর ঃ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানা দেবী

০ + ০
। জ্ঞা জ্ঞা । সা জ্ঞা -া । ঋা সা -া । II
আ মার্ আঁ ধা র্ ভা লো ০

\+ ০ + ০
II { সা দা -া । পা মা পা I জ্ঞমা জ্ঞা ঋজ্ঞা । ঋা সা -া I
ও ০ ০ আ মা র্ আঁ ধা র্ ভা লো ০

\+ ০ + ০
র্সা র্সা -া । র্ঋা র্সা -া I ণা ণর্সা দণা । দা পা দা I
আ লো র্ মা ঝে ০ বি কি য়ে দে বে ০

\+ ০ + ০
মপা মা জ্ঞা । রা জ্ঞা -া I সা জ্ঞা -া । ঋা সা -া I }
আ প্ না কে সে ০ আঁ ধা র্ ভা লো ০

\+ ০ + ০
-া -া সা । ঋা জ্ঞা মা I পা -া দা I ণা র্সা -া I
০ ০ আ লো রে যে লো প্ ক রে খা য়

\+ ০ + ০
ণা জ্ঞা জ্ঞা । ঋা র্সা -া I -া -া -া । -া দা ণা I
সে ই কু য়া শা ০ ০ ০ ০ ০ ও গো

\+ ০ + ০
র্সা জ্ঞা জ্ঞা । ঋা র্সা -া I ণা -া দা । পা মজ্ঞা -া I
সে ই কু য়া শা ০ স ০ র্ব নে শে ০

\+ ০
মা মজ্ঞা -া । ঋা সা -া I II II
আঁ ধা র ভা লো ০

\+ ০ + ০
I {[মা ণদা -া । দা দা ণা I ণা র্সা -া । জ্ঞঋা র্সা]
সা সা ঋা । জ্ঞা মা -া । পা ণদা -া । ণা র্সা -া I
অ রু ণ্ শি শু ০ মা রে র্ গা রে ০

\+ ০ + ০
ণা র্সণা জ্ঞা । ঋা র্সা ঋা I ণা ণা র্সঋা । ণর্সা ণদা পা I}
স হ জ্ ম নে ০ বি হা র্ ক রে ০

\+ ০ + ০
র্সা র্সা -া । র্সঋা র্সা -া I ণর্সা ণা ধণা । দা পা মা I
অ ভি ০ মা নী ০ জা নী ০ তো মা র্

\+ ০ + ০
পর্সা র্সা -া । ণা দা পা I মা জ্ঞা মজ্ঞা । ঋা সা ঋা I
বা হি র্ দ্বা রে ০ ঠে কে ০ এ সে ০

\+ ০
জ্ঞা মা জ্ঞা । ঋা সা -া I II II
আঁ ধা র্ ভা লো ০

\+ ০ + ০
। । । । । সা সা I সা দা দা । পা পা -া I
তো মা র্ প থ আ প না র্

\+ ° + °
পাঃ দঃ র্সা । ণা ণদা পা I মা -া মা । মা মপা দা I
আ প্ নি দে খা য় তা ই বে দে মা৹ ৹

\+ ° + °
মপা -া পমা । জ্ঞরা মজ্ঞা -া I -া -া ঋসা । -া সা ঋা I
চ ন্ দ্ৰ৹ সো৹ না৹ ৹ ৹ ৹ ৹৹ ৹ যা য়

\+ ° + °
জ্ঞা মা মা I মা মা -া I মমা পদা দা । পা মা পা I
প থ যে খা বা র্ ভি৹ ড়্৹ ক রে গো ৹

\+ ° + °
মা জ্ঞাঃ রঃ । জ্ঞরা জ্ঞা -া I জ্ঞমা জ্ঞরা জ্ঞা । ঋা সা -া I }
তা রা ৹ কে৹ ব ল্ বা৹ ড়া৹ য় খোঁ জা ৹

\+ °
-া -া -া । -া দা পা I
৹ ৹ ৹ ৹ ও রা

\+ ° + °
{মা ণদা -া । দা দা ণা I ণা র্সা -া । ঋা র্সা -া I
ডা কে ৹ আ মা র্ গু ঞ্জ ৹ ছ লে ৹

\+ ° + °
ণা র্সা ঋজ্ঞা । জ্ঞঋা র্সা -া I ণা ণণা র্সঋা । ণর্সা ণদা পা I }
এ সে ৹ ৹ দে খি ৹ যে উ৹ ৹ল ত লে৹ ৹

\+ ° + °
পর্সা র্সা -া । র্সঋা র্সা -া I ণর্সা ণা ধণা । দা পা মা I
আ৹ প ন্ য নে র্ বি৹ কা র্ টা রে ৹

\+ ° + °
পা পর্সা র্সা । ণা দা পা I মা -া জ্ঞা । ঋা সা ঋা I
সা জি য়ে রা খে ৹ ছ ৹ ন বে শে ৹

\+ °
জ্ঞা মা জ্ঞা । ঋা সা -া I II II
আঁ খা র্ ভা লো ৹

মহাসাগরের গান

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেন

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" বলিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারাই আবার স্বীকার করিয়াছেন "রসো বৈ সঃ"। সুতরাং কাব্যের প্রকৃতি আলোচনা করিবার সময় ভূমার সহিত ইহার সম্বন্ধের কথা আসিয়া পড়ে। যাহা অতীন্দ্রিয় জগতের অন্তহীন বিরাটতার সহিত মানবের ক্ষুদ্র মনের সংযোগ সাধন করে, সাধনক্ষেত্রে তাহাকে বলে যোগ, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহাকে বলে কাব্য। প্রকৃত কাব্য যেন বিশাল মুক্ত আকাশকে ক্ষুদ্র গৃহকোণের সহিত মিলাইয়া দিবার একখানি মুক্ত বাতায়ন।

আজ আমরা এইরূপ একখানি বাতায়ন দিয়া একবার বাহিরের দিকে তাকাইতে চেষ্টা করিব। এই বাতায়ন-পথে বাহিরের বিশাল সাগরের পানে যিনি পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, কান পাতিয়া অনাদি অনন্ত সমুদ্র-কল্লোল শুনিয়াছিলেন, নয় বৎসর পূর্ব্বে এই ১৬ই জুন তারিখেই দার্জ্জিলিংএর "ষ্টেপ এসাইড-এ" তাঁহার প্রাণস্রোত মহাসাগরের স্রোতে মিলাইয়া গিয়াছে। আমরা "সাগর-সঙ্গীত"এর কবি ৺চিত্তরঞ্জন দাশের কথা বলিতেছি।

কবি বিশ্বাস করিতেন, প্রাণ দিয়া পরিপূর্ণভাবেই বিশ্বাস করিতেন, সমুদ্র জড় প্রকৃতির অংশ নহে, সে মানুষের মতই প্রাণবান। বাহিরের আকার এবং আয়তনগত পার্থক্য থাকিলেও মানব এবং সাগরের আত্মা ভিন্ন প্রকৃতির নহে। উহারা একই প্রাণস্রোত হইতে উদ্ভূত এবং অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। উহাদের মধ্যে যেন নাড়ীর টান রহিয়াছে।

> "অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
> দু'জনে এসেছি যেন দুটি প্রাণস্রোতে।
> তারপর কতবার জনমে জনমে
> আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে—"

দুইটি হৃদয় যেন দুইটি একসুরে বাঁধা বীণা। একটিতে কোমল করাঘাত করিলে আর একটিতে ঝঙ্কার উঠিতে থাকে। অদৃশ্য কাহার করস্পর্শে সমুদ্রের বুকে যখন মহাগান বাজিতে থাকে কবির মনও তখন সমধর্ম্মী কম্পনে (Sympathetic vibrationএ) কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে।

> "মনখানি মর্ম্ম
> শত শত তন্ত্রীভরা গীতযন্ত্র সম,—
> পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
> গরবে গৌরবে আজি উঠিছে বাজিয়া।"

সমুদ্রের বাধাহীন উৎসবে মনও বাধা মানিতে চাহে না,—অজানিত সুখ দুঃখের বিচিত্র অনুভূতিতে মন ভরিয়া যায়। সকল অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, সকল সুখ পুষ্প হইয়া ফুটিতে থাকে, সব দুঃখ গানরূপে দেখা দেয়।

এই "অতল অগাধ সঙ্গীতমণ্ডলের নীরব গর্জ্জনে" কবি আপনার অনন্তের ছায়াভরা প্রাণ-এর সাড়া পান, তাই হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সমুদ্রের গানের মাঝে আপনাকে খুঁজিয়া বেড়ান।

দিবস রজনী ভরিয়া "আলোকে আঁধারে" "তরুণ উষার আলোকে" "মেঘাক্রান্ত দ্বিপ্রহরে," "বাসনাহীন উদাস সন্ধ্যায়" নির্জ্জন তীরে বসিয়া "যন্ত্রী" সমুদ্র মানবের হৃদয়যন্ত্রে বিচিত্র ঝঙ্কার তুলিতে থাকে। কবি সমুদ্রের বিচিত্র রূপ দেখিতে পান, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও হৃদয়ের রং ফিরিতে থাকে।

প্রভাতের সমুদ্র যেন তরুণ প্রেমিক রাজার সাজে সাজিয়া আসে—

> "তরুণ উষার আলো প্রতি অঙ্গে তব,
> সোনার ঢেউয়ের মত বহে চলে যায়,…
> সোনায় ভরিয়া গেছে হৃদয় আমার…
> রেখে যাব আজ তব চরণতলায়—"

তারপর দ্বিপ্রহরে নির্জ্জন গগনতলে "গীতশ্রান্ত চোখে"-সেই রহস্যময় বন্ধু ঘুমাইতে থাকে।

"মেঘাক্রান্ত দ্বিপ্রহর, স্তব্ধ চারিধার…
দুই চোখে চেয়ে আছি তব মুখপানে।
ঘুমাও ঘুমাও তুমি। হৃদয় আমার
জাগিছে কাঁপিছে কোন শব্দহীন গানে।
কবে পাব পরিচয় হে বন্ধু আমার।
কখন জাগিবে তুমি?—"

সন্ধ্যায় যখন চারিদিকে আলোক আঁধার ঝরিয়া পড়ে, তখন মনে হয় সমুদ্র যেন কোন এক প্রশ্নভারাক্রান্ত আত্মা।

"ওগো সিন্ধু! অন্ধ তুমি কোন ছায়ালোক জুড়ে
গাহিছ করুণ গীতি দ্বিধায় জড়িত সুরে?
কোন প্রশ্ন উঠিয়াছে পাওনি উত্তর তার?
হৃদয় ভরিয়া আছে কোন সমস্যার ভার?
জীবন মরণ সনে কি কথা কহিছ আজি?
কোন তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে, কি বাথা উঠেছে বাজি?
তোমার পরাণ হতে আমার পরাণ 'পরে
সকল আলোক আর সকল আঁধার ঝরে।"

আকাশে এখনও তারা ফোটে নাই,—সমুদ্র যেন বাসনা-লেশহীন আত্মস্থ মহাযোগী। ধীরে ধীরে কাহার যেন অর্চ্চনা আরম্ভ হয়, পূজারী যেন কাহার পূজায় বসিয়া যায়। আরতির শঙ্খ বাজিয়া উঠে, ধূপ-ধুনা গুগ্গুলের সমারোহ চলিতে থাকে, কবির "পরাণপ্রদীপ" ঊর্দ্ধে কাহার পানে তুলিয়া ধরিয়া মহাসিন্ধু কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে। সাধক আপনার মাঝে আপনাকে ডুবাইয়া ফেলে, কবিও আপনাতে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন।

তারপর জ্যোৎস্না ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে থাকে। স্বপ্নময় জ্যোৎস্নার তরঙ্গে তরঙ্গে স্বপ্নের মত দূর অতিদূর হইতে পূর্ব্ব জন্মের কথা ভাসিয়া আসে,—এজন্ম, পূর্ব্বজন্ম, সকলজন্ম যেন এক হইয়া যায়।

"পূর্ব্বজনমের একি স্বপনের ছায়া
কোন পূর্ব্ব পুণ্যবলে উঠেছে ভাসিয়া
তোমার হৃদয়তলে। কোন পূর্ব্বমায়া
রচিতেছে স্বপ্ন তব জীবনে জাগিয়া।
আমার পরাণে আজি কাঁপিছে কেবল,
জোছনা তরঙ্গে শত স্মৃতিপুষ্পদল।
শত জনমের যেন হাসি-অশ্রুভারে
পরাণ উঠেছে গাহি গীত পারাবারে।
সকল জনম যেন এক হয়ে গেছে,
একটি পুষ্পের মত স্বপ্নে ভাসিতেছে।"

তখন ধীরে ধীরে মনে পড়ে সমুদ্রের সহিত পুরাতন প্রণয়ের কথা। সে তো আর একদিনের নয়, চিরজন্মের জন্মজন্মান্তরের। তাই যেন মনে হয় মুখখানি চেনা-চেনা—

"শুধু মনে হয়
তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন দেশে।
তোমার পরশখানি মনে জেগে রয়,
এতকাল পরে তাই আসিয়াছি ভেসে।"

আর সকলের সহিত যেমন, কবির সহিত সমুদ্রের তো তেমন বাহিরের পরিচয় নয়, তাহাদের পরিচয় যে অন্তরের! তাই বাহিরের গীতে কবির মন উঠে না।

"বাহিরের গীত র'বে বাহিরে পড়িয়া
সবাই শুনে যা' সেত' সবাকার তরে"—

তাহা কি আর ভাল লাগে! মিলন তাহাদের হইবে নির্জ্জনে গোপনে অন্ধকারে।

"গা'ব দু'জনায়
চারিদিকে অন্ধকার রহিবে প্রহরী।
তুমি এক গান গাবে আমি গা'ব আর
দু'জনে ভাসিয়া যাব অনন্ত হরষে।
আমারে ডুবাবে দিবে তোমার পরশে।"

শান্তরূপে যে সাগর সোনার স্বপ্ন সৃজন করে, যে বন্ধুকে আবেগে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে "একসূত্রে বাঁধা রব আমরা দুজনে, তরুণ উষার কোলে স্বপন বিজনে.—" সে-ই যখন আবার ভীমরূপে ভয়ালরূপে রুদ্রের প্রলয় বিষাণ বাজাইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে,—যখন দেখা যায়—

"তরঙ্গ তরঙ্গ 'পরে ঝাঁপায়ে পড়িছে
অশান্ত-বেদনাভরে দুলিছে ফুলিছে,
কাঁপিছে গর্জ্জিছে যেন মহা হাহাকার।…

"ঘনঘোর অট্টহাসে মরণ উম্বরে
লাফায়ে ঝাঁপায়ে পড়ে পাতাল অম্বরে ;
বিদ্যুৎবিহীন নিশা অশনি বরজে
ছিন্ন ভিন্ন বক্ষে তার মরণ গরজে !
উন্মত্ত তরঙ্গে তার অযুত ফণিনী
বিস্তারে অসংখ্য ফণা অনন্তরঙ্গিনী…
লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে
মন্দ্রিছে মরণগীতি অনন্ত আঁধারে।"

তখন কবির বক্ষ ভরিয়া "অনন্ত প্রভঞ্জন" চলিতে থাকে। "অনাদি কালের বক্ষে" যে "সৃষ্টি শতদল" "আপনারি সুখ দুঃখে টলমল" করে এ মহাপ্রলয়ে তাহা ধ্বংস হইতে যায় দেখিয়া সাগরের কবি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠেন।

"হে রুদ্র মরণ দেব ! জটী জটাধর !
প্রলয় ত্রিশূল তব সংহর ! সংহর !…
রাখ, রাখ রথ তব হে অন্ধ বিজয়ী,"—

কি তুমি চাও ? কি আহুতি দানে তোমার এ ভয়ঙ্কর ক্ষুধা মিটিবে ? আমার প্রাণ ? তাই কি ? কিন্তু—

"আমার পরাণ তরে মিছে যুদ্ধ করা
আমি ত' আপনা হ'তে দিতেছিনু ধরা।"

সমুদ্রের আত্মা মানবের আত্মাকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আপনার বিশাল বক্ষে টানিয়া লয়। তারপর দুই মুক্ত আত্মার মিলিত কণ্ঠ হইতে কত শত "শব্দহীন সঙ্গীত" উঠিতে থাকে।

"আমার বক্ষের মাঝে কি যে বিপুলতা !
কত শত শব্দহীন সঙ্গীত জাগিছে,
কত শত সঙ্গীতের পূর্ণ নীরবতা !
সকল শব্দের মাঝে শব্দাতীত বাণী
সকল সঙ্গীত" মাঝে অগীত কি জানি !

মহাসাগর ও মহামানবের এই নীরব সঙ্গীত কোলাহল-মুখরিত ধরিত্রীর ক্ষুদ্র বক্ষ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে বহু ঊর্দ্ধে এক অন্তহীন শব্দহীন অতীন্দ্রিয় জগতে উঠিয়া যায়। হেথাকার শব্দময় চপল ভাষণ সেই ঊর্দ্ধলোকে উঠিতে পারে না, বাক্য-হীন নীরবতার বিচিত্র সঙ্গীতে সেখানে অসীমের অর্চনা চলিতে থাকে। শুভ মুহূর্ত্তে সসীমের সহিত অসীমের যোগ হইয়া যায়।

হৃদয়ে আবেগ না আসিলে এই শব্দহীন সঙ্গীত রচিত হইতে পারে না। সমুদ্র আবেগের আধার,—তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে হয় সে যেন ব্যথারই সাগর।—

কাঁদিয়েছে, একি ক্ষুধা একি তৃষা অনিবার
একি গরজিছে ব্যথা শ্রান্তিহীন দুর্নিবার ?

বলিতে ইচ্ছা করে—

"নিশিদিন" ও বক্ষভরা সর্ব্ব আকুলতা,
গীতধ্যানে রচিতেছ শব্দনীরবতা !
হে গায়ক অনন্তের ! কোথা গীত বাজে ?
শব্দহীন কোন লোকে কোন উষা মাঝে ?

কাহার লাগিয়া এ আকুলতা ? কাহার লাগিয়া তাহার এ "অন্তহীন ক্রন্দন" ? বুঝিতে দেরী হয় না যখন সমুদ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া কবিও বলিয়া উঠেন—

"দেবতার তরে আজি আশার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি ! কি মধু বিরহ দিয়া !"

সমধর্ম্মী কম্পনে কবিরও বন্ধনমুক্ত মনে আকুলতা আসে। ব্যাকুলভাবে তিনিও বলেন—

"প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! তোমা পাই কি না পাই,
আমি ভেসে ভেসে উঠি, আমি ডুবে ডুবে যাই !"

ধরণীর সান্ত সাগর এইবার অনাদি অনন্ত এক মহা-সাগরের দিকে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছে। তৃষ্ণার্ত্ত আকুল হৃদয় লইয়া কবি ভাবেন, ওপারে গেলে কি তাঁহার প্রার্থিত শান্তি মিলিবে ?

"আমি যে তৃষিত বড়, ওগো মহাপ্রাণ !
আমি যে তৃষ্ণার্ত্ত আজি পরাণ মাঝারে !
আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ !
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপারে !
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন ?
কাঙ্গাল পরাণ হবে রাজার মতন ?"

শান্তির আশায় 'এপার' এবং 'ওপারের' চিন্তায় কূল না

পাইয়া সব চিন্তা ত্যাগ করিয়া কবি শেষে জীবন-দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণ করিতেছেন—

"এপার ওপার করি পারি না ত' আর
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই।...
হে মোর আজন্ম সখা, কাণ্ডারী আমার।
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।"

"আজন্মসখা" "কাণ্ডারীর" কানে কবির আকুল আবেদন পৌঁছিয়াছিল, তাই অকালে তিনি কবিকে তাঁহার "অপারে" টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। মহাসাগরের সহিত মহাস্রোতের মিলন ঘটিয়াছে।

দীর্ঘ দিন হইল তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অসীমকে সসীমের সহিত বাঁধিবার জন্ম যে গান তিনি গাহিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ইহার সুরে সুরে আমাদের প্রাণের সুর বাজে, ইহার মৌন বেদনায় আমাদের হৃদয়ের ব্যথা ফোটে, ইহার তরঙ্গে তরঙ্গে দূর সাগরের হিমকরস্পর্শ আমাদের গায়ে আসিয়া লাগে। ধরণীর সাগরের অন্ত আছে,—ধরণী হইতে বহু উর্দ্ধে অন্তহীন যে মহাসাগর তাহারও মধুর গম্ভীর গান জলকলতান এই "সাগর সঙ্গীত"এর মধ্য দিয়া আমাদের কানে ভাসিয়া আসিতে থাকে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেন

আজি বৃষ্টি হ'ল এইক্ষণ

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, বার-এট-ল

আজ যদি বর্ষা নামে   আজ যদি বর্ষা নামে
আজ যদি বর্ষা নামে মাঠে,
টুপ টাপ টুপ টাপ   গৃহমাঝে চুপ চাপ
একেলা বাদলবেলা কাটে।
মেঘলা-আকাশখানি   অব্যক্ত নিস্তব্ধ বাণী
কলোচ্ছ্বাসে করিবে নিঃশেষ,
একা এই ছোট ঘরে   বাহিরেতে জল ঝরে,
বাদল নামিলে হয় বেশ।

ঝরিবে কদম গাছে   ঝরিবে কদম গাছে
ঝরিবে কদম গাছে জল;
নীপবন শিহরিয়া   অশোকে আবেশ দিয়া
বকুল ঝরায়ে নামে ঢল।
ঝিকিমিকি লিচুপাতা   কেবলি নাড়ায় মাথা
কেবলি গলিত স্নেহাশীষ,
নতুন আমের গুটি,   করে শুধু লুটোপুটি,
জামের আগায় দোলে শিষ!

হিজলের মরা ডালে   হিজলের মরা ডালে
হিজলের মরা ডালে কাক,
দুটি পক্ষ বিছাইয়া   শাবকেরে আবরিয়া,
ভয়ে তার মুখে নাই ডাক।
ঝড় ওঠে সাঁই সাঁই,   বুঝিবা নিস্তার নাই;
স্নেহমুগ্ধ নগণ্য বায়স।
ঘনঘটা বরিষায়   আর্দ্র বায়ু বহে' যায়
মাতৃহৃদে অদম্য সাহস।

আজ যদি কাছে র'ত   আজ যদি কাছে র'ত
আজ যদি কাছে র'ত হেম,
নিবিড় দুবাহু দিয়া   আদরে হৃদয়ে নিয়া
আকুল আবেগ জানাতেম।
যে কথা পায়নি ভাষা   আজি ঝড় সর্ব্বনাশা
ভিতরকে করিত বাহির;
কেড়ে নিত কণ্ঠ হ'তে   ঢালিত শ্রবণ পথে
চিরসুধা বাণী ধরণীর।

আঁধারিয়া এল ধরা   আঁধারিয়া এল ধরা
আঁধারিয়া এল ধরাতল,
কলধ্বনি জলোচ্ছ্বাসে,   তটিনী ছুটিছে ত্রাসে,
অবিরল ঝরিতেছে জল।
তীরে শ্যাম অরণ্যানী   শিরে করাঘাত হানি'
ছিঁড়িতেছে শাখাপত্র রোষে—
ঘূর্ণীবায়ু ঊর্দ্ধমুখে   ছুটিয়া চলেছে রুখে,
বিধ্বস্ত ধরণী শুধু ফোঁসে।

বুঝি বৃষ্টি থেমে এল   বুঝি বৃষ্টি থেমে এল
বুঝি বৃষ্টি থেমে এল মাঠে,
বেতসের সরু পত্রে   সপ্তপর্ণ শিরচ্ছত্রে
নবদূর্ব্বাদল শ্যাম বাটে।
মসৃণ চিক্কণ চারু   ঘনকৃষ্ণ দেবদারু
সদ্যস্নাত কান্তি বিমোহন।
আজি বৃষ্টি ঝরে গেল   আজি বৃষ্টি ঝরে গেল,
আজি বৃষ্টি হ'ল এইক্ষণ।

বাংলা সাহিত্যে একশত ভালো বই

শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল্

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন গত ফাল্গুনের প্রবাসীতে বাংলা সাহিত্যে একশত খানি ভালো বইএর তালিকা প্রকাশিত করিয়া বাংলা সাহিত্য জগতে এক অভিনব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তৌলে মাপিয়া পুস্তকের সুনিশ্চিত মূল্য নির্ণয় করিয়া এই রকম এক স্থূল সীমাপরিবেষ্টিত তালিকা প্রকাশিত করা যে অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই রকম তালিকা বাহির না করাই ছিল সব দিক দিয়া ভালো। অনেকের মনে তিনি দুঃখ দিয়াছেন, ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছেন, আবার অনেকের মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছেন। যাহাতে অনেকের বিরাগভাজন হইতে হয়, সে-রকম কাজে হাত না দেওয়াই ভালো। অবশ্য, সে-দিক দিয়া আমি এই প্রবন্ধে কিছু বলিব না।

তাঁহার তালিকা দেখিয়া দুইটি বিষয়ে আমি অবাক্ হতবাক্ হইয়াছি। প্রথমতঃ, এমন অনেক প্রসিদ্ধ মূল্যবান গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে আছে বলিয়া আমার মনে হয় যাহার স্থান তিনি তালিকায় দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তালিকায় এমন সব বইএর স্থান হইয়াছে যাহাদের কোন দিক দিয়া কোন মূল্যই ও সাহিত্যপ্রতিষ্ঠা নাই। বাংলা ভাষায় ভালো বইএর কেমন খবর তিনি রাখেন জানি না; কোথায় কোন্ অখ্যাতনাম লেখক পাঁচদিনে কি উপন্যাস লিখিয়াছেন, সাতদিনে কি প্রবন্ধ পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নাম তালিকায় উঠিল, অথচ যে সব অক্লান্তকর্ম্মী সাহিত্যসেবী বহু বৎসর ধরিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, বহু দিক দিয়া নানা উপকরণ ও আনুষঙ্গিক মালমশলা সংগ্রহ করিয়া যে সব অমূল্য রত্নরাজি বাংলা ভাষায় দান করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন সন্ধানই তিনি লন্ নাই। অনেক ভালো বইএর নাম তিনি বাদ দিয়াছেন। আমি শুধু একখানি গ্রন্থের নাম করিব। আমার নিজের একটি লাইব্রেরী আছে; তাহাতে বাংলা, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনেক অনেক ভালো ভালো পুস্তকই আছে, সেই সব বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রন্থের পাশেও এই বইখানিকে কোন অংশে নিষ্প্রভ স্তিমিতাভ দেখায় না। এই বইখানিকে দেখিলে মনে হয়; বাংলা সাহিত্যের একটি অমর অক্ষয় অবদান, একটি অপরিম্লান chef-d'œuvre। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' বইখানির কথাই আমি বলিতেছি। এমন একখানি সুন্দর বই তাঁহার তালিকায় স্থান পায় নাই। তারপর, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারত', কাশীরামদাসের 'মহাভারত,' কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'—এই সব বইগুলির কি কোন মূল্য নাই? ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া নাই বা ধরিলাম, কাব্য হিসাবেও কি এগুলি জাতিতে উঠিতে পারে না? 'স্বর্ণলতা'র মত উপন্যাস, 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র মত উপন্যাস; 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' এর মত বই বাংলা ভাষায় কয়খানা আছে? যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বঙ্গের মহিলা কবি' বইখানি বহুদিনের পরিশ্রমের ফল; এই বইখানি প্রকাশিত না হইলে অনেক মহিলা কবিদের নাম পর্য্যন্ত আমরা শুনিতাম না; এমন সরল, সুসম্বদ্ধ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থখানিকেও তিনি লক্ষ্যের মধ্যে আনেন নাই। কবিদের মধ্যে তিনি করুণানিধানকে কোন আমলই দেন নাই; অথচ নিছক রূপের বর্ণনায় বাংলার কোন্ কবি তাঁহার সমকক্ষ? যে স্বভাবকবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসের কবিতা পড়িতে পড়িতে চোখের জল রাখিতে পারা যায় না, যাঁহার

'প্রেমদা' পদ্মার কূলে, কোমল শেফালী ফুলে,
করিয়া বাসর-শয্যা ডাকিছে আমায়,
'সারদা' চিলাই-তীরে, আম-কাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়!

বুকের মধ্যে রুদ্ধশ্বাস মেঘের সমারোহ জমাইয়া তোলে, বুকের পাঁজরের মধ্যে বেদনা-মুখর, বিরহ-ফেনিল অশ্রুর বান ডাকায়, সেই সত্যিকারের কবি গোবিন্দদাসকেও তিনি তাঁহার তালিকা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। কাজী নজরুল, মোহিতলালও কি নূতন কিছুই বাংলা কাব্য সাহিত্যে দান করেন নাই?

ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঁহাদের কোন উপন্যাসই কি তালিকায় স্থান পাইবার যোগ্য নহে? অথচ, এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কয় জন লেখকের আছে? আমার তো মনে হয়, নরেশচন্দ্র একজন বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী লেখক। তারপর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস। * * * * ছেলেদের বইএর মধ্যে 'আবোল-তাবোল'এর নাম করিয়াছেন, অথচ 'জীবজন্তু'র মত একখানি বইএর তিনি নাম করেন নাই।

তারপর আধুনিক সাহিত্যিকদের এতটুকু আমল তিনি দেন নাই। জগদীশ গুপ্তের 'মহিষী' ও শৈলজা মুখোপাধ্যায়ের 'ঝড়ো-হাওয়া'র নাম তিনি করিয়াছেন, অথচ যে বইগুলি শৈলজা বাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাদের কোন খোঁজই তিনি লন নাই। আর সব আধুনিক সাহিত্যিকদের কি দোষ তাহা বুঝিলাম না। হয় তো তাঁহারা বড় বেশী আধুনিক, বড় বেশী দুঃসাহসী, হয় তো বড় বেশী অশ্লীল। অশ্লীল বলিতে তিনি কি বোঝেন, জানি না। এ সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখা যায়। অশ্লীলতা যদি artistic setting-এর পরিবেশের মধ্যে ও 'সত্যম্ শিবম্সুন্দরম্'-এর পটভূমিতে তাহার রূপ উদ্‌ঘাটন করে, তাহা হইলে তাহা অশ্লীল নহে। Swinburneএর 'Poems and Ballas'd (প্রথম খণ্ড), Paul Verlaine, Baudelaire, Whitmanএর অনেক কবিতাই তো নিতান্ত অশ্লীল, কিন্তু অমন সুন্দর সুসমৃদ্ধ কবিতা কাব্য-জগতে কয়টা আছে। বাইবেলের 'Song of Songs'এর মত বই আর নাই, কিন্তু তাহাও তো কম অশ্লীল নয়? সূক্ষ্ম যৌনপ্রবৃত্তি ও লালসার বহু-বর্ণায়মান চিত্র লইয়া অনেক বিখ্যাত উপন্যাসই তো লেখা হইয়াছে, তাহাদের লেখকেরা তো অনেকেই নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। Maupassant, Sigrid Undset, Knut Hamsunএর অনেক বই তো চূড়ান্ত অশ্লীল। এঁরা তবু পদে আছেন, কিন্তু W. L. Georgeএর 'Second Blooming,' Theodore Dreiserএর 'Sister Carrie', Floyd Dellএর 'Janet March', James Joyceএর 'Ulysses', D. H. Lawrence এর 'The Rainbow,' 'Women in Love,' James Branch Cabellএর 'Jurgen'—এসব বইগুলির কথা আমরা কল্পনা করিতেও পারিব না। সে-সব বিশদীকৃত বহুবিবৃত নগ্নচিত্র পড়িতে পড়িতে প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। অথচ ও-রকম শক্তিপূর্ণ পরম সুন্দর লেখা পৃথিবীর কোন যুগে সম্ভবপর হইয়াছে? ধরুন Tennysonএর বিখ্যাত Godiva কবিতাটি। অমন অশ্লীল বিষয় যে কবিতার—সুন্দরী তরুণী সম্পূর্ণ বিবসনা হইয়া রাস্তায় ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতেছে—তাও কবি কি সুন্দর নিষ্কলঙ্ক ভাবে আঁকিয়াছেন! লেখার মধ্যে এতটুকু আবিলতার আমেজ পাওয়া যায় না। কবিতাটি পড়িয়া আমরা বলি সুন্দর। কিন্তু রোসেটি বা সুইনবার্ণ যদি কবিতাটি লিখিতেন, তাহা হইলে কবিতাটি হইয়া উঠিত নিতান্ত অশ্লীল, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহা যে সুন্দরতর, অনন্যসাধারণ ও পরিপূর্ণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুইনবার্ণ যদি লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রত্যেক অপূর্ব্ব সুন্দর, মন্থর-ঘন লাইনের মধ্যে পাইতাম স্পর্শ-সহিষ্ণু স্থূল শারীরিক-স্পর্শ। তাই বলিতেছি, যাহা সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্য-সমারোহে আবৃত তাহা কখনই অশ্লীল নহে।

এই তালিকায় এমন অনেক লেখকদের নাম দিতে পারিলাম না যাঁহারা অনেক কিছু লিখিলেও এমন কিছুই লেখেন নাই যাহার কোন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা আছে বা ভবিষ্যতে থাকিতে পারে। Victor Hugo বলিয়াছেন 'Prolificity is a sign of genius'; কথাটা খুবই সত্য, কিন্তু এই সব লেখকদের প্রতিভা থাকিলেও, কালের নিকষমণিতে ইঁহাদের লেখা টিকিবে কি না সন্দেহ। বিহারীলালের কবিতা ও দ্বিজেন্দ্র

নাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' যে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি স্পষ্টধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের লেখার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা সত্যিকারের আনন্দ দিতে পাবে।

পরিশেষে আমার বিনীত বক্তব্য এই যে, হয় তো অনেকেরই কাছে এ তালিকা মনঃপূত হইবে না, কিন্তু এই তালিকা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ দোষবর্জ্জিত ও ভ্রমলেশহীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।* শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের মত আমিও বলিতেছি যে ইহা পুস্তক বিশেষেব বিজ্ঞাপন নহে।

এক শত বইয়ের তালিকা

অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত … ১। প্রচ্ছদ পট (উ)
অন্নদাশঙ্কর রায় … ২। যাব যেথা দেশ (উ)
অতুল প্রসাদ সেন … ৩। গীতিগুঞ্জ (কা)
অনুরূপা দেবী …. ৪। পোষ্যপুত্র (উ)
… ৫। মন্ত্রশক্তি (উ)
অক্ষয় কুমাব বড়াল … ৬। এষা (কা)
অমৃতলাল বসু … ৭। চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে (না)
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় … ৮। দিকশূল (উ)
৯। শশিনাথ (উ)
১০। অন্তরাগ (উ)
কামিনী রায় … ১১। জীবন পথে (কা)
কালিদাস বায় … ১২। পর্ণপুট (কা)
কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় … ১৩। আমরা কি ও কে?
কাশীবাম দাস … ১৪। মহাভারত (কা)
কৃত্তিবাস দাস … ১৫। রামায়ণ (কা)
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় … ১৬। শতনরী (কা)
কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত … ১৭। সাবিত্রী (গ)
কাজি নজরুল ইস্লাম … ১৮। অগ্নিবীণা (কা)
কুলদারঞ্জন রায় … ১৯। আশ্চর্য্য দ্বীপ (উ)
কেদাবনাথ মজুমদার … ২০। রামায়ণের সমাজ (প্র)
কালীপ্রসন্ন সিংহ … ২১। মহাভারত
খগেন্দ্রনাথ মিত্র … ২২। সাবি (গ)
গিরিশচন্দ্র ঘোষ … ২৩। প্রফুল্ল (না)
২৪। বলিদান (না)
গোবিন্দচন্দ্র দাস … ২৫। কস্তুরী (কা)
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় … ২৬। সওগাত (গ)
জলধর সেন … ২৭। হিমালয় (প্র)
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস … ২৮। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (প্র)
জগদানন্দ রায় … ২৯। পোকা-মাকড় (প্র)
জসীম উদ্দীন … ৩০। নক্সী কাঁথাব মাঠ (কা)
তাবকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় … ৩১। স্বর্ণলতা (উ)
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যাষ…. ৩২। কঙ্কাবতী
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় … ৩৩। সাজাহান (না)
৩৪। দুর্গাদাস (না)
৩৫। হাসির গান (কা)
দীনবন্ধু মিত্র … ৩৬। সধবার একাদশী (না)
দীনেশচন্দ্র সেন … ৩৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্র)
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু … ৩৮। জীবজন্তু (প্র)
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ৩৯। ঠাকুরমার ঝুলি (গ)
দুর্গাচরণ রায় … ৪০। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন (উ)
দেবেন্দ্রনাথ সেন … ৪১। অশোকগুচ্ছ (কা)
ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় … ৪২। আমরা ও তাঁহারা (প্র)
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত … ৪৩। ব্রজনাথের বিবাহ (উ)
নবীনচন্দ্র সেন … ৪৪। পলাশীব যুদ্ধ (কা)
নিরুপমা দেবী … ৪৫। অন্নপূর্ণার মন্দির (উ)
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত … ৪৬। তৃপ্তি (উ)
৪৭। বিপর্য্যয় (উ)
৪৮। সর্ব্বহারা (উ)
নরেন্দ্র দেব … ৪৯। ওমর খৈয়াম (কা)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫০। ষোড়শী (গ)
৫১। দেশী ও বিলাতী (গ)

MORE AUDACIOUS THAN THIS ONE CANNOT BE

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৫২।	নবীন সন্ন্যাসী (উ)
প্রমথ চৌধুরী ...	৫৩।	চার ইয়ারী কথা (প্র)
প্রেমেন্দ্র মিত্র ...	৫৪।	উপনায়ন (উ)
প্রবোধচন্দ্র সান্যাল ...	৫৫।	মহাপ্রস্থানের পথে (প্র)
বিনয়কুমার সরকার ...	৫৬।	বর্ত্তমান জগৎ (প্র)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৫৭।	বিষবৃক্ষ (উ)
	৫৮।	কপালকুণ্ডলা (উ)
	৫৯।	কৃষ্ণকান্তের উইল (উ)
	৬০।	চন্দ্রশেখর (উ)
বিপিনবিহারী গুপ্ত ...	৬১।	পুরাতন প্রসঙ্গ (প্র)
বিবেকানন্দ ...	৬২।	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (প্র)
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৩।	সংবাদ পত্রে সেকালের কথা (প্র)
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৪।	অপরাজিত (উ)
	৬৫।	পথের পাঁচালী (উ)
বুদ্ধদেব বসু ...	৬৬।	বন্দীর বন্দনা (কা)
শ্রীম— ...	৬৭।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (প্র)
মণীন্দ্রলাল বসু ...	৬৮।	রমলা (উ)
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ...	৬৯।	মেঘনাদবধ কাব্য (প্র)
মোহিতলাল মজুমদার ...	৭০।	স্বপন পসারী (কা)
মনোজ বসু ...	৭১।	বন-মর্ম্মর (গ)
যোগীন্দ্রনাথ বসু ...	৭২।	মাইকেল জীবনী
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ...	৭৩।	সমসাময়িক ভারত (প্র)
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ...	৭৪।	শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (উ)
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৭৫।	বঙ্গের মহিলা কবি (প্র)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৬।	নৌকাডুবি (উ)
	৭৭।	গোরা (উ)
	৭৮।	গল্পগুচ্ছ (গ)
	৭৯।	বলাকা (কা)
	৮০।	পূরবী (কা)
	৮১।	কথা ও কাহিনী (কা)
	৮২।	সোনার তরী (কা)
	৮৩।	চিত্রা (কা)
	৮৪।	শিশু (কা)
রজনীকান্ত সেন ...	৮৫।	বাণী (কা)
রাজশেখর বসু ...	৮৬।	গড্ডলিকা (গ)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৮৭।	চরিত্রহীন (উ)
	৮৮।	বিন্দুর ছেলে (গ)
	৮৯।	শ্রীকান্ত (উ)
	৯০।	দেবদাস (উ)
	৯১।	পল্লীসমাজ (উ)
	৯২।	বিরাজ-বৌ (উ)
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৯৩।	নারীমেধ (গ)
	৯৪।	বধূবরণ (গ)
সীতা দেবী ...	৯৫।	পরভৃতিকা (উ)
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৯৬।	অভ্র আবীর (কা)
	৯৭।	বেলাশেষের গান (ক)
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৮।	চিত্রবহা (উ)
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৯৯।	কাজরী (উ)
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১০০।	কবিতাবলী (ক)

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

MORE AUDACIOUS THAN THIS ONE CANNOT BE

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভারতের সাধারণ ভাষা

হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োবিংশ অধিবেশনের সভাপতি রূপে বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড় হিন্দীকে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে চালাইবার পক্ষে ওকালতি করিতে যাইয়া যতটা আবেগ ও অধীরতার পরিচয় দিয়াছেন, যুক্তি অথবা তথ্যের আশ্রয় ততটা গ্রহণ করেন নাই। হিন্দীর পক্ষে এই প্রকার প্রচার নানা উপলক্ষে আমরা অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি।

ভারতবর্ষ খুব বড় দেশ, এখানে অনেক ভাষা প্রচলিত। ভারতের আয়তন ১,৮০০,০০০ বর্গ মাইল, এবং '৩১ সালের গণনা অনুসারে ২২৫টি স্বতন্ত্র ভাষা এখানে কথিত হয়। যে দেশে ৩৫৩,০০০,০০০ লোক বাস করে, সে দেশে ভাষার সংখ্যা বেশী হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। সমগ্র ইউরোপের জনসংখ্যা ৪৭৫,০০০,০০০ এবং আমেরিকার জন সংখ্যা ১২৩,০০০,০০০। তাহা হইলেও ভারতের এই সকল ভাষার অত্যন্ত বেশীর ভাগ, খুব অল্প লোকের দ্বারাই ব্যবহৃত হয়, এবং ভারতের অধিকাংশ লোক বাংলা, হিন্দী, মারাঠি, ওড়িয়া, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি কোন না কোন প্রধান ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন। এই সকল ভাষার সাহিত্যিক বিষয়বস্তু ও ভাবধারা প্রধানতঃ সংস্কৃত হইতে গৃহীত বলিয়া এবং এই সকল ভাষাভাষী লোকদের আচার, ধর্ম্ম, রীতিনীতি প্রভৃতিতে মিল থাকায় সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্যের ধারা বরাবর রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু, সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাষ্ট্রিকতা, অথবা সকল ধর্ম্মের, সকল প্রদেশের এবং সকল ভাষাভাষী ভারতীয়দের লইয়া একজাতি গঠনের কল্পনা, সম্পূর্ণ আধুনিক কালের। ইংরেজ শাসন ও ইংরাজী সাহিত্য প্রত্যক্ষ ভাবে এবং এই পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের প্রভাব পরোক্ষ ভাবে আমাদের এই ইচ্ছাকে গড়িয়া তুলিয়াছে ও পুষ্ট করিয়াছে।

সমগ্র ভারতের মধ্যে পূর্ব্বে ঐক্য থাকিলেও, বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। কাজেই ইহা কতকটা শিথিল ছিল এবং রাষ্ট্রীয় বা অন্য প্রয়োজনে প্রযুক্ত হইবার মত উপযোগিতা ইহার ছিল না। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আমাদের ঐক্যের শক্তিকে যখনই প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইল, তখনই আমাদের নেতারা দেখিলেন, আমাদের পরস্পরের দৃঢ়ভাবে মিলিত হইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা হইতেছে—আমাদের বহুভাষা। প্রথমে অবশ্য ইংরাজীর সাহায্যেই কাজ চলিয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত তাহাই চলিতেছে। কিন্তু, রাষ্ট্রিক আন্দোলনে জনসাধারণের যোগ যত ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল, ততই ইংরাজীর জন্য অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু, এই অসুবিধা অপেক্ষা আমাদের ক্রমবর্দ্ধিত জাতীয় অভিমান, ভিন্নদেশীয় ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য্য মনে করিতে বিশেষ ভাবে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। এই জন্য সকলের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, এমন একটি ভারতীয় ভাষা বাছিয়া লইবার চেষ্টা রাষ্ট্রিক আন্দোলনের মধ্যেই জন্মলাভ করিল।

সকল রাজনীতিক নেতাই একবাক্যে হিন্দীর পক্ষে রায় দিলেন; বাঙ্গালী নেতারাও ইহাতে সায় দিলেন। কিন্তু, মহাত্মাজীর প্রভাবকে পক্ষে পাইয়াই হিন্দী বর্ত্তমানে এতটা শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, সকল প্রদেশের রাজনীতিক এবং অরাজনীতিক সকল প্রকার লোকেই হিন্দীর দাবী অবিসংবাদী বলিয়া মনে করেন। অন্য কোন ভাষার অনুরূপ দাবী বা এতদপেক্ষা বেশী দাবী আছে কিনা, তাহা তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

কয়েকটি কারণের সমবায়ে হিন্দীর এই অসাধারণ গৌরব ও সুযোগ লাভের সুবিধা ঘটিল। মহাত্মার উপর এবং মহাত্মার সময়ে কংগ্রেসের উপর হিন্দীভাষী নেতাদের অপ্রতিহত প্রভাব যে হিন্দীকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাত্মার নিজের মাতৃভাষা গুজরাটীর সকল ভারতের সাধারণ ভাষা হইবার সম্ভাবনা কোন দিক দিয়া কোন প্রকারেই ছিল না। কাজেই, এ সময়কার সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী নেতাদের অধিকাংশের মাতৃভাষা এবং গুজরাটীর প্রতিবাসী-ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ভাষা হিন্দীর উপর স্বভাবতঃই তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকে হিন্দী বলে এবং হিন্দী বুঝে এই কথা বলা হইল। এসময়ে বাংলার নেতারা বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে পারিতেন। ইহা না করায় মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের যে সহজ কর্ত্তব্য ছিল, তাহা অবহেলা করা হইয়াছে। তাঁহারা ইহা সহজেই প্রমাণ করিতে পারিতেন যে, হিন্দীভাষীর সংখ্যা যত অধিক বলিয়া ধরা হয় ইহার প্রকৃত সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক কম এবং বাংলাভাষীদের অপেক্ষাও কিছু কম। পূর্ব্ব এবং পশ্চিমী হিন্দীর মধ্যে এতটা ব্যবধান যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাষাই বলা সঙ্গত। বিহারীকে হিন্দীর অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয় এবং বিহারীরাও হিন্দীভাষা ও সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে বিহারী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা এবং হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সহিতই ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। হিন্দীভাষী মুসলমানেরা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা উর্দ্দু নামে অভিহিত হয়। হিন্দীর সহিত ইহার পার্থক্য এত বেশী যে, হিন্দী শিখিয়া কেহ সহসা উর্দ্দু বুঝিতে সমর্থ হইবেন না।

হিন্দী হইতে বিহারীদিগকে বাদ দিলে, পূর্ব্ব হিন্দী পশ্চিমী হিন্দী এবং উর্দ্দুর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিলে এবং অন্যপক্ষে সমগ্র বঙ্গভাষীদের ভাষাগত ঐক্যের কথা, এবং আসামী, ওড়িয়া ও বিহারীর সহিত বাংলাভাষার নিকট সম্পর্কের কথা বিবেচনা করিলে, সংখ্যার শক্তিও যে বাংলার পক্ষে থাকিত তাহা বঙ্গীয় নেতারা দেখাইতে পারিতেন।*

হিন্দীকে ভারতের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার অন্যতম কারণ ইহাই হইতে পারে যে, সাধারণ ভাষাটিকে যাহাতে মুসলমানেরা মানিয়া লইতে পারেন, তাহারও প্রয়োজন ছিল এবং হিন্দী ও উর্দ্দু একভাষা (যদিও তাহা সত্য নহে) এই কথা বলিয়া হিন্দীর পক্ষে তাঁহাদের সমর্থন পাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু, বাঙ্গালী নেতারা দেখাইতে পারিতেন যে উর্দ্দুভাষী অপেক্ষা বাংলা-ভাষী মুসলমানের সংখ্যা অধিক।

সাধারণ ভাষা নির্ব্বাচনের সময়, ভারতীয় প্রধান ভাষা-গুলির মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষ কোনটির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাও বিবেচনা করা যাইত এবং তাহাতে বাংলার জয়লাভ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

বাংলার দাবীর কথা অন্যান্য প্রদেশবাসীদের স্মরণ না হইবার অন্য কারণ এই হইতে পারে যে, বাংলা ভাষীদের সংখ্যা অধিক হইলেও, ইঁহারা প্রধানতঃ বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। অন্যান্য প্রদেশবাসীদের বাংলা ভাষার সংস্রবে আসিবার অধিক সুযোগ ঘটে নাই। যে সকল বাঙ্গালী সাধারণতঃ অন্যান্য প্রদেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষিত লোক বলিয়া, ইংরাজীর সাহায্যেই কাজ কর্ম্ম চালাইয়াছেন অথবা সহজেই নিজেদের কর্ম্মভূমির ভাষা শিখিয়া লইয়াছেন।

অন্যপক্ষে হিন্দীভাষী লোকেরা বিপুল উদ্যমের সহিত তুচ্ছতম হইতে বৃহত্তম সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা সূত্রে, শ্রমসাধ্য, কষ্টসাধ্য, সাহস-সাপেক্ষ নানাপ্রকার কার্য্যে ভারতের সকল প্রদেশে বহুসংখ্যায় ছড়াইয়া পড়েন। পুলিশ ও সৈন্য বিভাগের সাহায্যেও হিন্দীভাষী লোকেরা ভারতের নানা প্রদেশে যাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। ইঁহারা কখনও নিজ মাতৃভাষা পরিত্যাগ করেন নাই; কাজেই, অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যাতীত লোককে হিন্দীভাষার সংস্পর্শে

* ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা বিচিত্রায় 'বঙ্গভাষা প্রচলন' শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথা লেখক কর্তৃক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আসিতে হইয়াছে, প্রত্যেক প্রদেশের লোকের মনে ক্রমে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, অন্য প্রদেশবাসীদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে হইলে, হিন্দীই শিক্ষা করিতে হইবে। হিন্দীকে বহু লোকের ভাষা মনে করিবার আর একটা কারণ এই হইতে পারে যে, অহিন্দীভাষীরা হিন্দীভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য উত্তর ভারতের সকল ভাষাকেই হিন্দী মনে করিয়া থাকেন। হিন্দীর সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে, এমন অন্যান্য ভাষাকেও হিন্দী মনে করিয়া থাকেন।

উর্দ্দু সারা ভারতের মুসলমানদের সংস্কৃতির ভাষা বলিয়া গৃহীত হয়, এবং সকল প্রদেশের মুসলমানেরাই ইহা শিখিবার চেষ্টা করেন। হিন্দীর সহিত ইহার সাদৃশ্য খুব নিকট বলিয়া, ইহাও হিন্দীর বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য হিন্দীভাষী লোকদের হাতে থাকায়, অভারতীয় বণিকেরাও ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দীই শিক্ষা করেন। যে সকল অভারতীয় বণিক বা রাজকর্ম্মচারী এদেশে বাস করেন, তাঁহারা এবং সকল প্রদেশের ভারতীয় ধনী লোকেরাও প্রধানতঃ হিন্দীভাষী লোকদের মধ্য হইতেই ঝি, চাকর, দারোয়ান প্রভৃতি শ্রেণীর লোক সংগ্রহ করেন। ইহার মধ্য দিয়াও হিন্দীভাষা ভারতের সকল প্রদেশে ছড়াইয়াছে এবং ভিন্ন প্রদেশীয় ভারতীয়দের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে হইলে হিন্দী ব্যবহার করিতে হইবে লোকের মনে ক্রমে এই ধারণা জন্মিয়াছে। এইরূপে ধীর ও দৃঢ়ভাবে হিন্দী ভাষা সকল প্রদেশেই স্থান করিয়া লইয়াছে এবং ইহার সর্ব্বজনগ্রাহ্যতা সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে, সেকথা সহসা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু, আলোচ্য ব্যাপারে হিন্দীর পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া মহারাজা গাইকোয়াড় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বাঙ্গালীদের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন এবং বহু বর্ষের চেষ্টায় উপহাস্য "বাবু ইংরাজী" শিক্ষার পরিবর্ত্তে কয়েকদিনের মধ্যে হিন্দী শিক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অনেক লাভের এই সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কোন প্রদেশের কোন শ্রেণীর লোকই যে বাঙ্গালীদের আক্রমণ করিবার কোন সুযোগই (অসুযোগকেও সুযোগে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া) বাদ দেন না, ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরব বোধ করিতে পারেন। তাঁহাদের 'বাবু ইংরাজী' সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, কোন জাতির বহু লোককে যখন কোন বিদেশী ভাষা শিখিতে এবং ব্যবহার করিতে বাধ্য করা যায়, তখন তাহাদের দ্বারা কতকটা হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নহে। প্রথম ইংরাজী শিখিতে অগ্রণী হওয়াতেই বাঙ্গালীরা এইরূপ উপহাসের পাত্র হইয়াছিলেন। একদিন যাহা মাত্র বাঙ্গালীর পক্ষে সত্য ছিল, এখন তাহা সকল প্রদেশের লোকের পক্ষেই সত্য।

আর বাঙ্গালীদের পক্ষে হিন্দী শিক্ষা করা যতটা সহজ, হিন্দীভাষীদের পক্ষেও বাংলা শিক্ষা করা ততটা সহজ, এবং বাংলার অধিকতর সমৃদ্ধিশালী সাহিত্যের জন্য, বাঙ্গালীদের হিন্দী শিক্ষা করা অপেক্ষা তাঁহাদের বাংলা শিক্ষা করা অধিকতর লাভের হইবে। সাধারণ ভাবে অহিন্দীভাষী এবং অবাংলাভাষী লোকদের পক্ষে হিন্দী ও বাংলা শিক্ষা করা সমানই সহজ অথবা সমানই কঠিন এবং কতকগুলি লোকের পক্ষে হিন্দী শিক্ষা করা যেমন কতকটা সহজ, আসামী, উড়িয়া এবং বিহারীদের পক্ষে বাংলা শিক্ষা করা তেমনই অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সকলের পক্ষেই বাংলা শিক্ষা করা অধিকতর লাভের।

যাঁহারা ভাষার মধ্য দিয়া সারা ভারতবর্ষের ঐক্য চান, তাঁহারা একীভূত ভারতবর্ষকে দেখিবার আগ্রহে এই সহজ কথাটা ভুলিয়া যান যে, সকল প্রদেশের সকল ভাষাভাষী লোকদের প্রত্যেকের মহত্তম বিকাশেই আমাদের লাভ এবং তাহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই বিকাশ প্রত্যেকের মাতৃভাষার উন্নতির এবং তাহার মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীত সম্ভব নহে। কোন এক প্রদেশের ভাষা সকলের উপর চাপাইয়া দিলেই আমাদের সকল উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না।

কোন একজন অবাঙ্গালী নাকি একবার বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের মত লোককে চাননা, কেননা তিনি প্রাদেশিক ভাষাকে পুষ্ট করিয়া ভারতের আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাকে বাড়াইয়া দিয়াছেন। কোন বৃহৎ জিনিসের সুপুষ্ট বিভিন্ন অংশ সমূহের যে স্বাভাবিক সংযোগ তাহাই তাহার শক্তি বিধান করে; কিন্তু একের অতি-প্রাধান্যের

মধ্যে সকলের আত্মবিলোপ শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের হ্রাসই ঘটায়।

ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা কোন ভারতীয় ভাষা হওয়া উচিত কি না

সংখ্যা দেখিয়াই হউক অথবা সাহিত্যিক উৎকর্ষ দেখিয়াই হউক, কোন ভারতীয় ভাষাকেই, রাষ্ট্রে এবং অন্যত্র সাধারণ ভাষার স্থান দান করা উচিত কিনা, তাহাও বিশেষ ভাবে বিচার্য্য।

বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যাইতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনের গতি এবং উন্নতি প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে এই প্রতিযোগিতাও বাড়িয়া যাইবে। ইহার পশ্চাতে কোন প্রকার বিদ্বেষ না থাকিলে, এই প্রতিযোগিতার ভাব ক্ষতির কারণ না হইয়া, আমাদের উদ্যম ও সচেষ্টতা বাড়াইয়া দিবে।

কিন্তু, সকল প্রদেশের লোকেই যাহাতে সমান সুযোগ প্রাপ্ত হইতে পারেন, কেহ কাহারও উপর কোন অন্যায় সুযোগ না লইতে পারেন, সকলের প্রতি ন্যায় ও সুবিচারের জন্য তাহার ব্যবস্থা রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে। ভারতবর্ষের কোন এক প্রদেশের ভাষাকে যদি রাষ্ট্রিক ভাষা করা হয়, তাহা হইলে সেই প্রদেশের লোকেরা সহজেই অন্য প্রদেশের লোকেদের উপর কতকটা সুবিধা লইতে পারিবেন। প্রথমতঃ ইঁহাদিগকে নিজেদের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা শিক্ষা না করিলেও চলিবে এবং এই জন্য অন্যান্য প্রদেশের লোকদের অপেক্ষা শিক্ষায় তাঁহাদের কম সময়ও উৎসাহ ব্যয় করিতে হইবে। বক্তৃতা, তর্ক, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রভৃতিতে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত সুবিধা হইবে। তদ্ব্যতীত নিজেদের ভাষা রাষ্ট্রিক ভাষা বলিয়া অন্যান্য প্রদেশের ভাষাও সাহিত্যকে কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখা, ইঁহাদের পক্ষে কতকটা স্বাভাবিক হইবে। সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি কৃত্রিম সাধারণ ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা সেইজন্য অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

Esperanto, Volapuk প্রভৃতি ভাষা সৃষ্টির কার্য্য এই প্রকার প্রয়োজন ও চেষ্টার ফলে কতক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা বর্ত্তমানে পৃথিবীর সাধারণ ভাষার কার্য্য যদিও কতক পরিমাণে চালাইয়া দিতেছে, তাহা হইলেও ইহাতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির লোকেরা সন্তুষ্ট নহেন।

নিজের মাতৃভাষা নহে, এমন যে কোন ভাষা শিক্ষা করা এবং নিজের মাতৃভাষার ন্যায় তাহা আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। অতি অল্প সংখ্যক লোকের পক্ষেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। এই ভাষা আবার যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের সহিত এই ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায়ই যদি প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহা হইলে বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হিন্দী হইলে, অহিন্দী-ভাষীদিগকে এই সকল অসুবিধায় পতিত হইতে হইবে। নিজেদের মাতৃভাষা ব্যতীত হিন্দী শিক্ষা করিতে হইবে বলিয়া, শিক্ষার জন্যও অন্যান্য প্রদেশবাসীদের অধিক সময় ও উদ্যম ব্যয় করিতে হইবে।

অন্যদিকে আবার বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার জন্য কতক লোককে বাধ্য হইয়া ইংরাজী শিখিতে হইবে। ভারত সরকারেরও বাহিরের সহিত সম্পর্ক রাখিতে হইবে এবং তাহার জন্য ইংরাজী রাখিতে হইবে। এই সকল বিভাগে যে সকল অহিন্দীভাষী চাকরি করিবেন, তাঁহাদিগকে, নিজেদের মাতৃভাষা, হিন্দী এবং ইংরাজী, তিনটিই ভাল ভাবে শিখিতে হইবে।

অথচ, যদি প্রাদেশিক সকল কাজে প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহৃত হয়, এবং নিখিল ভারতীয় ব্যাপার সমূহে ইংরাজীর ব্যবহার হয়, তাহা হইলে এই সকল অসুবিধা কিছুই থাকে না। ইহাতে কেহ কাহারও উপর অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না, অথবা কেহ অন্যায় ভাবে কোন ন্যায়সঙ্গত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন না, বহির্জ্জগতের সহিত আমাদের সম্পর্ক অটুট থাকিবে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যেও যোগাযোগ নষ্ট হইবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা এখনও অবতীর্ণ হই নাই, কাজেই, অন্যান্য জাতির ন্যায়, কোন বিশেষ জাতির

ভাষাকে গ্রহণ করায় আমাদের কোন ক্ষতি বা ক্ষোভের কারণ থাকিবে না।

কাহারও প্রতি কোন অবিচার না করিয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগের এই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যে, কোন বিশেষ ভাষার উপর নির্ভর না করিয়া, আমাদের শিক্ষার কোন একটা স্তরে ছাত্রকে নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন একটি প্রধান ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। একজন বাঙ্গালীর পক্ষে কাজ চালাইবার মত হিন্দুস্থানী বা মারাঠি শিক্ষা বা একজন হিন্দুস্থানীর পক্ষে বাংলা বা উড়িয়া শিক্ষা করা খুব কষ্টসাধ্য নহে। নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া ইহার কোনটির মধ্যবর্ত্তিতা গ্রহণ করিতে হইবে না বলিয়া কেহ কোন অসুবিধায় পতিত হইবেন না। ইহাতে সমগ্র ভারতের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইবে অথচ কাহারও কোন অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রে ঘরোয়া ব্যাপারে প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহৃত হইলে, কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কিত ব্যাপার সমূহে ইংরাজী ব্যবহৃত হইলে, এবং ভারত সরকার বর্ত্তমানের ন্যায় শুধুমাত্র ইংরাজী ব্যবহার করিলে, সাধারণ লোকের পক্ষে নিজ মাতৃভাষা শিক্ষা করিলেই চলিতে পারিবে এবং যে সকল বিভাগে ইংরাজীর জ্ঞান প্রয়োজন, সেখানে যাঁহারা চাকরি করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা তাহার জন্য বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অবশ্য যাঁহারা উচ্চ শিক্ষালাভ করিবেন, প্রতিভা অথবা কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম হইবেন, তাঁহাদের জন্য ইংরাজী অথবা অন্য বিদেশী ভাষা শিক্ষার এবং শিক্ষার মধ্যস্তরে নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা কি প্রকারে রাখিতে হইবে, তাহা নির্ণয়ের জন্য, অনুসন্ধান, বিবেচনা এবং বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্য ও পরামর্শ প্রয়োজন হইবে।

ভারতের সকল প্রদেশের জন্য সাধারণ অক্ষর

মহারাজা গাইকোয়াড় সকল ভারতবর্ষের জন্য এক সাধারণ বর্ণমালার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলিয়াছেন এবং দেবনাগরী অক্ষরকেই এই উদ্দেশ্যের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া মত দিয়াছেন। তাঁহার এই কথাও নূতন নহে।

উর্দ্দু ব্যতীত ভারতের সকল প্রধান ভাষার বর্ণমালাই এক। অক্ষরের আকৃতি এক হইলে, নানাদিক দিয়া আমাদের সুবিধা হইতে পারিত এবং ভারতের প্রধান ভাষাগুলিতে এক আকৃতির অক্ষর গৃহীত হইলে, এখনও এই সকল সুবিধা হইতে পারে। পুরাতন অক্ষর বর্জ্জন করিলে অনভ্যাস ও নূতন বানানপদ্ধতির জন্য যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, আমাদের বর্ণমালা এক এবং সংস্কৃতমূলক বলিয়া তাহার অনেকগুলি আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে না। বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে বলিয়া, নিজের মাতৃভাষা জানা থাকিলে, ইহার যে কোন ভাষাভাষীর পক্ষে অল্প জানিয়াই অন্য সকল ভাষার সাহিত্যাদির আংশিক রসগ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। কারণ, ইহা অন্যভাষা শিখিয়া, তাহা মাতৃভাষার ন্যায় ব্যবহার করার ন্যায় কঠিন নহে। ইহাতে মুদ্রণকার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারিবে এবং বিক্রয়ের সম্ভাবনা অধিক থাকায় উন্নত ধরণের টাইপরাইটার প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইবে।

কিন্তু, অক্ষর নির্ব্বাচনের সময় সকল প্রকার গোঁড়ামি বাদ দিয়া, যে অক্ষরের মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য, যে অক্ষর ছাপিতে সর্ব্বাপেক্ষা কম স্থান লাগে, যে অক্ষর ছোট করিয়াও পরিষ্কার ভাবে ছাপা যায়, যে অক্ষর হাতে, তাড়াতাড়ি ও সহজে পড়িতে পারা যায় এমন ভাবে দ্রুত লেখা যায়, তাহাই নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সম্ভবতঃ এদিক দিয়া বাংলার কিছু দাবী থাকিতে পারে।

রাজনীতি ও অর্থনীতি শিক্ষার বিদ্যালয়

মাদ্রাজ জুনিয়র লিবারেল লিগের উদ্যোগে, ওয়াই এম্-আই-এর বাড়ীতে মাদ্রাজের এড্ভোকেট জেনারেল, সার এ-কৃষ্ণস্বামী আয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতি শিক্ষাদানের জন্য একটি গ্রীষ্ম বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করিয়াছেন।

রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে

সকলকে আধুনিক জ্ঞান দান করাই এই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের মধ্যে এই ধরণের ইহাই প্রথম স্কুল।

আমাদের চারিপাশের ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই বর্দ্ধিত হইবে, আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যের পক্ষে আমাদের সঠিক বুঝিবার পক্ষে, আমাদের চিন্তা স্পষ্ট হইয়া উঠিবার পক্ষে ততই সুবিধা হইবে।

কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য আরও দুই একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাংলাদেশে অনুরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব নহে।

অসাম্প্রদায়িক দান

জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে, ছোটনাগপুরের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, রাঁচির বিশিষ্ট মুসলমান বণিক ও জমিদার খান্ বাহাদুর হবিবুর রহমান, লক্ষ টাকা মূল্যে সম্প্রতি ক্রীত তাঁহার হাত্‌মা জমিদারী দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সাধারণের হিতকল্পে কৃত সর্ব্বপ্রকার দানই প্রশংসনীয়। যাহার দ্বারা দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকই উপকৃত হইবেন, এই সাম্প্রদায়িকতার দিনে তাহার মূল্য আরও বেশী।

পাঁচ লক্ষ টাকা দান

বেকার পার্শী যুবকদের জন্য একটি শ্রমশিল্প-নিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য বোম্বায়ের কোন একজন পার্শী মহিলা, আত্মনাম গোপন করিয়া ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

মহাত্মার বাংলা ভ্রমণ স্থগিত

মহাত্মা তাঁহার ভ্রমণের অবশিষ্টাংশ পদব্রজে সমাধা করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করায়, বর্ত্তমানে তাঁহার বাংলায় আসা হইল না। মহাত্মা এই নূতন সঙ্কল্প গ্রহণের কারণ স্বরূপ—অন্যান্য কথার মধ্যে বলিয়াছেন যে, শ্রদ্ধা ও আগ্রহশীল শ্রোতাদের, সত্যের বাণী শুনাইতে পারিলেই মাত্র তাহা জনসাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে। দ্রুতগামী যানে আরোহণ করিয়া, পরস্পর হইতে বহুদূরে অবস্থিত তিনটি স্থানে প্রত্যহ যাইবার সময় এই সুযোগ পাওয়া কষ্টকর। শান্ত আবহাওয়া ব্যতীত আধ্যাত্মিক বা অন্য কোন প্রকার সত্যের বিস্তার সম্ভব নহে। এই আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম আন্দোলন। বিস্তার লাভের জন্য ইহা দ্রুতগামী যানের অপেক্ষা রাখে না, এবং ইহা খুবই সম্ভব যে, অন্তর হইতে যদি সত্য উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে রেল অথবা মোটর অপেক্ষা পদব্রজে ইহা অধিকতর দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করিবে।

দ্রুতগামী যানে ভ্রমণ করায় এবং কোন স্থানে বেশী সময় থাকিবার সুবিধা না হওয়ায়, মহাত্মাকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য লোকের অত্যন্ত ভীড় হওয়া এবং তাহাদের পক্ষে অধৈর্য্য হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। এবং একথাও সত্য যে, শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে শ্রদ্ধা ও আগ্রহান্বিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে কোন কথা বলিলে, তাঁহারা সেই কথার দ্বারা যতটা প্রভাবিত হইতে পারেন, অধৈর্য্য এবং উত্তেজনার মধ্যে ততটা হওয়া সম্ভব নহে। কোনও একটি বিশেষ শ্রোতৃমণ্ডলীর কথা ধরিলে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, দ্বিতীয় অবস্থা অপেক্ষা প্রথম অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিলে, তাহা অনেক লাভের হইতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ স্থানের লোক মহাত্মার লক্ষ্য নহে, সকল ভারতবর্ষ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। কাজেই, কথা আসিয়া দাঁড়ায়, একটা বিশেষ স্থানের লোককে কোন কথা ভাল করিয়া শুনান এবং সকল ভারতবর্ষের লোককে উদ্বুদ্ধ করিবার সুযোগ গ্রহণ করা, এই দুইটির মধ্যে কোনটি অধিক ফলদায়ক হইবে। সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যে কাজ করিতে হইবে, কোন একটা বিশেষ স্থানের কাজের মধ্য দিয়া, তাহা এই ভাবে সফল হইতে পারে যে, কোন একটা বিশেষ স্থানে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে, ক্রমে তাহা সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইবে এবং সাময়িক উত্তেজনার ঝোঁকে যে কাজ হয়, তদপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক হইবে।

হরিজন আন্দোলনকে শক্তিদান করিবার জন্যই মহাত্মা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি

যেখানে যেখানে যাইতেছিলেন, সে সকল স্থানে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইতেছিল, কর্ম্মীরা নূতন শক্তি পাইতেছিলেন এবং লোকে মহাত্মাকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রতীক মনে করে বলিয়া তাঁহার আগমনে অস্পৃশ্যতার কঠোরতা আপনা হইতেই শিথিল হইতেছিল। তাঁহার নূতন সঙ্কল্পে দেশ এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। কোনও একটা বিশেষ স্থানের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে পারিবে, এমন মনে হয় না। এরূপ সম্ভব হইলেও, যত অল্প সময়ে আমরা কাজ চাহিতেছি, ইহাতে তাহা যে হইবে না ইহা সুনিশ্চিত।

সমগ্র দেশময় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য যে আন্দোলন চলিয়াছে, মহাত্মার প্রভাব হইতেই তাহা উদ্ভূত হইলেও মহাত্মার সহিত জনসাধারণের সংস্পর্শের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। মহাত্মার চিন্তা ও চরিত্রের প্রভাব কর্ম্মী-মণ্ডলীর চেষ্টায় ও কার্য্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। মহাত্মাজীর এই ভ্রমণের ফলে বিভিন্ন প্রদেশের কর্ম্মীরা নূতন উৎসাহ ও প্রেরণা পাইতেন। ইহা দেখা গিয়াছে যে, কোন নূতন ভাব প্রচারের পক্ষে উত্তেজনা-পূর্ণ আবহাওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনের মধ্যেও তাহা দেখা গিয়াছে। মহাত্মার আগমনে নানাস্থানে যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইত, তাঁহার বর্ত্তমান ভ্রমণের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তাহা নিঃসন্দেহ সহায়তা করিত।

মহাত্মাজী এই প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মান্দোলন বলিয়াছেন। আমাদের সামাজিক জীবনের স্বাস্থ্য বিধানের পক্ষে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ অত্যাবশ্যক বলিয়া অনেকে ইহার জন্য চেষ্টা করেন এবং এই প্রচেষ্টাকে সংস্কার প্রচেষ্টা বলিয়া মনে করেন। কাহারও ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ করা নৈতিক বিচ্যুতি এই জন্য এই অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে নৈতিক বলা যাইতে পারে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রচেষ্টাকে এই জন্য নৈতিক ও সংস্কারমূলক বলা যাইতে পারে এবং নৈতিক বলিয়া শিথিলভাবে ইহাকে ধর্ম্মান্দোলন বলা যাইতে পারে। কিন্তু, মহাত্মাজী সম্ভবতঃ ইহাকে গভীরতর অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধারণের মধ্যে মহাত্মাজীর ন্যায় সত্যোপলব্ধি বা আধ্যাত্মিক দর্শন নাই বলিয়া ইহার দ্বারা ধর্ম্মান্ধভাব সৃষ্টি হইতে পারে। একবার অন্ধতার ফলে, বহু অন্যায় এবং গর্হিত কার্য্যকে আমরা ধর্ম্ম মনে করিয়া মরিয়াছি। এই নূতন অন্ধতা আবার আমাদিগকে নূতন অন্যায়ের পথে লইয়া যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনা অথবা আত্মিক শক্তিকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আমরা যে হিংসাবর্জ্জিত হইয়া, সদিচ্ছা এবং ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অন্যান্য কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারি, তাহার পথ মহাত্মাই আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কিন্তু, এই 'ধর্ম্ম' কথাটার যাহাতে অপপ্রয়োগ না হয়, যাহাতে ইহা মানসিক জটিলতার সৃষ্টি করিয়া আমাদের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে না পারিলে আমাদিগকে আবার নূতন প্রকার দুর্গতি ভোগ করিতে হইতে পারে।

মহাত্মাজীর এই পদব্রজে ভ্রমণকে কোথায়ও কোথায়ও বুদ্ধ এবং শ্রীচৈতন্যের পদব্রজে ধর্ম্ম প্রচারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এরূপ কথা শুনিতে ভাল এবং ইহাতে আমাদের আধ্যাত্মিক বাতিকগ্রস্ত মন আবিষ্ট হইয়া উঠিতে পারে এবং ভাবাবেশে আমাদের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতে পারে বটে, কিন্তু, কার্য্যে সিদ্ধিলাভের পক্ষে ইহাতে কোন সুবিধা হইবে কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

প্রাচীন কালে যখন মানুষ, তাহার সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিত, তখন মানুষের মনে ধর্ম্মের যে প্রভাব ছিল, বর্ত্তমান কালে তাহা আছে কি না এই সকল ধর্ম্মমতও বহু লোকের এবং বহু ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের বহুকালব্যাপী চেষ্টায়ই মাত্র নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল কি না, কোন একটা বিশেষ ফল লাভের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা ইহার সম্মুখে ছিল কি না, প্রভৃতি কথা এই প্রসঙ্গে বিচার করিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তির উৎস নিহিত আছে, তাহা আমরা জানি। ইহা মানুষকে চরম বিপদ ও সর্ব্বস্ব ত্যাগের মধ্যে আহ্বান করিতে পারে। মহাত্মা এই আধ্যাত্মিক শক্তিকে আমাদের গণ জীবনে সঞ্চারিত করিয়াছেন।

অন্যদিকে দেখিতে পাই, সঙ্ঘবদ্ধতা, শৃঙ্খলা, বুদ্ধি ও চাতুর্য্যপূর্ণ নীতির বলে, ইউরোপ অভূতপূর্ব্ব শক্তির অধিকারী হইয়াছে।

ইউরোপের এই শৃঙ্খলা ও সঙ্ঘবদ্ধতা হয়ত সব মানুষের কল্যাণ এবং একমাত্র সত্যকেই সম্মুখে রাখিতে পারে নাই এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির ঝোঁকে মানুষকে মগ্ন করিয়া রাখিতে অথবা তাহাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে দ্বিধা করে নাই। আমরাও আবার অন্য দিকটাকে এত বেশী করিয়া দেখিয়াছি যে, সাফল্য লাভের জন্য পথ এবং কৌশলের কথা ভাবি নাই। তাহার ফলে আমাদের অনেক শক্তি অপব্যয়ে নষ্ট হইয়াছে। ভিন্ন ভাবে ভিন্ন অভিপ্রায়ে এবং ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেও ইউরোপের বহু পরীক্ষিত নীতি ও পন্থা ও কৌশলকে আমরা বর্জ্জন করিতে পারি না।

ভারতের সমগ্র অতীত ইতিহাস, আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতা, শৃঙ্খলা এবং নীতিকুশলতার অভাবের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। পুনরায় যদি আমরা সেই সকল ভুল করিতে থাকি, তবে তাহা বিশেষ ক্ষোভের ও দুঃখের কারণ হইবে।

মহাত্মার পাদস্পর্শ করিবার ঝোঁক

মহাত্মা বলিয়াছেন, তাঁহার অনিচ্ছা ভিড় জমান এবং তাঁহার পাদস্পর্শ ও জয়ধ্বনি করা হইতে লোককে বিরত করিতে পারে নাই। এমন দিন যায় না, যে দিন পুণ্য-লোভীদের নখের আঁচড়ে তাঁহার পায়ে ক্ষত উৎপাদিত না হয়।

এই ব্যাপার হইতে আমাদের শিক্ষা পাওয়া এবং কোন দিক হইতে বিপদ আসিতে পারে তাহা অনুমান করিতে পারা উচিত।

মানুষের মনে ধর্ম্মভাব যখন বুদ্ধির আলোকপ্রদীপ্ত পথে না আসিয়া বিশ্বাসের গুপ্তদ্বার দিয়া প্রবেশ করে, তখন এইরূপ নানা অনর্থ ঘটিতে থাকে।

অজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতাপ্রসূত অন্ধবিশ্বাস, আমাদের সকল উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যে পথ দিয়া আলোক প্রবেশ করিতে পারিত, ইহা যদি সে পথও আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আর উদ্ধারের উপায় কি।

কংগ্রেস কর্ত্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার

মহাত্মার আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার মূলক বিবৃতিকে ভিত্তি করিয়া কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি, পাটনা অধিবেশনে সাধারণ ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং শুধু মাত্র মহাত্মাজীর উপর অনির্দ্দিষ্ট ভাবে স্বরাজ লাভের জন্য আইন অমান্য করিবার অধিকার ন্যস্ত করিয়াছেন।

যে কারণেই হউক দেশে আইন অমান্য আন্দোলন প্রায় কমিয়া গিয়াছে। এরূপ সময় ইহা প্রত্যাহার করায় দেশ নিরুদ্যম অথচ আতঙ্কিত অশান্তির অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবে এবং কর্ম্মীরা নূতন কর্ম্মে ও প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন।

যাঁহারা পূর্ব্বে এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখন তাঁহাদের প্রাক্ আন্দোলন জীবনে ফিরিয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন (সম্ভবতঃ করিবার মত কোনও কর্ম্মপন্থার অভাবে)। কাজেই আইন অমান্য করিবার ফলে যাঁহারা এখনও জেলে আছেন, তাঁহাদের উপর বিশেষ অবিচার করা হইতেছিল। এই কথা অন্য লোকের চোখ এড়াইলেও মহাত্মাজীর চোখ এড়ায় নাই। অন্য দিকে দেশে কোথায়ও আইন অমান্যের চেষ্টা প্রকৃত পক্ষে না থাকিলেও আইন অনুসারে ইহা বলবৎ থাকায়, যদি এই অবস্থা বন্দীদের মুক্তি পাইবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাঁহাদের উপর অবিচার হইতেছিল। এই আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া মহাত্মা ইঁহাদের প্রতি নেতার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। নূতন কর্ম্মনীতি অনুসারে অকপটে কাজ করিয়া কর্ম্মীরা, তাঁহাদের জেলে আবদ্ধ সঙ্গীদের প্রতি কর্ত্তব্য করিবার সুযোগ পাইবেন।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বরাজ লাভের জন্য আইন অমান্য করিবার ভার সম্পূর্ণ ভাবে মহাত্মাজীর উপর ন্যস্ত রাখিবার কারণ, আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। কোনও লোকের একক চেষ্টার দ্বারা স্বরাজ লাভ সম্ভব হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। যদি মহাত্মার সেই শক্তি

থাকিত, তাহা হইলে গত আন্দোলন অধিকতর সফল না হইবার কারণ কি? অন্যান্য কর্ম্মীদের দুর্ব্বলতা থাকিতে পাবে, কিন্তু মহাত্মা ত ইহাতে তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কোনও একজন লোক আমাদের অজ্ঞাত কোন অলৌকিক শক্তির বলে যদি স্বরাজ আনয়নে সমর্থও হন, তবে সে স্বরাজ তাঁহারই মাত্র হইবে; সাধারণ লোকের হইবে না। ইহার উত্তরে মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের মধ্য দিয়া প্রত্যেক লোকই স্বরাজ লাভ করিবে। ইহা যে জনসাধারণের মধ্যে নূতন শক্তি ও চেতনা আনয়ন করিয়াছে, কয়েকদিন তাঁহার সহিত যাপন করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

মহাত্মার প্রভাবে যে দেশের মধ্যে নূতন শক্তি ও চেতনা জাগিয়াছে, অন্ধ ব্যতীত সে কথা আর কে অস্বীকার করিবে। কিন্তু এই যে নবজাগ্রত শক্তি, দ্বন্দের মধ্য দিয়াই ইহা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই আন্দোলনে জনসাধারণের অংশ ছিল বলিয়াই, বহু লোকে দুঃখ ও বিপদকে বরণ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই, ইহা দেশকে নূতন শক্তি ও উৎসাহ দান করিতে পারিয়াছে, লোকের মধ্যে পৌরুষ ও আত্মবিশ্বাস জাগাইয়াছে, এবং সত্য ও আত্মমর্য্যাদার প্রতি লোককে শ্রদ্ধাবান করিয়াছে। জনসাধারণ যদি এই সংঘাতের মধ্যে আসিয়া না পড়িত, একমাত্র মহাত্মা যদি তাহাদের হইয়া এই সকল কার্য্য করিতেন তবে দেশের মধ্যে এই নূতন প্রাণের সাড়া কখনই পাওয়া যাইত না।

একথা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, কোন অলৌকিক প্রভাবে মহাত্মা স্বরাজ আনয়ন করিতে সমর্থ হইলে, দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সৃষ্টি হইবে, তাহা হইলেও বলিব, সেই উৎসাহ দেশকে যোগ্যতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিবে না। কারণ, সংঘাতের মধ্যেই শক্তি এবং পরীক্ষার মধ্যেই যোগ্যতা জন্ম লাভ করে। যাহারা পুণ্যলোভে মহাত্মার পদে ক্ষত উৎপাদন করে, মহাত্মার প্রভাব তাহাদিগকে ধর্ম্মান্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে যোগ্যতা, চেতনা বা শক্তি দান করিতে পারে নাই।

মহাত্মার উপর ভার ন্যস্ত রাখিবার যদি এই ব্যাখ্যা করা যায় যে, কোন্ সময়ে কি ভাবে ভবিষ্যৎ নিরুপদ্রব সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, কাহাদের লইয়া কোন্ কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ইহা পরিচালিত হইবে, তাহা স্থির করিবার ভার বর্ত্তমানে শুধুমাত্র মহাত্মার উপর রহিল, সময়, সুযোগ ও যোগ্যতা বুঝিয়া তিনি অন্যদেরও ইহার মধ্যে আহ্বান করিবেন, তাহা হইলেও বলিব, দেশের শক্তি ও উপযুক্ততা বিবেচনা করিবার, উপযোগী কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিবার এবং অসমর্থ হইলে ভুল করিবারও অধিকার দেশের লোকের অর্থাৎ কংগ্রেসেরই থাকা উচিত ছিল। মহাত্মাজী খুবই বড়, কিন্তু ভারতবর্ষ আরও বড়। আমাদের কর্ত্তব্য নির্ণয়ের সব দায়িত্ব একজনের উপর চাপাইয়া সেই ভারতবর্ষকে আমরা ছোট করিলাম এবং আমাদের নাবালকত্বের পাকা প্রমাণ রাখিয়া দিলাম।

মহাত্মাজী একস্থানে বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময় এবং পদ্ধতি একমাত্র সেনাপতিই নির্ণয় করিবেন, তিনিই সৈনিকদের যোগ্যতার পরীক্ষা করিবেন এবং কিভাবে কাজ করিতে হইবে, তাহা তিনিই স্থির করিবেন। যুদ্ধ যতক্ষণ চলিয়াছিল ততক্ষণ একথার যুক্তিযুক্ততা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু, যুদ্ধ যখন সাধারণভাবে স্থগিত হইল, তখন পুনরায় কখন্ কিভাবে ইহা আরম্ভ হইবে, তাহা নির্ণয়ের ভারও সেনাপতি রাখিতে চাহিলে, নিজ প্রাপ্য অপেক্ষা তাঁহার দাবী কি অধিক হইয়া যায় না?

কংগ্রেসের আলোচ্য প্রস্তাবের যদি এই ব্যাখ্যা করা যায় যে, বর্ত্তমানে দেশে গঠনমূলক কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা আছে, শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে যাহাতে তাহা চলিতে পারে, তাহার জন্য সাধারণভাবে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং কংগ্রেস যে তাহার এ পর্য্যন্ত অনুসৃত নীতি বর্জ্জন করিয়া সম্পূর্ণভাবে নত হয় নাই, তাহার প্রমাণ রাখিবার জন্য মহাত্মার উপর আইন অমান্য করিবার ভার রহিয়াছে, তাহা হইলে বলিব, প্রয়োজন হইয়া থাকিলে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ চেষ্টা প্রত্যাহার করা নিশ্চয়ই ভাল হইয়াছে, কিন্তু, যদি শুধুমাত্র মহাত্মার উপর ইহার সম্পূর্ণ ভার রাখিয়া আমরা একথা মনে করিয়া থাকি যে, কৌশল করিয়া

কংগ্রেসের নীতিকে বাঁচাইয়া রাখা হইল, তবে তাহাতে কতকটা আত্মপ্রতারণা করিবার চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র এবং সমগ্র ব্যাপারটিকে তাহাতে লঘু করিয়া ফেলা হইয়াছে। চোখ বুজিয়া না দেখিবার নীতির সহিত মহাত্মার যোগ কখনই থাকিতে পারে না বলিয়া, সর্ব্বশেষোক্ত উদ্দেশ্যে কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

যদি এই কথা বলা যায় যে, মহাত্মাজীর উপর নিরুপদ্রব সংগ্রাম চালাইবার ভার রাখিয়া, দেশ হইতে যাহাতে সত্যাগ্রহের প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহার মধ্য দিয়াই যাহাতে লোকের মন সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার উপায় রাখা হইয়াছে, তাহা হইলে বলিব, এই ভার মহাত্মাজীর উপর না থাকিলেও তিনি দেশকে প্রভাবিত করিবার এবং লোককে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত করিবার কম সুযোগ পাইতেন না; অথচ কলদায়কভাবে যাহা প্রয়োগ করা যাইবে না, কাগজপত্রে তাহার ব্যবস্থা রাখিয়া, তাহাতে কংগ্রেসকে লঘু করা হইত না।

মহাত্মার লোকোত্তর সাধু চরিত্রের উপর, তাঁহার অসাধারণ শক্তির উপর, দেশকে জয়ের পথে চালিত করিবার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস আছে বলিয়াই এত কথা বলিতে হইল।

মহাত্মা গান্ধী ও বাংলা

মহাত্মা গান্ধী বাংলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কোন কোন বাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা আমাকে বাংলার দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতি উদাসীন মনে করিয়া দোষ দেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আমার বাংলার প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী অস্বীকার করেন।"

"বাংলার প্রতিনিধিত্ব যদি আমি না করিতে পারি, তবে, আর কোন প্রদেশেরই প্রতিনিধি আমি নহি। আমি বাংলার কবিতা এবং ভাবপ্রবণতার স্তাবক। আমি প্রেমের রেশমসূত্রের দ্বারা এই প্রদেশের সহিত সংযুক্ত, কিন্তু, আজ আমি নিঃসহায়।"

তাহা হইলে বাংলার প্রতি অবিচারের কথা কি মহাত্মা পরোক্ষে স্বীকার করিতেছেন?

সত্যাগ্রহ ও জনসাধারণ

মহাত্মা সত্যাগ্রহকে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য পূর্ণফলপ্রদ অস্ত্র বলিয়া দাবী করিয়াছেন; কিন্তু, অনুপযুক্ত বলিয়া ইহা প্রয়োগের অধিকার সাধারণকে দিতে সম্মত হন নাই।

যদি ইহা যুদ্ধের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য হয়, তাহা হইলে, শিক্ষা ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া সাধারণের পক্ষে ইহা আয়ত্বযোগ্য হওয়া চাই। মহাত্মার ন্যায় অতি শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব মানুষের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। তিনি বা তাঁহাপেক্ষা উপযুক্ততর লোক ব্যতীত যদি ইহা আর কেহ প্রয়োগ করিতে না পারে, তাহা হইলে কখনই ইহাকে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যাইবে না।

প্রজ্ঞাশ্রী

শ্রীসুশীলকুমার দেব

আশ্চর্য্য মেয়ে হিল্ডা। দেশ তার জার্ম্মেণীতে—বাড়ী মিউনিক্। বলে কি না অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের বই ইংরেজীতে পড়েছে; হিন্দুদের মতন সেও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। তারি কথা বসে বসে ভাবছি। আর জাহাজ চল্‌ছে—বোম্বে থেকে পাড়ি দিয়েছে ভেনিসের পথে। তাতে হিল্ডা আমার সহযাত্রিণী।

সেদিন দুপুরে আকাশ একটু মেঘলা। ডাইনিং সেলুন থেকে মধ্যাহ্নের আহার শেষে বিশ্রামাগারে গিয়ে বস্‌লুম। চোখ দুটো একবার সাগরের ঘোলা জল একবার আকাশের ঘোলা মেঘের দিকে তাকিয়ে যেন কী অকস্মাতের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে নিচ্ছে। ঔৎসুক্যের শেষ নেই, দেখারও বিরাম নেই।

এমন সময় সহসা উচ্চ হাসির শব্দে আমার ধ্যান ভাঙ্‌ল। চেয়ে দেখি একজন কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় ভদ্রলোক ও একজন শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী হাতে হাত ধরে খুব কথাবার্ত্তার মধ্যে একে অন্যকে সহাস্য অথচ নিষ্পলক নয়নে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘরে ঢুক্‌লেন। ঢুকেই কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাটিকে প্রায় এক রকম ঠেলেই একখানা কৌচে আদর করে বসিয়ে ঐ কৌচের হাতার ’পরে নিজে বসে পড়্‌লেন। তারপর অনতি-বিলম্বে মহিলার হাত নিজের দু’হাতে নিবিড় করে জড়ালেন।

ইতি মধ্যে জাহাজটি বেশ দুল্‌ছে। ঝাঁকানি খেয়ে ঘরের ভেতর থেকে চোখ আমার বাইরের দিকে ছুটল। বৃষ্টি পড়্‌তে সুরু হয়েছে তখন।

আবার একটা হাসির শব্দ। এবার অবিমিশ্র স্ত্রীকণ্ঠ। অতএব পুনর্ব্বার কক্ষাভ্যন্তরে দৃষ্টি ফিরে এলো; পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক মহিলাটিকে কাতুকুতু দিয়ে হাসাচ্ছেন—তারি শব্দ। মহিলাটিও হাস্‌তে কিছুমাত্র গররাজি নন্; শুধু মিনতি করে বল্‌ছেন, "তুমি বড়ো দুর্দ্দান্ত। আমার শরীরে প্রায় জ্বালা তুলে ফেল্‌লে। আর কতো? থামো—দুষ্টু!" কথাগুলো স্বল্প চাপা সুরে বলা হলো। এবং তিনি যে নিতান্ত সীরিয়স্‌লি বল্‌ছেন তা তাঁর দৃষ্টির একটানা ভঙ্গিমা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক কিন্তু নাছোড়বান্দা। তবু যেন হার মান্‌লেন, এম্‌নিতর একটুখানি করুণ ভাব মুখ-চোখে প্রকাশ পেলো। অবশ্য অত্যন্ত সুবোধ বালকের মতো গোলমালে না যেয়ে; তারপরই মহিলাটির "বব্‌ড" কুন্তল-দাম মৃদুল স্পর্শ দ্বারা কণ্ডূয়ন কর্‌তে লাগ্‌লেন। মহিলা এতে বাদ সাধলেন না, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন তন্দ্রালু হলেন। দু’জনের ব্যবহারে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখে আমারও মনটা বেশ পাতলা হলো।

এম্‌নি কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই নৃত্যচ্ছন্দে দেহকে হিল্লোলিত করে মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকও একটা স্মার্ট লম্ফ দিয়ে উঠে আনতশির হয়ে বল্‌লেন—ধন্যবাদ মিস্ কার্‌টার্।

আমি তখনো বসে আছি। কিন্তু আমার বসে থাকাটা তেমন মনোযোগ দেবার মতন ঘটনাই নয় এম্‌নিধারা চতুরালি দেখিয়ে দু’জনেই ঘর ছেড়ে রওনা দিলেন ডেকের দিকে। যাবার সময় আবার সেই হাসি—এবার মিলিত কণ্ঠের হাসি। ব্যাপারটি এতো তাড়াতাড়ি মিট-মাট হতে দেখে আমি পূর্ব্ববৎ বসে রইলুম। খালি মনে হতে লাগ্‌ল, যেন বাস্তব জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে এক কল্পলোকের মধ্যে সমুদ্র-পাড়ি দিচ্ছি। চলন-বলন-ধরণ-ধারণের কতো নিত্য নতুন নমুনা এখন হামেশাই দেখ্‌ছি। আর হিল্ডার কথা কথা বার বার মনে পড়্‌ছে। হিল্ডার জুড়ি কেউ নেই

জাহাজের ত্রিসন্ধ্যা পানাহার, বৈকালিক চা, প্রতিযোগিতা-মূলক খোস্ ভ্রমণ, অলস সায়াহ্নে ডেক্‌-চেয়ারে পুস্তক পাঠ সময়ে অসময়ে সর্ব্বসময়ে খেলা খেলা খেলা, রাত্রে ডিনার

শেষে কফি সিনেমা নাচ গান গল্প গুজব মজ্‌লিস—রোজকার রুটিন্‌ একেবারে বেচপ ঠেকছে। দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন কাটছে। জাহাজ চল্‌ছেই। আর আমি উৎপিপাসু হয়ে দেখ্‌ছি—শুধু জল আর আকাশ, আকাশ আর জল। মাঝে মাঝে বন্দর পেলেই নেমে বেড়িয়ে এসে আমি যে সত্যিই স্থলচর সমাজে মানুষ হয়েছি, জলচর জাহাজের যাত্রী মাত্র নই—তাই পরখ করে দেখি। বেড়াবার সঙ্গিনী আমার হিল্ডা।

অবশ্য হিল্ডার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক কথোপকথন সব সময়ে জমেই জমে।

হিল্ডা বলে—ভ্রমণের জন্যে ভ্রমণ আদৌ সুখদ নয়। উদ্দেশ্য-মূলক লম্বা ভ্রমণের মধ্যে যে মৌজ তার তুলনা মেলা ভার। কারণ লম্বা ভ্রমণের মধ্যে উদ্দেশ্যের বাইরে যা-কিছু অনাকাঙ্ক্ষিতরূপে ঘটে তার সবটুকুই অকস্মাতের দ্বারা পরিপ্রেক্ষিত। অকস্মাতের সাক্ষাৎ মানেই বিস্ময়; তার মানেই আনন্দ। সুতরাং সমুদ্রযাত্রায় নিরানন্দের হেতু নেই: এইতো যথা, রাত্তিরে আজ জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজার ডিনার। আনুষঙ্গিক "ফেন্সী-ড্রেস্ নাচ", আরো কতো-কি সমারোহ আছে—কে জানে!

হিল্ডা নির্ভুল কথা বল্‌তে পারে। হীরের টুক্‌রো মেয়ে!

* * * *

আজ সমুদ্রযাত্রার তেরো দিন। রাত্রে ডিনারের পর ডেক্‌টি নাচ-বাজনার উৎসব-স্থলীতে পরিণত হয়েছে। একটা ঘটনার মতন ঘটনা—ফেন্সী-ড্রেস্ নাচ। নৃত্যাঙ্গণের কাছেই বসে আয়োজন-উদ্যোগ দেখ্‌ছি, এম্‌নি সময় হিল্ডা এসে বল্লে, 'কী—তুমি যে একলা বসে আছো মিঃ বেঙ্গল। নাচের পোষাক কই?'

হিল্ডা আমাকে প্রথম পরিচয়ের সঙ্গেই মিঃ বেঙ্গল বলে ডাকে। আমিও তাকে তার ডাক নামে সম্বোধন করি—হিল্ডা। মিস্ এলক্রাস বলে ডাকি না।

উত্তর করলুম, 'কেন—তোমাকে বলিনি আমি বিলিতি নাচ জানিনে।'

'ও! ভুলেই গেছ্‌লুম' বলে সে পাশে একখানা চেয়ার টেনে বসল।

নাচের বাজনা শুন্‌তে শুন্‌তে বল্‌লুম, 'হিল্ডা, তুমি নাচে যাবে না?'

'বেশ কথা তোমার। তুমি এখানে বসে খবরদারি করো, আর আমায় নাচ্‌তে পাঠাও ওখানে। তুমি এ নাচ শিখবে কবে, বলো!'

আমি হাসলুম উত্তর দেবার কিছু নেই তাই। হিল্ডাকে দেখেই মন খুশী হয়। তাকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে—ওগো, তুমি যে আমার দেখন-হাসি। কিন্তু হিল্ডা বাংলা জানে না। মুস্কিল আরকি!

হিল্ডার বোলচাল সব স্বতন্ত্র। আধুনিকদের হালফ্যাসান্ তার নখদর্পণে। কিন্তু তার মনের একটা নিজস্ব ছাঁচ আছে যা কিছুতেই দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। মনে মনে সে তার চিন্তাগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে; যখনই যে বিষয়ে বিতর্ক চলে সে বেশ চমৎকার সজ্জায় সে গুলো প্রকাশ করতে পারে। হিল্ডা ধীমতী। কিন্তু বয়স তার উনিশ। নিতান্ত ছেলেমানুষ। যেমন কথাবার্তায় তেম্‌নি তার ব্যবহারের সহজ ভব্যতা আমার কাছে তাকে অন্য সকলের থেকে আলাদা বলে সর্বদা মনে করিয়ে দিত। তার সৌম্য মানসিকতার সঙ্গে তারুণ্যের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য মিশে এম্‌নি চরিত্র রচিত হয়েছে যে তার মাধুর্য্য আমাকে যখন তখন আকর্ষণ করে।

এর সঙ্গে আমার পরিচয় একদিন ঘনিষ্ঠতায় গিয়ে দাঁড়ালো। বিকেল বেলা। ডেকে বেড়াতে বেড়াতে হিল্ডা আমায় বল্লে, 'জানো, আমি সুখী নই—দুঃখী।'

আমি বল্‌লুম, 'বাজে কথা রাখো। তোমার দুঃখের কোন কারণই থাক্‌তে পারে না।'

হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে আমরা ডেকের এক কোণে এসে পৌঁছেছি। হিল্ডা আমার চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলো।

জিজ্ঞেস করলে, 'কখনো প্রেমে পড়েছো?' প্রশ্ন বটে!

একটু বিস্মিত হলুম। বল্‌লুম, 'না।'

'আমাকে কেমন লাগে?'

ছোট্ট প্রশ্নটি। কিন্তু যেন জোয়ারের ঢেউ ওছল্ পাছল্ করে উঠল। বল্‌লুম, 'চমৎকার লাগে।'

উচ্ছ্বসিত হয়ে কথাটা বল্‌লুম। গুটিকয় ঢেউ জাহাজের গায়ে লেগে ভাঙল—ছল-ছলাৎ, ছল ছলাৎ। আমার মনে হলো, কি একটা বিরাট গহ্বরের তটে দাঁড়িয়েছি; একবার ওতে ঝাঁপ দিলে কোন্ অতলে তলিয়ে যাবো। ভয় হতে লাগল। হৃদয়ে একটা নাচুনে গতি অনুভব করলুম। জাহাজও হয়তো দুলছিল।

হিল্ডা দেখলুম নিস্পন্দ হয়ে তখনো চেয়ে আছে আমার চোখে। ধীরে ধীরে আমার কোটের তিনটি বোতামের মাঝের বোতামটি এঁটে দিয়ে বল্লে, 'তোমার কী সুন্দর মানায় এই সুটে! যেন গ্রীক্ দেবতাটি—মাইকেলেঞ্জেলো নিজ হাতে টিপে গড়েছে।'

মনে পড়ে গেল "পুরুষের উক্তির" সেই লাইন্—'তরুণ দেবতা সম দাঁড়ানু সম্মুখে।' হায়, হিল্ডা যদি বাঙলা জানত তাহলে তাকে এই লাইনটির কথা বলতুম। তবু এমন মধুর কথা কোনো মানুষের মুখে যে এতো মধুর শোনাতে পারে তা আমি এর আগে বুঝিনি। হিল্ডার কথা মধুক্ষরা।

বল্লে, 'জানো?—গত জীবনে আমিও বাঙালী ছিলুম, তোমার স্ত্রী!' স্পষ্ট দেখলুম হিল্ডার ওষ্ঠাধর কাঁপছে। আমি নীরবে শুনছি। যেন সাগরের জলে বান ডাকল—আনন্দের বান; আর আমি অথই জলে বে-সামাল হয়ে পড়লুম। তারপর কেন জানিনা, আমার চোখে জল ভরে এলো। বুঝি কাঁদ্‌তে লাগলুম। আমি কাঁদ্‌ছি দেখে হিল্ডাও কাঁদতে সুরু করেছে।

হিল্ডা সুধোলে, 'তুমি আমায় ভালোবাসো?'

আমি সুধোলুম "হিল্ডা! তুমি কি আমায় ভালোবাসো?"

কে কার প্রশ্নের উত্তর দেয়? বেশ মনে আছে, কারো কথার কোনো উত্তর আমরা দিইনি। শুধু হিল্ডার হাতখানা আমার হাতে তুলে নিলুম। দু'জনের হাততোলাই ঘামছে।

'উঃ! বড্ড গরম, হিল্ডা, চলো হেঁটে বেড়ানো যাক্।'

আমার কথার কোনো মৌখিক জবাব না দিয়ে হিল্ডা চল্‌ল হাঁটতে আমার সঙ্গে।

এ সেই হিল্ডা। তার আর অন্ত পরিচয় কি দেবো? জানি নিশ্চয়—সে প্রেমিকা। সে-ই এখন নাচের আসরে আমার কাছে এসে বসেছে।

নাচ আরম্ভ হয়ে গেছে। হঠাৎ জোড় বেঁধে দুজনে অপরূপ সাজে আসরে নেমেছেন। কে? কে?—ও! সেই মাণিকজোড়, মিস্ কার্‌টার্ আর কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোকটি।

আমার দিকে চোখ্ ফিরিয়ে হিল্ডা ব্যঙ্গোক্তি করলে, 'তুমি ও ঐ ভারতীয়টি একই দেশের চালান্ তো; অথচ তা বোঝা শক্ত। দেখো দিকিন্, উনি রীতি মতন হী-ম্যান্। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পাকা ওস্তাদ। আর তুমি কি না কুঁকড়ি সুঁকড়ি হয়ে এখানে বসে রয়েছো। বড্ড shy তুমি।'

তার পর বল্লে, 'এসো আমার সঙ্গে। তোমাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাব। এখানে বসে আর কি ছাই হবে?'

আমিও খুশী হয়ে নাচের আসর ছেড়ে বিশ্রামাগারে গেলুম। হিল্ডা পিয়ানোর পর্দা টিপে বাজাতে আরম্ভ করলে বীঠোভেনের নবম সিম্ফোনি। কিছুক্ষণ বাজানোর পরে আমার বিরক্তি ধরে গেল।

বল্লুম, 'ওসব সিম্ফোনি এখন রাখো। আমি কি কিছু বুঝি? তার চাইতে বাইরে গিয়ে ওপরতলার ডেকে বসে বসে গল্প করা যাক্ চলো।'

বাজানো বন্ধ করে হিল্ডা বল্লে, 'তুমি অরসিক।'

'আচ্ছা তাই সই। তুমিও বড়ো কম নও বন্ধু। তুমি কেন নাচে গেলে না? তোমার কি শরীর খারাপ করেছে?' জিজ্ঞেস করলুম।

'শরীর খারাপ নয়। শোনো, তোমায় একটা কথা বলা আমার দরকার। তুমি ঐ মিঃ টেণ্ডনকে জানো? লোকটা একেবারে পশু।'

'কেন কি করেছে?'

'কাল রাতে কাপড় ছেড়ে সবে মাত্র শুয়েছি। আমার কেবিনে যে আরেক জন বৃদ্ধা আছেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আস্তে আস্তে দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্ছে শুনে দরজা খুলে দেখি দাঁড়িয়ে এই টেণ্ডন্। শোবার পোষাকে তার সঙ্গে দেখা হলো এই জন্যে তার কাছে ক্ষমা চাইলুম। সে আমার ঐ কথায় বড়ো একটা কান দিলে না। অনুনয়ের একটানা সুরে একটা ভয়ানক কু-প্রস্তাব করলে। শুনেই আমি তাকে একটা চড় বসালুম। 'ক্ষমা করবেন' 'ক্ষমা করবেন' বলতে বলতে যেমন চোরের মতন এসেছিল

অমনি নিঃশব্দে পা টিপে টিপে দ্রুতগতিতে নিজের কেবিনের দিকে চলে গেল।'

আমি দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ করলুম—সয়তান! আমার গা জ্বালা করতে লাগ্‌ল।

আরো কি একটা কথা মুখে উঁকি দিচ্ছিল এম্‌নি সময় ঝড়ের বেগে কক্ষে ঢুক্‌লেন সেই মাণিকজোড়।

টেগুন্ সঙ্গিনীকে বল্‌ছে, 'তুমি আমার ভোগা দিচ্ছো, ডীয়ার্।'

মহিলাটি সুর করে এক লাইন গান করছেন, 'If I give in to you.'

হিল্ডাকে দেখা মাত্র টেগুন্ কেমন আচম্‌কা মনমরা গোছের হয়ে অস্বস্তি অনুভব করছে দেখ্‌লুম। কিন্তু চট্‌পট্ আত্মস্থ হয়ে সে বল্লে, 'মিস্ এলক্রাস, আপনার সঙ্গে নাচ্‌বার আনন্দ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন আজ।' মনের ভাব চেপে রাখ্‌বার আচ্ছা আর্টই দেখালে লোকটা।

মিস্ কার্‌টার্ মাঝখান থেকে জবাব দিলেন, 'আজ জাহাজে তেরো রাত। এবং তেরো সংখ্যাটি অলুক্ষণে। অশুভ রাত আজ কিন্তু। সেদিকে খেয়াল আছে?'

হিল্ডা কৌতুক করে বল্লে, 'কুসংস্কার!'

টেগুন্ সঙ্গিনীকে বল্লে, 'শুন্‌লে ওঁর মত? আজ হলো আনন্দের রাত। ফূর্তি করো, 'আত্মপ্রকাশ' করো। তুমি কিনা নিজেকে সঙ্কুচিত করতেই ব্যস্ত। Don't be stupid, dear.'

'আত্মপ্রকাশ' কথাটি শুনেই আমার মনের টনক নড়্‌ল। ও! শ্রীমান্ তাহলে "এক্স্‌প্রেসনিজম্"-এর তত্ত্ব ব্যাখ্যান করছেন। ফস্ করে বলে ফেল্লুম, 'আমি এক্স্‌প্রেসনিজম্ মানি না।

আমার মন্তব্যটি মুখ থেকে বেরোতে না বেরোতেই মাণিকজোড় যথারীতি তারস্বরে হাস্য-রোল করে আমাকে দমিয়ে দিলেন। টের পেলুম, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল; এঁরা হেসে আমার দোষ স্খালন করলেন।

হিল্ডা আমার পক্ষ নিয়েই বল্লে, 'এবিষয়ে মিঃ টেগুনের মতটাই আগে শোনা যাক্ না কেন?'

টেগুন্ বল্লে, 'তা বেশ তো। কিছুক্ষণ না হয় আপনাদের সঙ্গেই একটু আলোচনা হবে, মন্দ কি। আসুন, তাহলে বসা যাক্।' এই বলেই মিস্ কার্‌টার্‌কে হাতে ধরে নিয়ে বসালে।

হিল্ডা ও আমি পিছু পিছু গিয়ে আসন নিলুম। ডেকের ঐক্যতান বাতাসে ঘরের মধ্যে ভেসে আস্‌ছে। হিল্ডা আমাকে লক্ষ্য করে বল্লে, 'ঐ সুম্যান্ হচ্ছে।'

'একটু ক্ষমা করবেন' বলে টেগুন্ উঠে গিয়েই জনৈক পরিচারককে ডেকে আন্‌লে। তারপর প্রশ্ন করলে, 'কার কি চাই? আজ ফূর্তির রাতে ভালো পানীয় দেদার আছে। বলুন, কি চাই?—স্যাম্পেন্, বিয়ার্, ষ্টাউট্, হোয়াইট ওয়াইন্? মিস্ কার্‌টার্?—'

'আমি—হোয়াইট ওয়াইন্।'

'মিস্ এলক্রাস্?'

'ধন্যবাদ, আমি শুধু বিয়ার নেবো।'

'মিঃ—'

আমি এতোক্ষণেও কিছু ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌ছিলাম না। 'না' বল্লে পাছে মাণিকজোড় অসভ্য ভেবে আবার হাস্য করেন তাই হিল্ডার সঙ্গে পক্ষপাতটা বজায় রেখে বললুম, 'আমিও তাই—বিয়ার।' আসল কথা হচ্ছে, মদ আমি কখনো এর আগে খাইনি।

পরিচারক পানীয় পরিবেশন করে গেল। মহারাজার ডিনার। যার যতো ইচ্ছে খাও—পয়সা লাগ্‌বে না।

মদ খেতে আরম্ভ করেই টেগুন্ অভ্যাগতা ও (আমি) অভ্যাগতকে নন্দিত করার চেষ্টায় বল্লে, 'এক্স্‌প্রেসনিজম্ আর-কি?—দেহে মনে প্রথমত নেশা মেতে ওঠা চাই। তবেই তো প্রাণের প্রকাশ হবে। তারপর সাহিত্যে তদনুসারী ছায়াপাত করলেই হবে বাস্তব সাহিত্য।'

লোকটার নির্লজ্জ বাক্যালাপে আমি কুন্ঠিত হচ্ছিলুম। লজ্জায় আমার কর্ণমূল মধ্যে মধ্যে লাল হয়ে উঠ্‌ছিল। আশ্চর্য্য যে এই স্মার্ট পুঙ্গবের কীর্ত্তিকলাপ তেরোদিন সমানে দেখেও আমি সম্‌ঝিতে পার্‌ছিলুম না যে, লজ্জা ঘৃণা ভয় আত্মপ্রকাশের শাস্ত্রে টেবু।

টেগুন্ বলে যাচ্ছে, 'দেখুন, সাবলীল জীবন-যাপনের সব চেয়ে উগ্র বাধা হচ্ছে—মনোবিজ্ঞান যাকে বলে কম্‌প্লেক্স্। কম্‌প্লেক্স্ আত্মসঙ্কোচের চিহ্ন। যিনি সর্ব্বাঙ্গীন আত্মপ্রকাশ

করতে পেরেছেন তাঁর কোনো কম্‌প্লেক্স্ থাকবে না। অবশ্য এহেন লোক জীবনে আমরা সচরাচর দেখতে পাইনে। কিন্তু যাই হোক, সেই হচ্ছে আদর্শ। অকুণ্ঠিত হয়ে স্বেচ্ছায় নিজের আদর্শানুযায়ী কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে কম্‌প্লেক্স-গুলোর মহতী বিনষ্টির একমাত্র ঔষধ।'......

আরো কি বল্‌তে যাবে এমন সময় মিস্ কার্‌টার্ আমার প্রতি মেহেরবানি করে তাকিয়ে আদেশ করলেন, 'আপনি বলুন না যে, আত্মপ্রকাশেরও একটা সীমা আছে। এমন যদি হয় যে, এই আত্মপ্রকাশবাদী ভদ্রলোকটি জীবনে সাবলীলগতি হতে গিয়ে অপরের প্রতি (এখানে টেগুনের দিকে তীক্ষ্ণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হান্‌লেন) অন্যায় করেন, নিজের স্বার্থটাই দেখেন, অপরের স্বার্থটা দেখেন না, তাহলে সেটা সমাজের পক্ষে ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষে, চাই-কি মানবসমাজের পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। নয় কি? চোরের কাছে যেটা আত্মপ্রকাশ, গৃহস্থের কাছে সেটা মহাক্ষতি এবং সমাজের আইনে দণ্ডনীয়।'

আমার উত্তর দেবার আগেই টেগুন্ সুরু করলে, 'আঃ আমি কি সেকথা বল্‌ছি? আমি বল্‌ছি, কম্‌প্লেক্স-এর উচ্ছেদ সাধন করা মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায়—একটি বিশেষ উপায়। মিস্ এলব্রাস্ নিশ্চয়ই জানেন, (হিল্ডার দিকে মুখ করে) জার্মেণী হতে যে কম্‌প্লেক্স্ তত্ত্বটি বেরিয়েছে তার থেকে য়ুরোপের কোনো-কোনো দেশে nudist colony করার প্রস্তাব কার্য্যে কিঞ্চিদধিক অনুশীলিত হচ্ছে। আমেরিকায় কেউ কেউ কম্‌প্লেক্স এড়ানোর জন্যে একটি বিশেষ ব্রতও উদ্‌যাপন করতে লেগে গেছেন। সেটি হচ্ছে—ইচ্ছা মাত্র ইচ্ছার পরিপূরণ করা। ইচ্ছার নিরোধ পাপ। ইচ্ছার পূরণই জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাঁরা এও বল্‌ছেন যে, এই স্বভাব-ধর্ম্ম উদ্‌যাপনের প্রকৃষ্ট অবকাশ যৌবন। কুণ্ঠাকে বিসর্জ্জন দিয়ে অকুণ্ঠকর্ম্মী হওয়াই আত্মপ্রকাশের রীতি।'

হিল্ডা বল্লে, 'আইন করে এসব হুজুক বন্ধ করে দেবারও ব্যবস্থা হচ্চে—এও ঠিক।'

'কিন্তু সত্যের জয় একদিন হবেই' বলেই টেগুন্ মিস্ কার্‌টারের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলো।

মিস্ কার্‌টার্ নরম-গরম সুরে চেঁচিয়ে বল্লেন, 'না-না-না'। বলেই হাস্‌তে লাগ্‌লেন। এবং বারবার বল্‌তে লাগলেন, 'না-না-না-না...That can't be.'

পরিচারক আগের আদেশ মতো আরো কিছু পানীয় নিয়ে এলো। এবার আর কেউই খেতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু অকুণ্ঠকর্ম্মী টেগুন্ অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্লাসের পর গ্লাস খালি করছে। তার পানের তোড়জোড় দেখে আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে আমি ক্রমেই নিঃসন্দেহ হতে লাগ্‌লুম। সাহিত্যালোচনা চাপা পড়্‌ল। সাহিত্য ধর্ম্মের চেয়ে প্রাণ ধর্ম্মের চর্চ্চাতেই টেগুনের প্রীতি বেশী। তাই অলস বসে না থেকে, গলার স্বরকে খানিকটা খাদে নামিয়ে অকুণ্ঠকর্ম্মী মিস কার্‌টারকে নাচের অনুরোধ জানালে। বাইরে নাচের বাজনা বাজ্‌ছে। সুতরাং অবাধে নাচ চল্‌তে পারে। বিশ্রামাগারেই তাদের নাচ চল্‌ল।

হিল্ডা ও আমি আগেকার বিষয় নিয়ে মতামত দিতে লাগ্‌লুম।

হিল্ডা: 'জীবনে আত্মপ্রকাশেরও একটা দিক আছে বৈকি। প্রতিভা হচ্ছে এই আত্মপ্রকাশের ভিত্তি। কিন্তু প্রতিভাই মনুষ্যত্ব বিকাশের শেষ নয়। প্রতিভা একরকম স্বার্থপরতা। নিজের দেহমনের সুপ্ত শক্তি সামর্থ্যকে যখন চর্চ্চা দ্বারা কোনো বিশিষ্ট প্রণালীতে কাজে নিয়োগ করতে পারি তখনই অর্জ্জন করি প্রতিভা। প্রতিভাবান্ নিজেকে নিয়েই মস্‌গুল। অপরের স্বার্থ সুবিধার প্রতি নজর দেবার মতন তাঁর মনের অবস্থা নয়—সময়ও নেই। বরং অপরের স্বার্থ-সুবিধাকে অল্পাধিক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করতেও তিনি পেছ্-পা নন্।'

শ্রীমতী হিল্ডার মুখে খৈ ফুট্‌ছে। আমি শুন্‌ছি আর হিল্ডা বলে যাচ্ছে, 'মনুষ্যত্ব বিকাশের স্বপক্ষে প্রতিভাই সর্ব্বোচ্চ সহায় নয়। মানবকে যে-শক্তি মহামানবে পরিণত করে তা পরার্থপরতা—পরের জন্য নিজের শক্তিকে নিয়োগ করা। সঞ্চয়ের ফল প্রতিভা, দানের ফল মহামানবত্ব। অবশ্য প্রতিভার পক্ষে অব্যর্থ প্রয়োজনীয় স্বার্থপরতা-টুকুর মর্য্যাদা দিতেই হবে।'

হিল্ডার মুখের কথা কী সুন্দর! তাই আমি মনে মনে তার একটি নামকরণ করেছি—প্রজ্ঞাশ্রী।

এদিকে অকুণ্ঠকর্ম্মী নাচ্‌তে নাচ্‌তে মিস্‌ কার্‌টারকে বাহুবদ্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করলেন। মিস্‌ কার্‌টারও অকুণ্ঠকর্ম্মীর কাণ্ড-কারখানায় যথেষ্ট অভ্যস্ত। অতএব তিনিও নিরাপত্তিতে বাহুবদ্ধা হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে নাচের তালে পা বাড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি বল্‌লুম, 'হিল্ডা, তুমি কিন্তু মিস্‌ কার্‌টারের মতন মেয়ে নও। দেখো না, উনি কেমন স্বচ্ছন্দ-স্বভাব। শুধু ঐ ছোক্‌রা নয়, আরো কতোজনকে তিনি অনুগ্রহের খুদ কুঁড়ো দিয়ে খুশী করে যাচ্ছেন—যেন আনন্দের মন্দাকিনী। ঐ ছোক্‌রাটির গুণ, সে বেশী কায়দা জানে; তাই ওঁর কাছে থেকে বেশী বেশী আদায় করে নেয়। তোমার কাছে কিন্তু কায়দা-কায়দা টেঁকে না। আমার কাছে ছাড়া তুমি আর পাঁচ জনকে বড় একটা জিজ্ঞাসাবাদও করো না।'

হিল্ডা: ঐ আত্ম-প্রকাশের ভেঁপোমি তোমার নেই কিনা, তাই। তদুপরি তুমি আমার নারীর মর্য্যাদা বাড়িয়ে তুলেছো। তোমাকে আমি যতোখানি প্রশ্রয় দিয়েছি, অতোখানি দিলে ঐ আত্ম-প্রকাশবাদী টেণ্ডন্‌ আমার সর্ব্বনাশ না করে ছাড়্‌ত না।'

'হিল্ডা, আমি কি বল্‌ছি—জানো? আমি মিস্‌ কার্‌টারের কথা বল্‌ছি। তাঁর সঙ্গে তোমার অনেক প্রভেদ।'

'প্রভেদ? এদ্দিনেও বোঝোনি? আমি কি আত্ম-প্রকাশী পুরুষের হাতের শীকার নাকি?'

হিল্ডার প্রাণখোলা মন্তব্য যতোই শুন্‌ছি ততোই সে আমার আপনার হতে আপনার হয়ে আস্‌ছে।

'হিল্ডা! তুমি মাত্র রূপসী নও। তোমার অন্তরে প্রজ্ঞার আলোক। তুমি প্রজ্ঞাশ্রী।'

'বেশ তাই ভালো। আচ্ছা গত জীবনে তুমি আমায় কি বলে ডাক্‌তে তাই আমার জানতে ইচ্ছে করে। ওগো, আমি যদি জাতিস্মর হতুম!'

হিল্ডার ক্ষ্যাপামিতে আমি হাসি। কিন্তু হাসি ঠোঁটের নীচেয় চেপে রাখি। একবারটি যদি হিল্ডা বোঝে যে তার সরল বিশ্বাসকে আমি তুচ্ছ করছি, তাহলে তার চোখের জলের অবধি থাক্‌বে না। আমি চুপ করে থাকি। হিল্ডা তার বিশ্বাস ব্যক্ত করে।

আমাদের কথা উঠলে কথার আর বিরাম থাকে না। কথার রাশ যদিবা টেনে ধর্‌তে পারি তবু আমাদের মনের ভাবের জমাট বাঁধ্‌তে এতোটুকুও বাধে না। একজনের অস্তিত্বের অনুভূতিতে আরেকজনের অস্তিত্ব জম্‌ জম্‌ কর্‌তে থাকে।

আমাদের কথা চল্‌ল। আমি বল্‌লুম, 'হিল্ডা, স্বার্থপরতার মর্য্যাদা প্রতিভারই প্রাপ্য। ইতর সাধারণ রামুশ্যামুর প্রাপ্য নয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, রামুশ্যামু নিজেকে পুরাদমে নেপোলীয়ন বা নীটশে ভেবে বসে; সুপারম্যানের প্রহসন করে মরে।'

'ঠিক,' হিল্ডা বল্লে, 'আরেকটি মুস্কিল আছে। আত্ম-প্রকাশের নামে প্রতিভার যে অভিব্যক্তি আজকাল সাহিত্যে প্রচলিত মতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—তুমিই সেদিন তোমাদের সাহিত্যের কথা বল্‌ছিলে—তাতে অনেকের মনেই ধারণা জন্মাচ্ছে যে নেপোলীয়ন্‌-নীটশের চেয়ে বড়ো মহামানব আর কেউ নেই। প্রতিভাই যেন পরম কাম্য। কিন্তু তোমাদের দেশের সভ্যতার দিকে তাকিয়ে আমার একটা কথা প্রায়ই মনে হয়, প্রতিভার চেয়ে বড়ো পুণ্য এবং অন্তের প্রতিভা-স্ফুরণে কর্ম্মস্বত্তার একশেষ করায় পুণ্য। প্রতিভায় গৌরব আছে, কীর্ত্তি আছে, শক্তি আছে, কিন্তু পুণ্য নেই।'

প্রজ্ঞাশ্রীর মুখ থেকে কথা লুফে নিয়ে আমি বল্‌লুম, 'য়ুরোপের গৌরব সুপারম্যান্‌, ভারতবর্ষের গৌরব সি-আর্‌-দাশ। প্রতিভার বলে ভোগের চূড়ান্ত করেই ইনি ক্ষান্ত থাকেননি; আপনার সমস্ত সঞ্চয়কে সকলের মধ্যে নির্ব্বিচারে কল্যাণ কামনায় বিলিয়ে হয়েছেন পুণ্যাত্মা।'

কথাটা আমার মুখ থেকে টেনে নিয়ে হিল্ডা বল্লে, 'প্রতিভা পুণ্যের সোপান। স্বাঙ্গীকরণের নাম প্রতিভা। আর সঞ্চিত ক্ষমতা পরাঙ্গীকরণে পুণ্য। প্রতিভায় প্রাণের প্রকাশ অর্দ্ধেক—পূর্ণ প্রকাশ পুণ্যে।'

আমার মনের কথা হিল্ডার মুখে। এরকমটি প্রায়ই হয়। সত্য বল্‌ছি, প্রায়ই হয়। আমার প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। হিল্ডাতে আমাতে গলায় গলায় মিল।

একটা চিন্তা থেকে থেকে আমার মনে কুট্‌ কুট্‌ করছিল। শুধোলুম, 'হিল্ডা তুমি বলেছিলে তুমি দুঃখী। আমায় বুঝিয়ে বল্‌তে হবে এর অর্থ।'

'সোঁ সোঁ' শব্দে এক ঝট্‌কা বাতাস কক্ষের এক দরজায় ঢুকে আরেক দরজায় বের হয়ে গেল।

হিল্ডা বল্‌লে, 'এখনো সময় হয়নি। আরেকদিন।'

তারপর বল্লে, 'আমি মিউনিক্‌ থেকে জান্‌তে চাই তুমি কবে দেশে ফিরে যাবে. তোমার সঙ্গে জন্মের শোধ দেখা তখন লণ্ডনে এসে সেরে যাবো। তারপর পরজন্মে—

জন্মান্তর সম্পর্কিত তার খামখেয়ালী কথা আমি যখন তখন নির্ব্বাক্‌ হয়ে শুনি; কিন্তু এমন একবারও হয়নি যখন শুনে অবাক্‌ হয়ে যাইনি, এই ভেবে যে, এই পরদেশিনী-মেয়ে বলে কি?

আস্তে আস্তে রাত বাড়্‌ছে। নাচ থেমেছে। সবাই যার যার কেবিনে যাবার জন্যে প্রস্তুত। এম্‌নি আর কতোক্ষণ বসে থাকব। হিল্ডাকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরোতেই বাইরের আকাশের দিকে চোখ্‌ পড়্‌ল। সুনীলাকাশে চাঁদ তার সুধার ভাণ্ডার উজাড় করে জ্যোৎস্না ঢাল্‌ছে দিক্‌বিদিকে আমাদের জাহাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, হিল্ডার শুচিস্মিত মুখের 'পরে।

আমি ডাক্‌লুম, 'প্রজ্ঞাশ্রি হিল্ডা!'

হিল্ডা বাক্যব্যয় না করে আমাকে টেনে ওপরের ডেকের দিকে নিয়ে চল্‌ল। যে দিকে চাঁদ ভালো দেখা যায় সেখান-টায় রেলিং ধরে হিল্ডাকে কাছে টেনে দাঁড়ালুম। বল্‌লুম, 'হিল্ডা, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

'কি?'

'দেখ্‌তে পাচ্ছো ঐ ষ্টীমারের পাশের ঢেউগুলিতে আকা-শের চাঁদ মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যাচ্ছে।'

'তা তো দেখ্‌ছি।'

'আমার কি মনে হচ্ছে বোল্‌ব? একটা বঁড়্‌শি ফেলে ঐ চাঁদটাকে জল থেকে একেবারে এই ডেকে এনে তুলি।'

'তারপর?'

'জলের চাঁদ জলো হবেই কাজে কাজেই। যেমন ডিম ভাঙ্গলে তার কুসুম বেরোয় তেমনি এই চাঁদটাকে যেন ভাঙলুম। কি বেরোবে জান?—তরলায়িত সুধা। তা-ই দিয়ে তোমার অঙ্গ পরিলিপ্ত করে দি'।'

ডাক্‌লুম, 'প্রজ্ঞাশ্রি!'

'কি?'

'একটি চুমু।'

'তুমি আমায় একটিও চুমু দিলেনা। আমি কি সম্বল নিয়ে এ জীবন কাটাবো বলো দিকিন্‌?'

* * * * *

ডেকের ওপাশ থেকে একটা আর্ত্তনাদ কানে এলো। হিল্ডার হাত মুঠোয় চেপে সেই দিকে গেলুম। কার [illegible] অসহায় কান্না শুন্‌তে পাচ্ছি। আরো কাছে গেলুম। একী! এ যে সেই অকুণ্ঠকর্ম্মী আর মিস্‌ কার্‌টার্‌। মিস্‌ কার্‌টার্‌ কাকুতি মিনতি জানিয়ে লোকটার রিরংসাচার থেকে [illegible] হতে চেষ্টা করছেন। অসম্ভব দৃশ্য! এক মুহূর্ত্তে আমি [illegible] কর্ত্তব্য স্থির করলুম। অকুণ্ঠকর্ম্মীকে সজোরে [illegible] করলুম। চাবুক খাওয়া কুকুরের মতন লেজ গুটিয়ে অস্পষ্ট[illegible] কি কতোগুলো বিড়্‌ বিড়্‌ করতে করতে টেগুন [illegible]

মিস্‌ কার্‌টার্‌ কাঁপতে কাঁপতে আমার হাত ধরে [illegible] জানালেন। বল্লেন, 'লোকটা জাহাজে ওঠা অবধি [illegible] জ্বালাতন করছিল। আমি শান্ত রাখবার জন্যে [illegible] ওর ছোটোখাটো আব্দার রাখতে দিয়ে খুশী করতুম। [illegible] সে আমার সৌজন্যের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত [illegible] টিপে ধরেছিল। আপনারা এসে পড়াতেই বেঁচে [illegible]

অকুণ্ঠকর্ম্মীর আত্মপ্রকাশের দৌড় আরো [illegible] খানি গড়াতে পারে তা-ই বুঝিয়ে দিয়ে মিস্‌ কার্‌টার্‌কে [illegible] কেবিন অবধি পৌছে দিয়ে এলুম। সাবধান [illegible] আর আমল দেবেন না।

ভাবলুম, এই ত্রয়োদশ রজনীটি সুলক্ষণা [illegible]

সেই রাত্রের জন্যে বিদায়ের কালে হি[illegible] তোমার প্রেমে আজ আমার দীক্ষা হলো [illegible] আমার এই আরব্ধ সাধনার সিদ্ধি।'

আবার সেই জন্মান্তরের কথা। [illegible] আরেকবার চুমু নিয়ে বিদায় নেবো[illegible] 'না, দীক্ষা একবারই [illegible] জন্ম অপেক্ষা [illegible] তুমি আমায় [illegible]?' [illegible]

তারপর দেড় বছর কাট্‌ল। লণ্ডনে একদিন টমাস্ কুকের বেঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গেছি। দেখি মিস্ কার্‌টার সেই গদি আটা বেঞ্চিতে বসে।

মিস্ কার্‌টার্ বলে' অভিবাদন কর্‌তেই বল্লেন তাঁর কার্‌টার্ নাম বদ্‌লেছে। এখন তিনি মিসেস্ টেগুন্।

'আপনাদের বিয়ে হয়েছে শেষে ?' আমি একটু উত্তেজিত ভাবেই প্রশ্ন কর্‌লুম।

'আস্তে কথা বলুন। আপনাকে সব বল্‌ছি, বসুন।'

তিনি যা বল্লেন তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে যে, টেগুন্ তাঁকে টাকার লোভ দেখিয়ে ফুস্‌লাতে আরম্ভ করে। লণ্ডনেই তার একখানা ফ্ল্যাট আছে; তার বাপের একমাত্র ছেলে বলে বাপের সব সম্পত্তিই নাকি সে পেয়েছে। তার বাপ পাটের ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছেন। সব টাকাই এখন টমাস্ কুকে ছেলের খরচ পত্রের জন্তে রাখা হয়েছে। সে যাই হোক্, বিয়ের পর সত্যি সত্যি একটা ফ্ল্যাটে টেগুন্ দম্পতী গিয়ে উঠ্‌ল। তাদের একটি ছেলে হতেই স্বামী বল্লে পুত্র প্রতিপালন করা তার কর্ম্ম নয়। মার কাছ থেকে ছিনিয়ে ছেলেকে 'অরফ্যান্' নামে চালিয়ে একটা হাঁসপাতালে রেখে দিলে। স্ত্রীকে শাসিয়ে দিলে যে, ছেলের সমস্ত সংস্রব তাকে ছাড়্‌তে হবে। মা মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে ছেলেকে দেখে আস্‌ত। অতঃপর একদিন ঝগড়ার পর খুব রাগ দেখিয়ে ফ্ল্যাটে তাকে একলা ফেলে টেগুন্ পালিয়েছে। আর তার দেখা নেই। স্ত্রী পরে জান্‌লে যে, টমাস্‌কুকে লোকটার এক কাণাকড়িও ছিল না। বস্তুত স্ত্রীর অর্থেই এদ্দিন্ চলেছে। ফ্ল্যাটের বাকী ভাড়া সব চুকিয়ে দিয়ে অবশেষে মিসেস্ টেগুন্‌কে ইণ্ডিয়া অফিসে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে হলো। ছেলেকে অনেক কষ্টে হাঁসপাতাল থেকে এনে এখন সঙ্গেই রেখেছে। তার বেঙ্কে লটারীতে পাওয়া ২০০ পাউণ্ড জমা ছিল। তাইতেই চলে যাচ্ছে ?

অকুণ্ঠকর্ম্মীর কাণ্ড শুনে আমার কিছু বল্‌বার রইল না।

এদিকে আমার দেশে ফিরে আসার দিন ঘনিয়ে আস্‌ছে। মিউনিক্ একবার যাওয়া চাই-ই। গেলুম সেখানে হিল্ডাদের বাড়ীতে। হিল্ডার মা চিঠি-পত্রের সূত্রে আমায় জান্‌তেন। এবার আমায় সশরীরে দেখে খুব আহ্লাদ করে বাড়ীতে রাখ্‌লেন, কিন্তু হিল্ডা বাড়ীতে নেই, সুইজারল্যাণ্ডে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন কর্‌তে গেছে। তার মা বল্লেন, ভারতবর্ষ থেকে মেয়ে ম্যালেরিয়া নিয়ে ফিরেছে। গত বছর থেকে প্রায়ই জ্বর হত। ডাক্তারের পরামর্শ মতো এখন স্বাস্থ্য-নিবাসে আছে।

সুতরাং গেলুম সুইজারল্যাণ্ড। আমাকে পেয়ে খুব খুশী হিল্ডা। দেখ্‌লুম ভয়ানক শুকিয়ে গেছে। চোখ্ ছুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল।

যে দু'দিন তার সঙ্গ পেলুম তার মুখে বার বার একটি অনুরোধ—আমি তার জন্মান্তরের দয়িত হয়ে যেন তাকে গ্রহণ করি। আর সে সেই মহা-মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় রইলো।

আমি তাকে বল্‌লুম, 'হিল্ডা, তুমি কি শবরী ?'

শবরীর গল্প আগাগোড়া আমার কাছে শুন্‌লে—বাল্যে যৌবনে বার্দ্ধক্যে শবরীর প্রতীক্ষার কথা। তারপর হাততালি দিতে দিতে ছোট খুকীর মতন বল্লে, 'আমি শবরী, আমি শবরী।'

সেদিন সকালে খুব বরফ পড়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার বিদায়ের দিন ভারাক্রান্ত।

'হিল্ডা, তুমি বলেছিলে তুমি দুঃখী। সে কথা আমায় এখনো কিছু বলোনি।'

'উঃ, আমার কী ভোলা মন। এই কথাটাই তোমাকে বলিনি। আগে বলো, তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌বে।'

'ক্ষমা তোমায় আমি কি কোর্‌ব, হিল্ডা ? আমাদের দু'জনকার ভালোবাসার সমস্ত ক্রটি ক্ষমা করুন ভগবান্।'

'শোনো তাহলে। একবার আমি একটি পুরুষকে আমার সর্ব্বস্ব দান করেছিলুম। ভেবেছিলুম সে-ই বুঝি তুমি—আমার চিরকালের অভীষ্ট প্রেমের দেবতা। (হিল্ডা কাঁদ্‌ছে) সে ভুলের অবসান হলো যেদিন সে আমার দেহ কলঙ্কিত করে আমার আত্মাকে খেলো বানিয়ে বল্লে, 'জীবনের পথে চল্‌তে চল্‌তে হাতের কাছে ফুল হয়ে ফুটেছিলে তুমি, তুলে শুঁকে আমি আবার ফেলে যাচ্ছি। কি দুঃখ তোমার ?' কী স্বার্থপর!'

'হিল্ডা, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন ?'

'কাঁদ্‌ছি কেন ? তাও বোঝো না ? যেদিন শুভক্ষণ

এলো দেবতার পায়ে অর্ঘ্য হয়ে উৎসর্গীকৃত হবার, সেদিন আমার বিয়ের ফুলে পোকা ঢুকেছে। অপবিত্র ফুল আমি তোমায় নিবেদন ক'রে কি করে? পর জন্মে, প্রিয়তম—

পরজন্মের কথায় বল্‌লুম, 'পরজন্ম যদি না থাকে?'

খোঁচা খেয়ে সাপ যেমন ফণা তুলে ফোঁস্ করে ওঠে, তেম্‌নি ভাবে হিল্ডা বল্‌লে, 'হিন্দু হয়ে তুমি পুনর্জন্ম মানো না?'

কোনো বিতর্ক সভ হলে এ প্রশ্নের ওপর হয়তো ঝাড়া আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিতুম। কিন্তু হিল্ডার মুখের এই কথায় আমি একেবারে মুহ্যমান্ হয়ে রইলাম। কণ্ঠরোধ হয়ে এলো।

'গত জীবনে তোমাকে আমি বড়ো কষ্ট দিয়েছি!'

'কি করে জান্‌লে, হিল্ডা?'

'দেখো, তোমরা পুরুষ মানুষ বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বুঝ্‌তে চাও। এ বুদ্ধি দিয়ে বোঝার নয়। আমি যা অনুভব করি তা-ই তোমায় বলি। এজন্মে সেই কষ্টের প্রায়শ্চিত্ত না করলে তোমায় ফিরে পাবার আমার অধিকার নেই। আমার আত্মপ্রকাশে বাধা পড়েছে।'

'হিল্ডা, তুমি অস্থির মনে যা তা বকছো।'

'প্রিয়তম, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কোর্‌বে তো?'

'নিশ্চয় কোর্‌ব। বলো কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। মিউনিক্ থেকে তোমার চিঠি যেন আমি সর্ব্বদা পাই। মনে থাকে যেন।'

'না—না, এজন্মে নয় প্রিয়তম। পরজন্মে আমার অপেক্ষা করো। আমি তোমায় পাবই। তুমি আমায় নেবে তো তখন? দেখে চিন্‌বে তো?'

এই বলেই কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। হৃদয় আমার ভেঙে শতখান্ হলো।

'প্রিয়তম, একটি অনুরোধ।'

'কি হিল্ডা?'

'তুমি কিন্তু বিয়ে করো।'

'আর তুমি?'

'আমার জন্যে ভেবো না। তোমায় আমি এই জন্মে খুঁজে পেয়েছি। এর চেয়ে বেশী আমি কিছু চাইনে। তবে তোমায় আমি চিনে নেবো—সে আগামী জন্মে। মনে রেখো—প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম।'

আমার চোখ থেকে জল টস্‌টস্ করে পড়্‌ছে। ঝাপ্‌সা চোখে ভালো লক্ষ্য কর্‌তে পারিনি, বিদায়ের সময় প্রজ্ঞাশ্রী হিল্ডার মুখখানা দেখ্‌তে কিরকমটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

* * *

আজ দু' বছর হলো দেশে ফিরে এসেছি। সেদিন মিউনিক্ থেকে একখানা চিঠি এসে উপস্থিত। হিল্ডা আর বেঁচে নেই। দশ দিনের জ্বরে মারা গেছে। তার শেষ প্রেম-নিবেদন করে বিদায় নিয়েছে আমার কাছে; আমি যেন তাকে আগামী জন্মে চিনে নেই।

হিল্ডাকে মনে- মনে আমি কদাপি উপেক্ষা কর্‌তে পারিনি। তাই ব্যাকুল হলাম। তার পুনর্জন্মে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটা আমার কাছে খামখেয়ালী বলেই মনে হত। কিন্তু তার শেষ অনুরোধকে আমি অবহেলা কর্‌তে পার্‌লাম না। তার কি কোনো মানসিক রোগ ছিল? বিখ্যাত মনোবিশ্লেষক শশাঙ্কশেখর বসুকে তার বৃত্তান্ত আগাগোড়া বিবৃত করে চিঠি লিখ্‌লাম। তাঁর উত্তর পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, হিল্ডা আমায় অত্যন্ত ভালোবাসত। অথচ প্রচলিত সংস্কার বশে তার ধারণা হয়েছিল যে এ জীবনে তার সঙ্গে আমার মিলন পরিপূর্ণ সুখময় কিছুতেই হবে না। তাই রমণীসুলভ তীব্র কল্পনার আবেগে বর্ত্তমান অপূর্ণতাকে মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে সম্পূর্ণতা দান করে সে ভাব্‌লে যে, গত জীবনে সে আমার ছিল—পর জীবনেও সে আমার হবে।

এই শুধু? এর বেশী নয়? হিল্ডা সত্যিই আমার চিরকালের নয়?

হিল্ডার প্রেমের ঋণ পরিশোধ করার সঙ্গয় আমার কোথায়, এই কথাই খালি ভাব্‌ছি।

সুশীলকুমার দেব

শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ঘোষের কৃতিত্ব

শ্রীশান্তি পাল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সহরের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন মোটেই আমাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে নাই। কয়েকদিবস হইতেই গৃহে প্রত্যাগমনের প্রবল বাসনা আমাদের সকলকেই অত্যন্ত উদব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল; এমন সময়ে হঠাৎ কামায়ুধের বাঙ্গালী মহিলা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইলাম। কামায়ুধ রেঙ্গুন সহর হইতে ৫.৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটি বাঙ্গালী পল্লী বলিলে অত্যুক্তি হয়না। এই স্থানের অধিকাংশ অধিবাসীই কর্ম্মজীবী মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী।

রবিবার ২৪শে নভেম্বর সভার অধিবেশনের দিন ধার্য্য হইল। আমরাও ঐ দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় মহিলাবৃন্দ প্রফুল্লকুমার ও বধুমাতাকে হিন্দু সনাতনপ্রথা অনুযায়ী সভামধ্যে বরণাদির দ্বারা যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন। চতুর্দ্দিক শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণের জন্য মনে হইল যেন আমরা বাঙলা মায়েরই স্নেহকোমল ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছি। তাঁহাদের এই আন্তরিকতা বহুকাল আমাদের স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া থাকিবে। ইহার পর যোগনের মহিলা সমিতির সভ্যরাও প্রফুল্লকুমারের সাফল্যের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।

তাঁহাদের প্রদত্ত মান-পত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা উপভোগ করিবেন।—

"জগৎ বরেণ্য শ্রেষ্ঠ সন্তরণবীর, বাঙ্গলা মায়ের সুসন্তান, প্রিয় ভ্রাতা শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষ মহাশয়ের করকমলে—

প্রফুল্লকুমার, তোমাকে আমরা যথাবিহিত অভিবাদন করিতেছি, তুমি আজ দিগ্বিজয়ী বীর। তোমার বীরত্বে কেবল ব্রহ্ম বা বাঙ্গলা দেশ নহে, সমগ্র প্রাচ্যভূমি গৌরবান্বিত। অনেক কথা মনে হয়েছে জল মধ্যে তোমার বীরত্ব দেখে। বীরত্ব বীরত্বই বটে; মনস্তত্ত্ববিদের চক্ষে সামরিক বা অন্তবিধ বীরত্বে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়না; কাজেই মনে হয়েছে "বঙ্গের শেষ বীর" লেখার এখনও আমাদের সময় হয়েছিল না; মনে হয়েছে বক ও ভীমের জল যুদ্ধের কথা; সর্ব্বোপরি মনে হয়েছে পাষাণ বক্ষে প্রহ্লাদের জলে ভেসে থাকার কথা এবং যুগপৎ মনে হয়েছে যৌগিক শক্তির কথা, কেহ স্বীকার করুক বা না করুক আমরা একথা ঠিক জানি যোগ-সাধন ভিন্ন তোমার মত অত দীর্ঘকাল জলে থাকা সম্ভব হতেই পারে না। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তুমি এই কৃচ্ছ্র সাধনের নিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করেছ সে কথা বলতে আমাদের এতটুকুও কুণ্ঠা আসে না।

ভগ্নী হিসাবে তোমার নিকট এক নিবেদন আছে আমাদের হিন্দু মাত্রই নিমিত্ত স্বীকার করে। পাঞ্চজন্য হাতে বিভু বদিনা রথাগ্রে সারথী রূপে অধিষ্ঠিত থাকতেন কে পার্থের ক্লৈব্য দূর করে যুদ্ধজয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করতো তাঁকে? নিমিত্ত ভুলে গেলে চলবে না, ভাই। যে বাঙ্গলা দেশ দশবৎসর পূর্ব্বেও ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, আজ নিমিত্ত ও সারথীতে অবিশ্বাসী হয়ে সেই বাঙ্গলা হাল-ভাঙ্গা ডিঙ্গার মত বঙ্গোপসাগরের জলে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে। তুমি যখন জলে সাঁতার কাটছ, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি তোমার অনুরক্ত বন্ধুগণ ডাঙ্গায় বসে চিন্তাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তোমার কথা মনে হ'লে তাদের সেই আকুলি ব্যাকুলি এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে। পরন্তু, একথাও মনে রেখো যে ব্যায়ামক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ নাই; জলে ও স্থলে ব্যায়াম—ব্যায়াম নামেই আখ্যায়িত হয়েছে এবং হবে। অযথা বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন কেউ আমাদের করতে চাইলে তার কথা আমরা স্বজাতিদ্রোহীর কথার মত উপেক্ষা করবো। শতধা বিভক্ত হয়ে যুগে যুগে ভুগে ভুগে আজ আমরা বড় ক্লান্ত। ভারতবাসীর এই ক্লান্তি বিদূরিতকরণ মানসে ভারত-ললনা ব্রত নিয়ম উদ্‌যাপন করেন। জগত সভায় ভাইরা মোদের মাথা তুলে দাঁড়ালে ভারতের মাতা ও ভগ্নীগণের ব্রত নিয়ম সার্থক হবে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আর নাই এই আমরা দেখতে চাই। বীরোত্তম! তুমি আয়ুষ্মান্ হয়ে প্রাচ্যের গরিমা পাশ্চাত্যে প্রচার ক'রে ভারতের মুখোজ্জ্বল কর ও নিজে যশস্বী হও এই আমাদের শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা।"

বৃহস্পতিবার ২৮শে নভেম্বর "আরানকোলা" জাহাজে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার দিনস্থির হইল। আমরা গৃহে একখানি "তার" করিলাম। যাহাতে আমরা ঐ দিবস কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে না পারি তজ্জন্য নিয়োগী বাবুরা এবং রায় বাহাদুর বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহাদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে আমরা আরও কিছুকাল রেঙ্গুনে অবস্থান করি। এমন কি তাঁহারা আমাদের অগোচরে কলিকাতায় পৃথক তার প্রেরণ করিবার উদ্যোগও করিতেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের এই প্রগাঢ় স্নেহের অত্যাচারের হস্ত হইতে কোনোরূপে নিষ্কৃতি পাইয়া পরদিবস যথা সময়ে জাহাজে আরোহণ করিলাম। অনোন্যপায় হইয়া ইহারাও আমাদের বিদায় অভিনন্দনের জন্য ব্রুকিংষ্ট্রীট জেটিতে আসিলেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় জাহাজখানি বন্দর ছাড়িল। আমরাও ইহাদের স্নেহের কঠোর বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দেখিতে দেখিতে জাহাজখানি সহরকে পশ্চাতে ফেলিয়া মংকি-পয়েন্টের দিকে ছুটিল। ডেকের উপর দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত উঁহাদের হস্ত সঞ্চালিত বিদায়-সূচক রুমাল দেখিতে দেখিতে অবশেষে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলাম।

প্রত্যাগমন কালে জাহাজে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এবার সামুদ্রিক জর আমাদিগের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া বোধ করি বিশাল সমুদ্র গর্ভে আশ্রয় লইয়াছে পথের এক ঘেয়েমী কাটাইবার জন্য অধিকাংশ সময় প্রফুল্লকুমার তাস খেলিয়া কাটাইত। আমি ঐ রস গ্রহণে অক্ষম হওয়ায় আমার দিন অতিকষ্টেই কাটিতে লাগিল। রবিবার-প্রত্যুষে ৫ ঘটিকার সময় জাহাজ গঙ্গাসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কূলের দিগন্তব্যাপী শ্যামল ক্ষেত্র, বিচ্ছিন্ন তালীবন, ছোট ছোট আঁকা বাঁকা গেঁয়োপথ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মনে মনে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। পথের ক্লান্তি এক নিমিষেই দূর হইয়া গেল। আনন্দে বিহ্বল হইয়া বিমুগ্ধ নেত্রে আমার বাঙ্গলা মায়ের পল্লী-মাধুরী দেখিতে দেখিতে গান ধরিলাম—"আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।" কত মধুর! কত স্নিগ্ধ এই বাঙ্গলা দেশ ॥

বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় "আরাণকোলা" উট্রাম ঘাটের জেটিতে আসিয়া ভিড়িল। আমরা পথিমধ্যে "পাইলট" বোটের কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ পাইয়াছিলাম যে উট্রাম ঘাটের জেটিতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। জাহাজখানি জেটিতে ভিড়িতেই আমাদের সমিতির অন্যতম সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কয়েকজন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বরাবর জাহাজের উপরে আসিয়া প্রফুল্লকুমারকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন। জেটি হইতে অবতরণ করিতেই উৎসাহী জনতা ও কলিকাতার বিভিন্ন সমিতির সভ্যবৃন্দ প্রফুল্লকুমারকে অভিনন্দিত করিলেন।

এই বিজয় উৎসব উপলক্ষে "শৈলেন্দ্র স্মৃতি" সমিতির তরফ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু মহাশয়া ও বিলাতের পার্লামেন্টের মহাসভার সভ্য মিঃ এইচ্ কে হেল্‌স-ও আসিয়াছিলেন। মিঃ হেল্‌স, এই দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণের জন্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম:—"কমন্স সভার পক্ষ হইতে আমি আপনাকে বিজয় অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনার কার্য্যে ভারত তথা সমগ্র সাম্রাজ্য গৌরব বোধ করিতেছে।" ইস্কুল অফ্ ফিজিক্যাল কালচারের অধ্যক্ষ আমাদের পরম সুহৃদ্ মিঃ জে কে শীল-ও (মুষ্টি যোদ্ধা) এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

জাহাজ ঘাটের অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর আমরা সমিতি অভিমুখে রওনা হইলাম। এখানে পূর্ব্বেই প্রফুল্লকুমারের বিজয় গৌরবের জন্য কর্তৃপক্ষেরা সমিতির প্রাঙ্গণও বিচিত্র আলিপনা, মঙ্গলঘট, ও আম্রশাখা প্রভৃতির দ্বারায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। দ্বারে প্রবেশ মাত্রই কর্ম্মমঞ্চের উপর হইতে শানাইয়ের গুরু গম্ভীর "ভৈঁরো-র" আলাপ আমাদের শুভাগমন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে জ্ঞাপন করিল। সমিতির কুমারী-সাঁতারুবৃন্দ এই অবকাশে আমাদের সকলকেই পুষ্পমাল্য ও চন্দনের দ্বারায় বিভূষিত করিয়া মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। এই চিত্তস্পর্শী দৃশ্যে আমার অন্তর বিচলিত হইল, মনের মধ্যে একটা বিশেষ রকম গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমাদের প্রত্যাগমনের প্রায় এক সপ্তাহ পরে "শৈলেন্দ্র স্মৃতি" সমিতির সভ্যেরা কলিকাতা "ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট" হলে সহরবাসীর তরফ হইতে প্রফুল্লকুমারের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি বৃহত সভা আহ্বান করেন। এই সভার পৌরহিত্যের ভার রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ) মহোদয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং ভদ্রব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু মহাশয়া তাঁহার স্বভাব সুলভ সুললিত কণ্ঠে সভায় নিম্নলিখিত মান-পত্রখানি পাঠ করেন।

"পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তরণ বীর বঙ্গজননীর প্রিয় সন্তান প্রফুল্লকুমার ঘোষ করকমলেষু (শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবের উদ্যোগে)—

হে সন্তরণপটু বঙ্গবীর, আমরা তোমাকে স্বাগত জানাই।

তোমার আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও সহ্য গুণে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ, তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরাও যাহাতে ধৈর্য্য ও সহ্য শক্তিতে অনুপ্রাণিত হই। নিষ্ঠার সহিত অবহিত চিত্তে, দেশ মুখোজ্জ্বল করিতে ব্রতী হইতে পারি, সেই দীক্ষা দান করো। আমরা তোমাকে অভিনন্দন করি।

তপস্যার শ্রেষ্ঠ অর্জ্জন, আত্মশক্তির বিকাশ, তিতিক্ষা তাহার প্রথম সোপান, অধ্যবসায় ও সংযমের অধিকারী, হে তরুণ, আমরা ভক্তবৃন্দ তোমার অটুট স্বাস্থ্য কামনা করি।

তোমার চিত্তবল অপূর্ব্ব। সেই অতুলনীয় উৎকর্ষেই আজ আমাদেরও হৃতগৌরবের নব প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে। তুমি আমাদের বিস্মিত হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করো।

মঙ্গলময়ের চরণে সাধনার নিত্য প্রার্থনা, ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ। হে তপস্বীসমান সাধক, তোমার সে কামনা কখনো ব্যর্থ না হউক এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

যিনি চিরন্তন, যিনি ধর্ম্মলোক প্রকাশক সেই বরুণীয় দেবতা, মাভৈঃ মন্ত্রে দীক্ষিত তোমাকে বরাভয় দান করুন, পার্থের ন্যায় তুমি ভুবন-বিজয়ী হও।

হে সাহসের প্রতীক, মূর্ত্তরূপ, আমরা তোমাকে নমস্কার জানাই।

কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ

আজকাল সংবাদপত্রে সন্তরণের দ্বারা ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংলিশ-প্রণালীটিকে হেদুয়ার পুষ্করিণী বা কলিকাতার ভাগীরথীর অংশে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর, যিনি এক সময় ইংলণ্ডে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে ইংলিশ প্রণালী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে উহা নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিতে হইলে বৎসর দুই রীতিমত শিক্ষাধীনে থাকিয়া ইংলিশ প্রণালীতে নিয়মিতরূপে সাঁতার অভ্যাস ও ঐ স্থানের আবহাওয়ার সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এতাবৎ কাল বাঙ্গলা দেশে যতগুলি সাঁতারু সৃষ্টি হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্মশানেশ্বর সন্তরণ-সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র মালিক ও প্রফুল্লকুমারের মধ্যে সে শক্তির কতকাংশ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। উপস্থিত ক্ষেত্রে শেষোক্ত ব্যক্তিই বাঙ্গলা দেশে একমাত্র উপযুক্ত। প্রফুল্লকুমারের অবিচলিত ধৈর্য্য, মানসিক দৃঢ়তা, অদম্য উৎসাহ ও সহনশীলতার পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। মনে পড়ে ২৩ মাইল সন্তরণকালে বৈদ্যবাটীর নিকট আসিয়া হঠাৎ উদরে খাল ধরিল, এমন সময়ে প্রফুল্লকুমার জল হইতে উঠিবার জন্য আমার অনুমতি চাহিল। অনুমতি না পাইয়া এক হস্তে উদরের ব্যথিত অংশ চাপিয়া ধরিয়া অন্য হস্তে সাঁতার দিয়া বৈদ্যবাটী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু বিচারকদিগের সুবিচারে তাহাকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইল! জে পি উল্ফ্ নামে একব্যক্তি ইংলিশ্ প্রণালীতে সপ্তমবার সাঁতার দিয়া অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হন নাই। বহু সাঁতারু স্রোতের করাল কবলের মধ্যে পড়িয়া অপর পারের তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সমস্ত অভিজ্ঞ সাঁতারু দলের মধ্যে কেহ কেহ ৭০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া তীরে উঠিতে সক্ষম হন নাই। যদিচ ডোভার হইতে ক্যালের দূরত্ব ২১ মাইল মাত্র। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সমস্তই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। এমন কোন সাঁতারু নাই, যিনি সদর্পে বলিতে পারেন যে, তিনি প্রথম চেষ্টাতেই অতিক্রম করিবেন। ইংলিশ প্রণালী সাঁতার দিয়া অতিক্রম করিবার উপযুক্ত সময় জুলাইয়ের প্রথম হইতে আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত।

রাজা মন্মথনাথ রায়ের সহিত একদিন সন্তরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি প্রফুল্ল কুমার সম্বন্ধে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, আমার অন্যান্য ছাত্রেরা প্রফুল্লকুমারের সমকক্ষ হয় নাই কেন?

আমি রাজা সাহেবকে আমার অন্যান্য ছাত্রের সহিত প্রফুল্লকুমারের যে কি পার্থক্য তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার অন্যান্য ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই মাইল, অর্দ্ধ মাইল, সিকি মাইল, ২২০ গজ, ১১০ গজ, ওয়াটার-পোলো ডাইভিং ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় বহুবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এমন কি অনেক প্রতিযোগিতার সময় নির্দ্দেশ অদ্যাবধি কেহ অতিক্রম করিতেও সক্ষম হয় নাই। ইহা আমাদের সমিতির কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু একটা কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। হিন্দুস্থানী ভাষায় একটি কথা—আছে—"গুরু মিলে লাখে লাখ, লেকিন্ চেলা মিলে এক।" এ কথাটি ধ্রুব সত্য। প্রফুল্লকুমারের একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, সাহস, বিশ্বাস এবং সর্ব্বশেষে অবিচলিত গুরুভক্তি আজ উহাকে জগতের সম্মুখে ধরিয়াছে।

আমার প্রতি উহার এরূপ বিশ্বাস যে, আমি সম্মুখে থাকিলে অসাধ্য সাধন করিতে সে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না। মনে আছে ১৯৩০ সালে যে বার ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট কাল অবিরাম সাঁতার দিয়াছিল, সেই সময় একদিন প্রত্যূষে পায়ের দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করায় আমাকে জলে নামাইয়া বলিয়াছিল—"গুরুদেব তোমার পা-দুটা আমার মস্তকে এবং বক্ষে একবার বুলাইয়া দাও এবং কিছুক্ষণের জন্য আমার নিকট থাক। আমি এই মুহূর্ত্তে আর্থার রিজের সময় নির্দ্দেশ ভাঙ্গিয়া দিব।" তখন মাত্র ৬০ ঘণ্টা হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতে এরূপ অবিচল গুরুভক্তি সত্যই অতি বিরল! ধন্য প্রফুল্লকুমার তুমি কত শ্রেষ্ঠ ও কত মহৎ তাহা এই দীন লেখক কল্পনাতেও আনিতে পারে না!

প্রফুল্লকুমার দমিবার পাত্র নহে। আশা করিয়াছিল, তাহার এই ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সন্তরণের সময় নির্দ্দেশ শীঘ্রই ভঙ্গ হইবে এবং সেই সঙ্গে ১০০ ঘণ্টা নিরবসর সন্তরণের জন্য পুনরায় ঘোষণা করিবে।' যখন এই সময় নির্দ্দেশ ভঙ্গ হইল না তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া অভিনব কৌশলে হাতকড়া বদ্ধ হইয়া ২৪ ঘণ্টা কাল সাঁতার কাটিবার সঙ্কল্প করিল। এই ধরণের দীর্ঘকাল সাঁতার কাটা সন্তরণ ইতিহাসে এই প্রথম। আমরা মাত্র ২।১ ঘণ্টার জন্য অভ্যাস করিয়াছিলাম। হঠাৎ ২৪ ঘণ্টার কথা উত্থাপন হইতেই আমি চিন্তিত হইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, একবার ১২ ঘণ্টার জন্য গোপন পরীক্ষা করিয়া পরে ২৪ ঘণ্টার জন্য জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করিব। কিন্তু এই প্রস্তাব উত্থিত হওয়ায় প্রফুল্লকুমার হাসিতে হাসিতে বলিল, "গুরুদেব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি পি, কে, জি। আপনি কম্পমঞ্চের উপর চুপ করিয়া বসিয়া দেখুন আমি কি করি।" আমিও আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বলিলাম,—"তবে তাই হউক।"

শনিবার ৩১শে মার্চ্চ সাঁতারের দিন ধার্য্য হইল। ঐ দিবস কলিকাতার মেয়র এবং পুলিশের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক হাতকড়া বদ্ধ হইয়া বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ৫-৩৪ মিনিটে প্রফুল্লকুমার জলে অবতরণ করিল। সহস্র সহস্র দর্শক হেদুয়ার চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিয়া বিস্মিত নেত্রে প্রফুল্লকুমারের এই অভিনব কৌশলযুক্ত হাতকড়াবদ্ধ অবস্থায় সন্তরণ দর্শন করিতে লাগিলেন। সুকুমার ভড়,—যিনি ৫০ ঘণ্টা একাদিক্রমে সন্তরণ দিয়াছিলেন—জীবনরক্ষক রূপে প্রফুল্ল কুমারের সহিত অবতরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পর দিবস অর্থাৎ রবিবার প্রাতে হঠাৎ রক্ত বমন করায় জল হইতে তাঁহাকে উঠাইতে বাধ্য হইলাম।

এই ঘটনার পর হইতে প্রফুল্লকুমার বিনা জীবন-রক্ষকে ২৪ ঘণ্টা কাল সহাস্য বদনে পরিপূর্ণ করিয়া রবিবার ৫-৪৪ মিনিটের সময় বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং জল হইতে সিঁড়ি বহিয়া মঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার এই অলৌকিক কার্য্যে সহস্র সহস্র দর্শক স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় আসিয়া হাতকড়া উন্মোচন করিয়া প্রফুল্লকে অভিনন্দিত করিলেন। শরীর হইতে চর্ব্বি বিমোচন করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য মুক্ত বাতাসে নৌকা বিহার করিতে

লাগিল। এই ঘটনার অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে-ই স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির মতো প্রফুল্লকুমার রাজপথে বহির্গত হইল।

নিরবসর সন্তরণের খাদ্যদ্রব্যের তালিকা :—

৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট কালে—

১। বার্লি
২। হর্লিকস্
৩। গ্লুকোস্
৪। সন্দেশ
৫। পান

৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিঃ কালে—

১। কাফি
২। কোকো
৩। হর্লিকস্
৪। দুগ্ধ
৫। সন্দেশ
৬। পান

২৪ ঘণ্টা হস্তবদ্ধ অবস্থাকালে—

১। গ্লুকোস্
২। কোকো
৩। কাফি
৪। সিঙ্গাড়া
৫। সন্দেশ
৬। ডাব
৭। পান

অবিরাম সন্তরনের আবশ্যকীয় দ্রব্য তালিকা :—

১। চর্ব্বি
২। ভেসলিন
৩। নারিকেল তৈল বা সর্ষপ তৈল
৪। কলোডিয়াম
৫। রঙীন চশমা
৬। গোলাপ জল
৭। স্পিরিট
৮। তুলা
৯। পাউডার
১০। ফিডিং কাপ
১১। আইস্ ব্যাগ
১২। ষ্টোভ
১৩। আই ড্রপ

উপরিলিখিত খাদ্য দ্রব্য চার্ট হিসাবে এবং সাতারুর অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তিতরূপে খাওয়াইয়া থাকি

শ্রীশান্তি পাল।

বিতর্কিকা

১। বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা, না বাংলা?

শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

আজকাল যাঁহারা বাঙ্গালা মাসিকের খবর রাখেন—তাঁহারা জানেন যে, আমরা যে-দেশে বাস করি ও যে-ভাষায় কথা কহি—সেই দেশ, ও সেই দেশ-ভাষার নামের বানান হরেক রকম দেখা যায়।

এমন কি প্রাচীর বিজ্ঞাপনী হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্র "জয়ন্তী-উৎসর্গে" পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের হোমরা-চোমরা, মাথাওয়ালা, বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোকেরা দেশ ও দেশ-ভাষার নামের বানান প্রয়োগে শিরোনামাঙ্কিত কোন না কোন একটী বানান লইয়া—একই অনুচ্ছেদে বিভিন্ন পংক্তিতে শব্দটীকে বিভিন্ন হরপের দ্বারা সাজাইয়া—নিজেদের কেরামতি ও বানানের "তাজমহল" সৃষ্টি করিয়াছেন।

অনেকেই হয়ত বলিবেন, ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? সমস্ত বানানগুলিকেই যদি ভাষায় স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ত কোন গণ্ডগোলই থাকে না। কিন্তু কথা হইতেছে—বঁটী ও কলসীকে যথাক্রমে ছুরি ও হাঁড়ি বলিলে কেহ কি স্বীকার করিয়া লইবেন?

বিভ্রাট অনেক,—সহরের বুকে দুটি নাট্যশালা,—একটী—"রঙ্গমহল" অপরটী—"রঙমহল"। আমরা "রং" তামাসা দেখিতে যাই, দোলে "রঙ্" খেলি, আর "রঙ্গ"-রস বোধ হয় উপভোগ করি। আবার লোকে নেহাৎ হ্যাংলা লোককেই "ক্যাংলা" বলিয়া থাকে, কিন্তু শচীর দুলাল নিমাই প্রেমের "কাঙ্গাল"। এই বানান সমস্যার মাঝে পড়িয়া গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে ছাত্রের পিঠ বাঁকিয়া যায়; নাবালক শিশু ও বুড়া বাপকে বোকা বানাইয়া দেয়।

আপত্তি হইতেছে অনেক দিক হইতে। প্রথমতঃ ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের বিচারে ঐ বিভিন্ন বানানগুলির শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া হরপের আকারে বানানগুলি কেমন দেখায় তাহাও দেখিতে হইবে।

ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের দিক হইতে বিচার করিয়া সুনীতিবাবু 'বাংলা'কে নির্ব্বাসন দিয়াছেন। তাঁহার মত এই—"সুতরাং বাঙ্গালা ও তজ্জাত বাঙলাকে বাংলা রূপে লিখিলে অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ (অর্থাৎ কিনা বাংলা বাআঁলা ধরিলে) এই বানানকে অশুদ্ধ বলিতে হয়, অপিচ সমপর্য্যায়ের বাঙ্গালী বাঙালী শব্দের সহিত বানানের দৃষ্টিগত সাদৃশ্যকে অনাবশ্যক ভাবে লোপ করিয়া দেওয়া হয়।"

(বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।০—।৶০)

'শব্দকল্পদ্রুমে' "বাংলা" দেখিতে পাওয়া যায় না। 'বিশ্বকোষ'কার ও ঠিক "বাংলার" অনুমোদন করেন না। কারণ তিনি বরাবর "বাঙ্গালাই" লিখিয়াছেন। 'চলন্তিকা' এ বিষয়ে নীরব।

আশা করি, এ বিষয়ে "বিচিত্রায়" সুধী পাঠকবর্গ ও বহুদর্শী সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিবেন।

২। "বাঙ্গালী মেয়েদের শালীনতা বোধ"

শ্রীমতী লতিকা সেন

জ্যৈষ্ঠমাসের বিচিত্রার বিতর্কিকায় শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মৌলিকের লেখা "বাঙ্গালী মেয়েদের শালীনতা বোধ" পড়লাম। মোটামুটি তাঁর সঙ্গে আমার মতের অমিল না থাকলেও, তাঁর কয়েকটি অবান্তর কথা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

তাঁর উদ্দেশ্য সাধু, সে বিষয়ে আমি সন্দেহ করি না—তবে, তিনি নিজে পুরুষ, এবং মেয়েদের মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নেহাতই ভাসাভাসা, এবং স্থানে স্থানে ভুল।

মেয়েদের পরে পুরুষদের ব্যবহারের বোধহয় মোটামুটি তিনটে ভাগ করা যায়; প্রথমটি প্রাক্-শিভাল্‌রি যুগ বা খাঁটি সনাতন আর্য্যযুগ (?) যে সময় মেয়েদের তৈজসপত্র বা খুব বেশী হলে গরু বাছুর হাঁস মুরগীর সামিল করা হত। দ্বিতীয় যুগ হল ভিক্টোরিয় যুগের শিভাল্‌রির সময়, যখন নারী দেবী এবং অপ্রাপনীয়া, পুরুষদের পক্ষে তাকে পুজো করা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। আর তৃতীয় যুগ যে সময় নর ও নারী যথাসম্ভব সমান, যা আজকাল সমস্ত সভ্যদেশে চলছে, এবং যে হিসেব ধরলে, ভারতবর্ষ, তথা বাঙ্গলাদেশকে সভ্যতার বাইরে ফেলতেই হবে।

বাঙ্গলাদেশে এখনও সনাতন, তথাকথিত আর্য্যযুগ শেষ হয় নাই। তবে বোধ হয় এখন ভিক্টোরিয় যুগের আধিপত্যই বেশী। সেই কারণে একদল, মেয়েদের বাসে উঠতে দেখলে, ভুরু কুঁচকে ভাবেন এ হতভাগীরা এখানে অনধিকার-চর্চ্চা করতে আসে কেন, হাতাবেড়ি ফেলে? আর একদল মেয়েদের দেখলেই সিট ছেড়ে সসম্মানে উঠে দাঁড়ান। আর মেয়েদের যাঁরা নিজেদের সমকক্ষ মনে করেন, সে রকম ছেলে, আর ছেলেদের নিজেদের সমকক্ষ মনে করেন একরকম মেয়ে বাংলাদেশে যদি জন্মে থাকে, তবে তার সংখ্যা এত কম যে তার জন্য আনুবীক্ষণিক সেন্সাসের দরকার। সেই কারণে কোন ছেলের পাশে কোন অপরিচিত মেয়ে বসতে রাজী নন্ এবং কোন মেয়ের পাশে কোনও আত্মসম্মানজ্ঞান বিশিষ্ট ছেলে বসেন না, কণ্ডাক্টারের তাড়ার ভয়ে; কণ্ডাক্টারদের এসব ক্ষেত্রের শিভাল্‌রী স্যার বিডিভিয়ার প্রভৃতি গোলটেবিলের নাইটদের অনুকরণীয়। সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ে এসবে চরম আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

যে মেয়েটির কথা লেখক মহাশয় লিখেছেন তার অস্তিত্ব হাজারে একটি, অথবা তাও চাইতেও কম। কোন মেয়ে যদি সত্যি সত্যিই অমনি জবাব দিয়ে থাকে তবে, তাকে আমি প্রাণখুলে প্রশংসা করব। আর লেখক যাকে সহজ ভদ্রতা বলে ভুল করেছেন, তাহচ্ছে কৃত্রিম শিভ্যাল্‌রী, এবং বাসের যাত্রী সাধারণের সঈর্ষ্যাদৃষ্টি লাভের আনন্দ, এই দুইএর সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

আর মেয়েটির ব্যবহারকে লেখক অভদ্রতা বলে ভুল করলেও আসলে তা অত্যন্ত বড় কথা এবং বাংলাদেশে অল্প মেয়েই অমন চমৎকার জবাব দিতে পারে।

বাসের কথা নিয়েই অনেকখানি বলা হয়ে গেল। লেখকের আর একটি কথা সম্বন্ধেও আমার কিছু বলার আছে। মেয়েদের ব্লাউস্ সম্বন্ধে তিনি অহেতুক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। বাঙ্গালী পুরুষের পোষাক সম্বন্ধে বাঙ্গালী মেয়েদের অনেক অভিযোগ আছে কিন্তু তাঁরা ভুলেও তাঁদের পোষাকের কোন সত্যিকারের কাজের পরিবর্ত্তন করেন কি? তা যখন করেন না তখন মেয়েদের পোষাক সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত অশোভন।

বাঙ্গালী তরুণী শর্ট শার্ট পরে শরীর চর্চ্চায় যোগ দিলে লেখকের চোখে মোটেই ভাল লাগে না। বেশ, তবে কি হ'লে ভাল লাগে? বাঙ্গালী তরুণী কুড়ি বছর বয়সে পাঁচটি অপোগণ্ডের মা হয়ে যক্ষাক্লিষ্ট দেহ নিয়ে সন্তান গর্ব্বে বিচরণ করলে? লেখকের পক্ষে আশা ও আনন্দের কথা যে তিনি শর্ট শার্ট পরে শরীরচর্চ্চানিরতা বাঙ্গালী যতকম দেখতে পাবেন, চার পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা ঠিক সেই অনুপাতেই বেশী দেখতে পাবেন। বাংলাদেশের এ অসহনীয় ন্যাকামোভরা শিভাল্‌রী কবে শেষ হবে?

২ক। মেয়েদের শালিনতাবোধ

শ্রীসলিলকুমার হাজরা

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ মৌলিক লিখিত "মেয়েদের শালিনতাবোধ" এই প্রবন্ধ মনকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ ধরণের প্রবন্ধ লেখার জন্য যে সাহসের দরকার, সেটা লেখক মশায়ের আছে—তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

কিন্তু অনেকস্থলে লেখক দু'চারটি কুশিক্ষিতা নারীর অশোভন ব্যবহার দেখে, তাই নির্বিচারে সমস্ত বাঙালী মহিলাকে আক্রমণ করেছেন, একথা না বল্লে চলে না। সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগল্ লেখক যখন বল্লেন, ইউরোপীয় মহিলাদের আঁট-সাঁট Costume পরা বাঙ্গালী মহিলাদের আল্গা শাড়ী সেমিজ পরার চেয়ে অনেক বেশী সুশোভন। এতে অনেক বেশী শালিনতা রক্ষা পায়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ যেরকম কাপড় জামা ব্যবহার করেন, তা'তে নাকি কোনরকমে সোজা হ'য়ে চল্লেই শালিনতা রক্ষা পায়; আর দেহ একটু ঋজু হ'লেই বেশবাস এমনই আল্গা হ'য়ে যায় যে তা' দেখে বিদেশীয়গণ তাঁহাদের অর্দ্ধনগ্না আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলীয়ার অসভ্য রমণীদের সাথে এক পর্য্যায়ে ফেলিতে কুণ্ঠিত হন্ না। আর মাসিমারা (?) নাকি মেয়েদের হোষ্টেল ছেলেদের হোষ্টেলের পাশে করিতেই বেশী পছন্দ করেন।···ইত্যাদি

এই রকমের বহু অভাবনীয় কথা লেখক বলেছেন যেগুলো সর্ব্বাংশে সত্য নয়।

যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে যে, সত্যই যদি মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার তাই হ'য়ে থাকে (লেখক যেরকম বলেছেন), তবে এ বিষয়ে সংস্কার আবশ্যক কিনা। কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে বলার কিছু নেই; কেননা 'শালিনতা' কথাটার ঠিক অর্থ কোন অভিধানেই পাওয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মানুষের সমাজ আর রুচির উপর। আবার মানুষের রুচি সুচির-কাল-স্থায়ী; তাই দেশে দেশে, যুগে যুগে মেয়েদের বেশ-বাসের তারতম্য দেখা যায়।

আর একটা কথা, যেটাকে কোনমতেই উঠিয়ে দেওয়া চলে না। সেটা হ'চ্ছে, আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েরা যে ছোট কাপড় পরে বা সেমিজ পরে—না তার কারণ (তাদের কোন অসদভিপ্রায় নয়) (১) অনেক স্থলেই অর্থাভাব (২) কৃপণতা (৩) আমাদের দেশের শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষদের আর যাই থাক এই সুনাম এখনও আছে যে তাঁহারা নারী দেহকে ভোগ-বিলাসের লীলাক্ষেত্র ব'লে মনে করেন না। সেই জন্যও হয়তো, এদেশের মেয়েরা অঙ্গের শালিনতার দিকে একটু কম দৃষ্টি রাখেন।

৩। নামের পদবী

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

মাননীয়েষু,

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিচিত্রায় "নামের পদবী" সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে, সাগ্রহে সেটি পড়েছি। শ্রীযুক্ত স্বরূপ গুপ্ত বলেন যে পরিচিত পুরুষদের উল্লেখ করতে হলে আমরা যেমন তাঁদের নামের সঙ্গে 'বাবু' জুড়ে দিই, পরিচিতা মহিলাদের উল্লেখ করতে হলেও তেমনি তাঁদের নামের পিছনে 'দেবী' লিখে দেওয়া উচিৎ। এ সম্বন্ধে আমার কোনই আপত্য নাই। কিন্তু তিনি যদি বলেন যে অপরিচিত পুরুষদের ডাকবার সময় আমরা যেমন 'মশাই' বলে সম্বোধন করি। অপরিচিতা মহিলাদের ডাকবার সময় তেমনি 'ভদ্রে' কথাটি ব্যবহার করা যেতে পারে, তা' হলে আমি অনুযোগ করব।

'ভদ্রে' কথাটি খুবই ভদ্র সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু এ কথাটির গায়ে কি রকম যেন একটু নাটকীয় গন্ধ আছে বলে মনে হয় না কি? পুরাকালের নাটকাদিতে 'ভদ্রে' কথাটির খুবই প্রচলন দেখা যায়; পথে ঘাটে, মুখে মুখে এই কথাটি চলতে থাকলে কানে হয়ত খুব সুললিত শোনাবে না। 'ভদ্রে' বা 'আর্য্যে' এ দুটির কোনওটি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

বাংলা দেশে চিরকাল একটা রীতি চলে আসছে;

সেটি হচ্ছে সকলের সঙ্গেই একটা না একটা সম্বন্ধ স্থাপন করার প্রচেষ্টা। সেইজন্যই দেখতে পাওয়া যায় যে ভিন্ন জাতীয় হলেও অনেক স্থলে আমরা গ্রাম সম্পর্কে 'খুড়া', 'দাদা', 'দিদি' বা 'মাসী' পাতিয়ে বসি। আগে আমাদের দেশের রীতি ছিল যে অপরিচিতা মেয়েদের সম্বোধন করতে হলে 'মা' বলেই তাদের ডাকা হত। এখনও প্রাচীনেরা কোনও মহিলাকে সম্বোধন করতে হলে 'মা' বলেই তাঁকে ডাকেন। যাঁরা পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছেন তাঁরাই জানেন যে মন্দিরের পাণ্ডা আর টোঙ্গাওয়ালা থেকে আরম্ভ করে সকলেই অপরিচিতা পুরমহিলাদের 'মাঈ' বা 'মা-জী' বলে সম্বোধন করে। —

আমার বক্তব্য এই যে যদি অপরিচিতা মহিলাকে সম্বোধন করার সময় আমরা "দিদি" বা শুধু "মা" বলে তাঁকে ডাকি, তাতে ক্ষতি কি ? অবশ্য একথা উঠতে পারে যে যদি মহিলা স্বল্পবয়স্কা হন তাহলে কি উপায় হবে ? ১৭।১৮ বা তারও কম বয়স্কা তরুণীদের মাতৃসম্বোধন করা হয়ত অনেকের পছন্দ হবে না। অনেকেই হয়ত বলবেন যে ইস্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের যদি কেউ 'মা' বলে সম্বোধন করে, তাহলে তাঁকে হাস্যাস্পদ হতে হবে। কিন্তু কেন যে এক্ষেত্রে হাসির অবতারণা হতে পারে, আমি তা বুঝি না। 'মা' বলে ডাকার অর্থ এ নয় যে যাঁকে ডাকা হচ্ছে তিনি সত্যই সন্তানের জননী। এমন খুবই সম্ভব যে তাঁর সীমন্তে এখনও সিন্দুরের রেখাই পড়েনি। কিন্তু তা হলেও 'মা' সম্বোধনটিতে হাসির কি আছে ? এই একটি মাত্র কথায় যতখানি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যায় এমন আর কোনও একটি কথায় পারা যায় কি ? আর তা ছাড়া শব্দটি যে খুবই মোলায়েম ও শ্রুতিমধুর এ কথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন।

Madam শব্দের উৎপত্তি Madame এই ফ্রেঞ্চ শব্দটি থেকে। Dame শব্দের অর্থ প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা বা মাতা। ইটালী দেশে আগে Madam শব্দের পরিবর্তে Madonna শব্দটি ব্যবহৃত হত। সুতরাং Madam শব্দটির মধ্যে যে মাতৃভাবের একটি ব্যঞ্জনা আছে এ কথা বোধহয় স্বীকার করা যেতে পারে।

তাই আমি বলছি যে আমরা যদি অপরিচিতা মহিলাদের 'মা' বলে সম্বোধন করি তাহলে বোধহয় বিশেষ অন্যায় করা হবে না। 'মা' কথাটির মধ্যে যে দ্যোতনা আছে 'ভদ্রে' কথাটির মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

বেশ বুঝছি যে অনেকেই আমার বিপক্ষে সজ্জিত হচ্ছেন। আধুনিক যুবকেরা অপরিচিতাদের 'মা' বলে সম্বোধন করতে রাজী হবেন, মনে হয় না। তাঁরা হয়ত এমন একটি অভিধা খুঁজবেন যেটি হবে বেশ একটু Chivalrous ও একটুখানি কবিত্ব মাখা। একজন যুবক একটি অপরিচিতা তরুণীকে 'মা' বলে সম্বোধন করছে এই দৃশ্য তাঁদের চোখে অত্যন্ত কটু বলে মনে হবে। তাঁরা হয়ত বলবেন যেখানে মাতৃভাব মনে জাগে না সেখানে 'মা' বলে ডাকা যেতে পারে কেমন করে ? অপরিচিতা তরুণীর প্রতি আধুনিক যুবকের কি ভাব জাগতে পারে সে বিষয়ে আমি যখন কিছুই জানি না, তখন কি বলে সম্বোধন করলে যে তাঁদের মনোমত হবে তা-ও আমি বলতে অপারগ।

কথাটা যখন আরম্ভ হয়েছে তখন আরও একটু বিশদ করে আলোচনা হওয়া ভালো। অপরিচিত পুরুষের প্রতি একজন পুরুষের যে মনোভাব হয়, অপরিচিতা নারীর প্রতি একজন পুরুষের মনোভাব ঠিক সে শ্রেণীর নয়। এমন একটা অসমসাহসিক কথা বলে ফেললাম বলে নারী ও পুরুষ সমাজ যেন আমাকে ক্ষমা করেন কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই জানা যায় যে আমি যা বলছি সে কথা কতদূর সত্য। কি বলে অপরিচিত পুরুষকে ডাকব এ সমস্যা কোনদিন আমাদের মনে জাগে না। তাঁকে আপ্যায়িত করতেও আমরা চাইনা। দরকার হলে 'মশাই' বলে আলাপ করি; কাজ হয়ে গেলেই ছুটি। কিন্তু অপরিচিতা নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একটু অন্তরকমের। এক্ষেত্রে আমরা যেন একটুখানি বেশী ভদ্র হতে চাই, একটুখানি বেশী বিনয়ী; কথাগুলি কইতে চাই আর একটু মোলায়েম করে। ইংরাজীতে বলতে হলে বলা যেতে পারে—We want to create a good impression. এই যে মনোভাব আমি একে দূষণীয় বলি না কারণ মানুষের প্রকৃতিই এই, আর যা প্রকৃতি তা ভালো বা মন্দের বাইরে।

অপরিচিতা নারীকে প্রথম সম্বোধন করার সময় মনোভাব যে কেমন হয়, সে সম্বন্ধে আমি কোনও কথাই বল্‌তে পারব না; কারণ প্রথমতঃ আমি মনস্তত্ত্ববিদ্ নই এবং দ্বিতীয়তঃ কোনও নারীকে সম্বোধন করার সৌভাগ্য আমার কখনও ঘটে নি। আমি শুধু বলতে চাই যে 'ভদ্রে' কথাটির মধ্যে এখন একটি ইঙ্গিত আছে, যাকে যৌবনের ইঙ্গিত বলা চলতে পারে। নারী জাতিকে সম্বোধন করার সময় কথাটিকে আরও একটু ধীর, গম্ভীর, ও সশ্রদ্ধ (ঠিক যাকে বলে Sober) করে নেওয়া উচিৎ। 'ভদ্রে' কথাটি শুনলেই আমার যেন মনে হয় নায়ক নায়িকাকে সম্বোধন করছে। যিনি সম্বোধন করবেন এবং যাঁকে সম্বোধন করা হবে, তাঁদের যদি কদাচিৎ একথা মনে হয় তা হলে ব্যাপারটি নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে না।

অর্থাৎ ব্যাপার হয়েছে এই যে, ইউরোপে মেয়েরা স্বাধীন হয়েছে অনেক দিন। পুরুষেরা অপরিচিতা মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সেখানে মেয়ে পুরুষে এতই বেশী মেলামেশা হয় যে মেয়েরা সেখানকার পুরুষদের চোখে তাদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও ঠিক সে রকম হয় নি। আমাদের মেয়েরা পথে, ঘাটে, ট্রামে, বাসে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র কিছুদিন। এখনও শাড়ীর আঁচল বা এলো খোঁপা দেখলে আমাদের মধ্যে অনেকেই একটু চঞ্চল হয়ে ওঠেন। পথে ঘাটে এখনও নারী জাতির এত বাহুল্য ঘটে নি যে তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের আর কোনও কৌতূহল নাই। এখনও আমাদের ইচ্ছা হয় মেয়েদের সামনে এমন ব্যবহার করতে যাতে তাদের চোখে আমাদের ভাল লাগে। 'ভদ্রে' সম্বোধনটির পরিবর্ত্তে আমি 'মা' সম্বোধনটি বসাতে চাই এই ইচ্ছাটি একটুখানি প্রতিরোধ করতে।

এ সম্বন্ধে আরও বিশদ করে বলা অনুচিত হবে। যাঁরা বুঝতে চান, এইটুকু ইঙ্গিত তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

এইবার শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় বিষয়টির সম্বন্ধে আলোচনা করব। তিনি বলেন যে ইংরাজীতে Miss ও Mrs. বলে যে শব্দটী আছে, বাংলায় তার প্রতিশব্দ নাই। কিন্তু সব ভাষার সব কথারই প্রতিশব্দ যে বাংলা ভাষায় থাকতেই হবে এমন কোনও কথা আছে কি? Miss ও Mrs. শব্দ ব্যবহৃত হয় উল্লিখিত মহিলা বিবাহিতা কি কুমারী, সেইটি বোঝবার জন্য। কিন্তু এ কথা বোঝান কি নিতান্তই প্রয়োজন? তা-ই যদি হয় তাহলে মহিলাটি সধবা না বিধবা, সে কথা ও ত' বুঝিয়ে দেওয়া উচিৎ। শুধু নামটি উচ্চারণ করলেই যে তাঁর সকল পরিচয় দিয়ে দিতে হবে—নামের স্কন্ধে এতখানি কাজ চাপান অবিচার হবে। আমরা উপেন বাবু কিংবা সুরেন বাবু বলি কিন্তু তাঁরা বিবাহিত কি অবিবাহিত সে কথা সেই সঙ্গে জানিয়ে দিই কি। কেউ যদি সে খবর জানিতে চান, তাঁকে আবার প্রশ্ন করতে হবে। মেয়েদের সম্বন্ধে সেই রকম করলে ক্ষতি কি? যে নাম জানতে চায় সে শুধু মহিলাটির নামই জানবে। তিনি বিবাহিতা না কুমারী, সধবা না বিধবা, সে কথায় কি প্রয়োজন? আর যে এ খবরগুলিও জানতে চায় সে ত আবার প্রশ্ন করলেই পারে।

নামের আগে Miss লেখার এই যে ফ্যাসান এ-টি ইউরোপের আমদানী। বিদেশী যখন সবই বর্জ্জন করছি, এ-টি বর্জ্জন করব না কেন? আর মিস্ না লিখে যদি কুমারী লিখি তাহলে ব্যাপার হবে খাস্ সাহেবকে ধুতি চাদর পরালে দেখতে যেমন লাগে তেমনই।

শ্রীমতী আর শ্রীযুক্তা এই দুটি কথা নিয়ে আমরা একেবারে গোলমাল করে ফেলেছি। ছোটদের শ্রীমতী বা শ্রীমান্ ও বড়দের শ্রীযুক্ত বা শ্রীযুক্তা কেন যে বলা হয় তার কোনও কারণ নাই। ব্যকরণের হিসাবে ছোট ও বড় উভয়েই শ্রীমান্ বা শ্রীযুক্ত হতে পারে না-কি? Miss Sen না বলে শ্রীমতী সেন ও Mrs. Bose না বলে শ্রীযুক্তা বোস বলার পক্ষপাতী আমি নই। উভয়কেই শ্রীমতী বা শ্রীযুক্তা বলতে রাজী আছি।

তবে যদি মহিলাটি বিবাহিত কি না এ কথা বোঝান নিতান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে 'গৃহিনী' বা ঠাকুরাণী শব্দের প্রয়োগ করলে কেমন হয়? বোস গৃহিনী ও সেন ঠাকুরাণী শুনতে কি শ্রুতিকটু? গৃহিনী ও ঠাকুরাণী যদিই বা মুখে মুখে গিন্নী ও ঠাকরুণে পরিণত হয় তা হলেও কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে করি না।

আমার বক্তব্য শেষ হল। এ বিষয়ে নূতন কথা আরও যদি কেউ বলেন, শুনবার প্রতীক্ষায় থাকলাম।

৩ক। নামের পদবী

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নামের পদবী সম্বন্ধে শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায় নারী বন্ধুদের ডাকার যে সমস্যা উত্থাপন করেছেন তার সমাধান ক্রমশঃ জটিল হয়ে পড়ছে।

বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীনীহার রুদ্র লিখছেন—"যদি কোন নারী বন্ধুকে ভিড়ের ভিতর থেকে ডাকতে হয় তবে তার নাম ধরে দূর হতে ডাক্‌তে কোন বাধা আছে কি? শ্রীমতী রুবী দেবী, বা ইলা দেবী যদি কোন পুরুষের intimate friend হন তবে তাঁকে নাম ধরে ডাক্‌তে বাধা কি?"

এখন আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে শ্রীমতী রুবী দেবী বা ইলা দেবী যদি পুরুষের intimate friend না হন তা হলেও কি নাম ধরে ডাকা যেতে পারে? তিনি লিখছেন "যদি শুধু মুখ চেনা বা ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলবার বা জিজ্ঞাসা করবার দরকার থাকে দিদি বা বৌদি বল্‌লেই চলবে।" এখানেও জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, আগে থেকে দিদি বা বৌদি সম্বন্ধ পাতানো যদি না থাকে বা ঐ সম্বন্ধ পাতাবার মত ঘনিষ্টতা না জন্মে থাকে তাহলেও কি "শুধু মুখ চেনা" বা ভদ্রতার খাতিরে দিদি বা বৌদি বলে ডাকলেই etiquette বজায় থাকে? শ্রীনীহার রুদ্রের এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কতখানি জানি না। নারী বন্ধুদের নাম ধরে ডাকা বা দিদি ও বৌদি বলে ডাকার মত ঘনিষ্ঠতা না থাকলে তাঁদের ঐ রকম ডাকে ডাক্‌লে নারী বন্ধুরা যে খুব সন্তুষ্ট হবেন তা মনে হয় না।

পুরুষদের বেলায় যেমন আমরা উপেন বাবু বা সুরেন বাবু বলতে পারি মেয়েদের বেলায় কি বল্‌তে পারা যায় এই-টাই হচ্ছে এখন প্রশ্ন। তখনকার সমাজে পুরুষদের উপাধির শেষে "মশাই" যোগ করে 'চক্কোত্তি মশাই', 'বাড়ুয্যে মশাই' ইত্যাদি চল্‌তো, বর্ত্তমানে সমাজে westernisation এর ফলে চক্কোত্তি মশাইকে replace করেছে Mr. Chakravarty কাজেই মেয়েদের বেলাও যদি আমরা তাঁদের Miss Sen বা Mrs. Gupta বলে ডাকি তাহলে আর কোন গণ্ডগোল উঠতে পারে না, আর সবদিকও বজায় থাকে। তাছাড়া এইটাই এখন চলছে বেশ ব্যাপক ভাবে। শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে কেন যে এ শব্দটি শ্রুতিকটু হয়ে উঠলো তা জানি না।

মোটামুটী ভাবে দেখতে গেলে Miss বা Mrs. শব্দ দুটির ব্যবহারে সকল শ্রেণীর নারী বন্ধুদের; অপরিচিতই হউক আর পরিচিতই হউক, ডাকা যেতে পারা যায়। এ ছাড়া অন্য পদবী সব জায়গায় সমান ভাবে প্রযোজ্য হয় বলে মনে হয় না।

৩খ। নামের পদবী

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিতর্কিকাতে "নামের পদবী" নিয়ে যে আলোচনার সূত্র-পাত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ওটা কেবল মহিলাদের পদবী সম্বন্ধে—পুরুষের পদবী সম্পর্কে নয়।

এ কথা বোধ হয় মেনে নেওয়া যেতে পারে যে আমাদের দেশে মহিলাদের নামে পদবী সংযোগ খুবই আধুনিক; কয়েক বছর পূর্ব্বেও আমাদের মহিলাদের নিজ নিজ নামের পরে শুধু "দেবী" অথবা দাসী যোগ করেই তাঁদের পরিচয় দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইংরেজী রীতির অনুকরণেই এখন, কাল যিনি "বাসন্তী মিত্র" ছিলেন আজ বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই "বাসন্তী বসু" হ'য়ে পড়লেন। সে রকম প্রতিভা

নাগ প্রতিভা মজুমদার; শিশিরকণা চাটুয্যে শিশিরকণা মুখুয্যে হ'য়ে পড়ছেন।

এতে যে শুধু আমাদের অনুকরণপ্রিয়তারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা নয়, জটিলতাও অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

নীহারিকা দাশ গুপ্ত বি,এ, পাশ করে ভবশঙ্কর সেনকে বিয়ে করে নীহারিকা সেন হয়ে পড়লেন; কিন্তু তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের নিদর্শনগুলোতে নীহারিকা দাশ গুপ্তই লিখা রয়েছে। অনুকণা বসু ব্যাঙ্কে চলতি হিসাব খুলে টাকা গচ্ছিত রাখলেন, পরে বিশ্বরমণ মজুমদারকে বিয়ে করে অনুকণা মজুমদার লিখে ব্যাঙ্কে চেক পাঠালেন; ব্যাঙ্ক কিন্তু টাকা দিলেন না। অবশ্য উভয়স্থলেই বিস্তর লেখালেখির পরে পরিবর্ত্তন মেনে নেওয়া হলো। ব্যাঙ্কের চেক দস্তখত সম্বন্ধে আরো একটা প্রথা আছে বটে, কিন্তু তাতেও পদবী পরিবর্ত্তনের কৈফিয়তের মতো—Anukana Mazumdar Miss Basu লিখতে হয়।

সুরুচি গুহ ছেলেমেয়েদের প্রতিযোগিতামূলক আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে সুবর্ণপদক পেলেন, কিন্তু বিয়ের পরে সুরুচি ঘোষ হ'য়ে পড়াতে সন্দেহ জন্মালো কে সে পদক পেয়েছিলেন।

আমাদের মনে হয় নিঃসম্পর্কীয়া কোনো মহিলাকে তাঁর নামের পরে "দেবী" ("দাসী" এ যুগে সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণ অচল) যোগ ক'রে সম্বোধন করা চলে। "দিদি" অথবা "বৌদিদি" প্রভৃতি সকলে হয়তো পছন্দও করবেন না এবং তাতে কাজের সুবিধাও হবে না। যেখানে একাধিক "দিদি" অথবা "বৌদিদি" উপস্থিত থাকবেন, সেখানে ওরকম সম্বোধনে কাকে ডাকা হচ্ছে তা বোঝা সহজ হবে না।

যদি ইংরেজী মিস্ ঘোষ, মিসেস্ ঘোষ প্রভৃতির দাবীই বেশী ব'লে মনে হয় তা হ'লে কুমারী ঘোষ ও ঘোষ জায়া প্রভৃতির প্রচলন করা যেতে পারে। প্রথমে একটু বেখাপ্পা বোধ হ'লেও পরে স'য়ে যাবে। এখনো কেউ কেউ কুমারী আশালতা সেন, শৈলবালা ঘোষজায়া ইত্যাদি লিখে থাকেন।

৪। বাঙ্গালীর শিরস্ত্রাণ

শ্রীঅমিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ

বাঙ্গালীর পোষাক নিয়ে 'বিতর্কিকা'তে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে যদিও বলবার আরও অনেক কথা আছে, আমি পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবার আশঙ্কায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই না।

পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্য জাতিই বোধ হয় বাঙ্গালীর ন্যায় কোনও প্রকার মস্তকাবরণ শূন্য হইয়া চলা ফেরা করিতে লজ্জিত বোধ করে। বস্তুতঃ বাঙ্গালীর head-dress বলিয়া কোনও কালেই কিছু ছিলনা—আজও নাই। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই এবং বলা বাহুল্য বাঙ্গালী জাতি ইহাতে লজ্জিত নহে; পরন্তু এইটাই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজন বোধ করিলে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী একটা কিছু শিরস্ত্রাণ উদ্ভাবন করিত। কিন্তু সেরূপ প্রয়োজন, আমরা কোনও দিন বোধ করি নাই। এখন যদি আমরা newly-awakened nationalism-এর খাতিরে একটা শিরস্ত্রাণ উদ্ভাবন করিতে যাই—সেটা যেমন অনাবশ্যক, সেরূপ লজ্জাকর ও হাস্যাস্পদ হইবে। কেন, সত্যই কি আমাদের কোন প্রকার head-dress এর প্রয়োজনীয়তা আছে? খালি মাথায় চলিলে যাঁহাদের রৌদ্র লাগে—ছাতা আছে তাঁহাদের জন্য। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া ফেলি। কলিকাতায় M. C. C. খেলিতে আসিয়াছিল যখন, সকলেই দেখিয়াছিলেন বাঙ্গালী বাবুরা (যুবক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত) কাপড়, পাঞ্জাবীর উপর এক বিলাতী টুপি পরিয়াছিলেন। কি কদর্য্য দেখায়, বাঙ্গালী পোষাকের সহিত টুপি পরিলে। থাক্ ও প্রসঙ্গ। যেহেতু অন্যান্য সকল জাতিই একটা না একটা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে—আমাদেরও করিতে হইবে। এমন কি কথা আছে? বাঙ্গালী জাতীর বিশেষত্বই এইখানে। অনাবশ্যক আড়ম্বর বাড়াইয়া ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।

৫। বাঙালীর জাতীয় পোষাক

শ্রীনীহার রুদ্র

বাঙালীর জাতীয় পোষাক কী হওয়া দরকার আমার আগে তা অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন। কেউ বা পায়জামার পক্ষপাতী আবার কেউ বা ধুতিচাদরের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। আবার হয়ত কেউ বা বলবেন কেন হ্যাট কোট আমাদের জাতীয় পোষাক হওয়া দরকার, দরকারটা যে কী তা আজও আমরা ঠিক করে নিতে পারিনি তাই আজও এ বিষয়ের আলোচনা দরকার।

প্রথম আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে যে আমরা এই পোষাক নির্ণয় করবার আগে শুধু কী সহরের জনকয়েক ভদ্রসম্প্রদায়কে নিয়ে আলোচনা করব না যাদের অশিক্ষিত বলে দূরে ঠেলে দিয়েছি সেই কৃষক সম্প্রদায়কেও আমাদের দলে টেনে নেবো। যদি কেউ বলেন যে ওদের কথা ছেড়ে দিন তা হ'লে আমি বলব তবে ও বিষয়ের কোন আলোচনা না হওয়াই দরকার, কারণ নানান আবহাওয়ার মধ্যে সহরের দূষিত বায়ুর মধ্যে আমাদের সহুরে জীবন এমনি ভাবে বেড়ে উঠেছে যে নিত্য নূতন ফ্যাসানে নকল করাই আমাদের একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাজেই যদি কৃষক সম্প্রদায়কেও দলে টানা যায়, তবে মিঃ ফকির আহম্মদের নির্দ্দেশানুযায়ী পায়জামা প্রথমে বাদ দিতে হবে আমাদের, তার কারণ আমাদের দেশের কৃষকরা দরিদ্র, নিজেদের চাষ করে খেতে হয়। এ অবস্থায় মাঠের এক হাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে বলদের পেছনে পেছনে পায়জামা পরে ঘুরা খুবই অসম্ভব। আবার যদি ধুতি চাদর পরে নেহাৎ বাবু সেজে যাই তাহলেও ঐ অসুবিধা হবে। আর তা ছাড়া দুশ বৎসর আগের বাঙালীর কী পোষাক ছিল তা আবিষ্কার করে নিলেও চলবে না, কারণ আমরা আজ অনেক এগিয়ে এসেছি পুরাণো দিনের ছোট গণ্ডির ভিতর আর নিজেদের বেঁধে রাখলে হাঁফিয়ে উঠব।

কাজেই এমন একটা জিনিষ বেছে নিতে হবে যার দ্বারা ছোটখাট অসুবিধা কেটে গিয়ে চলাফেরার অনেক সুবিধা আমাদের হবে। ওটা বিদেশী আর এটা দিশি, কাজেই হ্যাট কোট পরা একটা ঘোরতর পাপ, আর ধুতি চাদর পরা খুবই পুণ্য তা ভাবা আমাদের চলবে না, দিশিই হোক আর বিদেশীই হোক আমাদের জীবনের দৈনন্দিন চলাফেরার সঙ্গে যদি খাপ খায় তবে সেই পোষাকই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। দিনে দিনে অনেক কিছুর পরিবর্ত্তন হবে ও হচ্ছে।

ফুটবল খেলা আমাদের দেশে আগে ছিলনা কিন্তু আজকাল ওর চলন এত বেশী যে মনে হয় ওটা যেন আমাদের জাতীয় খেলারই একটা অংশ সেই রকম অনেক কিছু নূতন হয়তঃ আজ আমাদের পোষাকের মধ্যে যোগ করতে হবে আবার তেমনি অনেক কিছু কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে দিতে হবে

আমরা দরিদ্র সেই দিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যে পোষাকে আমাদের খরচ খুব বেশী হয়ে না যায়। উৎসবের সময় ধুতি চাদর আবার খেলার মাঠে প্যাণ্ট অফিসে স্যুট,এত হরেক প্রকারের পোষাক ব্যবহার করার কোন মানেই হয়না। অতগুলি ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন না হলেই ভাল হবে বলে মনে হয়। জাতীয় পোষাকই যখন নির্ণয় করতে হবে তখন এমনি একটা পোষাক চাই যার দ্বারা আমাদের উৎসব সভাসমিতি অফিস প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করা চলবে।

মোহম্মদ আবদুল হামিদ মহাশয় বলেছেন যে কোট প্যাণ্ট পরলে কেউ সাহেব হয়ে যায় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার মনের গতি ঘরের দিকে তাকায়। বাস্তবিক তাই, কোট প্যাণ্ট পরলেই যে আমাদের বাঙালীত্ব ঘুচে গিয়ে সাহেবত্ব এসে যাবে তার কোন মানে নাই তবে আমাদের দেখতে হবে হ্যাট কোট আমাদের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে মানাবে কিনা, প্রথমতঃ ওতে খরচ পড়বে ঢের বেশী আর দ্বিতীয়তঃ এ গরমের দিনে এই "হোদল কুতকুত" একটা পরে থাকলেও বেশ নিরাপদ হব বলেও মনে হয় না।

দিনে দিনে আমাদের যুবকরা মেয়েলীভাবাপন্ন হয়ে

পড়ছে। সাহস ধৈর্য্য নাই, উৎসাহ নিবে এসেছে ধীরে ধীবে। এ হেন অবস্থায় বেশ সহজে অল্প খবচে এমন একটি পোষাক চাই যার দ্বারা আমাদের প্রায় সব কাজই বিনা বাধায় হয়ে যাবে আর আমরা কাজকর্ম্মেও বেশ উৎসাহ পাব। আমাব মনে হয় এর জন্ত বাঙালীর পোষাক হওয়া উচিত মালকোঁচা মারা কাপড় ও গায়ে সার্ট অর্থাৎ হাফ সার্ট হলে বেশ ভাল হয় কারণ তাতে খরচও কম পড়ে আর কাজকর্ম্ম কবাব সুবিধাও হয় অনেক, আর পায়ে থাকবে নাগরা বা সু। অফিসে খেলার মাঠে, উৎসবে ও সভা সমিতিতে প্রত্যেক যায়গায় এ পোষাক চলতে পারে বিনা বাধায়। দিনের মধ্যে দুচারবার পোষাক বদলানোর কোন দরকার নাই। লম্বা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরে তার উপর লম্বা ঝুলের সার্ট বা পাঞ্জাবী গায়ে দেওয়া মেয়ে পেটার্ণ চেহারা করে আমাদের কোন কাজই হয়না। আর বাধা আসে পদে পদে।

আর শিবস্ত্রাণ, জিতেন্দ্রনারায়ণ মহাশয় বলেছেন যে বম্বে মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশের লোকেরা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে বলে ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে তাদের চুল পেকে যায় আমার মতে এর মূলে কোন ভিত্তি নাই। কারণ যদি তাই হতো তবে পাশ্চাত্য জগতে আজ কালকার ২০।২৫ বৎসরের যুবকরা অকালে বার্দ্ধক্যের দুঃখভোগ করত, কারণ তারা সবাই সব সময় হ্যাট পরে থাকে।

তবে আমাদের দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী আমাদের শিরস্ত্রাণ চাই সাদা রংএর কারণ সাদা রং রৌদ্র নিবারক, কালো রং রোদ absorb করে নেয় কাজেই এই গরমেব দেশে সাদা টুপীই আমাদের শিরস্ত্রাণ হওয়া দরকার। বাজারে গান্ধী ক্যাপ বলে যা বিক্রি হয় তা মন্দ হবে না। ফুটীফাটা রোদে শিরস্ত্রাণ থাকলে মাথাটাকে কিঞ্চিৎ রক্ষা করা যাবে বলে মনে করি প্রখর রোদের হাত হতে।

ধূলির শিশু

শ্রীমতী রাজকুমারী অর্চ্চনা ঘোষ

রামরাজাতলা শঙ্কর মঠ
ছাতিম গাছের তলে
দেখিলাম এক নবজাত শিশু
শ্যামল ধরণী কোলে।

ভিখারী মাতার আহরণ করা
মলিন বিছানা গুলি
পারেনি ঢাকিতে তনুটুকু, তাই
সারা অঙ্গে মাখা ধূলি।

জননী তাহার কাছে সে ত নাই,
গিয়াছে বুঝিবা হায়
জঠর অনল নিবাইতে, ভুলি
তনয়ের মমতায়।

দেখিবারে তারে কাছে কেহ নাই,
শুধু এক "সারমেয়"
কি জানি কি ভেবে বসিয়া রয়েছে
আগুলিয়া শিশু দেহ।

ঝিমায়ে ঝিমায়ে দেখিতেছে আর
ভাবিতেছে মনে মনে,
ইহার স্বজাতি মানবের দল
ইহারে কেননা চেনে।

ঐ যে চলেছে রাজপথ দিয়া
জনমেলা অগণন,
কথা কৌতুকে হাস্য পুলকে
সকলেই নিমগন,—

ওরা একবার দেখেনা ত ফিরে
এ ধূলির শিশুটিকে,
স্নেহ মমতায় দু বাহু বাড়ায়ে
নেয়না ত তুলে বুকে।

ঐ যে রয়েছে উপবন ঘেরা
রাজহর্ম্ম্যের রাজি,
বিত্তদম্ভে গম্বুজ তুলি
সাক্ষ্য দিতেছে আজি,—

এখনো খুঁজিলে ঐ প্রাসাদের
ভিত্তির পাদমূলে
ইহাদের পিতৃ- পিতামহদের
অস্থি মজ্জা মিলে।

এখনো খুঁজিলে ঐ প্রাসাদের
প্রতি ইষ্টক ফাঁকে
ওদের ত্যাগের কীর্ত্তি কাহিনী
রক্ত আখরে লেখে।

উহারাই আজো পাথর ভাঙ্গিছে,
গড়িতেছে রাজপথ,
পাহাড়ের বুকে ভিত্তি গাড়িয়া
তুলিতেছে ইমারত,

কাঁকর মাখান নীরস মাটিতে
দেহের ঘর্ম্ম ঢেলে
রঙ্গিন করিয়া তুলিছে নিতুই
তিল সরিষার ফুলে।

শ্রাবণের ধারা বুকে ধ'রে এরা
ধান্য রোপণ করি
চৈত্র দিনের ভীষণ খরায়
গরুর গাড়ীতে ভরি

লয়ে যায় দূর মুনিবের বাড়ী
অবনত করি শির,
ফিরে অবশেষে নিশ্বাস ফেলি
চক্ষে ভরিয়া নীর!

যাদের লাগিয়া মুখের অন্ন
ইহারা তুলিয়া ধরে,
বিনিময়ে হায়, ছোটলোক নাম
উপাধিটি ক্রয় করে!

ইহারাই গেলে দেবের দেউলে
দেবতা অশুচি হয়,
সমাজের যত পরগাছা বয়ে
দেবতা ক্লান্ত নয়?

যুগ যুগ ধরি যাহারা কেবল
ত্যাগের সাধনা করি
স্বর্গ তীর্থ বিমল সলিল
বক্ষে লয়েছে ভরি,—

সুগত অতীত সমাগত যুগে
পরার্থে ত্যাগে দানে
হইল কেবলি বঞ্চিত যারা
সম্মানে ধনে মানে,—

তাহাদেরি ওই নিরুপায় শিশু
শেফালি-শুভ্র প্রাণ,
তোমাদের ঘরে হয় নাকি তার
হাত পরিমান স্থান?

ঘুমাও ঘুমাও ধরণীর শিশু
আকাশ ধরণী অঙ্কে;
ডুবে যাক্ তারা ডুবে গেছে যারা
বিলাস-প্রমোদ-পঙ্কে।

বায়ুকোণে ওই তুলিতেছে পাল
ঝড়ের দেশের মাঝি,
মহাপাপ ভরে বাসুকির ফণা
টল মল করে আজি!

গণদেবতার হোমের অনল
লক্ লক্ শিখা লয়ে
ভূমিকম্পের রূপে আসিতেছে
অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে!

রাজকুমারী অর্চ্চনা ঘোষ

স্বর্গীয় অনু ঘোষ ও তাঁহার আবিষ্কার

শ্রীরমেশ বসু এম-এ

স্বর্গীয় অনুকূল চন্দ্র ঘোষ, এফ, সি, এস্; এফ্, জি, এস্; এম্, আই, এম্, ই, সাধারণতঃ অনু ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার স্থায় অমায়িক ও নানা বিস্তায় উৎসাহশীল লোক খুব অল্পই দেখা যাইত। তিনি নানা

স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র ঘোষ

রকমে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াও কখনও নিজেকে জাহির করিতে চাহিতেন না, সেই জন্য বিশেষজ্ঞ ও রসজ্ঞ সমাজের বাহিরের অনেকেই তাঁহার নামও বোধ হয় জানেন না। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আত্মীয় ও বন্ধুজনদের এবং দেশের যে কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার আবিষ্কারের ক্ষুদ্র একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

তিনি মেজর এফ্, সি, ঘোষ, এম, বি, আই, এম, এস, মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। বঙ্গদেশের হিন্দুদিগের মধ্য হইতে প্রথম তাঁহার পিতা ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে (Indian Medical Service) প্রবেশ লাভ করেন। তখন উহা বঙ্গীয় চিকিৎসা বিভাগ (Bengal Medical Service) নামে পরিচিত ছিল। স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষা বিষয়েও এই পরিবার অগ্রণী ছিল। তাঁহার ভগিনী স্বর্গীয়া কুমারী উষা ঘোষ হিন্দু বালিকাদের মধ্য হইতে প্রথম যুগে লোরেটো বিস্তালয়ে (Loretto House) এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ করেন।

পরলোকগত অনু ঘোষ মহাশয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অ্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুল ও হিন্দু স্কুল হইতে পাঠ সমাপন করিয়া সেন্ট জিভিয়ার কলেজে ভর্ত্তি হন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি কলেজে বেশী দূর পড়িতে পারেন নাই, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় নিজের বিশেষত্বের পরিচয় দেন। এই সময়েই তিনি বৈজ্ঞানিক নানা বিষয় সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বহু প্রবন্ধ "উদ্বোধন" এবং ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। তখন উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউট Society for the Higher Training of Youngmen নামে পরিচিত ছিল।

ইহার অল্প কাল পরেই তিনি কলিকাতার যাদুঘরে Reporter on Economic Products এবং পরে Economic Chemist ডক্টর হুপারের (Dr. Hooper) অধীনে দুর্ভিক্ষকালীন খাস্তবস্তু (famine products)

সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করেন। তাঁহার এই বিশেষত্ব-পূর্ণ গবেষণা একটি প্রবন্ধাকারে—ঐ প্রবন্ধের নাম Asphodelus Tennifolius, an Indian Famine Food—সুপ্রসিদ্ধ সরকারী কৃষি পত্রিকা Agricultural Ledgerএ প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি "Jambon & Co"তে প্রথম বিশ্লেষণ রাসায়নিক (Analylical Chemist) ও পরে ভূতাত্ত্বিক ও খনিবিদ্যাবিশারদ (Geologist and Mineralogist) রূপে কাজ করেন। তিনি শীঘ্রই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ম্যাঙ্গানিজ খনি বলিয়া প্রসিদ্ধ সন্দুর ম্যাঙ্গানিজ খনি আবিষ্কার করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। এই খনি সম্বন্ধে তাঁর উপাদেয় প্রবন্ধ Mining and Geological Institute of India কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় এবং উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ যথা Sir Thomas Holland, Sir Henry Haydn এবং ভারতের ভূবিদ্যা বিভাগের কর্ত্তা Dr. Fermor কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। ইঁহারা সকলেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাকে সন্দুর খনি সম্বন্ধে মৌলিক, মূল্যবান গবেষণামূলক পুস্তকের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের পুরস্কার (Govt. of India prize) দেওয়া হয়। উপরোক্ত Jambon & Co তাঁহার দ্বারা সন্দুর খনি আবিষ্কারের ফলে প্রভূত লাভবান হয়; পরে যখন এই কোম্পানীর কারবার The General Sandur Mining Co. নামে রূপান্তরিত হয় তখন উহা তাঁহার কাজের জন্য সন্তোষ প্রকাশের হিসাবে তাঁহাকে ২৫০০০্ টাকা বোনাস প্রদান করেন।

এখন হইতে তিনি নিজে খনির মালিক হইলেন। তিনি খনির সন্ধানে ভারতবর্ষের উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম বহু স্থানে পরিভ্রমণ ও পরিশ্রম করেন। তাহার ফলে তিনি বহুস্থানে manganese, galena, তামা, barytes, হীরা, cement এবং steatiteএর মহামূল্যবান সঞ্চয়-ক্ষেত্র (deposit) আবিষ্কার করেন। তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত দক্ষিণ ভারতের barytesএর খনি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বিগত মহাযুদ্ধের সময় রং প্রস্তুত করিবার জন্য যে পরিমাণ barytes ভারতবর্ষে দরকার হইয়াছিল প্রায় তাহার সমস্তটাই তিনি সরবরাহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে তখন লোকের খুব উপকার হইয়াছিল।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান খুব গভীর ও বিস্তৃত ছিল এবং সে বিষয়ে তিনি হাতে কলমে ও স্বয়ং কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রশংসিত হইয়াছিল। Indian Industrial Commissionএর সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্য তিনি মান্দ্রাজ সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সুদক্ষ ও উপযোগী আলোচনার জন্য তিনি উক্ত কমিশনের সভাপতি Sir Thomast Holland কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত কমিশনের সম্মুখে সরকারের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় Indian Chemical Service নামে একটি বিভাগ খুলিবার জন্য খুব জোর দিয়া বলেন, কেন না তিনি মনে করিতেন, যে ভারতীয় শিল্প সাধনের সহায় রূপে এইরূপ একটি বিভাগ অত্যন্ত আবশ্যক। যখনই Indian Mines Actএ কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইত অথবা ঐ আইনের অনুসরণে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হইত তখনই সরকার তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। খনির মালিক স্বরূপে তিনি যত বেশী সংখ্যক ইজারা ও সনদ (Leases and licenses) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ততগুলি কখনও কোন একজন ভারতীয়ের ভাগ্যে জোটে নাই। দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র তিনি খনির মালিক ও ব্যবসা বিষয়ে অগ্রণী রূপে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিও তাঁহার ঐ সব প্রচেষ্টার কোন খবরই রাখিতেন না।

তিনি বহু পণ্ডিত-সমাজের সভ্য ছিলেন, যথা, বিলাতের The Chemical Society, The Geological Society, The Institute of Mining Engineers এবং ভারতবর্ষের The Mining and Geological Institute of India—এই শেষোক্ত সমাজের তিনি পরিচালন সভার সভ্য বহু বৎসর ছিলেন। উপরে উল্লিখিত সমাজগুলির মধ্যে শেষ দুইটি দ্বারা পরিচালিত সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় তিনি বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

তাঁহার আবিষ্কার শুধু ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যার রাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি রাসায়নিক গবেষণা ও আবিষ্কারেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় অন্যান্য ব্যবসার ন্যায় খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়েও কিছু কাল প্রচুর উন্নতি ও সম্পদ লাভের যুগ আসিয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার তাহাতে দুর্যোগ দেখা দেয়। তখন তিনি রাসায়নিক দ্রব্য নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হন এবং The Century Chemical Company নামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানী নানা রকমের সার, বিষনাশক, ও কীট পতঙ্গ নাশক দ্রব্যাদি (fertilizers, disinfectants, insecticides, germicides) প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। এই সকল দ্রব্য অতি প্রবল শক্তি সম্পন্ন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ দোকান The Planters Stores এই সকল দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিবার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছে। এই কোম্পানীর প্রস্তুত "Empranin" ম্যালেরিয়া বিষয়ে সরকারী বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা অতি কার্য্যকর ম্যালেরিয়া বিনাশক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সব ভিন্ন তিনি বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের কৃষিকার্য্যের প্রধান কণ্টক কচুরি পানা (water hyacinth) বিনাশ করিবার জন্য একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের বিবরণ ও ব্যাখ্যা তিনি বঙ্গদেশের তৎকালীন গভর্ণর লর্ড লীটনের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে উৎসাহ দান করার পরিবর্ত্তে একজন বিদেশীকে সুযোগ দেন। এই বিদেশী ম্যালেরিয়া দূর করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া দাবী করেন, এবং গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নানা রকম পরীক্ষা চালাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু সে পরীক্ষায় কোনই ফল হয় নাই।

যদিও তিনি ব্যবসা এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাপার লইয়া বিশেষরূপে ব্যস্ত থাকিতেন তথাপি তিনি পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। অনেক সময় এই সব রচনা The Madras Mail, The Times of India এবং The Mythical Societyর পত্রিকায় প্রথম ও গৌরবান্বিত স্থান লাভ করিত। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। বাস্তবিক, যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন তাঁহারাই তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞান-সেবীর পক্ষে এতটা প্রত্নানুরাগ দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। তিনি প্রাচীন ভারতের গৌরবে অতিমাত্রায় গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় তিনি নিজের খনিবিদ্যা সম্পর্কিত কাজের পরেই পুরাতত্ত্বের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার জীবনের এই একটি বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি খুব বড় পুরাতত্ত্ব বিষয়ক আবিষ্কার করিবেন। এই আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছিল। তিনি মূল্যবান্ খনিজ দ্রব্যের সন্ধান করিতে করিতে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কর্ণুল জেলায় পতিকোড তালুকের মধ্যে য়ারগুড়ি নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে একস্থানে একত্র স্থিত অশোকানুশাসন সমূহ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের কথা সাধারণ্যে প্রচার করিতে যাইয়া ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অস্থায়ী অধ্যক্ষ মিষ্টার এইচ্ হারগ্রীভস্ বলেন যে ইহা "the greatest in Mauryan Epigraphy made during the last half of a century." কিন্তু প্রথম তিনি ভয় পাইয়াছিলেন যে সরকারী পুরাবিদ্গণ তাঁহার এই আবিষ্কারে তাঁহার কৃতিত্ব স্বীকার না করিতে পারেন, তাই তিনি বহু বৎসর ধরিয়া এই আবিষ্কারের কথা গোপনে রাখেন। কিন্তু শেষে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের প্ররোচনায় তিনি ইহা প্রকাশ করেন। যাহা হউক তাঁহার কৃতিত্ব সরকারী বিবরণে স্বীকৃত হইয়াছে (Annual Report of the Archæological Survey of India, 1928-29, pp. 114, 161). পুরাতত্ত্ব বিভাগের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহ্নী ও প্রত্নলিপিজ্ঞ ডক্টর হীরানন্দ শাস্ত্রী উভয়েই ঘোষ মহাশয়ের আবিষ্কারকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

দুর্দ্ধর্ষ বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তির অন্তরালে তাঁহার মনে প্রবল সৌন্দর্য্যানুরাগ ছিল। অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি প্রাচীন শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহার সংগ্রহ রসিক-সমাজের নিকট কলিকাতার একটি দর্শনীয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বহু রকমের শিল্প সংগ্রহের মধ্যে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল বৌদ্ধ শিল্প সঙ্ঘটি।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এ ধরণের যে সকল সংগ্রহ আছে সেগুলির মধ্যে এ সংগ্রহের স্থান অতি উচ্চে। তিনি ভারতবর্ষ, নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, সিংহল, চীন ও জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে নির্ম্মিত অসাধারণ শিল্প-সৌষ্ঠব সম্পন্ন বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞেরা এরূপ সংগ্রহের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। ঘোষ মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে এই অপূর্ব্ব বৌদ্ধমূর্ত্তি সংগ্রহের একটি বিবরণী বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। তিনি উহা সচিত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সে কাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। শুধু মূর্ত্তি নয়, চিত্রসংগ্রহেও তাঁহার সমান অনুরাগ ছিল। তিনি কাংড়া চিত্রের যে সংগ্রহ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার অনুপম রসজ্ঞানের পরিচয় দেয়। কাংড়ার অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বহু চিত্র তাঁহার সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। সেগুলি স্বয়ং চক্ষে না দেখিলে বর্ণনা দ্বারা তাহাদের মাধুর্য্য বোঝান অসম্ভব হইয়া পড়ে। তিনি শিল্প বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও সমালোচনা "রূপম্" ও "রূপলেখা" নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত করেন।

তিনি বিগত ১৯১৯ সালে কলিকাতার কায়স্থ সমাজে এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নানা কাজে সত্যই সঙ্গিনী স্বরূপ ছিলেন।

হঠাৎ এবং আকস্মিক ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ১৯৩২ সালের ২৬শে জুন তারিখে পরলোকগত হন। তাঁহার ন্যায় গুণী, সরল, অমায়িক এবং উৎসাহশীল ব্যক্তির মৃত্যু পরিচিত সকলেরই শোকের কারণ হয় এবং মাত্র ৫২ বৎসরে তাঁহার ন্যায় জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যপন্থী, বহু কর্ম্মান্বিত এবং অগতানুগতিক জীবনের অবসানে দেশের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে।

শ্রীরমেশ বসু

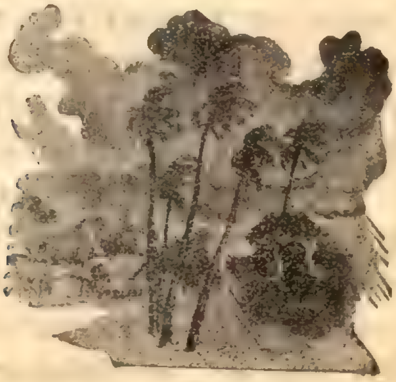

পুস্তক পরিচয়

মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ-আর-ই-এস্ বিরচিত। ৯০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅরুণ-কুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

"শনৈঃ কন্থা শনৈ পন্থা"—একটি প্রাচীন প্রবাদ। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় শনৈঃ শনৈঃ অনেকগুলি 'জীবন চরিত' লিখিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার 'হেমচন্দ্র', 'রঙ্গলাল,' 'কালীপ্রসন্ন সিংহ,' 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,' 'কিশোরীচাঁদ মিত্র,' 'ভোলানাথ চন্দ্র' প্রভৃতি চরিতাখ্যানের এক পংক্তিতে আসিয়া সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে 'রাজকৃষ্ণ'। বহিগুলির একটা বৈশিষ্ট্য সমস্ত পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকেরই ভাষা সহজ, স্বচ্ছন্দ-গতি ও স্থানে স্থানে অনাড়ম্বর কবিত্ব-পূর্ণ। প্রত্যেক পুস্তকেই অসাধারণ শ্রমলব্ধ উপকরণ সংগ্রহ পাঠকের প্রত্যেকেরই উদ্দিষ্ট গ্রন্থ নায়ক সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ হইবে। তৃতীয়তঃ, বহিগুলির আকার যত বড়ই হউক না কেন, ইহাদের মধ্যে প্রাচীন চিত্রের এতটা বাহুল্য যে এক একখানি পুস্তক যেন চিত্রশালা। পুস্তকগুলি সযত্নে গ্রন্থাগারে রাখার যোগ্য, একবার পড়িয়া ছাড়িয়া দেওয়া বা হারাইয়া ফেলিবার নহে। ইহাদের বাইণ্ডিং কাগজ ও ছাপা সুন্দর। যদি কোন পাঠক ঘূর্ণ্যমান একটি সেল্ফ তৈরী করিয়া বইগুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন, তবে টেবিলের সামনে থাকিলে অনেক সময়েই দরকারে লাগিবে। ইঁহার নূতন পুস্তক "রাজকৃষ্ণ" আমার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছে, মূল নায়কের বিবরণের সঙ্গে যে চালচিত্র দেওয়া হইয়াছে—সেই সাময়িক অবস্থা চিত্রণ ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগুলি বড়ই উজ্জ্বল হইয়াছে—তাহা বঙ্গদেশের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ। এই বইখানিতে অন্যান্য ছবির সঙ্গে বঙ্কিম বাবুর তরুণ বয়সের যে একখানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে অনেকেই হয়ত পরিচিত নহেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম—শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র অনূদিত, ৬১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে ডি, এম, লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য আট আনা।

শুধু অনুবাদ নহে—রসের অনুবাদ। কোন পরদেশী কাব্যকে ভাষান্তরিত করিতে হইলে ভাষা ও ছন্দের উপর যত অধিক অধিকার থাকা আবশ্যক, সতীশচন্দ্রের তাহা আছে। তাঁহার রচনা-রীতি অতি সুন্দর। বইখানি পড়িয়া সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেম ও প্রতিমা—শ্রীরমেশচন্দ্র দাস প্রণীত। প্রকাশক এম্-সি সরকার এণ্ড সন্স্। ৪৫ পৃষ্ঠা দাম ১৲

তুমি আর আমি—শ্রীসুধীর মিত্র প্রণীত। প্রকাশক পি-সি সরকার এণ্ড কোং। ২৮ পৃষ্ঠা, দাম আট আনা,—বাঁধানো বারো আনা।

এই দুটি তরুণ কবির কাব্যদুখানি পড়ে আমরা পরম প্রীত হ'য়েছি। বাংলাদেশে আজকাল কবির অভাব নেই; কবিতার বই যে আরো বেশি ছাপা হয় না,—তার কারণ দেশের কবি-প্রতিভার অভাব নয়,—দেশের অর্থাভাব। তার উপর, এই দুটি বই-এরই কবিতাগুলির বিষয়-বস্তু কিছু নূতন নয়,—প্রেম,—যা' নিয়ে সাহিত্যের আদিকাল থেকে রাশি রাশি কবিতা রচিত হ'য়েছে। তথাপি আলোচ্য বই দুখানির মধ্যে কিছু নূতন রসের আস্বাদন পাওয়া গেল।

একথা এই তরুণ কবিদের পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নয়,—বিশেষতঃ যখন ভাবি যে বৈষ্ণবযুগ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্য প্রেমের কবিতায় পৃথিবীর সমৃদ্ধতম সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম।

বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে বা বর্ত্তমান যুগের অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের তুলনা করা আমাদের মোটেই উদ্দেশ্য নয়,—তবু বল্‌তে চাই প্রেমের কবিতায় সমৃদ্ধ যে বাংলা সাহিত্য,—তারও সম্পদ যে এ বই দু'খানি বৃদ্ধি

করবে,—একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। ভাবের গভীরতায় ও সরসতায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, প্রকাশ-ভঙ্গীর নবীনত্বে, ছন্দের ঝঙ্কারে,—জীবনের গভীরতম আবেগকে যে একটা নূতন অনির্ব্বচনীয় রসরূপ দান করা হ'য়েছে—এই বই দুখানিতে, তা পড়লে পাঠকের অন্তর পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে,—জীবনের উপর যেন একটুখানি আলোক সম্পাত হয়। সর্ব্বোপরি কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে কবির যে মন উঁকি মারে,—তা' যেমন সরল ও অকপট, তেমনি সতেজ ও নির্ভীক,—আড়ম্বরহীন ও সামাজিক জটিলতা থেকে মুক্ত,—অথচ আবেগ-চঞ্চল ও বেদনা-সমৃদ্ধ এবং শেষ পর্য্যন্ত আত্মনিবেদনের মধ্যে প্রশান্ত।

"প্রেম ও প্রতিমার" কবিতাগুলির মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য আছে। প্রথমদিকের কবিতাগুলির মধ্যে মিলন ও সম্ভোগের সুর; প্রতিদিনকার জীবনের আনন্দ মুহূর্ত্তগুলিকে লঘু ছন্দে বেঁধে রাখা হ'য়েছে।—

"আল্‌তা চুড়ির রিনিক্-ঝিনি দেয় কত সংবাদ,
গৃহকর্ম্মে ফাঁকে ফাঁকে ঘটায় পরমাদ।
তোমার সজাগ ডাগর আঁখি
হাতছানি দেয় থাকি থাকি
আমায় দেখে যায় যে বেঁধে তোমার চরণদ্বয়,
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস পরিচয়।

"বুকের রক্ত ক্ষীর হয় যবে" কবিতাটিতে মাতৃত্বের প্রথম বিকাশের ছবিখানি চমৎকার—শেষ চার লাইন উদ্ধৃত করে দিলাম—

"সারা শরীরের শোণিতের দল সুধার আকারে জাগি
যেদিন বক্ষে উঠিল জমিয়া আরেক জীবন লাগি,—
জগৎ জুড়িয়া সে কী সঙ্গীত মানবের ঘরে ঘরে,
দেবতা ভাবিছে স্বর্গে বসিয়া—এত সুখ কোথা ধরে।"

প্রতিদিনকার কত বিস্মৃত মুহূর্ত্তের মধ্যে যে কতখানি অকপটতা ও রহস্য আছে,—রমেশবাবুর কবিদৃষ্টিতে তা' ধরা পড়েছে। প্রিয়াকে কত কাছে কত রকমে রোজই পাওয়া যায়,—তবু সহসা একদিন প্রভাতে মনে হয়,—

"কোন্ সে রহস্যময়ী চির-সঙ্গোপনে
রেখেছে প্রিয়ারে ঢাকি রহস্য বেষ্টনে।"

অথবা,—

"তুমি এলে,—তুমি এলে জানাইলে মোরে
আমার দিবসগুলি সচেতন করে।"

শেষ ভাগের কবিতাগুলির মধ্যে অন্য সুর। এখানে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু কোনো আশা নেই। এই ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় জর্জ্জরিত কবির মন স্তরে স্তরে উঠে গিয়েছে দৈহিক জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতে। বলা বাহুল্য এই ভাগের কবিতাগুলি আরো উচ্চ অঙ্গের,—কেননা মানুষের বেদনার গানই মধুরতম। এই কবিতাগুলিতে কবির গোপন প্রাণের অন্তরতম নিবিড় অনুভূতির যে অকপট নির্ভীক ও সকরুণ পরিচয় গম্ভীর ছন্দের মধ্যে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে, তা' সত্যই অনবদ্য। কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে দিলাম—

"তোমারে বেসেছি ভালো, একথা তুমিও সখি
স্বপনেও জানিবে না কভু,
তবুও গোপনে হায়, বাঁচায়ে রাখিতে হবে
সবার মনের অন্তরালে;
এমনি নিঃসঙ্গ হ'য়ে মনেরে বঞ্চনা করি
স্পর্শ সুখ পেতে হ'বে তবু,—
একটি সে নারী দেহ,—তিল তিল রেখা তার
বিচ্ছুরিত দিক্ চক্রবালে।"

আবার—

"একটি ভবনে তুমি কারারুদ্ধ, মোর কাছে
চিরমুক্ত উদাসী আকাশে
তোমার দেহটি দেখি নবশ্যাম শস্পপরে,
আঁখি তব দীঘির অতলে,
তোমার কথা যে শুনি রোমাঞ্চিত অন্ধকারে,
নাম তব ভোরের নিঃশ্বাসে—
আমার অনন্ত দুঃখ বেদনায় রাঙা হ'য়ে
দিবসের চিতা হ'য়ে জ্বলে।"

শ্রীযুক্ত সুধীর মিত্রের কবিতাগুলির অন্য সুর, চির-বিচ্ছেদের পর মিলনের মুহূর্ত্তগুলি অমর ছন্দে গ্রথিত। এর মধ্যে মিলনের সুখস্মৃতি আছে, বিচ্ছেদের বেদনা আছে, কাতর প্রাণের ব্যাকুল আত্ম নিবেদনের সান্ত্বনা আছে,—

নিবিড় অনুভূতি ও আবেগের গভীরতায় মানব জীবনের কয়েকটি চরম সত্যের অনির্ব্বচনীয় রস প্রকাশ আছে। আটাশটি কবিতার মধ্যে ঘুরে ফিরে এই সুরগুলি পাঠকের অন্তরকে সকরুণ আঘাত করে, দরদে ও সমবেদনায় ভরিয়ে দিয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় রসলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়। "তুমি ও আমি" নামটি সার্থক,—এই "তুমি" ও "আমি"র মিলনে ও বিচ্ছেদে যে জগতের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে পাঠকের মন কয়েকটি বিরল মুহূর্ত্তের সন্ধান পায়।

একটি কবিতায় আছে—

"কতোদিন আগে কোন্ বিস্মৃত বরষে
এমনি সে স্তব্ধ রাতে তোমার পরশে
জেগে উঠেছিনু মোরা! নিস্তব্ধ আঁধার
দুয়ারে লুটিতেছিল করি হাহাকার,—"

একদিন প্রিয়া কুণ্ঠাহীন অসঙ্কোচে নিবেদন করেছিল—
"একটি কবিতা লিখো মোর নাম দিয়া।"

"হায় প্রিয়া, চেয়েছিলে তুমি মোর কাছে
নশ্বর ধরার বুকে অনন্ত জীবন,
আমি ক্ষুদ্র দীন কবি! মোর সাধ্য আছে
তোমারে বাঁচায়ে রাখি জিনিয়া মরণ?"

আবার—

"যা পেয়েছি ক্ষণিকের, হোক না সে ছায়া—
জীবনের গোধূলিতে সেইটুকু দান,
যত না ভঙ্গুর হোক মরীচিকা মায়া
চিরন্তন স্বপ্নসম রহিবে অম্লান!
আমরা ভাসিয়া যাবো, মহা খরস্রোতে,
প্রেম তবু বেঁচে রবে সন্ধ্যার আলোতে।

সুশীলচন্দ্র মিত্র

বর্ণ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রস্তাব—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন শর্ম্মা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, ৮৪নং বেচু চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

পুস্তকখানির নাম পড়িয়াই মনে হইতে পারে, ইহাতে বোধ হয় প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যথার্থ পুনঃ প্রতিষ্ঠার পক্ষেই গ্রন্থকার যুক্তি চিন্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তকটির আলোচনা বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। ইহাতে গ্রন্থকার প্রাচীন তথ্য বা তত্ত্বগুলি আধুনিকতার কষ্টিপাথরে ঘসিয়া দেখিয়াছেন, এবং সেগুলিকে কিরূপে যুগোপযোগী করা যায় সে বিষয়ে প্রচুর গবেষণা ও আলোচনা করিয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, কেননা তিনি তাঁহার যুক্তির সপক্ষে বহুশাস্ত্র বচন উদ্ধার করিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন যে, হিন্দুর শাস্ত্রাদিতে ঔদার্য্যের অভাব আছে, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, সে ধারণা যথার্থ নহে। সেই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, বর্ত্তমান গ্রন্থকারের মনও গোড়ামি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। হিন্দুর জাতিবিভাগকে বর্ত্তমানকালের উপযোগী করা বিষয়ে তাঁহার মতামত অনুধাবনযোগ্য হইয়াছে।

ইহা ছাড়া জ্ঞান, ভক্তি এবং সৃষ্টি ও ঈশ্বর বিষয়ক প্রচুর আলোচনাও ইহাতে আছে।

সর্ব্বশেষে, বৈদ্য জাতির ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কীয় যে আলোচনা আধুনিক কালে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে একটি অত্যন্ত সারবান সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর নিবন্ধ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পুস্তকখানিতে কয়েক জায়গায় ছাপার ভুল লক্ষিত হইল। তথাপি বিষয় গুণে পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

নানা কথা

ভূদেব স্মৃতি-সভা

দেশের যে সকল মহাপুরুষ নিজেদের জীবদ্দশায় প্রতিভা ও পরিশ্রমের দ্বারা দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে দিয়ে গেছেন তাঁদের স্মৃতি মন থেকে বিলুপ্ত করলে কর্ত্তব্য-বিচ্যুতি ঘটে। বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পরলোকগত মহাত্মা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে সমারোহের সহিত তাঁহার স্মৃতি-পূজার আয়োজন করে চুঁচুড়ার অধিবাসীগণ উক্ত কর্ত্তব্য-বিচ্যুতির অপরাধ থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন। সভার কার্য্যে যোগদান করার জন্যে কলিকাতা এবং অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থান থেকে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী এবং ৺ভূদেব বাবুর গুণানুরাগী ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সভার কার্য্য আরম্ভ হলে "স্মৃতি সমিতি"র সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও "চুঁচুড়া সমাচার" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের সুলিখিত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া সকলে বিমুগ্ধ হন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন ৺ভূদেব বাবুর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তন্মধ্যে ৺ভূদেব বাবুর পার্শ্বচর বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দীর্ঘকাল একত্র অবস্থান হেতু তিনি ভূদেব বাবুর সম্বন্ধে এত কথা জানেন যে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে তা "ভূদেব চরিতে"র উপসংহাররূপে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ হ'তে পারে। সভায় সমবেত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, রাজা ক্ষিতিশদেব রায় মহাশয় (বাঁশবেড়িয়া), কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, কুমার শরৎকুমার রায়, পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ শেঠ, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, হুগলী জেলা বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত তারক নাথ মুখোপাধ্যায়, "চুঁচুড়া সমাচারের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ভূদেব বাবুর পৌত্র শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায়, এবং শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়, দৌহিত্র শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রপৌত্র শ্রীঅনিলদেব ও শ্রীগৌরদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী সভাপতিকে ও সমাগত ভদ্র-মহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করলে রাত্রি ৯টার সময়ে সভা ভঙ্গ হয়।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন
দ্বাদশ অধিবেশন

বর্ত্তমান বৎসরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় হ'বে স্থির হ'য়েছে। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হ'য়েছিল ১৩২৯ সালে কাশীধামে কবিবর রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। তারপর প্রতি বৎসর উত্তর ভারতের কোন-না-কোন প্রধান সহরে সম্মেলনের অধিবেশন হ'য়েছে। গত একাদশ অধিবেশনে গোরক্ষপুরে স্থির হয় যে, আগামী দ্বাদশ অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হ'বে। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বাংলা দেশের কলিকাতায় হওয়া সহসা অসমীচীন মনে হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের মনে হয় সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষের এ ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে সন্তোষজনকই হ'য়েছে। প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গলা দেশের যোগ সর্ব্বতোভাবে থাকা বাঞ্ছনীয়, এমন কি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের মধ্য দিয়েও। সম্মেলনের জন্মের প্রথম যুগান্তের শেষে সম্মেলনের অধিবেশন বাঙ্গলা দেশে অনুষ্ঠিত হ'ল। আমরা আশা এবং কামনা করি দ্বিতীয় যুগান্তেরও অধিবেশন বাঙলা দেশেরই কোন সহরে হ'বে। সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে প্রতি বৎসর বহুব্যক্তি উত্তর ভারতে গমন করেন। এবার উত্তর ভারতের বাঙ্গালী প্রবাসীগণ বাঙলায় আগমন করবেন। এতদ্বারা

আমাদের মনে হয় প্রবাসী বাঙালীদের সহিত বাঙলাদেশের অধিবাসীগণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর এবং দৃঢ়তর হ'বে। আমরা সম্মেলনের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি এই সাফল্যকে অধিগত করবার জন্যে সকলেই যথাসম্ভব সহায়তা করবেন।

আপাতত সম্মেলনের পক্ষ থেকে যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হ'য়েছে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় যথাক্রমে তার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন। সম্মেলন সম্বন্ধে খবরাখবর জানবার জন্যে ৪৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতার ঠিকানায় কলিকাতা দ্বাদশ অধিবেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়ের সহিত পত্রব্যবহার করলে চলবে।

প্রবাসে রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত ৩০শে বৈশাখ ১৩৪১ রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মীরাট শাখার উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চতুঃসপ্ততিতম জন্মোৎসব মীরাট দুর্গাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রথমে 'জনগণ-মন অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা' গানটি ছোট ছোট বালিকারা সমস্বরে (কোরাস) গান করে। তার পর কুমারী নীহার সেনগুপ্তা "আমায় ক্ষম হে ক্ষম, তোমায় নম হে নম" গানটি গেয়ে পঞ্চ প্রদীপ শঙ্খ বরণডালা প্রভৃতি দ্বারা রবীন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছবির আরতি করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রবাসী বাঙালীর পক্ষ হ'তে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। কুমারী কণিকা সুর "প্রলয় নাচন নাচ্‌লে যখন" গানটি নৃত্যসহযোগে করেন; কুমারী লীলা দত্ত এবং শোভা দত্তও নৃত্যসহযোগে গান করেন। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। কুমারী সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় "পঁচিশে বৈশাখ" আবৃত্তি করেন। স্থানীয় বান্ধব নাট্য সমিতি "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয় করেন। রাত্রি ১১॥০ টার সময় উৎসব শেষ হয়। স্ত্রী পুরুষের এতাদৃশ জনসমাগম অন্য সভায় দেখা যায় নাই।

জলধর-প্রীতি-সম্মিলনী

আমরা শুনে সুখী হ'লাম গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ২রা জুন, শনিবার, সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায়, ৫।৩ রস্তম্ জী ষ্ট্রীটে দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ য়্যাও কালেক্টার রায় কুমার শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের ভবনে বালীগঞ্জের বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান "রূপ-বাসর" একটি জলধর-প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন করেছিলেন। বাঙ্‌লাদেশ সত্যসত্যই সাহিত্যিকের যোগ্য সম্মান দিতে প্রস্তুত হ'য়েছে দেখ্‌লে বড়ই আনন্দ হয়। জলধর বাবু আজীবন বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করেছেন, সুতরাং "রূপ-বাসর" তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ যে প্রীতি-সম্মিলনীর ব্যবস্থা করেছিলেন তজ্জন্য এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানটি বাঙ্‌লাদেশের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। সভায় জলধর-সাহিত্যের আলোচনা, প্রবন্ধ ও কবিতাপাঠ, সঙ্গীতাদি হয়েছিল। আমাদের "বিচিত্রার" অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম-এ, বি-এল "রূপ-বাসরের" সম্পাদক হিসাবে রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুরকে পরিশেষে একটী সুদৃশ্য মান-পত্র উপহার দেন। রায় শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, রায় শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী, মিঃ এ, কে, ঘোষ, বার-য়্যাট্-ল, রায় শ্রী অঘোরনাথ অধিকারী বাহাদুর, রায় শ্রীঅমৃত ভট্টাচার্য্য বাহদুর, বেঙ্গল পুলিশের মিঃ যামিনীনাথ চন্দ, ডাঃ মোহিনী ভট্টাচার্য্য পি-এইচ-ডি, মিসেস্ রেণুকা চন্দ, শ্রীসুকোমল বসু, মিঃ পি, দত্ত প্রভৃতি বালীগঞ্জের বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা "রূপ-বাসরের" দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্সের নূতন অট্টালিকা

বিগত ২রা জুন ১৯৩৪, শনিবার, কলিকাতার সুবিখ্যাত কাগজ-ব্যবসায়ী "ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স"-এর নূতন বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন

হয়েছে। গৃহটি পুরাতন চিনাবাজার এবং জ্যাক্‌সন্ লেনের সংযোগস্থলে অবস্থিত, এবং ইহাতে ব্যবসার হেড্ অফিস্ স্থাপিত। দ্বারোদ্ঘাটন ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন শ্রদ্ধেয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়, এবং তদুপলক্ষে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, ভারতবর্ষীয় এবং ইয়োরোপীয় উভয়ই, উৎসব সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের, বিশেষতঃ কোম্পানীর সুযোগ্য জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এবং ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাসের সুমিষ্ট আতিথেয়তায় এবং সৌজন্যে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

এই দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবটি আমাদের দুই বিভিন্ন দিক থেকে ভালো লেগেছে। প্রথমত, কাগজ আমাদের মাসিক-পত্র কারবারের একটি প্রধান উপকরণ ব'লে কোনো কাগজ ব্যবসায়ীর অনন্যসাধারণ উন্নতি এবং সাফল্য দেখ্‌লে আনন্দ লাভ করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এ আনন্দের মূলে অবশ্য কিয়ৎ পরিমাণে আত্মীয়তার স্বার্থ নিহিত আছে। কিন্তু আনন্দের প্রধান এবং প্রকৃত কারণ, একটি বাঙ্গালী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের এরূপ বিপুল সফলতা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ। এই বৃহদায়তন অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত কাগজ এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির বিরাট ভাণ্ডার এবং সেই সকল দ্রব্যসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পূর্ণ আধুনিক সুব্যবস্থা যাঁরা দেখেছেন, এবং সেই সঙ্গে সুবিগত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের এই কারবার সংযুক্ত সামান্য একটি ঘটনার কথা অবগত আছেন, তাঁরা আমার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন। কোনো আত্মীয়ের নিকট হ'তে সহসা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামান্য একটু সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ

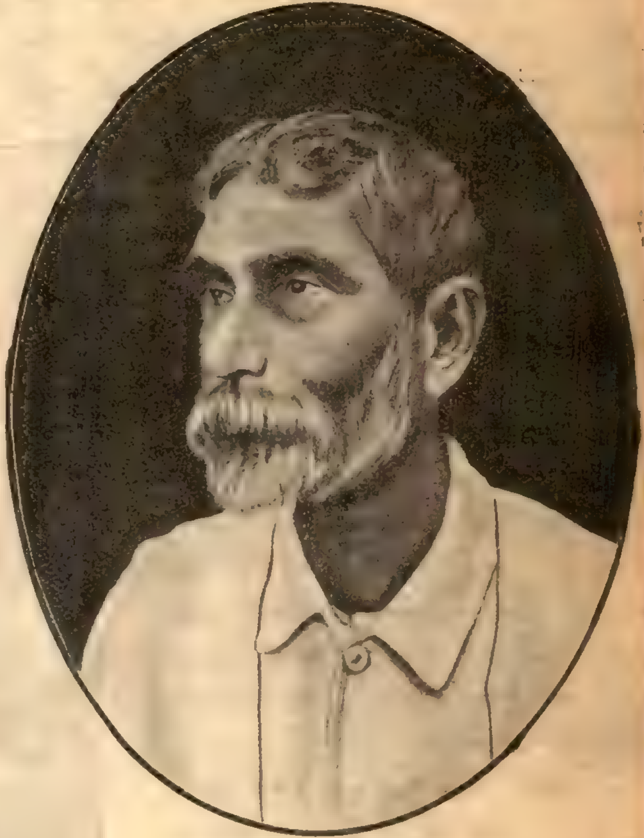

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মাত্র আট শত টাকা মূলধন নিয়ে এই কারবারের প্রতিষ্ঠাত পরলোকগত ভোলানাথ দত্ত মহাশয় কলিকাতার চিনাবাজা অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র খুচরা বিক্রয়ের কাগজের দোকান স্থাপিত

বান্ধবের "আইস্ ক্রীম সন্দেশ" খাইলে
প্রাণে স্ফূর্ত্তি আনে ও শরীরের অবসন্নতা দূর করে।
বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—১১৮ বি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা (পোষ্ট অফিসের সম্মুখে)

করেন। সেইটি বীজ। তা থেকে অঙ্কুরোদ্গম হ'য়ে ক্রমশ ধীর অথচ নিশ্চিত উন্নতির পথ দিয়ে আজকের এই মহামহীরুহের পরিণতি। সুবিস্তৃত আটষট্টি বৎসরের মধ্যে মাথার উপর দিয়ে তবুও কত ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেছে।

যাঁরা মনে ভাবেন, বিপুল অর্থ ফেল্‌তে না পারলে কোনো ব্যবসার সুত্রপাত হ'তে পারে না, তাঁরা ভোলানাথ বাবুর দৃষ্টান্ত অবলোকন ক'রে সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে দরিদ্র ভোলানাথ মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে চিনাবাজারের কাগজ ব্যবসায়ী ঠাকুরদাস নাগের দোকানে সামান্য চাকরী গ্রহণ করেন, কিন্তু পরের দাসত্বে সন্তুষ্ট থাক্‌তে না পেরে উন্নতিকামী যুবক কয়েক বৎসর পরেই ১৮৬৬ সালে তথায় নিজ দোকান স্থাপিত করেন। তারপর বিপুল পরিশ্রম উদ্যম, অধ্যবসায় এবং সততার ফলে উত্তরোত্তর ব্যবসাকে উন্নতির পথে নিয়ে গিয়ে ১৯০৮ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। ১৮৬৬ সালের বীজ তখন সতেজ বৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে। ভোলানাথ দূরদর্শী ছিলেন, পূর্ব্ব হতেই পুত্রদিগকে ব্যবসাতন্ত্রে শিক্ষিত করেছিলেন, সুতরাং পুত্রদের হস্তে ব্যবসা বানচাল না হ'য়ে উত্তরোত্তর উন্নতির মুখেই ধাবিত হ'ল।

৺ভোলানাথ দত্তের তিন পুত্র শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর দত্ত, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত এবং পৌত্র (রঘুনাথ বাবুর পুত্র) শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দত্ত উপস্থিত ব্যবসাটি পরিচালিত করছেন। এঁদের উৎসাহ-এবং-উদ্যমশীল পরিচালনার ফলে নানা বিভাগে এবং শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত হয়ে কারবার এখন বৃহৎ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

যে ব্যবসা এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে, তার মূলে যে উদ্যম অধ্যবসায় প্রভৃতি বাণিজ্যসঙ্গত গুণ আছে তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সর্ব্বোপরি য, সততা বিদ্যমান, সেই কথাই আমরা বিশেষ ক'রে লতে চাই। সততাপরায়ণতা ভিন্ন ব্যবসায়ে এতটা সফল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই সত্যটি ব্যবসাপরায়ণ ইংরাজ জাতির 'Honesty is the best policy' কথাটির মধ্যে সুপরিব্যক্ত হয়েছে। Honestyকে সে ক্ষেত্রে তারা virtue হিসাবে দেখেনি,—দেখেচে কৌশল রূপে, ফন্দীরূপে; ব্যবসাদার হ'তে হ'লে honest না হয়ে উপায় নেই! আমাদের দেশে ব্যবসাদারদের মনে এই ব্যবসা-বুদ্ধিটি ব্যাপকভাবে কতদিনে জাগ্রত হবে তা কে জানে!

৺ভোলানাথ দত্ত

দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবদিনে যে উদ্বোধন সঙ্গীতটি গীত হয়েছিল, এই সম্পর্কে আমরা তার মধ্য থেকে চারটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করলাম,

ভিত্তি এ সৌধের সততায় বদ্ধ,
পুণ্যের নভে চূড়া লগ্ন,
অনাগত দিবসের বৈভবে উন্মুখ,
অতীতের মহিমায় মগ্ন!

"ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স"-এর নবনির্মিত গৃহ

আমরা আশা করি এই স্বস্তি-বাক্য সার্থক হ'য়ে আলোচ্য বাণিজ্য-সৌধের অনাগত কালকে বৈভবশালী ক'রে রাখ্‌বে।

পরলোকগত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ বাঙলার সুবিখ্যাত নাট্যকার এবং অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৫৯ বৎসর হয়েছিল। অপরেশচন্দ্রর মৃত্যুতে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের যে গুরুতর ক্ষতি হল তা শীঘ্র পূরণ হবার নয়। আমরা অপরেশচন্দ্রের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ভ্রমসংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বিচিত্রা'য় ৬৬৭ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধে দ্বিতীয় কলমের ২২-২৩ পংক্তি এইরূপ হইবে:—"পুঁথির ৪৭ নং পদ পদাবলীর ৩১৯ নং পদের প্রথম হইতে ৭ লাইন ও ২৬৩ নং পদের ১৪ লাইন হইতে শেষ।"

রবীন্দ্র-পদক

দিল্লী হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত পত্রখানি আমরা পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করলাম।

"রবীন্দ্র সাহিত্যে বাংলার পল্লীচিত্র" নামক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পাটনা ল'কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত রাধামোহন ভট্টাচার্য্য লিখিত প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায়, তিনি এ বৎসর "রবীন্দ্র-স্বর্ণপদক" পুরস্কার পাইবেন।

"রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উৎসবকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য দিল্লীর বেঙ্গলী ক্লাব "রবীন্দ্র-পদক" নাম দিয়া প্রতি বৎসর একটি করিয়া স্বর্ণ-পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রবাসের বাঙ্গালী ছাত্র ও ছাত্রীগণের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলনে সহায়তা এই আয়োজনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আগামী বৎসরের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী আগামী ১লা ভাদ্রের পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত করা হইবে।

বেঙ্গলী ক্লাব, দিল্লী
২৫শে বৈশাখ, ১৩৪১ সাল

শ্রীযামিনীকান্ত সোম,
সম্পাদক
"রবীন্দ্র-পদক" কমিটি।

আরতি সাহিত্য সম্মিলনী—কাশী

কাশীর আরতি সাহিত্য সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত বিবরণীটি আমরা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত করলাম।

'প্রায় দুই বৎসর হইল কাশীধামে কতিপয় সাহিত্যানুরাগী উৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় 'আরতি সাহিত্য সম্মিলনী' নামে একটি সাহিত্য সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাহিত্য-চর্চ্চা দ্বারা জীবনের উৎকর্ষ লাভ ও বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। তরুণদিগের মহৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য অনেক প্রবীণ সাহিত্যিক ও বিদুষী মহিলা ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে খ্যাতনামা সুরসিক শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুসাহিত্যিক রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, প্রবীণ কবি কিরণচাঁদ দরবেশ, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সুলেখক শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র রায়, শ্রীশম্ভুনাথ দত্ত (আর্টিষ্ট), শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী (উত্তরার সম্পাদক), সুকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া, শ্রীযুক্তা পূর্ণশশী দেবী, শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী, শ্রীউমাশশী দেবী, শ্রীবেলা দেবী, শ্রীগিরিবালা রায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সম্মিলনী হইতে "আরতি" নামে একটী হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়। অনেক প্রবীন ও নবীন লেখকের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট এবং সুনিপুণ শিল্পীগণের চিত্রে ইহা সুশোভিত। সম্মিলনীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ['বাণী' পত্রিকার ভূতপূর্ব্বিক সম্পাদক] ইহার সম্পাদক; সহকারী সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী।'

নিবেদন

বর্ত্তমান সংখ্যায় বিচিত্রা'র সপ্তম বর্ষ পূর্ণ হইল।
**াগামী শ্রাবণ মাসে অধিকতর সৌষ্ঠবের
হিত অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইবে।** বিচিত্রা পাঠ
রিয়া যাহাতে পাঠকগণ জ্ঞান শিক্ষা এবং আনন্দ লাভ
রিতে পারেন তজ্জন্য আমরা পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিতে
ষ্ঠিত হই নাই। নিয়মিতভাবে মাসে মাসে রবীন্দ্রনাথ,
ৎচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলা সাহিত্যের বহু
তনামা লেখকের প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রহসনাদি
চিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্র-সম্পদ বিচিত্রার গর্ব্বের
, এবং স্বরলিপি বিচিত্রার বৈশিষ্ট্য। সুরের মধ্যে
চিত্র্য এবং বিশেষরূপ মাধুর্য্য না থাকিলে কোনো গানেরই
লিপি বিচিত্রায় প্রকাশিত করা হয় না। 'দেশের কথা'
চিত্রার পাঠকগণকে দেশের প্রধান এবং গুরুতর সমস্যা
র সহিত নিয়মিতভাবে পরিচিত রাখে, এবং 'বিতর্কিকা'
রুচিত্তে কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তুলে।
সকল কারণে বিষম অর্থসঙ্কটের দিনেও বিচিত্রার
দা অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।
মী বর্ষে যাহাতে বিচিত্রা আরও অধিক পরিমাণে
গণের মনোরঞ্জন করিতে পারে তজ্জন্য আমরা
তর বৈচিত্র্য সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছি।

বিচিত্রার বার্ষিক মূল্য মনিঅর্ডারে ৬৷৹, ভি. পিতে ৬৷৶৹, এবং ষাণ্মাসিক মূল্য মনিঅর্ডারে ৩৷৹, ভি, পিতে ৩৶৹। সুতরাং **খরচের দিক দিয়া মনিঅর্ডারেই টাকা পাঠানো সুবিধা।** কিন্তু যে-সকল গ্রাহক আষাঢ় মাসের মধ্যে মনিঅর্ডারে টাকা না পাঠাইবেন তাঁহারা ভি, পিতেই কাগজ লওয়া সুবিধাজনক ভাবেন মনে করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রাবণ মাসের বিচিত্রা ভি, পিতে পাঠানো হইবে। কোনো কারণে কেহ যদি উপস্থিত গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকেন তাহা হইলে আষাঢ় মাসের কাগজ পাওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব আমাদিগকে সে কথা অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। অন্যথা ভি, পিতে কাগজ পাঠাইয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। **এ বিষয়ে বর্ত্তমান গ্রাহকদিগকে আর স্বতন্ত্র পত্রাদি দেওয়া হইবে না।**

টাকা পাঠাইবার সময়ে পুরাতন গ্রাহকেরা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক মনিঅর্ডারের কুপনে গ্রাহক নম্বরটি (বিস্মরণে 'পুরাতন' কথাটি) লিখিয়া দিবেন, এবং নূতন গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া 'নূতন' বলিয়া উল্লেখ করিবেন, অন্যথা টাকা জমা করিবার সময়ে গোলযোগ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে।

Edited by Upendranath Ganguly. Printed b...

ভারতের

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজদিগের

দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদসম্মত উপায়ে

প্রস্তুত অভিনব সুগন্ধি তিনটি

—কেশ তৈল—

ভৃঙ্গরাজ অনুপমা কেশল

বর্ণে, গন্ধে, গুণে ও বিশুদ্ধতায়—অতুলনীয়।

ব্যবহারে সকলেই প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

বেঙ্গল ইকনমিক্ কেমিক্যাল ওয়ার্ক্স্।

৬৪ নং বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা

One of the eminent physicians says......These oils are delicately perfumed and hygienic to use. The Bhringaraj oil is particularly good. It is cool and refreshing.

..............Lt. Col.,
F. R. C. S. I.

The Mayor of Calcutta says,....The Bhringaraj hair oil is particularly rich in medicinal properties and has remarkable cooling effect on the brain............

Dr. M. N. Goswami, M. A. Lecturer in Applied-Chemistry, Science College, Calcutta, says,............The oils have been most scrupulously refined in order to avoid...objectionable matters. The perfumes chosen are not only exquisite but also conducive to growth of hair......The firm has studied the problem of hair oil making scientifically.

Ex-judge Hon'ble, Mr. P. R. Das says,......The hair oils manufactured by Bengal Economic Chemical Works are very efficacious. I especially recommend the Bhringaraj to those suffering from headache and insomnia.

Sir Sultan Ahmed, Most prominent Advocate of Patna says......The oils have been used by me and I have found them extraordinarily good. The "BHRINGARAJ" oil particularly can be used with great advantage by people who like myself suffer from insomnia.

ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিরাজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় বলেন......এই ভৃঙ্গরাজ তৈল মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক, কেশবর্দ্ধক এবং অনিদ্রাজনিত উপসর্গে হিতকর।

ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিরাজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রাণাচার্য্য মহাশয় বলেন......বেঙ্গল ইকনমিক্ কেমিক্যালের—"ভৃঙ্গরাজ তৈল" আয়ুর্ব্বেদ সম্মত। ইহা কেশবর্দ্ধক, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ও অনিদ্রা দূর করে।

(সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুইখানি উপন্যাস

১। বৈরাগ যোগ—মূল্য—১৷৽

হিন্দু ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত।

ভাষা এবং ভাবের তুলনা নাই।

২। স্মৃতির আলো—মূল্য—২৲

নারী প্রগতির মূল কথা কি তাহা এই পুস্তক পড়িলে জানিবেন। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা নিমেষে পড়িয়া ফেলিতে হয়। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের যোগ কোথায় এই পুস্তক পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

রিপণ কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ

পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা জ্যোতিষী

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত

"জাতকচন্দ্রিকা"

(মৌলিক গ্রন্থ) পাঠ করিলে জ্যোতিষে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিবেন। মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান :—The Stellar Message Office at 2/2 Uriapara Lane, Intally P. O. Calcutta। উক্ত স্থানে অতি সুলভে পাশ্চাত্য এবং হিন্দু মতে সর্ব্বপ্রকার গণনা কার্য্য করা হয় এবং গণনার ফলে সকলেই চমৎকৃত হইয়া থাকেন।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনা হইতে উদ্ধৃত

যৌবনের একেবারে গোড়াকার কথা; প্রতিভা ও প্রেম। নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত কর্‌বার যে শক্তি তার নাম প্রতিভা। আর অপরের প্রতিভার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ফলবান হবার যে প্রেরণা তার নাম প্রেম। (তারুণ্য)

চাঁদের অপলক দৃষ্টির তলে তুষারময়ী পুরী বিবশার মতো শায়িতা। তার তরুণ দেহের নিটোল কঠিন চূড়ায় চূড়ায় জ্যোৎস্নার চুম্বন, তার রজত আভরণের গাত্রে তারার ঝিকিমিকি। দস্তুর পর্ব্বতের সারি পার্শ্বরক্ষীর মতো সারারাত্রি পাহারা দিচ্ছে, বিমুগ্ধা "শালে"গুলি গবাক্ষের ঘোম্‌টা তুলে বিজলী-আলোর উঁকি মেরে দেখ্‌ছে, টোপর-পরা পাইনগাছের দল স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মতো খাড়া রয়েছে। (পথে-প্রবাসে)

বল্‌ছিলুম এমন একজন পুরুষ দেখ্‌লুম না যে বন্ধুতার মর্য্যাদা রাখ্‌ল। দু'দিন পরে নর-নারীর সেই আদিম সম্পর্ক! বন্ধু হয়ে উঠ্‌ল প্রেমিক। হতে চাইল স্বামী। (আগুন নিয়ে খেলা)

আত্মানং সততং রক্ষেৎ। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। অপ্রত্যাশিতভাবে কতো অতিথি আসবে। একজন-না-একজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়ে যেতে পাবে। গভীরতম সামঞ্জস্যই তো সত্যিকারের বিবাহ অধৈর্য্য হয়ে যাকে তাকে বিয়ে করে আসল বিবাহের সকল সম্ভাবনা নষ্ট কোরো না। (অসমাপিকা)

জগতের যত মহাপুরুষ তাদের সকলের সঙ্গে এক সারিতে বস্‌বার যোগ্যতা অর্জ্জন করবে সে। তার কল্পলোকে পদে পদে যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও করমর্দ্দন তাঁরা কলিন্স মিলফোর্ড দে সরকার নন্, আত্ম অবিশ্বাসী ওয়েলী নন্, তাঁরা দান্তে গ্যেটে শেক্‌সপীয়ার প্লেটো অ্যারিষ্টট্‌ল গৌতম বুদ্ধ। (যার যেথা দেশ)

পুন কোন্ বনে পড়িব বাঁধা
নূতনা রাধা!
পুন কোন্ বনে বাঁশরি-সাধা
আবার কাঁদা!
পথের কোথাও শেষ কি আছে
পথিকের কোনো দেশ কি আছে
ঘরের বাঁধনে নাই কি বাঁধা
নাই কি কাঁদা!
সমাপিবে চির বাঁশরি-সাধা
সুচিরা রাধা। (রাখী)

এই চিরসৌন্দর্য্যলোকে
সুন্দরী উত্তমা গো
আজকে রাতে তুমি আমার সাথে।
চিনাও মোরে অন্ধকারের
উদ্ভিন্ন সুষমা গো
অন্তরালের বার্ত্তা শুনাও
সুন্দরী উত্তমা গো
লোকান্তরে পৌঁছে দিও প্রাতে।

(একটি বসন্ত)

হাটের দিন

বিচিত্রা
শ্রাবণ, ১৩৪১

শিল্পী—শ্রীতারকনাথ বসু